তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৬৩ (৩৩০০)

উপদেষ্টা পরিষদ :

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর সুকুমার সেন

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোকচিত্র :

শ্রী মোনা চৌধুরী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন,
কলিকাতা-৬ হইতে শ্রী জয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

কালরাত্রি

তা. র. ১৮—১

শ্রীমান নির্মল খান

কল্যাণীয়েষু

প্রথম পর্ব

কয়েকটা মুহূর্তের জন্য পৃথিবীর সমস্ত গতি, সমস্ত চেতনা, সমস্ত জীবনস্পন্দন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল অংশুমানের কাছে। মনে হল সূর্যের চারিপাশে আপন কক্ষপথে পৃথিবীর যে অবিরাম চলমানতা তাও যেন থেমে গিয়েছে।

ফলে অংশুমানের দৃষ্টির সম্মুখে স্থির এই জগৎ-লোকের সমস্ত কিছু আস্তে আস্তে মুছে আসতে আরম্ভ করেছিল। কোন আলো সেখানে ছিল না, কোন কালোও সেখানে ছিল না। তার নিজের অস্তিত্বও যেন তার নিজের কাছে মুছে যাচ্ছিল; গিয়েওছিল অনেকটা। নিভিয়ে আসা প্রদীপের শলতের প্রান্তে ক্ষীণতম আলো ও উত্তাপের মতই তার অস্তিত্বের অবশেষটুকু কোনরকমে বজায় ছিল।

মোটর অ্যাকসিডেন্টে আহত সেই রক্তাক্তদেহ শিশুটি তারই ছেলে? যাকে সে নিজে দুই হাতের ভাঁজের উপর তুলে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সী ওয়ার্ডের টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে এসেছিল—সেই অচেনা শিশুটি? তারই ছেলে? সীতা তার কাছ থেকে চলে গিয়ে নিজের হাতে নিজের সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন নিয়ে তারই উপাধি ব্যবহার করে ওই শিশুকে সগৌরবে আপন গর্ভে ধারণ করেছে; প্রসব করেছে; তাকে এতবড় করে তুলেছে; অবশেষে—!

এইখানেই তার চেতনা ও চৈতন্যের শিখাটা নিভে যাওয়ারই কথা। কিন্তু এইখান থেকেই শিখাটা আবার একটু করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ণ চেতনায় ফিরে এল সে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীও চলতে লাগল—সকালের আলো আপন দীপ্তিতে উত্তাপে প্রকাশিত হল। মনে পড়ে গেল—সংলগ্ন বাথরুমটার মেঝের উপর ওই শিশুটি এবং সীতার রক্তমাখা কাপড়-জামাগুলি জড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে।

একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে বাথরুমের ভিতর থেকে। সে ল্যাভেণ্ডার সাবান ব্যবহার করে; দেশী ল্যাভেণ্ডার অবশ্য; সেই সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়েছে—সেই গন্ধ বাতাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে—তার সঙ্গে আছে জলো জলো ভাব। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রঞ্জন। রঞ্জন সংবাদটা এনেছে।

* * *

চলমানতার বেগ তাকে পিছনের দিকে নিয়ে গেল; সামনে তো অগ্রসর হবার সীমা শ্মশান পর্যন্ত বিস্তৃত। তার বেশী তো নয়। অন্ততঃ এই এখনি এই মুহূর্তে ওই শ্মশানঘাট নিমতলা বা কেওড়াতলাকে অতিক্রম করে আর যাওয়া যায় না। না বৈতরণী নয়; ভাগীরথী আর কাটিগঙ্গা এগিয়ে যেতে দেয় না। মৃত্যুলোক বা অমৃতলোক বা পরলোকের স্বর্গ নরকের কথাও নয়। অংশুমান ওতে বিশ্বাস করে না। বাস্তব জীবনেই এর পর আর কোন কল্পনা যেন পক্ষবিস্তার করতে পারছে না। শ্মশানের বুকে কাঠ সাজিয়ে একটি চিতা তৈরি করে তার উপর ওই শিশুটির শব নামিয়ে দিয়ে—।

চমকে উঠল; সারা বুকটা যেন তার টনটন করে উঠল। ছেলেটি যে তারই সন্তান!

মন তার চিতায় আগুন দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়; পিছন ফিরে ছুটে পালায়। মন তার ছোটে পিছনের দিকে।

•

চৌরঙ্গী রোড আর ধর্মতলা স্ট্রীটের জংশনে মন গিয়ে থামল। গতকালের অপরাহ্ণবেলা—বেলা পাঁচটা; পশ্চিম আকাশে সূর্য তখনও বেশ উত্তপ্ত এবং দীপ্তিও তার খুব প্রখর। অংশুমান ফিরছিল ট্যাক্সিতে। তার ট্যাক্সির সামনেই ছিল একখানা প্রাইভেট। তার সামনে ছিল একখানা খালি ট্রাক এবং একখানা দোতলা স্টেট বাস। সব গাড়ি কখানাই মোড় নিচ্ছিল ডানদিকে ধর্মতলা স্ট্রীটে—সামনের বাস ট্রাক এবং প্রাইভেটখানাও। তার ট্যাক্সি যাবে সোজা উত্তরে। প্রাইভেটখানা ট্রাক ও বাসখানাকে পাশ কাটিয়ে যাকে মেরে বেরিয়ে যাওয়া বলে তাই যেতে গিয়ে কর্কশ শব্দ তুলে ধাক্কা লাগালে। লাগালে ট্রাকখানার সঙ্গে, গাড়িখানার ডানদিকের পিছনদিকটা একেবারে তুবড়ে গেল। প্রচণ্ড একটা শব্দ উঠল।

এই গাড়িতে ছিল সীতা। আর এই শিশুটি। এরাই ছিল পিছন সিটে। সামনে বসে যিনি ড্রাইভ করছিলেন তিনি বেঁচে গেছেন। ছোট শিশুটির একখানা হাত একেবারে থেঁতলে গিয়েছিল—সীতার মুখ ভাঙা কাঁচে কেটে ছোট ছোট ক্ষতে বিক্ষত হয়ে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল।

সীতাকে দেখে চমকে উঠেছিল অংশুমান। শিশুটি সীতার তাতে সন্দেহ ছিল না। সীতার মুখের আদল ছিল—আর তা ছাড়া ট্যাক্সিতে বাক্স পেঁটরা বেডিং বোঝাই করে যে মেয়ে যাচ্ছিল, হাসপাতালে যার ভ্যানিটি ব্যাগে দেড়খানি সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট পাওয়া গিয়েছিল সে মেয়ের ওই শিশুটি সন্তান ছাড়া কি হতে পারে?

যিনি গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন তিনি অক্ষত ছিলেন এবং তাঁকে পুলিস নিয়ে গেল থানায় আর সীতাকে ও শিশুটিকে তার ট্যাক্সিতে তুলে অংশুমানই নিয়ে এসেছিল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সঙ্গে পুলিসও ছিল অবশ্য।

সীতার আঘাত বাইরে থেকে গুরুতর মনে হয় নি। কপালে একটা ইঞ্চি দেড়েক লম্বা কাটাই ছিল সব থেকে বড় আঘাত। তা ছাড়া টুকরো টুকরো কাঁচ বিঁধেছিল; সেগুলি খুব মারাত্মক মনে হয় নি কারও। তবে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল এইটেই ছিল আশঙ্কার কথা। বাইরে থেকে দৃষ্টির অগোচর কোন আঘাত যদি তার মাথায় কি বুকে লেগে থেকে থাকে তবে সে আঘাত সামান্য হবে না।

অংশুমান ওই শিশুটিকে দেবার জন্য কিছু রক্ত দিয়ে এসেছিল। 'ভাগ্যের কথা'—ডাক্তার তাই বলেছিলেন; অংশুমানের রক্ত নেবার সময় ডাক্তার বলেছিলেন—ভাগ্যের কথা বলতে হবে। একই গ্রুপের রক্ত।

তখন একটু চমকে উঠেছিল অংশুমান। সীতার শিশু এবং তার রক্ত অংশুমানের রক্তের সঙ্গে একই গ্রুপের?

মন তার আরও পিছনে চলে গেল।

তার চোখ আপনি ঘুরে গিয়ে নিবদ্ধ হল তার শোবার ঘরের দিকে; তার ওই সিংগল্-বেড খাটখানার উপর।

*   *   *

পাঁচ বছর আগে চলে গেল মন। ১৯৫২ সালে। তারিখও মনে আছে। ২৭শে জুলাই। তারিখ তার মনে থাকে না। ডায়রী রাখা তার ঘটে ওঠে না। বছরের প্রথমেই ডায়রী ক্যালেণ্ডার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠায়। একখানা ডায়রীতে খরচ নয়, জমা লিখে রাখে; বাধ্য হয়েই রাখে। না-হলে পাওনা হিসেবের সময় গোলমাল হয়। আর একখানা সে ডায়রী লিখব বলেই নাম ঠিকানা লেখে—১লা জানুয়ারী থেকে কয়েকদিনের ডায়রীও থাকে কিন্তু তারপর আর থাকে না। হঠাৎ কোন দিন ডায়রীখানা টেনে নিয়ে দু'চার লাইন লিখে রাখে।

১৯৫২ সালের ২৭শে জুলাই লেখা আছে—"আজ সীতা চলে গেল। কাল রাত্রে সে এখানে ছিল। আমি তাকে জোর করে আটকে রেখেছিলাম।"

তারপর কয়েকটা লাইন লিখেও কেটে দেওয়া আছে। কালির দাগে দাগে লেখাগুলিকে একেবারে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মনে আছে অংশুমানের। "অনুশোচনা হচ্ছে। অন্যায়—।" কেটে দিয়েছে। তারপর ছিল—"কালের সঙ্গে সে চলতে পারলে না। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি—এ কি সেই সীতা?"

ভোরবেলা সে গাঢ় ঘুমে ঘুমোয়। সেদিন ঘুমটা গাঢ় হয় নি। হতে পায় নি। সীতা এবং সে এই এক খাটেই রাত্রি যাপন করেছিল। ঘুমটা ছিল পাতলার উপর। একটা জেট প্লেনের ল্যাণ্ডিংয়ের কঠিন এবং নিষ্ঠুর আওয়াজে তার ঘুমটা ভেঙে গেল। প্লেনখানা রোজই আসে রোজই নামে—কিন্তু সেদিন এমনভাবে মাথার উপর এত নিকট দূরত্বে এসে পড়েছিল যে চমকে জেগে উঠতে হয়েছিল তাকে।

মনে আছে প্রথমটা ঘুমের মধ্যেই তার মনে হয়েছিল যে হয়তো কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। হয়তো জেটখানা ভেঙে পড়ছে। এবং পড়ছে বাড়ির মাথায়।

পরক্ষণেই প্লেনখানা তার বাড়ির মাথার এলাকা অতিক্রম করে এগিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তার মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে এসেছিল একটা বিরক্তিসূচক শব্দ।

"আঃ" শব্দ করে সে চোখ মেলতে বাধ্য হয়েছিল।

সব স্পষ্ট মনে পড়ছে।

এত স্পষ্ট যে মনে হচ্ছে, আশ্চর্য কিছুর স্রোতে অবগাহন করে এমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। না-হলে এই পাঁচ বছরের বাতাসে উড়েপড়া ধুলোর আস্তরণ কোনক্রমে মুছে ফেলা যেত না। বিবর্ণ হয়ে যেতই।

মনে পড়ছে বিছানায়-শুয়ে-থাকা মুখের কাছেই ছিল সীতার মাথা দেওয়া বালিশটা। কোন গন্ধ তার নাকে এসেছিল কি না মনে পড়ছে না। অন্ততঃ সে-সম্পর্কে সে সচেতন ছিল না।

বালিশটাই তার স্মৃতির আলোটিকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ইলেকট্রিক বাল্বের মত দপ্

করে জলে উঠেছিল।

মুহূর্তে একই সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল গত রাত্রির সমস্ত ঘটনার কথা এবং খোলা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিল সীতা দাঁড়িয়ে আছে তারই দিকে তাকিয়ে। যেন যাবার জন্ম তৈরী হয়ে তার এই চোখ খুলে তাকানোর প্রতীক্ষা করেই দাঁড়িয়ে ছিল। চোখোচোখি হতেই অথবা তার আগে থেকেই সীতার মুখে একটুকরো এবং অতি ক্ষীণ-হাসি ফুটেছিল।

এ হাসি এবং এ দৃষ্টি যেন কাঁটার মতই তীক্ষ্ণ মুখে বিদ্ধ করেছিল অংশুমানকে। মনে পড়ছে সঙ্গে সঙ্গেই সে চোখ বন্ধ করেছিল। কিন্তু সীতা বলেছিল—চোখ বন্ধ করো না। আমি যাচ্ছি।

—যাচ্ছ? চোখ না খুলে পারে নি অংশুমান।

সীতা বলেছিল—কিন্তু এটা কি হল বল তো?

এবার আবার চোখ বন্ধ করেছিল অংশুমান। সীতা আবার হেসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সারা মুখখানির উপর নেমে এসেছিল করুণতম বিষণ্ণতার ছায়া। নিরুত্তর অর্ধনিমীলিত চোখে অংশুমানের দিকে তাকিয়ে সীতা বারকয়েক বেদনার্তের মত ঘাড় নেড়ে বলেছিল—উত্তর দেবে না?

এবার চোখ বুজে থেকেই অংশুমান উত্তর দিয়েছিল, 'ডোণ্ট বি সেন্টিমেণ্টাল!'

এর আর কোন উত্তর দেয় নি সীতা। তার মুখে এবার ব্যঙ্গের নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠেছিল। সে হাতব্যাগটা তুলে নিয়েছিল সামনের টেবিলের উপর থেকে, তারপর মৃদু চটির শব্দ তুলে যত কম শব্দ করে হয় ঘরের দরজাটি খুলে ফেলে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু দরজার মুখে গিয়ে আবার একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল! বিছানার তার খালি যে অংশটা পড়ে ছিল সেই দিকে তাকিয়েছিল সে। ওই স্থানটুকু তার জীবনের স্বর্গ না নরক তা বুঝতে চেষ্টা করেছিল বোধ হয়। কিন্তু সে-প্রশ্ন সে করত কাকে? ভগবান মানলে হয়তো তার কাছে করতে পারত। ভগবান সে মানে না এমন নয়—তবে মানে কিন্তু বিশ্বাস তো নেই। জিজ্ঞাসা করবার মত বিশ্বাস তো করে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনি যেন ঝরে পড়ল তার বুক থেকে। তার নাম সীতা—অংশুমানকে সে কিছুতেই রাবণ বলে ভাবতে পারে নি। কথা ক'টা সীতারই কথা। কথাগুলো মুখে সে সেদিন বলে নি। পরে চিঠিতে লিখেছিল। চিঠিখানা সে ছিঁড়ে ফেলেছে কিন্তু কথাগুলো ভুলতে পারে নি। মাস চারেক পর হঠাৎ চিঠিখানা এসেছিল। ঠিকানা ছিল না। লিখেছিল—"আমার নাম সীতা বলেই সেদিন ভোরবেলা মনে হয়েছিল তোমাকে রাবণ বলে গাল দেব। কিন্তু কিছুতেই তা পারি নি। তোমাকে রাক্ষস ভাবতে আমি পারলাম না। তুমি রাবণকে বলতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্বর; ব্রহ্মার অভিশাপকে ধ্রুব মনে করে সীতার সর্বনাশ সে করতে পারে নি। তুমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নও—বর্বরও নও। এবং আমার জীবনের কিছুই তোমাকে অদেয় ছিল না। কিন্তু—। থাক—সব ডুবিয়ে দাও। তুমিও দাও। আমিও দিতে চেষ্টা করব। তুমি রাবণ নও আমিও সীতা নই। তোমার কোন হুকুমে অগ্নিপরীক্ষা আমি দেব না।"

থাক। সেদিন যখন সীতা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বিছানাটার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল

তখন তার চোখ আপনাআপনি বুজে এসেছিল। চোখ বন্ধ করেই সে তাকে বলেছিল—শোন।

সীতা বলেছিল—বল।

সে বলেছিল—কোন ডিফিকাল্টি হলে আমাকে জানিয়ো।

এ কথায় সীতার কপালে ক'টা রেখা জেগে উঠেছিল। কণ্ঠস্বর তিক্ত হয়ে উঠেছিল উত্তর দিতে। উত্তরে তিক্তকণ্ঠে বলেছিল—ডিফিকাল্টি?

আজও মনে পড়ছে কথাটা খোঁচার মত মনে হয়েছিল এবং সেও তিক্তস্বরে বলেছিল—হ্যাঁ হ্যাঁ—ডিফিকাল্টি। খুকীপনা করো না।

সীতা বলেছিল—অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলেছিল—না খুকী আমি নই। খুকীপনা আগে করতাম এখন একেবারেই করিনে। যার জন্যে অভিনয় করাই ছেড়ে দিলাম। খুকী নই সে জ্ঞান আমার আছে বলেই আমার সকল কাজের দায় একান্তভাবে আমারই। সে বোধ আছে বলেই তোমার আমার দেনাপাওনার দায় মিটিয়ে যা দেবার দিয়ে যাচ্ছি যা নেবার নিয়ে যাচ্ছি। এর জন্যে যে দুর্ভোগই আসুক না কেন সে একান্তভাবে আমারই। তার জন্যে তোমার শরণই বা নেব কেন—তোমাকে স্মরণ করতেই বা যাব কেন?

অংশুমান চোখ বন্ধ রেখেই বলেছিল—আই সী।

সীতা বলেছিল—ভারী খারাপ লাগছে অংশু। তোমার মুখে ইংরিজী কথা। এম. এ. পাস করেছ বাংলায়। বাংলায় বল না।

কথা ক'টা তার মুখের উপর যেন শপাং শব্দ তুলে চাবুকের মত আছড়ে পড়েছিল। অত্যন্ত কঠিন কথা বলেছিল সীতা। সীতাদের বাড়ি খুব উগ্র ইংরিজীনবিসের বাড়ি। এবং অংশুমান বাংলায় এম. এ-তে ফল ভাল করেও এবং লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেও ইংরিজীতে পোক্ত নয়। যার জন্যে ইংরিজীর উপর চটা সে; আহত হয়ে অনেক খুঁজে অবশেষে সে বলেছিল—আমার ইংরিজীর উপর রাগটা তুমি অকারণ করছ সীতা। ইংরিজী হয়তো আমার খারাপ। কিন্তু তোমাদের মত ইংরিজীনবিসদের ইংরিজী যে বেশী ভাল তা নয়—

বলতে বলতে সে থেমে গিয়েছিল; কারণ একটি স্যাণ্ডেলপরা হালকা পায়ের মৃদু শব্দ যেন উঠতে আরম্ভ করে ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে দূরে চলে গেল মনে হয়েছিল তার।

সীতা কি চলে গেল?

কথা বলা বন্ধ করে চোখ মেলেছিল অংশুমান। দেখেছিল সীতা নেই। সে চলে গেছে। ঘরের দরজাটা একপাল্লার দরজা; সেখানাকে ঠেলে দিয়ে গেছে। সেটা এসে দরজার ফ্রেমের গায়ে লেগেছে আলতোভাবে। কিন্তু অংশুমানের মনে হয়েছিল সীতা এবং তার মধ্যে ওই দরজার পাল্লাটা একটা চি রুদ্ধ আড়ালের প্রতীক হয়ে তার দৃষ্টিকে অবরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

* * * *

মিনিট খানেক পরেই সীতা আবার ফিরে এসেছিল। আলতো ভাবে যে পাল্লাটা

দাঁড়িয়েছিল সেইটেকেই ঠেলে দিয়ে ভিতরে এসে ঢুকেছিল। তার হাতে কিছু ছিল—প্রথম নজরেই সেটা কি তা সে ঠাওর করতে পারে নি। কাছে এসে দাঁড়াতেই সে চিনেছিল—ফাউণ্টেন পেনের কালীর দোয়াত এবং সেটা লাল কালীর দোয়াত আর একটা নিব পরানো হ্যাণ্ডেল কলম।

অংশুমান বলেছিল—বস।

—না, আমি বসব না, তুমি ওঠো।

—কেন? শরীর বড্ড ম্যাজম্যাজ করছে। ইচ্ছে করছে না উঠতে।

—কিন্তু এক্ষুনি তোমাকে বেরুতে হবে। তুমি বেরুবে। আমি জানি। তোমার এনগেজমেণ্ট আছে।

—এনগেজমেণ্ট!

—হ্যাঁ। একটু আগে টেলিফোন করেছিলেন কোন একজন—বোধ হয় তোমার বান্ধবী। তিনি আসবেন এখানে। তুমি ঘুমুচ্ছিলে। হরি টেলিফোন ধরেছিল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুনেছি।

চমকে উঠেছিল অংশুমান। হ্যাঁ। আছে, কথা আছে। তার নূতন নাটকের নায়িকা একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।

অংশুমান সেই খ্যাতিমান অংশুমান চৌধুরী—যে নূতন যুগের নাট্যকার, যে নিজে খ্যাতিমান অভিনেতা এবং কিছু কিছু ছোট গল্প ও আধুনিক গানের গীতিকার হিসেবেও খ্যাতিলাভ করেছে। সর্বজন না হোক—বাংলা দেশে লিখনপঠনক্ষম এবং সংস্কৃতিতে অনুরাগী অনুরক্ত যারা তাদের অনেকেই তাকে চেনে।

সে আজকের কবি নাট্যকার নয়—আগামী কালের কবি নাট্যকার এবং গীতিকার বলে মনে করে নিজেকে। সম্প্রতি একখানা নতুন নাটক লিখেছে সে। 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন'।

অর্থাৎ মহাভারতের স্রষ্টা মহাকবি মহর্ষি বেদব্যাস।

অংশুমান বলেছিল—আমার একান্ত ইচ্ছে ছিল—সত্যবতীর পার্টটা তুমি কর। আমি পরাশর আর শান্তনুর দুটো পার্ট করি।

—না।

—কেন?

—এর উত্তর তুমি জান। জীবন নিয়ে খেলা খেলতে যে পারে সে পারে, আমি পারি না।

—সীতা—

—দয়া করে মাফ করো আমাকে। এখন যা বলছি শোনো। যার জন্যে যেতে যেতে ফিরে এলাম আমি।

—বল।

—এই হ্যাণ্ডেলটার উল্টো দিক দিয়ে একটু লাল কালি আমার সিঁথিতে পরিয়ে দাও।

—সিঁথিতে লাল কালী পরিয়ে দিলেই কি—

বিষণ্ণ কণ্ঠে সীতা বলেছিল—তর্ক করতে আমি আসি নি। তর্ক করার মত মন আমার নেই। আমি তোমাকে ভালোবাসি অংশুমান। তার জন্যই এই স্মরণ-চিহ্নটুকু চাই। দাও পরিয়ে দাও।

—না। মুখ চোখ মন পাল্টে গিয়েছিল অংশুমানের। আজও সে কথা স্মরণ করতে পারে অংশুমান। এবং 'না' বলে সে পাশ ফিরে শুয়েছিল যখন—তখন সামনের দেওয়াল ঘেঁষে যে ড্রেসিং টেবিলটা ছিল—তার আয়নার মধ্যে নিজের চেহারা সে দেখতে পেয়েছিল। মনে পড়ছে—শক্ত কঠিন হয়ে উঠেছিল তার মুখের চেহারা। যেন আকাশে মেঘসঞ্চারের মত কিছু একটা সঞ্চারিত হয়ে উঠেছিল তার মনে—তার ছায়া পড়েছিল তার মুখে। নিষ্ঠুর তিরস্কার বা কঠিন প্রতিবাদ জমে উঠেছিল মনে মনে।

বিবাহে সে বিশ্বাস করে না।

বিচিত্র তার জীবন পথের অভিজ্ঞতা। তাই বা কেন? সারা দেশই তো চলেছে এই পথে। একে সে অস্বীকার করবে কি করে? না—ধর্মে ঈশ্বরে বিবাহে প্রেমে কিছুতে তার বিশ্বাস নেই।

—শোন।

তার ক্রুদ্ধ চিন্তার প্রবাহে ছেদ টেনে দিয়ে সীতা বলেছিল—আমি চললাম। আর কখনও আসব না। আমি নিজেই প'রে নিলাম ওই লাল কালির চিহ্ন। তুমি দেখলে না। তোমায় শুনিয়ে দিয়ে গেলাম।

এরপর সীতা চলে গিয়েছিল।

ভ্রূকুটি ফুটে উঠেছিল তার কপালে।

কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল সে।

মহাতপস্বী ব্রহ্মবিদ্ মহর্ষি পরাশর—তীর্থযাত্রায় বের হয়ে যমুনার ঘাটে এসে উপনীত হয়েছিলেন। সেই ঘাটে ধীবররাজের পরমাসুন্দরী যুবতী কন্যা সত্যবতী পারাপারের খেয়া নৌকা বহন করছিল। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য অপরূপ লাবণ্যবতী যুবতী কন্যার মদির যৌবন তপস্বী ব্রহ্মউপাসক—তীর্থযাত্রী পরাশরকেও প্রকৃতি-নিয়মে চঞ্চল করেছিল।

পরাশরের ঔরসে—ধীবর-কন্যা সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাসের জন্ম। জন্ম হয়েছিল এক দ্বীপে। তাই তাঁর নাম দ্বৈপায়ন। গায়ের রঙ তাঁর কালো তাই কৃষ্ণ বিশেষণযুক্ত তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। তিনি বেদব্যাস। মহাভারতকার। তিনি ভগবানের তুল্য স্রষ্টা। তিনিও মহাতপস্বী। তিনিও সমস্ত জীবনে বিবাহ করেন নি। কিন্তু তাঁর মায়ের আহ্বানে কৌরব বংশে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করেছিলেন। গোপন করেন নি সে কথা। তাঁর মা সত্যবতী তাঁকে প্রসব করেছিলেন কুমারী অবস্থায়। তারপর তিনি বিবাহ করেছিলেন মহারাজা শান্তনুকে।

আশ্চর্য ভাবে সত্যের মহাপ্রকাশ হয়েছে।

অথচ এই সত্য নিয়ে বাস্তবে কত কুণ্ঠা কত জটিলতা কত তিরস্কার কত শাস্তি!

বঙ্কিম রোহিণীর প্রাণদণ্ড দিয়েছেন। অনুতপ্ত গোবিন্দলালকে সন্ন্যাস দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছেন।

মহাকবি বিনোদিনীকে বৈরাগিনী সাজিয়ে কাশী পাঠিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী—পথ না পেয়ে পাগল হয়েছে, সাবিত্রী সতীশকে সরোজিনীর হাতে তুলে দিয়ে উপীনদা'র শেষ শয্যায় সেবা করতে গেছে।

কল্লোলের যুগে এই নিয়ে কলহের অন্ত ছিল না। সাহিত্যে আমরা এ সত্যের সহজ প্রকাশ গ্রহণ করতে পারি নি কিন্তু আজ সমাজে তা বলে তো সে-সত্য মুখ লুকিয়ে অন্ধকার গুহায় আত্মগোপন করে থাকবে না। মানুষের দেহ কোষে কোষে এই প্রবৃত্তি রিপু হয়ে উঠতে চাচ্ছে এবং উঠছে। আশ্চর্য—১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এ দেশ—যেন আর একরকম ছিল। তার আগে এ প্রবৃত্তি ছিল, ছিল না কে বলবে?

অকস্মাৎ একটা নিদারুণ অস্থিরতায় অস্থির হয়ে উঠল।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট—স্বাধীনতা লাভের ঘণ্টাখানেক আগে সে নিজে ভ্রষ্ট হয়েছিল। সেই রাত্রে তার বাবা মারা গিয়েছিলেন।

তার মনে হয়েছিল—অভিশপ্ত হয়েছে সে। ওই পাপে। ভাবতে ভাবতে সে যেন ভেঙে পড়েছিল। যে-সত্যকে সে সত্য বলে মেনেছে তারও উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি।

মনে পড়ছে—অস্থির হয়ে উঠে বসেছিল সে। চীৎকার ক'রে বলতে চেয়েছিল—সীতা! জীবনের এই দেওয়া-নেওয়াকে কি একান্ত সহজ সরল ক'রে নেওয়া যায় না? সীতা!

পারে নি। গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বের হয় নি তার। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে আবার ঘুরে শুয়েছিল। আবার সেই প্রশ্ন মনে জেগেছিল। কেন এমন হল। একা তো সে-ই শুধু নয়—সারা দেশেরই এই একই অবস্থা। নিজের জীবন দেশের মানুষের জীবন বিচিত্র ভাবে একটা আশ্চর্য উগ্র চেহারা নিয়েছে। প্রাচীন সব কিছুই যেন অসহ্য মনে হচ্ছে। বুকে যেন অকস্মাৎ কোন প্রসুপ্ত আগ্নেয়-গিরি জীবন্ত হয়ে উঠে অগ্ন্যুদ্গার করছে।

রাজনৈতিক দলের নেতারা এই উগ্র মনোভাবের সুযোগ নিয়ে তাতে শুধু দাহ্যপদার্থ নিক্ষেপ করছেন।

নানান দলের নীতি নানান ধরণের।

শুধু এ দেশই বা কেন? সারা বিশ্বের সকল দেশের অবস্থাই তো তাই। জ্বলছে; মানুষেরা যেন জ্বলছে। দেহের ক্ষুধায় পেটের ক্ষুধায় মনের ক্ষুধায়—জ্বলছে!

এ হয়তো এই কালেরই আগুন। এই যে কাল—১৯০১ থেকে এই ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এই কালে যেন কালেরই বুকখানাকে বিদীর্ণ করে তার ভিতরে সঞ্চিত বহু বহু কালের আগুন ফেটে বেরিয়ে—এতকালের সব কিছু জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এরই মধ্যে সে এবং সীতা—।

থাক, সীতার কথা।

আজ পাঁচ বছর পর এই মর্মচ্ছেদী সংবাদ পাওয়ার পর এই মুহূর্তে মনে পড়ছে সীতার কথা চাপা দেবার জন্তই সে ডেকেছিল হরিকে।

হরি তার বাহন। বন্ধুরা বলে বাহন। সে তার সব। চাকর পাচক বন্ধু কর্ণধার—তার বাসার সব ব্যবস্থার সব আয়োজনের কর্মী কর্তা দুই।

হরি এসে মাথাটি হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল। এবং সেটা তার চোখে পড়েছিল। পড়ার কথাই যে। সীতা এ বাসায় আগন্তুক নয়—সে এ বাড়ির প্রতিটি কোণ চেনে—এবং সবখানে তার পায়ের ছাপ এঁকে রেখেছে আজ দু'বছর ধরে; হয়তো এ ঘরের দরজাগুলি তার সম্মুখে খুলে যাবার জন্ত প্রতীক্ষাই করছিল কিন্তু তবু কাল যা ঘটে গেছে তাকে যেন স্বীকার করে নিতে পারছে না আবার নীরবে একে হজমও করতে পারছে না। হরি সেই অস্বস্তিকে প্রকাশ করছে ওই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। অন্ত দিন হরি ঘরে ঢুকেই প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে; সে স্বভাবে প্রগল্‌ভ—কথা কয় বড্ড বেশী। ঘরে ঢুকেই আরম্ভ করে—কি খাবে আজিকে? মাছঅ আনিবো না মান্‌সঅ আনিবো? কালঅ রাত্তিকে রঞ্জনবাবু ফোনঅ করিছিলো। আর ফোনঅ করিছিলো শিবঅবাবু। আমি তাকে বারণঅ করিছি আসিতে। আজও ইলিকটিরিকর টাকা দিতি হইব। জমাদারনী রানীয়া আজ পাঁচ দিনঅ কাম করিছে না। বলিলে ঝগড়া করিছে।

এমন অজস্র কথা। সংবাদ—প্রশ্ন—উত্তর। সে হাটবাজার চাল ডালের বাজারদর থেকে রাজনীতির বড় বড় কথা পর্যন্ত। সেই হরি পর্যন্ত বাক্যহারা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিন।

বোধ করি পূর্ণ এক মিনিট একটা বাক্যহারা নীরবতা শ্বাসরোধী গভীরতায় গভীর হয়ে উঠেছিল। তাতে হাঁপিয়ে উঠেছিল অংশুমান এবং জোর করেই গত রাত্রির সমস্ত স্মৃতি এবং তা নিয়ে ন্তায়-অন্তায় বিচারের সমস্ত বিতর্ককে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল—চা আন।

হরি বলেছিল—জল চাপালাম এখন। মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল হরি।

বিস্মিত অংশুমান বলেছিল—সীতার জন্তে চা করলি আমার জন্তে করলিনে কেন?

—উ তো চা খেলে না।

—খেলে না? সীতা চা খায় নি? অংশুমান প্রায় চমকে উঠেছিল। সীতা চা পর্যন্ত স্পর্শ করে নি?

—না। আমি তো এই উঠলাম। এখন তো অনেক সকাল আছে। ছটা বাজে নি। দিদিমণি আমাকে ডেকে দিয়ে চলে গেল।

চটে উঠেছিল অংশুমান।—সীতা চা না খেয়ে চলে গেল?

—কি করব? সাড়ে পাঁচটার সময় ডেকে দিয়ে চলে গেল। বললে—দুয়ার বন্ধ কর হরি। আমি চলিলাম। আমি বলিলাম—চা খাবে না? সে কিছু বলিল না, চলে গেল।

অংশুমান সবিস্ময়ে বলেছিল—চা খেয়েও গেল না সীতা!

কথাটার অর্থ সঠিক বুঝতে পারে নি হরি। বলেছিল—ই ঘর থেকে গেল। তোমাকে বলি গেল। আমি কি বলিব?

এরপর আর কথা খুঁজে পায় নি অংশুমান। যে কথাই বলতে চেয়েছিল বা বলবে ভেবেছিল সেই কথাই আটকে গিয়েছিল জিভে; হয়তো বা তার নিজেরই একটা সত্তা তার গলা টিপে ধরছিল।

'এ ঘর থেকে গেল—তোমাকে বলে গেল',—এ কথার পর কোন্ কথা বলবে সে? হরির কাছেও একটা সংকোচের মত কিছু অনুভব করছিল। সেই সংকোচেই সে তাকিয়েছিল সীতার মাথার বালিশটার দিকে। তখন ঘরে আলো হয়েছে। বাইরে রোদ ফুটি-ফুটি করছে। পরিস্ফুট আলোয় চোখে পড়েছিল সীতার মাথার চাপের চিহ্নের উপর দুগাছি লম্বা চুল লেগে রয়েছে। একসময় সীতার চুল ছিল খাটো চুল এবং সে চুল ছিল শ্যাম্পু করা। সীতা পালটাচ্ছিল—চুলগুলি পিঠ ছাড়িয়ে লম্বা হয়েছিল। এবং এই লম্বা চুল দুগাছি থেকে ক্যাম্থারআইডিন-সুরভিত একটি মৃদু গন্ধ আসছিল। বালিশটা সে উলটে দিয়েছিল।

সীতা ছিল তার বান্ধবী। তখন বান্ধবী থেকে প্রিয়বান্ধবীতে পরিণত হয়েছিল। একটি পরিচ্ছন্ন প্রসন্ন সম্পর্ক ক্রমশঃ হৃদ্য হয়ে উঠছিল।

হৃদ্যতম হয়ে ওঠার কথাই।

কিন্তু—। কিন্তু যা হল তাতে যেন প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল। সীতা প্রশ্নই করে গিয়েছিল—এটা কি হল বল তো?

প্রশ্নটার মধ্যে এমন একটা কঠিন নালিশ ছিল এবং সেই কঠিন নালিশ দায়ের করার কণ্ঠস্বরে এমন সকরুণ একটি বেদনা ছিল যে, উত্তরে রুক্ষস্বরে ইংরিজীতে 'ডোণ্ট বি সেন্টিমেণ্টাল' বলে চোখ বন্ধ করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না।

আকস্মিক দুর্ঘটনার মত—। না! তা কেন হবে? আকস্মিক দুর্ঘটনা কেন হবে? এইই তো ছিল নির্ধারিত পরিণতি। তার দাবি ছিল চিরন্তন দাবি! একটি যুবক এবং যুবতী—বন্ধু এবং বান্ধবী। পদক্ষেপে পদক্ষেপে প্রিয়বান্ধব প্রিয়বান্ধবী, নাই পৌঁছল সপ্তপদীতে। আজকের কালে পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন প্রথার মত এই সপ্তপদীও যেন বড় পুরাণো বড় জীর্ণ—বড় কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছে। এ দেশের মত দেশেও যে উপলব্ধিই বল—আর দাবিই বল তার জোরেই কোডবিল পাশ হয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করতে পারেন নি। আজ বিবাহ বন্ধন অসহনীয় হলেই বিচ্ছেদ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয়েছে। তারও থেকে নূতন সম্পর্কে তারা পৌঁছুবে ঠিক করেছিল। কিন্তু হল না।

কাল সন্ধ্যার পর দুজনেই দুজনের প্রতি তিক্ত হয়ে পরস্পরের কাছ থেকে সরে যেতেই উদ্যত হয়েছিল। সীতা চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ক্ষিপ্তের মত অংশুমান তাকে বলেছিল—না। এবং সারারাত্রি তাকে আটকে রেখেছিল।

সীতা বারকয়েক প্রতিবাদ করে হঠাৎ একসময় বিচিত্র হেসে আত্মসমর্পণ করেছিল। সে বিচিত্র হাসি এবং তার সে আত্মসমর্পণ প্রসন্ন কি অপ্রসন্ন, মর্মান্তিক বেদনার্ত এ কথা সে বিচার করে নি। বুঝতে চায় নি। বুঝবার মত ইচ্ছা বা মনও তার ছিল না। সে পুরুষ। এ

যুগের পুরুষ সে। তাদের প্রতিনিধি। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের নবযৌবন; সে-যুগে ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র ফালি ফালি করে চিরে দেখা হয়েছে। এ যুগ অরণ্য যুগের মত বর্বর নয় কিন্তু সকল অন্ধবিশ্বাসের বল্গা ছেঁড়া কালো ঘোড়ার মত বিদ্রোহী। হয়তো খানিকটা ক্ষ্যাপাও বটে। সে ত্যাগ থেকে ভোগকে ভালবাসে। জন্মের পরিণাম মৃত্যু এ কথা সে অস্বীকার করে না তবে এইটে সে জেনেছে এবং এইটেকেই সে ধরেছে যে, জীবনের ধর্ম হল বাঁচা। এবং সে বাঁচার উদ্দেশ্য হল অফুরন্ত ষড়ৈশ্বর্যময়ী পৃথিবীকে মন্থন করে তোলা উপাদানে গঠিত এই ষোড়শ-ঐশ্বর্যময় দেহময় জগৎকে আস্বাদন করা। এই জীবন্ময় সৃষ্টিকে বাড়িয়ে তোলা।

কথাগুলো আজ এই নিষ্ঠুর দিনে নিষ্ঠুরতম মুহূর্তে মনে পড়ল তার। মনে হল। আজ সেদিনের সেই ঘটনাগুলো মনে করতে গিয়ে যেন নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে।

কেন? কেন?

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে অংশুমান। কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। তারপর আবার সে তার ছেঁড়া সুতো জোড়া দিয়ে টানতে লাগল।

হ্যাঁ।

সীতা নীরবেই আত্মসমর্পণ করেছিল। এবং সে আত্মসমর্পণের মধ্যে কোন কুণ্ঠা বা কোন কার্পণ্য ছিল না। শুধু নীরব হয়ে ছিল। সে নীরবতার অর্থ সে বুঝেছিল। কিন্তু বুঝেও জীবনাবেগকে সে সংহত করতে পারে নি! সীতাও এ যুগের মেয়ে। সে তার থেকেও অবিশ্বাসী এবং তার থেকেও উগ্র বিদ্রোহাত্মক আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ। একসময় সীতার দুটো আঙুলে সিগারেট খাওয়ার জন্ম গাঢ় নিকোটিনের দাগের ছোপ ধরেছিল। তার অতীত সম্পর্কে খোঁজ সে করে নি, কিন্তু সে অতীতের রঙ শ্রাদ্ধবাসরের শ্বেতপদ্মের মত সাদা নয় বা গন্ধে অগুরুমেশানো ধূপকাঠির গন্ধের মত মৃদু নয়।

তবু যেন একটা অস্বস্তি বুকের ভিতর অশান্ত সাপের মত ঘুরপাক খাচ্ছে।

সেদিন, অর্থাৎ পাঁচ বছর আগে সেদিনও মন এমনি একটা অস্বস্তিতে পীড়িত হয়েছিল। এবং হঠাৎ না—নাঃ বলে চীৎকার করে উঠেছিল। বিছানার উপর নড়েচড়ে বসতে হয়েছিল অস্বস্তিতে। সীতার তাকে অদেয় কিছু ছিল না—জীবনের সব কিছু দেওয়া-নেওয়ার অকথিত প্রতিশ্রুতি আপনা-আপনি তাদের বন্ধুত্বের অলিখিত দলিলের একটা শর্তই ছিল এ কেউই অস্বীকার করতে পারত না—সেদিনও পারে নি; আজ এই ১৯৬৭ সালেও পারে না। তবু সীতার সেদিনের নীরব আত্মসমর্পণের মধ্যে অত্যন্ত বিষণ্ন বেদনার্ত একটা কিছু ছিল, যার জন্ম এত বড় দেওয়া-নেওয়াটাকে একতরফার থেকে বেশী কিছু বলা যায় না; তার তরফ থেকেই শুধু নেওয়াই হয়েছিল; সীতা হৃতসর্বস্ব হয়েই চলে গেছে।

আজকের মতই সে দিনও ওই জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে মনটাকে বাইরের ছড়ানো আকাশের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। রাত্রিটাকে ভুলতে চেয়েছিল। আকাশে একটা গুর-গুর শব্দ উঠেছিল মনে পড়ছে। জেট তো নয়ই, ভাইকাউন্টও নয়—অপেক্ষাকৃত মন্থরগামী কোন প্লেন। আকাশে মেঘ ছিল না। আকাশ ছিল রোদঝলমল।

সকালের সোনালী রৌদ্র উঠেছে; বড় বড় বাড়ির ছাদের আলসেতে এবং কয়েকটা অনেক উঁচু বাড়ির সর্বাঙ্গে যেন মাখানো হয়ে গেছে তখন।

রাত্রির স্মৃতিকে ভুলবার জন্য মনকে সে বাড়ি খুঁজতে বা চিনতে নিয়োগ করেছিল। না, আত্মহত্যার জন্য নয়, এমনি মনকে একটা কার্যান্তর দেবার জন্য। তেরতলা নিউ সেক্রেটেরিয়েট কোন্‌টা? সেইটে খুঁজতে চেষ্টা করেছিল।

বিচিত্র কলকাতা! কত স্টাইল—কত ফ্যাশন—কত ইজম—কত লড়াই—কত ভোগ! হঠাৎ সে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠে বালিশের তলা থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে উল্লাসের ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিছুই সে মানবে না।

বাড়ির সামনে কৃষ্ণচূড়ার গাছ পুঁতেছে কর্পোরেশন। বেশ বড় হয়ে উঠেছিল তখন। তার দোতলার ঘরের জানালার সমানই উঁচু সে সময়। মনে পড়ছে তার মাথায় কতকগুলো ভোডাবুলবুলি পাখী ঝগড়া লাগিয়েছিল। একটা ডাকছিল—সেই ডাক শুনে আর একটা উড়ে গিয়ে তার পাশে বসছিল—সঙ্গে সঙ্গে আগেরটা উড়ে যাচ্ছিল। এদিকে আরও দু'তিনটে এসে দ্বিতীয়টার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তুলছিল। লঙ্কাকাণ্ডের তুলনাটাই মনে পড়েছিল সেদিন এটা মনে আছে।

এই সময়ে হাতের আঙুলে আগুনের ছেঁকা লেগেছিল। আঙুলে ধরা সিগারেটটা পুড়ে ছোট হয়ে এসে আঙুলে আগুনের ছেঁকা দিয়েছিল। বিরক্তিভরে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হরিকে ডেকেছিল—হরি! চুরোট আন।

কড়া স্মোকের তৃষ্ণা অনুভব করেছিল সে।

মনের কোন অন্তহীন অতল থেকে একটা অত্যন্ত অশান্তিকর অস্বস্তি বাষ্পের মত উঠে তাকে যেন অসুস্থ করে তুলতে চাচ্ছিল।

তার নাটকের পাণ্ডুলিপিখানা খুলে পড়বার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু একটা ছত্রও প'ড়ে উঠতে পারে নি। নিজের লেখা অত্যন্ত বিস্বাদ মনে হয়েছিল। পাণ্ডুলিপিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সে।

* * *

স্পষ্ট মনে পড়ছে সেদিন ভোরবেলায় অদৃশ্য কেউ যেন তাকে নিষ্ঠুর এবং কঠিন ভাবে তিরস্কার করেছিল। তাকে সেদিন হীনতম পাপ কর্মের জন্য দায়ী করেছিল এবং বলেছিল—এ পাপের তোমার মার্জনা নেই; দ্বৈপায়ন নাটকের নাট্যকার, তুমি পরাশরও নও—তুমি দ্বৈপায়নও নও। তুমি কবি নাট্যকার অভিনেতা যাই হও মানুষ হিসাবে তুমি নিন্দাভাজন হলে। এবং এই মুহূর্তে তুমি সাধারণ মানুষ থেকেও অনেক নিচে নেমে গেলে!

মনে পড়েছিল মায়ের মুখ। মনে হয়েছিল এ তিরস্কার তিনি করলেন। বাবাকে মনে পড়েছিল। বাবার প্রতি খুব বড় শ্রদ্ধা না হোক, খুব গাঢ় গভীর ভালবাসা তার ছিল; তিনি বেঁচে নেই;—তাঁর মুখ মনে পড়েছিল, সে মুখ বড় বিষণ্ণ বড় করুণ। আরও অনেক মুখ মনে পড়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত অনেকের কথাই তার মনে হয়েছিল। পরের পর তাঁরা যেন মনের সামনে দেখা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আর সে

একটা নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়েছিল। সে বলতে চেয়েছিল তোমরা যা বলে গেছ, তোমরা যা ক'রে গেছ, এতকাল যা মেনেছ, মেনে ধন্য হয়েছ সে সবই আজ এমন ভাবে মূল্যহীন হয়ে গেল কেন? আমি তোমাদের আজ ব্যর্থ নমস্কারেই ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ধীরে ধীরে আবার তার মনের স্থিরতা ফিরে এসেছিল। মনের স্থিরতা সেই চিরকালের স্থিরতা নয় এ কালের স্থিরতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালের স্থিরতা।

নাগিনীদের বিষাক্ত নিশ্বাসের মধ্যের স্থিরতা। বিষজর্জর স্বাভাবিকতা। শান্তির ললিতবাণী আজ উপহাস মনে হবে।

* * *

তবুও সারাটা দিন সেদিন অশান্তি এবং অস্বস্তিতে কেটেছিল। সারাদিনে সে যেসব কাজের প্রোগ্রাম করে রেখেছিল সব বন্ধ করে দিয়েছিল।

তার নাটকের রিহারশ্যাল হবার কথা ছিল। নাটকের নতুন নায়িকা সুস্মিতাকে নিয়ে রঞ্জন এসেছিল এনগেজমেণ্ট মত; তাকে তার পার্টটা বুঝিয়ে একটা রিডিং দেবার কথা ছিল; কিন্তু তাদেরও সে ফিরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল—'শরীর ভাল নেই।'

তারপরই সে মিথ্যা কথাটিকে সংশোধন করে নিয়ে বলেছিল—না, শরীর আমার ঠিক খারাপ নয় রঞ্জন। মনের অবস্থা আজ আমার সুস্থ নয়। আর মনে হচ্ছে নাটকখানা আর একবার ভাল ক'রে আমাকে নিজেকে পড়তে হবে। পড়া উচিৎ আমার।

রঞ্জন বলেছিল—নাটক তোমার খুব ভাল হয়েছে অংশুদা। খুব ভাল, খুব জমাট। তা ছাড়া কনজারভেটিব আর রিঞ্যাকশানারিদের কাছে হবে বম শেল। ফ্ল্যাট হয়ে যাবে সব। দেখো তুমি।

অংশুমান তাতে মানসিক শান্তি ফিরে পায় নি। মনের মধ্যে যে নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব চলছিল এবং তার ফলে ভালো মন্দ সমস্ত কিছু যে একটা ধূম্রাচ্ছন্নতার আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল তারও কোন সুরাহা হয় নি। সান্ত্বনার চেয়ে বিরক্তি বা যন্ত্রণাকেই রঞ্জন বাড়িয়ে তুলেছিল। অংশুমান বলেছিল—Please—তোমাকে মিনতি করছি আমি। তোমরা এখন যাও।

রঞ্জন তবু ক্ষান্ত হয় নি। সে বলেছিল—কিন্তু হাতে যে দিন আর নেই।

—না থাকে, তোমরা অন্য বই ধর। এ নাটক এখন থাক।

সুস্মিতা মেয়েটি বলেছিল—তা হ'লে কিন্তু আমার কথাও আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি এই বই শুনেই ওই সত্যবতীর পার্ট করবার কথা দিয়েছি।

অংশুমান সামনের ঘর থেকে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বলেছিল—আমার বিশ্রামের প্রয়োজন রঞ্জন। আমি যাচ্ছি। পরে তুমি আমাকে ফোন ক'রে এসো। সুস্মিতা কিছু মনে করো না তুমি।

ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল সে।

সমস্ত অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। না পেরেছিল কোন একটা সত্যে পৌছুতে—যে সত্যকে আঁকড়ে ধরে ভেঙে পড়ার সমস্ত আবেগকে অনায়াসে সামলাতে পারে—আবার ভেঙে পড়ে একেবারে ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়ে হার মানতেও সে পারে নি।

"না। সত্য নয়। সত্য, ধর্ম, ন্যায়, নীতি এ সব অর্থহীন একটা কিছু। আজকে যেটা সত্য কাল সেটা মিথ্যা হয়ে যায়। আজকের ধর্ম কাল জীর্ণ হয়ে যায়, সব থেকে বড় অন্যায় বা পাপ হয়ে দাঁড়ায়।"

"যা সকলে মিলে চীৎকার করে বলে—তাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়।"

এত করে এই সব বাছা বাছা যুক্তি-তর্কগুলো মনে মনে চীৎকার ক'রে বলেও কিন্তু মনের অস্বস্তি সে দূর করতে পারে নি।

বার বার মনে মনে বললে—সীতা যাবার সময় সিঁথিতে সিঁদুরের বদলে লাল কালির দাগ নিজে হাতে এঁকে নিয়ে চলে গেল। স্বাভাবিক ভাবে গেল না, একটু থিয়েটার ক'রে গেল। কিন্তু তাতেও কোন জোর পেলে না।

অবশেষে—সে অনেকটা ধড়মড় করে এক সময়ে উঠে বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল; যাবার সময় হরিকে হেঁকে বলেছিল—আমি বেরুচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে।

বলে আর দাঁড়ায় নি। পিছন ফিরে তাকায় নি পাছে হরি তাকে কোন প্রশ্ন করে।

প্রায় সারাটা দিন সে ঘুরেছিল। পথে পথে ঘোরার মত ঘোরা হলেও ঘুরে ফিরে সীতাকেই সে খুঁজে বেড়িয়েছিল।

যে হোমে সে কাজ করত, থাকত, সেখানে গিয়ে শুনেছিল—সেখান থেকে সে চলে গেছে; একেবারেই চলে গেছে। বলে গেছে—সে আর ফিরবে না। বলে গেছে—একজন ঝি শ্রেণীর মেয়েকে। বলে গেছে—বড়দিকে বলো—আমি চলে যাচ্ছি—আর ফিরব না। বলো—হঠাৎ আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।

তা হ'লে?

তা হ'লে কোথায় গেল সীতা? সীতার সন্ধান করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সীতার ভাইদের বাসাতে গিয়েছিল। ভাইদের বাসায় সীতার যাওয়ার কথা নয়; ভাই দুজন তার উপর নিষ্ঠুর ভাবে বিরূপ। সীতার জন্ম তারা তাদের পৈতৃক বাড়ী বেচতে বাধ্য হয়েছে। ভাজেরা আরও বেশী বিরক্ত। তবুও ওদের বাড়ী গিয়েও খোঁজ করেছিল, কয়েকটা অপ্রিয় কথা শুনেছিল। তাতেও সে ক্ষুন্ন হয় নি। বাড়ীর সামনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে বাড়ী ফিরে এসেছিল।

কিছুর জন্ম যেন সীতাকে তার প্রয়োজন ছিল। একটা বোঝাপড়া, যেটা শেষ না হ'তেই সীতা চলে এসেছে। বোধ হয় তার জন্ম। তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল—সেটা ভাঙলে কে?

* * *

টুকরো টুকরো অজস্র অসংখ্য কথা মনে পড়েছিল। একটা দুটো নয়। অনেক কথা,

অ—নেক—কথা। এগুলোকে ভুলতে চেষ্টা করেও ভুলতে পারে নি। অবশেষে সেদিন বাড়ী ফিরে এসে—সীতার কথা মনে করতে করতে—একখানা বাঁধানো স্বদেশ পত্রিকা টেনে বের করে টেনে নিয়েছিল বইয়ের সেল্ফ থেকে।

সামনে মেলে ধরতেই—বাঁধানো পত্রিকাখানার ইংরিজী উনিশশো ষাট, বাংলা তেরশো সাতষট্টি, আশ্বিনের তৃতীয় সপ্তাহের সংখ্যাটির একটি পাতা আপনি বেরিয়ে পড়েছিল—এর পূর্বে বহুবার এই পাতাটা খোলা হয়েছিল এবং সে পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ছিল তারই লেখা একটি প্রবন্ধ।

"সীতার পরীক্ষা।"

এই প্রবন্ধটির সূত্র ধরেই সীতার সঙ্গে তার পরিচয়।

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ঘটনা সীতা হরণ।

রাবণ দেবতা রাক্ষস যক্ষ কিন্নর অসুর দৈত্যদের ভয় করতো না। ভয় করতো মানুষকে। সূর্পনখার অপমানের শোধ নিতে সে সীতাকে অপহরণ করবার সংকল্প করেছিল। রামের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে তাকে বধ করে সীতাকে বলপূর্বক গ্রহণ করতে তার সাহস হয় নি। নর এবং বানরের হাতেই তার বিপদ সে তা জানত। তাই কৌশলে চোরের মত সীতাকে হরণ করতে মারীচকে স্বর্ণমৃগ রূপ ধারণ করিয়ে সীতার মনকে প্রলুব্ধ করেছিল। এ মায়াজাল অব্যর্থ। পরম সোহাগের সোহাগিনী যুবতী নারীর সম্মুখে জীবন্ত স্বর্ণমৃগ। মুগ্ধা সীতা তার রূপযৌবনের মোহমুগ্ধ রামচন্দ্রকে বললেন—তুমি ধরে দাও, আমাকে সোনার হরিণ ধরে দাও।

রামচন্দ্র হরিণের পিছনে ছুটলেন। মারীচ রামচন্দ্রের বাণবিদ্ধ হয়ে মরবার সময় অবিকল রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর নকল ক'রে লক্ষ্মণকে ডাকলেন—আর্তভাবে। সীতা ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্মণকে পাঠালেন রামচন্দ্রের সাহায্যে। রাবণ তপস্বীবেশে আবির্ভূত হল—সীতার কুটীর-দ্বারে। এবং লক্ষ্মণের গণ্ডী থেকে ছলনা করে বাইরে এনে বলপূর্বক তাকে অপহরণ করে পুষ্পক রথে তুলে বায়ুপথে চললো লঙ্কার পথে।

পথে বিহঙ্গ-শ্রেষ্ঠ জটায়ুর সম্মুখে পড়ল রাবণ। জটায়ু তাকে বাধা দিল। চূর্ণ করে দিল রাবণের রথ। অগত্যা রাবণ রথ থেকে নেমে—সীতাকে সেই বনে রেখে—জটায়ুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। তারপর জটায়ুকে বধ ক'রে সীতাকে তার চুলের মুঠোয় ধ'রে ঝুলিয়ে নিয়ে তার রাক্ষসী মায়া-শক্তিতে আকাশপথে লঙ্কার দিকে চলে গেল।

এ ঘটনা সর্বজনবিদিত। কয়েক হাজার বৎসরই এই ঘটনা এইভাবেই মানুষ মেনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে নূতন কালের বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদ-উপাসক এক বিদ্বান অধ্যাপক লিখলেন, "রাবণ এইখানে এই বনের মধ্যে জটায়ুকে বধ করার পর সীতাকে দেহগত ভাবে ধর্ষণ করেছিলেন। তিনি এখানে ধর্ষিতায়াং সীতায়াং শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এবং আশ্চর্য প্রগতিশীলতা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। রাবণকে চরম অত্যাচারী এবং অপরাধী হিসাবে অভিযুক্ত ক'রে পাঠকের দরবারে দাঁড় করিয়ে অত্যাচারী প্রতিপন্ন ক'রে তাকে চরম দণ্ড দিয়েছেন। এবং সব থেকে আশ্চর্যের কথা এই যে—এদেশের

বহুকাঙ্ক্ষিত এবং প্রার্থিত—দেহগত সতীত্বের সংস্কারকে লঙ্ঘন করতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। মহর্ষি বাল্মীকি এইখানে মহাকবি এবং সর্বকালের প্রগতিশীল সংস্কারমুক্ত এক অমর স্রষ্টা।" অধ্যাপকটি প্রায় উচ্চ কণ্ঠেই বলেছিলেন, প্রগতিশীল মহাকবি বাল্মকী এইখানে আশ্চর্য কৌশলে সীতার উপর রাবণের পাশব অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেছেন।

সীতা যখন বনের মধ্যে হা-রাম! হা-রাম! বলে কাঁদছেন তখন রাবণ তাকে ধরবার জন্য অগ্রসর হল, সীতা ভয়ে পালাতে চাইলে এবং বনের গাছের আড়াল দিয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করলে; কিন্তু সে কতক্ষণ? রাবণ সীতার মুক্তবেণী কেশকলাপ ধরে তাকে আকর্ষণ করলে। এবং তাকে ধর্ষণ করে ওই চুলের মুঠোয় ধ'রে আকাশপথে মায়া-বলে উঠে গেল। বাল্মীকি লিখেছেন—এইভাবে ধর্ষিতা সীতাকে দেখে আকাশ কৃষ্ণবর্ণ হল, অরণ্যের বৃক্ষপল্লব নিশ্বাস রুদ্ধ করলে—বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হল—সিদ্ধ ঋষিগণ হায় হায় করে সারা হল—ইত্যাদি।

দুটি শব্দ দিয়ে তৈরী একটি আশ্চর্য চিত্র।

"প্রধর্ষিতায়াং বৈদেহ্যাং—"।

সুতরাং সীতাকে রাবণ ধর্ষণ করেছিলেন ওই বনমধ্যে।

অধ্যাপকটি বাল্মীকির ভূয়সী প্রশংসা ক'রে লিখেছিলেন, "আশ্চর্য! দেহগত শুচিতার শুচিবাই নেই—, তথাকথিত সতীত্ব অসতীত্বের কোন বদ্ধ সংস্কার নেই। বর্তমান কালেও ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ যেখানে পৌছুতে পারেনি সহস্র বৎসর পূর্বে এই প্রাচীন মহাকবি সেখানে অনায়াসে উত্তরণ করেছিলেন।" এ ধরণের মন্তব্যে অংশুমান একালের মানুষ হয়েও কিছু চঞ্চল হয়েছিল। ভদ্রলোক এ তথ্যকে রচনা করেছেন বলেই তার মনে হয়েছিল।

অংশুমানের সাহিত্যজীবনের তখন সবে আরম্ভ। ওই অধ্যাপকটি থেকে তার বয়স অনেক কম। এবং সে একজন প্রগতিশীল বলেই নিজেকে বিশ্বাস করে। হিসেব করলে অধ্যাপকের চেয়েও তার মতামত আরও অনেক বেশী প্রগতিশীল। রাজা রামমোহনের জন্ম ১৭৭৪ সালে—সতীদাহ সহমরণ প্রথা বন্ধ ক'রে আইন পাশ হয়েছিল ১৮১৯ সালে। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন পাশ করিয়েছিলেন ১৮৫৬ সালে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে মূর্খ বলেছিলেন; কৃষ্ণকান্তের উইলে বিধবা রোহিণীকে গোবিন্দলাল তাঁরই বিধানে গুলি ক'রে মেরেছিল। তারপর সাহিত্যে বিনোদিনী সাবিত্রী কিরনময়ীরা এসে গোটা জাতেরই স্নেহ আকর্ষণ ক'রেছে এবং তাদের মাথায় ঢেলে দিয়েছে হৃদয়ের সহানুভূতি। তারপরও আছে। কল্লোল আমলে 'বিবাহের চেয়ে বড়' জীবনকে কামনা করেছে সাহিত্য, পাঁচিল-ঘেরা অন্দর থেকে মুক্তিও কামনা করেছে যে সাহিত্য সেই সাহিত্যের দরবারের প্রতিনিধি এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের হিন্দু কোডবিল পাশ হওয়া সমাজের সাহিত্যিক হয়ে এসেছিল যে অংশুমান, সে অংশুমান নামাবলী গায়ে দিয়ে এবং টিকি ঝুলিয়ে আসে নি; এসেছিল রীতিমত ঢিলেহাতা পাশবোতাম পাঞ্জাবি এবং ঢিলে পাজামা পরে; মাথায় তার বাবরী চুল ছিল না, মুখে দাড়িগোঁফ ছিল না; ইংরিজী ঘাড়-কামানো ছাটেও সে চুলছাঁটা বিলিতী ঢঙ নিয়ে আসে নি, বড় বড় বিশৃঙ্খল চুলে বব ছেঁটে দাড়িগোঁফ কামিয়ে ভিতরে বাহিরে সোচ্চার যোগ্যতার দাবী নিয়েই

এসেছিল। সে দেহগত শুচিতা-অশুচিতার প্রশ্নে অধ্যাপকটির মন্তব্যে সর্বনাশ হয়ে গেল এমনতর ভাবনায় মুহ্যমান হবার মানুষ নয়। তবু তার কৌতূহল হয়েছিল। রামায়ণ মহাভারত সে পড়েছে। কৃত্তিবাস কাশীরাম শুধু নয়—আরও পড়েছে। সংস্কৃতও কিছু কিছু পড়েছে। কিন্তু এমন ধরণের ব্যাখ্যা হ'তে পারে বা এমন ঘটনাবিন্যাস বাল্মীকি করেছেন এ কথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে নি। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সীতার অগ্নিপরীক্ষা। এমনিই মন থেকে সে সংস্কৃত রামায়ণ আত্মন্ত বারকয়েক পড়ে দেখেছিল এবং একটি প্রবন্ধও লিখে ফেলেছিল। "সীতার পরীক্ষা।"

প্রথম পরীক্ষা ত্রেতাযুগে—লঙ্কার রণক্ষেত্রে। অগ্নিপরীক্ষা। দ্বিতীয় পরীক্ষা সেও ত্রেতাযুগে—স্থান অযোধ্যার রাজসভা—। সীতার পাতাল প্রবেশ। বর্তমান তৃতীয় পরীক্ষা কলিযুগে। রামায়ণের প্রাচীন সাহিত্যভূমি খনন করতে গিয়ে পাওয়া গেছে—এক নরকঙ্কাল এবং তার সঙ্গে কিছু আধুনিক অঙ্ককষা প্রমাণ, যার বলে—সীতাকে আবার দাঁড় করানো হয়েছে লোকসমক্ষে। আধুনিক কালের বাল্মীকির নবভাষ্যকার—অরণ্যকাণ্ডে একটি শ্লোক আবিষ্কার করেছেন।

এই শ্লোকের এই ধর্ষিতায়াং সীতায়াং শব্দের অর্থ কি? অধ্যাপক বলেছেন, বলপূর্বক রাবণ এই যে দেহভোগ করেছে তাতে কোন অশুচিতা সীতাকে স্পর্শ করে নাই। এবং এটা নিতান্তই বাহ্য।

এত বড় একজন অধ্যাপকের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে ভেবেছিল যে সে একটা চমকপ্রদ কিছু করেছে। এ কথা যেমন সত্য তেমনি সত্য—সে রামায়ণ তন্ন তন্ন করে প'ড়ে, বিশ্লেষণ ক'রে, বাল্মীকির স্রষ্টা মনটিকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিল। আরও একটি সত্য ছিল। আজ সে যে অংশুমানই হয়ে থাকুক—ছেলেবেলায় রামায়ণ পড়ে রাম সীতাকে বড় ভালবেসেছিল—এবং সীতা থেকে পবিত্রতম এবং সুন্দরতম নায়িকা চরিত্র আর ছিল না। তাই প্রাণপণ খেটে নিবন্ধটি লিখে স্বদেশ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিল এবং প্রচুর প্রশংসা এবং বহু অভিনন্দন প্রত্যাশা করেছিল। খেটেছিল সে অনেক। এবং বাল্মীকির লেখার সত্যকে আবিষ্কারও করেছিল।

সীতাকে রাবণের মত বলশালী কামার্ত ব্যভিচারীর হাতে দিয়ে বাল্মিকী এমন অপব্যাখ্যা-কারকদের কথা অথবা রূঢ় বাস্তবতার কথা ভাবেন নি, তা কখনওই নয়; নিশ্চয় ভেবেছেন এবং ঠিক যথাস্থানে এর জন্ম রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করে সীতাকে লঙ্কায় অশোক-বনে চেরীদের মধ্যেও সুরক্ষিত করে গেছেন। দেহগত ভাবে রাবণ তাকে বলপূর্বক ভোগ করলে—'কায়েন মানসা বাচা' এই শব্দ তিনটির সমন্বয়ে এমন একটি বাক্যের সৃষ্টি হত না—যা শুনবা মাত্র মনে হবে এ বাক্য—সীতা ছাড়া আর কারুর নয়। এই বাক্যটি যেন ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ-বনিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত।

ধারণা তার মিথ্যা হয় নি। সে আবিষ্কার করেছিল—বাল্মীকি ওই "প্রধর্ষিতায়াং বৈদেহ্যাং" শব্দ দুটি দিয়ে কেশাকর্ষণের অপমানে অপমানিতা ও "কষ্টে ও লাঞ্ছনায় ক্লিষ্টা ও লাঞ্ছিতা সীতা"—এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন। আরও আবিষ্কার করেছিল যে, মহর্ষি

বাল্মীকি তাঁর সারা রামায়ণের মধ্যে বলপূর্বক নারীদেহ-ভোগ বা বলাৎকার অর্থে ধর্ষণ করা বা ধৃষ ধাতু কখনও ব্যবহার করেন নি।

এই তথ্য আবিষ্কার ক'রে তরুণ অংশুমান মনে মনে একটা আশ্চর্য উৎসাহ অনুভব করেছিল; তার অর্থ বোধ করি এই যে, এমন একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপকের ভুল সে ধরেছে। আরও ছিল। মনে মনে সে প্রত্যাশা করেছিল যে, তার এ প্রবন্ধ পাঠকসমাজে আশ্চর্য আলোড়নের সৃষ্টি করবে। মনে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঘরে-বাইরে উপন্যাসে—ভিলেন-চরিত্র সন্দীপের মুখ দিয়ে সীতা সম্পর্কে কয়েকটি মন্দ কথা বলানোর জন্য কি পরিমাণ প্রতিবাদ ও রূঢ়তার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সুতরাং বঙ্গদেশের এইসব সমাজপতিদের শাসিত সমাজ এই প্রতিবাদের জন্য যে তাকে মাথায় তুলে নেবে এতে তার সন্দেহ ছিল না। তবে সবটাই যে বাহবা পাবার লোভ এ কথাও সত্য নয়। একটি মিথ্যার প্রতিবাদের জন্যও সে এর প্রতিবাদ লেখায় প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং খুব পরিশ্রম করেই প্রতিবাদ-প্রবন্ধ রচনা করেছিল সে।

অধ্যাপকের একমাত্র নজীর ছিল একটি বিশেষণ একটি শব্দ। 'ধর্ষিত' শব্দ। বনপর্বের ওইখানটিতে আছে রাবণের রথ যখন ভেঙে পড়ল তখন রাবণ সীতাকে নিয়ে মাটিতে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে বনমধ্যে ছেড়ে দিয়ে জটায়ুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। জটায়ুকে বধ করে রাবণ যখন সীতাকে আবার ধরবার জন্য অগ্রসর হলেন তখন সীতা বনের গাছের গুঁড়িকে জড়িয়ে ধরে হা-রাম হা-রাম বলে করুণ কণ্ঠে কেঁদে উঠেছিলেন। রাবণ তখন তাঁর চুলের মুঠি জড়িয়ে ধরে মায়াবলে সোজা আকাশে উঠে গেলেন।

> ক্রোশন্তীং রাম রামেতি রামেন রহিতাং বনে।
> জীবিতান্তায় কেশেষু জগ্রাহান্তক সন্নিভ॥
> প্রধর্ষিতায়াং বৈদেহ্যাং বভূব সচরাচরম্।
> জগৎ সর্বমমর্যাদং তমসান্ধেন সংবৃতম্॥

ঝুলানো সীতা ঝুলতে লাগলেন শূন্যলোকে। এইখানে সংস্কৃত রামায়ণের শ্লোকে আছে এবম্বিধ "প্রধর্ষিতায়াং বৈদেহ্যাং"—ধর্ষিত সীতাকে দেখে ত্রিভুবন হায় হায় করে কেঁদে উঠল। এই 'প্রধর্ষিত' শব্দটিকে অবলম্বন করে এই অতি আধুনিক নাস্তিক পণ্ডিত ব্যক্তিটি বলতে চেয়েছিলেন 'প্রধষত' শব্দের অর্থ 'বলাৎকার'। তাঁর নাস্তিক্য তত্ত্বের দিক থেকেই এই পণ্ডিত বাল্মীকিকে বহু বাহবা দিয়ে তাকে অনুগ্রহপূর্বক বলেছিলেন মহাকবি।

অংশুমান তার প্রবন্ধে প্রমাণ করেছিল যে, ওই প্রধর্ষিত শব্দটির অর্থ বলাৎকার নয়। গোটা রামায়ণে বাল্মীকি বলপূর্বক নারীদেহ ভোগ অর্থে কোথাও ধর্ষিত বা ধর্ষণ শব্দ বা ধৃষ্ ধাতু ব্যবহার করেন নি। সেখানে তিনি সর্বত্র ভুজ্ ধাতু ব্যবহার করেছেন এবং 'বলাৎ ভুক্ত' লিখেছেন। ধর্ষণ ধর্ষিত শব্দ ধৃষ্ ধাতু সর্বত্র তিনি নির্যাতন এবং বিপর্যস্ত করা অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়াও আরও প্রমাণ সে রামায়ণ থেকে তুলে উপস্থাপিত করেছিল।

রাম যেদিন বানরসৈন্য নিয়ে সেতুবন্ধ তৈরি করে লঙ্কায় এসে উপস্থিত হচ্ছেন সেইদিন রাবণ সভা ডেকে সভাসদদের কাছে প্রথম প্রকাশ করছেন যে, সীতা নাম্নী একটি মানবীকে তিনি অপহরণ করে এনেছেন। সে এখনও তাঁর শয্যাভাগিনী হয় নি। তিনিও তাকে ভোগ

করেন নি। এবং পরামর্শ চেয়ে প্রশ্ন করেছেন—এই মানবীকে কি রামের কাছে প্রত্যার্পণ করতে বল তোমরা? এবং এই প্রসঙ্গেই রাবণ সভাসদদের বলেছেন যে, কিছুকাল পূর্বে কোন এক অপ্সরালোকবাসিনীকে জোরপূর্বক আয়ত্তে এনে তার দেহ ভোগ করার জন্ম লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন। বলেছেন নারীর অসম্মতি সত্ত্বেও বলপূর্বক তাকে ভোগ করলে রাবণের দশটি মাথা একশোখানা হয়ে ফেটে যাবে। শতধা বিদীর্ণ হবে।

এইখানে সে লঙ্কাকাণ্ড থেকে শ্লোক কয়েকটি উদ্ধৃত করে দিয়েছিল। রাবণের সভাসদ মহাবল মহাপার্শ্ব রাবণকে বলেছিল—

"যঃ খল্বপি বনংপ্রাপ্য মৃগব্যাল নিষেবিতম্।
ন পিবেন্মধু সংপ্রাপ্য স নরো বালিশোভবেৎ॥
ঈশ্বরস্যেশ্বরঃ কোঽস্তি তব শত্রুনির্বহণ—
রমস্ব সহ বৈদেহ্যা শত্রুনাক্রম্য মূর্দ্ধসু॥
বলাৎ কুক্কুট বৃত্তেন প্রবর্ত্তস্ব মহাবলঃ
আক্রম্যাক্রম্য সীতাং বৈ তাং ভুঙ্‌ক্ষ্ব চ রমস্ব চ।"

রাবণ উত্তরে বলেছিল—

"মহাপার্শ্ব নিবোধত্বং রহস্যং কিঞ্চিদাত্মনঃ।
চিরবৃত্তং তদাখ্যাস্যে যদবাপ্তং পুরা ময়া॥
পিতামহস্য ভবনং গচ্ছন্তীং পুঞ্জিকস্থলাম।
চঞ্চূর্য্য মানাম দ্রাক্ষমাকাশেঽগ্নিশিখামিব॥
সা প্রসহ্য ময়া ভুক্তা কৃতা বিবসনা ততঃ।
স্বয়ম্ভুভবনং প্রাপ্তা লোলিতা নলিনী যথা॥
তচ্চ তস্য তথা মন্যে জ্ঞানমাসীন মহাত্মনঃ।
অথ সঙ্কুপিতো বেধা মামিদং বাক্যমব্রবীৎ॥
অদ্য প্রভৃতি যামন্যাং বলান্নারীং গমিষ্যসি।
তদা তে শতধা মূর্দ্ধা ফলিষ্যতি ন সংশয়ঃ।"

'রমস্ব' 'প্রবর্ত্তস্ব' 'ভুঙক্ষ' 'রমস্ব' 'ভুক্তা' শব্দগুলির নিচে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছিল সে। এবং একশত বার 'প্রধর্ষিত' ও 'ধর্ষিত' শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছিল যে সর্বত্রই তার অর্থ হ'ল—লাঞ্ছিত করা, বিপর্যস্ত করা। লঙ্কাপুরীতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়াকেও 'লঙ্কা ধর্ষিত হ'ল' বলেছেন রামায়ণের কবি। আবার বানর কটক মধুবন ভেঙে তছনছ করেছে, সেখানেও "মধুবন ধর্ষিত হল" এই কথাই বলেছেন মহর্ষি বাল্মীকি। স্বর্গ জয় করেছে রাবণ ও রাক্ষসেরা, সেখানেও ধৃষ্ ধাতুর প্রয়োগ; লঙ্কা দহন করেছে হনুমান, সেখানেও তাই। দুর্মুখ রাক্ষস ক্রুদ্ধ হয়ে বলছে—

অব্রবীত্তম সংক্রুদ্ধো দুর্ম্মুখো নাম রাক্ষসঃ
ইদং ন ক্ষমনীয় হি সর্ব্বেষাং ন প্রধর্ষণম॥

অয়ং পরিভবো ভূয়ঃ পুরসাস্তঃ পুরস্ত চ।
শ্রীমত্তো রাক্ষসেন্দ্রস্য বানরেন্দ্র প্রধর্ষণম।

দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়ে সে লিখেছিল—"বলপূর্বক নারীদেহ ভোগ অর্থে ধৃষ্‌ ধাতুর ব্যবহার রামায়ণে কোথাও নেই।

রচনাটি প্রকাশিতও হয়েছিল। অবশ্য সেই কাগজে নয় অন্য কাগজে। সে কাগজ লেখাটি ছাপতে ইচ্ছুক ছিল না। তারা এ সম্পর্কে দু-তিনটি মৃদু প্রতিবাদ ছেপেই আলোচনা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

অংশুমান প্রত্যাশা করেছিল—এই অধ্যাপকের প্রবন্ধ নিয়ে দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। কিন্তু আশ্চর্য! তার কিছুই হয় নি। কোথাও কোন পণ্ডিত বা বিবেচক সাহিত্যিক এ সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি। যে দেশে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে ঘরে বাইরে উপন্যাসের শিক্ষিত ভিলেনের মুখ নিয়ে সীতার চিত্তলোকের কথা নিয়ে কয়েকটা বিরূপ মন্তব্য ক'রে— রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট পুরুষ মহাকবি তিরস্কৃত হয়েছিলেন—সেই দেশে এই তিরিশ-চল্লিশ বছরে এমন পরিবর্তন ঘটেছে যে এ নিয়ে কেউ একটুকু বিরক্তও হ'ল না!

তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে হয়তো কিছুটা আলোড়ন উঠবে, এ প্রত্যাশাও তার মিথ্যা হয়েছিল।

সে তখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপ্রার্থী। তার প্রত্যাশা মিথ্যা হওয়ায় সে শুধু আহতই হয় নি খানিকটা ক্রুদ্ধও হয়েছিল।

কয়েকখানা চিঠি পেয়েছিল।

তাও বেশীর ভাগ চিঠিতে প্রশ্ন ছিল—"আপনি অধ্যাপক মহাশয়ের সুচিন্তিত এই ব্যাখ্যায় এমন ক্রুদ্ধ হয়েছেন কেন? কি এমন অযুক্তির কথা তিনি লিখেছেন।

মনে পড়ছে তার সঙ্গে সাম্প্রতিক দাঙ্গায় নোয়াখালি অঞ্চলে যে সব মেয়েরা গুণ্ডাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিল, যাদের লুঠে নিয়ে গিয়েছিল গুণ্ডারা তাদের কথা তুলে প্রশ্ন করেছিল— "এদের সম্পর্কে কেউ যদি বলে যে, দৈববল এমন ভাবে তাদের রক্ষা করেছে—যার জন্য এদের অঙ্গ স্পর্শ বা এদের ধর্ম নষ্ট কেউ করতে পারে নি—তা হলে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে?"

একখানা চিঠির জবাব দিয়ে সে লিখেছিল—আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমার বক্তব্য এই অধ্যাপকটি ইচ্ছাপূর্বক ভুল ব্যাখ্যা করে বাল্মীকির মানসকন্যার অঙ্গে কালি লেপন করেছেন। দেহগত শুদ্ধতার মূল্য আমার কাছে কতটা প্রশ্ন এখানে—তা নয়, প্রশ্ন বাল্মীকি কি মূল্য দিতে চেয়েছেন তাই। মূল্য কষ্টিপাথরে সোনার দাগের মত সীতার দুটি পরীক্ষায় তাঁর শপথবাক্যের মধ্যে নির্ণিত হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডে অগ্নিপরীক্ষা এবং উত্তরকাণ্ডে সীতার পাতাল-প্রবেশের সর্গে এগুলি পাবেন।

কায়েন মনসা বাচা—যথা গতি চরাচরম্।
রাঘবং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং তথাসাং পাতু নাবকঃ॥

হল— মনসা কর্ম্মণ বাচা যথা রামং সমচ্চয়ে
তথা সে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

এ পত্র একজন খ্যাতনামা ইংরাজী সাহিত্যবিদকে লিখেছিল অংশুমান। এর উত্তর আসে নি। কিন্তু এ পত্রের প্রতিক্রিয়ায় যা ঘটেছিল তা শুনতে পেয়েছিল অংশুমান। অধ্যাপক ভদ্রলোক চিঠিখানা দুমড়ে বাড়ীর সামনে রাস্তার উপর ফেলে দিয়েছিলেন। কেউ সেটা দেখতে যায় নি, তিনি এটা নিজেই তাঁর বন্ধুমহলে প্রচার করেছিলেন। তাদের একজনের কাছে শুনে অন্য একজন এসে কথাটা তার কানে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। তবে এ সব চিঠির জন্য তার মনে কোন গ্লানিবোধ সে করে নি।

লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত হয়েছিল একজন হিন্দুসভা-পন্থী রাজনৈতিক কর্মীর অভিনন্দনে। হয়তো একটু ভুল হ'ল—লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত শব্দ দুটো ঠিক হ'ল না; লজ্জিত, কুণ্ঠিত হয় নি—একটি অস্বস্তি-বোধ তাকে কিছুটা উৎকণ্ঠিত ক'রে তুলেছিল। মনে হয়েছিল—প্রতিবাদটা নিশ্চয়ই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

* * *

এর-পরই সীতার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

আশ্চর্য একটি মডার্ন মেয়ে।

সেই প্রথম দেখা হওয়ার কথা তার মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে। সীতা দীপ্তিমতী মেয়ে। রূপসী ঠিক বলা চলে না। নাকে চোখে মুখে গড়নে খুঁত আছে অনেক। রঙটা খুব ফরসা। তার মধ্যে রক্তাভার ঈষৎ উগ্রতা আছে। চোখ দুটির তারা কালো নয়—খয়েরি; চুল আছে একরাশ কিন্তু সে চুলে কালো লাবণ্যের অভাব আছে। সেগুলোকে খাটো ক'রে কেটে এবং শ্যাম্পু করা রুক্ষতায় এমন বিদেশী ছাপ ফেলেছে—যাতে তাকে অবাঙালী এমন কি অভারতীয় বলেও চালানো যায়। তার উপর সেদিন তার সাজসজ্জা বেশবাস সবই ছিল একটি পরিকল্পিত বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। নিজে সে খুব বড়ঘরের ছেলে নয়, তবে সচরাচর গেরস্ত বাড়ীরও নয়; নিজেদের হীরে-জহরতের গয়না ছিল না—সোনা-রূপো ছিল। তবে বড় আত্মীয় ঘরের মেয়েদের পান্নাসেট প'রে সাজা—হীরের সেট প'রে সাজা সে দেখেছে। সেদিন যেন এ মেয়েটি কাপড়ে-চোপড়ে রুবিসেটের গয়নায় সাজা মেয়েকে মনে পড়িয়ে দিয়েছিল।

মনে পড়ছে—দীর্ঘাঙ্গী রক্তাভ গৌরবর্ণা একটি মেয়ে, পরনে আগুনের শিখার মত রঙের নাইলনের শাড়ী—তারই সঙ্গে ম্যাচ ক'রে লাল সাটীনের ব্লাউস—পায়ে লাল রঙের স্ট্র্যাপওয়ালা স্যাণ্ডেল, তারই মধ্যে একটি মিষ্টি মুখ—কপালের মাঝখানে একটি কুমকুমের টিপ, কানে দুটি লাল পাথরের ইয়ারিং। রুখু চুলের ডবল বেণীতে টকটকে লাল ফিতের ফুল। তার বাড়ীর বারান্দার ধারে হাত জোড় করে নমস্কার করেছিল।

তার দিকে তাকিয়ে বেশ একটু বিস্ময় অনুভব করেছিল অংশুমান। তখনও সে সাজ-সজ্জার সন্নিবেশ বিশ্লেষণ ক'রে খতিয়ে দেখেনি—কিন্তু এমন সুপরিকল্পিত মেকআপের প্রভাবটুকুকে সে ঠিক অনুভব করতে পেরেছিল। এবং সে ছবি তার আজও মনে পড়ছে। তাই সে প্রথম বারেই না-হলেও, পরে যতক্ষণ সে ছিল—ততক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সাজ-সজ্জা দেখছিল।

ওই প্রবন্ধ বের হবার মাস তিনেক পর।

তার নতুন কেনা বাড়ীতে সে স্থায়ী হয়ে বসেছে; নিজের জীবনের পথও ঠিক ক'রে নিয়েছে। তার পৈতৃক উত্তরাধিকারসূত্রে তার সম্মুখে পথ কয়েকটা খোলাই ছিল। জমি নিয়ে ফার্মিং করা মানে চাষবাস, তার সঙ্গে পোলট্রি ফিশারী, তার সঙ্গে হাস্কিং মেসিনও একটা চলতে পারত; রাজনীতি, বাবা তার কংগ্রেস লীডার ছিলেন। বাবার পর তার মা হয়েছিলেন কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট, এখন তার বৈমাত্রেয় দাদা প্রেসিডেন্ট। অনায়াসে সে রাজনীতি করতে পারত; পি. এস. পি, কি সি. পি. আই, কি আর. এস. পি-তে যোগ দিতে পারত। আরও আছে ওদের, রাইস মিল আছে—তা নিয়ে থাকতে পারত। এক বৈমাত্রেয় দাদা ওই রাইস মিল নিয়ে আছে। তা ছাড়া সে নিজে বি. এ পাশ করেছিল ভাল ভাবে। এম. এ-তে সে আরও ভাল ফল করতে পারত—কিন্তু পরীক্ষা দেয় নি। ছাত্র জীবনের রাজনীতি স্টুডেন্টস মুভমেণ্ট করতে করতে পরীক্ষা না-দিয়ে না-দিয়ে বছর কয়েক কাটিয়ে কবি, নাট্যকার, গল্পলেখক এবং তার সঙ্গে অভিনেতা হিসেবে একটি লোভনীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করে সেই পথকেই জীবনের পথ বলে গ্রহণ করেছে।

গ্রহণ করেছে কেন—বেশ কয়েক পা চলা হয়ে গেছে। এবং তখন সে বিশ্বসংসারে একা হয়ে গেছে।

বাবা অনেক দিন মারা গেছেন। ১৯৪৭ সালে। স্বাধীনতা দিবসে। মা-ও মারা গেছেন চার বছর হ'ল। অবশ্য তার আগেই মতবিরোধ হয়ে মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছিল। সৎমা—সৎভাইরা আছেন, তাদের সঙ্গে সম্পর্কও নেই। গ্রামের সঙ্গেও নেই। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রী করে দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একক এবং একেবারে মুক্ত ব্যক্তি হয়ে এই সাহিত্য সঙ্গীত ও অভিনয় সাধনার পথে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

সেদিন সে নতুন নাটকের কথা ভাবছিল।

এ যুগের মন তার, যে-মন অতীত যুগের সব চিন্তাকে সব ধারণা-ধ্যানকে অস্বীকার করতে চায়; সমাজে রাষ্ট্রে—ধর্মের নামে, আইনের নামে মানুষের জীবনে যত বাঁধন যত গিঁট আছে সমস্ত কিছুকে ভেঙেচুরে ধুয়ে মুছে নূতন এক সমাজ চায়। তেমনি একখানা নাটক লিখবে সে।

আজও মনে পড়ছে তার মনে তখন তার নিজের একটি ধারণা গড়ে উঠেছে। অবশ্য এ ধারণার সঙ্গে এ যুগের চিন্তার এবং ধারণার স্বাভাবিক ভাবেই সম্পর্ক ও সাদৃশ্য গভীর।

বন্ধন যেখানে—গ্রন্থিই সেখানে মূল। ঘরসংসার সম্পর্ক জাতি ধর্ম আত্মীয় বন্ধু নিয়ে সমাজ-জীবনের মূল গ্রন্থি দাম্পত্যজীবন—বিবাহ। এবং গ্রাম দেশ রাষ্ট্রের মূল গ্রন্থি হ'ল জমির উপর অধিকার। এবং এই দুটো নিয়েই আজ আর মিথ্যাচার ও ব্যভিচারের শেষ নেই। এই ভাবনার কাঠামোয় নাটকের প্রতিমা গড়বার জন্য সে কাহিনীর উপাদান খুঁজছিল মনে মনে।

মহাভারত থেকে কাহিনী খুঁজে সে বের করেছিল।

নাটকের নাম দেবে স্থির করেছিল—দ্বৈপায়ন।

মৎসগন্ধা সত্যবতীর সঙ্গে ঋষি পরাশরের একদিনের বাসর। মৎসগন্ধা হ'ল যোজন গন্ধা।

ধীবর-কন্যা হ'ল—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষি ও মহাকবির জননী। তারপর সে হ'ল ভারতেশ্বরী। মহারাজ শান্তনুর মহিষী।

তার ফল হ'ল চিত্রাঙ্গদা ও বিচিত্রবীর্য।

তাদের অকালমৃত্যু হ'ল।

রাজ্যাধিকার রক্ষার জন্য অম্বিকা অম্বালিকার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্রের ব্যবস্থা হ'ল। প্রয়োজনের জন্য প্রেমহীন সংসর্গের ফল—একজন অন্ধ, একজন বিবর্ণ পাণ্ডুর বর্ণ—দুর্বল অক্ষম।

একখানা খাতায় এই কথাগুলি লেখা আছে। লেখক হিসেবে সে নোট-বই রাখে। মনে পড়ছে, নাটকের পরিকল্পনাটুকু লিখে তার একটি মন্তব্যও সে লিখেছিল পাশে। লিখেছিল—"সমাজতন্ত্রমুখী পৃথিবী এবং রাষ্ট্রে, পূর্ণ নারী-স্বাধীনতা-ঘোষিত সমাজে—এ ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় সত্য আছে?"

ঠিক এই সময়েই ওই অগ্নিবর্ণা মেয়েটি এসে তার বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে নমস্কার করেছিল তাকে—নমস্কার।

অংশুমান তার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করেছিল। কিন্তু এমন একটি শ্রীময়ী দীপ্তিময়ী, বিশেষ ক'রে এমন যত্ন ক'রে লাল সাজে সাজা একটি মেয়েকে দেখে দুঃস্বপ্নের মত জটিল ওই চিন্তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে আনন্দের নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। তার দিকে তাকিয়ে খুশী হয়েই প্রসন্ন হাসির সঙ্গে বলেছিল—আসুন—ওই যে, ওই ফটক দিয়ে ঘুরে আসুন।

অংশুমান বসেছিল বারান্দায়। বারান্দাটা প্যারাপেট এবং গ্রীল দিয়ে ঘেরা, বাড়ী ঢুকবার ফটক পাশের ফটক দিয়ে।

মেয়েটি ঘুরে ফটক খুলে ভেতরে এসে বলেছিল—আমি একটু ভেতরে যাব। বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে দেখা করব।

আপনা-আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—কি ব্যাপার? ইলেকশন? না—কোন পার্টির ক্যানভাসিং?

মেয়েটি বলেছিল—না। পলিটিকাল পার্টি-টার্টি নয় তবে আমি ক্যানভাসার সত্যি। বিজিনেস পার্টির—।

একটু হেসে অংশুমান বলেছিল—যা বলবার আমাকেই বলুন। বাড়ীতে মেয়ে কেউ নেই।

—থাক তা' হ'লে অন্যদিন আসব—এই—

তার কথা শেষ না হতেই অংশুমান বলেছিল—সেদিনও কোন মেয়েকে পাবেন না। কারণ আমার সংসারে—। একটু থেমে বোধ করি কি বললে ভাল শোনাবে ভেবে নিয়ে বলেছিল—আমি অবিবাহিত।

—ও! বলে একই সঙ্গে অপ্রতিভ এবং যেন খানিকটা বিস্মিত—দুইই হয়ে উঠেছিল। এবং আর কোন কথা যেন খুঁজে পায় নি। অংশুমান নমস্কার ক'রে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে যাচ্ছিল—ঠিক সেই সময়ে মেয়েটি বলেছিল—আমার এটা ঘর-সংসারের ব্যাপার—

অংশুমান বলেছিল—বেশ তো আমাকেই বলুন। আমার গৃহিণী না থাক গৃহ আছে এবং গৃহকর্তা আমি। শাড়ী ব্লাউস জাতীয় একেবারে 'ফর লেডিজ ওনলি' না হলে আমাকে বলতে পারেন।

একটু হেসে সে বলেছিল—না—তা নয়, 'ফর লেডিজ ওনলি' নয়; একেবারে ঘরের ব্যাপার, রান্নাশালের; ইলেকট্রিক কুকার, কেটলী—হীটার; কয়লায় ঘুঁটেতে ধোঁয়া হয় কালী হয় ঝুল পড়ে—। এ একেবারে পরিচ্ছন্ন ব্যাপার। তা ছাড়া অটোমেটিক ব্যবস্থা আছে।

—তা বেশ। একদিন এসে ডেমনেস্ট্রেশন দিয়ে দেখিয়ে একটা কিছু দিয়ে যাবেন।

—একটা কিছু কেন? সবই ইলেকট্রিক ক'রে নেবেন না কেন? একসঙ্গে গরুরগাড়ী আর মোটর দুটোর উপর দুই পা দিয়ে চলা যায়?

হেসে ফেলেছিল অংশুমান। বলেছিল—চমৎকার কথা বলেন আপনি।

মেয়েটিও হেসে বলেছিল—ক্যানভাসিংয়ের ওইটেই তো প্রথম গুণও বটে শেষগুণও বটে।

—হ্যাঁ। একেবারে অদ্বিতীয় একক সত্য বলে প্রমাণিত করতে হবে।

—আমি কিন্তু মিথ্যাকে সত্য বানাচ্ছি না। আমাদের বাড়ীতে সব ইলেকট্রিক—আমি দেখছি—বিশ্বাস করি—।

অংশুমান একটু যেন কাতর ভাবেই বলেছিল—মধ্যে মধ্যে যে ফিউজ হয়ে যায়। ভাত চাপিয়ে মাঝখানে উনোন নিভে গেলে—কাঠ ঘুঁটে গুঁজে দিলে চলে, নিদেন কাগজ পুড়িয়েও কাজ সারা যায়। এর কিন্তু কয়েল পুড়লে—অন্ধকার। আমার হাটার একটা আছে তো!

—না-না-না। এ খুব ভালো জিনিস। আমরা গ্যারান্টি দেব। ডিফিকালটি হলে আমাদের মিস্ত্রী আসবে—আমি আপনাকে এখনি দেখাতে পারি—। বলেই সে রাস্তার দিকে ফিরে ডেকেছিল, আয়ার—আয়ার!

আয়ার নিশ্চয় মাদ্রাজী। কিন্তু একজন হিন্দুস্থানী মাথায় একটা বোঝা নিয়ে একটু এগিয়ে এসে বলেছিল—আভি আসবে। উধর গেল। সিগারেট মৌলতে গেল।

এতক্ষণ একজন কালো সাহেব আর মাথায় মস্ত মোট বহনকারী এই হিন্দুস্থানীটিকে কোন সূত্র দিয়ে যুক্ত করতে পারে নি।

* * *

অংশুমানের বাড়ীতে তার সব কিছু করে তার একমাত্র অনুচর ভরতচন্দ্র। উড়িষ্যাবাসী এই অল্পবয়সী ছেলেটির গুণ কার্যক্ষমতা অসাধারণ। অংশুমানের মত মানুষের জীবনেও সে কোন অসুবিধা ঘটতে দেয় না। অংশুমানের বন্ধুজনে বলে অংশুমানের বাহন।

অংশুমান বলে—হ'ল না। বিষ্ণুর বাহন গড়ুর, রামের বাহন মারুতি গন্ধমাদন উপড়ে রণে অসাধ্য সাধন করে কিন্তু রান্না-বান্না ক'রে খাওয়াতে পারে না, অসুখে-বিসুখে মাথার শিয়রে বসে কপালে জলপটী দিতেও পারে না, বাতাস করতেও পারে না। ডাকবা মাত্র সাড়া

এরাও দেয় ভরতও দেয় কিন্তু বিশবার চা করতে বললে করবে না। ভরত আমার রামের ভরত থেকেও বেশী। অতঃপর সেই ভরতচন্দ্রকে ডেকে তার মত নিয়ে একটা ইলেকট্রিক কেটলী—একটা প্রেসার কুকার—একটা স্পেশাল হীটার কিনেছিল মেয়েটির কাছে। ডেমনেস্ট্রেট ক'রে দেখাবার জন্য ইলেকট্রিক কেটলীতে জল গরম ক'রে চা তৈরী ক'রে খাইয়েছিল মেয়েটি।

এই চায়ের আসরে সে হঠাৎ বলেছিল—রামায়ণ আপনার খুব ভাল লাগে, না?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে অংশুমান বলেছিল—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? তারপরই বলেছিল—রামায়ণ কার ভাল লাগে না? আপনার লাগে না?

মেয়েটি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—না—মানে, এর নাম ভরত—

—ভরত ওর নাম—ওর বাপ মা রেখেছে, আমার কাছে চাকরি করছে—সেটা একটা ঘটনাচক্র মাত্র; অন্য নাম হ'লেও কিছু আসতো যেতো না।

এবার সে বলেছিল বা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে সে তার ওই প্রবন্ধটি পড়েছে।

খুশী হয়েছিল অংশুমান। বলেছিল—এই ধরণের প্রবন্ধ পড়া অভ্যাস আছে? পড়েন!

কুণ্ঠার সঙ্গে বলেছিল—সচরাচর পড়িনে, এটা পড়েছিলাম। আমার বাবার খুব বন্ধু হলেন ওই প্রফেসর বোস, যিনি মূল আর্টিকলটা লিখেছিলেন। বাবা বলছিলেন ওটা খুব বোল্ড। আমার বাবা আপনার প্রবন্ধ পড়ে ঠিক করেছিলেন প্রতিবাদ লিখবেন কিন্তু লেখেন নি, কারণ কোথায় কম্যুনাল কোশ্চেন হয়ে দাঁড়াবে। মানে আমরা কৃশ্চান তো!

কথাটা ওইখানেই চাপা দিয়েছিল বা দিতে চেয়েছিল অংশুমান। মেয়েটিই জের টেনেছিল। বলেছিল—কিন্তু আপনি তো অর্থোডক্স নন।

—এর সঙ্গে অর্থোডক্সির সম্পর্কটা কি? কিছু রূঢ় হয়ে গিয়েছিল কণ্ঠস্বর।

মেয়েটি একটু চকিত ভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল—বাবা আর তাঁর ওই বন্ধু বলছিলেন—; এ-কালে 'কায়েন মনসা বাচা'—ওইটে—; থেমে গিয়েছিল সে।

অংশুমান বলেছিল—এ শপথ ত্রেতা যুগের সীতার শপথ। সেইটেই আমি বলেছি। আমি অর্থোডক্স নই। আমি হ্যাম খাই। আমি ঈশ্বর মানি নে। আমাদের পৈতৃক দেবোত্তর আছে—দেবতাকে প্রণাম করতে হবে, পূজো করতে হবে বলে তার ভার নিই নি—। সুতরাং অর্থোডক্সির কোন প্রশ্নই নেই।

এরপর মেয়েটি চুপ করে গিয়েছিল। কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বসেই ছিল। অংশুমানের মনে হয়েছিল মেয়েটি উঠতে চাচ্ছে কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে বা কোন রকম সঙ্কোচের কারণে উঠতে পাচ্ছে না।

আমার নামের মাদ্রাজীটি চুপচাপ কথাগুলো শুনেই যাচ্ছিল—একটু দূরেই বসেছিল সে। বদরী বসে ঢুলছিল। কথাবার্তার মধ্যে অকস্মাৎ ছেদ পড়তেই ওঠবার তাগিদ দিয়েছিল আমার। লোকটি বাংলা ভাল জানে না। কোন রকমে কাজ চালিয়ে যায়—খানিকটা হিন্দী খানিকটা বাংলা আর খানিকটা ইংরিজী মেশানো একরকম বুলিতে। সে বদরীকে

চমকে দিয়ে একটু জোরেই বলে উঠেছিল—এ—ব-দ্-রী—! দেখো বৈঠকে বৈঠকে আরামসে স্লীপিং—! গেট আপ ম্যান! উঠাও—মাল উঠাও! মিস সেন!

বিদায়-নমস্কারটা অংশুমানই আগে জানিয়েছিল। হেসে বলেছিল—আচ্ছা নমস্কার। সীতাও উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং প্রতিনমস্কার জানিয়ে বলেছিল—কোন কিছু খারাপ হলেই কোম্পানীতে ফোন করে জানিয়ে দেবেন। বলবেন মিস সেন—সীতা সেনের কাছে জিনিস নিয়েছি।

এবার একটু চমক লেগেছিল অংশুমানের। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—আপনার নাম সীতা সেন?

সীতা একটু হেসেই বলেছিল—হ্যাঁ।

তারপর মুখ তুলে খুশী-হওয়া ভঙ্গিটিকে প্রকাশ করেই বলেছিল—যা ভয় হয়েছিল প্রথমটা!

—কেন?

—ভেবেছিলাম—গোঁড়া একজন খুব রাগী মানুষ হবেন। আর হয়তো—

—কি?

—ভেবেছিলাম—অনেকটা বয়স্ক মানুষ আপনি—। সেকেলে আধবয়সী মোটাসোটা—। হেসে ফেলেছিল এতক্ষণে।

ভুরু কুঁচকে অংশুমান ভাবছিল মানুষ এমন ভাবলে কেন? সে তো শুধু বিকৃত ব্যাখ্যা করার জন্ম প্রতিবাদ ক'রে তার সত্য অর্থ টা প্রবন্ধে তুলে ধরতে চেয়েছিল। সীতার হাসি শেষ মুহূর্তে তাকে কিছুটা শান্ত এবং স্মিত করে তুলেছিল। সীতা এবার পিছন ফিরে আয়ার এবং বদ্রীকে বলেছিল—চলো।

আয়ার বলেছিল—বাট্—উই আর অলরেডি লেট—বাই হাফ এ্যান আওয়ার।

—তাতে কিছু হয় নি। চলো। আমরা বাঙালী আয়ার, সায়েব নই। চলো।

অংশুমান প্রশ্ন করেছিল—কোথায় যাবেন?

—এই কাছেই। একটা বড় অর্ডার আছে। মালগুলো তাদেরই। পথে আপনার বাড়ীতে আপনাকে দেখে—

কাপড়ের আঁচলখানায় বেশ একটু দোলা লাগিয়ে বারান্দা থেকে নামতে নামতে বললে—ভারী ভাল লাগল। জানেন—।

ভারী ভাল লাগল।

* * *

এই সীতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

এই প্রবন্ধটির জন্ম সে তাকে দেখতে এসেছিল। সেবারের পরিচয় ওখানেই শেষ। দ্বিতীয়-বার দেখা না হলে সীতার কথা আর কোন দিনই মনে হ'ত না। সীতা তার জীবনেই আসত না এবং আজকের এই মর্মান্তিক আঘাতের সম্মুখীন হ'ত না।

এ আঘাত প্রচণ্ড—এ আঘাত বোধ করি সমস্ত আঘাতের মধ্যে নিষ্ঠুরতম আঘাত।

কয়েক ফোঁটা চোখের জল টপটপ ক'রে ঝ'রে পড়ল।

সীতার সঙ্গে যদি তার দেখা না হ'ত। সেদিনের এই দেখা হওয়াটা কোন একটি সভা-সমিতিতে দেওয়া একটি ফুলের গুচ্ছের বেশী কিছু নয়।

না।

সীতার সঙ্গে সেদিন দেখা না হলে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সে লিখত না।

সীতার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, ওই প্রথম প্রবন্ধের জের টেনেই যেন সে আর একটি প্রবন্ধ লিখেছিল। সে প্রবন্ধটি প্রথম প্রবন্ধটির ঠিক উল্টো। বাল্মীকির রচনার ব্যাখ্যা নয়, বাল্মীকিকে সে সমালোচনা করেছিল।

সীতার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর একটা রূঢ় প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার মনে। এমনি একটি অল্পবয়সী মেয়ে তাকে সভয়ে সবিস্ময়ে দেখতে এসেছিল; ধারণা করেছিল সে একজন গোঁড়া হিন্দু ধার্মিক, স্বভাবে সে রাগী মানুষ, বয়সে সে প্রবীণ যার অর্থ সে সেকেলে, সে পুরানো অচল!

এটা শুধু ওই সীতা নাম্নী নবীনা মেয়েটির ধারণাতেই সীমাবদ্ধ নয়, এ কালের মেয়েদের ছেলেদের প্রগতিশীল মানুষদের সবারই ধারণায় এটা একটা কোন দেবমন্দিরের পুষ্পকুণ্ডের বাসী ফুলের গন্ধ-বহা হাওয়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে। এ যুগে 'রিলিজিয়াস' 'অর্থোডক্স' কথা দুটো ভালো কথার সূচীর মধ্যে পড়ে না। বামুন পণ্ডিত মোল্লা মৌলভী এ শব্দগুলোর আসল মানে যাই হোক বা এককালে যাই থেকে থাক এ যুগে এ শব্দগুলোর অর্থ সাপ বিছে কাঁকড়া-বিছের মত একটা বিষাক্ত এবং ঘৃণ্য অর্থ বহন করে। এই সীতা মেয়েটি সেদিন এসে তাকে এই খবরটাই দিয়ে গিয়েছিল যে বাল্মীকির শ্লোকের অপব্যাখ্যা এবং সীতা চরিত্রের অন্তর্নিহিত কবি-কল্পনার বিকৃতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে গোঁড়া ধার্মিক—সেকেলে এবং রিলিজিয়াস রিঅ্যাকশনারী বলে পরিচিত হয়েছে।

এর একটা নিদারুণ অস্বস্তি আছে। না, অস্বস্তির থেকেও বেশী। এ একটা অসহনীয় মর্মযন্ত্রণা।

অথচ সে তার ঠিক বিপরীত।

তার বাপ বিদ্রোহ করেছিলেন। তার মাও ছিলেন বিদ্রোহী। তার সূতিকাগার থেকে তার বিদ্রোহ আর বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা।

এর জন্যই সে দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখেছিল। প্রবন্ধের নাম ছিল বাল্মীকি ও বেদব্যাস। দীর্ঘ প্রবন্ধ। আজ মনে হচ্ছে লেখার মধ্যে নানা স্থানে রক্ষণশীলতাকে ব্যঙ্গ করার মধ্যে মাত্রা সে অনেকবার ছাড়িয়েছিল। পূর্ব প্রবন্ধ লিখে সে যত জ্বালা অনুভব করেছিল আজ বাল্মীকি বেঁচে থাকলে—অথবা পরলোকে তাঁর আত্মা অবিনশ্বরত্ব লাভ করে থাকলে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি জ্বালা অনুভব করতেন বা করবেন এতে সন্দেহ ছিল না। এ প্রবন্ধে সে রামায়ণ-রচয়িতার বাস্তবভীতিকে উদ্ঘাটিত করে উপহাস বল উপহাস, কষাঘাত বল কষাঘাত, তাই করেছিল। অথবা বলা যায় সমাজের মুখ রক্ষা করতে সতীত্বের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে সত্যকে আটক আইনে বন্দী করে দেবলোকের জেলখানায় বন্দী করা হয়েছিল।

প্রথম লিখেছিল যে সীতা মাত্র একটি সোনার হরিণ দেখে এমন বিমোহিত হল যে রামকে পাঠালে—যাও তুমি ধরে এনে দাও। দিতেই হবে। "যে যা বলিস ভাই—আমার সোনার হরিণ চাই।" যার যা হবে হোক না তাতে আমার কিছু নাই। কিন্তু সেই সীতা স্বর্ণলঙ্কায় এসে সোনার বাড়ি সোনার ঘর দেখে ভুলল না কেন? কেন সে অনশন সত্যাগ্রহ করে পড়ে থাকল অশোকবনে, তার সংগত কোন কারণ নেই। তারপর সে লিখেছিল—মহাকবি তাঁর সৃষ্ট ওই সীতা নাম্নী মানবী এবং মানবকুলবধূর দেহের শুচিতা নিয়ে মারাত্মক বিপদে পড়েছিলেন। সত্যের সম্মান রাখি, না সতীত্ব-মহিমার মাটির ঠাকুরকে পুজো করি; বাস্তবকে বাস্তব স্বরূপে তুলে ধরি, না সমাজের হুকুমকে তামিল করে শিরোপা শিরোধার্য করি এই সমস্যার মধ্যে পড়ে একবার নয় দু'দুবার দৈব ম্যাজিকরূপ অসম্ভব ও অলৌকিকের শরণাপন্ন হয়েছেন। এবং সুকৌশলে পূর্ব প্রবন্ধের কথা স্মরণও করিয়ে দিয়েছিল সে। বুঝিয়ে বা জানিয়ে দিয়েছিল যে এ প্রবন্ধ তার পূর্ব প্রবন্ধেরই শেষ কথা বা আসল কথা। প্রবন্ধে সে এনে ফেলেছিল সেই সীতা-হরণের কথা। জটায়ু প্রসঙ্গ।

"জটায়ুকে বধ করে চুলের মুঠো ধরে ঝুলিয়ে সারা আকাশপথ অতিক্রম করে লঙ্কায় এসে অশোকবনে সীতাকে চেড়ীর পাহারায় রেখেও দশানন তাকে ভোগ করতে সাহস করলেন না। মানবিক উদারতা রাক্ষসের নেই। রাবণের তো নেইই। তবুও পারলে না। কেন পারলে না তার কারণ রাবণ নিজমুখেই ব্যক্ত করেছে তার সভাসদদের সম্মুখে। বলেছে লোকপিতামহ ব্রহ্মার অভিশাপে অভিশপ্ত—নারীর বিনা সম্মতিতে বলপূর্বক তার দেহ ভোগ করলে আমার দশমাথা শতধা বিদীর্ণ হবে।"

রাবণের অশোকবনে সীতাকে এনে ফেলে কবি সম্ভবতঃ সমাজের এবং রাজা মহোদয়ের (তিনি হয়তো রাম) রক্তচক্ষু স্মরণ করে বিচলিত হয়ে মা সরস্বতীর রাঙাচরণ দুখানির উপর আছড়ে পড়েছিলেন—এবং জননী বাকবাদিনী যিনি নাকি কল্পনায় মানুষের মনকে আকাশে বিচরণের শক্তি দেন তিনি বলেছিলেন, "ভয় কি বাছা! দৈব মহিমার অলৌকিক ওড়না দিয়ে সীতার অঙ্গবন্ধন করে দাও।" বাল্মীকি বুদ্ধি করে সীতার অঙ্গবন্ধন না করে রাবণের হস্ত পদ—কুড়িখানা হাত দুখানা পা দেবলোকের তাঁতে বোনা অলৌকিক গামছা দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন।

"আদিপর্ব থেকে বনপর্বের ওই রাজসভা বর্ণনার সর্গ পর্যন্ত কোথাও রাবণের অভিশাপ সম্পর্কে একটা কথাও বলেন নি কবি। এই সর্গে পৌঁছে মনে হয়েছে রাবণকে বধ করা যায় যাবে কিন্তু তার অশোকবনে সীতাকে এনে ফেলে কি করে তার দেহকে বাঁচানো যায় রাবণের কুড়িটা হাতের আক্রমণ থেকে? বেঁচেছে যে উপায়ে তা লোকবিদিত। এবং এ পর্যন্ত অর্থাৎ ত্রেতাকাল থেকে পুরো দ্বাপর এবং কলির বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাল্মীকি নিরঙ্কুশ প্রশংসা এবং অভিনন্দন পেয়ে এসেছেন। এই বিংশ শতাব্দীতে তাঁকে দাঁড়াতে হবে বিচারের কাঠগড়ায়। আমার এই প্রবন্ধ ঠিক প্রবন্ধ নয়—এ আমার লোকবিচারালয়ে আরজি। সাক্ষী আমি কাউকেই মানব না। সাক্ষী মানব বাল্মীকিকেই। তাঁকে বলতে হবে—রাবণের মুখ দিয়ে ওই অভিশাপের কথা বলানোর পর আবার একবার অগ্নিপরীক্ষার

ম্যাজিকের দরকার হল কেন? তারপরও পৃথিবী বিদীর্ণ করে সীতাকে পাতালে পাঠিয়ে দিলেনই বা কেন? তিনি সেই রাজসভা থেকে বৈকুণ্ঠ থেকে সমাগত রথে আরোহণ করে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে লক্ষ্মীরূপে বৈকুণ্ঠে গেলেন না কেন?"

এর পর সে মহাভারতের সভাপর্বের পাশা খেলা এবং রজঃস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভায় টেনে এনে দুঃশাসনের বস্ত্রাকর্ষণের প্রসঙ্গ এনে বলেছিল—যদিও বেদব্যাস নারায়ণ রূপী কৃষ্ণের অলক্ষে থেকে বস্ত্র যুগিয়ে দেওয়ার কথা লিখেছেন তবুও ওইটেই দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করা রোধ করার জন্য একমাত্র রক্ষা-কবচ নয়। দৈববলই একমাত্র বল নয় এখানে। স্মরণ রাখতে হবে যে অন্নদাস ভীষ্ম-দ্রোণকে উপেক্ষা করেও অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রই সেখানে শেষ আধিকারিক—তিনিই কৌরব-কুলপতি রাজা। দেবী গান্ধারীর মত মহিমময়ী রাজেশ্বরীকেও মনে রাখতে হবে। মহাভরত সযত্নে পড়লে বোঝা যায় এক্ষেত্রে দ্রৌপদীকে রক্ষা করেছে জন্মান্ধ রাজাধিরাজ ধৃতরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। দুর্যোধনকে কঠিন তিরস্কার করে দ্রৌপদীকে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বর দিয়েছেন। দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে পাণ্ডবেরা।

এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হতেই সেদিন আশ্চর্য আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল চারিদিকে। নানান মন্তব্য—নানান আলোচনা চলেছিল কাগজে। গালাগাল কম নয়, অনেক। তবে মুখে মুখে আলোচনার আর শেষ ছিল না। বিশেষ করে তরুণ মহলে।

একটা বিচিত্র কথা এই যে, এই গালাগালিতে সে নিজেকে বিব্রত বোধ করে নি। বরং যেন একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার-বোধে বেশ একটি পরিতৃপ্তি লাভ করেছিল।

চিঠিপত্র এসেছিল অনেক। সাধুবাদ, অভিনন্দন এও ছিল। আবার নিন্দা কটু-বাক্য, তার সঙ্গে অভিসম্পাত এও ছিল। চিঠিগুলির হস্তাক্ষর লক্ষ্য করত সে। হাতের লেখার ভাল মন্দ কাঁচা পাকা সব রকমই ছিল। এ থেকেই সে বিচার করত কতজন তাদের মধ্যে ছেলেমানুষ, ক'জনই বা চিন্তাশীল ব্যক্তি হতে পারেন। কতজন মেয়েছেলে—কতজন পুরুষ তারও হিসেব সে করত। নবীনেরাই তাকে উৎসাহ দিয়েছিল। প্রবীণদের মধ্যে পুরুষেরা কয়েকজন শাস্ত্রের বিতর্ক তুলেছিল, কয়েকজন দুঃখপ্রকাশ করে অনুরোধ করেছিল যে সে যেন আর পুরাণের অপব্যাখ্যা না করে। দুজন বৃদ্ধ তাকে অভিসম্পাত দিয়েছিল। একদল মহিলা তাকে প্রায় একই কথায় গাল দিয়েছিল—লিখেছিল—তোমার মত লেখককে আমরা ঘৃণা করি। কেউ কেউ বা একবার ঘৃণা করি লিখে তুষ্ট হন নি লিখেছেন—ঘৃণা করি, অত্যন্ত ঘৃণা করি।

আরও হয়েছিল, ছাত্রদের মহলে তার নাম একটি চাঞ্চল্যকর নাম হয়ে উঠেছিল। তারা দুজন একজন ক'রে তার সঙ্গে দেখা করতে বা তাকে দেখতে আসতে শুরু করেছিল। সভা-সমিতিতে বিতর্কের আসরে তার নাম একটি অতি আগ্রহে প্রতীক্ষিত নাম হয়ে উঠেছিল।

ছাত্রমহলে আগে থেকেই তার নাম ছিল। ছাত্রজীবন তার দীর্ঘ এবং দীর্ঘ ছাত্রজীবনে সে ছাত্র-আন্দোলনের সামনের সারিতেই তার আসন ছিল। দু-চারটি রাজনৈতিক দলও তাকে তাদের খাতার নাম লেখাতে অনুরোধ করেছিল কিন্তু সে তা লেখায় নি।

রাজনৈতিক দলকে সে এই স্বল্প জীবনকালের মধ্যে ভাল করে জেনেছে এবং চিনেছে। রাজনৈতিক দর্শন রাজনীতি শাস্ত্র এ সে অনেক পড়েছে। রাজনৈতিক দলদেরও সে চেনে। সব দলের চেহারাই সে দেখেছে।

থাক।

সীতা অনেক দূরে পড়ে যাচ্ছে।

জীবনের কথা তো অনেক। সে সব কথা কথা হয়েও কথা নয়। সকালের যে কথাটা সন্ধ্যাবেলায় মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায় সে কি কোন কথা? রাত্রে রোজই প্রত্যেকে কিছু কিছু স্বপ্ন দেখে কিন্তু সকালে তার আর কিছু মনে পড়ে না;—ওগুলো তাই।

সীতা তা নয়।

আজ মৃত সন্তানকে কোলের কাছে নিয়ে—সে রোগশয্যায় শুয়ে তার কাছে বার্তা পাঠিয়েছে।

সে কৃতকর্ম বিচার ক'রে তার নিজের অপরাধের দণ্ড নির্ণয় করছে।

* * *

সেদিন অনেক চিঠি অনেকজনে লিখেছিল কিন্তু সীতা কোন চিঠি লেখে নি বা সীতা আর কোন অজুহাতে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি। না। সেও তাকে খোঁজে নি।

একখানা পত্র লিখেছিলেন তার মা।

অতি কঠোর কর্কশ তার ভাষা এবং বক্তব্য ছিল মর্মান্তিক ভাবে নিষ্ঠুর। মায়ের সঙ্গে সে পৃথক হয়ে গেছে অনেক দিন সে তার ছাত্রজীবনেই। তখনও সে আই. এ পাশ করে নি। তখন থেকেই তিনি তার মুখ দেখতেন না। তিনি এই প্রবন্ধ পড়ে লিখেছিলেন, "তোমার প্রবন্ধ পড়িয়া আমি দিব্য বুঝিতেছি যে, তোমার মন কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হইয়াছে। তুমি ঈশ্বরের কাছে করুণা ভিক্ষা করিয়ো। দেশে কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসার উন্নতি হইয়াছে শুনিয়াছি, অমোঘ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু মনের কুষ্ঠ রোগ কোন দিনই দিব্যকরুণা ব্যতীত নিরাময় হয় না। মনে মনে অনুতপ্ত হইয়ো। অনুশোচনায় চিত্ত শুদ্ধ করিয়ো।"

না।

অনুতাপ সে করে নি—অনুশোচনার কোন কারণ ঘটে নি সেদিন।

দ্বিতীয় পর্ব

এত পত্রাঘাত, বাহবা, নিন্দা এমন কি মায়ের ওই নিষ্ঠুর ক্রোধের উত্তাপে উত্তপ্ত পত্রখানিতেও সে বিচলিত হয় নি। কোন পত্রেরই সে জবাব দেয় নি। মায়ের পত্রেরও না।

যারা তাকে উৎসাহিত ক'রে বাহবা দিয়েছিল তাদের দলেরও সে কেউ নয়, আবার যারা তাকে অভিসম্পাত দিয়েছিল তাদেরও সে কেউ না। সে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে গোটা দেশটার, তাই কেন, গোটা পৃথিবীর এই শতকের অবস্থা দেখে সে যা বুঝতে পারছিল,

যে ধারণায় উপনীত হচ্ছিল তাকেই সে প্রকাশ করতে তৃতীয় প্রবন্ধ রচনার সংকল্প করেছিল।

নামটাই তার মনে আগে এসেছিল।

নাম দিয়েছিল 'নবভারতের মুক্তিপর্ব'। আরম্ভও করেছিল কিন্তু প্রবন্ধের কর্মে তাকে প্রকাশ করা তার পক্ষে সহজ হয় নি। বার বার আরম্ভ ক'রে কিছুটা লিখে যেন অবশ হয়ে পড়ছিল তার হাত এবং কলম। মনে হয়েছিল ঠিক হ'ল না। ফেলে দিয়েছিল। কোনবার দু'চার প্যারাগ্রাফ কোনবার এক পৃষ্ঠা বা দু পৃষ্ঠা কোনবার বা পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা লিখেও ফেলে দিয়েছিল। তার কিছু অবশেষ আজও তার ঘরের পুরনো ফেলে দেওয়া কাগজের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে।

যা সে বুঝেছিল তাকে প্রকাশ করতে উপলব্ধির অভাব তার হয় নি কিন্তু তাকে প্রকাশ করতে সাহস যেন তার হয় নি। এবং বহুস্থলে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যা অবশ্য প্রয়োজনীয়—সেই যুক্তি এবং তথ্য ইত্যাদিরও অভাব ঘটছিল। সংগ্রহ করতে সে পারে নি। পারে নি ঠিক নয়, চেষ্টা করলে অবশ্যই পারত সে কিন্তু সেই ধৈর্য তার ছিল না। সে প্রবন্ধ-লেখক ঠিক নয়, সে লিখতে ভালবাসে লিখতে চায় নাটক এবং গান; গল্প উপন্যাসও কিছু কিছু লিখেছে সে কিন্তু নাটকই তার সব থেকে প্রিয় মাধ্যম।

এই নূতন উপলব্ধিতে সে অনেক ভেবেচিন্তে নতুন নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছিল মহাভারতের মৌষল পর্ব নিয়ে। শেষ দৃশ্যটাই কল্পনা করেছিল সর্বাগ্রে।

'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং'—পৃথিবীতে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য অবতার আবির্ভূত হয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণ তখন জরাগ্রস্ত হয়ে আসছেন; কুরুক্ষেত্রে ধ্বংসের পালা শেষ হয়েছে। কৌরবকুলের অন্তঃপুরে বিধবা বিধবা আর বিধবা ছাড়া কাউকে দেখা যায় না। পাণ্ডব বংশে উত্তরার পুত্র পরীক্ষিৎ একমাত্র বংশধর। দুর্বল ভারত ক্ষেত্রে শিশু বৃদ্ধ আর বিধবা বা কুমারী। কিন্তু সমুদ্রতটে দ্বারকা রাজ্যে ছত্রিশ কোটী যাদবেরা প্রমত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উচ্চহাস্য আর অট্টহাস্যে সমুদ্রকল্লোল লজ্জিত হয় কোলাহল কলরবে আস্ফালনে—ঝড় আসতে আসতে গতিপথ পরিবর্তন করে। যাদব কুমার-কুমারীরা স্বচ্ছন্দ বিহার করে বেড়ায়।

থাক। সে সব বর্ণনা থাক।

উন্মার্গগামী সংখ্যাস্ফীত যাদববংশ মদ্যপানে প্রমত্ত হয়ে আত্মকলহ অন্তর্দ্বন্দ্বে। না—ওসব সংস্কৃত কথা নয় সাদা কথায় দাঙ্গা বাধিয়ে নলখাগড়ার গাছ আর তাল তুলে তাই দিয়ে এ ওকে পিটিয়ে শেষ ক'রে দিলে।

শ্রীকৃষ্ণ জানতেন এমন পরিণতির কথা।

তিনি জরা ব্যাধের শরাঘাতে আহত হয়ে নিমগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার সময় অন্তিম মুহূর্তে দুটি ফোঁটা চোখের জল ফেললেন। নাটকের শেষ এখানেও সে করে নি, করেছিল—অর্জুন যখন অনাথা অর্থাৎ নাথহীন যাদব পুরনারীদের হস্তিনায় নিয়ে যাচ্ছেন এবং পথের মাঝখানে যেখানে শবর এবং ব্যাধেরা এসে তাদের আক্রমণ করেছে—সেই-খানে। অর্জুন বাধা দিতে গিয়ে গাণ্ডীব ধরে তাতে জ্যা রোপণ করতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পারলেন না ধনুকে জ্যা দিতে। থরথর করে কেঁপে উঠলেন। এ কি হ'ল? কেন

এমন হ'ল? কোনক্রমে জ্যা দিলেন তো যুদ্ধকৌশল ভুলে গেলেন। তাঁর অক্ষয় তূণ যুদ্ধ করতে করতে বাণশূন্য হয়ে গেল।

ওদিকে উল্লসিত শবরেরা ব্যাধেরা রথ থেকে টেনে নামাতে লাগল পুরনারীদের। পুরনারীরা আর কেউ নয়—মহাভারতের পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমের বংশের কন্যা এবং বধূ। হয়তো বা কৃষ্ণ বাসুদেবের অসংখ্য বিবাহিতা পত্নীদের ভাগ্যে ভিন্নতর কিছু ঘটে নি। ব্যাসদেব কিছু লেখেন নি।

যে ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সেই ধর্মরাজ্য একখানা আকাশে ওড়া ঘুড়ির মত সুতো কেটে ভেসে গেল আকাশে—নিতান্তই একখানা কাগজের টুকরোর মত।

এই পঠভূমির মধ্যে কাল এল নূতন কাল নিয়ে।

নূতন কালে দিনের রঙ বদল হয় নি, দিনের দৈর্ঘ্যের তারতম্য হয় নি, উত্তাপের তারতম্য হয় তো কিছু হয়েছে—কিন্তু সেও কিছু নয়। আলোর বাতাসের জলের মাটির সেই একই গতি একই গুণ একই ক্রিয়া এবং একই স্বাদ আছে। তবু কালের বদল হ'ল। বদল হ'ল ধর্ম—বদল হ'ল জীবন-ভাবনায়। জীবন ধর্মের পরিবর্তনে কাল পাল্টায়, দ্বাপরের পর কলি। পরীক্ষিৎ কলিকে শাসন ক'রেও ঠেকাতে পারেন নি।

সর্পাঘাতে পরীক্ষিতের মৃত্যু হ'ল। কলি এসে তার শাসন প্রসারিত করলে। তার প্রশাসনে আত্মা নাই, ঈশ্বর অস্বীকৃত, সত্য শুধু—জীবন্ত মানুষ আর বস্তু।

* * *

না—কলিকালকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ ব্যাখ্যা তার সত্য ব্যাখ্যা নয়। এ ব্যাখ্যার সম্মুখে আজ অসংখ্য প্রশ্ন নির্ভয়ে উচ্চারিত হচ্ছে। কলি মহারাজা পরীক্ষিতের সম্মুখে এ প্রশ্নগুলি উপস্থাপন করতে পারে নি। আজ এ প্রশ্ন প্রমাণের সঙ্গে কলি প্রচার করেছে।

কে বলে—কলিযুগ ভ্রষ্টতার যুগ?

কে বলে—কলিকাল খর্বতার কাল, দুর্বলতার কাল, নৈবীর্যের কাল?

কে বলে—কলি যুগ অজ্ঞানতার যুগ, মিথ্যার যুগ, ভ্রান্তির যুগ? সঙ্কীর্ণতার যুগ? অশান্তির যুগ? ভোগ-সর্বস্বতার যুগ?

কলি যুগে—কি দিবালোক ম্লান হয়েছে? দিনের দৈর্ঘ্য কি হ্রাস পেয়েছে? অন্ধকার কি গাঢ়তর কালো হয়েছে? রাত্রির দৈর্ঘ্য কি বৃদ্ধি পেয়েছে?

না।

কলি যুগ বিচিত্র যুগ। সত্য ত্রেতা দ্বাপর থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। তা ভ্রষ্টতার যুগ নয় খর্বতারও নয়—সংকীর্ণতা বা দুর্বলতা বা নৈবীর্যের যুগও নয়।

* * *

এইখানে এসে তার চিন্তা সব যেন এলোমেলো হয়ে খেই হারিয়ে মনের আকাশে বিশ্বকর্মা পুজোর দিনের অসংখ্য কাটা ঘুড়ির মত ছড়িয়ে হারিয়ে গিয়েছিল।

নাটকের উপসংহার বা সমাপ্তি যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছিল। বারকয়েক নাটকখানি

আরম্ভ ক'রে কিছুদূর ছুটো—তিনটে দৃশ্য লিখেই সরিয়ে রেখেছে; ভয় পেয়েছে; এক বিরাট ধ্বংস এমন ভয়ালরূপে সামনে এসে দাঁড়িয়ে যে সেই ধ্বংস দৃশ্য পার হয়ে তার কল্পনা কোন একটি একবিন্দু আলোর আশ্রয় পেয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে পারে নি।

নাটক লেখা হয় নি। পত্তন হয়েছিল নতুন প্রবন্ধের। ভেবেছিল প্রবন্ধের মধ্য দিয়েই মাকে জবাব দেবে। চিঠি দেবে না। কিন্তু তা লিখে তার মন তৃপ্ত হয় নি। শুধু তার খানিকটা অংশ নিয়ে শেষ পর্যন্ত তার মায়ের সেই অভিসম্পাত ভরা বা নিদারুণ উত্তাপ ভরা পত্রখানার জবাব দিয়েছিল।

লিখেছিল—তুমি আমাকে যে পত্র লিখেছ তার মধ্যে বাছা বাছা যে কঠিন বাক্যগুলি প্রয়োগ করেছ তা একান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং লজ্জিত হয়েছে। তুমি এমন পত্র লিখবে এ আমি প্রত্যাশা করি নি। এমন অযৌক্তিক তুমি হতে পার এ ধারণা আমার ছিল না। অতসীর ঘটনা নিয়ে তুমি আমার উপর বিরক্ত ও বিরূপ সে কথাটা সর্বজনবিদিত হলেও সে বিরক্তির বিষাক্ততা এবং সে বিরূপতার ব্যাপ্তি এমন তীব্র ও দুস্তর এ কথাটা আমি জানতাম না। আমি তো তোমার গর্ভের সন্তান, তোমার কাছেই তো আমার প্রথম শিক্ষা। ছেলেবেলা দেখেছি তুমি ঠাকুরবাড়ী-মুখে হাঁটতে না। বলতে গেলে অবিশ্বাস করতে। আজ তুমি লেখাপড়া জানা মেয়ের ভাষায় যা বলেছ আমাকে—সেকালে বড়মা তাঁর সে আমলের গেঁয়ো ভাষায় ঠিক তাই বলত। তুমি আজ তাই লিখলে আমাকে?

কথাটা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে অংশুমানের পিছনের জীবনের কথা।

শুধু অংশুমানের পিছন জীবন কেন—তারও পিছনে আছে তার বংশের জীবন। তার বাবা নিরঞ্জন চৌধুরী, মা শোভা চৌধুরী।

না। শোভা চৌধুরী বিবাহসূত্রে চৌধুরী হওয়ার পূর্ব থেকেই মনে করতে হবে। আগে স্থান তার পরে কাল—সর্বশেষে পাত্র।

বর্ধমান জেলার উত্তর প্রান্তে অজয় নদী; নদী নয় নদ। না থাক তার নদের পৌরুষ। তবু নদ।

অজয়ের ধারে একখানি গ্রাম। ব্রাহ্মণ বৈশ্য গন্ধবণিক উগ্রক্ষত্রিয়-প্রধান গ্রামখানিতে তার বাপ জ্যাঠারাই ছিলেন সব থেকে বড়। অন্য অন্য গ্রামে এ অঞ্চলে উগ্রক্ষত্রিয়েরা প্রধান এবং প্রবল হলেও এ গ্রামের জমিদার জোতদার ও মহাজন—এই তিনই ছিল চৌধুরীরা।

কাল ১৯২৪ থেকেই আরম্ভ করা ভাল।

১৯২৪ সালে অজয় নদের দক্ষিণ তটের উপর দেবগ্রাম গ্রামখানির, (গ্রামখানির নাম দেবগ্রাম) প্রধান জন ছিল চৌধুরীরা। উপাধি চৌধুরী, জাতিতে ব্রাহ্মণ, গোত্রে কাশ্যপ অর্থাৎ চাটুজ্জে। বাংলা দেশে গ্রামীণ সমাজের মধ্যে নিঃস্ব খেটে-খাওয়া মানুষ থেকে সম্পদশালী ভূসম্পত্তিশালী ঘর পর্যন্ত অনেক শ্রেণী, অনেক ধাপ বা সিঁড়ি। দিন আনে দিন খায়, না আনলে উপোস যায় থেকে দিয়ে খায়, খেয়ে ছড়ায়, ছড়ানো ভাত কাকে খায় কুকুরে খায় যে ঘরে সে ঘর পর্যন্ত মুটে মজুর কৃষাণ চাকর-চাষীভূষি জোতদার পর্যন্তই বহু ধাপ—তারপর প্রধান তিনটে ধাপ—জোতদার—মহাজন—জমিদার। এর সঙ্গে আবার জাতের শ্রেণীবিন্যাস

জড়িয়ে আছে, ছুৎ-অছুৎ—ব্রাত্য থেকে নবশাক পর্যন্ত অনেক শ্রেণী। উপরের তিনটে শ্রেণী সচরাচর কায়স্থ বৈদ্য ব্রাহ্মণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেবগ্রাম চৌধুরীরা ব্রাহ্মণ।

অনেক পিছনের লোকেদের মুখের গল্প কথিত আছে যে অনেক পিছনের কালে দেবগ্রাম চৌধুরীরা পটো ঝাড়া বামুন ছিল। অর্থাৎ পুরুতগিরি ক'রে বেড়াত এই সদগোপপ্রধান অঞ্চলে। লোকে বলত—ভশচাজেরা। অর্থাৎ ভট্টাচার্যেরা।

নিরঞ্জন চৌধুরীর পাঁচ পুরুষ আগে কৃষ্ণপুর থেকে কয়েকখানা গ্রাম পরের গ্রামের এক সম্পদশালী যজমান বাড়ী সমাজে পতিত হয়েছিল গুরুতর অপরাধের জন্য। তাদের সংসারে নাকি মুসলমান সংসর্গ দোষ ঘটেছিল। ঘটেছিল স্বয়ং কর্তার। তিনি অমিতচারীও ছিলেন না—পাপী ব্যভিচারী বলতে যা বোঝায় তাও ছিলেন না। বর্ধমান ফৌজদারের অধীনে কাজ করতেন, গানবাজনার শখ ছিল, বাঈজীতে আসক্ত ছিলেন—সে আসক্তি এমন গভীর হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রামপ্রান্তের বাগানবাড়ীতে এনে তুলেছিলেন। ফলে পাতিত্য ঘটল। ওদিকে ফৌজদারের তরফ থেকে চাপ এল। তিনি ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করলেন। রাজা সভায় রাজ সরকারের চাকরে—অবস্থাপন্ন ব্যক্তি—জমিদারী জায়গীরদারী রয়েছে, বিশেষ অসুবিধায় পড়েন নি; কেবল মুস্কিল হয়েছিল বাড়ীর শিলা নারায়ণ নিয়ে। জাত দিতে পেরেও ওই শিলাটিকে নদীর দহে বা পুকুরে ফেলে দিতে পারেন নি বা লোহার হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলতেও পারেন নি। বিলাসী ফৌজী ওই মানুষটির বুকের মধ্যে কোথায় একটি আশ্চর্য মমতা ছিল এই শিলাটির জন্য।

অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত দেবগ্রামের পুরোহিত ঠাকুরটিকে ডেকে তাকে দিয়েছিলেন এই শিলা নারায়ণটি এবং তার সেবার্চনার জন্য দিয়েছিলেন কুড়ি বিঘার একটি জোত—তার সঙ্গে একটি পুকুর একটি বাগান। সবই নিষ্কর সম্পত্তি। খাস নবাবী দপ্তর মুরশিদাবাদ থেকে নবাবী সইযুক্ত নাখরাজনামা আনিয়ে দিয়েছিলেন। গল্প আছে নাখরাজনামার দুটো জায়গার লেখা ঝাপসা হয়ে গেছে, ঠিক স্পষ্ট নয়। লোকে বলে—নাখরাজনামাখানা চাটুজ্জে ভটচাজকে দেবার সময় কর্তার চোখের জল পড়েছিল দু ফোঁটা।

এই সূত্রপাত। যিনি এই ঠাকুর এবং জমি পেয়েছিলেন তিনি নিরঞ্জন চৌধুরীর বৃদ্ধ পিতামহ।

এর পরের পুরুষ নিরঞ্জন চৌধুরীর প্রপিতামহ চাকরি নিয়েছিল—ফৌজদারের উপরি উপার্জন থেকে মহাজনী কারবার ক'রে একই সঙ্গে জোতদার ও মহাজন হয়ে উঠেছিলেন। এবং চৌধুরী উপাধিও পেয়েছিলেন। জমিদার হয়েছিলেন নিরঞ্জনের পিতামহেরা। পিতা-মহেরা দুই ভাই। তাঁরাই জমিদারী অর্জন করে পুরুতগিরি পেশার লজ্জাকর পরিচয় মুছে ফেলবার জন্যই চট্টোপাধ্যায় (সাধারণে ভুল ক'রে বলত ভটচাজ) উপাধি বর্জন ক'রে চৌধুরী উপাধি কায়েম করে—বাড়ীর দেবসেবার জন্য অন্য এক ব্রাহ্মণকে এনে গ্রামে বসিয়েছিলেন।

থাক। পিছনেরও পিছনের ঘটনায় এখানেই যবনিকা পড়ে যাক। না। আর একটা আপনা থেকে ডাক দিয়ে কানের কাছে এসে শুনিয়ে দিচ্ছে। বলছে—আরও একটা কথা আছে। নিরঞ্জন চৌধুরীর পিতামহেরা দুই ভাই। শেষ জীবনে দুই ভাগে ভাগ হয়েছিল।

এক ভাইয়ের এক ছেলে অন্য ভাইয়ের দুই ছেলে। নিরঞ্জনের বাপ ছিল ওই বাপের এক ছেলে। সেই এক ছেলের আবার দুই ছেলে। অর্থাৎ নিরঞ্জনের এই সহোদর আর দুই ভাইয়ের ছেলে দুগণ্ডা অর্থাৎ আটজন। সুতরাং পরের পুরুষেই সুরু হল ভীষ্মপর্ব থেকে সৌপ্তিক পর্ব পর্যন্ত বা স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত কুরুক্ষেত্র ভাগ সুরু হয়ে গেল।

মামলা মকর্দমা, বিবাহে উপনয়নে, শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকাণ্ডে সমারোহ থেকে আরম্ভ করে, কথিত আছে, বর্ধমানের খেমটাওয়ালীদের আসরে প্যালা দেওয়ার পাল্লা পর্যন্ত সে-কুরুক্ষেত্র মহাভারতের কুরুক্ষেত্র থেকে পৃথক হ'লেও অত্যন্ত সাধারণ এবং সুপরিচিত। এরই মধ্যে একটি যুদ্ধ-মুখ বা ক্ষেত্র হ'ল রাজানুগ্রহের ক্ষেত্র। যে যেমন রাজানুগ্রহ পায় তেমনি প্রতিপত্তি সে বিস্তার করে সাধারণ মানুষের উপর সমাজের উপর।

১৯২০ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতী নিয়ে ছিল প্রতিযোগিতা। এ পদটি চৌধুরীদেরই দখলে ছিল কিন্তু চৌধুরীদের মধ্যে ছিল দারুণ বিবাদ।

১৯৩১ সালে হল ইউনিয়ন বোর্ড। ওদিকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচন।

আজ ১৯৩১ সালে বলার প্রয়োজন আছে যে ১৯২১ সালে লোয়ার হাউসের নাম এ্যাসেম্ব্লী ছিল না, কাউন্সিল ছিল। আপার হাউস ছিল এ্যাসেম্ব্লী।

১৯২১ সালে ইউনিয়ন বোর্ডে নিরঞ্জন চৌধুরীর ভাই হয়েছিল প্রেসিডেণ্ট। আগে থেকেই নিরঞ্জনের দাদা প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ ছিল এখানকার। তখন নিরঞ্জনেরা ছিল একসংসারে। এইখানেই ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ বেধেছিল। বেধেছিল ১৯২১ সালের আন্দোলন নিয়ে। ১৯২১ সালে পূজার সময় দেবগ্রামের দুগাই মিস্ত্রির কাপড়ের দোকানে হঠাৎ একদল ছেলে পিকেটিং সুরু ক'রে দিয়েছিল। বিলিতী কাপড় কেউ কিনো না—বেচতে পাবে না বিলিতী কাপড় এই ছিল দাবী। দুগাই মিস্ত্রি ছিল নিরঞ্জনের দাদা পুরঞ্জনের ক্লাস-ফ্রেণ্ড। এবং ইউনিয়ন বোর্ডে সে ছিল ক্লার্ক এবং ট্যাক্স কলেকটর—দুই। দুগাই মিস্ত্রিই আবিষ্কার করেছিল যে, এই পিকেটারদের পিছনে যিনি প্রেরণাদাতা তিনি নিরঞ্জন চৌধুরী এবং এই দুগাইই ব্যাখ্যা করেছিল যে এটার কারণ স্বদেশপ্রেম নয়, দেবগ্রামে বিলিতী কাপড় বিক্রীতে পিকেটিং-এর অর্থ হ'ল এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে জেলার ওপরতলাদের কাছে অপদার্থ প্রতিপন্ন করা।

নিরঞ্জন চৌধুরী এদের সমর্থক ছিল এ কথা সত্য। কিন্তু তার দাদাকে অপদস্থ করা তার অভিপ্রায় ছিল এ কথা সত্য নয়। আসল সত্য হল এই যে, দেশজোড়া আন্দোলন তাকেও স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তার নিজের ক্ষমতা ছিল না আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তাই সে ওই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের দিয়ে বিলিতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিয়ে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করতে চেয়েছিল। তার সঙ্গে কিছু প্রতিষ্ঠাও হয়তো কাম্য ছিল। এবং সারকেল অফিসার থানা অফিসার যখন দাদা পুরঞ্জনকে বলেছিল—আপনার এলাকায় ছেলেরা আপনার কথা না মেনে আপনার ছোট ভাইকে মানবে এটা মশাই যেন কেমন লাগে। মনে হয় আপনিই এসব ভাইকে দিয়ে করাচ্ছেন। এর সঙ্গে সারকল অফিসার গণি বলেছিলেন—আপনাকে রায়সাহেব করার কথা মাঝে মাঝে ওঠে পুরঞ্জনবাবু। কিন্তু এসব করলে—।

ওই ওতেই বিচিত্র ভাবে একদা স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে উঠল যে নতুন এবং পুরনো দুটো কালে বিবাদ বেধে গেছে ; দেশে নয়, দেবগ্রাম গ্রামে চৌধুরীদের বাড়ীতে। বাড়ীটাই দু'ভাগ হয়ে গেল। হল ওই ঘটনাটিকে অবলম্বন করে। অথবা আজকে এই যা ঘটেছে—সেই ঘটনাটির সূচনা হয়েছিল সেই দিন।

* * *

পুরঞ্জন চৌধুরী শুধু ক্ষুব্ধই হয় নি। ক্রুদ্ধও হয়েছিল। ছোট ভাইটার জন্য সে তো কম করে নি। এণ্ট্রান্স ফেল এই নিরঞ্জন খোকা নয়, বয়স তার বেশ হয়েছে। দুই ছেলে এক মেয়ের বাপ। ছেলেরা বড় হয়েছে, বড় ক্লাস নাইনে পড়ছে। অবশ্য অল্প বয়সে ছেলে হয়েছে। তা হোক। খোকা সাজলে চলবে না। ছেলের বাপকে মনে রাখতে হবে যে সে ছেলের বাপ। এ কাল পর্যন্ত পুরঞ্জনই এস্টেট চালিয়ে আসছে। যোগ্যতার সঙ্গে চালাচ্ছে। তাদের জ্ঞাঠতুতো ভাইদের সম্পত্তি দু পয়সা চার পয়সার ক'রে সাপের হরিণ গেলার মত গিলছে। জমিদারী বেড়েছে জমি বেড়েছে। এসব পুরঞ্জন নিজের একার জন্য করে নি। দুই ভাই ভাগ করে নেবে বলেই সে দুই ভাইয়ের নামে কিনেছে। নিরঞ্জন এণ্ট্রান্স ফেল ক'রে ঘরে ব'সে কিছুকাল ফুটবল খেলে বেড়িয়েছে। আর গানবাজনা। তবলা পাখোয়াজে পাকা বাজিয়ে। গানও গায়। তারপর ১৯১৫।১৬ সাল থেকে মেতেছে থিয়েটারে। বর্ধমান শহরের মহারাজার থিয়েটারে পার্ট ক'রে সে নাম করেছিল। তাতে খুশী হয়েছিল পুরঞ্জনবাবু এবং গ্রামে শহরের থিয়েটারেরও পত্তন করেছিল। বাড়ীতে পিতামহ রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করে দেবোত্তর সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই দেবোত্তরের টাকায় চলত থিয়েটার। রাধাগোবিন্দের দোলযাত্রা রাসযাত্রা উপলক্ষে উৎসব হ'ত—সেই সময় দেবগ্রাম রাধাগোবিন্দ থিয়েটার তিন দিন তিন দিন ছ দিন অভিনয় করত। কলকাতা থেকে ছেলে আনতে হ'ত মেয়ে সাজবার জন্যে। যে ভাইয়ের জন্য এত করেছেন পুরঞ্জন সেই ভাই এইভাবে বাঁকা পথে বিরোধিতা করছে এ কথা জেনে তার ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হবারই কথা। দারোগা এবং সার্কেল অফিসার দুজনেই বলে গেল—এ রিপোর্ট আই. বি-র রিপোর্ট। এ-খবর মিথ্যে হয় না, হ'তে পারে না।

ভাইকে ডেকে পুরঞ্জন বললে—তুই এত বড় কুটিল শয়তান? এত নীচ হ'তে পারিস তুই?

নিরঞ্জন চমকে উঠেছিল।—কি বলছ! কি করেছি?

—কি বলছি? তুই অস্বীকার করতে পারিস, দুগাই মিস্ত্রির দোকানে যারা বিলিতী কাপড় কেনার বিরুদ্ধে পিকেটিং করছে তাদের পিছনের লোক তুই?

অবাক হয়ে নিরঞ্জন বলেছিল—হ্যাঁ তা অস্বীকার করব কেন? আছিই তো।

—কেন আছিস?

—কেন আছি? এটা আবার কোন প্রশ্ন হতে পারে নাকি?

—কেন? পারে না কেন?

—না, পারে না। কারণ আমরা জমিদারবংশের ছেলে জমিদার,—আমাদের টিকি বাঁধা আছে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের কাছে। আমরা জমিদারী আইনে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করতে বাধ্য। তিন নম্বর হল আমি যতদিন সংসারের কর্তা এবং আমি যতদিন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট—ততদিন এ বাড়ীর কেউ গভর্ণমেণ্টের বিরোধীদের দলের খাতায় নাম লেখাবে তা হবে না।

নিরঞ্জন বিস্মিত হয়ে বলেছিল—তুমি যে নিজে স্বদেশী স্বদেশী কর, স্বদেশী কাপড় পড়, স্বদেশী জিনিস ব্যবহার কর?

বাধা দিয়ে পুরঞ্জন বলেছিল—সে আলাদা কথা। তার সঙ্গে আন্দোলন করার কোন সম্পর্ক নাই।

কথার মাঝখানে নিরঞ্জন কিছু বলতে চেয়েচিল কিন্তু পুরঞ্জন হাত নেড়ে বলেছিল—থাম্ থাম্—শোন্ শোন্—যা বলছি শোন্। বুঝিস তো ছাই। নটোগিরি আর আড্ডা দিয়ে তো দিন কাটাস। গভর্ণমেণ্টের খাতায় বাবার আমল থেকে আমাদের নাম আছে; খেতাব দেবার কথা ছিল বাবাকে কিন্তু বাবা মরে গেলেন হট ক'রে। আমাকে সার্কল অফিসার বলে গেছেন—

—ও—: তাই বুঝি এত দরদ!

পাকা সিরিও-কমিক এ্যাক্টরের অ্যাক্টিংএর সুরে নিরঞ্জন এবার ওই '—ও—' শব্দটি উচ্চারণ করেছিল যে তাইতেই চৌধুরীবাড়ীর জীবননাট্য—একটি অঙ্কের সমাপ্তি ঘটে যবনিকাপাতের মত একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে গিয়েছিল।

অর্থাৎ এতেই চৌধুরীবাড়ীর শেষ সম্পন্ন এবং বিত্তমান বাড়ীটিও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

তা গেল, কিন্তু তার ফলটা নিরঞ্জন চৌধুরীর পক্ষে ভাল হ'ল না। সে একেবারে একলা পড়ে গেল। নিরঞ্জনের স্ত্রী—বড়ভাই পুরঞ্জনের স্ত্রীর খুড়তুতো ভাই এবং পুরঞ্জনের স্ত্রীর মেসোমশাই সেকালের একজন নামজাদা লোক। এম-এ পাশ; অধ্যাপনা ছেড়ে কয়লার ব্যবসা ক'রে মস্ত ধনী হয়েছেন। একজন খেতাবধারী রায়বাহাদুর। লাটসাহেবেরাও তাকে সম্মান করে। এই কারণেই নিরঞ্জনের স্ত্রী—স্ত্রী পুত্র শ্বশুর শাশুড়ী সহোদর থেকে সহোদরের এই খেতাবধারী মাসশ্বশুর পর্যন্ত তাকে প্রায় একা ফেলে তাকে অনুভব করাতে চেয়েছিল—সে ভুল করেছে। তাতেও কিন্তু নিরঞ্জন ভুল স্বীকার করে নি। সে স্ত্রী পুত্রদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেই জীবনে আঁকড়ে ধরেছিল—আপন জেদে। চাষবাসে মন দিয়েছিল, থিয়েটারকে খুব জাঁকজমক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিল। তাতে তার বেকার ছেলের দলের চেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। শুধু চেলার সংখ্যা বাড়াই নয়—কয়েকটা সে-আমলের স্বদেশী নাটক ক'রে সে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সে জনপ্রিয়তা চিন্তিত করেছিল পুরঞ্জনকে। তিনি গুজব শুনছিলেন ১৯২৪।২৫ সালে ইউনিয়ন বোর্ড ইলেকশনে নিরঞ্জন তার সঙ্গে ভোটযুদ্ধে যুদ্ধ দেবে। সে থিয়েটার বন্ধ করবার জন্য ফন্দি খুঁজে বের করলে। দেবোত্তর থেকে থিয়েটারের খরচা দেওয়া হবে না। আমোদ-আহ্লাদের জন্য সামান্য খরচ করে কীর্তন-

যাত্রা করিয়ে বাকী টাকায় একটা প্রাইমারী গার্লস স্কুল খুললে। পুরঞ্জন চৌধুরীর ওই মেসোমশাই গভর্ণমেণ্ট থেকে এড সংগ্রহ করে দিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এনে ধুমধাম ক'রে সভা-সমিতি করালেন। তিনজন শিক্ষয়িত্রী এল। দুজন প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্ত—একজন বয়স্কা মহিলাদের সেলাই এবং জামার ছাঁটকাট শিক্ষা দেবার জন্তে। নিরঞ্জন চুপ ক'রে বসে রইল না, বিচিত্র ভাবে—সে আপনার পথে আপনি আবিষ্কার ক'রে নিলে; জল যেমন ঢালের মুখে আপনি এঁকে-বেঁকে—সে সামনেই চলে—ঠিক তেমনি ভাবেই তার এ পথ চলার পথে গতির বেগে আপনা থেকেই তৈরী হয়ে গেল। দাদার সঙ্গে ভিন্ন হয়ে—সে মন দিল চাষবাসে, আর থিয়েটারের রুচিতেই সে ওই থিয়েটারটিকে শুধু থিয়েটার না রেখে তার সঙ্গে লাইব্রেরী জুড়ে এবং একটা ফুটবল ক্লাব জুড়ে দিয়ে তৈরী করে ফেললে পূর্ণাঙ্গ একটি ক্লাব। তার সঙ্গে মাস'স্তে পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় পূর্ণিমা-মিলন বলে আলোচনা বৈঠক বসাতো। আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু তখনকার কালে ছিল দুটি। প্রথম স্বাধীনতা,—প্রথম পরাধীনতা থেকে মুক্তি, দ্বিতীয় সামাজিক শাসন থেকে মুক্তি। নিজের স্ত্রী-পুত্রদের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করেই নিরঞ্জন পথে নেমেছিল এবং চলেছিল। ঘরের মজুত ধান সব বিক্রি করে—ধারদেনা করেও তার চৈতন্ত হয় নি। একটা জেদ চেপে গিয়ে সেই জেদের বশেই সে চলেছিল সর্বজন-পরিত্যক্ত সংকীর্ণ একটি গ্রাম্য নালা বা খালের অগভীর স্রোতে নিজের জীবনের নৌকাখানি ভাসিয়ে, বুক দিয়েই প্রায় ঠেলে নিয়ে চলেছিল। ঠিক ছিল না বৈতরণীর কোন ধারায় গিয়ে মিশবে। কারণ শোনা যায় বৈতরণীর দুটি ধারার একটি ধারা নিয়ে গিয়ে ফেলে অন্ধকার অস্বাচ্ছন্দ্যের লোকে—অন্যটি নিয়ে যায় স্বর্গে না হোক স্বর্গের বন্দরে।

১৯২৪ সাল পর্যন্ত আর একটা মোড় ঘুরল। একলা নিরঞ্জনেরই নয় সকলেরই জীবনে।

১৯২৪ সালে এল দ্বিতীয় বারের লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ইলেকশন। তখন এ্যাসেমব্লী ছিল না—তখন ছিল কাউন্সিল। ১৯২১ সালের প্রথম ইলেকশনে কংগ্রেস ভোটে নামে নি। নামল দ্বিতীয় বারে; ১৯২৪ সালে। বর্ধমানের এলাকায় ভোটযুদ্ধ তাদের মাতাতে পারে নি। মাতিয়েছিল—বীরভূমের ভোটযুদ্ধ। অজয় নদীর দক্ষিণ দিকে বাঁধের গায়ে তাদের গ্রাম। আর নদী পার হয়ে ওপারে উত্তরপারে বীরভূম এবং ওই উত্তরপারেই ছিল চৌধুরীদের জমিদারী পত্তনী এলাকা। বীরভূমে সেবার দাঁড়িয়েছিলেন একজন রায়বাহাদুর এবং একজন রাজাবাহাদুর। রাজাবাহাদুরের ম্যানেজার এবং সর্ব যজ্ঞে কর্মকর্তা ছিলেন তাঁর পিসতুতো ভাই একজন জমিদার—অবনীশ রায়। কংগ্রেস কোন প্রতিনিধি পায় নি। কিন্তু হঠাৎ ওই ইলেকশনের কোন একটা ব্যাপার নিয়ে রাজাবাহাদুরের ক্রোধ হ'ল তাঁর পিসতুতো ভাইয়ের উপর। বিরোধটা হঠাৎ এমন দাবানলের মত জলে উঠল যে দাউ দাউ ক'রে জলতে জলতে এই রায়মশায়ই রাজ এস্টেট ছেড়ে—ইলেকশনের কর্তৃত্ব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—সটান গিয়ে উঠলেন—বিপিসিসি অফিসে। এবং কংগ্রেসের সভ্য হয়ে—বীরভূম জেলা থেকে কংগ্রেস নমিনি হিসেবে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ রথী হয়ে ফিরে এলেন। ট্রাঙ্গুলার ফাইট হয়ে গেল।

নিরঞ্জনের দাদা পুরঞ্জনের সেই খ্যাতনামা মামাশ্বশুর তাঁর বন্ধু রায়বাহাদুরের পক্ষ নিয়ে পুরঞ্জনের বাড়ী এলেন। তাকে নিয়ে বীরভূমের অজয় তীরবর্তী এলাকাগুলো ঘুরলেন। এবং পুরঞ্জনকে সব কাজের ভার দিয়ে গেলেন। আপিস পর্যন্ত খোলা হয়ে গেল। মাইনে ক'রে দু'তিনজন বেকারকে বসানো হ'ল।

নিরঞ্জন তার বাইসিক্ল নিয়ে অজয়ের উত্তর তীর থেকে সিউড়ী—সে অনেক কয়েক ক্রোশ পথ—সেখান পর্যন্ত গিয়ে সিউড়ি বীরভূম কংগ্রেস আপিস থেকে কংগ্রেসপ্রার্থী রায়মশায়ের নির্বাচন ব্যবস্থার সকল ভার নিয়ে ফিরে এল। শুধু তাই নয় পরদিন বর্ধমান শহরে বর্ধমান জেলা কংগ্রেস আপিসে গিয়ে—নগদ চাঁদা দিয়ে নিজে কংগ্রেসের সভ্য হল, তার সঙ্গে তার ক্লাবের অনুগত সব ছেলেগুলির নামে রসিদ কাটিয়ে—দেবগ্রাম কংগ্রেস কমিটি ফর্ম করে, বাজার থেকে একটা সাইন বোর্ড লিখিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরল রাত্রি প্রায় দশটায়।

ভাই তো বিরোধী ছিলই। সেই বিরোধ থেকেই এত কাণ্ড। স্ত্রী-পুত্রেরা নিরঞ্জনের তখন খুব ছোট ছিল না। তারাও এতে বিরোধী হয়েছিল। কিন্তু নিরঞ্জন শোনে নি। শোনে নি নয়, কর্ণপাতও করে নি, গ্রাহ্যও করে নি।

একটা যুগের ভাবজীবন যেটা সেটাই হ'ল মানুষের জীবনস্রোতের শক্তির সৃষ্টি। তীর এবং তরঙ্গের সংঘর্ষে তার উদ্ভব। যেখানটিতে কোন একটি বিশেষ কিছু ঘটে সেখানেই গঙ্গার ঘাটের মত ঘাটের সৃষ্টি হয়।

এই ঘটনার মধ্যে বড় ঘটনা হল—বহুর জীবনস্রোতে একটি কোন বিশেষ স্রোতের ধারায় মিশে যাওয়া। নদীর দুই কূলের জল—কূল ভাসিয়ে নদীতে এসেই পড়ে। কিন্তু যেখানে সেই কূলের জল অন্য একটি স্রোতকে সৃষ্টি করে—সেই ধারা বেয়ে এসে নদীতে পড়ে তখনই হয় সংগম তীর্থ। যুক্তবেণী। আবার সেই স্রোত ছেড়ে যখন কোন স্রোত বেরিয়ে সাগর-সন্ধানে ছোটে তখন সেটা হয় মুক্তবেণী।

যে ধারা মরুপথে হারা হয় সে ধারা অভিশপ্ত।

যে ধারা সাগর পর্যন্ত যায় সে ধারা—

থাক।

সেদিনের কথাই বলি। সেদিন নিরঞ্জন জনতার জীবনস্রোতে এসে মিশেছিল অনেকগুলি জীবনের জলধারাকে নিয়ে। লোকে নিরঞ্জনের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছিল।

*　　*　　*

১৯২৪ সালে কংগ্রেস বীরভূমে জিতেছিল।

রায়বাহাদুর রাজাবাহাদুর দু'জনকেই হারিয়ে জিতেছিলেন রায়মশায়। সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জনও বিখ্যাত হ'ল। তাকে রায়মশাই ভালবেসেছিলেন। রায়মশায়কে ভালবাসতেন—দেশবন্ধু। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ডান হাতের মত তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত অবনীশ রায় অহরহই পাশে থাকতেন। স্বর্গীয় জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গীয় সত্যেন মিত্র তাঁরা অবনীশ রায়ের

সঙ্গে তাঁর বাড়ী আসতেন। বীরভূমে সভা-সমিতি ক'রে বেড়াতেন। নিরঞ্জন তাঁদের সঙ্গে ঘুরত। এবং তার আগ্রহাতিশয্যে দু'চার বার দেবগ্রামেও এসেছিলেন।

নিরঞ্জন ক্রমে ক্রমে কলকাতায় পরিচিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র কিরণশঙ্কর যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি-দের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিল। দেশবন্ধুর তিরোধানের পর যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের দলের সঙ্গে থাকতেন। ১৯৩০ সালে নিরঞ্জন চৌধুরী আইন অমান্যও করেছিলেন কিন্তু জেলে যান নি। তা বলে বণ্ড বা দাসখত লিখে ছাড়ান নিয়ে ঘরে ঢোকেন নি। নিরঞ্জন চৌধুরী ছিলেন পাক্কা জ-জো-ম অর্থাৎ জমিদার জোতদার ও মহাজন; টেনেন্সী অ্যাক্ট থেকে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড, ছেলেবয়েস থেকে বাড়ির গাইয়ের দুধ, বাড়ির পিছনের কৃষ্ণসায়রের জল এবং মোকররী মৌরসী স্বত্বের জমির গোবিন্দভোগ চালের সঙ্গে এবং ক্ষেতের গুড় ও পুকুরের মাছের সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন। সেই আইন-জ্ঞানের বলে দস্তুরমত মামলা লড়ে ভারত সরকারকে হারিয়ে দিয়ে খালাস পেয়ে বাড়ি এসেছিলেন। এত কথায় হয়তো প্রয়োজন হত না কিন্তু এই কথা বা এই অতীত ঘটনাগুলির সঙ্গে অংশুমানের জীবনের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; এমনই ঘনিষ্ঠ যে এই ঘটনাগুলি না ঘটলে অংশুমান হয়তো এ সংসারে আসত না, এবং তার মতিগতি প্রকৃতি ঠিক এমনই হত না।

১৯৩০ সালে দেবগ্রাম গ্রামে ১৪৪ ধারা জারি করে সভা সমিতি মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারের খেয়াল ছিল না যে দেবগ্রাম গ্রামখানি সরকারী খতিয়ান অনুযায়ী একটি মৌজা নয়; সদর রাস্তার উত্তর দিকে একসারি বসতি এবং থানাটিই হল সরকারী খতিয়ান অনুসারে দেবগ্রাম। সদর রাস্তাটি থেকে দক্ষিণ দিকে গোটা গ্রামটি হল অন্য একটি মৌজা—তার নাম চক দক্ষিণপাড়া—এবং এইটিই মূল বসতি।

নিরঞ্জন চৌধুরী প্রসেসন নিয়ে গেলেন সদর রাস্তার উপর দিয়ে, থানার সামনে দিয়ে। থানার দারোগা নিরঞ্জন চৌধুরী এবং তাঁর সঙ্গে আরও চারজনকে অ্যারেস্ট করে প্রসেসন ভেঙে দিলে। এখন ১৪৪ ধারা অমান্যের জন্যে মামলা করলে। চৌধুরীর জেলে যাওয়াই ঠিক ছিল। কিন্তু ওই আইনের ফাঁকটা হঠাৎ মনের চোখের সামনে একদিন তাকে-ফেলে-রাখা দুর্লভ বস্তুটির মত চোখে পড়ল; চৌধুরী তাকে উপেক্ষা করলেন না। জামিন নিলেন। উকীল দিলেন। এবং প্রমাণ করে দিলেন, তিনি প্রসেসন নিয়ে গেছেন,ধ্বনি তুলেছেন সবই করেছেন আইনসংগত ভাবে। কারণ ১৪৪ ধারা জারি আছে দেবগ্রামে। তিনি প্রসেসন নিয়ে গেছেন যে রাস্তার উপর দিয়ে সে রাস্তায় দেবগ্রামের এক ইঞ্চি জমি বা সীমানা নেই। পুলিস তাঁকে বা তাঁদের অ্যারেস্ট করে বেআইনী এবং সাম্রাজ্যবাদী খামখেয়ালী অত্যাচারের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আদালত চৌধুরীকে এবং তাঁর সহকারীদের সসম্মানে ছেড়ে দিয়েছিলেন। দু'চারটে সকৌতুক মন্তব্যও করেছিলেন। কিন্তু সে কথা থাক। ব্যাপারটার ওখানেই শেষ নয়। চৌধুরীরা মামলায় খালাস পেলেন বটে কিন্তু গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রী কুমারী শোভা চক্রবর্তীর চাকরিটি গেল।

মেয়েটি মাস ছয়েক আগে সরোজনলিনী মেমোরিয়াল জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠানে পড়ে পাস করে দেবগ্রামে চাকরি নিয়ে এসেছিল; বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশও হয় নি। অল্প বয়সের চাপল্যবশে

বা তারুণ্যধর্মের দুঃসাহসবশে মেয়েটি কংগ্রেসের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রেখে তাদের সাহায্য করছিল।

কথাটা কিন্তু গোপন রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও অগোচর কারুর ছিল না। তার কারণ শোভা চক্রবর্তী নাটকাভিনয়ের মুগ্ধা ভক্ত ছিল—উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত। এবং নিরঞ্জন চৌধুরীর লেখা নাটক একখানি ওই শোভা চক্রবর্তী কপি করে দিয়েছিল। এবং এর জন্য শোভা চক্রবর্তীকে কেউ নিন্দা বা অশ্রদ্ধাও করে নি কিন্তু একখানা বেনামী দরখাস্ত গিয়েছিল পুলিসসাহেবের কাছে এবং ডিস্ট্রিক্ট ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুলের কাছে যে শোভা চক্রবর্তী শুধু গোপনে কংগ্রেসকে সাহায্যই করছে না, নিরঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে তার যে যোগাযোগ ও মেলামেশা তা অত্যন্ত আপত্তিজনক।

তদন্ত একটা হল এবং শোভা চক্রবর্তীর চাকরিও গেল। কিন্তু শোভা চক্রবর্তী দেবগ্রাম থেকে গেল না। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের বাসা থেকে সোজা এসে উঠল নিরঞ্জন চৌধুরীর বাড়ির অন্দরমহলে। নিরঞ্জন চৌধুরী টোপর মাথায় দিয়ে শোভা চক্রবর্তীকে বিয়ে করলেন।

নিরঞ্জন চৌধুরীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী পুত্র কন্যারা ঘরে প্রবল প্রতাপেই দখলিকার ছিলেন। দরখাস্তটা তাঁদের দিক থেকেই হয়েছিল ; বড়ছেলের বয়স তখন বাইশ-তেইশ। বি. এ. পাস করে ল পড়ছিল। মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। ছোটছেলে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ত। তারা প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছিল এ বিয়ের পথে কিন্তু নির্বন্ধ,—সে নির্বন্ধ যারই হোক সে এমনি যে তাকে রোধ করা যায় নি। নিরঞ্জন চৌধুরী শোভাকে বিবাহ করলেন জেলা কংগ্রেসের আপিসের বাড়িতে ছাঁদনাতলা পেতে এবং জেলার ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের খাতায় সই করে। বছরখানেক থাকলেনও সদরে বাসা ভাড়া করে। সেই বাসাতেই সেই বছরের মধ্যে জন্ম হয়েছিল অংশুমানের। অংশুমানকে কোলে করে অংশুর মা মাথায় নামমাত্র ঘোমটা দিয়ে দেবগ্রামের চৌধুরীবাড়ির ছোট তরফে আর একটা ছোট তরফের সৃষ্টি করে সেইতরফে এসে ঢুকেছিল।

নিরঞ্জন চৌধুরীর বৈঠকখানাবাড়ির পশ্চিমদিকে কুলিরাস্তার পশ্চিমদিকে ছিল সাবেক অন্দরমহল—এবার চৌধুরী বৈঠকখানার পূবদিকে কৃষ্ণসায়রের পাড়ে নতুন একটা ছোট দোতলা বাড়ি তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন, সেই বাড়ি হল ছোট তরফের ছোট তরফ।

* * *

অন্ধকার এবং আলো, আলো এবং অন্ধকারের মত পর পর জীবনের মধ্যেকার ফাঁকি মেকী নকল আর সত্য ও আসল নিয়ে টানাপোড়েন দিয়ে তৈরী হয় বোধ করি ইতিহাস। আজ সৃষ্টির বিচিত্র ভঙ্গিতে অংশুমান দেখছিল শুধু ফাঁকি মেকী এবং নকলের দিকটাই। মনে হচ্ছিল সব ফাঁকি সব ফাঁকি সব ফাঁকি। না। না। এমন ক'রে দেখলে চলবে না। না। ভগবান তুমি ক্ষমা কর।

নিরঞ্জন চৌধুরীর বড়ছেলের নাম রমারঞ্জন, ছোটর নাম রাধারঞ্জন। নিরঞ্জন তাঁর ছোটছেলের নাম রাখতে চেয়েছিলেন সুরঞ্জন। তখন এক বছর শোভা চক্রবর্তীর সঙ্গে ঘর করে রমা রাধা কৃষ্ণ কালী প্রভৃতি নামগুলি তাঁর কানে যেন কেমন-কেমন ঠেকতে শুরু

করেছে এবং রঞ্জন শব্দটিতে সু যোগ করে নামটিকে আধুনিক করে নেবার মত মন ও রুচিও হয়েছে চৌধুরীর। কিন্তু শোভা তার ছেলের নাম সুরঞ্জন রাখতে দেয় নি। সে চায় নি যে তার ছেলের সঙ্গে বড়গিন্নীর ছেলেদের নাম বা প্রকৃতির বা রুচির বা কোন কিছুর সঙ্গে এতটুকু মিল থাকবে। সে নিজেই পছন্দ করে নাম রেখেছিল—অংশুমান।

শোভা চৌধুরী বাড়িতে পড়ে একে-একে আই. এ. তারপর বি. এ. পাস করেছিল এবং গার্লস স্কুলের সেক্রেটারী হয়েছিল। চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীর মেম্বর হয়েছিল। এবং অংশুমানকে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলেছিল। তাঁদের আদর্শমত মানুষ করতে চেয়েছিল। তাতে এতটুকু ফাঁকও ছিল না। ফাঁকিও ছিল না।

* * *

সব মনে পড়ছে। এবং কিছুতেই একে বাঁকা চোখে দেখতে পারছে না। ১৯৪৭ সাল—তখন তার বয়স ষোল। তখনও পর্যন্ত সে ছিল নিষ্পাপ। হ্যাঁ, নিষ্পাপ অনায়াসে তাকে বলা যায়। ইস্কুলে পড়াশোনায় ভাল ছিল। কবিতা লিখত। ভাল আবৃত্তি করত। কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করে জেলার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সে মেডেল পেয়েছিল। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাতেও দ্বিতীয় হয়েছিল। তা ছাড়া সে তকলীতে সুন্দর সুতো কাটত।

তার বাবা মামলা করে জেল যাওয়া এড়িয়েছিলেন কিন্তু সুতো কাটতেন খদ্দর পরতেন, জাতিভেদ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মত পোষণ করতেন, বক্তৃতা করতেন; সকল লোকের—অন্ততঃ যারা পরিচ্ছন্ন তারা যে জাতের লোকই হোক—তাদের বাড়িতে জল খেতেন। জমিদারী জোতদারী ও মহাজনীর ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম আইনের উপর চলতেন। ঠকিয়ে কাউকে নিতেন না এবং যেটুকু ন্যায্য পাওনা সেটুকুও ছেড়ে দিতেন না। গান্ধীজীর দৃষ্টান্তে মাছ মাংস খেতেন না। পূজা উপাসনা করতেন। তার এই বাবার অনুসরণে সেও তকলীতে সুতো কাটত, খদ্দর পরত, সকলজনের বাড়িতে এবং হাতে জল খেত। সেও মাছ মাংস খেত না।

তার মা গান্ধীবাদকে উপেক্ষা করতেন না কিন্তু তাঁর গান্ধী-মতবাদে কিছু উগ্রতা ছিল। পূজাটা তিনি পছন্দ করতেন না। বাড়ির দেবোত্তরের যা কিছু পর্বপার্বণ তা পালিত হত ছোটবাড়ির বড় তরফে—ছোট তরফ তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখত না। সভাসমিতি করেই শোভা চৌধুরী বেশী বেড়িয়েছিলেন ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। তারও আগে শান্তিনিকেতন গেছেন—রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, প্রণাম করেছেন। অংশুমানের মা কখনও একটি সোনার গহনা ছাড়া দ্বিতীয় সোনার গহনা পরেন নি। সেটি হল সোনায় মোড়া বিয়ের লোহার বেড়খানি, তাছাড়া ডান হাতে থাকত সাদা শাঁখা। বাঁ হাতেও শাঁখা থাকত। কিন্তু বাইরে যাবার সময় খুলে ফেলে ঘড়ি বাঁধতেন। মাথায় সিন্দূর ভাল বোঝা যেত না কিন্তু কপালে সিন্দূর বা কুমকুমের টিপটি থাকত নিখুঁত সুন্দর। অংশুমান প্রায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকত।

মা শোভা চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষা ছিল ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ড করে। কিন্তু তা হয় নি—ফার্স্ট ডিভিসনে তিনটে লেটার নিয়ে পাস করেছিল। সংস্কৃত বাংলা অঙ্ক। ইংরিজীটায়

কম নম্বর হয়েছিল—না হলে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপটা নিশ্চয় পেত। জেলায় সে সেকেণ্ড হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করে কলকাতায় পড়তে এল। কলকাতায় তখনও হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা চলছে একটা সুদীর্ঘ খাণ্ডবদাহনের মত। বনে আগুন লাগার সঙ্গে এই দাঙ্গার যত মিল তত আর কিছুর সঙ্গে হয় না। কখনও দাউদাউ করে জ্বলে, কিছুক্ষণ জ্বলে, জ্বলা শেষ হয়, সেখানটায় আগুন নেভে কিন্তু দেখতে দেখতে আর এক জায়গায় জ্বলে ওঠে; এখান থেকে যে সব আগুনের টুকরো বা ফুলকি উড়েছে তা গিয়ে অন্য এক বা দু'তিন জায়গায় ঘাসের মধ্যে পড়ে আগুন জ্বালিয়েছে। জ্বলতে জ্বলতে আজও জ্বলে চলেছেই। শুধু এইটুকুই নয়। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বিরাট বিশ্বযুদ্ধ হয়ে শেষ হয়ে গেল। দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা গান্ধীবাদী আন্দোলন গেল। সুভাষচন্দ্র কলকাতা থেকে বার্লিন—সেখান থেকে সিঙ্গাপুর টোকিয়ো হয়ে কোহিমা এলেন। নেতাজী হলেন। বাংলাদেশে সাইক্লোন হ'ল; বন্যা হ'ল। দুর্ভিক্ষ হ'ল। কালোবাজার পর্দা খুললে। দেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলন প্রবল হ'ল। হ'ল অনেক। আদর্শবাদ ভেঙে গেল।

চিন্তিত নিরঞ্জন ও শোভা দুজনে পরামর্শ করে ছেলেকে এনে শোভার এক দিদির বাড়িতে রেখে গেলেন। শোভার ভগ্নীপতি পুলিস কোর্টের উকীল। ভালো উকীল। সংসারটি পরিচ্ছন্ন। ছেলেরা সব চাকরে। বিদেশে বিদেশে ঘোরে। বাড়িতে থাকবার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী অর্থাৎ শোভার ভগ্নীপতি এবং শোভার দিদি। থাকার ব্যবস্থা অত্যন্ত সম্মানজনক। মাসে মাসে একটি বেশ ভালো টাকা নিতে হরিচরণবাবু আপত্তি করেন নি। এ ছাড়া লোকজন আসা যাওয়ার মারফৎ তরিতরকারি টাটকা মাছ এবং মিহি চালের উপঢৌকন আসত। ১৯৪৬।৪৭ সাল। তখন সারা বাংলাদেশেই চালের অভাব হয়েছে। গম খেতে হচ্ছে এক.বেলা। কলকাতা শহরে যারা ৪২।৪৩ সালে এসে 'একটু ফেন দেবে মা?' 'দুটো এঁটোকাঁটা?' বলে দোরে দোরে ফিরত তারা, মরেও শেষ হয় নি, দেশে ফিরেও যায় নি, চুপও হয় নি। বরং তাদের দল পুরু হয়েছে, প্রতি বছরে বর্ষার সময় গ্রাম থেকে নতুন নতুন লোক এসেছে।

মা শোভা চৌধুরী যাবার সময় বলে গেছলেন—মন পাতিয়ে পড়। সাবধানে থাকিস। মুখটা আমার উজ্জ্বল করিস। আমার অনেক আশা। তোর বাপেদের গুষ্টির ওই গেঁয়ো জমিদার দেবগ্রামের দেবতা হোস নে যেন। তোর বাপ যে কি ছিল সেকালে, ধারণা করতে পারবি নে। ওই তো মুখের সামনে বলছি। নিজের দাদাদের বড়মায়ের ছেলেদের তো দেখেছিস। বড়দার মত যদি সস্তাগণ্ডার উকীল হোস তাহলে কিন্তু আমি গলায় দড়ি দেব।

বাপ বলেছিলেন—She is right. দেখ আমি মহাত্মাজীর শিষ্য। বুঝেছ। হয়তো ঠিক পারি নে। তবু মনে মনে আমি তাই। একটা বড় কিছু হও তুমি। আর সাবধানে থেকো। দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছে। মানুষের জীবনের কোন দাম নেই। সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ঢুকো। মাসীমা মেসোমশাইকে যা হবে সব বলবে। ওঁদের অকারণে ভাবাবে না।

And be a good boy—ভবিষ্যতে যাতে man হতে পার। Either a leader or an I. A. S.

হানাহানি হাঙ্গামার মধ্যে সে কলকাতা এক আশ্চর্য কলকাতা। অন্ততঃ তাই দেখেছিল অংশুমান। এক আশ্চর্য কলকাতাকে দেখেছিল।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে তখন মানুষ প্রায় পাগল হয়ে গেছে। বিষপ্রয়োগের ফলে একটা গোটা জাত যেন বিষজর্জরতায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। বিচারবোধ বিবেচনাশক্তি বিষাক্ত হিংসার কাছে পঙ্গু, বোবা। কিন্তু তারও মধ্যে মধ্যে বিচিত্র মানুষ অকস্মাৎ এসে দাঁড়াচ্ছে। নোয়াখালি থেকে অত্যাচারিতেরা এখানে এসেছে। মুসলমানেরা হিন্দু পাড়া থেকে চলে গিয়ে মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে দলে ভারী হয়ে বাস করছে; হিন্দুরা যারা মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে ছিল তারা হিন্দু পাড়ায় এসে জমেছে। বস্তির মানুষেরা এক একটা আশ্রয়ে গাদাগাদি হয়ে দিন কাটাচ্ছে। বীভৎস সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে একটা যেন বড় কিছু করার মত ভাব বা ভঙ্গি ছিল। এরই মধ্যে নেতারা অহরহ ব্যস্ত। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগকে নিয়ে লর্ড ওয়াভেল ও তারপর লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কথাবার্তা বলছেন। ইংরেজ চলে যাবে বলছে—কিন্তু কাকে দিয়ে যাবে ভারতবর্ষের ভার। সারা ভারতবর্ষ দুর্দশার মধ্যে চরম আত্মঘাতে লিপ্ত থেকেও মনে করছে তারই মধ্যে আছে কল্যাণ এবং মুক্তি।

মেসোমশায় হরিচরণবাবু তখন খুব ব্যস্ত। পুলিস কোর্টের উকীল। সে-সময় পুলিস দাঙ্গার জন্যে যাকে পারছে তাকেই ধরছে। গুণ্ডারা যারা পাকা দাঙ্গাবাজ তারা গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছে। তারা ছাড়া পাড়ায় পাড়ায় যে-সব তরুণেরা প্রথমে আত্মরক্ষার তাগিদে পরে প্রতিশোধ নেবার ডাকে সাড়া দিয়ে মালকোঁচা মেরে দাঁড়িয়েছে তারাই ধরা পড়ছে বেশী। এই দিক থেকে পুলিস কোর্ট এবং ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের উকীলদের কাজের খুব ভিড় পড়েছে। এবং এই সব নিয়ে আলোচনারও শেষ নেই। সে-আলোচনা উঁচু পর্যায়ের দার্শনিক আলোচনা নয়, বৃহত্তর জীবনের ন্যায়-অন্যায় নিয়ে আলোচনা নয়। সে-আলোচনা একেবারে যা পথে-ঘাটে ঘটছে তাই নিয়ে আলোচনা।

এরই মধ্যে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে স্বাধীন হবে ঠিক হল। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন যেন পূর্ণিমায় সমুদ্রের মত উথলে উঠল। এবং তারই মধ্যে একদিন সে দেখলে আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন সিপাহীকে। বাগবাজার স্ট্রীটের উপর প্যাণ্ডেল বেঁধে সভা হয়েছিল। বক্তা ছিলেন হেমন্ত বসু। অংশুমান দেখতে গিয়েছিল আজাদ হিন্দ দলের সেই সৈনিকটিকে। কালো রঙ, নির্দোষ সরল মুখ, ফৌজী পোশাক পরে ফুলের মালা পরে বসেছিল। আজ মনে প্রশ্ন জাগে—কি ছিল সে মুখের মধ্যে? আজ তার উত্তরও মেলে;—কিছুই ছিল না। না; তার মুখে কিছুই ছিল না! যা ছিল তা ছিল তরুণ অংশুমানের দৃষ্টির মধ্যে। সে দৃষ্টিতে সে দেখতে পেত স্বাধীন ভারতবর্ষকে। সে স্বাধীন ভারতবর্ষ আশ্চর্য এক ভারতবর্ষ। আজ মনে হয় সে হল তার নির্বোধ এবং মূর্খ মনের অতিহাস্যকর এক কল্পনা। পরীদের ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো কল্পনার মত একটা বোকা এবং ছেলেমানুষী কল্পনা। সে দেখত স্বাধীন ভারতবর্ষ—সত্যবাদী মানুষের দেশ ভারতবর্ষ। অহিংস মানুষের দেশ ভারতবর্ষ। জ্ঞানী

তপস্বীর দেশ ভারতবর্ষ। কম্যুনিস্ট না হয়েও আশ্চর্য এক সাম্যের দেশ ভারতবর্ষ। সে এক অতিবিচিত্র এবং বাস্তবে অতি-অসম্ভব সোনার পাথরবাটি ভারতবর্ষ। সেদিন কিন্তু এতটুকু অসম্ভব মনে হয় নি। এক তিল এক চুল না। বরং চোখের সামনে সে ভারতবর্ষ রূপ নিচ্ছিল—এ সে স্বচক্ষে দেখেছে।

সে বেলেঘাটায় গান্ধীজীকে দেখতে গিয়েছিল। গান্ধীজী তখন বেহার থেকে কলকাতায় এসেছেন। এবং বেলেঘাটায় বিপন্ন মুসলমানদের রক্ষা করবার জন্যে সেখানেই গিয়ে বাস করছেন। মুসলীম লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেব তখন নিজেকে বিপন্ন মনে করছেন। দেশের লোকও ভাবছে এই এত বড় নিষ্ঠুর এবং কুটিল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী এই ব্যক্তিটিকে প্রতিহিংসাজর্জর দেশের মানুষ কিছুতেই নিষ্কৃতি দেবে না। ওদিকে ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের দিন ঠিক হয়ে গেছে ১৫ই আগস্ট। সুরাবর্দী সাহেবও বেলেঘাটায় রয়েছেন গান্ধীজীর কাছে।

সেদিন অংশুমান গান্ধীজীকে দেখেছিল। প্রার্থনা সভার সামনের দিকেই বসে সে সারাক্ষণ ওই বিচিত্র মানুষটির দিকে তাকিয়েছিল।

সেই দিনই গান্ধীজী অনশনের সংকল্প ঘোষণা করলেন। এই হিংসা রক্তপাত বন্ধ না হলে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করবেন।

"রঘুপতি রাঘব রাজারাম" ভজন গানের পর "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব" গানখানি গাওয়া হয়েছিল। সে গান শুনে সে কেঁদেছিল। একা সে নয় আরও অনেকে। অনেকে চোখ মুছেছিল। এবং বুকের ভিতরটা যেন এক পরমাশ্চর্য পরমশুদ্ধ কিছু দিয়ে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল জীবন মন। মনের কাছে অসম্ভব কিছু মনে হয় নি। এবং জীবনোচ্ছ্বাসে দেহের স্নায়ুশিরাগুলি রক্তস্রোতের চাপে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

কলকাতায় ফল হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। বউবাজারের হিংসাশ্রয়ী দলের সব থেকে বড় নায়ক এবং উত্তর কলকাতার হিংসাশ্রয়ী দলের তেমনি একজন নায়ক রাত্রে গান্ধীজীর বাসস্থানে এসে টমিগান পাইপগান পিস্তল শটগান ছোরা ছুরি তলোয়ার সড়কি বর্শার বোঝা এনে তাঁর পায়ের তলায় নামিয়ে দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে যে, তারা নিজেরা আর হিংসা করবে না এবং অন্যদেরও করতে দেবে না। গোটা দেশে সে একটা আশ্চর্য ভাবস্রোত বয়ে গিয়েছিল। যার প্লাবনের মধ্যে সমস্ত ছোট ভাবনা ক্রূর ভাবনা কদর্য ভাবনা চাপা পড়ে গিয়েছিল। একটা পঙ্কিল বিষাক্ত বীজাণু-দূষিত বদ্ধ জলার উপর এই স্রোতটা এসে পড়ে সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

এরপর এসেছিল ক্লাইম্যাক্স।

শচীন মিত্তির স্মৃতীশ বাঁড়ুজ্জে এবং সুশীল স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন নতুন হিংসার আকস্মিক প্রজ্বলনকে নেভাতে গেলেন এবং সেইখানেই ছুরি খেলেন। ছুরি খেয়ে হাসপাতালে এলেন কিন্তু দেশকে বললেন—"এ ওদের মর্মান্তিক ভুল। এ হিংসা নয়। একে ভুলে যাও।"

গান্ধীজী বললেন—শচীন যতীশ সুশীল অহিংসার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল।

মানুষ মরে। মরে শেষই হয়ে যায়। পরলোক নেই—জন্মান্তরও নেই। তবু গান্ধীজীর কথা সেদিন আশ্চর্যভাবে সত্য মনে হয়েছিল।

অংশুমানও পরলোক জন্মান্তর এবং দেবতাকে ঠিক বিশ্বাস করত না। কারণ তার মা এসবে বিশ্বাস করতেন না। দেবোত্তরের কোন দায়িত্ব তিনি নিতেন না। অংশুমানের বড়মা দেবোত্তর চালাতেন এবং দেবোত্তরের আয় আমদানী সব নিতেন তিনি। সে নেহাত তুচ্ছ ছিল না। নাথরাজ বাগান পুকুরের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ যা তাই ছিল দেবতার নামে। বাড়ির দোরে কৃষ্ণসায়র পুকুর এবং পাড়ের উপর কলমের বাগান ছিল ও অঞ্চলের সেরা সম্পত্তি। কৃষ্ণসায়রের জল যেমন ছিল কাজলকালো, মাছ হত তেমনি প্রচুর এবং মাছের স্বাদ ছিল তেমনি মিষ্টি। আর বাগানে ছিল ল্যাংড়া, হিমসাগর, বোম্বাই, ফজলী আমের গাছ—তার সঙ্গে ছিল লিচু পেয়ারা কলসা প্রভৃতি নানান ফলের গাছ। এই সম্পত্তিতে দেবোত্তরের অংশের মতই নিরঞ্জন চৌধুরীর অংশ ছিল আটআনা। সে আটআনার সবটাই নিতেন নিরঞ্জনের প্রথমা স্ত্রী; তাতে অংশুমানের মা আপত্তি করতেন না। নিরঞ্জন চৌধুরী একবেলা খেতেন ও-বাড়িতে একবেলা এ-বাড়িতে। সুতরাং অংশুমানের মা মেনে নেওয়াতেই কোন গণ্ডগোল হয় নি। এবং অংশুমানের মা এমন কড়া ছিলেন এ বিষয়ে যে, অংশুমানকে কোনদিন ও বাগানের একটা ফল বা ঠাকুরবাড়ির কোন প্রসাদের কিছুটাও খেতে দিতেন না। মাছ তো সে খেতোই না।

সেকালে অংশুমানের মন মায়ের আদর্শের এই নিষ্ঠার গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। মুগ্ধদৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত।

আজ মনে হয়, না—। থাক সে কথা।

গান্ধীজীর কথা এবং সেদিনের দেশ ও মানুষ ছিল আশ্চর্য এবং বিস্ময়কর। অন্ততঃ ১৪ই আগস্ট রাত্রি নটা পর্যন্ত ছিল। রাত্রি নটা পর্যন্ত সেটা যে রাত্রিকাল—তার রূপ যে কালো এ কথাও তার মনে ছিল না। শুধু আলো আলো আর আলো। কলকাতার সে আলোক-সজ্জার স্মৃতি আজও মনে পড়ে। কিন্তু তাকে আজ আর সেদিনের মত সত্য বলে মনে হয় না। সেদিন মনে হয়েছিল এই যে আলো জ্বলল—এই যে বিচিত্র বহুবর্ণের আলোর ঝলোমলো এ আর কোনদিন নিভবে না। এইটিই হল স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বরূপ।

রাত্রি দশটার সময় হঠাৎ—।

সন্ধ্যেবেলা থেকে সে বেরিয়েছিল স্বাধীনতা উৎসব দেখতে। তার বাবা মা তাকে দেশে যেতে বলেছিলেন। কারণ ছিল। কারণ সেদিন দেবগ্রামে স্বাধীনতা উৎসবের কেন্দ্রস্থল ছিল নিরঞ্জন চৌধুরীর ছোট সংসার; শোভা চৌধুরীর বাড়ি। ১৯২৪ সাল থেকে নিরঞ্জন চৌধুরী যে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ধরেছিলেন সে-ঝাণ্ডা সেদিন সেই উড়িয়ে ঘোষণা করবে ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে দেবগ্রামও স্বাধীন। এবং স্বাধীন দেবগ্রামে সর্বময় কর্তা হলেন নিরঞ্জন চৌধুরী এবং তাঁর ছোটস্ত্রী শোভা চৌধুরী।

দু'দিন আগে বাড়ির নায়েব এসে বাজার করে নিয়ে গিয়েছিল এবং অংশুমানকে

বলেছিল—বাবু যেতে বলছেন—ছোটমা যেতে বলেছেন। বাজারের মধ্যে বাতি মাটির প্রদীপ ছিল গাদা গাদা, তা ছাড়া বারুদের কারখানা।

আরও শুনেছিল, এই উপলক্ষ্যে বিশেষ ভোগরাগ হবে। সেই ভোগরাগে এবার ছোটমা যোগ দেবেন। এবং স্বাধীনতা উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজনে বড়মা ইতিমধ্যেই এসে যোগ দিয়েছেন।

১৪ই সন্ধ্যে থেকে সকলে এসে থানা-কম্পাউণ্ডে জড়ো হবেন। সেখানে সন্ধ্যে থেকে গান হবে। স্বদেশী গান। রাত্রি একটায় শাঁখ বাজতে শুরু করবে। বোমবাজি ফাটতে আরম্ভ করবে। তারপর পুড়বে আতসবাজি—বারুদের কারখানা। পরদিন সকালে নিরঞ্জন চৌধুরী পতাকা তুলবেন। মিটিংএ সভাপতিত্ব করবেন। সেদিন সন্ধ্যেবেলা হবে থিয়েটার। বই হবে "চিতোরোদ্ধার"। এ নাটকখানি নিরঞ্জন চৌধুরীর লেখা নাটক। এতকাল রাজদ্রোহের ভয়ে অভিনীত হয় নি।

অংশুমান এতেও প্রলুব্ধ হয় নি।

অংশুমানের ভিতরের মানুষ সেদিন বোধ হয় জেগেছিল। না-হলে সে নিশ্চয় যেত। অথবা—।

আজ ১৯৩১ সালে মনে হচ্ছে হয়তো বা 'ভাগ্য'। সেদিন ভাগ্য সে মানত না। কাল সন্ধ্যেবেলা, তাই বা কেন, ভোরবেলা পর্যন্ত ভাগ্য সে মানে নি। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে—ভাগ্য। ভাগ্যই তাকে যেতে দেয় নি। কলকাতায় রেখে দিয়েছিল।

১৪ই আগস্ট, ভাগ্য,—। না, ভাগ্য সে বলবে না। বলবে, বাস্তব। সন্ধ্যেবেলা উৎসবময়ী স্বাধীন কলকাতাকে দেখবার জন্ত বেশ সেজেগুজেই বেরিয়েছিল। মেসোমশাই মাসীমা তাকে ছুটি দিয়েছিলেন খুশী মনে। বলেছিলেন—নিশ্চয় যাবে। যাও দেখে এস। যত রাত্রি হয় হোক, ভাল করে ঘুরে দেখ। শুধু সাবধান; হঠাৎ যদি দেখ হাঙ্গামা মানে সিচুয়েশন রায়টাস হয়ে উঠেছে তাহলে সেখান থেকে সরে এস। বুঝেছ?

খদ্দরের ধুতির সঙ্গে সিল্কের পাঞ্জাবি এবং কাবুলী চপ্পল পরে বেরিয়েছিল সে। শরীরে তার শক্তির অভাব ছিল না। দেহ তার শক্ত এবং সমর্থ—তার সঙ্গে লম্বা সে তখন থেকেই। এখনকার মত চওড়া সে হয় নি। চওড়া বলতে বুকের পাটা হাতের মাসল্ এবং হাড় মোটার কথা হচ্ছে। তখন সে ছিল হিলহিলে লম্বা তবে শক্তও নেহাত কম ছিল না। বয়স থেকে একটু বড়ই দেখাত তাকে।

আলোয় আলোময় কলকাতা। সুসজ্জিত তোরণে তোরণে, মালায় মালায়, আলোয় আলোয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্তের 'সেই বিবাহের কন্তার মত' সেজেছিল। মাইকে মাইকে গান গান গান।

"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।" একটু আগে বাজছে "অয়ি ভুবন-মনমোহিনী।" আর একটু আগে বাজছে—"বন্দে মাতরম্"। আরও একটু গিয়ে "বাংলা-দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।" হ্যারিসন রোড পার হয়ে বিচিত্র ভাবে তিনটে জায়গায় একটা গান বাজতে শুনেছিল—"উঠ গো ভারতলক্ষ্মী উঠ

আদি জগৎজনপূজ্যা!" ক্যাপার বিগ্রেড মহম্মদ আলি পার্কের ওপাশে তখন বাজছে—"ছাড়ো গো ছাড়ো সুখশয্যা—কর সজ্জা পুণ্য কমল কনক ধন ধান্যে। জননী গো লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বনাবাস দেহ তুলে চক্ষে, কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো!" অপরূপ একটি স্বপ্নাচ্ছন্নতা তার মন চিত্ত এমন কি বাস্তব সত্তাকেও অভিভূত করে ফেলেছিল। জনতার মধ্যে সে যেন ভাসতে ভাসতে চলেছিল সম্মুখের দিকে মেডিক্যাল কলেজের সীমানা পার হয়ে। ইডেন হসপিট্যাল রোডের মুখে তখন বাজছিল—"দুঃখ দৈন্য সব নাশি কর দূরিত ভারতলজ্জা।"

একই গান তিনটি জায়গায় বাজার জন্যে একটি বিচিত্র স্বপ্নঘোরের সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল। অন্যের মনে সে স্বপ্নের ছোঁয়াচ লেগেছিল কি না সে বলতে পারবে না তবে তার মনে সৃষ্টি হয়েছিল। হঠাৎ স্বপ্নঘোরটা যেন হাত থেকে পড়ে কাচের জিনিসের মত ভেঙে গেল। কি একটা কারণে একটা হুড়োহুড়ির একটা চাপ চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল, কিছু ভেঙে পড়ার ব্লাস্টের মত, সেই চাপটার মধ্যে সেও পড়ল। পিছন থেকে মানুষ পড়ল তার ঘাড়ে। সে উপুড় হয়ে পড়েই যেত কিন্তু শক্ত সবল তরুণ বয়স বলেই পড়তে পড়তেও সামলে নিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। তবে ধস্তাধস্তির মধ্যে হাতের ঘড়িটা ব্যাণ্ড ছিঁড়ে পড়ে গেল হয়তো তারই পায়ের তলায়। অথবা চলে গেল কারুর হাতের মধ্যে। স্বপ্নঘোর কেটে গেল তার। সে সাবধান হল। একটু এগিয়ে গিয়ে সে ইডেন হসপিট্যাল রোডে ঢুকে একটু দাঁড়াল এবং দেখে নিলে আর কি গেছে! আরও গেছে—লাল রুবি বসানো চেনসুদ্ধ সোনার বোতামছড়াটা ছিঁড়ে নিয়েছে। কিন্তু মনিব্যাগটা আশ্চর্য ভাবে রয়ে গেছে। আশ্চর্য ভাবে ঠিক নয়। বোতাম ঘড়ি সম্পর্কে তো সাবধান হওয়ার উপায় ছিল না। ব্যাগটা সম্পর্কে সে উপায় ছিল। ব্যাগটা রেখেছিল পাঞ্জাবির নিচে টুইলের ফতুয়ারও ভিতরপকেটে। সেই কারণে থেকে গেছে। ব্যাগটার মধ্যে ষাটটা টাকা ছিল, কয়েকটা কাগজ ছিল, হাতের বোতাম ছিল। এবং একটা গুপ্ত খোপরে আলাদা একখানা একশো টাকার নোট ছিল। ওটা তার মা-বাবা বিপদে আপদের জন্যে রাখতে বলেছিলেন। এগুলো যায় নি। নিশ্চিন্তও হয়েছিল এবং বিচিত্র হেসে সজাগও হয়েছিল। মনে হয়েছিল বাস্তব স্বাধীন ভারতবর্ষ এইই বটে।

* * *

ঠিক এই সময়েই পিছন থেকে তার কাঁধে হাত দিয়ে কে মিহি মিষ্টি গলায় বলেছিল—আচ্ছা ছেলে বাবা! এমনি করে হাত ছেড়ে দিলি—এখন আমি যদি তোর পাত্তা না পেতাম!

চমকে উঠে সে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছিল একখানি সুশ্রী মিষ্টি মুখ। তার থেকে বয়সে বড়। কিন্তু বেশী বড় নয়। তবে অত্যন্ত সপ্রতিভ। সেদিনের সেই আলোর মধ্যে তাকে যেন খুব উজ্জ্বল মনে হয়েছিল। না হলে অতসী এতখানি উজ্জ্বল ছিল না।

অতসী তার নাম। না। অতসীকে সে চিনত না। সে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। কিন্তু ভারী ভাল লেগেছিল। সমস্ত দেহ মন যেন আনন্দে চাঞ্চল্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। অদ্ভুত ভাল লেগেছিল সমস্ত কিছুকে। তারপরই অতসী জিভ কেটে বলেছিল—না তো! তুমি কে? তুমি তো বাদল নও! বাদল কোথায় গেল! আমি তোমায় বাদল আমার ভাই বাদল মনে করেছিলাম। এই ভিড়ে যে কোথায় হাত ছেড়ে চলে গেল!

অংশুমান তখন কিশোর। সেই তার প্রথম রোমান্স। কলকাতার রাজপথের উপর এমন একটি আনন্দোৎসবের মধ্যে একটি যুবতীর সঙ্গে প্রথম আলাপ। সে সেধে আলাপ করছে। পৃথিবীর সব কিছু মিথ্যা হয়ে ওইটুকুই পরম সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে সে মুখচোরা ছিল না। জিজ্ঞাসা করেছিল—কোথায় যাবেন?

অতসী বলেছিল—দেখতে বেরিয়েছিলাম, ঘুরব ভেবেছিলাম অনেক। কিন্তু বাদলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

একটু বিপন্ন ভাব দেখিয়েছিল। সেদিন তখন বুঝতে পারে নি অংশুমান, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিল যে তার মধ্যে অতসীর মুচকি হাসি প্রচ্ছন্ন ছিল। তারপরই অতসী বলেছিল—বাড়ি ফিরে যাব, আমাকে একটু বাড়ি পৌঁছে দেবে?

অংশুমান বলেছিল—চলুন!

তার হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের হাতে চেপে ধরে অতসী বলেছিল—আমার হাত তুমি ধর। চেপে ধর। কেমন?

সত্যিই সে চেপে ধরেছিল অতসীর হাত। অতসীর হাতখানা গরম সেই সঙ্গে অপূর্ব রকমের কোমল মনে হয়েছিল।

কয়েক পা উত্তরমুখে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল—তোমার নাম কি?

সে বলেছিল—অংশুমান চৌধুরী।

—বাঃ, খাসা নাম তো! অংশুমান চৌধুরী। অংশুমান মানে সূর্য? নয়?

—ঠিক বলেছেন তো!

—বলব না? মুখ্যু তো নই! আচ্ছা অংশু—।

—বলুন।

—তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে তো?

—তাই তো যাচ্ছি।

—তাহলে চল না, আর একটু ঘুরি দুজনে! তারপর আমাকে পৌঁছে দিয়ে তুমি চলে যাবে। তোমারও দেখা হবে আমারও হবে!

খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল অংশুমান। বলেছিল—বেশ তো। খুব ভাল হবে। আমারও তো রাজভবন পর্যন্ত যাবার ইচ্ছে। চলুন।

আবার ফিরেছিল তারা দক্ষিণমুখে। অতসী নিজেই তার পরিচয় দিয়েছিল—সে অতসী। বলেছিল—তুমি ঠিক বাদলের মত দেখতে। বাদল তোমার থেকে একটু ছোট। কত বয়স তোমার?

অংশু বলেছিল—ষোল।

অতসী বলেছিল—ওরে ছেলে, তুমি তো সাবালক হয়ে গেছ। আমারই বয়সী প্রায়। আমি সতের। তোমার থেকে মোটে এক বছরের বড়। আমায় দিদি বলবে। বলে তার তর্জনীটি তার মুখের কাছে নেড়ে দিয়েছিল।

বিচিত্র সে স্মৃতি। আজও মনে করতে তার মনে সেই চঞ্চলতা যেন চকিতের একটা চমক

দিয়ে মিলিয়ে যায়!

অতসী তাকে রাজভবন ফেরত এনে তুলেছিল বিডন স্ট্রীটের কাছাকাছি একটা বাড়িতে। —এস! বলে তার হাত ধরে উপরে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দু'হাতে জাপটে তাকে তার বুকে চেপে ধরেছিল। একটা কথা বলেছিল—ভেবে বলে নি কিন্তু কথাটা নিয়ে অংশুমান আজও ভাবে। বলেছিল—এস, আমরাও আজ স্বাধীন।

* * *

না। তার জন্য সে অনুতাপ করে না। অতসী যা বলেছিল সেটাও তার পক্ষে স্বাভাবিক। দুঃখ এই যে, সে প্রতারিত হয়েছিল; অতসীকে দিয়ে তাকে এমন ফাঁদে ফেলে মজা করতে চেয়েছিল ওই শিবকিংকর গুপ্ত।

তাদের গ্রামের গুপ্তবাড়ির ছেলে, শিবকিংকর বি. এ. পাস করা লোক; সম্পত্তি ওদেরও ছিল, ভাল সম্পত্তি। বেশ সচ্ছল অবস্থা। বয়স তখন ছিল সাতাশ-আটাশ। কলকাতায় দালালি করত। পাটের দালাল। থিয়েটারে খুব ঝোঁক ছিল। অভিনয় করতে ঠিক পারত না তবু অ্যামেচার ক্লাব নিয়ে মাতামাতি করতে তার জুড়ি বড় একটা মিলত না। থিয়েটারের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করত নিখুঁত। মদ খেতো। এসব কথা গ্রামের লোকেও জানত। তাদের গ্রামেও অ্যামেচার ক্লাব আছে। সেখানেও শিবকিংকর পাণ্ডা। গ্রামের বড়ঘরের ছেলেরা তার বৈমাত্রেয় ভাইরা জ্যাঠতুত ভাইরা অভিনয় করে। তার বাবারও এককালে শখ ছিল। শখ ছিল না তার মায়ের। মা তার বিরূপ ছিলেন থিয়েটারের উপর। সেই কারণে তার বাবা আর নামতেন না। তার মা অংশুমানকে অতি যত্নের সঙ্গে এই মাতিয়ে তোলা শখটি থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন।

শিবকিংকরকে তিনি একটু বেশী কঠোর চোখে দেখতেন। সেকালে তাঁর নামে কম ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত না শিবকিংকর। অর্থাৎ অংশুমানের মায়ের নামে।

সেদিন শিবকিংকরও অতসীকে নিয়ে স্বাধীনতা দিবস দেখতে বেরিয়েছিল। অতসী একজন অ্যামেচার থিয়েটারে পার্ট করা অভিনেত্রী—অতসী মুখার্জী। অতসী তাদের গ্রামের থিয়েটারে গিয়ে কিছুদিন আগেই অভিনয় করে এসেছে। এবং অংশুমানদের বাড়িও দেখে এসেছে। শিবকিংকর পথে দেখতে পেয়েছিল অংশুমানকে। এবং অতসীকে তাকে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল—ওকে যদি আজকের দিনে এঁটো করে দিতে পার তবে তোমাকে খেতাব দেব স্বর্ণমৃগী।

অতসী সেই জাতের মেয়ে যাদের সোনার-লোভ টাকার-লোভের চেয়ে রোমান্সের-লোভ কম নয়, বেশী। যে-মেয়েরা জীবনে অনেকবার সত্যিসত্যিই প্রেমে পড়ে এবং বার বার নিজেরাই সে প্রেম ভেঙে, নতুন প্রেমে পড়ে ও পড়তে ভালবাসে সে তাদেরই মধ্যে পড়ে। সেদিন ১৫ই আগস্টের মত একটি সমারোহের আলোর আলোময়, গানে গানময়, উল্লাস ও উচ্ছ্বাসময় রাত্রে এ খেলার জন্য তার মন উদ্‌গ্রীব হয়েই ছিল। শিবকিংকর কথাটা বলবা মাত্র সে খেলায় নামতে এবং মাততে কোমরে যেন আঁচল বেঁধেছিল। এবং অংশুমানকে একটু কাছ থেকে দেখে মন তার দ্বিধা করে নি, ঝপ করে লাফ দিয়েছিল।

অংশুমানের চোখ দুটি আশ্চর্য সুন্দর দুটি ডাগর চোখ। সে চোখ কোমল নয়—সে চোখ দীপ্ত এবং উগ্র। সে চোখ যখন হাসে তখন বিদ্যুতের মত ঝলক দেয়। রাগলে ভয় করে। কাঁদলে, সে কান্না যে দেখে তার বুক ফেটে যায়। নাকের ডগাটা একটু মোটা। কপালখানা চওড়া; এবং কপালের বাঁ দিক ঘেঁষে চুলে একটা ঘূর্ণি আছে। যেন সিঁথি কাটবার ঠাঁইটুকু চিহ্নিত করা আছে।

এর উপরেও আরও খানিকটা আকর্ষণ অতসী অনুভব করেছিল দেবগ্রামের চৌধুরীবাড়ির কথা মনে করে। নিরঞ্জন চৌধুরী এবং শোভা চৌধুরী স্বামী-স্ত্রীতেই সেবারকার ক্লাবের ফাংশনে সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন দখল করেছিলেন। তখন দেশ স্বাধীন হবে-হবে হচ্ছে-হচ্ছের সময়। একসঙ্গে জমিদার মহাজন জোতদার এবং কংগ্রেসী—এ একেবারে সুদুর্লভ ব্যাপার। সুতরাং তাঁদের খাতিরের আর শেষ ছিল না। উইংসের ফাঁকে দাঁড়িয়ে অতসী তাঁদের সে-খাতির দেখেছিল। এবং নিজেও খানিকটা খাতির আবার খানিকটা ঈর্ষা মেশানো একটি মনোভাব অনুভব করেছিল। সেটাও তাকে যেন এ খেলায় উদ্দীপিত করে তুলেছিল।

এসব কথা অংশুমানকে অতসীই বলেছিল। পরের দিন সকালে। সেদিন রাত্রে সে স্তব্ধ হয়ে অতসীর বাহুবন্ধনে বদ্ধ হয়ে ছিল এবং কখন একসময় সেই তাকে অর্থাৎ অতসীকে তার বাহুবন্ধনের মধ্যে বেঁধে ফেলেছিল। তার সে বাহু দুখানি দুর্বল ছিল না। দেহ ছিল তার এক্সারসাইজ করা। পেশীগুলি কঠিন হয়ে উঠেছিল দেহক্ষুধায় উন্মত্ত আবেগের প্রচণ্ডতায়। অতসী লতার মত এলিয়ে পড়েছিল নির্বাক হয়ে।

কখন যে সারারাত্রি শেষ হয়ে গিয়েছিল তার খেয়াল ছিল না। তারও না। অতসীরও না। ঘুম যখন ভাঙল তখন রোদ উঠেছে। ১৫ই আগস্টের সূর্যোদয় হয়ে গেছে। অতসীই চমকে উঠে বলেছিল—কি সর্বনাশ! এ যে রোদ উঠে গেছে। ওঠো ওঠো! না হলে তুমি বিপদে পড়বে। তোমার চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

সে-ই তাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে পথে এসে বলেছিল—এ আমার রাত্রির আস্তানা। আমি ভদ্রঘরের মেয়ে। আমার মা আছে বাপ আছে ছোট ছোট ভাই আছে। লেখাপড়াও জানি। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছি। তারপর—। বিচিত্র হাসি হেসে বলেছিল—যুদ্ধের সময় বাবার চাকরি গেল। তখন আমার দাদা ছিল একজন। সেই দাদা আমাকে হোটেলে নিয়ে যেত। দাদা দালালি করত আমি নিজেকে বেচতাম। তারপর এই অ্যামেচার থিয়েটারে পার্ট করতে লাগলাম। দাদা মারা গেল। এখন নিজেই বিচরণ করি। একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিল—দেখ দেহ নিয়ে কারবার করি আমি। গরীবের ঘরের মেয়েদের যাদের বিয়ে হয় না তাদের অনেকজনের ভাগ্যে এই হয়।

কথা বলতে বলতেই তারা হাঁটছিল। চলছিল বিডন স্ট্রীট সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যুর দিক থেকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের দিকে। অতসীর বাড়ি কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে বেরুনো একটা এঁদো গলিতে। যে ঘরখানায় রাত্রে ছিল সেখানাকে অতসী বলত—আপিস। হেসেই বলত—এ হল আমার আপিস।

পথে একটা রেস্টুরেণ্টে চা খেয়ে নিয়েছিল দুজনে। সেখানেই অতসী তাকে বলেছিল শিবকিংকরের কথা।—শিবকিংকর গুপ্তকে চেনো ?

চমকে উঠেছিল সে—শিবকিংকর গুপ্ত ?

—তোমাদের গ্রামের।

—তুমি কি করে চিনলে তাকে ?

হেসে অতসী বলেছিল—সে-ই তোমাকে চিনিয়ে দিলে কাল। বললে—ওকে যদি ভোলাতে পার তাহলে বুঝব তুমি সত্যি স্বর্ণমৃগী। তোমাকে ভোলাবার জন্তেই তোমার ঘাড়ে হাত দিয়ে তোমাকে ডাকলাম 'বাদল' বলে। কিন্তু শেষে দেখছি তুমি ভোল নি, আমিই ভুললাম।

চমকে উঠে স্থিরদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থেকেছিল অতসীর মুখের দিকে। ভয় অনুতাপ পাপ বোধ সব কিছু একসঙ্গে মিশে তাকে যেন অধীর করে তুলেছিল একমুহূর্তে।

অতসী বলেছিল—ভয় নেই তোমার। তার হাতে তোমাকে আমি ধরিয়ে দেব না।

অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলেছিল—তাহলে তার কথা তোমাকে বলতামই না। তোমাকে আমি ভালবেসেছি অংশু। তুমি বিশ্বাস করো।

অতসীর মত সহজভাবে সোজা কথা কাউকে বলতে শোনে নি অংশুমান। না-হলে— "পেটের যেমন একটা ক্ষিদে আছে দেহের তেমনি একটা ক্ষিদে আছে অংশু। এ ক্ষিদে পুরুষের মেটানো সোজা কিন্তু মেয়েদের পক্ষে এ বড় কঠিন। লজ্জা তাদের জন্মগত; তারা মুখ ফুটে বলতে পারে না। তা ছাড়া তাদের উপর সমাজের কড়াকড়ির আর শেষ নেই। চোর-ছ্যাঁচড়ের পরিত্রাণ আছে কিন্তু মেয়েদের এ অপরাধের আর মাফ নেই। আমার সব গেছে—আমি আজ সব হারিয়ে বেপরওয়া—আমি তাই বলতে পারছি। যারা বলতে পারে না তাদের যে সে কি জ্বালা—"

অংশুমান ভাবছিল নিজের কথা। অনেক কথা তার মনের মধ্যে পরের পর এসে দাঁড়িয়েছিল তার সামনে এবং প্রশ্ন করেছিল—এ কি করলে তুমি ? তোমার লজ্জা হল না ? ভয় হল না ? তোমার কি হবে ভেবেছ ? মায়ের সামনে কেমন করে দাঁড়াবে বল তো ? বাবার সামনে ? নিজের সামনে ? ভগবানের সামনে ? এ কত বড় পাপ বল তো ?

ভাবতে ভাবতে একসময় দুই হাতের তেলোর মধ্যে নিজের মুখ লুকিয়ে সে ভেঙে পড়েছিল চায়ের টেবিলটার উপর। ভাগ্যে সেটা ছিল কাঠের পার্টিশন দিয়ে ঘেরা একটা ছোট কেবিন তাই রক্ষা! অতসী—আশ্চর্য অতসী। সে তাকে সোজা সহজ কথায় সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—ছি, এই রকম করে না। তাহলে তো আমাকে বিষ খেতে হয়। হয় না ? তুমিই বল ?

এ কথার সে উত্তর দিতে পারে নি। উত্তর সে জানতও না। সেদিন তাকে বুঝিয়ে নিজের আঁচলে তার চোখ মুছে দিয়ে অতসী তাকে সমাদরের মধ্যে সান্ত্বনা দিতে পেরেছিল। যুক্তির মধ্যে নয়। মনে পড়ছে অতসী বলেছিল—আমি তোমার। একদিনে আমি তোমার

হয়ে গিয়েছি। তুমি কাঁদলে আমি কি করব বল? আমি যে তোমার চোখের জলে ভেসে যাব! না—মুখ তোল—তুমি হাস। দেখ সংসারে এটা হয়তো পাপ। কিন্তু আজ থেকে আমি যদি আর অন্য পুরুষকে না ভজি আর তুমি যদি আর কোন মেয়েকে ভালো না বাসো তাহলে? তাহলে পাপ কেন হবে বলো? আমি তোমাকে কথা দিলাম। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। ভগবানের নাম নিয়ে বলছি। তোমাকে ছাড়া আর আজ থেকে আমি কারুর নই—কারুর নই—কারুর নই। এবার তুমি বলো—আমার গা ছুঁয়ে বলো!

অংশু কথা বলতে পারে নি, হেসে ফেলেছিল।

অতসী বলেছিল—বাবাঃ, তোমার মুখে হাসি দেখে বুকে আমার জল নামল। আমি যেন ডুবে মরতে বসেছিলাম। তুমি আমার নাগর—আমার বর। আমার সর্বস্ব।

সেখান থেকে বেরিয়ে দুজনে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে এসে ছাড়াছাড়ির মুখে অতসী বলেছিল—আজ ঠিক সন্ধ্যের সময় আসবে। আমি তোমার পথ চেয়ে থাকব। হ্যাঁ? না এলে আমি কিন্তু তোমার বাসা পর্যন্ত যাব!

অংশু কথাবার্তার মধ্যে বলে ফেলেছিল নিজের ঠিকানা।

* * *

অনুতাপ এবং অনুশোচনার মধ্যেই সে বাসায় ফিরেছিল এবং অনায়াসে মিথ্যে কথা বলেছিল মেসো ও মাসীকে; ওই শিবকিংকরেরই নাম করে বলেছিল—পথে শিবকিংকরদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাদের গ্রামের কবিরাজমশায়দের বাড়ির ছেলে। ব্যবসা করে—বি. এ. পাস। জোর করে ধরে নিয়ে গেল ওদের বাসায়।

মেসো এর জন্যে বিরক্তি প্রকাশ করেন নি, মাসীও না। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যেখানে গতরাত্রে কোন দাঙ্গা বাধে নি কোন খুন হয় নি কোন বোমা ফাটে নি সেখানে যদি রাত্রে বাড়ি না ফিরে সারা কলকাতার পথে পথেই ঘুরে বেড়িয়ে থাকে তাহলে তাতে কোন দোষ হয় নি। এবং তাঁরা সত্যসত্যই কোন চিন্তা তার জন্য করেন নি।

ঘরের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেই নটা সাড়ে নটার মধ্যে। এবং গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মধ্যে বার চারেক বোধ হয় ঘুম পাতলা হয়ে এলে স্বপ্ন দেখেছিল। একবার মাকে স্বপ্ন দেখেছিল। একবার শিবকিংকরকে। দুবার অতসীকে। শেষবার অতসীকে স্বপ্ন দেখে ঘুমটা তার চোখ থেকে ছেড়েই পালিয়েছিল, সে উঠে বসেছিল তক্তপোশের উপর, আর ঘুমোয় নি। অতসীকেই ভেবেছিল বসে বসে।

অতসী। অতসী। অতসী।

সব অনুশোচনা সব অনুতাপ সব গ্লানি কিভাবে যে কে মুছে দিয়েছিল নিঃশেষে, মনের মধ্যে যে কাঁটাগুলো ফুটে অস্বস্তি ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল সেগুলো যে কে নিপুণ হাতে তার অজ্ঞাতেই টেনে টেনে বের করে নিয়েছিল তা সে জানে না। তবে মন তার কোন উত্তাপ বা কাঁটার ডগার স্পর্শ অনুভব করে নি; মনে মনে অতসীর বাড়ির দিকে পা বাড়াতে, পায়ের নিচে কোন ফুটে-থাকা কাঁটার জন্য তাকে খোঁড়াতে হয় নি। বেলার অগ্রগতির সঙ্গে বুকের মধ্যে একটা উল্লাসের আবেগ জমতে শুরু করেছিল। ঘড়ির কাঁটা যত সামনের দিকে

এগোচ্ছিল তত সে উল্লাস পশ্চিম আকাশের মেঘের মত পরিধিতে বাড়তে লেগেছিল। বেলা তিনটে থেকেই সে একবার শুয়েছে আবার উঠেছে; কিছুক্ষণ বসে থেকেছে; টাইমপিস ঘড়িটার টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ শব্দ শুনেছে—আবার শুয়েছে। মনে হয়েছে অনেকক্ষণ শুয়ে থেকেছে বলে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসেছে কিন্তু ঘড়িতে দেখেছে সময়টা দশ মিনিটের বেশী নয়। তখন উঠে এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছে। বাইরের দিকে তাকিয়েই থেকেছে এবং মনে মনে অতসীকে নিয়ে কল্পনার জাল বুনেছে। হঠাৎ ক্লক ঘড়িতে চারটে বাজার শব্দ শুনে তার সে-জাল ছিঁড়েছিল। এবং সে উৎসাহিত হয়ে উঠে স্যুটকেসটি খুলে বসেছিল। সিল্কের পাঞ্জাবি বের করেছিল—নতুন ফতুয়া বের করেছিল। নতুন ধোয়া ধুতি রুমাল। একশিশি আতরও ছিল তার স্যুটকেসে। তাদের বাড়িতে তার মায়ের আমলে এই আমিরী স্বদেশীয়ানায় চলতি ছিল; সেখানে খদ্দরের জামা থেকে তসর মুগা সিল্কের জামার চলন ছিল বেশী। সভাসমিতিতে খদ্দর ছাড়া পরতেন না নিরঞ্জন চৌধুরী কিন্তু অন্যত্র তসরের প্রতি রুচিটা ছিল বেশী। রুমাল সিল্ক ছাড়া ব্যবহার করতেন না। সেণ্টও আতর ছাড়া অন্য কিছু না। একশিশি আতর অংশুমানের স্যুটকেসে ছিল—সেটাও সে বের করে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছিল, কখন সন্ধ্যা হবে। সন্ধ্যা সেদিন তার কাছে যেন অতসীর মূর্তি ধরে উঁকি মেরেছিল তার মনে।

সেদিন তখন ছটা। শ্রাবণ দিনের আলো তখনও ঝলমল করছে প্রায়। আকাশের পশ্চিমদিকে মেঘ ছিল। সে আকাশে রঙ ধরি-ধরি করছে। এরই মধ্যে সে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের সেই এঁদো গলির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। রাস্তায় ভিড়ের অন্ত নেই। বাড়িতে বাড়িতে পতাকা—বাড়িতে বাড়িতে যার যেমন সাধ্য সজ্জা আলোয় ফুলে পাতায়। লোকেরাও তাই। উল্লাসে উচ্ছ্বসিত; অপ্রীতি নেই বিদ্বেষ নেই—কোথাও রাগারাগি নেই। কিন্তু গ্লানি কলুষ অন্ধকার অপবিত্রতা ছিল আশ্চর্য ভাবে সমান পরিমাণে, সমান ওজনে। হঠাৎ সেটা চোখে পড়েছিল তার। অতসী বাড়ির ভেতর থেকেই তার আগমনবার্তা জেনেছিল। সে একবার উঁকি মেরে দেখা দিয়ে একটু হেসে ইশারায় তাকে অপেক্ষা করতে বলেই বের-করা মুখ ঢুকিয়ে নিয়েছিল। প্রায় আধঘণ্টা পর সে প্রসাধন সাজসজ্জা সেরে বেরিয়ে এসেছিল।

অংশুমানের বুকের স্পন্দন বাড়তে শুরু করেছিল। আগের দিন সেটা হয় নি। সেদিন হয়েছিল। চলতে চলতে যেন হাঁপ ধরছিল—গলা শুকুচ্ছিল। অতসী হেসে তাকে বলেছিল—দেখ তো, স্বর্ণমৃগী বলে মনে হচ্ছে কি না? সোনার হরিণী—মনো-হারি-ণী! শেষের কথা কয়েকটা সুর করে বলেছিল।

কথার উত্তর দেবার মত অবস্থা ছিল না অংশুমানের।

অতসী প্রশ্ন করেছিল—কি হল তোমার?

তার হাতখানা চেপে ধরেছিল নিজের হাতের মুঠোয় মধ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—বাপরে! হাত যেন জলছে।

অতসীর গোপন বাসকক্ষ যে বাড়িটায় সে বাড়িটা আগের দিন প্রায় স্তব্ধ ছিল। কিন্তু সেদিন ঘুঙুরের আওয়াজে যন্ত্রসঙ্গীতের কণ্ঠসঙ্গীতের সুরে সুরে স্খলিত কণ্ঠের কথায়বার্তায়

আর এক চেহারা নিয়েছে। অংশুমান একটু চকিত চঞ্চল এবং কিছুটা শঙ্কিত হয়ে অতসীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। অতসী হেসে বলেছিল—ওদের সব অষ্টপ্রহর চব্বিশপ্রহরের আসর পড়েছে। এখানে সব বাঁধা বাবুদের আসর। দেশ স্বাধীন হল, ওরা আসর পেতেছে। এ বাড়িতে হল্লা খুব হয় না। আজকের মত দিন বলেই এ হচ্ছে। তবে এ বাড়িতে পুলিস ঢুকবার হুকুম নেই। মাসে মাসে থানার বাঁধা টাকা পাওনা আছে। আগাম আগাম নিয়ে যায়।

তালা খুলে ঘরে ঢুকে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—সারাটা দিন যেন আর যেতে চায় না। মা বলে তোর হল কি? কি আর বলি বল? "রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।" সে বোঝে কে?

অংশুমান তখন বোবা।

জীবন তখন শুধুই জীবন, সেই আদিম জীবন, তার বেশী কিছু নয়। যার শুধু গ্রাসই আছে আর কিছু নেই। তার হাত-পা কাঁপতে চাচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে কেঁপে উঠছিল। তবু অধীর হয়ে উঠছিল মুহূর্তে মুহূর্তে।

সেদিন আটটার সময়েই অতসী তাকে ছুটি দিয়েছিল। বলেছিল—আজ কিন্তু হে আমার নবীন নটবর, এর যেরে নয়া পিয়ার, মেরে মজনু, বাঁদীকে ছুট্টি দেনেকো হুকুম হোয় যায়। ছুটি দিতে হবে আজ। বুঝেছ? কখন যে শিবকিংকর আসবে তার ঠিক নেই। সে যে এখনও কেন আসে নি তা বুঝতে পারছি না।

ছুটি দিতে অংশুমানের ইচ্ছে ছিল না। অংশুমানের বুকে একটা প্রতিক্রিয়ার আঘাত লেগেছিল, মধ্যে মধ্যে তাকে সংকুচিত করছিল তার নিজের কাছেই। প্রশ্নও করছিল—কি করছি আমি? উত্তরে প্রতিবাদ করবার মত কণ্ঠস্বরও ছিল না ভাষাও ছিল না। কিন্তু একটা লোলুপতা তাকে শিকার-ধরা বাঘের মত করে রেখেছিল। তবু অতসীর কথা সে মেনে নিয়ে ফিরে এসেছিল ন'টার মধ্যে।

ফিরবার পথে সিগারেট খেয়ে নিজেকে ঘায়েল করেছিল সে কথা মনে আছে। সে সিগারেট খায় না শুনে অতসী বলেছিল—না খেয়ো না। সিগারেট ভাল নয়। খবরদার। তাহলে ঝগড়া করব। অতসীর তুমি বয়সে-ছোট বর। বুঝলে!

পথে বেরিয়ে সেদিন সে সিগারেট খেয়ে সত্যিকারের যুবক হতে চেয়েছিল। সিগারেট খেয়ে এমন কেশেছিল যে অতসীর ঘরে যা খেয়েছিল সব বমি হয়ে উঠে গিয়েছিল—তার সঙ্গে মাথাটা কেমন যেন হঠাৎ ধরে উঠেছিল। মেসোর বাসা উত্তর কলকাতায় গ্রে স্ট্রীটের একটা গলিতে। বিডন স্ট্রীট থেকে পথ সামান্যই কিন্তু এই সামান্য পথটুকু হাঁটতে অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিল তার। কোনরকমে বাড়ি পৌঁছে সে চুপি চুপি নিজের ঘরটায় ঢুকে পড়ে শুয়ে পড়েছিল। মেসো-মাসীর সামনে যায় নি; ভয় হয়েছিল হয়তো সিগারেটের গন্ধ পেয়ে যাবেন তাঁরা। চাকরটাকে বলে দিয়েছিল—দেখ শরীরটা আমার খারাপ মনে হচ্ছে। আমি শুয়ে পড়ছি। খাব না কিছু। আমায় যেন না ডাকে। বুঝলি?

ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হয় নি। অতসীকে নিয়ে বিচিত্র কল্পনা করতে করতে অল্পক্ষণের মধ্যেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। মনের সংকল্প তখন তার স্থির হয়ে গেছে। অতসী তার থেকে বয়সে বড়, বাধ্য হয়ে সে সংসারকে বাঁচাবার জন্য এ পথে নেমেছে; তা নামুক। সে তাকে বর বলেছে। বলেছে এরপর সে আর এ পথে পা দেবে না। তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করবে। সেও তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছে। হ্যাঁ, অতসীই তার স্ত্রী। নাইবা হল মন্ত্র পড়ে বিয়ে। নাইবা থাকল সামনে শালগ্রাম শিলা। তার থেকে তাদের এ বন্ধন আরও দৃঢ়, আরও পবিত্র। একটা বাসা ভাড়া করবে। সেখানে সে রাখবে অতসীকে। সে আর অতসী। যতদিন সে পড়বে ততদিন অতসীর অজ্ঞাতবাস। তারপর সে—

ওঃ! সে কত আকাশকুসুম রচনা করেছিল মনে মনে! একদিন সে স্বাধীন ভাবে দাঁড়াবে নিজের পায়ের উপর। সে বিখ্যাত ব্যক্তি হবে। একজন বিরাট বড় রাজকর্মচারী—I. A. S. না। সে হবে একজন বিখ্যাত নেতা। পণ্ডিত জওহরলালের পরবর্তী কালের নেতা। হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা হবে। সেই তাঁকে ঠিক চিনবে। এবং বলবে—নেতাজী! নেতাজী বলবেন—চুপ করো। আমাকে সাহায্য করো। নেতাজী প্রতিষ্ঠিত হবেন—ভারতবর্ষ উথলে উঠবে। নেতাজীর পি-এ হবে সে। সে অতসীকে নিয়ে নেতাজীর সামনে নতজানু হয়ে বসবে—

ঘুমিয়ে পড়েছিল এইখানেই।

হঠাৎ তাকে ডেকে তুলেছিল। ডেকে তুলেছিল তাদের দেবগ্রাম বাড়ির একজন গোমস্তা।

—ছোটবাবু! ছোটবাবু! ছোটবাবু!

ঘুম ভেঙে উঠে বসে সে বলেছিল—কে? কি?

বিরক্তির আর সীমা ছিল না তার।

গোমস্তা প্রাণকৃষ্ণ চট্টরাজ বলেছিল—আপনাকে বাড়ি যেতে হবে ছোটবাবু। বাবার খুব অসুখ!

—বাবার অসুখ!

—হ্যাঁ। খুব অসুখ। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। আমি ওষুধ নিতে এসেছি আর আপনাকে নিতে এসেছি।

* * *

নিরঞ্জন চৌধুরী ১৪ই আগস্ট সারাদিন উদ্যোগ আয়োজন করেছেন স্বাধীনতা দিবসের। মধ্যরাত্রি অর্থাৎ ১৫ই আগস্টের শঙ্খধ্বনির সময় থেকে শুধু চীৎকার করেছেন। চীৎকার করে অতীতকালের ঘটনা বলে গেছেন। হঠাৎ সেই সময় তাঁর প্রথম মনে হয়েছিল ১৯২১ সাল থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন্ কাজটি এবং কোন্ ঘটনাটি কোথায় ঘটেছিল সেই স্থানগুলি চিহ্নিত করবেন। বাখারির মাথায় কাগজের বোর্ড এঁটে লিখে দেবেন—১৯২৪ সালের ১২ই পৌষ এই ঘরে প্রথম কংগ্রেস কমিটির উদ্বোধন হয়। সভাপতি নিরঞ্জন চৌধুরী। ১৯২৫ সালে এই গাছতলায় প্রথম জনসভা হয়—ভাষণ দেন বিখ্যাত নেতা ৺জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামের ভিতরে কোথাও সভা করিতে দেওয়া হয় নাই। ১৯৩০ সালে

রথযাত্রার দিন এইখানে সভাপতি নিরঞ্জন চৌধুরী ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া গ্রেফতার হন।

সারারাত্রি পরিশ্রম করে এই ঐতিহাসিক ঘটনাবিন্যাস শেষ করে সকালবেলা কংগ্রেস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা তুলে থানায় পতাকা তুলবার কথা ছিল। কিন্তু কংগ্রেস প্রাঙ্গণে পতাকা তুলেই তিনি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন চেয়ারে—তারপর অজ্ঞান হয়ে যান। ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়। ডাক্তার আসে। তারপর অনেক ঘটনা।

অংশুমানের মা স্বামীর করণীয় কাজগুলি শেষ করেন—সকলেই এটা চেয়েছিল। তিনিও এটাকে কর্তব্য মনে করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন থানায় পতাকা তুলতে এসেছিলেন সেই সময় নিরঞ্জন চৌধুরীর প্রথমা স্ত্রী এবং তাঁর ছেলেরা রমারঞ্জন আর রাধারঞ্জন ধরাধরি করে তাঁকে নিজেদের মহলে নিয়ে গেছেন।

তাঁর বিছানায় বসে তাঁর সেবা পর্যন্ত করতে দিচ্ছে না অংশুর মাকে। সেবা করছে রমারঞ্জন রাধারঞ্জনের স্ত্রীরা—মাথার শিয়রে বসে আছেন মহামায়া অর্থাৎ রমারঞ্জনদের মা। শোভাকে কেবল ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে দেখতেই দিচ্ছে। এবং দাঁড়িয়ে থাকলে বলছে—আপনি বাইরের কাজগুলো দেখুন!

অংশুমান একটা প্রচণ্ড আঘাতে যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একসময় ঘন গুমোট-ধরা অপরাহ্ণে পশ্চিম আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন কালো মেঘকে বিদীর্ণ করে বিদ্যুৎ খেলে যাওয়ার মতই একটা প্রশ্ন তার সমস্ত অন্তর মনকে চমকে দিয়ে জেগে উঠেছিল—কেন এমন হল? তার পাপে? অতসী—।

সেদিন সে বুঝতে পারে নি, উত্তর পায় নি। কিন্তু আজ পায়।

অনুশোচনার কিছু নেই। না, কোন অপরাধ তার নেই। লজ্জার কিছু নেই। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে—তাই বা কেন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকেই দুনিয়ার সমাজের যাত্রার বা থিয়েটারের সাজানো আসর ভেঙে গেছে। অতীতকালের পৌরাণিক ঐতিহাসিক নাটকের আমল চিরদিনের মত শেষ। গ্রীনরুম থেকে রঙ মুছে সবাই বেরিয়ে এসে খোলা মাঠে ময়দানে নেমেছে। পয়সা বদলে নয়া পয়সা হয়েছে। মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়েছে; পারমাণবিক বোমার আঘাতে নাগাসাকি হিরোসিমার মানুষই শুধু মরে নি, সেখানকার সমস্ত প্যাগোডাগুলো এবং ভিতরের দেবতাগুলি ভেঙে গেছে। পৃথিবীতে কালোবাজার নামে নতুন একটা বিরাট বা বিশাল বাজার আপনাআপনি পথের ধারের হাটের মত বসে গেছে। সে-বাজারে যারাই পসরা নামিয়েছে তারাই হাটুরে থেকে হয়ে উঠেছে মহাজন। লক্ষ টাকার দাম পড়ে গেছে, কোটি টাকাটাই এখন প্রায় মুখের কথা। গত মহাযুদ্ধে যখন কালোবাজারের পত্তন হচ্ছে, কারবার শুরু হচ্ছে, তখন হাজার দরুনে মানুষ না খেয়ে এবং অখাদ্য পেয়ে পথের ধারে মরে পড়ে থেকেছে; পচে ঢোল হয়েছে। চোরা-বাজারের আশেপাশে রাত্রির প্রথম প্রহর দ্বিতীয় প্রহরে কালোটাকায় মেয়েরা দেহ বেচেছে। বেচেছে পেটের দায়ে বেশী, কিন্তু যুদ্ধবিভাগের ফৌজী কামার্ততা মেটানোর চাহিদা তার থেকে খুব কম ছিল না। আবার দেহ কেনা-বেচার নেশাও বড় একটা কম নেশা নয়। কারণ যুদ্ধ মিটবার পরও যে এই কারবার ফলাও হয়ে চলেছে, সে এই নেশার ঘোরেই বেশী

চলছে।

আরও আছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধ জিতেও সাম্রাজ্যবাদীদের গিলটির জলুস কালের হাওয়ার কেমিক্যাল অ্যাকশনে গেবে মলিন হয়ে গেছে, আবার ফেটেফুটে চটেও গেছে। পূর্ব ইয়োরোপে, চায়নায় কম্যুনিস্ট বিপ্লব হয়ে গেছে। ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হয়েছে, সেখানেও তখন কম্যুনিজমের ছোঁয়াচ লেগেছিল। বার্মা ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন হবার জন্তে ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্তান দুই ভাগে ভাগ হতে হয়েছে। পাকিস্তান থেকে হিন্দু এবং ভারতবর্ষ থেকে মুসলমানেরা পালিয়ে গেছে ভিটেমাটি ছেড়ে। যাবার পথে কিছু মরেছে এবং বাকীরা গিয়ে পৌঁছে স্টেশনের ধারে পড়ে থেকেছে, ক্যাম্পে থেকেছে, ভিক্ষে করেছে, মেয়ে বেচেছে, ছেলে বেচেছে, মরেছে। রাজনৈতিক নেতারা এদের নিয়ে খেলা খেলেছে। ভাঙিয়ে টাকা রোজগার করেছে। ক্যারমের গুটির মত বাপ গেছে এ পকেটে, মা গেছে ও পকেটে, ছেলেমেয়েরা বোর্ডে পড়ে থাকবার মত পড়ে থেকেছে পথেঘাটে।

রাশিয়া অ্যামেরিকা স্পেস-শিপ উড়িয়েছে। রকেটের পর রকেট উঠেছে শূন্তমণ্ডলে। পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরেছে, চাঁদে গিয়ে পৌঁছেছে; অ্যাটম বোমার পর হাইড্রোজেন বোমা তৈরী হচ্ছে। মানুষেরা গরুর গাড়ি ঘোড়ার গাড়ি পার হয়ে রেল মোটরের যুগে এসে দু'দুটো মহাযুদ্ধ লড়া শেষ করে এরোপ্লেনে উড়তে আরম্ভ করেছে। এবং সে স্পীড একশো মাইল থেকে উঠতে উঠতে এখন জেট প্লেনে পাঁচশো মাইলে পৌঁছেছে। আগের কালে সমুদ্রে জাহাজে করে ভাসতে ভাসতে এসেছিল ইয়োরোপের বিদ্যা, ইয়োরোপের ফ্যাশন, তার সঙ্গে বাইবেলের উপদেশ এবং আদর্শ। এখন ওই প্লেনে করে এবেলা ওবেলা এসে পৌঁছচ্ছে ইংল্যাণ্ডের ডেমোক্রেসী, অ্যামেরিকার অ্যামেরিকানিজম, সোসালিজম, কম্যুনিজম—তার সঙ্গে আরও অনেক ইজম। ভারতবর্ষের গান্ধীবাদ অচল হয়েছে, গান্ধীজীকে এদেশের মানুষেরাই গুলি করে মেরেছে। গান্ধীজী গেছেন, রুজভেল্ট গেছেন, উইনস্টন চার্চিল গেছেন, জোসেফ স্টালিনও গেছেন। স্টালিন একবার যান নি দু'দুবার গেছেন, একবার ক্রেমলিন থেকে লেনিনের সমাধিমন্দির, লেনিনের কফিনের পাশেই তাঁর কফিন রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয়বারে লেনিনের সমাধিমন্দির থেকে ক্রেমলিনের দেওয়ালের পাশে কবর দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে কারুর অপরাধ হবার অবকাশ কোথায়। এবং হলে কার আইনে হবে। ঈশ্বর তো মৃত।

অংশুমান বলে—যার চোখ আছে, মন আছে, অনুভূতি আছে সে নিশ্চয় বুঝতে পারে যে গোটা পৃথিবীটিই একটি বিরাট কবরে পরিণত হয়েছে, সে কবরে গোর দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরের কবর। ঈশ্বরের মৃতদেহকে সেখানে যুদ্ধের মড়ার সঙ্গে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে লিখে দেওয়া হয়েছে—হতভাগ্য অজ্ঞাতপরিচয় ধিক্‌তদের সমাধি।

এ কথা অংশুমানই বলতে পারে। ঈশ্বরের কবরের উপর দাঁড়িয়ে আছে আজ সবাই—সে পুরোহিত পূজক পাদরী থেকে শুরু থেকে সাধারণ সব মানুষই এবং একটি অস্বস্তি অনুভব করছেও সকলেই, প্রায় সমান অস্বস্তি; কিন্তু বলতে তারা পারে না। বলতে অংশুমানের

মত মানুষই পারে।

বহুনিন্দিত অংশুমান বহুবন্দিত না হোক, অনেক অভিনন্দনও সে পেয়েছে। শিবকিংকর গুপ্ত বলে—হ্যাঁ, হ্যাটস্ অফ তোমাকে অংশুমান। বাবা আমি শিবকিংকর, আমি বহু তরুণ মস্তক চর্বণ করেছি এবং বেমালুম হজম করেছি কিন্তু তোমার মাথায় আমার দাঁতই বসল না! বসা দূরের কথা নড়ে গেল পাটিকে পাটি! এবং চিরজীবনের মত ডিসপেপসিয়া ধরে গেল। শিবকিংকর গুপ্ত তার গ্রামের লোক। সেও এই বিচিত্র যুগের এক বিচিত্র মানুষ। সে মূর্খ নয়—এম. এ. পাস, সে অক্ষম নয়—সক্ষম উপার্জনশীল ব্যবসাদার মানুষ। সে সাহিত্য-রসিক, সে নাট্যরসিক। সে চতুর, সে রাজনীতিবিদ্; এককালে সে ছিল পার্টি সিমপ্যাথাইজার, এখন হাতেকলমে রাজনীতি করে। যুদ্ধের সময় সে মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট নিয়েছিল, মেজর কর্নেলদের সেলাম ঠুকতো। ডালি দিত। বাগানে পার্টি দিত। সেখানে ঘুঙুর পরে নটরাজ নৃত্য নাচত। এবং ফরওয়ার্ড ব্লককে মনে মনে সিমপ্যাথাইজ করত। স্বাধীনতার পর কংগ্রেসী হতে চেয়েছিল কিন্তু তখন কংগ্রেস নেয় নি। অগত্যা একটা লেফটিস্ট পার্টিতে নাম লিখিয়েছিল। এখন কংগ্রেসের দরজা হু'পাট খুলে ধরেছেন ওঁরা। শিবকিংকর সেখানে জাঁকিয়ে বসেছে। শুরু করেছে মণ্ডল কংগ্রেস গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে। ধীরে ধীরে উপরে উঠছে।

শিবকিংকর পারে না শুধু ছবির রাজ্যে মাতব্বরি করতে। শিল্প সে বোঝে না; দাবিও করে না। সাহিত্যে কিন্তু দাবি তার জোরালো; সেও এককালে সাহিত্য করত। জীবনে অংশুমান যখনই এমনই কোন সংকটের মধ্যে প'ড়ে জীবনকে খতাতে বসে তখনই তার মনে পড়ে শিবকিংকরকে। শিবকিংকরের প্রতি কৃতজ্ঞতা তার যত আক্রোশ এবং ঘৃণাও তার তত। শিবকিংকর তাকে মদ খেতে শিখিয়েছে, শিবকিংকর তাকে অতসীর মুখে তুলে দিয়েছিল। নারীদেহের প্রথম আস্বাদন পেয়েছিল সে অতসীর কাছে। তখন বয়স তার পনের বছর। বিচিত্র ব্যাপার—তারিখটা ছিল ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল এবং শিবকিংকর তার বাবার নাটুকে দলেরই একজন সভ্য।

তৃতীয় পর্ব

সে সময় তার মনে হয়েছিল সে গান্ধীজীর কাছে প্রশ্ন করবে। এ কি তার পাপের ফল?

বাবা তার বাঁচেন নি। ছ'দিনের দিন অর্থাৎ যেদিন তারা বাড়ি পৌঁছেছিল সেই দিনই তিনি মারা গিয়েছিলেন। তারপর পূর্ণ এক বছর। সে একটা অপব্যয়; তার জীবন থেকে একটা বছর খসে পরে ধুলোমাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

বড়মা বড়দা মেজদা সকলে মিলে (ওরা অবশ্য মিলে এক চিরকাল) তার এবং মায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। সে কুৎসিত একটা কাণ্ড। সেকাল এবং সেকালের বিষয়-কাণ্ড

চিরকালই জটিল এবং কুৎসিত। দেবোত্তরের বিষয় এবং অধিকার নিয়ে সেই প্রথম ঝগড়া লাগল তাদের সঙ্গে। বড়মা বড়দা মেজদা প্রথম নাকি তার মায়ের সঙ্গে বাবার বিবাহটাই অসিদ্ধ প্রমাণ করবে বলে মতলব এঁটেছিল। ঝগড়া লাগল দেবত্রের অধিকার নিয়ে। তার মা এই প্রথম ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুরের পূজাঅর্চনায় অংশ নিতে গেলেন। বিষয় ভাগ হচ্ছিল। তার অনেক কৃত্য। সম্পত্তির ফর্দ—তার যাচাই (অর্থাৎ কোথাও কোন সম্পত্তি বাদ পড়ল কি না)—তারপর প্রত্যেকটির দাম নির্ণয়। তারপর তিন ভাগ করা। এই সব চলছিল।

অংশুমানের আর কলেজে যাওয়া হয় নি। তার মেসোমশায়ই তার মাকে বলেছিলেন —না, যখন ভাগ হচ্ছে তখন ও নিজে থাকুক, দেখুক বিষয়সম্পত্তি কোথায় কি আছে—কোন্‌টা কি চিনুক।

এরই মধ্যে একদিন শিবকিংকর এসে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলেছিল—পড়া ছেড়ে দেবে? কলকাতায় যাবে না? থাকতে পারবে?

অংশুমান একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বুঝতে চেষ্টা করেছিল সে কি বলছে। শিবকিংকর বলেছিল—তোমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। ভারী দুঃখ করছিল। বলছিল, হয়তো ভুলেই যাবে আমাকে। কি বলব বল তাকে?

অংশুমান ভয় পেয়েছিল কিন্তু সামলে নিয়েছিল—বলেছিল—কিছু না।

অতসীর কথা সে ভোলে নি। নিত্যই প্রায় মনে পড়ত তাকে। মনে পড়াতো তার বড়মা তার বড়দা।

তারা তার মাকে বলত—ওই—ওর পাপেই হল এটা। সব হল ওর জন্যে। দেবতাকে দেবতা বলে নি, গোসাঁই বলে নি, সেদিন ভোরবেলা আমি কাপড় ছেড়ে মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছি—মালা গেঁথে রেখেছি, বলেছি সকালে মন্দিরে এসে ঠাকুরকে মালা দিয়ে প্রণাম করে যাবে। আগে ঈশ্বর, তারপর দেশ—স্বাধীনতা। তা না। শুনলাম দেরি হয়ে যাবে বলে ওই নাস্তিক অহিন্দু মেয়েটি তাকে আসতে দেয় নি। দু-তিন মিনিট দেরিতে মহাভারত অশুদ্ধ হত।

তার মাও বোধ হয় এ প্রশ্নে ও প্রসঙ্গে বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি শ্রাদ্ধের দিন থেকে মন্দিরে নিয়মিত যেতে শুরু করেছিলেন। প্রথম প্রথম শুধু দ্বিপ্রহরে রুদ্ধদ্বার মন্দিরের সামনে নতজানু হয়ে চোখ বুঁজে বসে থাকতেন। শ্রাদ্ধের কয়েকদিন পরই অংশুমানই এটা আবিষ্কার করেছিল। তারও মনে এমনই একটা প্রশ্ন ঘনিয়ে ঘনিয়ে যেন বাষ্প থেকে বস্তু হয়ে উঠছিল।

অপরাধ কি তার?

অতসী-প্রসঙ্গটা বিচিত্রভাবে তার মনের মধ্যে ঘুরতে আরম্ভ করেছিল তখন। অনুতাপ দিন দিন যত উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল ততই তার চিত্ত হয়ে উঠছিল অশান্ত অধীর। সেও সান্ত্বনা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। একদিন ঠাকুরবাড়িতে সেও এসেছিল ওই প্রশ্ন রাখতে—"অপরাধ কি আমার? ওই অসতীর জন্তেই কি?" নির্জন দুপুরে এসেছিল ওই প্রশ্ন করতে। এসে দেখলে ঠাকুরঘরের দরজা খুলে সামনে নতজানু হয়ে বসে আছেন তার মা।

তাঁর কটি কথাও তার কানে এসেছিল।—আমার পাপেই এই হল ?

সে নিঃশব্দে এসেছিল নিঃশব্দেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু সেই দিন থেকেই ঝগড়া বেধেছিল তার মায়ের সঙ্গে বা তাদের সঙ্গে দাদাদের। বড়মা সন্ধ্যেবেলা চীৎকার জুড়ে দিয়েছিলেন—দুপুরে ঠাকুরঘর খুলেছে কেন? ঠাকুর বিশ্রাম করছিলেন। ভাত খেয়ে ভাত-খাওয়া কাপড়ে মন্দিরে ঢুকেছে কেন? যে নাস্তিক যে অবিশ্বাসী সে ঠাকুরঘর খুলবে কেন, ঢুকবে কেন ?

মা যুক্তির অবতারণা করে বলেছিলেন—চেঁচিয়ো না দিদি; ঠাকুর কখনও ঘুমোন না, কিংবা ঘুমুলেও জেগে থাকেন। ওঁর নিদ্রাও জাগরণ, জাগরণও নিদ্রা। ভাত-খাওয়া কাপড়কে আমি অশুচি মনে করি না। আর নাস্তিকও আমি নই।

দু'একটা কথার পরই বড়মা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, ঠাকুরবাড়িতে তাদের কোন অধিকার নেই। ঠাকুরবাড়ি দেবোত্তর, তাঁর নিজস্ব। নিরঞ্জন চৌধুরীর প্রথম পক্ষের সংসারের। বরাবর তারাই ভোগ করে আসছে। নাস্তিক শোভা চৌধুরী বা তার পেটের ছেলেকে তারা ঠাকুরবাড়িতে ঢুকতে দেবে না।

সঙ্গে সঙ্গে তার মা ঠাকুরবাড়িতে হুকুমজারি করলেন—ঠাকুরের প্রসাদ ছোটতরফের অর্ধেক (অংশুমানের জ্যাঠামশাইয়ের অংশ বাদ দিয়ে) যথানিয়মে তিন ভাগ হবে। এবং অংশুমানের ভাগ এ বাড়িতে আসবে।

থাক, ঠাকুর-দেবতার প্রসঙ্গ থাক।

ঠাকুর নিয়ে সে মামলার কথা অবান্তর। ঠাকুরে দেবতায় তার বিশ্বাস বা অবিশ্বাস দুইই সমান ঝাপসা। কোনটারই রঙ গাঢ় ছিল না। ওই কাঁচা যতক্ষণ ততক্ষণ একটা রঙ রয়েছে বলে মনে হত। কিন্তু শুকুলেই সাদা হয়ে যেত। রঙও ছিল না, আকার-অবয়বও ছিল না। ক্রমে ক্রমে পড়াশোনার সঙ্গে এবং বেড়ে ওঠার সঙ্গে কাঁচাতে কোন রঙ আর দেখায় না। সম্ভবতঃ একেবারেই উবে গেছে। দুর্গাপূজার উৎসবের মধ্যে উল্লাসের মধ্যে জীবনে একটা পার্বণ আসে কিন্তু কোন দেবতা বা ঈশ্বরের কোন সংস্রবই তাতে নেই। না গন্ধ, না স্পর্শ, না কোন ক্ষীণ শব্দ। তার জন্ত তার আপসোসও নেই উল্লাসও নেই। মধ্যে মধ্যে নিষ্ঠুরতম মুহূর্তে ভগবান বা হে ঈশ্বর বলে একটি শব্দকে প্রয়োজন হয়—বুক থেকে আপনি বেরিয়ে আসে—এই পর্যন্ত। তার বেশী কিছু নয়। ঈশ্বর নেই। থাকলেও তিনি অপরাধ নেন না বা অপরাধের জন্ত কোন শাস্তি কাউকে দেন না। এটা সে নিশ্চয় করে জেনেছে।

তার মায়ের অপরাধ তো নিশ্চয় ছিল না। তারও ছিল না। না—ছিল না ছিল না। কথাটা তার নিজের মনেই ওঠে এবং নিজের মনেই না না বলে চীৎকার করে ওঠে। অতসীর সঙ্গে তার জীবনের যোগ যেভাবেই দেখুক তাতে তার কিছু আসে যায় না। অতসীর সঙ্গে তার জীবনের তার স্নেহের যোগ যেদিন হয়েছিল—সেই দিনই তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল, এর জন্ত দীর্ঘনিশ্বাস তার আজও পড়ে। আজও তার মন বিষণ্ণ হয়—চোখ দুটি যেন আপনাআপনি নেমে আসে এবং অবাঞ্ছিত ঘটনা মনে পড়লে অকারণে মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেও যে চঞ্চলতা প্রকাশ করে সেই চঞ্চলতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস

বেরিয়ে আসে, তাকে কিছুতেই রোধ করতে পারে না। মনের মধ্যে যুক্তি তাকে যাই বলুক এবং সে যুক্তি যত সত্যই হোক তাতে ওইটুকুর গতিরোধ হয় না।

হয়তো এইটেই শেষ দুর্বলতা।

হে ভগবান!

এই মুহূর্তে—আজ ১৯৩১ সালের এই সকালবেলাটিতে বাবার মৃত্যুর স্মৃতি থেকে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল কালকের সন্ধ্যেবেলার স্মৃতি। ভেসে উঠল তার হাতের ভাঁজের ওপর সে তুলে নিয়েছে একটি রক্তাক্তদেহ শিশুকে। অ্যাকসিডেণ্ট হওয়া গাড়ি থেকে সে-ই তাকে বের করেছিল। একটা হাত ছেলেটির ছেঁচে পিষে গিয়ে বীভৎস ভাবে ঝুলছিল। সে-ই তাকে ট্যাক্সিতে সারা রাস্তা সেই হাতের ওপরে শুইয়ে নিয়েই মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত এসেছিল। সে-ই তাকে এমারজেন্সী ওয়ার্ডে টেবিলের উপর শুইয়ে দিয়েছিল। তার পাশে শুইয়ে দিয়েছিল আহত অচেতন সীতাকে।

ছেলেটির মুখের দিকে সে অনেকবার তাকিয়ে দেখেছিল। সুন্দর ছেলে। সব থেকে চোখে পড়েছিল কপালে বাঁদিক ঘেঁষে চুলের আরম্ভরেখায় একটা ঘূর্ণি। সেটা তারও আছে।

না। তবু তার মনে হয় নি সে সন্তান তার।

মনে হওয়া উচিত ছিল। নিশ্চয় উচিত ছিল।

ভগবানকে সে মানে না। অন্ততঃ মাথা ঘামায় না তাকে নিয়ে। বিপদ থেকে উদ্ধার করতে ডাকে না, প্রার্থনা পূর্ণ করতে ডাকে না; পূজা করব বলেও ডাকে না। মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে গান গাইবার জন্যেই ডাকে, পূজা নিবেদন করে। সেও নেহাত অর্থহীন ভাবে। কিন্তু আজ সে এই অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ডাকলে। হে ভগবান! এবং বসে বসেই বিছানার বালিশটার উপর মুখ রাখলে।

বেশ কিছুক্ষণ এমনিভাবে মুখ গুঁজে বসেছিল সে। নিজেকে সামলাচ্ছিল। হঠাৎ হরি এসে বললে—শিবকিংকরবাবু আসিল। বাহিরে বসি আছে।

শিবকিংকর? শিবকিংকর গুপ্ত! শিবকিংকরের সঙ্গে আশ্চর্য সম্পর্ক তার। দরিদ্র প্রতিষ্ঠাহীন আত্মীয় যেমন অবাঞ্ছিত হয়েও প্রতিষ্ঠাবান ধনীজনকে ধরে থাকে—বার বার তার পিছনে ফেলে-আসা বাড়ির বংশের ইতিহাসের সঙ্গে তাকে জোর করে যুক্ত করে রাখে, তেমনিভাবেই তাকে ধরে আছে।

সীতাকে সে-ই নিয়ে এসেছিল।

আবার মনে পড়ে গেল অতসীকে। অতসীকে আবার দ্বিতীয়বার তার সামনে নিয়ে এসেছিল এই শিবকিংকর। এবং তারা সারা জীবনের স্রোতকে সে আজকের এই গতিমুখে মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল।

বাবার মৃত্যুর পর তখন তাদের পার্টিশনের কাজ চলেছে। দেবোত্তরের দাবি নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত আদালত গ্রাহ্য করে সালিশ মান্য করা হয়েছে। তাদের জ্যাঠতুত ভাই, বাঁড়ুজ্জেদের শিবদাস ঋষি, গুপ্তদের হরিকিংকর কবিরাজ ডাক্তার এই নিয়ে সালিশী তৈরী হয়েছে। কর্মচারীরা কাগজ তৈরী করছে। সম্পত্তির

তালিকা, দেনাপাওনার তালিকা, দেবোত্তরের ব্যাপারের মীমাংসার যুক্তি তৈরী হচ্ছে। মেসোমশায় হরিচরণবাবুর পরামর্শমত সে কলেজে ফিরে না গিয়ে এই বিষয় ব্যাপার দেখছে এবং বুঝবার চেষ্টা করছে। তার পিছনে আছেন তার মা। মা তখন তার আদালত থেকে নিযুক্ত গার্জেন। তাদের কিছুটা জমিদারি আছে সেই কারণে সে সাবালক বলে গণ্য হবে একুশ বছর বয়সে। মা তার অনেক আগে থেকেই বিষয় ব্যাপার বোঝেন। তিনি পুরো অন্দরবাসিনীও কোন কালেই ছিলেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর তখন আরও বেশী করে বেরিয়ে আসতে হয়েছে তাঁকে। নিরঞ্জন চৌধুরীর মৃত্যুর পর তিনিই হয়েছেন দেবগ্রাম কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট; ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর হয়েছিলেন নিরঞ্জন চৌধুরী—সে শূন্য আসনেও তিনি গিয়েছেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। কেউ দাঁড়াতে সাহস করে নি। জেলা কংগ্রেসেরও মেম্বর তিনি। তা ছাড়া তখন চারিদিকে কাজ, চারিদিকে আহ্বান। সে একটা আশ্চর্য সময়—সে সময়ের দিন আলাদা ক্ষণ আলাদা; মানুষ আলাদা মন আলাদা; স্বাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক হানাহানি নিষ্ঠুর রক্তপাত রাজনৈতিক 'ঘোর কুটিল দ্বন্দ্বের' মধ্যে ভারত যেন বসে আছে বোধিদ্রুমের তলে, অবিচলিত এবং ধ্যানমগ্নের মত। সমস্ত পৃথিবী তাকিয়ে আছে এই দেশের দিকে। এরই মধ্যে গান্ধীজী খুন হলেন ফ্যানাটিক হিন্দু গডসের হাতে। 'হা-রাম' বলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। গান্ধীজীর মরজীবন শেষ হল কিন্তু তাঁর অহিংস ভারতের সাধনা যেন অশেষ হয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। দিকে দিকে আহ্বান। সভা, সভা আর সভা। দেবগ্রামের চারিপাশের গ্রাম থেকে তার মায়ের ডাক আসছে। তার মায়ের দু-তিনটে বক্তৃতা তার মুখস্থ হয়ে গেছে। বক্তৃতা তিনটে লিখেছিল সে-ই—মা সংশোধন করে নিয়েছিলেন। ওঃ সে কি প্রদীপ্ত কাল!

আজ তার মনে হয় গান্ধীজীর অহিংসা, গান্ধীজীর জীবনদর্শন, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও পন্থার পক্ষে সেই কয়েক মাস বা একটা বছরই ছিল শুক্লপক্ষের পূর্ণ তিথি। তারপরই ক্ষয় হতে লেগেছে। আজ—থাক। আজ গান্ধীজী ছবিতে আছেন। নিতান্ত অসহায়—একান্ত। কি বলবে? করুণার পাত্র বলতে ইচ্ছে করছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীর তিরোধানের পর—তাই। সত্যই তাই তিনি। থাক। থাক। আজকের কথা থাক। সেদিন গান্ধীজীর চিতাভস্ম অসংখ্য পাত্রে ভরে সারা ভারতবর্ষে নদীর ঘাটে ঘাটে ভাসিয়ে দিয়ে গান্ধীঘাট তীর্থ সৃষ্টির কাজ চলছে।

বাংলাদেশে প্রধান গান্ধীঘাট তীর্থ হয়েছে ব্যারাকপুরে। এ ছাড়া জেলায় জেলায়, বড় বড় গ্রামে, শহরে, যেখানে নদী আছে প্রায় সে সব জায়গায় সর্বত্রই চিতাভস্ম পাঠানো হয়েছে; এবং বিশিষ্ট গান্ধীবাদী বা ব্যক্তিরা সেই পাত্র মাথায় নিয়ে স্থানীয় ঘাটে বিসর্জন দিয়ে স্নান করে তীর্থ সৃষ্টি করেছেন। দেশের লোককে ডাকতে হয় নি। ডাক দেওয়াই ছিল। দিক থেকে দিকে তার প্রতিধ্বনি ক্রমান্বয়ে ধ্বনিত হয়েই চলেছে। হৃদয়ের ডাক—কর্মকর্তাদের সযত্ন ও সচেতন পরিকল্পনার ডাক; বুদ্ধিমান মানুষের সজাগ মনের ডাক, পলিটিক্যাল পার্টির ডাক—থাক থাক। আজ চিত্ত তিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ভুলতে যে পারছে না। ভোলা যে যায় না। সেদিন ওই গান্ধীজীর প্রভাবে আচ্ছন্ন মন নিয়েই সে শিবকিংকর এবং অতসীর

সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে কি সময়!

মানুষের স্পর্ধা আছে—সে স্পর্ধা জীবন-প্রকৃতিকে ভেঙেচুরে সরিয়ে নড়িয়ে অনেক অদল-বদল করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতও করেছে। জন্তুজানোয়ার পশুদের থেকে সে সম্পূর্ণ পৃথক। সে মানুষ। এমন কি জীবজগতেও সে স্বতন্ত্র বিশেষণ নিয়ে সবার থেকে সরে পৃথক হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে যখন সেই স্পর্ধাকে অশেষ ও অসম্ভব করে তুলতে চায় তখন যত ভোগ করে লাঞ্ছনা তত জর্জরিত হয় প্রহারে। এবং তারই ফল হয় এই যে জীবনটাই হয়ে ওঠে অশান্তিতে অসার্থক। এবং জীবনই করে তার প্রতিবাদ

মনে পড়ছে তার সে কথা। অজয়ের ঘাটে গান্ধীজীর চিতাভস্ম ভাসিয়েছিলেন তার মা। অংশুমান ছিল তার মায়ের পাশেই। তাইই থাকত তখন। মায়ের ঠিক পাশে পাশে থাকত। শিবকিংকর এবং অতসী যেদিন তার সামনে এল এবং সে তাদের সামনে গিয়ে অসীম স্পর্ধায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াল সেদিনও সে তার মায়ের পাশেই দাঁড়িয়েছিল একটি সমারোহের আসরে। ওই গান্ধীঘাটের উপরেই স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সমারোহ হচ্ছিল। সুন্দর একটি স্তম্ভ তৈরী করিয়ে তার গোড়ায় একখানি মার্বেল ট্যাবলেট লাগানো হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল—"দেবগ্রাম মহাত্মা গান্ধী ঘাট। মহাত্মার আদর্শের উপাসক স্বর্গীয় নিরঞ্জন চৌধুরীর নামে উৎসর্গীকৃত হইল।"

অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করছিলেন তার মা। উদ্বোধন করবার জন্য এসেছিলেন প্রসিদ্ধ গান্ধীপন্থী নেতা, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি।

সে মায়ের পাশেই ছিল। সেই স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিল। ছাত্রজীবন থেকেই সে লেখে।

অবশ্য বাংলাদেশের ছেলে কে না লেখে। সেও লিখত। তার মা এর জন্য অহংকার করতেন—বাবাও খুশী হতেন। সেদিনের স্বাগত সম্ভাষণ সে লিখেই পড়েছিল। মনে পড়ছে, ভাষণে ভাবাবেগ কিছুটা বেশী থাকলেও ভাষণটি ভালোই হয়েছিল। ভাষণের শেষে হাততালির উল্লাসের মধ্যে সে বুঝতে পেরেছিল যে ভালো হয়েছে তার ভাষণ। বেশ একটু অহংকৃত আত্মতৃপ্তি নিয়ে সে চেয়ারে বসে রুমাল বের করে মুখ মুছছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল সাজানো শামিয়ানার আসরের পরই যে সব লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে তাদেরই প্রথম সারিতে একেবারে তাদের ডায়াসের ডানদিকে হাত কুড়ি দূরে দাঁড়িয়ে আছে শিবকিংকর এবং অতসী। একমুহূর্তে তার সমস্ত শরীরে যেন একটা ঠাণ্ডা প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল। পুতুলের মত সে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টে। হাতের রুমাল হাতেই ধরা ছিল। মনে পড়ছে, তার মনে হচ্ছিল অতসী যদি এই সভার মধ্যে এগিয়ে এসে বলে—! পরমুহূর্তেই মন বলেছিল —বলে কি? বলবেই! তার দাদারাই তাকে বলাবার জন্য এনেছে। শিবকিংকর তাদের দাদাদের নামে বন্ধু, কাজে এজেন্ট! অতসী এখানকার থিয়েটারে পার্ট করে, সে থিয়েটারের কর্তা তার দাদারাই।

অতসীর মুখে কিন্তু একটি আশ্চর্য হাসি মাখানো ছিল। যে হাসিতে মানুষের মুখ প্রসন্ন দেখায় না সে হাসি নকল হাসি—মেকী হাসি। অতসী অভিনয় করত। কিন্তু তার সেদিনের

হাসি অভিনয়ের নকল হাসি ছিল না সে কথা তার ভয়ার্ত মনও বুঝতে পেরেছিল।

অতসী তখনও তার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল এবং ঠোঁটের হাসিতে প্রসন্নতা যেন শরৎকালের শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার মত ঝরে পড়ছিল। তবু তার ভয় যায় নি, ধীরে ধীরে সে নিজের জোর সঞ্চয় করেছিল, গান্ধীজীকে স্মরণ করে। বেশ তো সত্যকেই সে—।

তার প্রয়োজন হয় নি। শিবকিংকর ভিড়ের মধ্য দিয়ে দিয়ে তার কাছে এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং একসময় তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল—ও তোমাকে দেখতে এসেছে। ভয় নেই, কেউ কিছু জানবে না।

* * *

সত্যই তাই। অতসী সত্যসত্যই তাকে দেখতেই এসেছিল। এবং বলতে এসেছিল—তুমি আমাকে মাফ্ করো। হয়তো সেদিন আমাকে ছুঁয়েই তোমার এমন ক্ষতি হল—তোমার বাবা চলে গেলেন সেই রাত্রে।

অংশুমান বলেছিল—না অতসী, ও তুমি মনে করো না। ও মনে করা ভুল। কিছুর জন্যেই কিছু হয় না। বিশেষ করে আমি পাপ করলে আমার মায়ের অনিষ্টও কখনো হতে পারে না। এটা বিংশ শতাব্দী। জান, গান্ধীজীর মত মানুষ এমন ধরনের কথা বলেছিলেন—তাঁকেই কেউ বিশ্বাস করে নি।

হেসে বলেছিল—তাহলে ইংরেজদের মত অধর্ম করে এত বড় জাত তারা হতে পারত না।

সেদিন তার সমস্ত মনকে যে-আলো যে-হাওয়া ব্যাপ্ত করে ছিল তা ছিল রাজনৈতিক ঋতুর আলো-হাওয়া। এ ছাড়া উপমা তার মনে যোগায় নি।

সন্ধ্যার পর শিবকিংকর তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাদের বাড়িতে। শিবকিংকরের বাড়িতে তার মা আর বিধবা দিদি ছাড়া কেউ ছিল না। অতসী তাদের বাড়িতে আগেও এসে থেকেছে। বন্ধুর বোন বলে পরিচয় ছিল তার। সেই শিবকিংকরের বাড়িতেই কথা হয়েছিল।

অতসী বলেছিল—আমার আর আপসোসের আক্ষেপের শেষ ছিল না অংশু!

থেমে গিয়েছিল একটুক্ষণের জন্ত। তারপর বলেছিল—বর বলতে লোভ হচ্ছে কিন্তু বলব না। তোমার থেকে বয়সে আমি মাস কয়েক নয় বছর ছু-তিনের বড়। খোকাবর মিথ্যে বলি নি। কিন্তু আর বলব না। নাঃ—তুমি অনেক বড় হবে। আজ সভায় যা সুন্দর বললে তুমি! আর ওই তোমার মা!

চুপ করে বসে ছিল অংশুমান, কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছিল, অনেক কথা যেন তোলপাড় পাকিয়ে একটা ঝড়ের মত প্রচণ্ড প্রবল কিছু সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল।

শিবকিংকর তাদের কাছেই ছিল অথচ ছিল না। অর্থাৎ ক্রমাগত বাইরে যাচ্ছিল আর আসছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্ত মধ্যে মধ্যে বসে ছুটো চারটে কথা বলে আবার একটা প্রয়োজন খুঁজে নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল। কথা বলছিল অতসী একাই।

এই ক'মাসের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। তার মধ্যে প্রধান ঘটনা হল—সে তার

সেই রাত্রির প্রয়োজনে ভাড়া করা ঘরখানা ছেড়ে দিয়েছে। শুধু ঘরখানাই নয় তার সঙ্গে জীবনের সকল সংস্পর্শ ছোঁয়াচও ধুয়ে মুছে ফেলেছে।

—মনে একটা সাধ বাসা বেঁধেছিল তোমাকে নিয়ে। আবার তোমার এই দুর্ভাগ্য ঘটল বলে আক্ষেপ হল আরও বেশী। সেই আক্ষেপে সব ছেড়ে দিলাম। জান, রোজ গঙ্গাস্নান করেছি। এই লোকটিকেও তাড়িয়ে দিয়েছি। বলেছি, আর আমার ছায়া মাড়াবে না। ছাড়তে পারি নি কেবল অভিনয়। ওটা ছাড়লে ভাইবোনদের পড়া বন্ধ হত। সংসার উপোস যেত। অ্যামেচার ছেড়ে পাবলিক থিয়েটারে চাকরি পেয়েছিলাম। সেখান থেকে চান্স পেলাম ফিল্মে। সেকেণ্ড হিরোইনের পার্ট পেয়েছি একখানা বইয়ে। নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছি কিন্তু মনের মধ্যে অহরহ অশান্তি ছিল তোমার জন্যে। এই লোকটি—

শিবকিংকরকে দেখিয়ে বলেছিল—এই লোকটিকে আমি ছেড়েছিলাম, সেও অন্যখানে বাসা বেঁধেছিল কিন্তু আমাকে ছাড়ে নি। মানে নিয়মিত থিয়েটারে আসত, বকবক করত। আর তোমার কথা বলত। মন্দ বলত না—ভালোই বলত।

হেসে অতসী বলেছিল—বলত কি জান। অংশু একদিন লীডার হয়ে যাবে। ভারী ভালো ছেলে। ওর অনিষ্ট করা আমাদের উচিত হয় নি। তোমার বক্তৃতা করার কথা বলত—তোমার সাহসের কথা বলত। তোমাদের এখানে নাকি হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গার সময় তুমি মুসলমানদের বাঁচাবার জন্যে যে সাহস দেখিয়েছিলে তার তুলনা হয় না। আরও কত কথা। শুনে শুনে সাধ হত একবার তোমাকে দেখে বলে আসব আমি তোমার অনিষ্ট করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এই দিন পনের আগে ওর কাছে হেরে গেলাম। ওকে বিয়ে করব বলে মন বাঁধলাম। কথা পাকা হয়ে গেল। হঠাৎ কাল এসে বললে, অতসী, যাবে দেবগ্রামে অংশুকে দেখতে? যাব যাব বলো। যাবে তো চলো। দেবগ্রামে অংশুর বাবার নামে অজয়ের ঘাটে স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন হবে। অংশুর চেহারাটা দেখতে পাবে। বললাম—যাব। চলে এলাম।

কথা শেষ করে সে হাসিমুখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। অংশুমান নিজেও তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে। মনের মধ্যে যেন একটা আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল গল্পে উপন্যাসে কাব্যে পুরাণে অতসীর মত মেয়ে বোধ করি হয় নি। সে অতুলনীয়া, সে অপরূপা।

হ্যাঁ, তার রূপেরও তুলনা ছিল না বলেই সে-দিন তার মনের ভিতর থেকে তার অন্তরাত্মা বলতে চাচ্ছিল—না—না না। অতসীকে ছেড়ে দিতে আমি পারব না। পারব না।

ঠিক তারই পাশাপাশি আরও একটা আবেগ ঝড়ের সঙ্গে নদীর বুকের মত বনের মাথার মত আন্দোলিত হচ্ছিল। সে-আবেগ অংশুমানের সেই ১৯৪৮।৪৯ সালের আদর্শবাদের আবেগ। সেদিন এমন করে নিজেকে পৃথক্ পৃথক্ ভাগ করে দেখতে পারে নি। সেদিন দুটো মিশে একটা হয়ে গিয়েছিল। যোল-সতের বছরের অংশুমানের তরুণ চিত্তকে শুধু অতসীর আকর্ষণই আকৃষ্ট করে নি—সে আকর্ষণকে আরও প্রবল করে তুলেছিল তার সেদিনের সত্যনিষ্ঠার আদর্শ।

মানুষের মন চিরদিনই সত্যনিষ্ঠ। সত্যনিষ্ঠ তো নয়, সত্যকে প্রকাশ করাই তো স্বাভাবিক—উচিত। প্রকাশ করে না কেবল লজ্জার জন্যে সংকোচের জন্যে; অপরাধবোধের জন্যে। মানুষের চালাকির প্রথম শিক্ষা হয়েছে মিথ্যে কথা বলতে শেখার মধ্যে।

এই দুর্বলতাকে জয় করে মানুষ আবার যেদিন অবশ্যম্ভাবিত্বকে মাথা পেতে নিয়েও মিথ্যার পরিবর্তে নির্ভয়ে সত্যকেই প্রকাশ করে তখনই মানুষের হয় চরম জয়। এ জয়ের চেয়ে বড় জয় আর হয় না। মানুষ এর জন্যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েও মরে না, সর্বস্বান্ত হয়ে সর্বাঙ্গে ধুলো মেখেও রাজার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে। এর এক আশ্চর্য শক্তি, বিচিত্র মোহ। সেই শক্তি সেদিন যেন এদেশের আকাশে বাতাসে জলের মধ্যে মিশে ছিল। অংশুমান দেবগ্রামের চৌধুরীবাড়িতে জন্মে মা-বাপের কাছ থেকে এরই দীক্ষা পেয়েছিল। ছেলেবেলায় ছেলেখেলার মধ্যেই এর কিছুটা সাধনাও করেছিল। বন্ধুদের কাছে এর জন্য তার অহংকারও ছিল। এবং সেদিন অতসী তাকে ভয় দেখালে এবং শিবকিংকর তাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইলে সে কি করত তা আজ বলতে পারে না তবে তারা দুজনেই যখন তাকে দেবতা বানিয়ে প্রশংসা করে তাকে মুক্তি দিতে চাইলে তখন সে চমকে উঠে সরে এসেছিল। কারণ মনে হয়েছিল তাকে ছোট করে অতসী শিবকিংকরই বড় হয়ে গেল। তাই বা কেন, নিজের কাছেও নিজে সে ছোট হয়ে যাচ্ছিল।

সে বলেছিল—না।

অতসী চমকে উঠে বলেছিল—কি না?

—এ হয় না।

—অংশু!

—না। তোমাকেই আমি বিয়ে করব।

শিবকিংকর বলেছিল—চুপ কর অংশু চুপ কর!

—না। চুপ করতে আমি পারব না শিবকিংকরদা!

*　　　*　　　*

"একটা ইমোশনাল ফু—ল।"

কথাটা বলেছিলেন তার মেসোমশাই হরিচরণবাবু উকীল।—"এর কোন মানে হয়, না মাথামুণ্ড আছে? এঁচোড়পাকা কাজিল ছেলে—এ প্রিকসাস চাইল্ড! তার থেকে বয়সে পাঁচ-ছ' বছরের বড় একটা ফলেন গার্ল, তাকে বিয়ে করবে! আবদার!"

অংশুমান সত্যসত্যই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা করে বসেছিল। সে সেইদিন রাত্রেই গ্রাম থেকে কলকাতা চলে এসেছিল। এবং কলকাতা থেকে দীর্ঘ চিঠিতে আগাগোড়া সমস্ত কথা প্রকাশ করে তার মাকে লিখেছিল, আমি এই অসতীকেই বিবাহ করতে চাই। তাকে আমি ভালবাসি এ কথাও সত্য এবং লোভের বা মোহের বা যদি ভ্রান্তিই হয় সেই ভ্রান্তির মধ্যে যা ঘটে গেছে তারপর তাকে বিয়ে করা ছাড়া আমার আর অন্য পথ নাই।

কলকাতায় এসে এবার আর সে মেসোমশায়ের বাড়িতে ওঠে নি। এসে উঠেছিল একটি ভালো বোর্ডিং হাউসে। বাড়ি থেকে আসবার সময় তার দু সেট সোনার বোতাম,

গোটা পাঁচেক আংটি, হাতের বিছে তাগা, তার অন্নপ্রাশনে পাওয়া একছড়া হার, পৈতের সময় পাওয়া আর একছড়া হার এবং দশখানা গিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সে নিজের ঘরকে বুঝত—তার নিজের মাকে চিনত এবং জানত যে এর জন্যে তাকে লড়াই দিতে হবে। সে লড়াই সহজ হবে না। বিষয়ী ঘরের ছেলে—বাপের কাছে কাছে ছিল ছেলেবেলা থেকে এবং বাপের মৃত্যুর পর বিষয় নিয়ে সৎমা ও সৎভাইদের সঙ্গে পার্টিশনের কাজ হাতে-কলমে করে এসব বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল না। সে জানত তার সৎভাইরা এবং সৎমা তারস্বরে চীৎকার করবেন—তার জাত গেছে। এ বিষয়ে তার কোন অধিকার থাকতে পারে না। কাজে কিছু হবে না কিন্তু চীৎকার তাঁরা করবেনই। ভয় তার মাকে। তিনি কি করবেন সেটা সে ঠিক অনুমান করতে পারে নি। তার মা গান্ধীবাদিনী একথা সত্য। কিন্তু সত্য বলেই এই সমাজবিদ্রোহী সত্যকে কি তিনি স্বীকার করে নেবেন?

১৯৪৮।৪৯ সালের ঘটনা।

আজ ১৯৪৮ সাল। ১৮।১৯ বছর আগে সেদিন যখন সে তার জিনিসপত্তরগুলো নিয়ে কলকাতা চলে এসে হোটেলে উঠেছিল তখন ওইসব প্রশ্নগুলো সমস্যাগুলো এমন পরিষ্কার বা স্বচ্ছ ছিল না। মনে মনে আশঙ্কার মধ্যে সব কিছুই অনুভব সে করতে পেরেছিল—কিন্তু আজকের মত এমন পরিষ্কার ছিল না মামলার আরজির দাবির পিছনের যুক্তির মত।

আইনও সে পড়েছে বছর তিনেক, কিন্তু পরীক্ষা দেয়নি। জীবনে সাহিত্য এবং নাটক যদি তাকে না পেয়ে বসত তাহলে সম্ভবত সে উকীলই হত।

থাক। উকীল না-হওয়ার জন্য তার আক্ষেপ নেই। গল্পলেখক উপন্যাসকার নাট্যকার হয়ে তার জীবনে একবিন্দু ক্ষোভের কারণও ঘটে নি। কারণ উকীল হলে সে হয়তো সত্যকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতেও পারত না; যাকে সে সত্য বলে মানে তাকেই সে এমন করে রক্ষা করতেও পারত না।

জীবনে সেদিন সে সত্য থেকে এক পা পিছিয়ে আসে নি।

তার মেসো হরিচরণবাবু উকীলই তার কাছে এসেছিলেন প্রথম দিন। সে বোর্ডিংএ উঠেই চিঠি লিখেছিল তার মাকে। বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিল। আর একখানা চিঠি লিখেছিল অতসীকে।

অতসী এবং শিবকিংকরকে সে দেবগ্রামে ফেলেই কলকাতা চলে এসেছিল। তারা জানতও না যে, অংশুমান এমন করে কলকাতায় চলে যাবে। তবে তত্তদিনে, অর্থাৎ সে কলকাতা চলে আসবার পর তারা নিশ্চয় দেবগ্রাম থেকে চলে এসেছে অনুমান করেই অতসীকে তার বাড়ির ঠিকানায় চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল—'আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারব না অতসী।'

তখন তরুণ বয়স। সাহিত্যে প্রথম হাতেখড়ির কাল চলছে—অনেক কাব্য করেই সে লিখেছিল—"তোমাকে মুক্তি দিতে গেলে আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে তোমাকে মুক্তি দিতে

হবে। কারণ আমার হৃদয় এখানে শুক্তি, তার মধ্যে তুমি মুক্তা হয়ে রয়েছ ; কোন দিন একটি বালুকণার মত তুমি হৃদয়ে প্রবেশ করেছিলে—তার যন্ত্রণায় জীবনের রস দিয়ে বালুকণাকে মুক্তা করে তোলার মতই তোমাকে অপরূপা করে আমিই তুলেছি এবং আমার দেহমনের সঙ্গে এক করে নিয়েছি। আমাকে শেষ না করে কি করে তোমাকে মুক্তি দেব ? তা ছাড়া আমার ধর্ম, আমার ন্যায়, আমার সত্য ? তোমাকে জড়িয়ে যে আমার সব দাঁড়িয়ে রয়েছে আজ। তোমাকে মুক্তি দিলে এক-মুহূর্তে যে সব মুখ থুবড়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে। আমার সত্য আমার ন্যায় তাসের ঘর নয়। পুরনো কালের সত্য এবং ন্যায়ের মত আধখানা রেখে আধখানা ভাসিয়ে দেওয়া যায় না। আমার সত্য, আমার ন্যায়ধর্ম মহাভারতের কর্ণের মত বীর্যবান এবং সহজাত কবচকুণ্ডলধারী। তাকে ভাসিয়ে দিলেও সে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে ফিরে আসে।" মস্ত বড় চিঠি : এবং খুব দৃপ্ত চিঠি। সে নিজেও সেদিন দৃপ্ত ছিল। আপোস সে কারুর সঙ্গে বা কিছুর সঙ্গে করে নি।

মায়ের সঙ্গেও না।

এই নিয়েই মায়ের সঙ্গে তার চিরদিনের মত বিচ্ছেদ হয়ে গেল। তার মা তেজস্বিনী ছিলেন—তার থেকেও তাঁর জেদ এবং তেজ বেশী ছিল। অংশুমানের সত্যকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তবে বলেছিলেন—তোমার সত্য তোমার, আমার সত্য আমার। দুয়ের মধ্যে আপোস হতে পারে না।

অতি নিষ্ঠুর কথা বলেছিলেন মা। লিখেছিলেন—একটা অসতী মেয়েকে আমি পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করতে পারব না। কোন একটি মেয়েকে কালো বলে তোমার অপছন্দ হলে যেমন তোমার না বলার অধিকার আছে, ঠিক তেমনি অধিকার আমারও আছে বলে আমি মনে করি। এবং সেই অধিকারেই আমি 'না' বলছি। তুমি মহাভারতের সত্যবতীর দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখেছ—"দেহগতভাবে অশুদ্ধ হয়েও সত্যবতী ভারতের সম্রাজ্ঞী হয়েছিল ; চন্দ্রবংশের প্রথম রাজা পুরূরবা অপ্সরা উর্বশীকে বিবাহ করেছিলেন, উর্বশীও দেহগতভাবে শুদ্ধ নয়।" উত্তরে আমি জানাই যে, এই দৃষ্টান্ত আমার কাছে আদর্শই নয়। পৃথিবীতে এমন ঘটেছে এবং ঘটে এ কথা আমি মানি। কিন্তু এমনটিই ঘটা উচিত তা আমি কখনই স্বীকার করি না। এবং স্বীকার করব না জানবে।

অংশুমান লিখেছিল—দুর্ভাগ্যের কথা আজ গান্ধীজী আর বেঁচে নেই। থাকলে তিনি আমাকে আমার কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করতেন এ কথা নিশ্চয়, কিন্তু আমার এই সংকল্পকে তিনি সমর্থন করতেন।

মা লিখেছিলেন—তাহলে গান্ধীজীর এ সমর্থন আমি তুচ্ছ করতাম।

থাক। সে বাদানুবাদ দীর্ঘ।

আজও সে-কালের সেই সুদীর্ঘ বাদানুবাদের সমস্ত কথাগুলিই অংশুমানের মনে পড়ল। অন্যায় তার হয়েছিল এ কথা সে আজও মনে করে না। না। তবে হয়তো তার দিকের ন্যায়ের দাবিকে সে বড় বেশী রূঢ়ভাবে প্রকাশ করেছিল। মা তার দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনিও তাঁর ন্যায়ের দাবি থেকে একবিন্দু ছেড়ে আসতে রাজী হন নি।

অথচ ন্যায় অন্যায় দাবি এবং জোর যার যা থাক, তাকে উপেক্ষা করে বাস্তব যা ঘটাবার তাই ঘটিয়ে যায়। কথাটা হয়তো ঠিক হল না—দু'পক্ষের ন্যায় অন্যায়ের দাবি এবং জোরের যোগবিয়োগ করে যা ঘটবার সেইটে ঘটে। তারা মা এবং ছেলে দু' পক্ষ যখন নিজের নিজের ন্যায় নিয়ে পরস্পরের মুখদেখাদেখি বন্ধ করলে তখন অতসী এবং শিবকিংকরের বিয়ে হয়ে গেছে। নববিবাহিত অতসী এবং শিবকিংকর একসঙ্গে অংশুর বোর্ডিংয়ে এসে তাকে জানিয়েছিল এবং বলেছিল—দোহাই তোমার, তুমি শান্ত হও। আর না। এসব আর করে না।

অংশু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এমনটা সে ভাবে নি। তবু সে অতসীর প্রতি অভদ্র হয় নি। তার বাপের দেওয়া একটা হীরের আংটি ছিল, তার তের বছর বয়সের সময়ের অনামিকার বাপের আংটি সেটা, এখন তার ক'ড়ে আঙুলের মত হয়েছিল, সেইটে খুলে সে অতসীর আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল। এবং বলে দিয়েছিল—তোমাদের প্রীতিভোজে আমি যাব না, মাপ করো। এবং ভবিষ্যতেও সম্পর্ক না রাখলে আমি খুশী হব।

অতসী খানিকটা হেসেও ছিল, খানিকটা জলও সেই সঙ্গে তার দু'চোখ ভরে ছলছল করে উঠেছিল। বলেছিল—বাপরে! এত রাগলে আমি কি করি বল তো? কেমন করে তোমাকে বোঝাব বল তো যে, এ আমি করলাম তোমার ভালোর জন্যেই!

অংশু এসব আর শুনতে চায় নি। বলেছিল—দেখ—দয়া করে তোমরা এখন যদি এস তবে আমি খুশী হব।

তারা দুজনে হাসতে হাসতেই চলে গিয়েছিল। সে হাসির সাড়া এসেছিল বোর্ডিংয়ের সিঁড়িটার বাঁকের ওদিক থেকে। অংশু সেদিন সারাদিন দুরন্ত ক্রোধে যেন কারণে অকারণে ফেটে পড়তে চেয়েছিল।

বোর্ডিংয়ের চাকরটাকে চড় মেরেছিল। ম্যানেজার এবং মালিকের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গিয়েছিল ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে। অবশিষ্ট দিনটা সেখানে বসে থেকে রাত্রি আটটার সময় বোর্ডিংয়ে ফিরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিল। এবং ঘণ্টা দেড় দুয়েক কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পরের দিন সকালের ডাকেই মায়ের লেখা একখানা নিষ্ঠুর চিঠি এসেছিল। তার মধ্যে শিবকিংকর এবং অতসীর তাঁকে লেখা একখানা পত্র ছিল যাতে তারা তাদের বিয়ের কথা জানিয়ে অনুরোধ করেছিল তিনি যেন বালক অংশুমানকে ক্ষমা করেন। মা লিখেছিলেন, পত্রখানা পড়ে দেখো। এই মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে বলেছিলে, তার জন্য লজ্জার আমার শেষ ছিল না। আজ কিন্তু মনে হচ্ছে মাথাটা কাটা গেল। কারণ তোমার অহংকার করে ঐ কথা বলার পর মেয়েটা তোমার গালে চুনকালি মাখিয়ে দিয়ে চলে গেল। এখন একমাত্র শর্তে তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারি। এই কথা যখন গ্রামে জানাজানি হয়েছে এবং দেবোত্তর নিয়ে যখন মামলা চলছে তোমার বৈমাত্রেয় দাদাদের সঙ্গে তখন তোমাকে শাস্ত্রমত একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সে সেই মুহূর্তেই চিঠিখানার উত্তর লিখে নিজে হাতে ডাকে ফেলে দিয়ে এসেছিল।

লিখেছিল—প্রায়শ্চিত্তে সে বিশ্বাস করে না। ভোজ্য উৎসর্গ করে কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত নয়। অতসীকে বিবাহ করাই ছিল, তার অপরাধের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। তাতে সে প্রস্তুতই ছিল। এবং সে-কথা প্রকাশ্যেই একরকম ঘোষণা করে জানিয়েছিল। কিন্তু অতসী শিবকিংকরকে বিবাহ করেছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে। সুতরাং তার করণীয় কিছু নেই। যে অপরাধটুকু তার দেহে ও স্মৃতিতে বাল্যকালে চুরি করে খাওয়া পরের বাগানের ফলের পুষ্টির মত রয়ে গেল তা সে নিরুপায় হয়েই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহন করবে।

তার উত্তরে তার মা লিখেছিলেন—তোমার সহিত পত্রালাপেও শরীর মন অশুচি হয়ে ওঠে আমার। এর পর আর কোন পত্র তুমি আমাকে লিখো না। এবং এই বাড়ি এবং আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক আর রইল না এই কথাটি মনে রেখো। অতঃপর এস্টেট থেকে কোন টাকা তুমি পাবে না।

অংশুমানের মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই সে পত্রখানার জবাব লিখে ফেলেছিল। বিষয়ী ঘরের ছেলে—সেই শৈশব থেকে এই সতের বছর বয়স পর্যন্ত সে বাপের কাছ থেকে শুধু দেশসেবা করতেই শেখে নি, তাঁর বিষয়কর্ম করা দেখে বিষয়কর্ম আইনকানুনও শিখেছে; বিষয়কর্ম করতে সে পারে, বৈষয়িক আইনকানুনও সে বোঝে; ইদানীং সম্পত্তি পার্টিশন নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করে সে বোধ তার আরও ধারালো এবং স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মায়ের চিঠির উত্তরে সে একেবারে আইনসম্মত পত্রলিখন-ভঙ্গিতে লিখেছিল—"আপনি আমার গর্ভধারিণী, আমার পিতৃদেব ৺নিরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনের পর আমি বয়সে নাবালক থাকায় আপনি স্বাভাবিক অভিভাবিকা হিসাবে আদালত হইতে আমার (অর্থাৎ শ্রীঅংশুমান চৌধুরীর) গার্জেন নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং সেই অধিকারে আমার অংশের এস্টেট পরিচালনা করিতেছেন। আদালতের কাছে আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণের সময় এস্টেটের যাবতীয় আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাহার সঙ্গে এ প্রতিশ্রুতিও আছে যে আমার জীবনে উচ্চশিক্ষার জন্য আমার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য আপনি প্রয়োজন হইলে সম্পত্তি বিক্রয়ও করিতে পারিবেন। অর্থাৎ আমার জন্যই সব হইবে। আমাকে বাদ দিয়া কোন ব্যয় করিবার আপনার অধিকার নাই। করিলে পরে ইহার জন্য আপনাকে দায়ী হইতে হইবে। আপনি আমাকে…সালের… তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন 'এই বাড়ি এবং আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক রহিল না।…অতঃপর এই এস্টেট হইতে কোন টাকা তুমি পাইবে না।' ইহার উত্তরে আমি জানাই যে আমার সহিত কোন সম্পর্ক না থাকিলে বা না রাখিলে আপনি আমার গার্জেন থাকিতে পারেন না। আমার পিতার পরলোকগমনের মুহূর্ত হইতেই আমি আমার পিতার সম্পত্তির এক-তৃতীয় অংশের (আমরা পিতার তিন পুত্র হিসাবে) আমি মালিক হইয়াছি। কোনক্রমেই সেই অধিকার হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না।"

* * *

দেবগ্রাম থেকে খুব বেশী দূরে নয়, মাইল কয়েক পশ্চিমে অজয়ের ধারেই, দুর্গাপুর

ফরেস্টের মধ্যে যুদ্ধের সময় তৈরী মিলিটারী বেসের খানিকটা অংশ ছিল। পানাগড় থেকে পশ্চিমে অণ্ডাল উখরা এবং উত্তরে পানাগড় ইলামবাজার রোডের পশ্চিম গায়ে গায়ে অজয়ের তীরে শ্যামরূপার গড় পর্যন্ত বিস্তৃত মিলিটারী বেসটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষের সেকেণ্ড ফ্রন্ট হিসাবে তৈরী হয়েছিল। এর কিছুটা পানাগড়ে আজও আছে। মিলিটারী বেস হিসেবেই আছে।

এইখানে অংশুমান একটা বিস্ফোরণ দেখেছিল।

আতসবাজির বিস্ফোরণ নয়। বোমবাজির শব্দ সে নয়—হাউই চরকির ফুলঝুরি বা রঙমশালের রঙিন আলোর উচ্ছ্বাস সে নয়। সে বিস্ফোরণ বিচিত্র, বিস্ময়কর, ভয়াবহ।

১৯৪৭ সালের মার্চ মাস তখন। বর্ষার পরে শরতের রোদের মত স্বাধীনতার আগমনী হাওয়া এসেছে, রঙ লেগেছে; তার বাবা তখন ছোটখাটো কংগ্রেস নেতা হিসাবে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেদিন ওই ইলামবাজার পানাগড় রোডের ধারেই একখানা মুসলমানপ্রধান গ্রামে সে তার বাবার সঙ্গে গিয়েছিল। গ্রামখানায় একঘর বর্ধিষ্ণু মিয়াসাহেবের বাস। তাঁরই দলিজায় বসে কথাবার্তা হচ্ছিল। সামনে খানিকটা খোলা জায়গার ওপাশে একখানি ভাঙাচোরা গরীবের বাড়ি। সেই বাড়িটা হঠাৎ একটা বিকট শব্দ করেই যেন মাটির উপর আছড়ে পড়ে গেল। তারপর উঠল ধুলো আর ধোঁয়া। সমস্ত জায়গাটা ঢেকে গেল। এর পরই একটা মেয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটে পালিয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে চাপা পড়েছিল তার স্বামী এবং দুটো ছেলে। মেয়েটির স্বামী বনের মধ্যে কাঠ ভাঙতে গিয়ে লোহার একটা বেশ বড় রকম বস্তু পেয়েছিল। সেটাকে কুড়িয়ে বাড়ি এনে খুলতে চেষ্টা করেও খুলতে পারি নি। এবং কিছু হয়ও নি। ফেলে রেখেছিল ঘরের এক কোণে। আজ বিকেলে রান্না চড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে মেয়েটির হঠাৎ নজর পড়েছিল সেটার উপর এবং মাথার মধ্যে খেলে গিয়েছিল—উনোনের আগুনে তাতালে কি হয়? তাইই সে করেছিল, উনোনের মধ্যে ফেলে দিয়ে সে গিয়েছিল খিড়কির ঘাটে—ইতিমধ্যে সেটা ফেটেছে। সেটা ছিল একটা সত্যিকারের শক্তিশালী বোমা। স্বামী এবং ছেলে দুটোকে চাপা দিয়ে ঘরটা ভেঙে পড়েছে।

সে বিস্ফোরণের শব্দ, সে ধুলো এবং ধোঁয়ার পুঞ্জের কথা ভুলতে পারবে না অংশুমান। মধ্যে মধ্যে চোখের সামনে সেই দৃশ্যটা অবিকল ভেসে ওঠে।

১৯৬৭ সালের এই সকালবেলাটিতে জীবনের পুরনো কথা মনে হতে হতে হঠাৎ তার মাঝখানে এই সংস্রবহীন ছবিটি মনের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে অংশুমান।

তার মায়ের সঙ্গে পত্রালাপের কথা মনে হলেই এই বিস্ফোরণের ঘটনাটিই মনে পড়ে। একবার সে উপমা খুঁজতে গিয়ে ওই বিস্ফোরণের ছবিটিকেই মিলিয়ে মিলিয়ে সাজিয়ে নিয়েছিল। অন্য জায়গায় মিল থাক বা না-থাক ওই মেয়েটির ছুটে পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তার মায়ের সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়ার মিলটা খুব ঘনিষ্ঠ। তার মা এখন আশ্রমবাসিনী।

মা তার চিঠির আর উত্তর দেন নি। তিনি আদালতে দরখাস্ত দিয়ে নাবালকের

অভিভাবকত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে গিছলেন কাশী। তার সম্পত্তি থেকে কোন মাসোহারাও চান নি।

মা তার আজও বেঁচে আছেন। সেও তাঁর খোঁজ করে না—তিনিও তার কোন খোঁজ রাখেন না। তার সৎভাইদের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ আছে। তার বড়মাও আজকাল তাঁর কাছে গিয়ে থাকেন। তার সঙ্গে বিরোধ হয়ে ওদের সঙ্গে অর্থাৎ সতীন এবং সতীন-পুত্রদের সঙ্গে তাঁর মিল হয়েছে। তাঁর নিজের নামে যে সম্পত্তি আছে সে সম্পত্তি তিনি গৃহদেবতাকেই দিয়ে যাবেন। তার সেবায়েত রমারঞ্জন এবং রাধারঞ্জন, অংশুমান নয়। তার মা নিজে বাদী হয়ে নালিশ করে আদালত থেকে এই ব্যবস্থা বাহাল করে গেছেন। নিরঞ্জন চৌধুরীর সন্তান হিসেবে তাঁর সম্পত্তির একের তিন অংশে অংশুমান চৌধুরীর অধিকারে কেউ কোন কারণেই হস্তক্ষেপ করতে পারে না—এমন কি ওই অতসী নাম্নী এক ভ্রষ্টা অসতীর সঙ্গে সংস্রবদোষের অপরাধ হলেও পারে না, কিন্তু ওই অতসী নাম্নী মেয়েটির সঙ্গে জীবনের সংস্পর্শ-দোষ নিজ মুখে ঘোষণা করেও যে প্রায়শ্চিত্ত করে না দেবতায় বা দেবোত্তর সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার থাকতে পারে না।

তার মা মূর্তিমতী সে-কাল। যতটুকু পারেন এ-কালের উপর আঘাত হেনে গেছেন—অভিসম্পাত দিয়ে গেছেন। তা যান তিনি, তাতে সে কোনদিন আক্ষেপ করে নি। করবেও না। সে-কাল সর্বদাই সে-কাল, সে সর্বস্বান্ত হয়ে বিগত হবার সময় এমনই করে অনুদার হয়ে অভিসম্পাতই দিয়ে যায় চিরকাল। বিচিত্র! সব দিয়ে যেতে হয় বলে যতটুকু পারে নিজের সঙ্গে নষ্ট করে দিয়ে যায়। যতটুকু পারে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখে—তা খুলে নেওয়া যায় না; শেষ পর্যন্ত তা তার মৃতদেহের সঙ্গে হয় পোড়ে নয় কবরে চাপা পড়ে। পরবর্তীকালে প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রী হয়। মা তার গেছেন দেবোত্তর সঙ্গে নিয়ে। তিনি তা দিয়ে যাবেন তার সৎদাদাদের। তারাও সে-কাল।

অতসী তাকে ধরে ছেড়ে দিয়েছিল। শিবকিংকরের সঙ্গে—। যাক সে। সে গেছে, তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে তার জন্যে.তাকে ধন্যবাদ। অতসী সেদিনের পচধরা দূষিত বর্তমান। যে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হবে তাকে ধরে তার সঙ্গে চলতে পারবে কেন? পারে নি। তাকে ছেড়ে দিয়ে শিবকিংকরের সঙ্গে চলে গেল।

যাক।

তার সম্মুখের পথ মুক্ত হয়েছিল। আশ্চর্যরূপে পরিষ্কার ছিল সম্মুখের দিগন্ত। আকাশ ছিল নীল নির্মল। সে একা।

চতুর্থ পর্ব

নির্মল নীল আকাশের নিচে একটি আশ্চর্য সুন্দর এবং সমৃদ্ধ পৃথিবী। কত সুখ সেখানে। যত সুখ তত সমৃদ্ধি। উজ্জ্বল পৃথিবী। অফুরন্ত ভাণ্ডার। আনন্দের সংসার। অধীনতার

সংকোচন নেই; অপরাধের বেড়া নেই; অবাধ গতিতে মাটিতে জলে আকাশে মানুষ চলবে সামনের পথে।

১৯৪৮ সালের পর ১৯৪৯ সালে আবার সে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে সে ইউনিভারসিটি ছেড়েছে। আট বছর এমনই একটি পৃথিবীকে কল্পনা করে সম্মুখের দিগন্তের মুখে নিরন্তর চলেছে।

তার মা তার অভিভাবকত্ব ছেড়ে দিলেন। আদালত থেকে একজন উকীল অভিভাবক নিযুক্ত হবার কথা, কিন্তু বিচিত্র সংসার—তার বড় সৎভাই এগিয়ে এসে তাকে বললেন—আমি গার্জেন হলে তোর আপত্তি হবে?

অংশুমান অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—আমার আপত্তি নেই। কেন হবে আপত্তি? উকীল দেখত না হয় তুমি দেখবে। তুমি উকীলও বটে দাদাও বটে। কিন্তু পরে বিষয় বুঝিয়ে দিতে গোল বাধাবে না তো?

এক বছরের মধ্যেই বিচিত্র ঘটনা সংস্থানে সারা ভারতবর্ষের সদ্যস্বাধীন মানুষদের মধ্যে নেতাদের বাদ দিয়ে সে-ই বোধ হয় সব থেকে বেশী স্বাধীন হয়ে উঠেছিল।

হয়তো আরও বেশী স্বাধীন সে হতে পারত। যা হওয়া হয়তো তার উচিত ছিল। কিন্তু ততখানি হতে পারে নি। যদি সে দেবগ্রামে ফিরে যেতে পারত এবং গোটা গ্রামের লোকের সামনে কথাগুলির মীমাংসা করতে পারত তাহলেই হয়তো ঠিক হত। কিন্তু ততটা পারে নি। কথাবার্তাগুলি হয়েছিল কলকাতার বোর্ডিং-হাউসে বসে। বোর্ডিংটি ভাল পরিচ্ছন্ন। সিংগল্-সীটেড রুম। আজ ১৯৪৮ সালে যখন চালের দর ষাট টাকা মণ তখন সেদিনের বোর্ডিং চার্জ মনে করতে বিস্ময় জাগছে মনে। বোর্ডিং চার্জ ছিল পঞ্চান্ন-ষাট টাকা। চায়ের কাপের দাম ছিল ছ' পয়সার নিচে। সেই বোর্ডিংয়ের ঘরেই এসেছিলেন তার বড়দা। সঙ্গে বউদিও এসেছিলেন। হিসেবের কথায় বউদি বলেছিলেন—আমি জামিন থাকব ঠাকুরপো। নিশ্চিন্ত থাক—হিসেব তুমি কড়ায় গণ্ডায় বুঝে পাবে।

বউদি কলকাতার মেয়ে এবং ভাল ঘরের অর্থাৎ অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। তাঁর বাবা পাট কয়লা অভ্র নিয়ে ব্যবসা করতেন। বড় ব্যবসাদার ছিলেন। এবং সেই সঙ্গে ছিলেন সেকালের প্রগ্রেসিভ মানুষ। ইংরেজ আমলে রায়সাহেব খেতাবও পেয়েছিলেন। মস্ত বড় সংসার। বউদিরা পাঁচ ভাই ছয় বোন। তিনটির তখন বিয়ে হয়ে গেছে—তিনটি তখনও কুমারী।

বউদির বাবা তখন বুড়ো হয়েছিলেন। তিনটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন; এবং দীর্ঘ ষাট বছরের জীবনে পাট কয়লা অভ্র কেনাবেচা করে সে আমলে একটি সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন; সেই উপলব্ধি থেকেই তিনিই বড়মেয়েকে বলে কয়ে এ কাজে সেদিন পাঠিয়েছিলেন। সেদিন জানতে পারে নি পরে জেনেছে অংশুমান যে, ভদ্রলোকের দুটি অভিপ্রায় ছিল; প্রথম অংশুমানের সম্পত্তির অংশ উকীল গার্জেন হিসেবে করতলগত করে বড়জামাই যথেষ্ট লাভবান হতে পারবে। দ্বিতীয় মতলব ছিল আরও নিগূঢ় এবং বিচিত্র। ওই কুমারী তিনটি কন্যার একটিকে এই অংশুমানের জীবনের সঙ্গে বেঁধে দেবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছে।

এককালে তাঁর নিজের যাতায়াত ছিল সোনাগাছি অঞ্চলে। তাঁর বড় দুই ছেলে—তারা তখন ১৯৪৮।৪৯ সালে ময়দান হোটেলে ঘুরত। রিপন স্ট্রীট অঞ্চলে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়ার সন্ধ্যের সাহেব ছিল।

এদের কাছে শোনা অংশুমানের এই অতসী অধ্যায়ই তাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বউদির বাবা তারিফ করেছিলেন অংশুমান যে চিঠিখানা তার মাকে লিখেছিল সেই চিঠিখানার। এবং বলেছিলেন—শক্ত ছেলে। গড়েপিটে নিতে পারলে হাতিয়ার হবে। তাছাড়া জাত বেটাছেলে। আর আমাদের পালটি ঘর। এ ছেলে অন্ততঃ হাতে রাখ।

তাঁর জীবনে তিনি মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ সেই পুরনো আমলের ধারাতেই করে আসছেন। মেয়েদের বিয়ের সম্বন্ধ মেয়েদের সাত-আট বছর হতে হতেই ঠিক করে ফেলতেন। জানাশোনা অবস্থাপন্ন পালটি ঘরের ছেলের খোঁজ পেলেই কথা বলে রাখতেন এবং কথায়-বার্তায় চিঠিপত্রে সে কথা জিইয়ে রাখতেন এবং যথাসম্ভব সত্বর মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন।

তাঁর ছেলেরা এত অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। মেয়েরা অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাস করবে বা ফেল করবে একবার—তারপর বিয়ের পক্ষপাতী। ওদিকে ছেলের গ্র্যাজুয়েট হওয়া দরকার। তবে তারা চাকরে বাপের ছেলে চায়।

অংশুমানের ক্ষেত্রে অংশুমান চাকরে বাপের ছেলে নয় কিন্তু লীডার বাপের ছেলে, এবং এই যে কাণ্ডটি সে করেছে তার দ্বারা কিছুটা সমঝে চলতে পারলে অনায়াসেই সে ভবিষ্যতে লীডার হয়ে যাবে তাতে তাদের সন্দেহ ছিল না। সুতরাং এরা তাতে আপত্তি করে নি, তবে বলেছিল—আরও কিছুদিন যাক—ওর মতিগতি দেখি তারপর এগিয়ে যাওয়ার কথা।

সে-কালের শেষ এবং এ-কালের আরম্ভের সময়ে এইটেই ছিল স্বাভাবিক। হিন্দু কোড বিল, এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট অর্থাৎ জমিদারী উচ্ছেদ বিল তখনও অনেক দূরের কথা, তখনও স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানই পাস হয় নি। সে-কালে এই বোনের বড়দিদি হিসেবে তার বউদিদি তার কাছে এসে স্বামীর হয়ে হিসেবের জন্ত জামিন থাকতে চেয়েছিলেন অনায়াসে। শুধু নিজে জামিন থাকব বলেই ক্ষান্ত হন নি, বলেছিলেন—শোন ঠাকুরপো হাসি-তামাশার কথা আমি বলছিনে। আমার ছেলেমেয়ের দিব্যি গেলে বলছি তোমার পাইপয়সাটি উনি তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন, দেবেন, দেবেন।

তিন বছর পর অংশুমান আই-এ পাস করলে। ভাল ভাবেই পাস করেছিল আই-এ। প্রথম পঁচিশ জনের মধ্যেই ছিল তার প্লেস।

তার মা তখন কাশীতে। দেবোত্তরের মামলা আরম্ভ করেছিলেন তিনি, তিনিই সাক্ষী দিয়ে সেই মামলায় অংশুমানকে সৎভাইদের কাছে হারিয়ে দিয়ে কাশী গিয়েছেন। সাক্ষী দিয়েছিলেন—তিনি বা তাঁর পুত্র অংশুমান এমন কি তাঁকে বিয়ে করার পর থেকে তাঁর স্বামী স্বর্গীয় নিরঞ্জন চৌধুরীও দেবতায় বিশ্বাস করতেন না। সেই কারণেই তাঁরা মূল বাড়ি থেকে সরে পৃথক বাড়িতে বাস করতেন।

কাশীতে বাস করলেও তার মা সত্যঅর্থে কাশীবাসিনী ছিলেন না। বিশ্বনাথ বিশেশ্বর অন্নপূর্ণা দুর্গা কালী থেকে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় এবং গভীর ছিল খাদিমওলের সঙ্গে, ওয়ার্ধা আশ্রমের সঙ্গে, কস্তুরবা ট্রাস্টের সঙ্গে। কাশীতে বাড়িভাড়া করে থাকতেন কিন্তু ঘুরতেন দিল্লী ওয়ার্ধা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে। বিনোবাজী জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি নেতাদের কাছে যেতেন। তেলেঙ্গানা ঘুরেছেন। পাস করার খবর দিয়ে একখানা চিঠি সে মাকে লিখেছিল —তার জবাব পেয়েছিল এক মাস পর। মা লিখেছিলেন—"তোমার পরীক্ষার খবর পেয়ে খুশী হলাম। কিন্তু পরীক্ষায় ভালো ফল করাটাই মনুষ্যত্ব নয়। সংস্কারের মানুষ হলে আমি সুখী হব। আমি দিল্লীতে ছিলাম বলে পত্রের উত্তর দিতে দেরি হল। কাল পাটনা যাচ্ছি—সেখানে সদাকত আশ্রমে কিছুদিন থাকব।"

এ চিঠির আর কোন উত্তর সে দেয় নি। সে তখন স্টুডেণ্টস্ মুভমেণ্টে নামবার উদ্যোগ করছে। এবং মা কংগ্রেসে আছেন বলে তাঁর সব আদর্শ বাদ দিয়েছে। সিগারেট ধরেছে। এবং কফি হাউসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে পাঁচ সাত-কাপ করে কফি খাচ্ছে।

এদিকে তিন বছর পর ১৯৫১ সাল সেটা—তার পরীক্ষার ফলের কথা জেনে দেবগ্রাম থেকে তার বউদি এবং দাদা তাকে লিখলেন—একবার গ্রামে এস।

সে গিয়েছিল।

হঠাৎ অত্যন্ত বিষণ্ণ একটুকরো হাসি তার মুখে আজ ফুটে উঠল। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সে।

সেই ষোল বছর আগে ১৯৫১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সে বাড়ি গিয়ে পৌঁছেছিল। তার বড়মা সেদিন কেঁদেছিলেন তাকে দেখে। কেঁদেছিলেন তার বাবার জন্যে। বলেছিলেন— "আঃ! সে নেই আজ! কত সাধ আশা তার অংশুকে নিয়ে! আমি সৎমা অংশুর, অংশুর আদর দেখে আমার নিজের ছেলেদের জন্যে দুঃখ হত। সেই অংশু আজ ভালো করে পাস করেছে—আজ সে থাকলে বাড়িতে সমারোহ জুড়ে দিত।"

এক টুকরো প্রক্ষিপ্ত উজ্জ্বল ঘটনা! তারও মনে পড়েছিল তার বাবাকে। শুধু বাবাকে কেন? মাকেও মনে পড়েছিল। মায়ের কোন খবর সে তখনও পায় নি। চিঠিটা সবে কাশী গিয়ে পৌঁছুবার সময় হয়েছে। তবু অভিযোগ গোপনে গোপনে মনের কোণে জমা হয়ে উঠতে ছাড়ে নি।

সমস্ত গ্রামের ছেলেরা তাকে আশ্চর্যভাবে অভিনন্দিত করেছিল। গ্রামে ইস্কুল ছিল, সেই ইস্কুল থেকেই পাস করেছিল সে। বুড়ো হেডমাস্টার পুরনো লোক। তিনি খুব গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—I am glad that your result is not bad. অবশ্য আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।

কয়েক মুহূর্ত পরে নিজের কথার প্রতিবাদ করেই বলেছিলেন—Result এতখানি ভাল হবে এও অবশ্য ভাবতে পারি নি।

আবার বলেছিলেন—হ্যাঁ, মন দিয়ে পড়াশোনা কর। Forget everything else.

সেই লোকটার সঙ্গে সম্পর্ক যেন রেখো না। Don't.

অর্থাৎ শিবকিংকরের সঙ্গে।

থাক। শিবকিংবরের কথা থাক। তার সঙ্গে অতসীর কথাও থাক।

না।

অতসীর কথা আসবে। দেবগ্রামে গিয়ে অতসীর কথা ভুলবার উপায় ছিল না। গ্রামের ছেলেদের যে মুগ্ধ অভিনন্দন, সে কেবল ওই অতসীর জন্য। ঠিক অতসীর জন্য নয়, অতসীকে যে মর্যাদা ও সম্মান দিতে চেয়েছিল তারই জন্য। সারা গ্রামটার যেখানে পাকা দেওয়াল বা রাঢ়দেশের বেলেমাটি তুষমাটি করা পোক্ত মাটির দেওয়াল পেয়েছিল তার প্রায় সব জায়গাতেই খড়ি অথবা কাঠকয়লা দিয়ে তারা 'অংশুমান জিন্দাবাদ'—'অংশু অতসী' ধরনের নানান জয়গাথা লিখে ভরিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং অতসীর কথা থাক বলে চাপা দিতে গেলেও যাবে না।

অতসীকে কিন্তু সে তখন ঘৃণা করত। তখন অতসী ছবিতে নামছে। পর পর কয়েকটা ছবিতেই সে চান্স পেয়েছিল। প্রথম ছবিখানায় ভাল করেছিল। তার নাম হয়েছিল। একখানা ছবিতে হিরোইনের পার্ট পেয়ে অতসী তখন আকাশে তারা হয়ে ফুটি-ফুটি করছে। মধ্যে মধ্যে সে স্মরণ করত অংশুকে। কিন্তু অংশু সাড়া দিত না। এবং অংশুর জন্যই সে হোস্টেলে যায় নি। কারণ কলেজ হোস্টেলে শিবকিংকর এবং অতসী গেলে ঢেলামারা মৌচাকের মত সারা হোস্টেলটা মুহূর্তে ভনভন করে উঠবার সম্ভাবনা ছিল। তা ছাড়া অংশুমান আশ্চর্যভাবে মনে মনে স্বাধীন হয়ে উঠেছিল, যে স্বাধীনতা তার কলেজ হোস্টেলে কোনমতেই বাঁচানো যেত না। নিত্যই কোন-না-কোন বাধা-নিষেধের গণ্ডী ভেঙে, নীতি নির্দেশ অমান্য করে সে স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত এবং অধিকতর প্রগল্ভ করবার চেষ্টা করত। কিন্তু তা বলে সে সস্তা কিছু করে নিজেকে খেলো করে নি। মোট কথা যে-অংশুমান সারা বাল্য কৈশোর মা ও বাবার স্নেহের মধ্যে গভীর বিশ্বাসে সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছিল সে সেই সত্যের নির্দেশেই তার একদিনের ওই পদস্খলনের ঘটনাটিকে বা প্রাপ্তিকে নেহাত প্রক্ষিপ্ত একটি আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করে নি; মনে করে নি এটা জীবনে এমনি একটা কিছুর সংস্পর্শ যেটাকে এক আঁজলা জল দিয়ে ধুয়ে মুছে দেওয়া যায়। তা মনে করে নি বা করতে পারে নি বলেই সে তাকে এবং ঘটনাটিকে সত্যের মর্যাদা দিতে চেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আদর্শবাদের চরমে পৌঁছুতে চেয়েছিল এদেশের পদস্খলিতা মেয়ে ওই অতসীকে তার জীবনে ও গৃহে প্রতিষ্ঠা দিয়ে। কিন্তু অতসীও তা স্বীকার করলে না। তাকে স্বীকার না করে সে স্বীকার করলে শিবকিংকরকে। আর তার মা। তার মায়ের কাছেই সে সব থেকে বেশী সমর্থন এবং আশীর্বাদ আশা করেছিল। তাঁর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কথাগুলি বলতে গিয়ে কেমন একটা লজ্জা বোধ করেছিল বলেই অংশুমান কলকাতা চলে এসে চিঠি লিখে একথা তাঁকে জানিয়েছিল, না হলে তার আশা ছিল মা কয়েক মুহূর্ত বা কয়েক ঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে থেকে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝে নিয়ে তাকে ডেকে আশীর্বাদ করবেন এবং সারা দেবগ্রাম অঞ্চলটা জুড়ে এই নূতন সত্যপালনের আদর্শের একটা হাওয়া বইয়ে দেবেন। এ

সত্যপালনের একটা অলিখিত প্রতিশ্রুতি তাঁর দেওয়া ছিল কিন্তু তিনি তা পালন করতে পারেন নি।

সেটা ১৯৫১ সাল। অংশুর বয়স তখন ১৯ বছর। ওখানকার ছেলেরা এসে তাকে বলেছিল—অংশুদা আপনি ইলেকশনে দাঁড়ান। আমরা সবাই আপনার জন্মে খাটব। এবং নিশ্চয় জিতিয়ে দেব।

অংশু হেসে বলেছিল—না।

তারা বলেছিল—কেন ?

অংশু বলেছিল—প্রথম আমার বয়স হয় নি। দ্বিতীয় আমার সময় নেই রে।

সত্যিই তার সময় ছিল না। কারণ বড়বউদি তখন বাড়িতে জমাট করে আসর পেতেছেন। সে আসরে জমিয়ে গান ধরেছে সদ্য থার্ড ডিভিশনে পাস করা বউদির চতুর্থ বোন অমিতা। বউদির তিন-তিনজন কুমারী বোন অমিতা নমিতা এবং শমিতা আম খাবার জন্ম দেবগ্রামে এসে আগে থেকেই জমিয়ে বসেছিল।

অমিতারা তিন বোনেই গান শিখত। অমিতা এবং শমিতা শিখত গান—নমিতা শিখত সেতার। অমিতা শিখত রবীন্দ্রসংগীত শমিতা শিখত ক্ল্যাসিক্যাল।

তিন বছর পর সেদিন সন্ধ্যাকালে দেবগ্রামে এসে প্রায় একটা পর্যন্ত সে জেগে বসেছিল। মনের মধ্যে কত স্মৃতি এলোমেলো ভাবে আসা-যাওয়া করেছিল। কতজনে এসে দেখা করেছিল। কত কথা বলেছিল। সে সব কথা মনে নেই। মনে আছে এক প্রগল্ভ বৃদ্ধের কথা। হারু চাটুজ্জে। গ্রামসম্পর্কে তার বাপের খুড়ো। কটকটে লোক। বলেছিল—"যাক ফিরে এলে শেষে! এও ভাল করেছ। এখন বিয়েটিয়ে করে সংসারী হও। খুব বেঁচে গিয়েছ। মেয়েটাকে যে ঘাড়ে কর নি করতে হয় নি এ খুব বাঁচোয়া তোমার। তিলকে তাল করে তোলা। আরে এ হয় না, মানে, ঘটে না কোন্ মানুষের ?" এবং মলমূত্র ত্যাগের নজীর সামনে ধরে একটি বিচিত্র জীবনদর্শন-তত্ত্ব তাকে শিক্ষা দিয়ে গিছল। বলেছিল—"এই দেখ আমার বয়স বাপু বাষট্টি হল, এখনও আমাকে লোকে বলে আমার স্বভাব খারাপ।"

অংশুমান লোকটার সঙ্গে কথা বলে নি।

লোকটার একটি যোল-সতের বছরের কুমারী দৌহিত্রী ছিল।

মেয়েটির নাম রমলা। হারু চাটুজ্জের মেয়ে বিধবা হয়ে বাপের ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল ওই মেয়ে নিয়ে। ভবানীপিসী সারা গ্রামে কাজকর্মে লোকের বাড়ি খাটাখাটনি করত। রান্নাবান্না পুজোআর্চার কাজকর্ম। আর খুব বই পড়ত। সেই সূত্রে আসত তার মায়ের কাছে। তার মায়ের কাছ থেকে বই নিয়ে যেত। গ্রামের লাইব্রেরী থেকে তার মা বই আনিয়ে তাকে পড়তে দিতেন। আরও কিছু করতেন—ভবানীপিসীকে সেলাইটেলাই শেখাতেন। মণীন্দ্রলাল বোসের 'রমলা' উপন্যাস পড়ে ওই নামকরণ করেছিল মেয়ের।

পরের দিন ভোরবেলা তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বউদির ছোট বোন শমিতার গলা সাধার আওয়াজে—আ-আ-আ। আ-আ-আ। বিরক্ত হয়েছিল মনে মনে। সে বিরক্তি অপনোদন

করে তার বউদি এসে তাকে বসে থাকতে দেখে বলেছিলেন—উঠেছ? আমি কাল জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিছিলাম, কটার সময় ওঠো তুমি। অমি—অমি! চা নিয়ে আয়।

বউদির সম্ভ ম্যাটি ক পাস বোন অমিতা চায়ের ট্রে হাতে এসে ঘরে ঢুকেছিল।

না, অমিতা তার কাছে আদৌ আকর্ষণীয় ছিল না। শমিতার কথা বাদই দিতে হবে—তখন সে সবে তেরোতে পা দিয়েছে। তবে মাঝের বোন নমিতা তাকে আকর্ষণ করেছিল। মেয়েটির রূপে বৈচিত্র্য ছিল, তার সঙ্গে মনের একটা দীপ্তি ছিল। সে ছিল খানিকটা গম্ভীর। প্রগল্‌ভা ছিল না। সেতার সত্যিই ভাল বাজাত। পড়াশোনাতেও ভাল ছিল। অমিতা ছিল গৌরী—ছোট শমিতা ছিল উগ্র রকমের ফরসা—নমিতা ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। চোখ দুটি ছিল বিষণ্ণ সুন্দর। হাসত কম। কিন্তু হাসলে সে হাসিতে সমস্ত পরিপার্শ্বও হেসে উঠত। এবং চোখের দৃষ্টির সেই বিষণ্ণতা সে সময়টিতে মুছে দিয়ে জ্বলে উঠত প্রদীপের মত। অমিতার থেকে নমিতার বয়সের তফাতও খুব বেশী ছিল না, মাত্র বছর দেড়েকের মত।

প্রথম দিনের সকালেই চায়ের আসরটিই হয়ে উঠেছিল একটি স্বয়ংবর সভা। তাতে মেয়েরাই এসেছিল সেকালের রাজাদের মত এবং তাকেই নিতে হয়েছিল রাজকন্যার ভূমিকা। সে জমেও গিয়েছিল। সত্যিই সে আকৃষ্ট হয়েছিল নমিতার দিকে। দিদির হুকুমে সে সেতার বাজিয়ে শোনাচ্ছিল এবং বাজাচ্ছিলও বেশ ভাল; অংশুমান তার মুখের দিকে একাগ্র হয়েই তাকিয়ে ছিল। নমিতার সঙ্গে চোখাচোখিও হয়েছিল—তাতে সে লজ্জিতা হয়েও বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে আত্মসংবরণ করে বাজিয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। এরই মধ্যে শেষ আসরে এসে হাজির হয়েছিল রমলা।

অবাক হয়ে গিয়েছিল অংশুমান।

তার মনে হল, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় দীন ব্রাহ্মণবেশী অপরাজেয় অর্জুন এসে ঢুকেছেন এবং বলছেন, আমি ওই মৎস্যব্যূহ লক্ষ্যভেদ করব। মেয়েটার যেমন আশ্চর্য যৌবন এবং তেমনি মদির নিমন্ত্রণ তাতে। কিন্তু মেয়েটা মুখ খুলতেই অংশুমানের চেতনা হয়েছিল এবং বুঝতে পেরেছিল যে, এটা নেহাতই যাত্রার আসরের দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা। এবং ওই রমলাকে অর্জুনের পোশাকে খুব ভাল মানালেও পার্ট করতে একান্ত অপটু। রমলা একটা চিনেমাটির ডিসে কতকগুলি বেলফুল এবং একটি খুব ভাল আম নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই ঘরখানির দরজার মুখে। নমিতার সেতারের বাজনায় তখন সারা ঘরখানা একেবারে ভরে রয়েছে—মানুষের আপন নিঃশ্বাসের শব্দও মানুষ ঠিক শুনতে পাচ্ছে না এমনই একটা সময়ে সে ঘরে ঢুকে দিব্যি এগিয়ে এসে রেকাবিখানা তার সামনে নামিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা জুড়ে দিতে চেষ্টা করেছিল।

—দাদু এগুলি পাঠিয়ে দিলে।

অংশুমান তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। রমলা ফিক করে হেসে বলেছিল—আমি রমলা। চিনতে পারছ আমাকে? বলে তার পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিল।

অংশুমান বিরক্ত হয়ে বলেছিল—থাক। ওই হয়েছে।

—ও মা। তাই হয়?, তুমি আমার দাদা হও না? তোমার বাবা আমার দাদুকে কাকা বলত। আমার মা তোমার বাবাকে বলত দাদা। তোমার মা আমার মাকে বলত ভবানী ঠাকুরঝি। দাদু তোমাদের জ্ঞাতি। দশ রাত্রের জ্ঞাতি। তোমরা চৌধুরী হলেও তোমরা কাশ্যপ গোত্তর।

ক্রমান্বয়ে সে বকেই চলেছিল। ওদিকে নমিতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। এই অবস্থায় হঠাৎ বউদি ঘরে ঢুকে সব দিক রক্ষা করেছিলেন। রমলার হাত ধরে তাকে টেনে খানিকটা দূরে এনে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—এইখানে বস্। মেলা বকবক করিস নে।

কিছুক্ষণ একটু বিমর্ষ হয়ে চুপচাপ ছিল মেয়েটি। কিন্তু তারপরই আবার যা কে তাই। কিছুক্ষণ পর সবে নমিতা সেতার বাজনা শেষ করে সেতারটি নামিয়ে রেখেছে, রমলা এই ক্ষণটিকে পাবামাত্র বলে উঠেছিল—তুমি একটা 'আব্বিত্তি' কর না অংশুদা! ইস্কুলে 'প্রেয়াইজের' সময় কি সুন্দর 'আব্বিত্তি' করতে। সব সভাতে করতে।

* * *

হারু চাটুজ্জে গরীব। তার বিধবা কন্যা ভবানী তার ঘাড়ের দায়; তার মেয়ে রমলা। তার যৌবন দারিদ্র্যের জন্য কুণ্ঠিত ছিল না। অভাবকে অগ্রাহ্য করেও সে মাটির তলার জলের মত জীবনে এসেছিল। তার সঙ্গে রূপও ছিল কিছু এবং সে শিখেছিল এই যে, কোনক্রমে কোন দয়াল জনের রসনাকে বর্ণ বা গন্ধের নিমন্ত্রণে সরস করে তুলতে না পারলে সে একদা বৃন্তচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ে মাটিতেই মশে যাবে। সুতরাং তার মনোরঞ্জনের চেষ্টার আর সে বাকী করে নি।

তা যদি সে না করত তাহলে ভাল করত। হয়তো বা অংশুমান তার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হত। রমলা মধ্যে মধ্যে নিজের বক্ষোবাস অসংবৃত করে নিজের যৌবনকে নিয়ে বিব্রত হয়ে লজ্জিত হত। এবং বার বার বলত—"বাবাঃ বাবাঃ! চুলের জ্বালায় আর—। মরণ হয় তো বাঁচি।"

এক্ষেত্রে ভুল করতে তার বার বার ইচ্ছে হয়েছিল—মনের মধ্যে ভুল করবার দিকে প্রচণ্ড ঝোঁক আছে—সেটা দাঁড়িপাল্লার ওঠা নামার মত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তবু অংশু সে ভুল করে নি।

আজ মনে হচ্ছে, ভুল যদি সেদিন সে করত তবে হয়তো ভাল করত। কারণ আজ যেখানে সে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে সে এসে পৌঁছত না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে অংশু।

অতসীর শিক্ষা তাকে এদিক থেকে সংযত করেছিল এবং হারু চাটুজ্জের কদর্য দীনতা ও হীনতা তাকে তার নাতনী থেকে অহরহ দূরে থাকতে বলত। আর সাহায্য করেছিল নমিতা। সে তাকে আকর্ষণ করেছিল প্রথম প্রথম ধীরে ধীরে—ক্রমশঃ গাঢ় আকর্ষণে দ্রুতবেগে।

সেবার দেবগ্রামে ছিল কুড়ি দিন। কুড়ি দিনের পর সে কলকাতা ফিরেছিল—বি-এ ক্লাসে ভর্তি হবার তাগিদ রয়েছে। তার সঙ্গে বউদির বোনেরাও ফিরেছিল কলকাতা।

তাদের নিতে এসেছিল অমিতা নমিতার পরের ভাই—শমিতার বড়—পনের বছরের—কি কুমার যেন! বউদির ভাইরা সবাই কুমার—অরুণ বরুণ তরুণ—তারপর দুজন কি কুমার তা অংশুর আজ আর মনে পড়ে না। অনেক দিনের কথা। সে ১৯৪৮ সাল—এটা ১৯৫১। ষোল বছর হয়ে গেল।

আসবার দিন হারু চাটুজ্জে তাকে খোলাখুলি বলেছিল—তোমাকে একটা কথা বলব ভায়া? কিছু মনে করবে না তো?

সে বলেছিল—না। বলুন। কিছু মনে করব কেন?

—রমলাকে কেমন লাগল?

—এ-কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? চমৎকার মেয়ে রমলা।

—চমৎকার আরও চমৎকার মেয়ে রমলা হে! ও তো তোমার সাজতেগুজতে পায় না। পাবে কোথায় বল! ওই সব স্নো পাউডার। তা ছাড়া গাঁয়ের তো! ওসব পেলে ও আরও অনেক চমৎকার হবে। তা ছাড়া সেবা। সে তোমাকে কি বলব! আমার মাথা ধরলে বলি—রমি, দে না ভাই মাথায় হাত বুলিয়ে একটু! কি বলব ভাই ওর হাত এমন নরম আর এমন ঠাণ্ডা। মাথায় হাতটি রাখলেই যেন মাথা ছেড়ে যায়। আর তেমনি পায়ে হাত বুলোলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসে। তা তুমি তো সে সব নাও নি। আমি বলে দিয়েছিলাম। কিন্তু—। রমি বললে—দাদু অংশুদা ওসব চায় না।

একটু চুপ করে থেকে চাটুজ্জে বলেছিল—তোমাকে মেয়েটা ভালবেসে ফেলেছে হে! তুমি ওকে বিয়ে কর না ভাই!

এবার কর্কশভাবে অংশু বলেছিল—এই জন্য ওকে আমার কাছে পাঠাতেন নাকি?

চাটুজ্জে হুঁকোসুদ্ধ হাতটি পাশে নামিয়ে বলেছিল—তা ভাই বটে। তা পাঠাতাম বইকি

—ছি—ছি—ছি। কথার মাঝখানেই ধিক্কার দিয়ে উঠেছিল সে। কিন্তু তাতে চাটুজ্জে লজ্জিতও হয় নি, কুণ্ঠিতও হয় নি। হেসে বলেছিল—ছি কেন বলছ ভাই। আজকাল তো তোমার কোর্টশিপের যুগই পড়েছে। তুমি রমলাদের পালটি ঘর। রমলা ভাল মেয়ে। বিয়ে হলে ও নিজে সুখী হবে—তোমাকে সুখী করবে। তোমার কোন খুঁত ধরবে না। ওই ধর সেই পুরনো কথা তুলবে না। তা ছাড়া আমাদের টাকা নাই বিয়ে দেবার। তোমার ভাই অভাব নাই। তাই পাঠিয়েছিলাম। সে তো তোমার দাদার শ্বশুর—তিনি তো শুনি মস্ত লোক—তিনি তাঁর মেয়েদের পাঠিয়েছেন—

অত্যন্ত রূঢ়ভাবে সে বলেছিল—না। তারা এখানে তাদের দিদির কাছে এসেছে।

বলেই সে চলে এসেছিল। ঠাকুরবাড়ির ফটকের সামনে দুখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ি তখন সেজে অপেক্ষা করছে।

* * *

রমলাকে তার জীবনে যদি সে গ্রহণ করত তবে আজ এখানে এসে দাঁড়াতে হত না।

মেয়েটা বিচিত্র। সে তাকে সব দিতে চেয়েছিল। অনাবৃত যৌবন মেলে ধরে তাকে আহ্বান করেছিল। বলেছিল—তুমি আরও বিয়ে করো। আমি তোমাদের সেবা করব। দুটো বিয়ে তো তোমার বাবাও করেছিল।

সেদিন সে তাকে গ্রহণ করতে পারে নি। তখন সে নমিতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে।

দেবগ্রাম থেকে যাওয়ার পর থেকেই টেলিফোনে কথা হত তাদের।

ওদিক থেকেই ডাক এসেছিল প্রথম। তার বোর্ডিং হাউসের আপিসে চাকর ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। তরুণ নারী কণ্ঠস্বর চকিত করেছিল প্রথমটা।

চকিতভাবেই প্রশ্ন করেছিল—কে?

একটুকরো হাসির সঙ্গে উত্তরে প্রশ্ন এসেছিল—কে বলুন তো?

দুটি নাম মনে ভেসে উঠেছিল। নমিতা আর অতসী। অতসীর তখন টেলিফোন হয়েছে খবর পেয়েছিল। অতসী তখনও মন থেকে মোছে নি।

নমিতা বলেছিল—হেরে গেলেন তো! আমি নমিতা।

—নমিতা?

—হ্যাঁ।

নমিতা বলেছিল—এক বান্ধবীর বাড়ি থেকে ফোন করছি। কেমন আছেন? আপনি তো খবর নিলেন না!

অপ্রস্তুত হয়েছিল অংশুমান। বোকার মতই বলেছিল—আমি কি করে খবর নেব বল—!

খিলখিল শব্দের হাসি উঠেছিল ওপাশে। তারপর বলেছিল—কেন টেলিফোন কিংবা বাড়ি এসে—

—তোমার মা বাবা কি দাদারা যদি—

—কি বোকা আপনি! তাহলে আমাদের দেবগ্রাম যেতে দিতেন নাকি! বাবা মা দাদারা কিছু মনে করবেন না।

এর কিছুদিন পর আরও স্পষ্ট হয়েছিল সমস্তটা। দাদার শ্বশুর তাকে বলেছিলেন—মন দিয়ে পড়। ফরগেট অল দোজ পাস্ট। বুঝেছ! মধ্যে মধ্যে এস। বুঝেছ! ভারী ভাল লাগে তোমাকে। বোল্ড ইয়ং ম্যান। আরও ভাল লাগে যে ছাট গাঁধীইজমের দড়ি খুলে ফেলতে পেরেছ।

এই পরিস্থিতিতে সে তখন বালিগঞ্জ যাচ্ছে। ওদের বাড়িতে চা খাচ্ছে। নমিতা অমিতা শমিতা এবং বাড়ির অন্যদের সঙ্গে হুল্লোড় করছে। ওদের গানের সঙ্গে বাঁশী বাজাচ্ছে। সাহিত্যালোচনা রাজনীতি নিয়ে তর্ক উত্তপ্ত। দাদার শ্বশুরেরা সদ্য কংগ্রেসে ঢুকেছেন। ১৯৫১ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের সংবিধান পাস হয়েছে। বি-পি-সি-সিতে অতুল্য ঘোষ প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর দলবল নিয়ে মন্ত্রিসভা এবং কংগ্রেস দুই ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় চীফ মিনিস্টার হয়েছেন। দিল্লীতে আচার্য কৃপালনী কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষদের সঙ্গে দল গড়েছেন। বাংলাদেশে কম্যুনিস্ট

পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে, সামনে নির্বাচন আসছে তার জন্য পার্টির উপর থেকে 'ব্যান' তুলে নেওয়া হয়েছে সম্প্রতি। বাইরের পৃথিবীতে চীনে কম্যুনিস্ট বিপ্লব হয়ে গেছে। চিয়াং কাইশেক ফরমোজায় হটে চলে গেছেন। আমেরিকা সারা পৃথিবীকে ঋণের পাকে পাকে জড়াচ্ছে। পাকিস্তানে এবং ভারতবর্ষে মতান্তরের সঙ্গে মনান্তরের উত্তাপের আর শেষ নেই। ১৯৪৬ সালে হিন্দু মুসলমানে যে দাঙ্গা বেধেছে তার জের মিটেও মিটছে না। বাংলাদেশে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, শাসন নাই, শৃঙ্খলা নাই। সমাজ নাই, শাস্ত্র নাই।

এরই মধ্যে নতুন সংগঠনের নামে কংগ্রেসের দুই দিকে দুটো দরজা খুলেছে। একদিকে নতুন লোক ঢুকছে—অন্যদিকে দরজা দিয়ে পুরনো লোকেরা বেরিয়ে যাচ্ছে। এই আলোচনা দাদার শ্বশুরবাড়িতে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি করত। এবং সে জ্বলত আগুনের মত। সে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার দলের মানুষ হয়ে উঠেছে তখন। বি-এ ক্লাসে ভরতি হয়ে স্টুডেন্টস্ মুভমেণ্টে অন্তরতম বৃত্তের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে সে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিন্তু কংগ্রেস-বিরোধী।

আশ্চর্য! পৃথিবীর একটা ঘটনার সঙ্গে আর একটা ঘটনা, যত দূরদূরান্তরের হোক, আর ভিন্ন জাতি জাত্যান্তরের হোক, আশ্চর্যভাবে অতি সূক্ষ্ম বন্ধনেও পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। নমিতার সঙ্গে তার গোপন প্রীতির সম্পর্ক না থাকলে এদের সঙ্গে প্রচণ্ড বিরোধ হয়ে যেত এবং স্টুডেন্টস্ ফ্রণ্টে সে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থাকত না।

কো-এডুকেশনের দিন। উজ্জ্বলা এবং প্রখরা সহপাঠিনীরও অভাব ছিল না এবং মৃদুহাসিনী সুকোমলা সলজ্জারও অভাব ছিল না। তবু জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছিল ওই নমিতার আকর্ষণ। ওই নমিতার আকর্ষণেই সেদিন রমলার প্রলোভনও তাকে প্রলুব্ধ করে নি।

মেয়েটা বিচিত্র। আজকের মত অতি তীব্র বেদনার্ত দিনেও তাকে বার বার মনে পড়ছে। আজ সে ওই সন্তানটির জননী হলে তার পায়ে আছড়ে পড়ে পা দুটোকে জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকত।

সে তাকে সব দিতে চেয়েছিল। জীবনের সব।

ওই জ্যৈষ্ঠ মাসের থেকে ছ মাস পর। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের প্রথম নির্বাচন। সারা দেশ জুড়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষের কাছে যেতে হচ্ছে ক্যাণ্ডিডেটকে। ভারতবর্ষের পুরাণে বর্ণিত দশ বিশটা অশ্বমেধ বা রাজসূয়েও এত আয়োজন প্রয়োজন হয় নি। এবং এতও কি পলিটিক্যাল মতভেদ ছিল!

দেবগ্রামে কংগ্রেস থেকে দাঁড়িয়েছিলেন এক ভিন্ন-ভাষাভাষী ধনী ব্যবসাদার। তাঁর বিরুদ্ধে ক্যাণ্ডিডেট ছিল আরও তিনজন। প্রজা সোসালিস্ট, কম্যুনিস্ট আর একজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট।

তার দুই দাদা সমর্থন করছিল কংগ্রেসকে। জ্যাঠতুত ভাইরাও তাই। এরই মধ্যে কাশী থেকে তার মা এসে হাজির হলেন দেবগ্রামে। কংগ্রেসকেই সমর্থন করছেন। নিজে গিয়ে তাঁকে কাশী থেকে নিয়ে এসেছেন ওই শেঠজী। কংগ্রেস সভাপতির অনুরোধপত্র নিয়ে

গিয়েছিলেন। দেবগ্রাম অঞ্চলে আপত্তি উঠেছিল—কংগ্রেস দিয়েছে বলে কি একজন পরদেশীকে সমর্থন করতে হবে আমাদের? সেই কারণেই মা এসে দাঁড়ালেন। স্বর্গীয় নিরঞ্জন চৌধুরীর সহকর্মিণী এবং সহধর্মিণী। সংবাদ পেয়ে পি-এস-পিকে সমর্থন করবার জন্য সে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

উপস্থিত হয়ে বিপদটা সে বুঝতে পারলে। আসায় বিপদ আছে জেনেই সে এসেছিল কিন্তু বিপদটা যে কতখানি তা অনুমান করতে পরে নি।

তার বাড়ি যেখানা সে বাড়িতে উঠেছেন তার মা। তার দাদারাও কংগ্রেসের সমর্থক। সে উঠবে কোথায়? সে মাকে বলবে—বাড়ি ছেড়ে দাও?

তাদের প্রার্থী বলেছিল—আমাদের একটা আপিস আছে দেবগ্রামে—সেখানে থাকুন। না হয় চলুন আমার বাড়িতে গিয়ে থাকবেন। দেবগ্রামে হারু চাটুজ্জের বাড়ির বাইরের দুটো ঘর নিয়ে আমরা আপিস করেছি।

* * *

বিচিত্র ঘটনা সংস্থান। রাজনীতি এবং অর্থনীতি দুটো স্রোত একসঙ্গে মিললে আর রক্ষা থাকে না। অর্থনীতি যে কোন উপায়েই পেটের অন্নের সংস্থান করুক রাজনীতি সে অন্নকে গ্রহণ করবার বা দেবতাকে নিবেদন করবার মন্ত্র তৈরি করে দেয় এক মুহূর্তে।

হারু চাটুজ্জে ইলেকশনে ঘর ভাড়া দিয়ে একেবারে পি-এস-পি সমর্থক হয়ে উঠেছে। চাটুজ্জের কোন রাজনীতি ছিল না তা নয়, এর আগে পর্যন্ত সে হিন্দু মহাসভার গোঁড়া সমর্থক ছিল। এবারে এখানে হিন্দু মহাসভার প্রার্থী নেই সেই কারণে প্রথমটা ছিল বেকার। হঠাৎ ঘর ভাড়া দিয়ে প্রথম হয়েছিল পরোক্ষ সমর্থক, তার পর এখন হয়েছে প্রত্যক্ষ সমর্থক, কারণ কর্মী যারা ওখানে থাকে চাটুজ্জের বাড়িতেই তার হেঁসেলেই তাদের রান্না হয়। চাটুজ্জের স্ত্রী এবং মেয়ে ভবানী রান্না করে। দৌহিত্রী রমলা পুরোপুরি পি-এস-পির সভ্যাই হয়ে গেছে বোধ হয়। সে খদ্দরের শাড়ি ফেরতা দিয়ে পরে অতি আধুনিকার মত দেবগ্রামে ধ্বজাধারিণী হয়ে উঠেছে। শ্লোগান দেয়। বাড়ি বাড়ি মেয়েদের কাছে যায়। বিশেষ করে ব্রাত্য পাড়ার মেয়েদের কাছে যায়।

বিচিত্র ঘটনা সংস্থানে সে চাটুজ্জের বাড়িতে গিয়েই রাত্রির মত বাসা নিয়েছিল।

রমলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

—অংশুদা!

অস্বস্তি বোধ করেছিল অংশু। রামলার মুখের দীপ্তি তাকে স্বস্তি দেয় নি। উদ্ধতযৌবনা রমলা যেন সেই মুহূর্তেই আগুনের সামনে দাহবস্তুর মত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

হারু চাটুজ্জে সেদিন বাড়িতে ছিল না।

রমলা তাকে বাইরের ঘরে থাকতে দেয় নি। দিয়েছিল বাড়ির ভিতরে হারু চাটুজ্জের শোবার ঘরের পাশের ঘরে। পুরনো কালের ভাঙা দোতলার দেড়খানার মত ঘর বসবাসযোগ্য ছিল। তারও মধ্যে ওই আধখানাটিই ছিল সব থেকে ভাল। প্রথম সে ওই ঘরে যেতে রাজী হয় নি কিন্তু বাইরের ঘর দুখানায় ভোট কর্মীরা এমন সার্থকভাবে

সমাজতান্ত্রিক ব্যবহার প্রাথমিক অবস্থাকে প্রবর্তিত করেছিল যে সে সহ্য করা সম্ভবপর হয় নি তার পক্ষে। বিড়ির কুটী এবং একটা ভ্যাপসা গন্ধ, তার সঙ্গে তক্তাপোশ বাজিয়ে হল্লোড় দেখে সে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল। এই সময়েই বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে এসেছিল রমলা। অংশুদা—!

তারপর আর কোন কথা শোনে নি, কইতে দেয় নি, বলে নি, নিজেই সুটকেসটা তুলে নিয়ে একজন পনের-ষোল বছর বয়সের ছেলেকে বলেছিল—নে তুই বিছানাটা নে।

তার দাদা এসেছিল তাকে নিতে।

থাক সে সব কথা।

একেবারে হুড়মুড় করে এসে পড়ছে রাত্রির কথা। গভীর রাত্রে সে তখনও জেগে ছিল। কেমন যেন একটা অজানা আতঙ্ক তাকে চেপে ধরেছিল দুঃস্বপ্নের মত। সে ভাবছিল—কেন সে এল ? বার বার মনে পড়ছিল নমিতাকে।

শ্যাম্পু করা চুল, মুখে পাউডারের একটি ধূসরতা, চোখে কাজলের রেখা, ঠোঁটে লিপস্টিকের আভাস। তন্বী তরুণী নমিতা শুধু সেতারই ভাল বাজায় না, সে নাচেও খুব ভাল। পুজোর আগে ওদের স্কুলের সোস্যালে নমিতা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে শ্যামার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। সে অভিনয় দেখেছিল অংশুমান। এবং এরপর কোনদিন নমিতাকে চিত্রাঙ্গদার ভূমিকা দিয়ে তার নিজের অর্জুনের ভূমিকায় অভিনয় করবার কল্পনা যে কতদিন করেছে তার হিসেব নেই। এ কথা নমিতা জানে। নমিতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ধীরে ধীরে প্রেমের কোঠায় পৌঁছেছে এ সত্যটা সে সেইদিন রাত্রেই প্রথম অনুভব করেছিল। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটা অনুভূতির স্পর্শ লাগে—পরস্পরের হাতে হাত ঠেকলে কেমন করে আঙুলগুলো কেঁপে ওঠে—মধ্যে মধ্যে কোন টেবিলের এপাশে ওপাশে বসে কথা কইতে কইতে হঠাৎ পায়ে পায়ে ছোঁয়া লেগে বুড়ো আঙুল চঞ্চল হয়ে ওঠে—সে-সব কথাই সে মনে করছিল। এরই মধ্যে, রাত্রি তখন গভীর, বাইরে সমস্ত গ্রাম স্তব্ধ, শুধু অগ্রহায়ণের শেষ রাত্রে এক একটা কুকুর ডেকে উঠছিল আর ডাকছিল আমবাগানে ঝিঁঝি পোকা ; হঠাৎ তার দরজার বাইরে শব্দ উঠেছিল—ঠুক। আবার—ঠুক। আবার—ঠুক ঠুক।

শেকলটা দরজার গায়ে ঠেকছিল।

তার বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠেছিল। সারা শরীরে একটা উত্তেজনার প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল।

আজও মনে পড়ে দুটো সমান বিরোধী শক্তি তার জীবনের দুই প্রান্ত ধরে টানছিল। একটার টানে সে উঠে বিস্ফারিত চোখে পা টিপে টিপে যেতে চাচ্ছিল ওই দরজার দিকে দরজা খুলে দেবার জন্য—আর একটা সমান শক্তি তাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে রেখেছিল বিছানার উপর। সমস্ত অন্তর সমস্ত বাহির যেন নিঃশেষে অবলুপ্ত এবং শূন্য হয়ে গিয়েছিল। শুধু ছিল হৃদ্‌স্পন্দনের গতির মধ্যে একটা অসহনীয় উদ্বেগ। শীতের রাত্রি, তবু শরীর তার ঘেমে উঠেছিল।

শেষ পর্যন্ত চাপা গলায় রমলা তাকে ডেকেছিল—অং—শু—দা—। অংশু—দা! চাপা গলায় দীর্ঘায়িত সতর্ক আহ্বান!

তবু সে দরজা খোলে নি।

কেন খোলে নি এ প্রশ্ন সে সেদিন করে নি। সেদিন সে প্রচণ্ড শঙ্কায় শঙ্কিত ছিল যে দরজা খুললে সে আত্মসংবরণ করতে পারবে না; রমলা তার বুকের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। এবং সমুদ্রের ঢেউয়ের সামনে ঝাঁপ দিলে সমুদ্র যেমন তাকে নিবিড়ভাবে আত্মসাৎ করে ঠিক তেমনিভাবে তাকে আত্মসাৎ না করে সে কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করতে পারবে না এ কথা সে নিশ্চিতরূপে জানত। এবং এও জানত যে তারপর রমলাকে বিয়ে করা ছাড়া তার আর নিষ্কৃতি থাকবে না। হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই রমলার মা দিদিমা এসে দরজায় ধাক্কা দেবেন। অথবা ঘরের দরজায় শেকল তুলে দিয়ে গাঁয়ের লোক ডেকে জড়ো করবেন।

সারারাত্রি সে কাঠ হয়ে পড়েছিল। কতক্ষণ বলতে পারে না তবে সে রাত্রিটা ছিল যেন একটা যুগ অথবা অনন্তকালের অন্তহীন রাত্রির একটি রাত্রি। সে রাত্রিরও আর শেষ ছিল না এবং তার একটা টুকরোর দৈর্ঘ্যেরও মাপজোখ ছিল না। এরই মধ্যে একসময় রমলা কখন চলে গিয়েছিল সে ঠিক ধরতে পারে নি।

পরের দিন দুপুরবেলা একবার মাত্র এসে তাকে ক'টি কথা বলে গিছল।

—কাল রাত্রে দরজা খুললে না কেন?

সে চুপ করে থেকেছিল।

রমলা বলেছিল—আমি তোমাকে—

বলে আর বলতে পারে নি। কিছুক্ষণ পর বলেছিল—তুমি আমাকে বিয়ে কর অংশুদা। দয়া করে বিয়ে কর। আমাকে বিয়ে করে আমাকে তুমি এই গাঁয়ের বাড়িতে ফেলে রেখে কলকাতায় থেকে অমিতা নমিতা যাকে ইচ্ছে হয় বিয়ে করো আমি কিছু বলব না।

সে তবু চুপ করে বসে ছিল।

রমলা বলেছিল—দাদু আমার বিয়ে দেবে এক বুড়োর সঙ্গে।

সে তবু কথা বলে নি।

রমলা বলেছিল—দেখ এ গাঁয়ে তোমার দাদারা থেকে ছোঁড়ারা পর্যন্ত আমার পিছনে জন্তুর মত লেগে আছে। ছিঁড়ে খেতে চায়। তুমি আমাকে বাঁচাও।

এবার সে বলেছিল—না তা হয় না!

—হয় না! বেশ! বলে চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—তবু রাত্রে আজ দরজাটা খুলে দিয়ো। ভাসতেই যখন হবে তখন তোমাতেই প্রথম ভাসান দেব। ভয় নাই—তার জন্যে কোন দাম চাইব না।

কোন মেয়ের এমনতর দুঃসাহসী আত্মদানের প্রস্তাব সে শোনে নি। মেয়েটা বিচিত্র।

অংশু কিন্তু রাত্রে আর থাকে নি। বিকেলে মিটিংয়ে বেরিয়ে ওই ক্যাণ্ডিডেটের সঙ্গে তার জীপে সেই দিনই রাত্রি দশটার সময় এসেছিল বর্ধমান। বাকী রাত্রিটা বর্ধমানে থেকে ভোরের লোকালে ফিরে এসেছিল কলকাতা। আর সে যায় নি গোটা ইলেকশনের

সময়ের মধ্যে।

এরই মধ্যে হঠাৎ সে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিল। বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র। হারু চাটুজ্জে তাকে রমলার বিবাহে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়েছে। রমলার বিবাহ হচ্ছে গোপগ্রামের হরিধন ঘোষালের সঙ্গে। এই কয়েকদিন পরই মাঘ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

বউদি চিঠি লিখেছিল—রমলা মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল। গোফ-গাঁয়ের হরি ঘোষালের সঙ্গে; অবস্থা খুব ভাল। দেড়শো দুশো বিঘে জমি—পুকুর—সম্পত্তি অনেক। শুধু লোকটার বয়স হয়েছে। বাহান্ন-চুয়ান্ন তো হবেই কেউ কেউ বলে বেশী হবে। তা হোক। অনেক গয়না দিয়েছে রমলাকে। এক-গা পুরনো আমলের ভারী ভারী গয়না পরে রমলা ঠাকুরবাড়িতে প্রণাম করতে এসেছিল। খুব খুশী। বললে—অংশুদাকে লিখো তো বউদি আমি কত গয়না পেয়েছি! এছাড়া প্রথম পক্ষের ছেলে বউদের সঙ্গে পৃথক করে আলাদা সম্পত্তি দিচ্ছে। তোমাকে মেয়েটা বড্ড জ্বালাতন করত বলেই খবরটা জানালাম। তুমি কিন্তু ভালো করে পড়ো। 'লেখাপড়া করবে যেই নমিকে হয়তো পাবে সেই।' বুঝলে! বাবা বলেছে।

* * *

১৯৫২ সাল তখন পড়েছে।

তার জীবনের একটা মোড় ঘুরে গেল ওই অধ্যাপক পণ্ডিতের একটি 'ধর্ষিত' শব্দ অবলম্বন করে সীতা চরিত্রের ওই অদ্ভুত ব্যাখ্যা নিয়ে। সে তার প্রতিবাদ লিখে খ্যাতি পেয়ে গেল। কবিতা গান সে লিখত—এবার এই খ্যাতির সূত্র ধরে সেগুলি কাগজের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগল।

তখনকার সব কবিতা তার নমিতাকে নিয়ে। মনে পড়ছে একটা কবিতায় পুরানো পদ্ধতিতে গোড়াকার অক্ষর ধরে উপর থেকে নিচের দিকে 'নমিতা আমার নমিতা' কথাটা লেখা ছিল।

"নদী ছুটে চলে সমুদ্র প্রেমে ভোর—
মিতার মতন তীর পাশে পাশে ছোটে;
তার সাধ শুধু তারই দুটি বাহুডোর,
আপন করিয়া বেঁধে রাখে দুই তটে।"

এইভাবেই ছিল নমিতা আমার নমিতা। টেলিফোনে নমিতাকে সে বলেছিল—কবিতাটা পড়ে দেখো, বলতে হবে কি আছে ওতে।

নমিতা ধরেছিল ঠিক।

সে তাকে বকেছিল। বলেছিল—এ সব কি হচ্ছে?

—কি হচ্ছে?

—জানিনে যাও। কিন্তু এসব করো না আর।

—কেন?

—দেখবে আমার দাদারা ঠেঙিয়ে দিয়ে আসবে। হেসে উঠেছিল নমিতা। হাসি থামিয়ে বলেছিল—কচিদি ধরে ফেলেছে—নমিতা আমার নমিতা। বুঝেছ?

—কেউ কিছু বলছিল নাকি?

—বলে নি তবে বলবে। আর করো না।

যে যা বলবে বলুক, অংশু থামে নি। সে গান রচনা করেছিল।

হঠাৎ একদিন শিবকিংকর দীর্ঘ চার বছর পর ওই গান যে কাগজে বেরিয়েছিল সেই কাগজ হাতে করে হাজির হয়েছিল।

সে খুব অখুশী হয়েই বলেছিল—তুমি?

সে হেসে বলেছিল—হ্যাঁ—আমি।

—তুমি কেন এলে?

—ওঃ তোর রাগ এখনও যায় নি!

সে চুপ করে অন্য দিকে তাকিয়েছিল—উত্তর দেয় নি।

—অতসী তোকে যেতে বলেছে।

—নাঃ! তুমি চলে যাও এখান থেকে।

শিবকিংকর রাগ করে না কখনও। সে বলেছিল—যাব—অতসী একটা কাজের জন্যে পাঠিয়েছে। আমাকে ফিরিয়ে দিলে সে নিজে এসে হাজির হবে।

এবার তাকে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল—কি কাজ?

—এই গান? এ গান তোর লেখা?

—হ্যাঁ আমার। আর একটা কথা; তোর নয় তোমার, তুই নয় তুমি বলে কথা বলবে।

—বেশ। তাই বলব। এখন এই গানের 'রাইট' অতসী কিনবে। কি নেবে তুমি বল?

অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। গানের রাইটের জন্যে টাকা!

শিবকিংকর বলেছিল—অতসী একখানা ছবি করছে। মানে প্রডিউস করছে। গানখানা কিনবে। আরও খানকয়েক গান লিখে দিতে বলেছে।

কলেজে তখন ফোর্থ ইয়ার। জীবনের মোড়টা আর একবার অতসী ফিরিয়ে দিলে। নমিতাকে ভালবেসেছিল—সেই ভালবাসাবশে তার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কাব্যে ধরা দিয়েছিল, তাই সমাদর করে কিনলে অতসী। চারখানা গান লিখে দিয়ে পেয়েছিল চারশো টাকা। একজন কবির প্রথম কাব্যের দাম হিসেবে সেটা কম নয়। তার সঙ্গে পেয়েছিল নাম। প্রতিষ্ঠা।

উদর চায় আহার, পেট পুরে আহার; তার সঙ্গে রসনা চায় রসের আস্বাদন। দেহ চায় দেহের সান্নিধ্য; তার সঙ্গে হৃদয় চায় প্রেমের স্পর্শ। না হলে খাওয়াও সত্য হয় না, দেহমিলনেও তৃপ্তি হয় না। তার বদলে ক্ষোভ হয়।

অতসীর দেহের স্বাদ তাকে একদা পাগল করেছিল, কিন্তু অতসীর প্রেমহীনতা সে স্বাদকে কটু করে তুলেছে তার কাছে।

সেই তিক্ততার স্মৃতিই তাকে রমলার দেহের স্বাদ গ্রহণ করতে দেয় নি। নিজের দিক থেকে তার লোভ ছিল। তার দেহের স্নায়ু শিরা রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল কিন্তু তার হৃদয়

আর মন তাকে ধরে রেখেছিল, বেঁধে রেখেছিল।

নমিতার প্রেমে তখন সে ভোর হয়ে ছিল। বিচিত্র তার স্বাদ। দেহের স্বাদ থেকেও বোধ করি তার স্বাদ আরও মধুর।

এ মুহূর্তে পুরাণের দুটি নাম মনে পড়ে গেল।

দৈত্যরাজার কন্যা শর্মিষ্ঠা আর দৈত্যগুরুর কন্যা দেবযানী। দেবযানী ক্রীতদাসী করেছিলেন শর্মিষ্ঠাকে। রাজা যযাতিকে বিবাহ করে দেবযানী রাজপুরীতে এসেছিলেন—সঙ্গে শর্মিষ্ঠা এসেছিলেন ক্রীতদাসী হয়ে। কিন্তু শর্মিষ্ঠা প্রেমের বলে রাজাকে জিতে নিয়েছিলেন। দেবযানী ধর্মপত্নী হয়েও তাঁকে পান নি।

শর্মিষ্ঠা প্রেম—দেবযানী মানবীদেহ। বিবাহ তো মানুষ একটি মানুষীকে তার মানুষী দেহের জন্যেই করে থাকে। তার যৌবন তার রূপই তো তাকে আকর্ষণ করে।

* * *

১৯৫২ সালের তখন শেষ। তার চারখানা গানের রেকর্ড বেরিয়ে গেল।

ভোরের আলোয় ফোটা ফুলের মত
আমার প্রেমে ধন্য যে-জন হবে
ফেলবে খুলে অঙ্গ হতে রত্নমালা যত।
এগিয়ে এসে আমার মালা আপন কণ্ঠে লবে—

এ গানখানা হিট্ হয়ে গিয়েছিল।

নমিতাদের বাড়িতে এ গানখানার খুব সুখ্যাতি হয়েছিল। আরও অনেক বাড়িতেই হয়েছিল কিন্তু তার কাছে নমিতাদের বাড়িতে পাওয়া খ্যাতির দাম ছিল আলাদা। অমিতা শমিতা তাদের সঙ্গে নমিতাও সেতার রেখে এ গানখানা রেকর্ড বাজিয়ে শিখে নিয়েছিল।

ও বাড়ির বউদের কাছেও তার খ্যাতি আশ্চর্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দাদার শাশুড়ী গম্ভীর লোক। খুব হিসেবী মানুষ। তিনিও বলেছিলেন—তাই তো অংশু, তোমার তো খুব নাম করছে গো লোকেরা! আমার পিসতুতো বোন, আমার থেকে ছোট বয়সে। তার এসবে খুব বাতিক। জান—কালিদাস রায়, কুমুদ মল্লিক, প্রেমেন মিত্তির আরও সব কে কে বটে বাপু—তাদের চিঠি লেখে। কাজী নজরুলের বাড়ি মধ্যে মধ্যে গিয়ে ফুলটুল দিয়ে আসে। সে বলছিল, ভাল হয়েছে। আর রেকর্ড নাকি খুব বিক্রী হয়েছে। খুব। তা তুমি কি পেলে? বলছিল উনি বোধ হয় ফাঁকিই পড়েছেন। কমিশনের কথা থাকলে অ—নে—ক টাকা পেতে। তা এবার থেকে তুমি বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করো। বুঝেছ—। ব্যাবসাদার মানুষ তো। ওঁকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়!

পৃথিবী আশ্চর্য।

কোন একটি মানুষের যে কোন ক্ষুদ্র একটি ঘটনার ওপর বোধ হয় সারা পৃথিবীর ঘটনার ছাপ পড়ে।

নমিতার বাবা খুশী হন নি। ঠিক এই সময়েই উপর থেকে নীচে নেমে আসছিলেন।

তাকে দেখে বলেছিলেন—আরে তুমি! কাল থেকে তোমাদের কথা ভাবছি হে। তোমার কথা, তোমার দাদার কথা! তোমার দাদা তো উকীল হয়ে কিছু করতে পারলে না। বাড়ি থেকে চাল নিয়ে গিয়ে খায় বর্ধমানে। তুমি সব কি গান-ফান লিখছ। এদিকে যে কংগ্রেস জমিদারি উচ্ছেদ করবে ঠিক করেছে। কোন দিকে হালে পানি না পেয়ে, নে—ওই জমিদার বেটারা আছে—নেহাত বিয়ে করা সেকেলে পরিবারের মত—তাদের যা আছে কেড়েকুড়ে নিয়ে দেখিয়ে দে কেমন দেশসেবা হচ্ছে। রাবিশ! জমিদারি গেলে চলবে কি করে তোমাদের? ওসব গানটান লেখা ছাড়। ছেড়ে বেশ ভাল করে পাস কর। একটা হাই লেবেলের অফিসার হয়ে যাও—!

জমিদারি উচ্ছেদ করছে কংগ্রেস, এ খবরটা সে নমিতার বাবার কাছেই পেয়েছিল। কিন্তু তাতে সে ঘাড় ভেঙে পড়ে পড়াশুনো করে বি-এ পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ড করবার মত প্রেরণা পায় নি। তার বদলে বিচিত্র সূত্রে দুটি অতিবিচিত্র ঘটনার কথা জানতে পেয়ে প্রথম তাই নিয়ে লিখেছিল একটি গল্প—কিন্তু লিখে তৃপ্তি হয় নি বলে তাই থেকে লিখেছিল একটি একাঙ্কিকা।

একটি ঘটনার কথা জেনেছিল একজন ডাক্তার সেনের কাছ থেকে। নমিতার এক বান্ধবীর কাকা। উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার যুদ্ধে ভারতবর্ষ থেকে মেডিক্যাল মিশনের সঙ্গে গেছলেন। নমিতা তাকে বলেছিল, তার বান্ধবী তার সঙ্গে আলাপ করতে চায়—সে ওই রেকর্ডের জন্যে। চায়ে নেমন্তন্ন করেছিল। সেখানে গিয়ে আলাপ হয়েছিল তার কাকা ডাক্তারের সঙ্গে। দিলদরিয়া মেজাজের লোক। মতবাদে হয়তো কম্যুনিস্ট অথবা মার্কিনী। মোট কথা এদেশী মানুষ কোনমতে নন। তা হোক। ভালো গল্প বলেন। অংশু গল্প লেখে শুনে কথায় কথায় ফ্রয়েড ওঠে, এবং তা থেকে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বোসের কথা উঠেছিল। ডাঃ সেন তাকে ডাঃ বোসের চিকিৎসা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিচিত্র গল্প বলেছিলেন।

বিচিত্র পৃথিবীর সূত্র। তার গানের সূত্র ধরে তাকে ডেকেছিল নমিতার বান্ধবী এবং তার কাকার সঙ্গে নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়ার সূত্র ধরে সে পেয়েছিল একটি জমিদারের ছেলে এবং একটি নার্সের বিচিত্র কাহিনী। নার্স মেয়েটিকে এই জমিদারের ছেলেকে নার্সিং করতে হয়েছিল এক জটিল পথে। তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে নিজের প্রতি ছেলেটিকে আকৃষ্ট করতে হয়েছিল। ফল তাতে হয়েছিল, কিন্তু এই নার্সটি পড়েছিল তার প্রেমে। অথচ মেয়েটি ছিল অত্যন্ত প্রগল্‌ভা এবং স্বৈরিণী অপবাদও ঠিক অসত্য ছিল না। তরুণ ডাক্তারদের সঙ্গে প্রেমের-খেলা খেলা তার একটা বিলাস অথবা প্রকৃতিধর্ম ছিল। মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সে এই কাজ নিয়েছিল। এবার আর প্রেম করা তার খেলা ছিল না, এবার ছিল নার্সিংয়ের অঙ্গ। অর্থাৎ ওই মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ছেলেটিকে বিশ্বাস করাতে হয়েছিল যে সে তার সঙ্গে সত্যই প্রেমে পড়েছে। ঘটনা-বৈচিত্র্য এই যে, মেয়েটি এবার প্রেমের-খেলা খেলতে গিয়ে সত্যসত্যই প্রেমে পড়ল এই মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত তরুণটির সঙ্গে। তরুণটি সেরে উঠল। মেয়েটি তার প্রাপ্য নিলে বটে কিন্তু সে চোখের জলে ভেসেই নিলে এবং এরপর কোথায় যে চলে গেল কেউ জানে না।

আর একটি গল্প শুনেছিল নমিতাদের বাড়িতে। ওদেরই দূরসম্পর্কের আত্মীয়বাড়ির একটি মর্মান্তিক ঘটনা।

কলকাতার দক্ষিণে এক বর্ধিষ্ণু ঘরের একটি ছেলে। একটি ছেলে বললেই সব বলা হল না ; ওই বাড়ির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তরুণ বয়স, উজ্জ্বল চেহারা ; লেখাপড়ায় মাঝারি কিন্তু বাঁশী বাজাতো গান গাইতো বড় ভালো। সংসারে একমাত্র বিধবা দিদি ছাড়া আর কেউ ছিল না। এক বছর আগে ছেলেটির বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর বর বউ আসছিল নৌকোয়। ছেলের দিদি ব্যবস্থা করেছিলেন আলো জ্বালিয়ে শোভাযাত্রা করে ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপ বাজিয়ে বর কনেকে গ্রাম ঘুরিয়ে বাড়িতে বরণ করবেন। সে-দিন কালরাত্রি। বর কনেতে দেখা হতে নেই। তার জন্য দুখানা পালকির ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু বিকেলের দিকে জল ঝড় হয়েছিল বলে বর কনের নৌকো এসে পৌঁছুতে খানিকটা রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। এবং গ্রামের রাস্তাঘাট সে জলে ঝড়ে এমন বিপর্যস্ত হয়েছিল যে কলকাতার দক্ষিণের গাঙের ধারের গ্রাম্য রাস্তা পিছল হয়ে পড়েছিল। সেই কারণে বর কনেকে সতর্ক পাহারার মধ্যে ঘাটেই দুখানা স্বতন্ত্র নৌকোয় রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন দিদিটি। কারণ সে-রাত্রিটা ছিল কালরাত্রি। সকালে আলো বাদ দিয়ে শোভাযাত্রা করে বর কনেকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে দেবতাদের দোরে দোরে প্রণাম করিয়ে ঘরে তুলবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু রাত্রে এ নৌকোয় বর ও নৌকোয় কনে এই বিংশ শতাব্দীর একান্নতম বৎসরে কালরাত্রির বিরহ মান্য করতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের চোখে ঘুম ছিল না—তারা জেগেই বসেছিল। আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ। নদীতে ছিল বড় জোয়ার। নৌকোর সকলেই যখন ঘুমিয়েছে তখন দুই নৌকোর বাইরে পাটাতনের উপর এসে দাঁড়িয়েছে তারা। বর বাজাচ্ছিল বাঁশী, বউ মৃদুস্বরে গাইছিল গান। জোয়ারের ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৌকো দুখানা পাশাপাশি যেন তালে তালে দোল দিচ্ছিল। একসময় বর তাকে ডেকেছিল—এস আমার নৌকোয়।

কনের নৌকো কালরাত্রিতে মিলিত হবার পক্ষে অনুকূল ছিল না। কনের সঙ্গে ছিল কনের বাড়ির একজন ঝি এবং বরের বাড়ি থেকে এসে রাত্রিকালে বউ আগলাচ্ছিল বরের সম্পর্কিত দুই বোন। তাদের মধ্যে একজন বয়স্কা।

—'এস আমার নৌকোয়' বলে বর বাড়িয়ে দিয়েছিল হাত। নৌকো দুখানা একেবারে পাশাপাশি, দুখানার দুই কিনারা পরস্পরের গায়ের সঙ্গে মিলে লেগেছিল। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে বিস্ময়কর অভাবনীয় পথে। যা ভাবা যায় না তাই ঘটে বলেই অনিবার্যভাবে ঘটে যায় অ্যাকসিডেন্ট। বউ যে মুহূর্তে আসবার জন্যে এক পা বাড়িয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই উঠেছে একটা বড় ঢেউ। নৌকো দুখানা পরস্পরের গায়ে ঠোকা খেয়ে পরস্পর থেকে দূরে সরে গেল দুই উলটো দিকে এবং বউটি 'ওগো' বলে মর্মান্তিক এক আর্তনাদ করে পড়ে গেল জোয়ারের তুফানে। সঙ্গে সঙ্গে বর তার বাঁশী রেখে দিল ঝাঁপ। তারপর মাঝি মাল্লারাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোলাহল উঠল। হইচই হল। ফল হল—বরকে পাওয়া গেল অজ্ঞান অবস্থায় কিন্তু বউকে পাওয়া গেল না। একদিন পর তাকে পাওয়া গেল কিনারার একটা

ডাকে।

বর ছেলেটিও কঠিন আঘাত খেয়েছিল বুকে কিন্তু বাঁচল। তবে সে বাঁচা শুধু নামেই বাঁচা। ভগ্ন দেহ তার সঙ্গে অসুস্থ মন। তার ধারণা তার সেই বউয়ের আত্মা ঘুরে বেড়ায় এবং তাকে ডাকে। ওগো, ওগো বলে সে ডাক সে শুনতে পায়। কান পেতে থাকে সে। এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ সেদিন সে মারা গেছে। এই মৃত্যুর মধ্যেও আছে তার খানিকটা বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্য না বলে ছেলেটির অসুস্থ মনের অদ্ভুত সংস্কারের অনিবার্য পরিণতি বলাই ভাল। এক বৎসর পূর্বের তার সেই কালরাত্রির এক বৎসর পূর্ণ হল যেদিন সেদিন সে দিদিকে বললে—আজ তার বউ নিশ্চয় আসবে। সে সেজেগুজে বাসর সাজিয়ে বসে বাঁশী বাজাবে তার শোবার ঘরে। তার দৃঢ় বিশ্বাস তার বাঁশী শুনে তার বউয়ের আত্মা আসবে এবং তাকে হয়তো নিয়ে যাবে।

কারুর কোন বারণ সে শোনে নি। সে বাঁশী বাজিয়েছিল ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে এবং তার ফলে সে মারা গেছে।

ঘটনাটা আজ হোক কাল হোক ঘটবে এইটে প্রায় নিশ্চিতরূপেই স্থির ছিল। তবু সেইটে এইভাবে ঘটবে এমনটা কেউ ভাবে নি। এর মধ্যে অনিবার্যতার দুঃখের চেয়ে কিছু যেন বেশী ছিল যা এমন সকরুণ ঘটনাটিকে সুন্দর করে তুলেছে।

* * *

ঘটনা দুটো মনের মধ্যে অহরহ কয়েক দিন ঘুরতে ঘুরতে একসঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। একটা মনে পড়লেই আর একটা মনে পড়ত। তার ফলে একটির শিকড় এবং অন্যটির ডালে জোড় বেঁধে একটি আশ্চর্য রোমান্টিক কাহিনীতে পরিণতি লাভ করে প্রথমে বেরিয়েছিল গল্প হয়ে—তারপরই তাই নিয়ে সে লিখেছিল একটি একাঙ্কিকা।

একাঙ্কিকা লিখিয়েছিল তাকে শিবকিংকর।

তার জীবনের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে জড়িয়ে আছে সে। সে তাকে ডাকে না, সে তাকে চায় না তবু সে আসে, নিজে থেকে আসে। অতসীর খবর আনে, অতসীর অনুরোধের কথা বলে। অতসী তার অতীত জীবনের পুরনো কালের পাপ, তাকে সে যত পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায় তত সে তার পিছনে পিছনে এসে ওই শিবকিংকরকে দিয়ে তাকে ডাকে, তাকে ধরে। এদিকে নমিতা তার নতুন কাল। না—ভুল। নমিতা নতুন কাল নয়, ছদ্মবেশী নতুন কাল, সিউডো নতুন কাল। নতুন কাল সেজে এসে তাকে সেই পুরনো কালেই নিয়ে যেত। তার বাপ-ভাইয়েরা ছিল যুদ্ধের সময় কালোবাজারী। তারপর স্বাধীনতার পর কিছুদিন চুপ করে থেকে ভোল পালটে আজ সেজেছে প্রগতিশীল।

অতসী, পাপ অতসী। না—পাপ বলতে সিন্—sin নয়। Sinএ সে বিশ্বাস করে না। Crimeএও বিশ্বাস করে না, তবে crimeকে মানে। অতসী crime তো বটেই, crime থেকেও কিছু বেশী। তবু পাপই অতসীর একমাত্র বিশেষণ। নমিতা তার থেকেও বেশী।

অতসী তার ওই গল্পটা পড়ে শিবকিংকরকে পাঠিয়েছিল—গল্পটা সে ছবির জন্য কিনবে।

নমিতা তাকে বলেছিল—তুমি ওটা নিয়ে নাটক কর। তুমি বরের পার্ট করবে, আমি বউ আর নার্সটার পার্ট করব। লুকিয়ে করব। বুঝলে আমাদের বাড়ির কাউকে জানতে দেব না। ছোট একটা হল ভাড়া করে—।

তা কিন্তু হয় নি। তার বদলে যা হল তার ফলে জীবনটা সোজাসুজি ঢালের পথেই মূল গঙ্গাধারার মতই বয়ে গিয়েছিল; যাকে দেশের লোক বলে 'কীর্তিনাশার ধারা'; লোকপরম্পরায় যে ধারা সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে ওই ধারায় স্নান করলে পুণ্যক্ষয় হয়।

হঠাৎ নমিতা জীবনের ধারার খাত বদল করলে যেন। ইদানীং নমিতাদের বাড়ির বাইরেও তাদের দেখাশোনা হত। ওই যে ডাঃ সেনের ভাইঝি—নমিতার বান্ধবী, তার বাড়িতে হত। মধ্যে মধ্যে দুপুরবেলার শোয়ে সিনেমা হলে হত। টেলিফোন নিত্যই হত কোন কোন দিন এবেলা ওবেলা দু'বেলাও হত। হঠাৎ একদা অংশুমান আবিষ্কার করেছিল গতকাল একবারও টেলিফোন করে নি নমিতা। তার দিক থেকে টেলিফোন করার ঠিক উপায় ছিল না। কারণ কাকে টেলিফোন করবে? কি বলবে? এই আধুনিক ধনীদের বাড়ির বাঁধন ওখানে ঠিক আছে।

পরের দিনও টেলিফোন পায় নি। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যেবেলা সে অজুহাত একটা খুঁজে নিয়ে দাদার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখেছিল বাড়ি প্রায় ফাঁকা; গোটা বাড়িটাই প্রায় চলে গেছে দেশভ্রমণে। সেই উত্তর সীমায় শ্রীনগর থেকে দিল্লী আগ্রার চারিদিকের অঞ্চল সবটাই সে ভ্রমণের এলাকায় পড়বে। হরিদ্বার মথুরা বৃন্দাবন এসব স্থানেও যাবেন তাঁরা। ওদিকে পুষ্কর কুরুক্ষেত্র সাবিত্রী পর্যন্তও যেতে পারেন। একটা ভালোরকম যোগাযোগ হয়েছিল। সারা ভারতের রেল বিভাগের একজন চিত্রগুপ্ত-জাতীয় কর্মচারী সপরিবারে ভ্রমণে বের হচ্ছেন। নমিতার বাবা তাঁর বন্ধু। তাঁর ট্রাঙ্ককলে ব্যবসা সংক্রান্ত কথা বলতে গিয়ে এই ভ্রমণের কথা জানতে পেরে বলেছিলেন—আমায় বললেন না। আমি যেতাম আপনাদের পিছু পিছু। সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রহ নিমন্ত্রণ এসেছিল—"আসুন—কালই চলে আসুন। পারেন না? তার পরের সব ব্যবস্থা আমি করব।"

দাদার শ্বশুর সেল্ফ্ মেড ম্যান, তিনি বলেন—ক্রম এ সচ্ছল চাষী গেরস্থ পরিবার টু দি হেড অফিস অব টোয়েন্টি-থ্রি লিমিটেড কম্পানীজ। ক্রম লগ কেবিন টু হোয়াইট হাউসও যদি কোন দিন হয় তাতে আশ্চর্য হবে না কেউ। অন্ততঃ আমি তো হবই না। বাট্ ইউ সি—। আমার ভাল লাগে না। নইলে আমার ডিকশনারীতে অসম্ভব শব্দটি আমি ঘষে তুলে দিয়েছি।

দাদার শ্বশুর 'কালই' যেতে পারেন নি। পরশুই রওনা হয়ে গেছেন—সঙ্গে গেছে তাঁর স্ত্রী, তিন কুমারী কন্যা এবং মেজছেলে, মেজবউ এবং ছোটছেলে। ফিরবেন কবে তার ঠিক নেই তবে মাস দুয়েক যে হবে তাতে সন্দেহ নেই।

দাদার বড়শালাজ অর্থাৎ বড়শালার স্ত্রী, ও বাড়ির বড়বউদি—তিনি এদেশের সেই সব মেয়েদের একজন যাঁরা বছর তিরিশেক বয়সে পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়ের মা হয়ে আধহাত চওড়া

হাতীপাড়পেড়ে শাড়ি চল্‌কো করে পরে প্রবীণা এবং ভারিক্কী হয়ে পড়েন। তিনি বলেছিলেন —এখন মাস দুই আড়াই মন দিয়ে পড়াশোনা করগে। এবার তো তোমার পরীক্ষার বছর।

সেই তার ও-বাড়িতে শেষ যাওয়া। এর পর আর যায় নি। কারণ দু মাস পরই সে খবর পেয়েছিল দেশে ফিরেই দাদার শ্বশুর তাঁর দুই কন্যার বিবাহ দিচ্ছেন। অমিতার এবং নমিতার—পাত্র দুটিই দিল্লীর সরকারী দপ্তরের চাকরে; ওই রেলদপ্তরের ভদ্রলোকের পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র। দুজনেই কুলীন—বিলাতফেরত।

* * *

না। সে মদ খেতে ধরে নি। ঠিক হল না। অতসীকে নিয়ে মায়ের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের সময় থেকেই সে মধ্যে মধ্যে মদ খেয়েছে। মদ খেলে কোন অন্যায় হয় না বা মদ খেয়ে অন্যায় হয় এইটে সে মানে না তাই প্রমাণ করবার জন্য খেয়েছে। লোকের কাছেও সে প্রমাণ করতে চায় নি। নিজের কাছেই প্রমাণ করতে চেয়েছিল। হঠাৎ কোন কোন দিন তার মনে একটা সংশয় জাগে। মনে হয় যে সে আগের কালের সেই গোঁড়া ধর্ম এবং গঙ্গাজলে ধোওয়া রাজনীতির গোবরমাটি-নিকোনো খামারবাড়িতেই পোষা পায়রার মত ঝরা ধান খেয়ে বেড়াচ্ছে; আকাশে উঠে পাক খেয়ে ডিগবাজি খেয়ে চক্কর মেরে কসরত যাই দেখাক মোটামুটি নজর তার কাবুর দিকে। এইটে মনে হলেই এমনিভাবে সে নিজের কাছেই নিজে প্রমাণ করতে চায় যে, সে পোষা কবুতর নয়, সে বাজপাখী—লক্ষ্য তার উদয়-দিগন্তের দিকে। সেখানে পৌঁছুনোর আগে পাখা সে বন্ধ করবে না।

তার জীবনের সব আনুগত্য আজ সন্ধানহীন নেতাজীর প্রতি। কেবল একটি কারণে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে সে ধন্যবাদ জানায়। নেহেরুজী গান্ধীবাদের গোঁড়ামির এবং ভ্রান্ত আদর্শগুলোকে সুকুশল নৈপুণ্যের সঙ্গে এদেশের জীবনের উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

নমিতার এই বিয়ের খবরের বিশদ বিবরণ সে পেয়েছিল মিস সেনের কাছে। নমিতার বান্ধবী মিস সেন। স্মৃতি সেন। দেখা হয়ে গিয়েছিল একটা স্টুডেণ্টস্ র‍্যালিতে। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ছাত্র সমাবেশে সে সেদিন বক্তৃতা করেছিল।

আজ এই ১৯৪২ সালে ঠিক মনে পড়ছে না র‍্যালিটা ছিল কিসের জন্যে। কিন্তু বিশ্বরাজনীতি এসে পড়েছিল একেবারে শুরু থেকেই।

স্টুডেণ্টস্ ফেডারেশনের জোরটা সেইই ১৯৪২।৪৩ থেকেই ছাত্রজগতে অনন্তমূলের মত মূলজাল বিস্তার করে রেখেছে। গ্রীষ্মে শীতে শুকনো শুকনো দেখায় কিন্তু বর্ষা এলেই সে মাটির ভিতরের শুকনো শিকড় জল শুষে সতেজ হয়—সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে ফেলে মাটির বুক। তাদেরই একজন প্রথম শ্রেণীর বক্তা শুরু করেছিল বক্তৃতার এই ধারা।

সে সেদিন ক্ষুব্ধ হয়েই ছিল। সে ক্ষোভ তার নমিতার জন্য। সেই ক্ষোভ বিচিত্রভাবে, এই একটি ফাটল দিয়ে মাটির বুকের চাপা আগুন যেমন বেরিয়ে আসে তেমনিভাবেই বেরিয়ে এসেছিল।

চীন, ফরমোজা, নর্থ কোরিয়া, সাউথ কোরিয়া, নর্থ ভিয়েৎনাম, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, ইউনাইটেড আরব, মাও সে-তুঙ, চিয়াং কাইশেক, হো চি মিন, উন্নু, সুকার্ণো, কর্নেল নাসের, ইরান, ইরাক নিয়ে এক নয়া দুনিয়ার ছবি এঁকে পুরানো পৃথিবী পুরানো সমাজকে বরবাদ ঘোষণা করে গালাগালি দিয়েছিল, অভিসম্পাত দিয়েছিল ভ্রান্ত অহিংসাপন্থী এবং সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ ভারতবর্ষের বর্তমানকে। যার মধ্যে তার মনে মনে বার বার ভেসে উঠছিল তার মায়ের মুখ, তার দাদার শ্বশুরের মুখ, নমিতার মুখ, তার সঙ্গে বারকয়েক অতসীর মুখও বোধ হয় ভেসে উঠেছিল।

এই সমাবেশের মধ্যে গান গাইতে এসেছিল যারা তারই মধ্যে ছিল মিস সেন। স্মৃতি সেন। রুক্ষ চুল, ধুলিধূসর মুখ, পারিপাট্যহীন অথচ অপরিসীম এক আকর্ষণ তার সাজসজ্জায়, মেয়েটিকে দেখে প্রদীপ্ত মনে হচ্ছিল। অন্যেরা তার কাছে যে ম্লান ছিল তা ছিল না তবু তার পরিচিত মুখ তাকে আকৃষ্ট করেছিল বেশী। মিস সেনও তাকে লক্ষ্য করেছিল ওই পরিচয়েরই আকর্ষণে। সেও এই দলে খুব একটা বেশী অভ্যস্ত ছিল না। নতুন এসেছে। হাতেখড়ি নিচ্ছে। বিদেশী গানের সুর টান ওর গলায় ভাল ওঠে, ওই গান জানে বলেই তাকে এই বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য রিক্রুট করা হয়েছে। অনেকেই বেশ ভাল বলেছিল। তার মধ্যে অংশুমান একজন।

বক্তৃতার শেষে সে বেরিয়ে এসে একটু নিরিবিলিতে সিগারেট ধরিয়ে টানছিল সেই সময় স্মৃতি এসে তাকে বলেছিল—আপনি তো বেশ চমৎকার বলেন অংশুবাবু।

একটু তিক্ত হেসে সে বলেছিল—ভাল লাগল?

—চমৎকার লাগল।

সে উত্তর দেয় নি। স্মৃতি একটু যেন কথা খুঁজে নিয়ে বলেছিল—আপনি সুন্দর গান লেখেন—সুন্দর গল্প লেখেন—এমন বক্তৃতা করেন—এমন চেহারা আপনার—আপনাকে ছেড়ে দিয়ে নমিতা ওই একটা চাকরে বাজে-মার্কা লোককে বিয়ে করতে গেল। এম-এ পাস করে আপনিও একটা বড় চাকরি পেতে পারবেন। না হলই বা সরকারী। পলিটিক্যাল লীডার হতে পারতেন।

অংশু বলেছিল—আমাকে ধরেছিল তা আপনাকে কে বললে?

—কে বলবে? এ আবার বলতে হয় নাকি? তবে ওর কথা ও আমাকে নিজেই বলেছিল। কি বলেছিল জানেন?

—কি?

—বলেছিল বাবা ওর সঙ্গে বিয়ে না দিলে লুকিয়ে বিয়ে করে ফেলব। অথচ—

—অথচ কি?

—অথচ আর কি? খুব খুশী বিয়েতে।

—খুব খুশী?

—ওরে বা-প-রে! বরের গল্প আর ফুরোয় না আমার কাছে। এই এতো টাকা মাইনে হবে। তিন হাজার পর্যন্ত। ফরেন সার্ভিসের চান্স আছে। তা হলে তো একেবারে

কথাই নেই। পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরবে। আমি তাও বললাম—তাহলে অংশুবাবুর সঙ্গে এমন করে ঢলাঢলি করলি কেন? বললে—ঢলাঢলি? ঢলাঢলি কোথায় করলাম! বললাম—প্রেম তো করছিলি? বললে, করছিলাম। কিন্তু সে তো এমন কতই হয়। তা ছাড়া বাবা-মা এদের কথা আছে। হাজার হলেও আমাদের হিন্দুর ঘর তো!

এই সময়েই রমেশ তাকে ডেকেছিল, শোন, ডাকছে তোমাকে।

—কে?

—বড় বড় লোক।

* * *

সত্যিই তাকে বড় বড় লীডারেরা ডেকে প্রশংসা করে স্টুডেন্টস্ মুভমেণ্টে তাঁদের দলে যোগ দেবার জন্ম ডেকেছিলেন। হয়তো সে তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঝাঁপিয়েই পড়ত সে মুভমেণ্টে। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়তে দেয় নি তাকে ওই স্মৃতি মেয়েটি আর তার লেখা সেই রামায়ণ প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা প্রবন্ধটি। স্মৃতিই তাকে লেখক অংশুমান চৌধুরী বলে পরিচিত করে দিয়েছিল। সেই কানে তুলে দিয়েছিল যে সে খুব ভাল লেখে। এবং এই পরিচয় থেকেই প্রশ্ন করেছিলেন লীডারেরা—এ কোন্ লেখক অংশুমান চৌধুরী? রামায়ণের 'ধর্ষিতায়াং সীতায়াং' শব্দ নিয়ে যে প্রগ্রেসিভ গবেষণা হয়েছে যাকে যুগান্তকারী বলা যায়—সেই গভেষণার প্রতিবাদে যে-লেখক অংশুমান চৌধুরী সমগ্র রামায়ণে কতবার ধর্ষিত শব্দ ব্যবহার হয়েছে এবং কোথাও ধর্ষিত বা ধর্ষণ বলাৎকার অর্থে ব্যবহৃত হয় নি দেখিয়েছে ও পরবর্তী সুন্দর-কাণ্ডে রাবণের উপর ব্রহ্মার অভিশাপের কথা তুলে ধরে সীতার দেহগত সতীত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে, এ কি সেই অংশুমান চৌধুরী? এ তো একটি ছেলেছোকরা বললেই হয়। তার আপাদ-মস্তক দৃষ্টি দিয়ে লেহন করে একজন নেতা প্রশ্ন করেছিলেন—এসব নিয়ে মাথাব্যথা কেন?

সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলেছিল—মিথ্যের প্রতিবাদ করব না?

—সত্যি-মিথ্যে তুমি বোঝ?

—বুঝি বইকি।

—না। বোঝ না।

—মানে?

—মানে যাকে সত্য বলে এতকাল জেনে এসেছ তার কোনটাই সত্য নয়। সত্যকে নতুন করে জানতে হবে, বুঝতে হবে।

—কি বলছেন আপনি?

—বলছি। বুঝিয়ে দিচ্ছি। বল না, সূর্য রথে চড়ে পূর্বদিকে উঠে সারাদিনে পশ্চিমদিকে অস্ত যায়, না পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে? বল না, ভূমিকম্প হয় বাসুকিনাগ মাথা নাড়লে না অন্য কারণে? বল?

সে খানিকটা ভড়কে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল—তাহলে আগে রাবণ দশটা মাথা কুড়িটা হাত নিয়ে কি করে কাত হয়ে শুতো বা ক'খানা থালা নিয়ে খেতো এবং ক'টা পাকস্থলী তার ছিল গবেষণা করতে বলব। বিজ্ঞানের সত্য আর দর্শনের সত্য এক নয়।

বিজ্ঞানে স্বর্গ নেই—দর্শনে আছে। কল্পনাই এখানে শ্রেষ্ঠ সত্য।

চলে এসেছিল সে। তার স্বভাবমতই কাজ করেছিল। পার্টি পার্টির মত কাজ করেছিল—কলেজ ইউনিয়নে সে নমিনেশন পায় নি। কিন্তু সে তাতে পিছিয়ে আসে নি। জেদ করেই ছাত্র মুভমেণ্টে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ক্যাণ্ডিডেট হিসেবেই বেশ ভালো ভোটে জিতে নির্বাচিত হয়েছিল।

তার উত্তপ্ত চিত্তলোকে অবাধ ঝড় বয়ে গিয়েছিল পুরো পাঁচ বছর। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৫৩সাল পর্যন্ত। বি-এতে আরও এক বছর। ইউনিভারসিটিতে এসে পুরো চার বছর। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত। তখন আকাশে স্পুটনিক পৃথিবীকে বেষ্টন করে পিপ্ পিপ্ আওয়াজ করে ঘুরছে। আমেরিকা লজ্জায় মাথা কুটছে। ওদিকে বিকিনীতে অ্যাটম বোমার পর অ্যাটম বোমা ফাটছে। বৃষ্টির সঙ্গে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ বিষ এসে পৃথিবীকে বিষাক্ত করছে। সুয়েজ নিয়ে একটা নাটকীয় দৃশ্য হয়ে গেছে একেবারে প্রথম দিকে; ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্সের গালে চড় মেরে নাসের সুয়েজ ক্যানেল কেড়ে নিয়েছে। বুড়ো সিংহের একখামচা কেশর খসে পড়ে গেছে সে চড়ের আঘাতে। রাশিয়ায় মেলেনকভ গেছেন, বেরিয়া গেছেন, (স্টালিন তার আগেই গেছেন), বুলগানিন এসেছেন—তার পিছনে পিছনে ক্রুশ্চেভ এসেছে। এদেশে আর একটা ইলেকশন হয়ে গেছে। তাতেও কংগ্রেস জিতেছে সর্বত্র। বি-পি-সি-সির প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন অতুল্য ঘোষ! লোকে বলছে লোহার মনুষ্য বা পাথরের মনুষ্য। এর মধ্যে ধন্যবাদ জনাব রফি আহমেদ কিদোয়াইকে—তিনি কেন্দ্রে খাদ্যমন্ত্রী হয়েই রেশনিং তুলে দিয়েছেন। চালের দর কিন্তু নামে নি। বাংলাদেশের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন কিছুটা বেকার হয়ে পড়েছেন।

বিগত কালের নেতারা পঞ্জিকা ফলের গ্রহদের মত একের পর এক অস্ত যাচ্ছেন।

তিব্বতের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছে চীন সরকার। ১৯৫৪ সালে মে মাসে দলাইলামা এবং পাঞ্চেনলামা পিকিংয়ে গেছিলেন First National কংগ্রেসে যোগ দিতে। দলাইলামা বুদ্ধের অবতার হিসেবে নয়। জনগণের ডেপুটী হিসেবে।

১৯৫৬ সালে হয়ে গেল বান্দুং কনফারেন্স।

নেহেরু আনলেন 'পঞ্চশীল'। ভারতবর্ষেরই পঞ্চশীল; নেহেরু কিন্তু ওটা ধার নিলেন ইন্দোনেশিয়ার কাছে। আচার্য কৃপালনী বললেন পাঁচটি দুর্বোধ্য মূর্খতা নয় মূর্খামি। মোট কথা এই কয়েকটা বছরে সব কিছুর মানে যেন বদলে গেল। সব কিছুর রঙ যেন পালটালো।

অংশুমান একটা কবিতা লিখেছিল—

> আকাশের মহাশূন্যে স্পুটনিক ঘোরে
> অ্যাটমিক বোমায় ধুলো হয়ে হারিয়ে যাওয়া
> আকাশে চারিয়ে যাওয়া
> প্রভু পিতা অথবা নেহাতই ভাওতা
> ঈশ্বরের কণার সন্ধানে
> পিপ-পিপ রব তুলে।

শুধু এই নয়। আরও আছে। অংশুমান এই পাঁচ বছরে কবি নাট্যকার গীতিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে।

পথ তাকে আপনি ছেড়ে দিয়েছিল পৃথিবী।

তার শক্তি ছিল। কিন্তু তাই সব নয়। কাল এবং দেশ তাকে সাহায্য করেছিল। বাংলায় জমিদারি উচ্ছেদ বিল—আসলে এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট পাস হল। সেই সময়েই সঙ্গে সঙ্গে এল নমিতার দিক থেকে আঘাত। সে হঠাৎ ঠিক করে বসল তার জমিদারির অংশ বিক্রি করে দেবে। শুধু জমিদারির অংশ কেন, সব কিছু। দেবগ্রামের সব কিছু—বাড়ি ঘর বাগান পুকুর জমিজমা সব।

আরও কারণ ছিল। প্রথম, জমিদারির কমপেনসেসনের টাকাটা সে সরকারী খাতায় সই করে নিতে রাজী ছিল না। দ্বিতীয়, জমিদারি নেবার আগে একটা সেটেলমেণ্ট হবে। সেখানে তার বড়দা তার অভিভাবক হিসেবে তার সর্বনাশ করে সব আত্মসাৎ করতে পারে। তারই সম্ভাবনা বেশী। ইতিমধ্যেই পুরনো চেক কেটে খাসপতিত নিজের নামে পত্তন করে নিচ্ছে।

কে দেখবে তার স্বার্থ?

মা প্রতিদিন বদলাচ্ছেন। বদলাতে বদলাতে তিনি এক বিচিত্র মানুষ হয়ে উঠেছেন। না সন্ন্যাসিনী তপস্বিনী—না রাজনৈতিক নেত্রী। রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে এখন সর্বোদয়ে যোগ দিয়েছেন। যত গালাগাল দেন নেহেরুকে, ভারত সরকারকে তত গালাগাল দেন বামপন্থী দলগুলিকে। যত গালাগাল দেন প্রাচীন সমাজকে তার থেকে বেশী গালাগাল দেন আধুনিকতাকে, আধুনিক সমাজকে। ধর্মকে কুসংস্কার বলেন। কিন্তু মানেন। জমিজমা যা তাঁর নামে আছে তা সব ভূদানে দিয়েছেন। ইচ্ছে, অংশুও সব ভূদানে দান করে দেয়। তার থেকে অংশু বিক্রি করে দিলে সব।

* * *

খদ্দের জুটিয়ে দিয়েছিল হারু চাটুজ্জ্যে। রমলার দাদামশাই। অংশুমানদের জমিদারির আয়তন খুব বড় ছিল না। আয়তন এবং আয় দুইই ছিল ছোট। মূল্য ছিল অন্য দিক দিয়ে। জমিদারির সবটাই ছিল স্থানীয় অঞ্চল জুড়ে। ফল ছিল অনেকটা সেকালের কোন ক্ষুদ্র রাজা তার রাজ্যের কেন্দ্রে রাজধানীতে বাস করার ফলের মত। শুধু খাজনা এবং ফলমূল ফসলের নিত্য নজরানাই সংগ্রহ হত না, দু'বেলা মানুষদের কাছ থেকে প্রণাম-নমস্কারও মিলত। জমিদারি চলে গেলে সেইটেই ছিল সব থেকে বড় লোকসান। আর আয়ের উপর ক্ষতিপূরণ মিলবে পাঁচ থেকে বিশগুণ পর্যন্ত। কম আয়ের জন্য অংশুদের কমপেনসেসন হবে বিশগুণ। সেইটে বর্ধমানের এক শেঠ কিনতে চাইলে বারোগুনো পণে। হাজার টাকা আয় বারো হাজারে কিনে রাখলে সরকারী কমপেনসেসন পাবে কুড়ি হাজার টাকা যার অর্থ হল আট হাজার লাভ। যারা পারসেণ্টেজ কষে তারা বলবে চল্লিশ পারসেণ্ট।

সেটা ১৯৫৪ সাল। বি-এ পরীক্ষার পর ঠিক করেছিল ১৯৫৭ সালের ইলেকশনে

দাঁড়াবে। এবং বাকী জীবনটা সে পলিটিক্সই করবে। পার্টি একটা ঠিক করে নেবে সেটা কংগ্রেসও নয় কম্যুনিস্ট পার্টিও নয়। হিসেব করে দেখেছিল বারোগুনো পণে জমিদারি সম্পত্তি বেচে অন্ততঃ সে আটচল্লিশ হাজার টাকা পাবে। এ ছাড়া চাষের জমি বাগান পুকুর এসবগুলো থেকেও অন্ততঃ হাজার বিশ পঁচিশ পেতে পারবে।

জমিজমা বাগান পুকুরের খদ্দেরও জুটিয়ে দিয়েছিল হারু চাটুজ্জে। সেটা কিনতে চেয়েছিল রমলার বুড়ো স্বামী। বৃদ্ধ রমলার নামে সেগুলি কিনতে চেয়েছিল। কারণ তার প্রথম পক্ষের ছেলেরা গ্রামের সম্পত্তিতে রমলাকে নখ ডোবাতে দেবে না এটা ছিল সর্বজনবিদিত ভবিষ্যৎ। সেই কারণেই দাদামশায়ের গ্রামে এই সম্পত্তির উপর রমলার আকর্ষণ হয়েছিল বেশী। এবং রমলা নাকি আবদার ধরে বলেছিল—ওই সম্পত্তি আমাকে তুমি কিনে দাও। চৌধুরীদের ভারী দেমাক। আর ওদের বাগান পুকুরগুলোর উপর আমার ভারী লোভ। ছেলেবেলা ওদের বাগানে কাঁচামিঠে গাছের আম চুরি করে পাড়তে যেতাম; ওদের লোকেরা দেখতে পেলে তেড়ে আসত। ওদের বাড়ির বউরা মেয়েরা আমাদের হেনস্তা করত। ওদের সব পুকুরে বড় বড় মাছ থাকত—এখনও আছে মাছ, খুব মিষ্টি। তুমি এই সম্পত্তি আমাকে কিনে দাও।

খরিদ্দার দাদারাও দাঁড়িয়েছিল। দাবিও তারা করেছিল, পৈতৃক সম্পত্তি, সে-হেতু তাদেরই দেওয়া উচিত এবং কম মূল্যেই দেওয়া উচিত। শুধু তাই নয় আইনগত বাধা যতরকম হতে পারে তাও তারা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল কিন্তু কোন বাধাই সে-দিন তার সম্মুখের পথে দাঁড়াতে পারে নি। ছাত্র আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা সে তখন; তার জীবনের আকাশের অবস্থা তখন বারিবর্ষণহীন ঘষা কাচের মত, মেঘের চাপে ঢাকা বিবর্ণ গ্রীষ্মের দুপুরের মত, সূর্য নাই চন্দ্র নাই তারা নাই; আলো আছে—সংশয়ের ছায়াচ্ছন্ন আলো; সে আলোর জ্বালা আছে, গুমোট আছে কিন্তু তার মধ্য থেকে গাছেরা সবুজ রঙ পায় না, তার জ্যোতিতে বীজাণু মরে না। সে কোন কিছুতে বিশ্বাস করে না। তাই সে সেদিন অনায়াসে বলতে পেরেছিল দেবকীর্তি পিতৃকীর্তি কুলকীর্তি প্রভৃতি সংস্কারগুলি একান্তভাবে অর্থহীন ও আমার বিচারে নিতান্ত মিথ্যা বলেই আমি এগুলিতে বিশ্বাস করি না। এবং বিশ্বাস করি না বলেই আমার মা-সৎমা ও সৎ-ভাইদের এই দাবি মানতে আমি বাধ্য নই। এ সবের জন্যে যে সম্পত্তি দেবোত্তর হিসেবে নির্দিষ্ট আছে তার অংশ থেকে ওঁরাই আমাকে অধিকার দেন নি। সেই সম্পত্তির আয়ের বাইরে আজ যদি অর্থের প্রয়োজন হয়—যা ওঁরা দাবি করেছেন—তা আমি দিতে বাধ্য নই।

সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেই সে সব বিক্রি করে দিয়েছিল। জমিজমা বাগান পুকুরের দাম সে বেশীই পেয়েছিল। এতটা পাবে সে প্রত্যাশা করে নি। পঁচিশ হাজারের প্রত্যাশার স্থলে সে পঁয়ত্রিশ হাজার পেয়েছিল। দাদাদের সঙ্গে রেষারেষি করে রমলা শেষ ডাকে তিরিশ হাজার থেকে একেবারে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দর তুলে দিয়েছিল।

সে সময় দেবগ্রামে শেষ দশ দিন সে রমলার কাছে হারু চাটুজ্জের বাড়িতেই খেয়েছিল।

এই সম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারটা নিয়ে দাদাদের সঙ্গে মুখদেখাদেখি বন্ধ হয়েছিল; করেছিল তারাই; তবে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলতে এতটুকু পিছোয় নি বা দ্বিধা করে নি। শুধু মা তার আশ্চর্য। তিনি এগিয়েছিলেন কি পিছিয়েছিলেন তা সে বলতে পারবে না, তিনি সে সময় এসেছিলেন দেবগ্রামে। একই বাড়িতে অর্থাৎ তার বা তাদের বাড়িতেই ছিলেন—তবে তিনি খাওয়াদাওয়া করতেন ঠাকুরবাড়িতে।

মা শুধু একদিন তাকে বলেছিলেন—জমিগুলি তুমি ভূদানে দান কর এই আমার ইচ্ছে।

সে বলেছিল—তোমার জন্যে একটা অংশ থাকছে সেটা তুমি দিয়ে দিয়ো। আমি ভূদানে বিশ্বাস করি না।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন—সত্যিই দেবোত্তর থেকে দেবোত্তরের খরচ আজকাল কুলোয় না। পিতৃপুরুষের পুজো—তাতে তুমি কিছুই দেবে না?

সে বলেছিল—না। তোমরাই আমাকে—

মা বলেছিলেন—থাক কারণ দেখাতে হবে না।

তারপর বলেছিলেন—এ বাড়িও বিক্রি করবে?

সে বলেছিল—স্থির করি নি। তবে রেখে কি করব? কোন্ বাঁধনে বাঁধা থাকব গ্রামের সঙ্গে? বাড়ি রাখলেও ইটগুলো ক্রমে খসে পড়বে। জ্ঞাতিরা দরজা জানালা ছাড়িয়ে নেবে।

বাস্। এর পর আর কথাবার্তা হয় নি। মা মুখ বন্ধ করেছিলেন। পরের দিনই তিনি চলে গিছলেন। টেলিগ্রাম এসেছিল। গেছিলেন উড়িষ্যায়। নবকৃষ্ণবাবুদের ওখানে।

সে ছিল; তখন বিক্রীকবালা লেখা হচ্ছিল। বাড়ির সম্পর্কে শেষ মীমাংসা করে দিয়েছিল রমলা। তারই নেবার কথা ছিল বাড়িখানা। সেই শেষ পর্যন্ত বলেছিল—না বাড়ি তুমি বিক্রি করো না অংশুদা। ওটা তোমারই থাক। ও আমি নেব না। ওটা বাদ থাক। আমি বরং ভাড়া নেব। এখানে এসে ওই বাড়িতে থাকব। ভাড়া নগদ দেব না। বাড়িটা মেরামত করাব। পরিষ্কার রাখব।

এই লেনদেনের মধ্যে শেষের আসরে রমলাই ছিল প্রধান। অংশুমান অবাক হয়ে এই বৃদ্ধ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিটির গৃহিণীটির কথা শুনেছিল। মনে পড়েছিল পুরনো রমলাকে। সে কি এই? বাহান্ন সাল থেকে চুয়ান্ন সাল—তিন বছরে রমলার পরিবর্তন দেখে তার বিস্ময়ের আর শেষ ছিল না। এ যেন সে প্রগল্‌ভা গায়েপড়া সেই মেয়েই নয়। এ এক আশ্চর্য মর্যাদাময়ী মেয়ে। বয়স বড়জোর আঠারো পার হয়ে উনিশে পড়েছে; দেহে যৌবন ওর প্রচুর ছিল—এখন তাতে ভাদ্রের পূর্ণিমার জোয়ার লেগেছে। কিন্তু সব উচ্ছলতা তখন শান্ত হয়ে গেছে। একেবারে গিন্নীবান্নীর মতই সে তখন ওই পঞ্চান্ন-ষাট বছরের পাকাচুল ভুঁড়িওলা স্বামীটিকে দিব্যি যেন দোক্তার কৌটো বা চাবির গোছার মত আঁচলের খুঁটে বেঁধে পিঠে ফেলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অথবা ভদ্রলোকই পোষা বিড়ালের মত বা চাষীর বাড়ির পুরনো বলদের মত তার পায়ে পায়ে বা গায়ে গায়ে ঘুরে বেড়াতেন।

রমলা সেদিন সকালেই কথাটা যখন বলেছিল তখন ভদ্রলোক নবীনবাবু রমলার কাছেই

বসেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলেছিলেন হ্যাঁ, ওটা থাকবে। তার জন্যে টাকা কম করব না আমরা। দলিল পঁয়ত্রিশেরই হবে। তবে আমাদের বাংলা বাড়িখানা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে রাখেন, আমরা মেরামত করাব, যখন আসব থাকব।

রমলা বলেছিল—সেই কথাই ভাল অংশুদা। বাড়িটা বেচলে আর কোনদিন তোমাকে পাব না। তুমি আর এখানে আসবে না। দেখ, সম্পত্তি আজ যেটা তোমার কাল সেটা আমার হয়। কিন্তু বাড়ি নিতে নেই। তা ছাড়া তোমার মা রয়েছেন।

সে বলেনি কিছু, শুধু শুনেই গিয়েছিল।

দলিল রেজিস্ট্রি হয়েছিল বর্ধমানে ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রারের আপিসে। আগের দিন সন্ধ্যেবেলা মনটা তার অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিল। বিষয়কে ভূমিকে সম্পত্তিকে ঘৃণা করি, চাই না একথা মুখে বলা সহজ। বক্তৃতামঞ্চে হাততালি মেলে কিন্তু এই বিষয় বিক্রি করার যে এতখানি বেদনা এর আগে সে বুঝতে পারে নি। জমিদারির দলিল আগেই হয়ে গেছে কিন্তু তাতেও এতটা যেন যোগ ছিল না। চাষের জমি বাগান পুকুর। এর আশ্চর্য মমতা। সামনের বাগান পুকুরের দিকেই সে তাকিয়ে ছিল—দেখছিল নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

একসময় রমলা এসে দাঁড়িয়েছিল তার সামনে। সে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—রমলা ?

—হ্যাঁ। একটা কথা বলতে এলাম।

—বল!

—বলছি, বছরে একবার করে যেন এসো। কেমন ? এই উপরতলাটা পুরো তোমার জন্যে বন্ধ থাকবে। নিচেটা আমরা ব্যবহার করব। আমার কাছে থাকবে খাবে। কেমন ?

সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল।

মনে পড়েছিল সেই একরাত্রির কথা! সেই গভীর রাত্রে দরজার বাইরে থেকে চাপাগলায় আশ্চর্য বাসনাব্যাকুল ডাক, অংশুদা! অংশুদা!

রমলার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল আজও চোখের দৃষ্টিতে সেই ব্যাকুলতা মাখানো রয়েছে। মনে হওয়ামাত্র চকিতে চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠেছিল, ভিতরে যেন আষাঢ়ের মেঘ ডেকে উঠেছিল গুরুগুরু ডাকে। সে হাত বাড়িয়ে রমলার হাতখানা টেনে নিয়েছিল নিজের উত্তপ্ত হাতের মধ্যে।

রমলা কিন্তু হাতখানা টেনে নিয়েছিল—বলেছিল—ছাড়ো।

বুকের মধ্যে যে আবেগটা আকস্মিক জেগে উঠে ফুলে ফেঁপে উঠছিল সেটা সেদিন তাকে সেই আদিম কালের মানুষে পরিণত করেছিল একমুহূর্তে, যে মানুষ নির্জনে নারীকে একাকিনী দেখলেই মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রমলার টেনে নেওয়া হাতখানা আবার হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে গাঢ়স্বরে অসহনশীলতার সঙ্গে বলেছিল—র—ম—লা!

রমলা তার দিকে কিছুটা সকৌতুক বিস্ময়ে ফিরে তাকিয়ে বলেছিল—কি ?

সে আবার বলেছিল—রমলা। এবং ওই ডাকটির মধ্যেই তার সব কথা সে একটি বিগলিত আবেদনের মধ্যে ব্যক্ত করেছিল।

রমলা বলেছিল—পাগলামি করো না। আমার অনন্ত নরকে স্থান হবে না। আমি তা পারব না। তা হয় না।

বলেই সে পিছন ফিরেছিল চলে যাবার জন্যে। তার হাতখানা তখনও অংশুমানের হাতের মধ্যেই ছিল, সে হাতখানা আবার টেনে নিতে চেয়েছিল রমলা। অংশু দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিল মুহূর্তে। সে হাতের মুঠি শক্ত করে সজোরে রমলাকে আকর্ষণ করেছিল তার দিকে। রমলা টলে পড়ে গিয়ে এসে পড়েছিল অংশুমানের বুকের উপর। সে রমলাকে সবলে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করেছিল।

রমলা একটা চাপা চীৎকার করে উঠেছিল—অংশুদা!

একটা গোখরো সাপের গর্জনের মত তার সে চাপা গর্জন। সে গর্জনকে উপেক্ষা করতে পারে নি। কেউই পারত না। একটু চকিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আরও চকিত হয়েছিল অংশুমান। রমলার চোখ দুটো জ্বলছিল। এবং দু'পাটি ধারালো ঝকঝকে দাঁত মেলে সে তাকে মুখের উপরেই হিংস্র জন্তুর মত কামড়াতে উদ্যত হয়েছিল। অংশুমান বিব্রত হয়ে বাঁ হাতখানা দিয়ে আড়াল দিয়েছিল রমলার মুখকে। রমলা তার হাতেই কামড় বসিয়ে দিয়েছিল। ক'ড়ে আঙুলের নিচে বাঁ হাতের তেলোয় কয়েকটা দাঁতের দাগ আজও আছে। সেদিন দাঁত বসে গিয়েছিল। রক্ত পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানও ফিরেছিল—সে তার হাতের বাঁধন আলগা করে দিয়ে বলেছিল—আমাকে মাপ কর তুমি। অপরাধ করে ফেলেছি।

রমলা কোন কথা বলে নি। নিঃশব্দে উঠে তার বিপর্যস্ত বেশবাস একটু সামলে নিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। দরজার মুখে শুধু একবার দাঁড়িয়ে বলেছিল—পালিয়ে যাবার পাগলামি করো না যেন। ভালো হবে না। তা অংশুমান করে নি। করবার লোক সে নয়। অতসীর প্রসঙ্গের মত এ প্রসঙ্গকেও সে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল।

রাত্রে রমলা আবার চাকর সঙ্গে করে খাবারের থালা হাতে নিয়ে এসেছিল তাকে খাওয়াতে। মেয়ে জাতটাই বিচিত্র। রমলাকে দেখে বুঝবার উপায় ছিল না যে কয়েক ঘণ্টা আগে এত কাণ্ড ঘটে গেছে। এ সম্পর্কে শুধু দুটি কথা বলেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল—হাতটা কতটা কেটেছে?

উত্তর শুনতে চায় নি। চাকরটাকে বলেছিল—টিঞ্চার আইডিন এনেছিস তো? ওই টেবিলে রাখ।

যাবার সময় বলেছিল—সব পারি অংশুদা এইটে শুধু পারি না। হাজার হলেও হিঁদুর মেয়ে তো!

উত্তরে কথা অনেক ছিল। অনেক হিঁদুর মেয়ের নজীর অংশু দিতে পারত। কিন্তু একটা কথাও সে বলে নি, বলতে পারে নি। পরের দিন সকালে উঠে ট্যাক্সি করে বর্ধমানে এসে দলিল রেজিস্ট্রি করে দিয়ে কাঁচা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে সে কলকাতা এসেছিল। বাড়িটা দলিলের বাইরে থাকল কি বিক্রী করা সম্পত্তির সঙ্গে ভুক্তান হয়ে গেল তা আর যাচাই করে নি। এ নিয়ে কথাও হয় নি। তবে রমলা মধ্যে মধ্যে চিঠি লেখে—একবার এসো।

বাড়ির কিছু অদল বদল দরকার—সেগুলো এসে দেখে "হ্যাঁ" "না" অন্তত বলে যাও। কিন্তু সে যায় নি।

অনেকবার সে উত্তর লিখেছে—"রমলা, একালের ছেলে আমি অংশুমান—আমি সবই পারি শুধু—শুধু মাটি সম্পত্তির বাঁধনে বাঁধা থাকতে পারি না। আর ছোট জায়গায় থাকতে পারি না। তার চেয়ে কলকাতাতে বাড়ি করে তোমাকে নেমন্তন্ন করব, এসো দেখা হবে।" কিন্তু লিখেও ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

*　　　*　　　*

এই বাড়িখানা সেই টাকায়।

একালের একটি আধুনিক জীবনের জন্য একটি সুন্দর নীড় গড়ে তুলতে চেয়েছিল। গড়ে দিয়েছিল বলতে গেলে শিবকিংকর।

সাতান্ন সালে সে ইলেকশনে নামবে স্থির করেছিল। পার্টি নয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিসেবে। ওই দেবগ্রাম থেকেই। কোথা থেকে শিবকিংকর খবর পেয়েছিল কে জানে সে এসে হাজির হয়েছিল তার হোটেলে।

সেই তার পুরনো বোর্ডিং-হাউস। সেটার এ ক'বছরে কিছু উন্নতি হয়ে হোটেল নাম দিয়েছে তখন। সে বললে—বাড়িটা তুমি কেনো। শুধু বাড়িটাই কেনালে না, আজকের এই ভবিষ্যতের পত্তন সেদিন সে-ই করে দিয়েছিল। সে ভেবেছিল রাজনীতি করবে। এককালে শুনেছিল কলিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ আর হয় না, অশ্বমেধের রূপান্তর হয়েছে; শরৎকালে দুর্গাপূজাই হল অশ্বমেধ। সে আবিষ্কার করেছে কলিতে রাজসূয় যজ্ঞ আর হয় না কারণ রাজতন্ত্রই থাকবে না—একে একে রাজতন্ত্রের দেউটি নিভছে কিন্তু তা বলে রাজসূয় যাবে না, গণতন্ত্রের কালে রাজসূয় যজ্ঞের ফল মানুষ পেতে পারবে বা পাচ্ছে রাজনৈতিক ইলেকশনে। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়ে ইলেকশনে নামবার সংকল্প থাকলেও ইলেকশন জিতে কোন পার্টির সঙ্গে হাত মেলাবে তারও একটা খসড়া তার করা ছিল। কিন্তু শিবকিংকর এসে সব গোলমাল করে দিলে।

শিবকিংকর হঠাৎ এসে হাজির হল রঞ্জন বোসকে নিয়ে। রঞ্জন বোস ছবির প্রডিউসার হিসেবে নামছে। ছবি করবে। ছবিতে অতসী নামবে। অতসী বলেছে অংশুর কাছে গল্প কেনো। ওই 'কালরাত্রি' গল্প। সেইখানেই শিবকিংকর তাকে দেশের সম্পত্তি বিক্রি করার কথা জিজ্ঞেস করে বলেছিল—টাকাগুলো নিয়ে কি করবে? ওড়াবে?

সে উত্তর দেয় নি। বিরক্তি বোধ করেছিল।

শিবকিংকর তাতে দমে নি। সে উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলেছিল—একখানা বাড়ি কেনো না। কিনবে?

বাড়ি?

বাড়ির একটা মোহ আছে। শব্দটাই মুহূর্তে তাকে চকিত করে তুলেছিল একটু। মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল প্রায় 'আপনাআপনি' যাকে বলে ঠিক সেইভাবে—বাড়ি?

সে বাড়ি এই বাড়ি। বাড়িখানা অতসীর।

কনট্রাক্টর হিসেবে তৈরী করাচ্ছিল ওই রঞ্জন বোস। ব্যবসাদার মানুষ রঞ্জন বোস। ব্যবসাদারের ছেলে ব্যবসাদার। কয়লা, অভ্র, পাট, কনট্রাক্টরী অনেক রকম শাখা আছে বোস অ্যাণ্ড সন্সের। সেই সূত্রেই রঞ্জন বোসই অতসী গুপ্তাকে জমি বিক্রি করেছিল ইনস্টলমেণ্টে এবং সেই বাড়ি তৈরীর কনট্রাক্ট নিয়েছিল। দু কাঠার উপর তিনতলা বাড়ি— নিচতলায় তিনখানা ঘর, দোতলায় দুখানা, তিনতলায় একখানা এবং তার বহুবিধ বৈচিত্র্য। ১৯৫৪।৫৫ সালে তার এস্টিমেট ছিল ষাট হাজারের কাছে। রঞ্জন বোস অতসীর নামের উপর বিশ্বাস রেখেছিল অথবা ব্যক্তিগতভাবে তার উপর বিশ্বাস রেখেছিল সে কথা সেই জানে। তবে তাকে ছবিতে নামিয়ে একখানি সাকসেসফুল ছবি করবার প্রত্যাশা সে করেছিল। একখানা ছবি মার খেয়েছে। এখানা দ্বিতীয় ছবি। এবার অতসীর কাছে প্রাপ্য টাকার জন্যে সিকি-সমাপ্ত বাড়িখানা বিক্রি না করে উপায় নেই। ‘বাড়ি’ এই শব্দটাই তার মনে মোহের সঞ্চার করেছিল। নতুন যুগে কংগ্রেস পর্যন্ত ‘আবাদী’ অধিবেশনে সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ন অব সোসাইটির কথা বলছে; সম্পত্তি এবং মালিকানি মানুষের পক্ষে নিঃসন্দেহে নিন্দার কারণ হয়েছে; অংশুমান দেশের সম্পত্তি বেচে দিয়ে সম্পত্তিবানদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়েছে এ সবই সত্য; তবুও ‘বাড়ি’—‘আমার বাড়ি’ এর একটা মোহ আছে সেটা তাকে পেয়ে বসেছিল সেদিন। সে সেই সিকি সমাপ্ত বাড়িটাকে কুড়ি হাজারে কিনে রঞ্জনদের বোস অ্যাণ্ড সন্সকে দিয়েই আরও আট হাজার টাকায় একতলা শেষ করে নিয়েছিল।

বাড়িটা নিয়ে কত কল্পনাই যে সে করেছে। এবং এই বাড়িখানাই বিচিত্রভাবে বঙ্কিম পথে অভাবিত সূত্র দিয়ে আকর্ষণ করে আজ তাকে এইখানে এই ভয়ংকর অনিবার্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

সে ভেবেছিল, মোটামুটি ঠিকই করে ফেলেছিল সে ইলেকশনে দাঁড়াবে। কিন্তু এই বাড়ির জন্যেই যোগাযোগ হয়ে গেল রঞ্জনের সঙ্গে। সেই যোগাযোগের জন্যই রাজনীতির পথে বাড়ানো পাখানা ফিরিয়ে নিয়ে ফেললে সে নাটকের পথে।

রঞ্জন শুধু অতসীর মোহে ছবি করতে নামে নি। তার ছিল অভিনয়ের শখ। নাটকের নেশায় ছিল পাগল। নাটকের জন্যই তার প্রথম পরিচয় হয়েছিল অতসীর সঙ্গে। অভিজাত গৌরবান্বিত একটি প্রতিষ্ঠান ছিল তাদের। ষোড়শী সংঘ। ষোড়শী সংঘের সত্যই খ্যাতি ছিল এবং খ্যাতির দাবিও তাদের মিথ্যে ছিল না। রঞ্জন ছিল তার হিরো। শচীন সেনগুপ্ত ছিলেন তাদের সভাপতি। ষোড়শী সংঘই তার কালরাত্রির নাট্যরূপকে অভিনয় করলে মঞ্চে। সে অভিনয়ের সমস্তক্ষণ একটা অস্বস্তি বোধ করেছিল অংশুমান। রঞ্জন ছিল নায়ক এবং নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল অতসী। দুটি ভূমিকাই অন্ততঃ সার্থক হয় নি অংশুমানের মতে। তবু সে খ্যাতি পেল।

প্রবন্ধকার হিসেবে যে-খ্যাতি একদিন পেয়েছিল সে-খ্যাতি তার গান রচনা করে গীতিকার হিসেবে বৃদ্ধি পেয়েছিল; আরও বৃদ্ধি পেলে সে-খ্যাতি গল্পলেখক হিসেবে। সে গল্প নাটক হয়ে যে খ্যাতি এনে দিলে সে অভাবিত। রেডিয়ো নাটকটি অভিনয় করলে। এবং সে

অভিনয় শুনে বাংলাভাষায় পারদমা বাংলার বউ এক বিদেশিনী সুইডিশ মেয়ে নাটিকাখানি অনুবাদ করলে তার মাতৃভাষায়।

এর ফলে, অংশুমান রাজনীতির দিকে পিছন ফিরলে, এম-এ পরীক্ষাও আর দিলে না। সে নাটক নিয়ে পড়ল। শুধু লেখাই নয়, সে অভিনয় করবার জন্যও এগিয়ে এল।

ষোড়শী সংঘের সভায় সে প্রস্তাব করেছিল, ষোড়শী সংঘ যদি অনুমতি দেয় তবে সে নিজে একবার 'কালরাত্রি'র নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে চায়। না হলে সে নিজে একটা সংঘ তৈরী করে অভিনয় করবে।

উৎসাহের সঙ্গে সর্বাগ্রে তার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন সভাপতি সেনগুপ্ত। বলেছিলেন —আমি আশা করব চৌধুরী, তুমি পারবে অসাধারণ একটা অভিনয় করতে। গোটা দেশের জন্য আশা করব। স্টেজ আজ মেকানিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। নাটক নেই। নতুন করে গিরিশচন্দ্রের মত নট-নাট্যকার একাধারে চাই। তুমি কর। আমরা দেখতে চাই তোমাকে যাচাই করে।

নায়িকার অভিনয় অতসীই করেছিল।

সেদিনের পথ বদলের পালায় অতসীর হাতছানিই কি সব থেকে বড় আকর্ষণ ছিল? অতসীই কি ছিল সেদিনের সোনার হরিণ?

সত্যকে অস্বীকার করতে তো পারবে না অংশুমান। আকর্ষণ একটা ছিল। কারণ এই অভিনয়ের পরই তার সঙ্গে অতসীর সম্পর্ক আবার একবার নতুন করে গড়ে উঠেছিল।

শিবকিংকর—অদ্ভুত শিবকিংকর—তার কাছে ন্যায় অন্যায় নেই, ধর্ম অধর্ম নেই—বাঁচবার জন্যই হোক আর আনন্দের জন্যই হোক যা প্রয়োজন হয় করে যায়। সেই তাকে হাতে ধরে অতসীর কাছে অথবা অতসীর হাত ধরে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। প্রথম দিনের রিহারস্যালে সেই নিয়ে এল অতসীকে। অতসীর পার্ট তৈরী ছিল। সে নিজে নাট্যকার। তার পার্ট তৈরী থেকেও বেশী কিছু ছিল। গোটা বইটারই জন্ম ছিল তার অন্তরের সূতিকাগৃহে। তবে কিছু অদলবদলের জন্য প্রয়োজন ছিল রিহারস্যালের। অতসীকে অংশুমান ছবির পর্দায় এবং স্টেজে দেখেছিল কিন্তু আসল অতসী হিসেবে তার সঙ্গে সেই ৪৮ সালে স্মৃতিস্তম্ভ-উদ্বোধন সভার পর এই প্রথম দেখা। ১৯৪৮ সাল আর ১৯৫৪ সাল—পূর্ণ ন' বছর। এই ন' বছরের মধ্যে কতবার নিমন্ত্রণ করেছে শিবকিংকর—অতসীর নিমন্ত্রণ জানিয়েছে কিন্তু অংশুমান নেয় নি সে নিমন্ত্রণ।

ন' বছর পর অতসীকে দেখে তার ভারী ভাল লেগেছিল। বড় পরিচ্ছন্ন সাদাসাপটা পোশাকে সে এসেছিল সেদিন। সব থেকে বিস্ময় লেগেছিল এই দেখে যে, এই ন' বছরে অতসীর বয়স যেন সাড়ে চার বছরও বাড়ে নি। মনে হয়েছিল তার রূপকে পরিপূর্ণ ফোটা ফোটাতে যতটুকু বয়স বাড়ার প্রয়োজন ততটুকুর বেশী বোধ করি একটা দিনও বাড়ে নি।

অতসী তাকে দেখে একটু ভারী মিষ্টি হাসি হেসেছিল। তাদের সে সম্পর্কের কথা শিবকিংকর ছাড়া কেউ জানত না তবু আসরে উপস্থিত সকলেই পুলক চাঞ্চল্য অনুভব

করেছিল।

শচীনদার প্রকৃতিই ছিল গম্ভীর—রসিকতার মধ্যেও সে-গাম্ভীর্য প্রকাশ পেত—তিনি সেই ভঙ্গিতেই বলেছিলেন—অতসী, এই হাসির টুকরোটুকুকে কিন্তু আমরা অভিনয়ের মধ্যে দেখতে চাই। বুঝলে। অংশু, তুমি স্টীফ হলে কেন? এঁ্যা। ইয়ং ম্যান তুমি। এখন হাসিতে কোথায় উল্লসিত হয়ে উঠবে, না স্টীফ হয়ে যাচ্ছ। অভিনয়ে তো তোমাকে বেশী বিগলিত হতে হবে হে!

হাসির রোল পড়ে গিছল।

শচীনদার কথাগুলি আজও কানে বাজছে। তিনি বলেছিলেন—জান, সেদিন একজন বলছিল, ছোকরার চেহারা দেখে ওথেলোর কথা মনে পড়ে। ওথেলো দি মুর। আমি বললাম—রাম কহো। তোমরা বাবা একেবারে জর্ডনতটের বাসিন্দে। কেন—যমুনাতটের কালো দুর্দান্ত ছোকরাকে মনে কর না কেন? বৃন্দে থেকে রাধা পর্যন্ত তার প্রেমমুগ্ধ।

এরই মধ্যে সে কখন সহজ হয়ে উঠেছিল এবং হৃদয়ের মধ্যে জেগে উঠেছিল সেই আবেগ, যে আবেগে মেঘ-ঝরা-জল নদীর বুকে স্রোতের বেগে এবং কলকল্লোলের ধ্বনিতে জেগে ওঠে।

রিহারস্তাল শেষ হলে শিবকিংকর বলেছিল—এস অংশু—গাড়ি রয়েছে—তোমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে যাই।

আপত্তির যা কিছু তা রিহারস্তালের মধ্যে দিয়েই বোধ হয় কেটে গিয়েছিল। তবু একটু ইতস্ততঃ করেছিল।

অতসীই ডেকেছিল এবার—আসুন।

গাড়ির মধ্যে উঠে পিছনের সিটে পাশাপাশি বসে অতসী তার হাতখানা চেপে ধরে বলেছিল—এইবার!

তখনও কথা বলে নি অংশুমান।

অতসী বলেছিল—বাবাঃ, এত রাগ!

এরই মধ্যে গাড়ি তার হোটেলে না গিয়ে এসে উঠেছিল অতসী-শিবকিংকরের বাসায়।

সে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

দোতলা বাড়ি। অতসী থাকে দোতলায়, শিবকিংকর একতলায়। এবং একতলায় শিবকিংকরের এক পরিপূর্ণ সংসার, তার স্ত্রী তার পুত্র কন্যা; রান্নাবান্না পর্যন্ত আলাদা।

শিবকিংকরের দুই সংসার। অতসীই তার এ বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করে দিয়েছে। সেও শিবকিংকরের স্ত্রী। তার থেকে মুক্তি সে নেয় নি। তবু—। সে নিজেই হেসে বলেছিল—দেখ আমি তোমার জন্তে পাগল হয়েছিলাম বলেই তোমাকে বাঁধতে চাই নি। আমার বাঁধন পড়লে তুমি এই যে বাড়টা বেড়েছ এ তুমি বাড়তে না। তাই সেদিন ওকে ধরেছিলাম। ও আমাকে ঠিক আমার তোমাকে ভালবাসার মত ভালবেসেছিল তাই বলেছিল—। থাক বলব না সে কথা।···তোমাকে ভালবাসবার অধিকার দিয়েছিল। ওর সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলাম নির্ভয়ে—ও বাঁধবে না আমাকে। তাই চলেছিল বছর দুয়েক। তারপর

বুঝলাম ওর বুকের দুঃখ। বুঝলে—বেটাছেলে পুরুষ যে তার স্ত্রীর উপর একাধিপত্য না হলে চলে না। মন ভরে না। বুক ভরে না। যাদের ভরে তারা পুরুষই নয়। তাই নিজে দেখে শুনে বিয়ে দিয়ে দিলাম; পর কেউ নয়—আমারই বোন। অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে দিয়েছি। আমাদের বিয়ে হয়েছিল কালীঘাটে। তোমার শিবকিংকর দাদার মাথায় থাকি আমি—পাশে থাকে 'সতী'। আমি শিবের মাথার গঙ্গার মত বিশ্বভুবন চরে বেড়াই। মন মাতলে দুষ্মন্ত রাজার দরজায় হানা দি। বুঝেছ।

সেদিন রাত্রে অতসীর বাড়িতে খেয়ে সে বাড়ি ফিরেছিল।

বিদায় দেবার সময় অতসী বলেছিল—আমার প্ল্যান মত বাড়িখানা কিন্তু কমপ্লিট কর। আমি খুব শখ করে করিয়েছিলাম। নিচতলায় মাঝখানে হল, সিঁড়ির তিন দিকে তিনখানা ঘর। দোতলায় দুখানা ঘর 'হল', খানিকটা খোলা ছাদ, তিনতলায় হল আর একখানা ঘর—বাকীটা সব খোলা ছাদ। সেই ছাদে টবের বাগান।

অংশুমান বেশী কথা বলে নি।

মনের আকাশটা আসন্ন ঝড়ের আকাশ হয়ে উঠেছিল। একটা গুমোট যেন মাটি ফেটে উপরের দিকে উঠছিল।

সেদিন রাত্রে ফিরে এসে চুপচাপ বসেছিল রাত্রি দুটো পর্যন্ত। মনের মধ্যে ঝড় বইছিল তখন।

দেহ আর মনে সে সংগ্রাম প্রচণ্ড।

মাটি ফেটে আগুন উঠে আকাশকে কালো করে দেওয়ার কথা সে পড়েছিল। সেদিন সে তা অনুভব করেছিল।

আকাশ সে নিতান্তই অলীক, একটি নয়নাভিরাম ছলনা—প্রসন্ন কোমল নীল নির্মল পবিত্র। আসলে সে মিথ্যা।

মানুষের নির্বোধ সংস্কারাচ্ছন্ন মন তবু বলে আমি বড়, আমি সত্য।

প্রায় রাত্রি একটার সময় হঠাৎ খাতা কলম নিয়ে বসেছিল। নাটক লিখবে। প্রথমেই লিখেছিল নাটকের নাম—"যোজনগন্ধা"।

প্রথম দৃশ্য ঢুকেছিল—গঙ্গার ঘাট। নৌকা নিয়ে ঘাটে অপেক্ষা করছে ধীবররাজকন্যা সত্যবতী।

অপরূপ রূপসী মেয়ে।

এসে প্রবেশ করলেন ব্রহ্মর্ষি পরাশর। এবং স্থির একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওই পরিপূর্ণযৌবনা রূপসী ধীবরকন্যার দিকে। সে দৃষ্টি শুধু একাগ্রই নয় তারও থেকে কিছু বেশী।

তার পায়ে তাঁর সকল তপস্যাফল নামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন পরাশর—তোমার রূপের মধ্যে কি অরূপ ব্রহ্ম রূপান্বিত হয়েছেন? তোমার সর্বাঙ্গে পেলবতার মধ্যে উত্তাপের মধ্যে মনে হচ্ছে ব্রহ্মই যেন তাঁর স্পর্শকে সঞ্চারিত করেছেন তোমার দেহগন্ধের মধ্যে—

মৎস্যগন্ধা বলে উঠেছিল—ছি ছি ঋষি এ কথা বলো না—আমার সর্বাঙ্গে তীব্র কুৎসিত মৎস্যগন্ধ জন্ম থেকে উৎসারিত—আমার দেহগন্ধের জন্য এক মক্ষিকা ছাড়া অন্য কোন কীটপতঙ্গও কাছে আসে না।

পরাশর বলেছিলেন—কে বললে? তোমার দেহ থেকে পারিজাতগন্ধ নির্গত হচ্ছে—আমি তার নিশ্বাস নিচ্ছি—

মুহূর্তে তাই ঘটেছিল এবং কন্যা অভিভূত হয়ে বলেছিল—এ কি করলে তুমি ঋষি? তুমি আমার এ কি করলে? আমার আশ্চর্য এক ঘুমন্ত মন জাগ্রত হয়ে ফুলের মত ফুটে উঠছে। বুকের মধ্যে কামনা যেন আকাশের বুকে মেঘের মত আলোড়িত হচ্ছে। আমি দেখছি—।

মৎস্যগন্ধা দেখেছিল এক শিশুকে। কৃষ্ণবর্ণ এক সন্তান। কিন্তু আশ্চর্য তার দীপ্তি। সে তাকে ডেকেছিল মা বলে।

ঋষি পরাশর তার মধ্যে দেখেছিলেন নিষ্প্রাণ বস্তুপুঞ্জের মধ্যে প্রাণকে—জড়ের মধ্যে জীবনকে—অপরূপের মধ্যে অরূপকে। দেহের মধ্যে জীবনের দাবিকে মেনে গিয়েছিলেন অবনত মস্তকে। স্বীকার করে নিয়েছিলেন সম্ভোগকে। বলেছিলেন—আমরা যা জানলাম না—আমরা যাকে প্রকাশ করতে পারলাম না তাকে জানবে এবং প্রকাশ করবে আমাদের উত্তরপুরুষ।

সে নাটক আজও শেষ হয় নি।

সেই ততটুকু লেখা হয়েই পড়ে আছে। মধ্যে মধ্যে মনে হয় লিখবে কিন্তু লেখা হয় না। পরের দিনই সে সেই একটা দৃশ্য নিয়ে অতসীকে শোনাতে গিছল।

শুনতে শুনতে অতসীর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল। সে হাসি দেখে সে যেন একটা আশ্চর্য অস্বস্তি অনুভব করেছিল। মনে হয়েছিল ওই হাসি হেসে তাকে ব্যঙ্গ করছে অতসী। সে থেমে গিয়েছিল। এবং প্রশ্ন করেছিল—হাসছ কেন বল তো?

—হাসছি নাকি? প্রশ্ন করেছিল অতসী।

—হাসছ না? হাসছ। এর মধ্যে হাসির কি পেলে?

এবার অনেকখানি হেসে ফেলেছিল অতসী। হাসি থামিয়ে একসময় গম্ভীর হয়ে বলেছিল—তরুণ কবি—কলম ধরলে আর আকাশে মন ছোটালে আর তোমাদের মাটির কথা মনে থাকে না।

—কেন?

—ওই যে সত্যবতী ছেলের কথা মা-হবার স্বপ্ন দেখছে—।

—এ মিথ্যে কি হল?

—সব মিথ্যে। ওখানে নারীর কাছে থাকে পুরুষ, পুরুষের কাছে থাকে নারী। ভগবানও বিলুপ্ত—আর তরুণ পরাশর! তার তো কথাই নাই। আমার কথা, সন্তান আমি চাইই না। শুধু আমি কেন, এ যুগের কোন মেয়ে চায় না।

তবুও সে প্রতিবাদ করেছিল—বলেছিল—চাও। তুমি নিজেকে জান না!

আবার একবার খুব হেসে নিয়ে অতসী বলেছিল—আমার সন্তান কখনও হবে না

অংশুমান। আমার কাছে একালের সত্যবতীদের কথা জেনে যাও।

সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

অতসী বলেছিল; তার আগে কিছুক্ষণ সেও স্তব্ধ হয়ে বসেছিল তার মুখের দিকে তাকিয়ে। একসময় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—যুদ্ধের সময় বাবার চাকরি গেল। মায়ের তখন তিনটে মেয়ে তিনটে ছেলে—ছটা, তার উপর পেটে একটা। পেটেরটা পেটেই মরল। মরা ছেলে হল। কোলেরটা না খেয়ে মরল। বাপ ভিক্ষে করতে লাগল। লোকে ভিক্ষে দেয় না। বাজারে আগুন লাগল। শেষে বাবা আমার হাত ধরে সন্ধ্যেবেলা নিয়ে যেত একটা বাড়িতে। তখন থেকেই সন্তান চাওয়া ছেড়েছি অংশুমান। তা ছাড়া—তা ছাড়া কোন দিন তুমি সকালে এস—তোমাকে দেখাব একটা ভিখিরী মেয়ে আসে ভিক্ষে করতে। আমি রুটি দিই। পাঁচটা ছেলে তার। ছেলেগুলোকে দেখলে ভয় করে। আরও দুটো না তিনটে তার হয়ে মরেছে। এ যুগে কেউ সন্তান চায় না সখা। আমার কথা ছেড়েই দাও—আমি মাতৃত্বকে ধারালো ছুরিতে কেটে ফেলে দিয়েছি।

বিচিত্র হাসি হেসে বলেছিল—আক্ষরিক সত্য অর্থে ঋষি পরাশর। এ তোমার কল্পনা নয়।

আরও একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অতসী বলেছিল—ও নাটক লিখো না। তার থেকে অন্য কিছু লেখ। কিংবা ওই কথাগুলো বাদ দাও। অন্তঃ আমাকে সত্যবতী করতে দিলে ওগুলো বাদ দিতে বলব।

* * *

শচীনবাবু বলেছিলেন—দ্যাট্‌স দি রিয়ালিটি অংশুমান। পৌরাণিক নাটক লিখবে বলে এ যুগের রিয়ালিটিকে অস্বীকার করলে চলবে না। পুরাণের খাতিরে অলৌকিক দু'চারটে চালাও চালাও—মোটামুটি মানুষ নেবে; কিন্তু বধূ বাসরে যায় কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে—তার মধ্যে জোয়ারীর ঝংকারের মত সন্তানকামনা ধ্বনিত হয় এ সত্য আজ আর চলবে না।

শচীনবাবুর সঙ্গে সে আলোচনা করেছিল এ নিয়ে। মানুষটির প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল তার। এবং অসাধারণ শ্রদ্ধারই মানুষ ছিলেন তিনি। বলেছিলেন—ধরেছ তুমি ঠিক। এইজন্তেই তোমাকে বলি তোমার ক্ষেত্রে নাটকের ক্ষেত্র। এখানে এসে চেপে বস। ভাব। আজ সারা দেশটা কেন এমন হয়ে গেল, ভেবে দেখ। পিছনের কালের মানুষ আমরা—আমরা অনেক আদর্শে বিশ্বাস করেছি—সে আদর্শগুলো চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, এ কালকে তার জন্তে অভিশাপ দিচ্ছি, অভিশাপ ফলছে না। কেন ফলছে না? আমরা যত জোর গলা করে বলছি সে কথা একালে কেউ শুনছে না। কেন? চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সব মুছে গেল—সব মুছে গেল হে! অবাক হয়ে দেখছি। কিন্তু এ নিয়ে লিখবার ক্ষমতা নেই। এ লিখতে পার তোমরা। মানে আজও যে এ-যুগের নায়ক সেই লিখতে পারে। তুমি লেখ। তোমাকে ধন্তবাদ জানাচ্ছি। তোমার মনে এসেছে তুমি ধরেছ!

শচীনবাবুকে সে বলে নি যে কথাটা তার নয়, কথাটা অতসীর। শচীনবাবুর প্রশংসা এবং

সাধুবাদ সত্ত্বেও কিন্তু সে অতসীর এ-সত্যকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারে নি। শুধু তাই বা কেন? কথাগুলি ভাবত আর সে শিউরে উঠত।

অতসী মিথ্যা বলে নি। কিন্তু তবু সে তার কথা স্বীকার করে নিতে পারলে না। ষোড়শী সংঘের অভিনয় প্রস্তাব বন্ধ হয়ে গেল। সে বললে—না। অভিনয় সে করবে না।

অতসী তাকে প্রশ্ন করলে—কেন? কি হল?

সে শুধু বলেছিল—না।

—সেই তো জিজ্ঞাসা করছি—কেন না?

—ভাল লাগছে না।

—একটা কথা বলব?

—বল।

—আমাকে ভাল লাগছে না বলে বলছ।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলেছিল—মিথ্যে ঠিক বল নি। তুমি সেদিন যা বলেছ সত্যবতী নাটকের প্রথম দৃশ্য শুনে—তারপর তুমি যদি কালরাত্রির নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় কর তবে নাটকটাই মিথ্যে হয়ে যাবে—নাটকই থেকে যাবে, সত্য হবে না।

—মানে?

—ভেবে দেখ, বুঝে দেখ।

অনেকক্ষণ পর বুঝতে পেরে অতসী হেসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। বলেছিল—আর একটা কথা বলব?

—বল।

—রাগ করো না যেন।

—না।

—অবিশ্যি তুমি খাও বলেই বলছি। ও আমাকে বলেছে তুমি খাও। অন্ততঃ না-খাওয়াটাই ধর্ম এবং পুণ্য এই সংস্কারটা ভাঙবার জন্যই খাও। তা আজ আনন্দের জন্যে খাও। এস দুজনে খাই। খেলে হয়তো মনের ওই ভাবটা কেটে যাবে।

দুটো গ্লাসে খাঁটি বিলিতী মদ ঢেলেছিল অতসী। অতসীর আলমারিতে সে দেখেছিল এই বোতল কিন্তু সে মদ খায় এ কথা ভাবে নি। সেদিন গ্লাস হাতে নিয়ে বলেছিল—তুমি খাও? না?

ভারী মিষ্টি হেসে অতসী বলেছিল—খাব বলে আনিয়েছিলাম। কিন্তু খাওয়া হয় নি। ওর সঙ্গে খেতে ভাল লাগে নি। এস আজ তোমার সঙ্গে খাই। দেখ, নতুন বোতল।

বোতলটা নতুনই ছিল।

সেদিন সে উপেক্ষা করে নি। দুজনে একসঙ্গে বেশ খানিকটা পান করেছিল। কিন্তু শান্ত হয় নি, আরও অশান্ত হয়ে উঠেছিল। তাকে সেদিন ঘুম পাড়াতে অতসীকে বেগ পেতে হয়েছিল। সারা রাত্রি প্রায় তার শিয়রে বসেছিল। শেষরাত্রে অংশুমান ঘুমিয়ে পড়লে তার মুখের পাশে মুখ রেখে বসে বসেই ঢুলে পড়েছিল।

* * *

পরদিন সকালে উঠে সে উদ্‌ভ্রান্তভাবেই বেরিয়ে এসেছিল অতসী এবং শিবকিংকরের বাড়ি থেকে। অতসী তখনও ওঠে নি। শেষরাত্রে ঘুমিয়ে সে তখনও গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। শিব-কিংকরকে নীচের তলায় ডেকে বলেছিল—আমি চললাম। ওকে বলো। না—থাক। আমি চললাম।

শিবকিংকর বলেছিল—দাঁড়াও গাড়ি ডেকে দি।

—না। পথে নিয়ে নেব ট্যাক্সি।

অধীর অশান্ত উত্তপ্ত জীবন নিয়ে যেন তার স্থির হয়ে দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না।

বিচিত্র। হয় ভাগ্য, নয় ভগবান, নয়—। নয় কি ? তা সে জানে না। বলতে হয় আকস্মিক ঘটনা। না। তাই বা কেন; পৃথিবীতে, দেশে যে ঘটনাস্রোত ইতিহাসের পথ কেটে চলেছে তারই একটা স্রোতের আকর্ষণ। তেমনি একটা আকর্ষণে পড়ে সে সেই দিন সন্ধ্যাতেই অ্যারেস্টেড হয়ে গেল।

বিকেলবেলা গিয়েছিল ইউনিভারসিটি।

সেখানে দুই ছাত্রদলে বচসা থেকে হাতাহাতি হচ্ছিল তখন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে হাতা-হাতি থেকে ক্র্যাকার এবং ইটপাটকেল ছোঁড়াছুড়ি শুরু হল। এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে হাঙ্গামা ছড়াল কলেজ স্ট্রীট পর্যন্ত। এর পর এল পুলিস। এবং পুলিস লাঠি নিয়ে তাড়া করতেই সমস্ত হাঙ্গামা এবং দাঙ্গাটার মোড় বদল হয়ে গিয়ে দাঁড়াল পুলিস এবং ছাত্রের হাঙ্গামা। এরপর আর নিরপেক্ষ থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। সেও নেমে পড়েছিল ছাত্রদের পক্ষে। তারপর সে নিজে আহত হয়েছিল পুলিসের লাঠিতে এবং সে ঘুঁষি মেরেছিল একজন অফিসারের নাকে। মেরেছিল সেই আগে। তা না হলে লাঠি খাবার পর তার পক্ষে আর ঘুঁষি মারা সম্ভবপর হত না। সেইটেই দাঁড়াল তার বিপক্ষে বড় অভিযোগ। আদালতে সে তা অস্বীকারও করলে না। বললে—হ্যাঁ আমি মেরেছি ঘুঁষি। উনি কি করেছিলেন তা ঠিক দেখি নি। তবে পুলিসের সঙ্গে student-দের লাগল, উনি সামনে পড়লেন আমি মারলাম। তবে ছাত্রদের বড় কটু কথা বলেছিলেন আমি তা শুনেছি।

ছ মাস জেল হয়ে গেল।

অংশু জেলে চলে গেল। শিবকিংকর ওর দিকের তদ্বির করছিল। বামপন্থী দলের উকীলেরা ওকে সমর্থনও করেছিল; অংশুমান না চাইলেও করেছিল। তারা সকলেই বললে, আপীল কর। কিন্তু তা সে করলে না। রঞ্জন, শিবকিংকর, অতসী এরাই গোড়া থেকে তার কেসের তদ্বির করছিল। তারাও তাকে আপীলে রাজী করাতে পারলে না। সই করলে না ওকালতনামায়।

লোকে তাকে খেয়ালী বলে চিরকাল! তার পরিচয় নাকি আছে তার কাজে এবং কর্মে। কিন্তু নিজের কাছে সে তা নয়। সে কোন কাজ কেন করে তা হয়তো ঠিক সে বলতে পারবে না, তবে এইটে সে বলতে পারে যে কাজটা না করলে সে নিজের কাছেই চোর হয়ে দাঁড়াত। ছাত্রদের দাঙ্গার মধ্যে তার এইভাবে নেমে পড়াটা তার খেয়াল নয়; তখনও

ইউনিভারসিটিতে নাম ছিল, সম্পর্ক ক্ষীণ হলেও বিলুপ্ত হয় নি। এবং সেদিন রাস্তা পর্যন্ত হাঙ্গামা ছড়াবার পর পুলিস যখন এল তখন ছুটে পালানো ছেলেদের মধ্য থেকে কিছু ছেলের ঘুরে দাঁড়ানো উচিত ছিল। সেই জন্যে সে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল—মেরেছিল। এবং এইভাবে জেলেও যাচ্ছে সে এই জন্যে। হোক অচল গান্ধীবাদ। তার মধ্যে কিছু বস্তু আছে যাকে ফেলে দেওয়া চলে না। যারা কৌশলকে মাথায় রেখে আন্দোলন করে এবং আইনের ফাঁক দিয়ে দণ্ড এড়ায় তাদের 'ইনকিলাবি' বোরকাপরা ইনকিলাবি।

লোকে কিন্তু বলেছিল অংশু লীডারশিপের প্রিপারেশনের জন্যে জেলে গেল।

শচীনদা তাকে বলেছিলেন—করলে কি অংশু! জেলে গেলে গেলে, এমনি একটা বাজে ইস্যু নিয়ে গেলে! দূর দূর। দুনিয়াজোড়া ইণ্টারন্যাশনাল ইস্যু গণ্ডায় গণ্ডায় বর্ষার মেঘের মত একটার পর একটা এসে জল ঢেলে যাচ্ছে, বন্যা হচ্ছে—দেশে এস-আর-সি, বেঙ্গল-বেহার মার্জার, ফুড নিয়ে তো তেলচিটচিটে ছেঁড়া কাঁথার আগুন জ্বলছেই—এ সব ছেড়ে এই একটা বাজে ইস্যুতে জেল খাটতে চললে? তা ভাল। দিনকতক ঘুরে এস। এক্সপিরিয়েন্স থাকা ভাল।

সে উত্তর দেয় নি। জেলে চলে গিয়েছিল। উত্তর তার ছিল না। কেন সে আপীলের ওকালতনামায় সই করলে না তা স্পষ্ট ছিল না তার কাছে। তবে তার ইচ্ছে হয় নি। পৃথিবী যেন তার সহ্য হচ্ছিল না। একমাত্র বাড়িটা নিয়েই তার চিন্তা ছিল। শেষ পর্যন্ত তার ভার দিয়ে গিয়েছিল এক উকীলকে। তখন হরি চাকর তার কাছে এসেছে। হরির মাইনে এবং খাইখরচ এবং অন্য খরচ বাবদ ছ মাসের জন্যে দুশো টাকা উকীলের হাতে দিয়ে চলে গিয়েছিল। রঞ্জন বলেছিল—আরও যদি কোন কারণে দরকার হয় সে আমি দেব। আপনি ভাববেন না।

প্রথম কিছুদিন খারাপ লেগেছিল। তারপর খারাপ লাগাটা যেন মুছে গিছল বা উপে গিছল।

* * *

ছ মাসের মধ্যে দেশ থেকে এসে জেলে ইণ্টারভ্যু চেয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছিল রমলা আর নবীনবাবু।

রমলা বলেছিল—আমি একটা খবর পেলাম না? যখন জেল হয়ে গেল, কাগজে বের হল তখন জানলাম। একটা সই করে দাও ওকালতনামায়—আপীল করব। ও খুব মামলা বোঝে। ঠিক জিতবে আপীলে।

আর এসেছিল অতসী এবং শিবকিংকর।

জিজ্ঞাসা করেছিল অতসী—হঠাৎ এ মতি হল কেন?

সে বলেছিল—জানি না।

—আপীল করবে না কেন?

—নাঃ দিনকতক বেশ থাকব।

বেশই সে ছিল। জেলে সে পড়াশুনো করেছিল আর ভেবেছিল। আর লিখেছিল।

লিখেছিল নাটক উপন্যাস ছোট গল্প গান।

লিখে মন তার ভরে নি। তবে বুকের মনের উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস এবং ব্যাকুলতাকে সে ব্যক্ত করতে পেরেছিল। অন্ধকার পৃথিবীর ব্যর্থতার বেদনা ও আলোর জন্ম ব্যাকুলতাকে সে ব্যক্ত করতে চেয়েছিল। তা হয়তো সে পেরেছিল।

পচাধরা সমাজ; গলিত তার আদর্শ; ঈশ্বর নিছক কল্পনা, সব থেকে বড় মিথ্যা; মানুষ স্বার্থান্ধ; ঈর্ষায় হিংসায় জর্জর মানুষ লোভী; মানুষ ক্রোধে উন্মাদ। সত্য একটা অর্থহীন শব্দ। সততা একটা মধ্যযুগের বোকামি; সতীত্বও তাই, তার থেকেও বেশী, কারণ সেটা শক্তর সংস্কারে পরিণত হয়েছে। সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে সে নাটক উপন্যাস লিখেছিল।

নাটকের নাম দিয়েছিল 'ব্যর্থ নমস্কারে'।

কাল্পনিক নাটক। প্রাচীনকালের পটভূমি। এক সাধকের জীবন। দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় ভগবানের মন্দির। সেখানে কেউ পৌছুতে পারে না। পুরোহিত পাহাড়ের মাঝখানে উঠে পূজা করে ফিরে যান। যাত্রীরাও তাই। কিন্তু প্রবাদ আছে মন্দিরে পৌছুতে পারলে দরজা খুলে যাবে এবং ভগবানের দর্শন মিলবে। সাক্ষাৎ ভগবান নিজে মন্দিরদ্বার খুলে তাকে সম্ভাষণ জানাবেন। এক সাধক প্রতিজ্ঞা করে পূজার থালা হাতে যাত্রা করেছিল। পিছনে পড়ে রইল মানুষের বসতি, তার ঘর; ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে রইল মা। প্রণয়িনী অনুনয় জানাল। বন্ধুরা অনুরোধ করলো। প্রবীণেরা ভয় দেখালে। কিন্তু সে মানলে না, চলল। মধ্যে মধ্যে বাতাসে ভেসে আসতে লাগল মায়ের অন্তিম আক্ষেপ। প্রণয়িনীর বিবাহবাসরের মন্ত্রপাঠ শব্দের সঙ্গে তার দীর্ঘনিশ্বাস। বন্ধুজনের বেদনাকাতর আক্ষেপ। তার কোনটিই তাকে বিচলিত করতে পারলে না। সে উঠেই চলেছিল। হঠাৎ একটা স্থানে এসে উপস্থিত হল যেখান থেকে শুরু হল যেন অন্য জগৎ। সব পেয়েছির দেশ। পরমানন্দের ভূমি। সম্মুখে মন্দির। দিব্য সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে বাতাসে। দিব্য গন্ধ উঠছে চারিদিকে। আকাশ জ্যোতির্ময়তায় উদ্ভাসিত। পৃথিবীর কোন শব্দ নেই, সংবাদ নেই।

স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে অনুভব করলে বুঝতে পারলে সব ভ্রান্তি, সব ভ্রান্তি, সব মিথ্যা! গন্ধ নেই, জ্যোতি নেই, কোন সংগীত নেই। শুধু এতখানি উঁচু পাহাড়ের মাথায় বাতাস এত ক্ষীণ, স্বল্প, এত হালকা যে তার নিঃশ্বাস নেবার মত বাতাসেরও সংস্থান নেই।

সে থরথর করে কাঁপতে লাগল। সে পড়ল। পড়বার সময় সে বললে, প্রলাপ বকে বললে—আমার সকল প্রণাম তুমি ফিরিয়ে দাও! ফিরিয়ে দাও!

উপন্যাসেও ছিল তার এই সুর। তবে পটভূমি ছিল বাস্তব। তার মায়ের জীবন। সে কল্পনা করেছিল যে সারাজীবন মা এই আদর্শের পিছনে পিছনে ছুটে একদা ক্লান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ফেলছেন এবং বলছেন—সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। সব মিথ্যে।

*   *   *

বাইরে যখন এল তখন জীবনক্ষেত্র যেন তার প্রতীক্ষা করে ছিল। তাকে অভ্যর্থনা দিয়ে সমাদর করে গ্রহণ করলে।

ছ মাসে পরিবর্তন হয়েছে অনেক। পৃথিবী দ্রুত পালটাচ্ছে। তিব্বত হাঙ্গেরী সুয়েজ ভিয়েৎনাম কোরিয়া ইন্দোনেশিয়া। পাকিস্তান ভারত সমস্যা জটিলতর হয়েছে। দাঙ্গা হয়ে গেছে। ফুড মুভমেণ্টে গুলি চলেছে; ট্রাম বাস পুড়েছে।

অতসী জীবন-রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্হিতা হয়েছে। বম্বের এক ক্রিকেট খেলোয়াড়কে বিবাহ করে চলে গেছে বম্বে। সে আর ছবি করবে না।

শিবকিংকরের দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া স্ত্রী অতসীর বোন, সে মরে গেছে। সে এবার একটি বিধবাকে গন্ধর্বমতে বা এমনই একটা কোন মতে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে এনেছে। সে এখন রঞ্জনের সঙ্গে পাট এবং কয়লার ব্যবসা করছে। তাছাড়া ছবির ব্যবসা। ছবির কারবারে প্রচণ্ড একটা আঘাত দিয়েই অতসী চলে গেছে।

রঞ্জন বলেছিল—দেখুন অংশুবাবু, আমার ফিল্ম কোম্পানি মার খেয়েছে—তবে আমি তিনপুরুষে ব্যবসাদারের ছেলে—আমি সে মার সামলেছি, সামলাব। আমি যখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে অতসীর মন নজর আপনার দিকে তখন থেকেই আমি গুটিয়ে ছিলাম। কিছু টাকা ওকে দিয়েছি; আর আপনার কালরাত্রির রাইট কিনেছি। সে আমার আছে। তারপর আর আমি পা বাড়াই নি। অতসী গেছে গেছে, এবার ছবি করব। প্রডিউসার না, ডিস্ট্রিবিউটার হিসেবে। শিবকিংকরবাবুকে নিয়েছি সঙ্গে। আপনাকে আমরা চাই। আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন। আপনার সব বই আমরা ছবি করব। সব নাটক ষোড়শী সংঘে প্লে করব।

'ব্যর্থ নমস্কারে' নাটিকা নিয়েই সে প্রথম ষোড়শী সংঘের আসরে নেমেছিল। এর আগে পর্যন্ত কালরাত্রিতে নামবার কথাই হয়েছিল, নামা হয় নি। জেলে যাবার ঘটনাটায় জড়িয়ে পড়েছিল

ষোড়শী সংঘ অভিজাত প্রতিষ্ঠান।

আটটি দম্পতি অর্থাৎ ষোলজন সভ্য-সভ্যা নিয়ে রসরসিকের একটি সংস্থা। এঁরাই প্রধান এবং প্রথম সভ্য। তার বাইরে আছেন আরও ষোলজন যাঁরা দম্পতি হিসেবে আসেন নি। দম্পতিদের অনুমোদনক্রমে এসেছেন।

'ব্যর্থ নমস্কারে' নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল সে নিজে। নাটিকার শেষ দৃশ্যে পূজার থালা ফেলে দিয়ে সে আছড়ে পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসতে আসতে মর্মান্তিক আর্তনাদ করে বলত—"ফিরিয়ে দাও—আমার প্রণাম ফিরিয়ে দাও। আমার জীবনের সকল প্রণাম ফিরিয়ে দাও।" তার প্রতিধ্বনি সারা প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি কোণে যেন মাথা কুটত।

"ফিরিয়ে দাও। আমার সকল প্রণাম তুমি ফিরিয়ে দাও।"

ক্রমান্বয়ে কুড়ি রাত্রি অভিনয় হল 'ব্যর্থ নমস্কারে'। কলকাতার রসিকমহলে, খবরের

কাগজের নাট্য সমালোচনার পাতায় 'ব্যর্থ নমস্কারে' নাটক এবং নাট্যকার অংশুমান চৌধুরীকে নিয়ে আলোড়নের সৃষ্টি হল।

অনেক স্বপ্ন দেখেছিল সেদিন অংশুমান। একটা আবছা কল্পনা ক্রমশঃ যেন স্পষ্ট হচ্ছিল —একটা চেহারা নিচ্ছিল।

একটা ঝড় আসছে। ঝড়ো আধকালো বিষণ্ণ ভয়াতুর ম্লানমুখ বিশ্বপ্রকৃতি। ক্রমশঃ ঘনায়মান হচ্ছে। সূর্যের উপরের জ্যোতিদীপ্ত মেঘটুকুকেও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বাতাসে উড়ছে শুকনো পাতা, জঞ্জাল, ধুলো। ঝরঝর শব্দে উড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে কোন্ নিরুদ্দেশে। এর পর হবে বর্ষণ। হয়তো এর মধ্যে হবে বজ্রাঘাত। হয়তো সমূলে গাছ উপড়ে পড়বে। হয়তো বসতি জনপদ উড়ে যাবে, ভেঙে যাবে। বন্যা আসবে, প্লাবন আসবে। আর্ত কোলাহল ক্লান্ত হয়ে থেমে যাবে। তারপর—।

এরই মধ্যে এল—।

*　　　　　*　　　　　*

দুই হাতে মুখ ঢেকে যেন ভেঙে পড়ে যেতে চাইলে অংশুমান। তার জীবনের স্নায়ু শিরা তার অন্তরের সমস্ত সহ্যশক্তি, সকল কাঠিন্য যুক্তি তর্ক সিদ্ধান্ত উপলব্ধি বিক্ষোভ সব কিছু যেন কঠিন টানে বাঁধা একটি বীণার সব তারগুলির একসঙ্গে ছিঁড়ে যাওয়ার মত ছিঁড়ে গেল।

সীতা। সীতা সেন।

রঞ্জন এবং শিবকিংকর তাকে নিয়ে এল। কালরাত্রি ছবিতে নামাবে। তার আগে একবার অভিনয় করে দেখে নেবে। একাঙ্কিকা হিসেবে কালরাত্রি নাটিকাটি অভিনয় করিয়ে দেখে নেবে। সীতাকেও দেখা হবে; নাটকটা থেকে ছবির সম্ভাবনাও বুঝতে পারা যাবে।

রঞ্জন বললে—অংশুদা, হিরো তোমাকে করতে হবে। আর সম্ভবপর হলে ছবিতেও নামতে হবে।

রঞ্জন তার থেকে বয়সে বড় কিন্তু এই আড়াই বছরে অংশুর ভক্ত হয়ে তাকে দাদা বলতে শুরু করেছে।

শিবকিংকর বলেছিল—আমারও তাই বলতে ইচ্ছে করে ভাই অংশু কিন্তু সেটা ভাই তোকে বড্ড ঠাট্টা করা হবে আর তোর অকল্যাণ করাও হবে। মানুষ হিসেবে আমি ইতর তা জানি। There is beast in me. I know my meanness—narrowness of mind—সব থেকে বেশী করে মনে করিয়ে দিস ভাই তুই। তোকে দাদা বললে মনে হবে এ দোষগুলোর ভাগ চাপাচ্ছি তোর ঘাড়ে। আমার দোষ তোর ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা তো কম করি নি। তোর পা পিছলেছে—তুই আছাড়ও খেয়েছিস। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েছিস সোজা হয়ে। অতসী আমাকে বলেছিল—ওকে ধরবার ক্ষমতা আমার নেই।

অংশু বাধা দিয়ে বলেছিল—আবোলতাবোল বকো না শিবকিংকরদা। তোমাদের দোষ

তো আমাদের উপর দোষ-চাপানোর জন্যে নয় শিবকিংকরদা। দোষ সব কালেই মানুষের মধ্যে আছে। মানুষ খায়, গোগ্রাসে খায়, মদ্যপান করে, নারী নিয়ে উল্লাস করে। হয়তো তা ব্যভিচার। হয়তো তা অপরাধ। এ অপরাধ এ দোষের দণ্ড যা আছে তা মানুষ ভোগ করে। আমিও ভোগ করেছি। আমার জীবন তার সাক্ষী। সে মিথ্যে সাক্ষ্য দিচ্ছে না বা দেয় না তার সাক্ষ্য তুমি দেবে শিবকিংকরদা। তার জন্যে দোষ তোমার নাই এবং তা দেব না। দোষ দেব কিসের জন্যে জান? দোষ দেব শিবকিংকরদা এই জন্যে যে, এতটুকু গুণও কেন দিতে পারলে না তোমরা বল তো? তোমাদের কালের সব গুণ এমনভাবে একালে বাতিল হয়ে গেল কেন?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল শিবকিংকর তার মুখের দিকে। ঠিক অর্থ সে ধরতে পারে নি। বলেছিল—কি বললি বল তো! বুঝিয়ে বল তো! বল তো!

অংশুমান বলেছিল—কি হবে তা বুঝে?

শিবকিংকরদার উত্তরটা মনে পড়ছে। চমকে দিয়েছিল শিবকিংকরদা। কথাটা সে বুঝেছিল তবে একটু দেরি লেগেছিল। এবার বিচিত্র হেসে সে বলেছিল—কিছু হবে না তা হয়তো বটে। বুঝেও তো এর প্রতিকার নেই। কিন্তু বল তো—ওকালের বড় বড় মানুষগুলো যাদের ভাঙিয়ে তোদের আজও বলতে গেলে দিন চলছে—রবীন্দ্রনাথই ধর—তাঁর গুণ—কিংবা তাঁকে এই কথাটা বলতে পারিস?

চুপ করে গিয়েছিল সে। বলতে হয়তো পারতো সে যে, মেনে কি চলছি এ যুগে আমরা? প্রশ্নটা তো আমার তাই। কেন চলছি না? কিন্তু তা বলে নি।

রঞ্জন কথাটা চাপা দিয়ে বলেছিল—দেখ কোন্ কথায় এসে পড়লে দেখ। অংশুদা, তুমি ভাই ছেলেবেলার পড়া-ধরা প্যাঁচটি ছাড়। তাহলে আর ষোড়শী সংঘের ড্রপ উঠবে না। যে কৃষ্ণপক্ষ লেগে আছে তার আর শেষ হবে না। অমাবস্যা আর পোয়াবে না।

অংশুমান হেসে ফেলেছিল।

অমাবস্যা পোয়ানো কথাটা সেই প্রচলন করেছিল। ষোড়শী সংঘের আসল নাম Full Moon Club; সেকালে যাঁরা এটা চালু করেছিলেন তাঁরা ছিলেন খাঁটি বাঙালী সাহেব। সবাই ছিলেন ব্যবসাদার। ডালহৌসী অঞ্চলে ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে সোয়ালো লেন লালবাজার পর্যন্ত এক একটা আপিসের মালিক। টাইসমেত চোস্ত নিখুঁত সায়েবী পোশাক পরে আপিসে আসতেন। বড় বড় সায়েব কোম্পানি—বার্ড হিলজার্স জার্ডিনস্কিন কোম্পানির সায়েবদের আপিসে আড্ডা জমাতেন, দালালি করতেন, মাল কিনতেন বেচতেন; তাঁরা একসঙ্গে ব্রোকারস, এজেন্টস, মারচেন্টস অনেক কিছু ছিলেন। খুব ভাল ইংরিজী বলতেন; সংস্কৃতির চর্চা করতেন; থিয়েটারে যেতেন; গানবাজনা শুনতেন; সভাসমিতির সভাপতি হতেন; চাঁদা দিতেন। এরই মধ্যে একটি তরুণের দল গড়ে উঠেছিল; যাঁরা সন্ধ্যেবেলা স্নান করে পাউডার মেখে কোঁচানো ধুতি পাঞ্জাবি পরে উত্তর কলকাতার বিশেষ পল্লীতে আপন আপন অর্থমূল্যে ক্রয়-করা বান্ধবীর বাড়ি এসে গান শুনতেন; পান করতেন, পান খেতেন। এবং মধ্যে মধ্যে একত্রিত ভাবে বাগানবাড়ি করতেন। গল্পে রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্র বণিকপুত্র

চার পুত্রের কথা আছে। এঁরা দৈবক্রমে আট পুত্র হয়েছিলেন। এই আটজনে আকস্মিকভাবে এক পূর্ণিমায় বাগানবাড়িতে সমবেত হয়ে চাঁদের আলোয় বিমোহিত হয়ে স্থির করেছিলেন তাঁরা মাসে মাসে প্রতি পূর্ণিমায় মিলিত হবেন। একক নয়—আপনাপন বান্ধবী নিয়ে। আট দুগুণে ষোলজন। বিচিত্রভাবে ষোলকলায় পূর্ণ চন্দ্রকে আকাশে রেখে এঁরা ষোলজনে মর্ত্যভূমের ষোলকলার মত সমবেত হতেন।

কালান্তরের সঙ্গে রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। সভ্যদের বয়স হল; ১৯৩০ সাল পার হল। কয়েকজন সভ্যের লোকান্তরও ঘটল। নূতন সভ্যরা এলেন। নূতন নিয়ম হল। নিয়ম হল সভ্যেরা বান্ধবী নিয়ে আসবেন না—তাঁরা দম্পতি হয়ে জোড়ে জোড়ে আসবেন। মেয়েরা রান্নাবান্না করবেন খাওয়াবেন—তাঁদের চিত্তবিনোদন করবার জন্য আসবেন নামকরা আর্টিস্ট যাঁরা তাঁরা।

ওস্তাদ আসবেন—রবীন্দ্রসংগীত গায়ক-গায়িকা আসবেন—কীর্তন-গায়িকাও আসবেন। আসরে প্রত্যেক দম্পতি একটি বন্ধুদম্পতি আনতে পারবেন। পানীয় আগে ছিল প্রচুর। এখন পানীয়ের ক্ষেত্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু হল।

এই ধারাতেই ষোড়শী সংঘ এখন একটি ক্লাবে পরিণত হয়েছে এবং শুধু ব্যবসায়ীদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। সভ্য সেই আটটি দম্পতি এবং তার সঙ্গে এখন ষোলজন বন্ধু অ্যাসোসিয়েটেড মেম্বার আছেন। তাঁরা দম্পতি নন। এবং এখন ষোড়শী সংঘের কার্যক্রম অভিনয়ের ইঞ্জিনেই টেনে নিয়ে চলে। অভিনয়ের আগে বই ধরার পরও ঠিক নয়, রিহারস্যালের দিন থেকেই জমতে শুরু করে। এবং অভিনয়ের দিন পর্যন্ত সে যেন শুক্লপক্ষের চাঁদের মত কলায় কলায় বাড়তে থাকে। অভিনয়ের দিন হয় পূর্ণিমার উদয়। তারপরই কৃষ্ণপক্ষ। সভ্যদের আসা বন্ধ হতে থাকে। ক্রমে এমন হয় যে কেউ আসে না।

বেয়ারা বাতি জেলে নিভিয়ে দেয়।

রঞ্জন সম্পাদক—সে কোন দিন এসে খবর নেয়, কোন দিন টেলিফোনে বলে—বেয়ারাকেই বলে—কেউ এলে বলিস আজ আমি কাজে ব্যস্ত আছি।

এককালে সংঘটির সঙ্গে পূর্ণিমার সম্পর্ক ছিল এবং আজও আছে বলে স্বাভাবিকভাবেই ওরা নিজেরাই এ সময়টিকে বলত কৃষ্ণপক্ষ। এবং একেবারে বন্ধ হয়ে থাকত যে সময় সে সময়টাকে বলত অমাবস্যা। এই উপমাটি কে চালু করেছিল কেউ জানে না।

অংশুমানের 'ব্যর্থ নমস্কারে' অভিনয়ের সময় শচীনদা হঠাৎ বলেছিলেন—কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা পার হল তাহলে! কি বল অংশুমান, তাহলে আজকের তিথিটিকে শুক্লা প্রতিপদ বলা যায়?

অংশুমান তাঁর কথাটির সূত্র ধরে রিহারস্যালের নোটিশের জন্য একটি আধা কবিতা রচনা করে একটা কাগজে লিখে রঞ্জনের হাতে দিয়ে বলেছিল, চমৎকার হবে। এই নোটিশ ইস্যু করুন।

"অমাবস্যা অবসানে, ষোড়শী সংঘের শুরু শুক্লা প্রতিপদ আগামী...তারিখে। চাঁদের কলারা সব যেখানে যে কাজে আছ অবশ্য অবশ্য এস—এই বার্তা ছুটে যাও দিকে

দিগ্বিদিকে।”

এটা সংবাদপত্রে ছাপানো হবে এই নিয়ম হয়েছে।

এবারকার অমাবস্যাটা, অর্থাৎ ‘ব্যর্থ নমস্কারে’ অভিনীত হবার পর থেকে অমাবস্যাটা যেন, বেশী দীর্ঘ অমাবস্যা গেছে। কারণ বোধ হয় অতসী। এ-কালে অতসীই ষোড়শী সংঘের সেই চন্দ্রকলাটি হয়ে উঠেছিল যেটি শুক্লা প্রতিপদের দিন থেকে উঠে পূর্ণিমা পার করে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর শেষরাত্রে ভোরের মধ্যে মিলিয়ে যায়। সম্পাদক রঞ্জনও যেন উৎসাহ পাচ্ছিল না তার অভাবে।

সেদিন উৎসাহিত হয়ে রঞ্জন অংশুমানকে ‘কালরাত্রি’ অভিনয়ের কথা তুলে বলেছিল—ছোট ছেলেকে পড়া ধরে মুখ বন্ধ করার প্যাঁচটি ছাড় ভাই অংশুদা। তাহলে ষোড়শী সংঘের এ অমাবস্যা আর পোয়াবে না।

রঞ্জন সোজা সহজ মানুষ। রঞ্জন সম্পর্কে একটা কথা সবাই বলে; বলে—He is a sport. খাঁটি খেলোয়াড়। সে কাজ চায়। তার জন্যে সে সব করতে প্রস্তুত। এবং তার ইদানীং সংকল্প হয়েছিল ষোড়শী সংঘ এবং অংশুমানকে জড়িয়ে বড় করে তুলবে।

লোকে বলে এই সংকল্পের আড়ালে আর একটি সংকল্প আছে। সেটি তার ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন এবং প্রডাকশন কোম্পানি। যাঁরা আরও গভীর তত্ত্বগ্রাহী তাঁরা বলেন আরও গভীর—আছে আরও জটিল সত্য। সেখানে রঞ্জন নাকি নারীবিলাসী।

রঞ্জনকে প্রশ্ন করলে বলে—তা যে একেবারে নই তা বলতে পারব না। সুন্দরী তরুণীর প্রতি প্রলোভন আমার আছে। তবে কাউকে পথভ্রষ্ট আমি করি না।

এদিক দিয়ে শিবকিংরের সঙ্গে রঞ্জনের মিল আছে। তবে ষোড়শী ক্লাবে সে তার ধর্ম-পত্নীকে নিয়েই আসে।

সেদিন অমাবস্যা পোয়ানোর কথায় অংশু প্রশ্ন করেছিল—কিন্তু ষোলকলার প্রথম কলা ছিল অতসী। তার স্থানে কে উদয় হবেন। শিবকিংকরদার তৃতীয়া তো একেবারে গৃহিণী। রন্ধনশালায় তরিতরকারিতে চলবেন—মানে তিনি তো কাঁচা কদলী; পুজোর জন্যে ষোলকলার এককলা যে পাকা কলা।

শিবকিংকর বলে উঠেছিল—আমার বউ কাঁচা কদলী কিন্তু রঞ্জন কাঁচা ছেলে নয়। তাকে আমি দেখিয়েছি সীতা সেনকে। জিজ্ঞাসা কর ওকে।

রঞ্জন বলেছিল—ভাল মেয়ে ভাই। এ যদি ধোপে টেঁকে তবে ছবির জগতে নতুন তারা উঠে যাবে। অতসীর মত ব্রাইট নয়, কিন্তু সীতা সেন ভারী মিষ্টি মেয়ে।

শিবকিংকর বলেছিল—তাছাড়া খুব মডার্ন মেয়ে। লেখাপড়াজানা মেয়ে, চমৎকার ইংরিজী বলে। and—খুব সম্ভব পার্টও করবে খুব ভাল। তবে বলা ভাল তার ষোড়শী সংঘে আসার প্রধান আকর্ষণ তুমি।

—আমি?

—হ্যাঁ। তোমার নাম শুনে তবে রাজী হয়েছে।

একটু হেসেছিল অংশুমান। স্পষ্ট মনে পড়ছে তার পুরুষ লেখক চিত্তের অহংকৃত এবং পুলকিত হয়ে ওঠার কথা। একে একে মনে পড়ে গেল অতসীকে রমলাকে এবং নমিতাকে। অতসীকে সে করুণা করে। অংশু তাকে ভালবাসতে চেয়েছিল কিন্তু ভালবাসতে দেয় নি তাকে অতসীই। দোষ অতসীকে দেবে না অংশুমান। অতসী মনের অস্পৃশ্যতা কাটিয়ে কোন মতে উপরে উঠে আসতে পারলে না। আর তার নিজের কাছেও সে-দিন ভালবাসা বলে কিছু ছিল না। তার চর্চা করেছিল সে। প্রেম ভালবাসা যদি বা সেকালে ছিল—কোন প্রকারে অতীত কালের বিলুপ্ত প্রাণীদের মত সেকালের সমাজে জন্মাতো—তাহলে একালে কাল পালটানোর সঙ্গে ভালবাসা প্রেম বিলুপ্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জীববিজ্ঞান দেহবিজ্ঞান তন্নতন্ন করে খোঁজো তার কোন সন্ধান পাবে না। সে নিজে ভালবাসা দিতে গিয়ে দেখেছে সে যা দিতে চেয়েছিল তা নিছক করুণা। এবং তার সঙ্গে অতসীর পেলব কোমল দেহখানির উপর লোভ।

রমলা নিজেকে তার পায়ে ঢেলে দিতে এসেছিল। সেও তার প্রতি প্রলুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু অংশুমান তাকে নেয় নি, প্রত্যাখ্যান করেছিল। রমলা বিয়ে করলে এক বুড়োকে। সে তাকে ভালবাসে না। কিন্তু অন্নবস্ত্র আশ্রয়ের জন্য করতে বাধ্য হয়েছিল। এরপর আসে নমিতা। ঠোঁটের ডগায় তার বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল। ওকে বাদ দাও। নমিতাকে বাদ দাও।

একখানা শক্তিশালী নাটকের কিছু সংলাপ অংশুর বড় ভাল লাগে। নায়ক নায়িকাকে এক জায়গায় বলেছে—"বিমলা সংসারে লক্ষ্মীদেবীকে সকলেই পূজা করে কিন্তু লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা চিরকালই ঘৃণ্য জীব।" নমিতাটা একটা পেঁচকী। তবু আশ্চর্যের কথা এই যে—রমলারা থাকবে না। থাকবে অতসীরা এবং নমিতারা। এ পিঠ আর ও পিঠ।

—তোমাকে সে চেনে।

বিস্মিত হয় নি অংশুমান। তাকে চেনা আর বিচিত্র কি? নূতন কালের মানুষের মনের কথা বলতে যে চায়, যে বলে, তাকে একালের ছেলেমেয়ে চিনবে বইকি!

—তোমার বাড়িতে ইলেকট্রিক্যাল রান্নার ইউটেনসীল বেচে গেছে। ইলেকট্রিক কেতলি, ইলেকট্রিক্যাল কুকার। বললে ওকে চা বানিয়ে খাইয়ে এসেছি। হরির নাম করলে।

চকিত হয়ে উঠেছিল অংশুমান।

মুহূর্তে মনে পড়ে গিয়েছিল।

ঠিক পুজোর আগে—এই মাস তিনেক হল। অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর। আড়াই মাস হবে—অক্টোবরের বারো চোদ্দটা দিন এবং ডিসেম্বরের এখনও বাকী বারো দিন বাদ দিয়ে। সেদিন সে বাইরের বারান্দায় বসে ছিল।

চেয়ারে বসে সে বিষণ্ণ মনেই আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। পুজো আসছে। আকাশে শরতের মেঘ ভেসে যাচ্ছিল। গাঢ় নীল আকাশ—ভেসে যাচ্ছিল পুঞ্জ পুঞ্জ পেঁজা তুলোর মত

সাদা মেঘ। সূর্য দিগন্তে নেমেছিল। লাল ছটার আভা প্রতিফলিত হচ্ছিল মেঘের গায়ে।

সেদিন, দুপুরবেলা হঠাৎ পূর্ব পাকিস্তানের ধাক্কায় কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের আক্রোশ আবার জলবার মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তার বাড়িতে দুটি মুসলমান ছুতোর মিস্ত্রী দেওয়াল আলমারির কাজ করছিল। তারা সকালে যখন এসেছিল তখন কোন উত্তাপ ছিল না। অকস্মাৎ দুপুরে ঘটেছে কয়েকটা ঘটনা। যার জন্য সে ট্যাক্সি ডেকে তাদের সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছে ওয়েলেসলী স্কোয়ারের কাছে। সেই পৌঁছে দিয়ে এসে চেয়ারে বসে বিষণ্ণ মনেই আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল এই ধর্ম নিয়ে বিরোধের কথা।

ভাবতে ভাবতে ইচ্ছে হয়েছিল লিখে রাখি কথাগুলি। তার নোটবই আছে—'অথারস্ নোটবুক'; টুকরো টুকরো চিন্তাগুলিকে সে লিখে রাখে। তাতে সে যা লিখেছিল সে লেখা সে পরে বড় করে লিখে বাঁধিয়ে রেখেছে। ওই ঝুলছে। "ঈশ্বর মৃত, ধর্ম মিথ্যে। তবু এদেশে হিন্দু এবং মুসলমানের দাবিতে দেশ ভাগ হয়ে গেল এবং তাই নিয়ে রক্তপাতের শেষ আজও হল না। ওপাশে হিন্দু মরছে, এপাশে মুসলমান মরছে। মৃত ঈশ্বরের প্রেতাত্মারা মানুষের ঘাড়ে ভর করে অট্টহাসি হাসছে এবং এ ওকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে। আমি ঈশ্বরকে মানি না, কিন্তু তার প্রেতের ভয় থেকে তো নিষ্কৃতি পাই না।"

মনে আছে, এইটুকু লেখে সে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। মনে পড়েছিল সে দিন একটা রাশিয়ান উপগ্রহ কক্ষপথে কলকাতার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে। যন্ত্রযোগে চেষ্টা করলে তার 'পিপ পিপ' শব্দ শোনা যাবে। মনে পড়ছে, মনে হয়েছিল নিশ্চিন্ত, শান্ত জীবন চিরকালের মত শেষ হয়ে গেছে। মনে পড়েছিল দেবগ্রামের জীবন। ভোরে উঠে নিশ্চিন্ত বায়ুসেবন, ব্যায়াম, দুধ-মুড়ি-গুড় খাওয়া, কিংবা চারখানা লুচি খাওয়া। বাবা সকাল থেকে খানিকটা কাজকর্ম দেখতেন, খানিকটা মাঠে বেড়াতেন, খানিকটা কংগ্রেস করতেন। তারপর স্নান, খাওয়া, ঘুম, বিকেলে আড্ডা। এ সব আর নেই, এ সব বিগত। পাখীর ডাক, ফুলের গন্ধ, আকাশের মেঘ—সব আছে কিন্তু মানুষের কাছে তা থেকেও নেই। এ সব তার চোখে পড়েই নি।

এরই মধ্যে রাস্তা থেকে ভেঙে তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল—নমস্কার!

তার দিকে চোখ ফিরিয়ে মনে হয়েছিল হঠাৎ সন্ধ্যাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দীর্ঘাঙ্গী উজ্জ্বল কাঞ্চনবর্ণা একটি মেয়ে, পরনে আগুনের শিখার রঙের নাইলনের শাড়ি, লাল সাটীনের ব্লাউস, পায়ে গাঢ় লাল রঙের স্যাণ্ডেল, এরই মধ্যে ভারী একটি মিষ্টি মুখ, উজ্জ্বল দুটি চোখ, তেল-চিকণ চুলে দুই বেণী করে বাঁধা খোঁপা। বাড়ির বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে সিঁড়িতে পা দিয়ে হাত দুটি তুলে নমস্কার করে মুখে বলেছিল—নমস্কার।

মনে পড়ছে ডান হাতে ছিল একগাছি সোনার রুলি, বাঁ হাতে কালো ফিতের ব্যাণ্ডে বাঁধা রিস্টওয়াচ। গলায় ছিল লাল পলা আর সোনার মটর মিলিয়ে গাঁথা একগাছি হার। কানে? কানে কি ছিল? ছিল রিঙ-মাকড়ি।

অংশুমান কয়েকটা পলক ফেলেছিল। এই দুঃস্বপ্নের মত জটিল চিন্তার মধ্যে এমন একটি

শ্রীময়ী রূপ দেখবার এবং সংগীতময়ী কণ্ঠ শুনবার জন্ত প্রস্তুত ছিল না। মুহূর্ত দুই পরে সে প্রতিনমস্কার করে বলেছিল—কিছু বলছেন?

সে বলেছিল—আমি একটু বাড়ির ভেতরে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করব।

অংশুমান বলেছিল—কি চান বলুন? ইলেকশন? না কনফারেন্স?

মেয়েটি সপ্রতিভ, বলেছিল—না। ইলেকশন নয়, পার্টি নয়। খুব ঝরঝরে ক্যানভাসিং।

অংশু বলেছিল—যা বলবার আমাকেই বলুন। বাড়িতে মেয়ে বলতে কেউ নেই।

মেয়েটি বলেছিল—তা হ'লে অন্ত দিন আসব। বলেই সে চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল।

অংশুমান ডেকে বলেছিল—সে দিনও মেয়েদের কাউকে পাবেন না। আমি ব্যাচিলর। মেয়েটি চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

সব মনে পড়ে গেল অংশুমানের।

রঞ্জন এবং শিবকিংকর মেয়েটি প্রসঙ্গে সেই কথাগুলি মনে করিয়ে দিতেই, তাকে আশ্চর্য স্পষ্টভাবে মনে পড়ে গেল। সীতা সেন! চমৎকার মিষ্টি মেয়ে।

শিবকিংকর বললে—খুব মডার্ন মেয়ে।

রঞ্জন বললে—যদি উতরে যায় তা হ'লে দাদা নিউ স্টারের উদয় হবে।

সেই কথা ধরেই অংশুমান জিজ্ঞাসা করেছিল—হ্যাঁ চেহারা ভাল। কিন্তু অভিনয় করেছে এখনও?

রঞ্জন বলেছিল—না তা করে নি। তবে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। সহজে রাজীই হয় না। হঠাৎ তোমার নাম করলাম—মানে আমার আর শিবকিংকরবাবুর মধ্যে কথা হচ্ছিল। শুনে বললে—লেখক অংশুমান চৌধুরী? বললাম—হ্যাঁ। বই ওঁর। হিরো উনি। আমাদের ক্লাবের মেম্বার উনি। তা ছাড়া শচীন সেনগুপ্ত আমাদের পেট্রন। তখন বললে—ওঁরা যখন আছেন তখন নামতে পারি।

শিবকিংকর বললে—নামবে এবং ও মেয়ে বেরিয়ে যাবে। দেখে নিয়ো। আমি বিশদ বিবরণ দিচ্ছি। শোন। গিছলাম চিড়িয়াখানা। বাণিজ্য করতে গিছলাম। কিছু মাল সাপ্লাইয়ের ব্যাপার ছিল। হঠাৎ কলরব করে যেন একদল সাইবেরিয়ান হংস এসে ঝপঝপ করে নেমে পড়ে কলরব তুলে দিলে। দেখলাম একদল তরুণ তরুণী যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বাঙালী দেশী ক্রীশ্চান, একজন অ্যাংলো মেয়ে, সবসুদ্ধ জন দশেক এসে ঢুকল—হাতে তাদের খাবার প্যাকেট। দেখেই বুঝলাম সারাদিনের প্রোগ্রাম, পিকনিক করতে এসেছে। দেখেই মনে হল এ মেয়ে ছবিতে নামতে পারে। এবং নামলে বাজার মাৎ করতে পারে। গোল হয়ে বসে ওরা সকলেই সিগারেট খাচ্ছিল। দেখে আরও বিস্ময় লাগল। গায়ে পড়ে আলাপ করলাম। দেশলাই এক্ষেত্রে আলাপের মোক্ষম অস্ত্র। ওরা দেশলাই দিলে, আমি সিগারেটের টিনটা সকলের দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। পরিচয় করলাম, চা পান করালে ওরা। বিবরণ শুনলাম—ওরা হল জেনিথ অ্যাণ্ড কোম্পানির ক্যানভাসার এজেন্টের একটি দল—তাদের ক্লাবের অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেট করতে এসেছে। Eat, Drink and Be Merry Club, সংক্ষেপে Edabem। বস্বে ক্লাবের একজন এসেছেন চীফ গেস্ট হয়ে। এ মেয়েটি

খুব কাশছিল সিগারেট টেনে। বুঝলাম নতুন খাচ্ছে, অভ্যেস নেই। বললেও তাই। আজকে সকলকে খেতে হবে। আমি বললাম—ছবিতে নামবে? চুপি চুপি বললাম অবিশ্যি। বললে—সত্যি বলছেন? বললাম—ঠিকানা নাও, যাচাই করে দেখ। তারপর বললে—পারব আমি? আমি বললাম—পারবে মানে—? হিট্‌ করে বসবে। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। দিন দশেক আগে হঠাৎ একদিন সকালে এসে হাজির। শুনলাম যাচাই করেছে। তখন রঞ্জনকে ডেকে আলাপ করালাম। রঞ্জন খুশী হল। কিন্তু মেয়েটা বেঁকে বসল। অতঃপর সঙ্কটভঞ্জন নাম, শ্রীমান অংশুমান, এনে দিল পরিত্রাণ, বল হরি হরি। সে বিবরণ রঞ্জন বলেছে। শুনেছ।

একটু হেসে বললে—সুতরাং অতঃপর শুক্লা প্রতিপদের নোটিশ ইস্যু করতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। শচীনদার কাছে আগেই গিছলাম। তিনি শুয়েছেন বিছানায়, তাও উঠে বসলেন। বললেন—"উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপর।" প্রমাণ দেখে নাও। আরম্ভ করে দাও। তবে কন্যাটিকে একবার আমার কাছে এনো। তাকে দুটো সদ্‌কথা বলব। শুনবে না, তবু বলব। হয়তো আমাদের কথা সদ্‌কথা হলে সেকালের সেই রামায়ণের রামের পিতৃসত্য পালনার্থ বনে যাবার কথার মত absurd হতে পারে। তা হলেও বলব। রাম was a very good boy of his time but is a বোকা অ্যাণ্ড হাঁদারাম in our time. আমাকে এক ব্যারিস্টার বলেছিল—রামের ব্রিফ যদি আমি পেতাম তাহলে কৈকেয়ী অ্যাণ্ড মন্থরার ষড়যন্ত্রের হাঁড়ি হাটের মাঝখানে ভেঙে দিতাম।

সীতাকে নিয়ে রঞ্জন গিছল তাঁর কাছে। সেও সঙ্গে ছিল। কিন্তু সে রিহারস্থালের পরে।

* * *

প্রথম রিহারস্থালের দিন অংশুমান আগ্রহসত্ত্বেও যেতে একটু দেরি করেছিল। কারণ সে জানত—প্রথম দিন ওই যে আটটি দম্পতি তাঁরা মিলিত হয়ে বেশ একটু আড়ম্বর সৃষ্টি করতে চাইবেন। অবস্থাপন্ন অর্থাৎ অর্থানুকূল্যের যে একটি বিশেষ পরিচয় আছে—যা দিয়ে সাধারণ মানুষের সমাজে ঈর্ষা বিদ্বেষ এবং যাকে বলে চোখটাটানি তাই সৃষ্টি করতে চায় তারই একটা বাহুল্য ঘটবে। এবং পরস্পরকে সম্ভাষণের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের কথা হবে, হয়তো বা কিছু পলিটিক্স আলোচনা হবে। কেউ বাংলার grand old young man ডাক্তার রায়ের কথা বলবেন, কেউ বলবেন প্রফুল্লদা মানে সেনের কথা। অতুল্যদা বাদ যাবেন না। ওদিকে প্রাইম মিনিস্টার থেকে অশোক সেন, কবীর সাহেব, সিদ্ধার্থ রায়, জ্যোতি বোস পর্যন্ত জিন্দাবাদ হবেন, মুর্দাবাদ হবেন। দেশের ফুড, এগ্রিকালচার, ইউনিভার্সিটি, হোম, পুলিস সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা হবে। এ ছাড়া হাঙ্গেরী আছে, সুয়েজ ক্যানেল আছে, সন্তজাগ্রত আফ্রিকা আছে। ইন্দোনেশিয়ার বড় বড় দুটো দাঁতওয়ালা সুকার্ণো আছে। চীনে মাও সে তুঙ আছে। কোরিয়ার সিঙ ম্যান রী আছে। হো চি মিন আছে। সব থেকে বেশী করে আছে রাশিয়ার সত্যোত্থিত রসিক, শক্ত মস্তুষ্য নিকিতা ক্রুশ্চেভ।

এদের সম্বন্ধে আলোচনায় প্রথম আসরটা একেবারে হেছোহাটা হয়ে উঠবে। এতে

অন্ততঃ তিন কোয়ার্টার যাবার কথা। তার আগে প্রথম পনের মিনিট হ্যালো হ্যালো ব্যাপার। কেমন আছেন? You look very smart, ah—very very smart; আপনার খোকন কেমন আছে? ক্রমে আসবে বিজনেসে। তারপর আসবে কোল্ড ড্রিঙ্ক।

ক্লাব ঘরখানা সত্যিই সুন্দর।

বেশ একটা বড় হল মাঝখানে। দুপাশে দুখানা ঘর। একটা বিলিয়ার্ড টেবিল আছে। অবশ্য বনাতে বড্ড বেশী ধুলো পড়েছে। একটা ঘরে পার্টিশন দিয়ে দুভাগ করে একদিকে সেক্রেটারীর ঘর অন্যদিকে ছোটখাটো ক্যান্টিন। চা কফি হয়। কোকাকোলা সোডা আইসক্রীম মেলে—কড়া পানীয় মেলে না, তবে অকেশন হলে আমদানী করা হয়।

বড় হলটায় তিন দিকে দেওয়াল ঘেঁষে তাকিয়া। একদিকে চেয়ার সোফাসেট। মাঝখানটায় রিহারস্যাল হয়, গানবাজনা হয়।

আটটি দম্পতির প্রথম জন রঞ্জন—তার স্ত্রী আধুনিকা—ভাল গান গায়—মিষ্টি মেয়ে, সিনেমা দেখে, থিয়েটারেও ঝোঁক—তবে সে কমিক রোল করতে চায়। শিবকিংকর আগে দম্পতি ছিল এখন একা; সে ম্যানেজমেণ্ট করে। নরেন বোস লেখাপড়াজানা লোক—একটুআধটু লেখে, দালালি করে, তার স্ত্রী অমিয়া ক্রিটিক; বিমল রায় নামকরা ব্যারিস্টারের ছেলে—নিজেও বিলেতফেরত কিন্তু পাস কিছু করে নি, এখানে এসে টুরিস্টদের এদেশ দেখায়, এদেশের কিউরিও বিক্রি করে, বিমল রায়ের স্ত্রী সত্যিকারের সুন্দরী মেয়ে তবে বড় বেশী সোফিস্টিকেটেড। স্বামীর খাতিরে এদের সঙ্গে মেশেন তবে সে ওই দু'চার দিন।

এ ছাড়া জে. চ্যাটার্জী, পি. মুখার্জী আর. বোস আছেন। এঁরা সব কোল প্রিন্স। একজন ডাক্তারও আছেন। ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সের ইঞ্জিনরুমে এঁদের অবাধ যাতায়াত। ইচ্ছামত এ ইস্ক্রুপ ও নাট কখনও টাইট করেন কখনও আলগা করে দেন। কংগ্রেস থেকে কম্যুনিস্ট পার্টির কাণ্ড থেকে ডালপালা ক্যাকড়া নিয়ে যে নানান পার্টি আছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই এঁদের অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক। এঁদের প্রথম মেলামেশা এবং আলাপ বৈচিত্র্যের উপমা একমাত্র বোধ করি ময়ূরের মেলে-ধরা পেখমের মত। মনোরম তাতে সন্দেহ নেই। মৃদু মধ্য এবং মধ্যে মধ্যে উচ্চ হাসিতে তালে তালে মুখরতা, সে বেশ লাগে কিন্তু তা অংশু পছন্দ করে না।

হ্যাঁ ওঁদের সঙ্গে আরও ক'জনের নাম আছে। একজন মিনু মাসীমা। অন্যজন বড়দি।

এককালে মিনু মাসীমা মধু বোসের সি-পি-এ দলের একজন বড় উৎসাহদাত্রী ছিলেন। তাদের সাজানোগোজানোর ক্ষেত্রে মাসীমার অনুমোদন ছাড়া কোন মেক-আপই গ্রাহ্য হত না। আলিবাবা নাটকে তিনি আলিবাবার বেগম ফতিমা বিবির ডুপ্লিকেট ছিলেন। বড়দি তার থেকেও বেশী—তিনি বিলেতফেরত মেয়ে—অধ্যাপনায় নেমেছিলেন কিন্তু তাঁকে বিয়ে করেছিলেন একজন ধনীর ছেলে—তিনিও অবশ্য বিলেতফেরত ছিলেন। উনি তাঁরই বিধবা। এমনই জনের সংখ্যা কম নয়—ষোল জন। অবশ্য শচীন সেনগুপ্ত, অংশুমান এরাও তাঁদের মধ্যে।

এঁদের আলোচনার এবং প্রারম্ভিক গৌরচন্দ্রিকা বা প্রলোপের স্বরূপের সঙ্গে অংশুমানের

পরিচয় আছে বলেই সে বিলম্ব করে পৌঁছেছিল সেদিন।

এই দিনের সেই স্মৃতি সেই ছবি তাকে বিচলিত করে তুললে আজ। সে কোন ১৯৫৫ সালের এক ডিসেম্বর মাস। আর আজ ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। এতকাল পর আজ মনে পড়ছে, যেন মাত্র ক'দিন আগে দেখা ছবি।

সে যখন গিয়ে পৌঁছুল তখন সকলেই এসে গেছেন—মিনু মাসীমা, বড়দি পর্যন্ত। শচীনদা অসুস্থ। সকলে প্রত্যাশা করে আছেন তাঁর এবং আজ যে নূতন আসবে তার। সীতার অপেক্ষায় আছেন।

সম্ভবতঃ সীতা সম্পর্কে বক্র এবং তীক্ষ্ণ অথচ মধুসিক্ত আলোচনাই চলছিল। সব থেকে মুখর ছিলেন রঞ্জনের স্ত্রী এবং নরেন বোসের এম-এ পাস ক্রিটিক স্ত্রী।

কথাটা তিনিই বলছিলেন—ব্যাটাছেলেদের ওই, ওই ওদের মাপকাঠি—যা নতুন তাই স্বর্গীয় অথবা অপরূপ। অবশ্য এক হিসেবে ভুল নেই কারণ যে রূপটি দেখি নাই যা নাকি নবরূপ তাই হল অপরূপ।

অংশুমান এসে বসতেই আলোচনায় ছেদ পড়েছিল। কিন্তু মিনু মাসী ছাড়েন নি—বলেছিলেন—আমাদের ড্রামাটিস্ট-হিরো কি বলেন?

অংশু হেসে বলেছিল—আমি মাসীমা কিছুই বলিনে।

রঞ্জন বলেছিল—জুতোর শব্দ উঠছে। বোধ হয় শিবদা মিস সেনকে নিয়ে এসে গেছেন। পরক্ষণেই বললে—এই যে এসে গেছেন।

খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বসে ছিল রঞ্জন।

সকলেই ফিরে তাকালেন দরজার দিকে।

ঢুকল একটি মেয়ে। সত্যি চমৎকার দেখতে। রঙে উজ্জ্বল গৌরী তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা এবং সুলোচনা, তার উপর ত্বকে একটি কোমল লাবণ্যের মসৃণতা আছে। পার্টে যেমন দরকার তেমনিই একটু দীর্ঘাঙ্গী; ছোট কপাল, চোখ দুটি বেশ টানা-ডাগর, ঠোঁট আর চিবুক ভারী সুন্দর, সবচেয়ে সুন্দর দাঁতগুলি, হাসলে মেয়েটি মনোহারিণী হয়ে ওঠে; চুলগুলি কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠের সিকিখানা পর্যন্ত এসে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বাকীটা কেটে ছোট করে নিয়েছে। সামনের দিকে সোজা সিঁথির দু'পাশে একটু ফুলিয়ে সাজানো। খুবই সুন্দর লাগছে, কিন্তু প্রসাধন করেছে বলে অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। কানে দুটি গোল রিং। মেয়েটি হেসে নমস্কার করল। বাঁ হাতে ঘড়ি, ডান হাত খালি। আঙুলগুলি লম্বা ধরনের। গলায় পলা বা লাল বিড আর সোনার মটরদানার একগাছি হার বা মালা। এবং আজকের পোশাক তার সাদা।

বিস্মিত হয়ে গেল অংশুমান। এ সীতা সেন যেন সে সীতা সেন নয়। লাল রংয়ের পোশাকের মোড়কে তাকে একটা দীপ্তি দিয়েছিল আজ তাকে সাদা পোশাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কিন্তু এতেই যেন মেয়েটিকে ভাল মানিয়েছে।

সীতা সেন তাকে নমস্কার করল—ভালো আছেন? চিনতে পারছেন আমাকে?

অংশু ঠিক ধরতে পারে নি খোঁচা আছে কি না। কিন্তু সংকুচিত বিনয়ের অভাব ছিল না এটা নিশ্চিত। অংশু প্রতিনমস্কার করে বলেছিল—এঁরা বলছিলেন হিরোইন সীতা সেন একটি আশ্চর্য নতুন মেয়ে। এবং তিনি আমাকে চেনেন। আন্দাজ একটা করেছিলাম। তবে আজ দেখছি এ-আপনাতে আর সে-আপনাতে তফাত আছে। কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি—সে রক্তরাগ থেকে শুভ্র পদ্মরাগের রূপান্তর সত্ত্বেও! আজ ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে আপনাকে!

সীতা সেন ঠকে নি। সে বলেছিল—আজ তো হিটারের বিজ্ঞাপনবাহিনী নই আমি—আমি আজ মধুকরমোহিনী হিরোইন।

কালরাত্রি নাটিকার নায়কের নাম 'মধুকর'। ছদ্মনাম—কিন্তু তাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে আসল নামে। অংশুমান খুশী হয়েছিল। কারণ মেয়েটির মধ্যে সিরিয়াসনেস আছে। এর মধ্যেই বইটা পড়ে ফেলেছে।

অংশুমান বেশ সকৌতুক বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তাকে তখনও দেখছিল। ভাল লাগছিল।

আজ এখন মেয়েটির পরনে সব সাদা। আর একটু প্রভেদ আছে। সেদিন বাঁ হাতে রিস্টওয়াচ ছিল—ডান হাতে সোনার রুলি ছিল, আজ রিস্টওয়াচ আছে—রুলি নেই। আর একটা প্রভেদ, আজ খাটো চুলগুলি শ্যাম্পু করা, এলানো। সে দু'দিনই চুলে ঈষৎ তেলের স্পর্শের চিক্কণতা ছিল আর দুই বেণী করে ঘাড়ের উপর সুন্দর একটি খোঁপা ছিল।

আজ মেয়েটিকে সেদিন থেকে অনেক বেশী মনোহারিণী বোধ হচ্ছে। এলানো শ্যাম্পু করা চুলের মধ্যে একটা এলোমেলো নেশা রয়েছে। যেটা চোখে লাগছে। নাকের নিশ্বাসের সঙ্গে লাগছে। মেয়েটি বসেছে সামনেই। তার বিপরীত দিকে। বেশ মৃদু একটি গন্ধ আসছে।

* * *

না—। সেদিনও তার প্রতি ঠিক আকৃষ্ট হয় নি। অংশু মানে যে, পুরুষ এবং নারীর মধ্যে যে আকর্ষণ সেটা একটা সুতোর আকর্ষণ নয়—দুটো সুতোকে একসঙ্গে পাকিয়ে নিয়ে আকর্ষণটা সম্পূর্ণ হয়। একটা আকর্ষণ দেহের অন্যটা মনের। দুটো একসঙ্গে জড়িয়ে শক্ত হয়ে যখন টানে তখনই সে টান সত্যিকারের টান। দেহের আকর্ষণ মানুষকে অহরহ টানে। সে তরুণ সে যুবক দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নারীদেহ কামনা কাঁদে—প্রতি অঙ্গের জন্যে প্রতি অঙ্গ কাঁদে। মধ্যে মধ্যে সে-কান্না দুর্বার হয়ে ওঠে। দেহব্যবসায়ের বাজার আছে; অস্বীকারও সে করবে না—কখনও কখনও সে দুর্বার বাসনাকে চরিতার্থ সে করেছে। তার জন্ম অপরাধবোধ তার নেই। কিন্তু দেহ এবং মন এই দুই দিয়ে একটি মেয়ের দেহ এবং মন কামনা করা স্বতন্ত্র ব্যাপার। তেমন কোন কামনা তাকে চঞ্চল করে নি। সে কারণেই দিব্যি অসংকোচে তাকে দেখে যাচাই করে নিয়েছিল যে হিরোইনের পার্টে তাকে মানাবে কি না।

মেয়েটি একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল।

কানে-কানে শিবকিংকর বলেছিল—চুম্বক নেই মেয়েটার মধ্যে?

শিবকিংকরের কথার কোন জবাব না দিয়ে অংশুমান বলেছিল—আপনাকে মানাবে খুব ভাল। এর আগে অতসী বলে একটি মেয়ে পার্টটা করেছিল—তার হাইট কম মনে হয়েছিল।

লজ্জিত হয়েছিল সীতা সেন। অংশুমান বলেছিল—একটু আগে বললেন 'মধুকর মনমোহিনী'। তা হলে বুঝতে পারছি এর মধ্যেই নাটিকাটা পড়ে ফেলেছেন আপনি।

সীতা বলেছিল—রেডিয়োতে আমি শুনেছি।

—বইটা পড়েন নি?

—না।

—আচ্ছা। কিন্তু এটা বুঝতে পারছেন যে আপনাকে ডাবল্ রোলে প্লে করতে হবে। মানে বউ এবং নার্স দুজনের রোল আপনাকেই করতে হবে।

—আমি পারব?

—কেন পারবেন না? যেমন সহজভাবে সেদিন আমাকে যন্ত্রপাতির কথা বুঝিয়ে এলেন ঠিক তেমনি সহজভাবে কথা বলে যাবেন—আর ভাবতে হবে আপনি তখন কে। মানে তাই হতে হবে।

চুপ করে থেকেছিল সীতা। শুধু একটা রজনীগন্ধার ডাঁটি ছেঁড়া একটা সবুজ পাতা নিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়েছিল।

রঞ্জন বলেছিল—আজ রিডিং দেবেন বইয়ের। নাও বই ধর অংশুদা।

রঞ্জনের বউয়ের হাতে ভার ছিল অতিথি আপ্যায়নের—সে কফি এবং কাজুবাদাম, বিস্কুট সাজাচ্ছিল ওঘরে—তার সঙ্গে ছিলেন বড়দি। নরেন বোসের শিক্ষিতা স্ত্রী বলেছিলেন—দাঁড়ান দাঁড়ান। আপনারা পুরুষেরা ভারী স্বার্থপর। ওরা আসুক তবে আরম্ভ করবেন।

* * *

নাটিকার আরম্ভ একটি নার্সকে নিয়ে।

অংশুমান পড়তে আরম্ভ করেছিল।

—একটি নার্স মেয়ে। সুন্দরী চটুল এবং প্রগল্‌ভা মেয়ে। তরুণ ডাক্তারেরা তার প্রতি মুগ্ধ। তারা তাকে অ্যাডমায়ার করে অ্যাডোর করে। আকারে ইঙ্গিতে তাকে তাদের হৃদয়ের বার্তা জানায়। সে তাদের নিয়ে খেলা করে। হাসে। তাদের নাচায়। কিন্তু আমল দেয় না। একজন তরুণ দুঃসাহসী বিলেতফেরত—এসব বিষয়ে নামকরা কুটিলচরিত্র সুদর্শন ডাক্তারের একখানা ডায়েরী এবং চিঠি হস্তগত করলে যাতে ডাক্তারটির মারাত্মক কুকর্মের স্বীকৃতি আছে। ধরাও সে দিয়েছিল। ডাক্তারটি জানতেন না চুরির কথা। এরপর তিনি তাকে ফেলে যে মুহূর্তে সরে যেতে চাইলেন সেই মুহূর্তে সে হস্তগতকরা ডায়েরী এবং চিঠি প্রকাশ করে দিতে উদ্যত হল। ডাক্তার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। কিন্তু অন্য সব ডাক্তারেরা তার উপর বিরূপ এবং প্রায় খড়গহস্ত হয়ে উঠল। মেয়েটি চাকরি করত একটি নার্সিং হোমে। সেখানকার যিনি প্রধান তিনি প্রৌঢ় খ্যাতনামা চিকিৎসক; তিনি কিন্তু মেয়েটিকে স্নেহ করতেন কন্যার মত। অন্য ডাক্তারেরা ইঙ্গিত করত যে, মেয়েটির পিতৃত্বের দায়িত্ব তাঁর। অথবা যৌবনে যে নার্সটিকে তিনি ভালবেসেছিলেন—যে নার্সটি এই মেয়েটির চেয়েও স্বৈরিণী

ছিল এ তারই মেয়ে। স্নেহটা সেই হেতু। তবুও তিনি নার্সটিকে ডেকে বললেন তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। অবশ্য বিচার করবেন কয়েকজন ডাক্তার। যদি মেয়েটির অন্যায় প্রমাণিত হয় তবে তার নার্সবৃত্তির ডিপ্লোমা ক্যান্সেল করে দেওয়া হবে। এইখানেই নাটকের আরম্ভ। পিছনের ঘটনাগুলি বাদানুবাদের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। এই মুহূর্তেই একটি লোক এল প্রবীণ ডাক্তারের কাছে। তাঁরই চিকিৎসাধীন এক রোগীর বাড়ি থেকে। কেসটি বাইরে থেকে সাধারণ কেস। কিন্তু ভিতরে অনেক জটিলতা। একটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। সুদর্শন তরুণ। এক বছর আগেও তার হাসি-উল্লাসের সীমা ছিল না। বাঁশী বাজাত আর ছদ্মনামে গান রচনা করত—সুরও দিত—যা রেকর্ডও হয়েছিল এবং অল্পদিনের মধ্যে তরুণ-সমাজে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সে তার ছদ্মনামটি কিন্তু এমন সযত্নে গোপন রেখেছিল যে, বন্ধুবান্ধবেও জানত না। এক বৎসর আগে ঠিক আজকের তারিখে ছিল তার বিয়ের কালরাত্রি। অর্থাৎ বিয়ের ঠিক পরের দিনের রাত্রি। এই রাত্রিতে হিন্দু সমাজের বিধিমতে বর ও বধূর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। এর পরদিন হয় ফুলশয্যা। কলকাতার দক্ষিণে নদীর ধারে গ্রাম; অবস্থাপন্ন ঘর। ঘরে ওই এক ভাই আর তার বড় বিধবা বোন নিয়ে সংসার। বড় দিদিই তাকে মানুষ করেছেন। আর দু'চারজন পোষ্য আত্মীয় আছে। রূপসী মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন দিদি। সে নিজেও তাকে দেখে এসেছিল। মুগ্ধ হয়েছিল বিশেষ করে এই কারণে যে, মেয়েটি ভাল গান গায় এবং কনে দেখার আসরে মধুকরের (তার ছদ্মনাম) গানই সে গেয়েছিল। সকৌতুকে সানুরাগে সে তার পরিচয় গোপন রেখে মধুকরের নিন্দা করেছিল, তাতে মেয়েটি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ছেলেটি ঠিক করেছিল, প্রথম মিলন-রাত্রির আগে পর্যন্ত সে এ পরিচয় গোপনই রাখবে। অর্থাৎ ফুলশয্যার রাত্রি পর্যন্ত।

আরও ঠিক করেছিল যে, ওই দিন লোকসমাজেও সে প্রকাশ করবে যে, সেই মধুকর। বিয়ের পরদিন বর-কন্যা এসে নৌকায় করে যখন ঘাটে পৌঁছল তখন ঝড় বৃষ্টি—দুর্যোগ। অবশ্য খুব বিপদের মত নয়। তবে তার ফলে দিদির অনেক সাধ করে ব্যবস্থা করা শোভাযাত্রা পণ্ড হল। আলো-বাজনাসহযোগে দুই পালকিতে বর ও কন্যাকে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে আতসবাজি পুড়িয়ে ঘরে তোলা গেল না। দিদি ব্যবস্থা করলেন, বর-কন্যা সেদিন ওই ঘাটেই দুখানা স্বতন্ত্র নৌকায় রাত্রিবাস করবে। পরের দিন সকালে শোভাযাত্রা সাজিয়ে বর-কনেকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে তুলবেন—বধূবরণ করবেন; সারা গ্রামের লোক দেখবে।

সেই ব্যবস্থা মত বর-কনে দুই পাশাপাশি নৌকোয় গ্রামের ঘাটে রাত্রিযাপন করছিল; নৌকোর মাঝিরা ঘুমিয়েছে, বরের চাকর কনের ঝি সকলে ঘুমিয়েছে; প্রায় মধ্যরাত্রি; আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে চাঁদ উঠেছে; বরের ঘুম হয় নি—সে বাঁশী হাতে এসে নৌকোর ছইয়ের বাইরে এসে সুর তুলছিল—মধুকরের গানের সুর। হঠাৎ তার মনে হয়েছিল, বাঁশীর সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কে গান গাইছে। তারপর বধূ এসেছিল বাইরে। সে বাজিয়েছিল বাঁশী—সে গেয়েছিল গান। মাঝিরা জেগে উঠেও আবার চোখ বন্ধ করেছিল, ক্লান্ত দেহ—নদীর বাতাসে ঘুমিয়েও গিয়েছিল। হঠাৎ বর বলেছিল—রাত্রিটা কি এমনিই যাবে।

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আমি যাই—আমাকে ধর—।

সে বারণ করতেও সময় পায় নি—বলতে পায় নি—আমি যাই—; বধূও নৌকো থেকে পাশের নৌকোয় আসবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। খুব কাছাকাছি নৌকো, তবু নৌকো দুলে উঠে সরে গিয়েছিল, বধূ পড়ে গিয়েছিল জলে। সঙ্গে সঙ্গে বরও ঝাঁপ দিয়েছিল। মাঝিমাল্লারাও জেগেছিল। তারাও এর পর ঝাঁপ দিয়েছিল। গঙ্গায় তখন জোয়ার। সহজে পায় নি তাদের। বরকে পেয়েছিল অচেতন অবস্থায়। বুকে আঘাত লেগেছে। পরদিন কনেকে পেয়েছিল চড়ার উপর—ফুলশয্যার বদলে বালির শেষ শয্যায় শুয়ে শেষ ঘুমে ঘুমিয়ে আছে।

বরের অসুখ তখন থেকে। তখন কলকাতার হাসপাতালে এনে রাখা হয়েছিল তাকে। বুকের আঘাত সেরেছিল; কোমরেও আঘাত লেগেছিল—তাও সেরে এসেছিল। ডাক্তারদের মতে ছেলেটি নিজে কিন্তু সারে নি। শুধু ক্লান্ত আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকে। ভাল সে হয় নি। ভাল হতে সে চায় না। ভাল সে হবে না। তার শেষদিন আসবে আগামী বৎসরের ওই কালরাত্রির তারিখে, তার দৃঢ় ধারণা সেদিন তার মৃতা বধূ আসবে, তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াবে, সেও হাত বাড়াবে, বধূর মতই সে পড়বে মরণ-সমুদ্রে, বধূও ডুব দিয়ে তার হাত ধরবে গিয়ে এবং চলে যাবে তারা নিরুদ্দেশের দেশে।

এই চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন এই বিখ্যাত প্রবীণ চিকিৎসকটি। হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে এনে মাস দুয়েক ক্লিনিকে রেখে, তিনি তাকে বাড়িতেই রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। রোগীদের মধ্যে না রেখে তার নিজের ঘরে স্বাভাবিক অবস্থার মত রেখেছিলেন। তার বই গ্রামোফোন রেডিয়োর ব্যবস্থার মধ্যে রেখে চেয়েছিলেন ধীরে ধীরে ছেলেটি জীবনের আকর্ষণ ফিরে পাবে। নার্স ছিল। নার্সদের ছেলেটি পছন্দ করে না। রাখতে চায় নি। কিন্তু এই প্রবীণ ডাক্তারটি তাকে মিষ্টি কথায় রাজী করিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তোমার কথা অন্যে যে অবিশ্বাস করে করুক, আমি করি না। আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি ওই দিন নিশ্চয় সে আসবে। কিন্তু সে দিনটি পর্যন্ত তো তোমার সেবার জন্য লোক চাই। তার জন্য নার্সরাই সব থেকে পারজম—তারাই এ কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষা নিয়েছে। সুতরাং নার্সে আপত্তি করলে চলবে কেন? এর উত্তরে কোন যুক্তি ছেলেটি পায় নি, সে রাজী হয়েছিল কিন্তু তরুণী নার্স পাঠাতে নিষেধ করেছিল। প্রৌঢ়া নার্স রাখা হয়েছিল একজন।

তাতে কিন্তু সমস্যা মেটে নি। কোন নার্সকেই সে এক সপ্তাহ দু' সপ্তাহের বেশী সহ্য করে নি। উত্তেজিত হয়েছে সামান্য ত্রুটিতে। কটু কথা বলেছে। তাকে সরিয়ে আবার অন্য নার্স এসেছে।

আজ সেই দিন। সকাল থেকেই রোগী উত্তেজনায় অধীর। সে আসবে। তার জন্য বিছানায় শুয়ে শুয়েই নির্দেশ দিচ্ছে। ঘর সাজাচ্ছে চাকরে। কাপড় কোঁচাতে বলেছে—সে পরবে। মালা গাঁথা হচ্ছে। বাঁশী নিয়ে বসে আছে। আজ সে বাজাবেই। এসব দেখে প্রৌঢ়া নার্সটি একটু বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, সেই কারণে সে তৎক্ষণাৎ তাকে তাড়িয়ে

দিয়েছে। রোগীর দিদি কাঁদছেন। তিনি বৃদ্ধ কর্মচারীকে পাঠিয়েছেন ডাক্তারের কাছে—আজ তাঁকে যেতেই হবে। রোগীকে যদি কোনমতে শান্ত করতে পারেন।

ডাক্তার শুনে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর সহকারীকে ডেকে পরামর্শ করলেন। স্থির করলেন বিচিত্র পন্থা। তারপর দুজনে গেলেন রোগীকে দেখতে। দেখলেন—বৃদ্ধের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রোগী বরের সাজে সেজে হাতে বাঁশী নিয়ে বসে আছে। বাঁশীর সুর না উঠলে অশরীরিণী বধূ তো কায়ামরী হয়ে আসতে পারবে না। তার বাঁশীর সুরই হবে অসীম শূন্যলোকে তার পথের সূত্র। বাঁশী তাকে বাজাতেই হবে।

ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে দেখলেন। কথা কইলেন। বুঝলেন ভাবপ্রবণ যুবকটি উন্মাদ হয়ে গেছে। এ ধারণা থেকে তার বিশ্বাস কোনক্রমেই নড়বে না। তার এ বিশ্বাস এমনি দৃঢ় যে প্রতিনিবৃত্ত করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

তিনি ভেবে নিয়ে বললেন—বেশ তাই হবে।

নির্দেশ দিলেন—কেউ যেন তার কথার প্রতিবাদ না করে। অমান্যও না করে। তবে রোগীর কাছে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, অশরীরিণী বধূ কায়ামরী হয়ে না আসা পর্যন্ত সে রোগী।

রোগী বললে, সেই নির্দিষ্ট সময়ে বারোটার সময় বাঁশী বাজাবে সে।

—নিশ্চয়, কিন্তু বারোটার আগে নয়।

তাই স্থির করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রোগীর দিদিকে বললেন—প্রতিবাদে কোন লাভ নেই। যা বলছে তাই করে যান। দেখুন না কি হয়! হয়তো বউয়ের আত্মা আসবে।

বলে তাঁকে চুপিচুপি বললেন—একটি ব্যবস্থা আমি করব। একমাত্র পথ। দেখুন তাতে কি হয়। একটি কথা, আপনাদের বউটির ছবি দেখে মনে হয় একটু দীর্ঘাঙ্গী ছিল এবং হালকা শরীর ছিল!

—হ্যাঁ।

—তাহলে সে আসবে। একটি শর্ত। বউটির গায়ে যে গহনাগুলি ছিল সেগুলি সব বের করে রাখবেন, কি রংয়ের কাপড় ছিল? বিয়েতে সাধারণতঃ লাল রঙই তো থাকে।

—ফিকে গোলাপী বেনারসী।

—তেমনি কাপড় কিনে আনতে হবে! কেমন? বুঝছেন তো, তার আত্মা যখন কায়া ধরবে, তখন এগুলি সে পাবে কোথা। সে সবই তো চিতায় উঠবার সময় ফেলে গেছে সে? তার বউ যদি এসে ওকে না নিয়ে গিয়ে নতুন করে বাঁচিয়ে দিয়ে যায় তবে সে গহনা কাপড় নিয়ে যাবে। যদি নিয়ে যায় তবে নিশ্চয় সে ফেলে দিয়ে যাবে। বুঝলেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দিদি বলেছিলেন—তাই হবে।

ডাক্তার বলেছিলেন—বউ আসবে আপনাদের। কিন্তু কোন্ পথে কিভাবে শুধু আপনি জানতে পারবেন, কিন্তু অন্য কেউ যেন না জানে।

তাই হল। মধ্যরাত্রে বাঁশীর সুর তুললে সে, অর্ধোন্মাদ তরুণ।

ঘরে নীলাভ আলো জলছিল।

ঠিক জানালার ধারে এসে দাঁড়াল ফিকে গোলাপী রঙের বেনারসী পরা দীর্ঘাঙ্গী তরুণী। সেই গহনা। সে বললে—আমি এসেছি।

রোগী উঠে বসল। বধূ বললে—তুমি তো জান মর্ত্যের আগুনের আলো আমার এ মায়াময় কায়াতে সহ্য হয় না। ওই আলোটা নিভিয়ে দাও। ওগো, নইলে যে আমি তোমার কাছে যেতে পারছি না!

রোগী বললে—তোমার মুখ কেমন করে দেখব?

—চাঁদের আলোয়। আজ যে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। তিথি ভুলে গেছ। সেই আলো জানালা দিয়ে এসে পড়বে মেঝেতে, আমি বসব সেই আলো সারা অঙ্গে মেখে—আমাকে তুমি দেখবে।

অপরূপ কথায় আত্মহারা বর বেড-সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল; কনে এসে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে-পড়া মেঝের উপর বসল। টেবিলের উপর থালায় মালা ছিল—সেই মালা নিয়ে বরের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে—এবার তুমি পরিয়ে দাও।

মেয়েটি আর কেউ নয়, বধূর আত্মা নয়, সেই নার্স টি, যে তরুণ ডাক্তারদের নিয়ে খেলা করে কিন্তু ধরা দেয় না। ধরতে গেলে কালনাগিনীর মত দংশন করে। প্রবীণ ডাক্তারটি শেষে এই উপায় স্থির করেছেন। রোগীর বিশ্বাসমত ওর বিশ্বাস পূরণ করিয়েই মেয়েটি আসবে বধূ সেজে; সেই সজ্জা, সেই আভরণ; সেই দীর্ঘাঙ্গী তরুণী, আলোহীন ঘরে জ্যোৎস্নার মায়ালোকে অন্ধবিশ্বাসের ঠুলীপরা বর তাকে বধূ বলেই বিশ্বাস করবে। এবং প্রথম কিছুক্ষণ উত্তীর্ণ হলে আর ধরবার কোন শক্তিই তার থাকবে না; মেয়েটি তাকে তার করস্পর্শে ছলনাভরা কথায় ভুল থেকে গভীর ভুলে নিয়ে যাবে; শান্ত করবে কাছে বসে, কপালে হাত বুলোবে। তারপর ধীরে ধীরে তার বাঁচবার ইচ্ছা ফিরিয়ে আনবে। বলবে—তুমি বাঁচ—তোমাকে যে বাঁচতে হবে। তুমি মধুকর নামে বিখ্যাত হও। আমি শূন্যলোকে ঘুরব আর শুনব মধুকরের গান আকাশে উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাতেই হবে আমার অনন্ত তৃপ্তি। তুমি বাঁচ, তুমি বাঁচ। ওগো তুমি বাঁচ। তারপর তাকে বিশ্বাস করিয়ে বলবে—তুমি বিয়ে কর। তুমি বিশ্বাস কর, আমি তার আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাব। বিয়ে না করলে আমাকে শুধু শূন্যলোকে ফিরতে হবে। দেখ তুমি ভাল হয়ে গেছ। ওঠ তুমি, দাঁড়াও, এস, তুমি আমার কাছে এস। সে নিশ্চয় হাঁটবে। শুধু সাবধান—যেন মানবী দেহের উত্তপ্ত অঙ্গস্পর্শে তার মোহ না ভাঙে! এইভাবে ধীরে ধীরে তার বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে তাকে ঘুম পাড়িয়ে চলে আসবে সে। ঘুমের ওষুধ সঙ্গে থাকবে তার। তাই সে সময়মত তাকে খাইয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে বসবে।

এর জন্য সে ওই বধূর অলঙ্কারগুলি সব পাবে; যার দাম অন্তত সাত-আট হাজার টাকা। ছেলেটিকে যদি বাঁচাতে নাও পারে—যদি সব ব্যর্থ হয়, তবুও এই এক রাত্রির অভিনয়ের জন্য এক হাজার টাকা দেওয়া হবে তাকে।

মেয়েটি এল—সকৌতুকেই এল। এক বিচিত্র অভিনয়! এবং আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনয় করে গেল। রোগীকে শেষরাত্রে ঘুম পাড়িয়ে বেরিয়ে এসে যখন সে ক্লান্ত হয়ে অন্য

ঘরে প্রতীক্ষমাণ ডাক্তারের সামনে চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রাখল তখন পৃথিবীর রঙ যেন পালটে যাচ্ছে।

ডাক্তার হেসে বললেন—ওয়েল ডান! খুব ভাল করেছ। অদ্ভুত! কিন্তু তুমি একটু বিশ্রাম কর। একটু পরেই রওনা করে দেব তোমাকে আমার গাড়িতে। এখানে কাউকে দেখতে দেব না। কোনক্রমে এ কথা ওর কানে উঠলে হয়তো ও পাগল হয়ে যাবে।

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন—মেয়েটি সেই বধূবেশেই সেখানে একটা বিছানা পাতা ছিল তাতে যেন ভেঙে পড়ে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার ঘরে এসে ওকে ডাকলেন। কিন্তু সাড়া পেলেন না। নাড়া দিয়ে দেখলেন, মেয়েটি বেঁচে নেই। তার হাতের মুঠোয় চিঠি। লিখেছে—জীবনে শেষ অভিনয় করে গেলাম। এরপর আর বাঁচতে পারব না। মনে হচ্ছে সব পেয়েছি। সকাল হলে সব হারাব। তাই সকাল হবার আগেই বিষ খাচ্ছি, পটাসিয়াম সায়নায়েড। ওটা আমার ভ্যানিটি ব্যাগে থাকত অনেক দিন থেকে। আজ কাজে লাগল। জীবন এত মধুর জানতাম না। সে স্বাদ মিলিয়ে যাবার আগেই চলে যাচ্ছি আমি।

* * *

দাদার শালী নমিতার বন্ধু স্মৃতি। স্মৃতির কাকা কোরিয়া-ফেরত ডাঃ ক্যাপ্টেন সেন। তাঁর কাছে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর বিচিত্র পথে মানসিক ব্যাধি ভালো করার গল্প। একটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে জীবনে বিমর্ষ এবং ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। গিয়েছিল অবশ্য একটি মেয়েকে ভালবেসে। ডাঃ বসু একটি নার্স তরুণীকে নিয়োগ করেছিলেন ছেলেটিকে আকর্ষণ করে উল্লসিত করে তুলে বাইরে বের করবার জন্য। ছেলেটি বের হল ভাল হল, কিন্তু মেয়েটি ছেলেটিকে ভালবেসে চিরবিষণ্ণ হয়ে গেল। আর একটি গল্প ওই নমিতাদেরই এক আত্মীয় তরুণের রোমান্টিক গল্প। ছেলেটি বিয়ে করে বাড়ি এল বউ নিয়ে। কালরাত্রি সেদিন। বর-বউয়ে দেখা হতে নেই। সকল জনকে লুকিয়ে সেই দেখা করতে গিয়ে অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল—তাতে বউ জলে ভেসে গেল, বর বাঁচল। কিন্তু তার ধারণা হল ঠিক এক বছর পর ওই দিনটিতে তার বউয়ের আত্মা এসে তাকে নিয়ে যাবে। এবং তাই ঠিক ঘটল। ছেলেটি ঠিক ওই দিনই মারা গেল। এই দুটি গল্পকে মিশিয়ে লেখা নাটক।

অংশুমান নাটকখানি আগাগোড়া নিজের মত করে রিডিং দিয়েছিল। সে নিজে লেখক এবং অ্যাকটিংও ভাল করে—তবে তার অ্যাকটিংয়ে একটু ইমোশন আছে। একালের মত বাস্তবতার জন্যে শুকনো নয়। কিন্তু ইমোশনের আমেজের ফলও আছে। সে যখন পড়া শেষ করল তখন সকলে অভিভূতই হয় নি চোখও সকলের সজল হয়ে গেছে। বই রেখে সে চুপ করল। গোটা ঘরটা স্তব্ধ হয়ে রইল। মেয়েরা চোখ মুছছিল। সীতা যেন দুই হাঁটুর উপর চিবুকটা রেখে স্তব্ধ হয়েই বসেছিল—চোখের জল সে মোছে নি। জলের রেখা দুটি চিকচিক করছিল গালের উপর।

অংশুমান একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল—বই ভাল—তবে শক্ত!

রঞ্জন বলল—শক্ত না হলে ভাল হয় কি করে?

বিমল গুপ্ত বলল—দাটস্ ইট!

মাসীমা বললেন—আমার খু—ব ভাল লেগেছে। খু—ব ভাল।

বড়দি তখনও চোখ মুছছিলেন। বললেন—বড় লেখকের লেখা! তাছাড়া জানো—লেখাটা ট্রানশ্লেট হয়েছে ইউরোপে! ওই যে গুরুসদয় দত্ত রোডে মিসেস সিনহা থাকেন—নরওয়ের মেয়ে—উনি ওঁদের ভাষায় ট্রানশ্লেট করেছেন। উনিই তো আমাকে বললেন। রেডিয়োতে শোনা শেষ করেছেন—আমি গেলাম—আমাকে বললেন—কি সুন্দর একটা ওয়ান-অ্যাক্ট প্লে হল রেডিয়োতে বড়দি, কি বলব! আমি ট্রানশ্লেট করব আমাদের ভাষায়। আমি বললাম—তার আর কি—অংশু আমাকে মাসীমা বলে। সে তোমাকে গ্ল্যাডলি পারমিশন দেবে।

অংশুমান বলল—আমি উঠব রঞ্জন। না হলে আর মাসীমার উচ্ছ্বাস সামলানো যাবে না।

—দাঁড়ান, ট্যাক্সি আনাই।

সীতা সেন বলেছিল—আমিও যাব রঞ্জনবাবু। শিবকিংকরদা!

শিবকিংকর বলেছিল—নিশ্চয়।

রঞ্জন বলেছিল—আপনার বাড়ি যাবার পথেই মাঝখানে ওঁর বাড়ি। শচীনদার বাড়ির একটু আগে। বাগবাজার স্ট্রীট ছাড়িয়েই গলির মধ্যে।

পথে সেই দিনই শচীনদার ওখানে সীতাকে নিয়ে গিয়েছিল। শিবকিংকরই জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। মতলব ছিল তার, সীতা বোঝে নি কিন্তু রঞ্জন বুঝেছিল—হয়তো বা সেও জানত এ মতলব তবে সে এটা অনুমান করতে পেরেছিল। শচীনদা ওকে সদ্বাক্য বলে উপদেশ দিয়ে আশীর্বাদ করবেন—উৎসাহবাক্যও বলবেন—তাতে সীতা যে পাখানি এ পথে বাড়িয়েছে সেখানি আর গুটিয়ে নেবে না।

শচীনদার বাড়ির কাছে এসেই ট্যাক্সি থামিয়ে শিবকিংকর এক মিনিটের জন্য শচীনদার কাছে গিয়ে ফিরে এসে বলেছিল—শচীনদা ডাকছেন। মিস সেন, আপনাকেই ডাকছেন বেশী করে।

নামতে হয়েছিল।

শচীনদা অসুস্থ শরীরে বিছানার উপর আধবসা হয়ে বসেছিলেন। বলেছিলেন—এস এস। এই শীতের রাত্রে তোমাদের ভালবাসার উত্তাপে একটু গরম করে দিয়ে যাও। চা হবে নাকি একটু?

সকলেই না বলেছিল। সকলে প্রণাম করে সরে দাঁড়ালে সীতা এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে একপাশে আনতমুখে দাঁড়িয়েছিল। শচীনদা বলেছিলেন—এদেশের সকলের অতিপরিচিতা—হৃদয়ের স্নেহসুধাধারাসিক্তা তুমি সীতা! এ্যাঁ। তুমি তো সুন্দর এবং মডার্ন। দুইই। তুমি নামবে স্টেজে? নাম নাম। স্টেজকে আরও উজ্জ্বল করে তোল বুঝেছ—brighter কর—more dignified—এবং পবিত্র কর আরও। একালে কে

কার, বা কে কোন্ বংশোদ্ভূত, তা নিয়ে কোন প্রশ্নই তোলে না। তার সত্য মূল্যও নিশ্চয় নেই; দিল্লীর চাঁদনী চৌকের ধারে তার প্রমাণ ছড়ানো আছে। কিন্তু এটা নির্ভুল যে, বংশের না হোক প্রতিটি মানুষের একটা বার্থরাইট আছে এবং রেসপনসিবিলিটি আছে। শুচিবাঈ একটা ব্যাধি কিন্তু শুচিতা মানুষের জীবনে মনুষ্যত্বের অন্যতম পরিচয়। জন্তু ময়লা মেখে থাকে, তাতে তার ক্ষতি হয় না। মানুষের কিন্তু চর্মরোগ জন্মায়। যে মানুষ আনক্লীন সে নিঃসন্দেহে মানুষদের মধ্যে নীচ। জীবের মধ্যে মানুষই মাথা উঁচু করে খাড়া সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মাথা নীচু হলে তার অমর্যাদা হয়।

সীতা একটি কথাও বলে নি।

আসবার সময় আবার শচীনদা বলেছিলেন—অংশুমানের উল্টো দিকে দাঁড়াতে হবে। তা পারবে তুমি। এবং মানাবে ভাল। আমি অভিনয় দেখতে নিশ্চয় যাব। ততদিনে ভাল হয়ে যাব। আর একটা কথা—তোমরা কোথাকার সেন?

সীতা এবার কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল—বলেছিল—ঠাকুরদা বেহারে ছিলেন, গয়াতে ওকালতি করতেন। বাবা বাংলাদেশে গভর্নমেণ্ট সার্ভিস নিয়েছিলেন। চাকরিতে ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছেন। এখন ওই খালের পোলের কাছে—

—আরে তোমাদের আদি বাড়ি কোথায়?

সীতা বলেছিল—তা জানি না।

—এই দেখ। অংশুমান, নতুন কালটা এমনি ভাবেই নোঙর ছিঁড়ে বেমালুম ঝরাপাতার মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে হারিয়ে গেল হে! দুঃখ করিনে। তবে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। সীতাকে একটু দেখো তুমি। বুঝলে?

* * *

শচীনদাই বোধ করি সীতাকে হাত ধরে তার একটু বেশী কাছে এনে দিয়েছিলেন। পথে সীতা তাঁকে উদ্দেশ করে বারকয়েক নমস্কার জানিয়ে বলেছিল—ভারী ভাল লাগল। দেবতার মত মানুষ। শুনতাম উনি নাকি রাগী লোক।

শিবকিংকর বলেছিল—রাগলে একেবারে ক্ষেপে যান। কোন অন্যায় সহ্য করেন না।

সীতা বলেছিল—ভারী লজ্জা লাগল আমার, আমাদের বাড়িটাড়ির কথা কিছুই বলতে পারলাম না!

অংশুমান বলেছিল—জেনেও বিশেষ কিছু হয় না মিস সেন। কাল আমাদের এমনভাবে টেনে নিয়ে চলেছে—কারুর কোন পরিচয়ই সে আর রাখবে না। সব মাটি-চাপা পড়বে।

পথে তার বাড়ি এসে পড়েছিল।

নেমে যাবার সময় সে বলেছিল—আমার ভয় করছে অংশুমানবাবু। এ বোধ হয় আমি পারব না!

১৯৬৭ সালে আজও তার কানে বাজছে সীতার সেদিনের কথা। রঞ্জন, শিবকিংকর দুজনেই কথাটা শুনে হা হা করে উঠেছিল। কিন্তু তার মনকে যেন বিচিত্র স্পর্শে স্পর্শ

করেছিল তার কথা। সেই কারণেই সে ওদের দুজনকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল—কি ভয় করছে বলুন তো?

সীতা বলেছিল—তা বলতে পারি না। তবে ভয় করছে। এবং চুপ করে গিয়েছিল সে।

অংশুমান বলেছিল—আমি এইটুকু বলছি যে অভিনয় চেষ্টা করলে আপনি পারবেন। দিন কয়েক দেখুন—যদি আপনাকে দিয়ে না হয় তবে আমিই বলে দেব। আর হলে বড় সাকসেস পেতে পারবেন আপনি। আর সংসারে ভয় আছে—তবে সে কোথায় নেই বলুন?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে গলির ভিতর দিকে চলে গিছল। বাড়িটা তাদের খানকতক বাড়ি পরে।

* * *

পরের দিন রিহারস্যালে সীতা এল। যেন বিষণ্ণ হয়ে এসেছিল। না। বিষণ্ণ নয়—মগ্ন হয়ে ছিল নিজের মধ্যে। হাতে বইখানা ছিল। রিহারস্যাল আরম্ভের পূর্বেই সে তার কাছে এসে বসেছিল এবং বলেছিল—অংশুবাবু। এ আমি পারব না।

চমকে উঠেছিল সে।—পারবেন না?

—না। এ আমি পারব না।

একসঙ্গে ষোড়শী সংঘের ষোলজনের স্থলে আঠারো কুড়িজন হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল। সীতা অসহায়ের মত দাঁড়িয়েছিল। তাদের হাঁ-হাঁ শেষ হলে অংশুমান বলেছিল—দেখুন মিস সেন, তেনজিং নোরকে মাউন্টেনীয়ারিং শিখে এভারেস্ট জয় করে এল। আপনি রিহারস্যাল দিয়েই দেখুন—তারপর যদি না পারেন পারবেন না। বলুন। আচ্ছা—কাল আমি রিডিং দিয়েছি আজ আপনি একটা রিডিং দিন তো। অন্ততঃ প্রথম সিনটা। বসে বসে পড়তে পারবেন তো!

না বললেই ভাল হতো!

আজ ধাক্কা-খাওয়া গাড়িখানার মধ্যে অচেতন সীতা—

ওঃ!

কচি শিশুটা! হাতখানা তার—। বুকের মধ্যে নিষ্ঠুরতম একটা যন্ত্রণায় বুকখানা ফেটে যেতে চাচ্ছে।

* * *

নিয়তি? না; নিয়তি ভাগ্য ঈশ্বর পাপ পুণ্য এসব সে মানে না। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ বছরের পরের পঞ্চাশ বছর নতুন কাল নতুন পৃথিবী নিয়ে এসেছে। এ যুগে কোন কিছুই অ-দৃষ্ট নয়। এ যুগে আকাশে দেবতা নাই স্বর্গ নাই। একালে সুখ আছে ভোগে—দুঃখ আছে অভাবে; সমস্ত সমস্যার সিদ্ধান্ত আছে বুদ্ধিতে। নিয়তি নাই।

বুদ্ধির ভুলে ঘটে গেছে এমনটা।

সীতাকে পড়তে না বললেই হতো। সম্ভবতঃ ওইটেই প্রথম ভুল।

সীতা পড়ে গিয়েছিল। লেখাপড়া জানা ক্যানভাসিং বিদ্যায় রপ্ত মেয়ে সে, ভাল পড়া তার পক্ষে কঠিন ছিল না তবুও সে যত ভাল পড়েছিল তত ভাল পড়া ষোড়শী সংঘের জন দুইকে বাদ দিয়ে চৌদ্দজনের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না।

প্রথম দৃশ্যটাই ছিল কলকাতার একটি বড় নার্সিং হোম। সেই নার্সিং হোমের একটি উইংয়ের এক পাশে ডাক্তারদের কনসাল্টিং রুম। সেই রুমের মধ্যে নার্সিং হোমের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও ডাক্তার—প্রৌঢ় মানুষ বিমর্ষভাবে বসে আছেন, এবং আরও ক'জন তরুণ ডাক্তার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

ডাঃ সেন বলছেন—হতভাগ্য ছেলে—নিতান্ত হতভাগ্য এবং আই মাস্ট সে—সে অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত। সমরেশের মত ছেলে বিষ খেতে পারে এ আমি বিশ্বাস করতেই পারি না।

অন্য ডাক্তার—But he tried to do—তা ছাড়া তার পথও ছিল না। মুখ দেখাতো কি করে? Blackmailingএর লজ্জায়—

অন্য ডাক্তার—আপনি এর বিচার করুন। এর জন্যে যে দায়ী তাকে পানিশমেণ্ট নিতে হবে। সে দায়িত্ব আপনার।

ডাঃ সেন—you mean নার্স সুপ্রিয়া! কিন্তু তাকে দোষী করছ কি করে? সমরেশ তাকে ভালবাসত। সে বাসত না। কোন মেয়েকে জোর করে তুমি ভালবাসাতে পার না। She was not his married wife—

—But why did she play with him in that way? What right she had to play false with him like that? এই চিঠি দেখুন। সমরেশের বাক্স থেকে সুপ্রিয়ার লেখা এই সব love letter আমরা পেয়েছি। Here she is, ওই তো আসছে। জিজ্ঞাসা করুন ওকে।

সুন্দর পড়ছিল—প্রথম একটু আড়ষ্টতা ছিল, মিনিটখানেক পরেই সে স্বচ্ছন্দ হয়ে পড়ে যেতে লাগল। অনুকরণ সে করে নি। তবে বোধ করি গতকাল অংশুমানের দেওয়া রিডিং সে খুব ভাল করে শুনেছিল। তা ছাড়া পড়ার মধ্যে প্রাণ দেবার ক্ষমতা ছিল মেয়েটির।

বিস্মিত সকলেই হয়েছিল। চুপ করে বসেছিল শুধু অংশুমান।

সীতা পড়ছিল—এবার প্রবেশ করলে নার্স সুপ্রিয়া। বাইরে থেকেই ক্যাচ ধরে ঢুকল—শান্ত ধীর কণ্ঠে বললে—কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে আমি তৈরী হয়েই এসেছি স্যার।

ডাঃ সেন বললেন—এ সব হাতের লেখা তোমার?

—আমার। স্বীকার করছি।

—You loved him?

—No Sir!

—Then you just played with him?

—তিনি আমাকে নিয়ে খেলতে চেয়েছিলেন—আমি জানতে পেরে তাঁকে নিয়ে খেলেছি

স্যার। বেড়াল এবং ইন্দুরের মধ্যে সব সময়েই বেড়াল জেতে না।

অন্য একজন ডাক্তার গর্জে উঠলেন—মিথ্যে কথা। সমরেশ কখনও খেলা করতে চায় নি। You were the attracting magnet—তুমি তাকে টেনেছিলে—

—এই চিঠিখানা পড়ে দেখুন স্যার। চিঠি নয়। চিঠির ফটোস্টাট কপি। মূল চিঠি আমার ডকুমেণ্ট। দেখুন কি লিখেছে। সমরেশবাবু ডাঃ হালদারকে লিখেছিলেন। ডাঃ হালদার একসময় আমাকে নিয়ে খেলতে শুরু করেছিলেন। আমি বুঝতে পেরে তাঁকেও ঠকিয়ে সরে এসেছিলাম। তাই যখন গুজব রটল ডাঃ সমরেশ ঘোষ আমার প্রেমে পড়েছেন—সম্ভবতঃ বিয়ে করছেন তখন তিনি তাঁর কলীগকে চিঠি লিখে বলেছিলেন—সুপ্রিয়া স্বৈরিণী—সে অশুচি—সে ব্যাভিচারিণী—বেশ্যা শব্দটাও ব্যবহার করেছিলেন। উত্তরে সমরেশ ডাক্তার তাঁকে বড়াই করে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন বিলেতে তিনি কত নারীর দম্ভ চূর্ণ করেছেন এবং সুপ্রিয়ার সঙ্গেও যে প্রেম তিনি করছেন তাও ছলনা। সুপ্রিয়াকে তিনি শিক্ষা দিতে চান। Expose করতে চান—জানিয়ে দিতে চান She is a harlot; দুর্ভাগ্য তাঁর চিঠিখানা আমার হাতে এসে পড়ল। সম্ভবতঃ দুখানা চিঠি একসঙ্গে লিখেছিলেন—একখানা আমাকে একখানা ডাঃ হালদারকে। তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমে খাম বদল হয়ে গেল। আমার চিঠিখানা ডাঃ হালদার পেয়েছেন—তাঁর চিঠিখানা পেয়েছি আমি। আরও কাগজ আমার কাছে আছে। ডাঃ ঘোষ কত নারীর সঙ্গে এই প্রেম করেছেন তার একটা list আমার কাছে আছে। I can produce.—

'চমৎকার পড়ে গেল সীতা। কঠিন কণ্ঠে বাঁকা বলার ভঙ্গিতে সে এমনভাবে পড়ে গেল যে সকলেই একসঙ্গে বাঃ বাঃ বলে তারিফ করে উঠল।

অংশুমান বলেছিল—আর পড়তে হবে না। Rehearsal আরম্ভ হোক। আপনি পারবেন।

সীতা কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু কেউ তা শোনে নি। শুনতে চায় নি।

মিনু মাসীমা বলেছিলেন—তোমার কোন কথাই শোনা হবে না। And that is passed unanimously; শচীন সেন প্রেসিডেণ্ট, তিনি নেই—as vice-president I give this verdict. One two three—passed. Now go on.

* * *

সত্যই, প্রথম দিকেই সে এত চমৎকার বলেছিল যে অংশুমানও বিস্মিত হয়েছিল।

রিহারস্যাল দিতে দিতে মেয়েটা আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ছে—।

নাটিকার ডাঃ বোস তরুণ একজন ডাক্তার কঠিন কণ্ঠে বললেন—যোড়শী সংঘের বিমল গুপ্ত বললেন—সমরেশ ডাক্তারের অপরাধের কথা বলেছ তুমি। কিন্তু তোমার নিজের কথা? অস্বীকার করতে পার তুমি যে প্রেমের অভিনয় করা তোমার একটা স্বভাব? এবং তোমার heartlessness সব থেকে বড় পরিচয়, তোমার স্বৈরিণীত্বের সব থেকে বড় প্রমাণ!

শান্ত স্বরে এবার সুপ্রিয়া নার্সের বলার কথা—হৃদয় কি এ যুগে কারও আছে ডাঃ বোস? আপনার আছে? তা ছাড়া আপনারা পুরুষেরা এ যুগে কোন পবিত্রতাকে স্বীকার

করেন ?

প্রবীণ ডাঃ সেন বললেন—সুপ্রিয়া, তুমি নিজের কথা বল। এ ধরনের তর্কের মধ্য দিয়ে কোন মীমাংসায় পৌছুনো যাবে না।

সুপ্রিয়া বললে—ডাঃ বোসের এ অভিযোগও আমি স্বীকার করছি। কিন্তু—ঠিক ওইভাবে নয়।

ডাঃ সেন—মানে ? কি বলতে চাও তুমি ?

—Sir, I have got some charm. সে আমার রূপ অথবা অন্য কিছু তা জানি না। তবে আমার একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। পুরুষেরা ছুটে আসে। মেয়েদের এ প্রলোভন সংবরণ করা খুব শক্ত। খেলতে তার ইচ্ছে হয় স্বাভাবিক ভাবে। আমার বেলা তার সঙ্গে মিশেছে আর একটা শক্তি। Sir, আপনি আমার পিতৃতুল্য, কন্যার মত স্নেহ করেন। আমাকে বিশ্বাস করুন আমি সত্য বলছি। একটা প্রতিহিংসা এসে মিশেছে আমার এই খেলা করার প্রকৃতির সঙ্গে। সে আমার দিদির জন্যে। তিনি আমার মতই আকর্ষণময়ী ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন শান্ত সৎ ধীর। ডাঃ সেন, তাঁর মত পবিত্র সুন্দর একটি মেয়ে জীবনে আমি দেখি নি। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। কেন জানেন ? দিদি একজন অধ্যাপককে ভালবাসতেন। বিয়ের সব ঠিকও হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ অধ্যাপক দিদিকে ছেড়ে আমাকে ভালবাসলেন। কারণ দিদির আকর্ষণী শক্তি ছিল কিন্তু খেলবার শক্তি ছিল না। আমি খেলতে পারতাম। তাঁর সঙ্গেও আমি আমার অজ্ঞাতসারেই খেলা করেছিলাম। যার জন্যে দিদির ভাবী স্বামী দিদিকে ফেলে আমাকে নিয়ে উন্মত্ত হলেন। দিদি আত্মহত্যা করলেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি তাঁকে ভালবাসি নি। দিদির ভাবী স্বামী বলে শ্রদ্ধা করতাম, ঠাট্টা করতাম। ডাঃ সেন, সংসারে মানুষ পুরুষ অল্প কয়েকজন আছেন। কালকালান্তরের traditionএর creation; যজ্ঞের চরু। বাকী সব animal, beasts.

রিহারস্যালে—আশ্চর্যভাবে সীতা কথাগুলিকে প্রাণবন্ত করে বললে। অতসী পার্টটা ভাল করত। কিন্তু তার বলার মধ্যে একটা actingএর কৃত্রিমতা ছিল। এ যুগের naturalism-এর নামে যে তড়বড় করে সমান একটা সরল রেখার পথে কথা বলে যাওয়ার একঘেয়ে সুর তার মধ্যে নতুন ঢঙের কৃত্রিমতা আছে—সেটা যেন সার্কাসের আসরের চাবুক মারার শব্দ অভিনয়ের মত মনে হত। সীতা আপন ভঙ্গিতে তার থেকে অনেক ভালই বললে। তবে উচ্চারণে সোফিস্টিকেশন কিছু বেশী।

সকলে তারিফ করে উঠল।

অংশুমান সব থেকে বেশী তারিফ করে বলে উঠল—চ—মৎ—কার। সুন্দর হয়েছে। এই স্পিরিট বজায় রেখে চললে মারভেলাস সাকসেস হবে।

সীতা সিনটা সেরে অংশুর সামনে এসে বসে বললে—এক গ্লাস জল খাব। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আমার।

অংশুমান বলেছিল—কিন্তু you have won the battle.

সীতা বলেছিল—হ্যাঁ। দেখলাম এমন কিছু নয়। ফাঁসির আসামীর পাটাতনের উপর দাঁড়ানো নয়।

অল্পক্ষণ পরেই এল সেই সিন। অংশুমান নায়ক হিসেবে প্রথম বের হবে স্টেজে। রোগশয্যায় শুয়ে অভিনয়। অংশুমান তার পার্ট বলতে বলতে সীতার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল; সীতা একেবারে মুগ্ধ অভিভূতের মত তার অভিনয়ের মহলা দেখছিল। অংশুমান সাধারণ মহলার আসরের চেয়ে একটু বেশী প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

ভরাট গলা অংশুমানের। চোখ তার স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল—আপনাআপনি হয়ে উঠেছিল। রুগ্নদেহ নববধূর অশরীরী আত্মার জন্ম প্রতীক্ষমাণ নায়কটি জেগে বসে ছিল। রাত্রে যখন সবাই ঘুমোয় তখন সে নিত্যই জেগে থাকে। সে যেন, দূর দূর অতিদূর কোন লোক থেকে ডাক শুনতে পায়, অশরীরিণী বধূ বলে—"ওগো—ওগো—আমায় ধর—আমায় টেনে নাও!" পাতার খসখসানি ভেসে আসে, সে-খসখসানি শুনে সে বুঝতে পারে অসহায়ভাবে বায়ুস্তরে বধূর অশরীরী কায়াখানি ভেসে বেড়াচ্ছে। সে দু'হাত বাড়িয়ে সেদিন সেই জলের তলায় যেমন তার জন্মে হাত বাড়িয়েছিল তেমনিভাবেই এই শূন্যতার সমুদ্রের মধ্যে তার জন্মে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঝিল্লী ডেকে যায়—তার মধ্যে নায়ক শোনে তার জীবনজোড়া কান্না! কিন্তু আজ তাদের সব প্রতীক্ষার শেষ। সে আসবে। আজ বৎসর পূর্ণ হল। আজ শ্রাবণের পূর্ণিমা তিথি। সে আসবে। নিঃশব্দ পদপাতে এসে দাঁড়াবে এবং রাত্রি দুপুরের ঠিক সেই লগ্নে আমি বাঁশী বাজাব—তার সুরের সূত্র ধরে সে এসে দাঁড়াবে ওই জানালার ধারে—

—উঠুন। সীতা দেবী—উঠুন। বলেছিল রঞ্জন।

—আমি? সীতা চমকে উঠেছিল।

—হ্যাঁ। জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন আপনি। ডাকছেন—মধুকর! ক্যাচ ধরে ডাকতে হবে। মানে ওর অসমাপ্ত কথা আপনার কথায় সমাপ্ত হবে।

সীতা সেন উঠে দাঁড়াল। রঞ্জন পরিচালক—সে বলল, অংশুদা আর একবার শেষটা বলুন। অংশু চোখ দুটি উপরের দিকে তুলে বিষণ্ণ-উদাস অথচ প্রত্যাশাভরা কণ্ঠে বলল—রাত্রে ঝিল্লী ডেকে যায়, আমি শুনতে পাই তার জীবনজোড়া কান্না বেজে চলেছে। একটু থেমে সে আবার শুরু করল, কণ্ঠস্বর পালটাল—একটু দীপ্ত হয়ে উঠল। অংশুমান বলল—কিন্তু আজ সে আসবে। নিঃশব্দ পদক্ষেপে আসবে। আমি বাঁশী বাজাব—বাঁশীর সুরের সুতোটি ধরে সে এসে দাঁড়াবে হয়তো ওই জানালার ধারে—আমাকে ডাকবে—

এই ক্যাচ ধরেই সেই নারীটি বধূর ছদ্মবেশ পরে জানালার পাশে এসে দাঁড়াবে—বলবে—মধুকর! আমার মধুকর—!

রঞ্জন তাকে ইশারা করেছিল—বলুন বলুন। মিস সেন!

বলতে চেষ্টাও করল সীতা সেন কিন্তু বলতে পারল না। কেমন যেন নার্ভাস হয়ে গেছে,

মুখ দেখেই বোঝা যায়। সময় পার হয়ে গেল কিন্তু কোনমতেই কথা বলতে পারল না।

অংশু বলল—আচ্ছা আমি আবার বলছি। সে শুরু করল। কিন্তু তবুও বলতে পারল না সীতা সেন—মুহূর্তে মুহূর্তে তার মুখখানা ফ্যাকাসে ক্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি কেমন অসহায় ভয়ার্ত হয়ে উঠছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সে।

অবশেষে সে বলল—এ আমি পারব না। বলে অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে এসে বসে পড়ল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করে বসে রইল। গোটা ঘরখানাই নিস্তব্ধ। সকলে চুপ হয়ে গেছে। তারা চোখে দেখতে পাচ্ছে মেয়েটির অবস্থা। এ অবস্থায় কি বলবে—কি বলতে পারে?

নীরবতা ভঙ্গ করে অংশু বলল—কি হল? আসছে না?

মুখ মাথা নেড়ে সে বলল—না!

—এক কাজ করুন। বইখানার ওই সিনটা রিডিং পড়ুন। বেশ উঁচু গলায়। অবশ্য অ্যাকটিংয়ের মত করে। পড়ুন!

সীতাকে বইখানা এগিয়ে দিল রঞ্জন। সীতা কিন্তু স্পর্শ করল না। অংশু বলল—পড়ুন। সীতা এবার ঘাড় তুলে মাথা নেড়ে বলল—আমি পারব না।

—কেন পারবেন না?

—না। আমি কেমন হয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনি এত ভাল পার্ট করছেন—আপনার পরে আমার কথা আসছে না। আমার গলা শুকিয়ে গেছে। হাত পা কাঁপছে। আপনারা অন্য কাউকে দিন।

—বেশ তো এরবার পড়ুন না।

—কি হবে পড়ে? পারব না যা—।

—লজ্জা লাগছে?

—লজ্জা? লজ্জা কেন হবে? প্রথম দিনে যে কথাগুলো বললাম—লজ্জা পেলে ওই কথাগুলোই আটকাতো!

—বেশ, আবার আপনি বই দেখে পড়ে যান। আমি পার্ট বলব বই দেখে—আপনি পড়ুন। না হয় সবটাই আপনিই পড়ুন। রিডিং পড়ুন।

বইখানা টেনে নিয়ে পড়ে গেল সীতা। সবটাই পড়ল। অর্থাৎ রিডিং পড়ে সে বর-বধূ যুগলের কথাই বলে গেল। পড়ার মধ্যে অভিনয়-ভঙ্গির রেশ ছিল না কিন্তু পড়ে গেল। অংশু বলল—ঠিক আছে। আমি এবার রিহারস্তালের মত করে আমার পার্ট বলে যাই, আপনার পার্টটুকু আপনি বই দেখে পড়ে যান।

সেটা সে পারল। এরপর অংশু বলেছিল—আজ এইখানেই থাক।

অংশু সেদিন ট্যাক্সিতে শুধু সীতাকে নিয়ে বাড়ি পৌছে দিয়ে নিজে বাসায় ফিরল। ট্যাক্সিতে চড়বার সময় সীতাকে ডাকল—আসুন। পৌছে দিয়ে যাব। রঞ্জন তুমি চলে যেয়ো।

ট্যাক্সিতে চড়ে সীতাকে বলল—শাই কেন আপনি?

—শাই? শাই কেন হব? আপনিই বলুন না, আমি শাই? আমি ক্যানভাসারের

কাজ করি, আমি পাই? হাসল সীতা।

অংশু বিস্মিত হয়ে গেল। সীতা পাল্টে গেছে। এ সেই মেয়ে। ক্যানভাসার। রঞ্জন বলেছিল—তাকে সে কফি হাউসে দেখেছে, মেট্রোর বারে দেখেছে, চিড়িয়াখানায় দলের মধ্যে হৈ হৈ করতে দেখেছে—অংশু তাকে নিজের চোখে না দেখলেও তার আভাস পাচ্ছে।

অংশুমান বললে—তা হলে? অভিনয়ে লাভ দিন। এতে নার্ভাস হচ্ছেন কেন?

একটু ভাবল সীতা। বলল—দেখুন, কারণ ঠিক একটা নয়। আমি বসে বসে ভাবছিলাম।

—কারণগুলো কি, বলুন দেখি?

কপালের চুল সরিয়ে সীতা বলল—প্রথম কারণ আপনার সামনে। আপনি খুব ভাল অভিনয় করেন শুনেছিলাম—রিহারস্থালে দেখলাম যা ভাবতাম তার থেকে অনেক ভাল। মনে হল এরপর আমি যে কথাগুলো বলব তা শুনে লোকে বোধ হয় হাসবে।

—না, হাসবে না। একটু প্রাণ দিয়ে অভিনয় করতে হবে। নিজেকে একটু ভুলতে হবে। দেখবেন আমার চেয়ে—

সীতা সেন বলল—সেই হয়েছে বিপদ। কিছুতেই ভুলতে পারছি না নিজেকে। তাছাড়া—। কিছু মনে করবেন না তো?

—কেন, মনে করব কেন?

—ব্যাপারটা রোমান্টিক ননসেন্স মনে হচ্ছে আমার। আমি মডার্ন-টডার্ন বুঝিনে। হাল-ফ্যাশান জানি। সাজতে-গুজতে পারি। কথাও বলতে পারতাম, এখন ক্যানভাসারি করে প্রায় টেপ রেকর্ডারের মত বেজে চলি। বাবা ছিলেন রিটায়ার্ড গভর্নমেণ্ট সারভেণ্ট—বাড়িতে এককালে সায়েবীয়ানা ছিল, রিটায়ারমেণ্টের পর অনেক কমিয়েছিলেন, কিন্তু উঠিয়ে দেন নি। ছেলেবেলায় মিশনারী ইস্কুলে পড়েছি। বড় হয়ে কিছুদিন লরেটো, তারপর অর্থাভাবে দেশী ইস্কুলে।

* * *

সেইদিন ওই ট্যাক্সিতেই পূর্ণ পরিচয় পেয়েছিল সীতা সেনের। অত্যন্ত সহজভাবে কথায় কথায় সীতাই বলে গিয়েছিল। সোফিস্টিকেটেড ঘরের মেয়ে। যত নাক উঁচু, ভাঙা অবস্থার জন্ম জটিল ধুলোমাটির রিয়েলিটির উপর তত বেশী অনুরাগ। ওইটেকেই চরম সত্য মনে করে সেণ্টেড হেয়ার আয়েল কিংবা দামী শ্যাম্পুর অভাবে চুল রুখু করে রাখে। ধুলোবালি মাখার মতো দেখায়। কিন্তু নারকেল তেল মাখতে পারে না।

বাপ ছিলেন ইংরেজ আমলের ছোটখাটো গেজেটেড অফিসার। ছিলেন সাব-ডেপুটি, স্বভাবে ঝগড়াটে লোক। উপরওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়া করতেন। বলতেন—বিদ্যে তো সেই এক। তুমিও এম-এ, আমিও এম-এ। তবু সুবিধেবাদের কেরামতিতে কিংবা মুরুব্বীর জোরে তুমি দু'ধাপ ওপরে আমি দু'ধাপ নীচে। আবার সে আমলের ন্যাশনাল লীডারদের বলতেন—লোফার। দু' বছর জেল খাটলেই হিরো! বিদ্যে ম্যাট্রিক ফেল—নয় পাস। এমনি

ধরনের মানুষ ছিলেন বাবা। স্বাধীনতার পর তারাই যখন দেশের কর্ণধার হল তখন নিজের বিষেই নিজে জর্জর হয়ে গেলেন। লম্বা ছুটি পাওনা ছিল তাই নিয়ে বসলেন। ফলে ইংরেজ আমল থেকে দেশী আমল পর্যন্ত থেকে গেলেন সেই সাব-ডেপুটি গ্রেডে। মেজাজটা বরাবরই ছিল সাহেবী। বাড়িতে স্টাইলটা যথাসম্ভব অভিজাত করে রেখেছিলেন। দুই ছেলে তিন মেয়ে; সীতা ছোট মেয়ে। ছেলেদের পড়াতেন সেণ্ট জেভিয়ার্সে সিনিয়র কেম্ব্রিজ কোর্সে। মেয়েদের পড়াতেন লরেটোতে। ছেলে দুটি ইংরেজীতে পাকা কিন্তু বাকী সব কিছুতেই গোবরের মত কাঁচা। দুই মেয়েই সব থেকে বড়। তাদের বিয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজ আমলে চাকরি থাকতে থাকতে। ছেলেরা বিয়ে করেছিল ভাল ঘরে; মানে মফস্বলের অবস্থাপন্ন জমিদার-কাম ব্যবসায়ীর ঘরে। সার্কেল অফিসারি সূত্রে পরিচয় হয়েছিল। তারা প্রত্যাশা করেছিল—হাকিমের ছেলে—দস্তুরমত স্টাইলদার এবং চমৎকার ইংরিজী বলে—এ ছেলেরা বড় চাকরে হবেই। ছেলেদের তখন পঠদ্দশা। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে পড়ে। বছরের পর বছর পরীক্ষা দেয় না ফার্স্ট ক্লাসের জন্যে। স্টুডেণ্ট মুভমেণ্ট করে। মেয়ে সীতা তখন লরেটোতে ফ্রক পরে স্কুলে যায়।

রিটায়ারমেণ্টের পর বাপ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের যে টাকা পেলেন তাই নিয়ে নতুন করে নামলেন বিস্তৃততর জীবনক্ষেত্রে। শেয়ার মার্কেটে। ছেলেদের আশা তখন গেছে। ছেলেরা এম-এতে থার্ড ক্লাস নিয়ে কোন রকমে বেরিয়ে ধরাপড়া করে ঢুকেছে গভর্নমেণ্ট সার্ভিসে। একজন ফুড ডিপার্টমেণ্টে ইন্‌স্পেক্টার, অন্যজন সেক্রেটেরিয়েটে ক্লার্ক।

বাবা একখানা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ি কিনলেন—নইলে শেয়ার মার্কেটে খাতির থাকে না। এবং পরিচিতদের কাছে বেশ মাথা উঁচু করে বলা চলে না—বিজিনেস করছি। এবং তখন অবস্থাটা ভিতরে ভিতরে যাই হোক বাইরে থেকে নিজেও কিছু বুঝতে পারেন নি। পৈতৃক বাড়ি আছে, পেন্সন আছে। ছেলেরা মাইনে আনে। বউদের ছেলেপুলে হয় নি। চলছিল ভালই। হঠাৎ শেয়ার মার্কেটে ডুবলেন মিঃ সেন।

ব্যাঙ্ক করেছিলেন আর এক সেন সাহেবের সঙ্গে জুটে। সেই ব্যাঙ্ক ডুবল। আসল সেন সাহেব ব্যাঙ্কের টাকা সরিয়ে ধরা দিয়ে জেল খাটলেন। আর সীতার বাবা সেন—তিনিও ছিলেন ডিরেক্টার—তিনি শেয়ারগুলো লোকসান করে বেচে সব শেষ করে পুরনো মোটরে চেপে বাড়ি ফিরলেন। দু'দিন পর সেটাও বেচে ঘরে ঢুকে বসে ব্রহ্মাণ্ডকে গাল দিতে দিতে একদা হার্টফেল করলেন।

সীতা তখন আই-এ পড়ছে। সেও পড়ার ক্ষেত্রে ভাইদের যোগ্য বোন; একবার ফেল করেছে। বিয়ে হয় নি। কলেজে যায়—মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারে। তারপর বছরখানেকের মধ্যে ভাইরা পৃথক হল। শুধু ভাইয়ে ভাইয়ে নয়, মায়ের সঙ্গেও পৃথক হয়ে গেল। সীতার দায়িত্বও কেউ নিলে না। সীতা বললে—ঠিক আছে—আমার দায়িত্ব আমিই নেব, শুধু আমারই নয় মায়ের দায়িত্বও রইল আমার।

লরেটোর পড়া মেয়ে, মোটমাট শ্রীমতী। স্টাইল জানে, ইংরেজিতে ভালো কথা বলে। এই ভারতবিখ্যাত ইলেক্‌ট্রিক্যাল কোম্পানীর ক্যানভাসারের চাকরি যোগাড় করে নিলে।

বাপের পরিচয় কিছু সাহায্য করেছিল, কিন্তু তার থেকেও বেশী সাহায্য করেছিল তার এই মডার্ন জীবন—এই স্বরূপ, এই প্রগল্‌ভতা। এই চমৎকার ইংরিজী ব'লতে পারা। কোম্পানীর মক্কেল বাঙালী বেশী নয়। বাঙালীরা ঘুঁটের ধোঁয়া আর কয়লার ধোঁয়া ছাড়া রান্না করতে পারে না আর বোধ হয় অল্প আঁচে রান্না করলে ধোঁয়ার একটু গন্ধও থাকে না বলে ব্যঞ্জনী মিষ্টি লাগে না। ভিন্ন প্রদেশবাসীরা বেশী খদ্দের বড় খদ্দের—বিশেষ বর্তমান কালের রাষ্ট্রনায়কদের জাতেদের, যাদের বাড়িতে লণ্ডন নিউইয়র্কের সুখ-সুবিধে আমদানী হয়েছে, যাদের মেয়েরা গঙ্গাস্নান করে এবং বাচ্চাদের 'বেবী' বলে ডাকে। ঝিদের আয়া বলে—চাকরদের বয় বলে। পুরুষেরা কোট-প্যাণ্ট পরে। বছরে দু'একবার ইয়োরোপ অ্যামেরিকা যায়। ফরেন ব্যাঙ্কে যাদের মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স। খদ্দের তারাই। তাদের সঙ্গে চাকুরে মাদ্রাজীরা আছে—ফরেনার তো আছেই। এদের কাছে তার মত মডার্ন ক্যানভাসারের অনেক মূল্য বলেই কোম্পানীর কাছেও তার আদর হয়েছিল অনেক।

* * *

কথাগুলি হতে অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল। ট্যাক্সিওলা অংশুমানের চেনা। সে তাকে একেবারে তার বাড়িতে এনে হাজির করেছিল। গাড়িটা থামলে দুজনের খেয়াল হয়েছিল। এবং দুজনেই হেসে উঠেছিল। সীতা বলেছিল—এ মা! দেখুন তো কাণ্ড! ট্যাক্সি ফেরাতে বলুন। আমায় পৌঁছে দিয়ে আসুন।

অংশু বলেছিল—কথাগুলো শেষ করুন। আপনার দেওয়া কেটলিতে তৈরী কফি খেয়ে নিন।' ট্যাক্সি রইল। বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব।

কথা শেষ করে সীতা বলেছিল—ও অত্যন্ত আনরিয়াল। অ্যাবসার্ড। ও পার্ট আমি পারব না। আমার ক্যানভাসারিই ভাল। ওই ব্যাপারটার কিছুতেই সত্যি বলে মানতে আমি পারছি না।

অংশুমান বলেছিল—সত্যি তো নয়। বলেই তো দেওয়া আছে মিথ্যে।

সীতা তার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়েছিল। অংশুমান বলেছিল—এমন করে তাকাচ্ছেন যে! বলুন তো ওটা কি সত্যকারের লাভ সিন? না—একটি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত তরুণকে প্রেমাভিনয় করে তাকে বাঁশী বাজানো থেকে নিরস্ত করা হচ্ছে এবং তার বাঁচবার ইচ্ছা—will to live জাগ্রত করা হচ্ছে? নাটকে কি স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া নেই?

বেশ কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সীতা যেন সমস্তটা বুঝে নিয়েছিল এবং ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলেছিল—হ্যাঁ। একমুহূর্ত পরেই কিন্তু বলেছিল—কিন্তু মেয়েটা অভিনয় করতে গিয়ে তো প্রেমে পড়েছে। বিষ খেয়ে মরেছে।

—তা মরেছে। সেখানটায় তো আপনি শুধু শুয়ে থাকবেন চোখ বুজে। মরতে তো হচ্ছে না আপনাকে। আপনার নিশ্বাস পড়বে—তা পড়বে; সেটা নাট্যশাস্ত্র অনুসারে আপত্তিজনক হবে না!

হেসে উঠেছিল সীতা।

* * *

বিপদ বেধেছিল স্টেজ রিহারস্যালের দিন।

সেদিন অংশুমানের মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। প্রায় তিনটে মাস চলে গেছে। দেরি হয়েছে তারই জন্তে। কয়েকটা বড় কনফারেন্স গেল। লিটারারি কনফারেন্স দুটো, দুটো ড্রামা ফেস্টিভ্যাল। তাকে যেতে হয়েছিল। দিল্লীতে সংগীত নাটক একাডেমিরও একটা নেমন্তন্ন সে পেয়েছিল। কিন্তু সেদিনের ক্ষোভ সেজন্তে নয়। সেদিন খবর এসেছে সন্ধ্যের সময়—নেহেরু পার্লামেণ্টে বলেছেন—তিন দিন আগে ৩১শে মার্চ তিব্বতের জীবিতবুদ্ধ বুদ্ধের অবতার দালাই লামা, তাঁর মা তাঁর ভাই বোন, তিনজন মন্ত্রী এবং দুজন শিক্ষক সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে এসে পৌচেছেন।

হায় বুদ্ধের অবতার, হায় ধর্ম, হায় ঈশ্বর! চীনের মাও সে-তুঙ অবতার নন। তিনি জনগণের ডিকটেটর। ক্ষমাহীন পরিচালক। সর্বময় অধিকর্তা। তাঁর ভয়ে জীবিতবুদ্ধ শরণ নিয়েছেন এই দুর্বল ভারতের! একটা ক্ষুব্ধ চিত্ত নিয়েই সে এসেছিল। রাজনীতির কোনটিকেই সে মানে না, চায় না, তবুও সে যখন আপন দাপটে এসে ব্যক্তিজীবনকে পর্যন্ত নাড়া দেয় তখন ক্ষুব্ধ না হয়ে উপায় কোথায়?

সেদিন স্টেজ রিহারস্যালের সময় প্রথম সিনগুলিতে সুন্দর অভিনয় করে ওই সিনে অংশুমানের কথা ধরে নববধূর ছদ্মবেশ পরে সীতা ঢুকল ঠিক কিন্তু কথা বলতে পারলে না। প্রমটার বার বার কথা ধরিয়ে দিলে—সে বলবার চেষ্টা করলে কিন্তু বলতে পারলে না।

ভিতর থেকে রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে—কি হল?

সে কিছু বলতে পারে নি শুধু থরথর করে কেঁপেছিল।

সকলে বলল—কি হল?

সীতা অসহায় ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, ঘামছিল; দরদরধারে ঘামছিল। একটু একটু হাঁপাচ্ছিল। রঞ্জন এসে বলেছিল—মিস সেন, কি হল?

সে বলেছিল—পারছি না। এ আমি পারব না রঞ্জনবাবু!

—সে কি?

—না! আমি পারব না! আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে! দেখুন!

ষোড়শী সংঘের সকলে রাগে অধীর হয়ে উঠেছিল। বিমল গুপ্ত বলেছিল—রাবিশ! প্লে বন্ধ করে দিন! রঞ্জনবাবু আর অংশুবাবু এর জন্তে দায়ী।

মাসীমা বলেছিলেন—এ যে দারুণ ন্যাকামি। আমরা পারিনে!

অংশু উঠে এসেছিল এবার, সে স্টেজে তার জায়গায় বসেই ছিল। উঠে এসে বলেছিল—সরুন তো সব। সকলেই সরে গিয়েছিল। অংশু এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল সীতার। বলেছিল—কি হয়েছে তোমার? একমুহূর্তে সেদিন তাকে 'তুমি' বলেছিল সে। কণ্ঠস্বর তার রূঢ় কঠিন।

সে কণ্ঠস্বর শুনে সীতা সকরুণভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

অংশু প্রশ্ন করেছিল—কি হয়েছে বল?

করুণ কণ্ঠেই সীতা বলেছিল—আমি পারছি না। আমি কাঁপছি! ঘামছি!

—না কাঁপছ না। ঘামছ ঘাম। পার্ট করতেই হবে!

সীতা বলেছিল—না, আমি পারব না!

খপ করে তার হাত ধরে অংশু তাকে টেনে গ্রীনরুমের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সীতা বিহ্বল হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল—কোন প্রশ্ন করতে পারে নি।

—পারবে না কেন?

সীতা এবার একলা অংশুমানকে পেয়ে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং বলেছিল—না। পারব না। আমি পারছি না! করব না আমি অভিনয়!

—কি—ভেবেছিলে কি?

—কি?

—সাহিত্যিক অংশুমান তোমার প্রেমে পড়েছে? এবং ভয় হচ্ছে, অভিনয় করতে গিয়ে তুমি তার প্রেমে পড়ে যাবে?

নির্বাক স্তব্ধ হয়ে গেল সীতা। তার সুন্দর মুখ পেন্টের রঙে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিল—সে মুখ যেন কালো হয়ে গেল। দুটি অশ্রুর ধারা তার চোখের কোল বেয়ে নেমে এল।

—কাঁদছ কেন? কেঁদে কি ফল? এদের কথা ভাবছ না তুমি?

চোখ মুছে উঠে দাঁড়িয়েছিল সীতা। বলেছিল—চলুন।

কোন উৎসাহবাক্য বলে নি অংশু—কোন সান্ত্বনা দেয় নি—দরজা খুলে বলেছিল—এস!

স্টেজে এসে বলেছিল—আরম্ভ কর। গোড়া থেকে। এই সিনের গোড়া থেকে। বিকেল থেকে সিন আরম্ভ। বিকেলের আলো—। বিকেলের আলো দাও! প্রমটার—

আরম্ভ হয়ে গেল। একপাশে উইংসের ধারে মাটির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল সীতা। মাটির দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ তার কানে এসেছিল অংশুমানের কথা—কিন্তু আজ সে আসবে। নিঃশব্দ পদক্ষেপে আসবে! আমি আমার বাঁশীর সুর ছড়িয়ে দিয়েছি। তারই সুতো ধরে এসে সে হয়তো ওই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ডাকবে—মধুকর—!

সীতা এসে ঠিক দাঁড়িয়েছিল জানালার ধারে। কণ্ঠস্বর একটু মৃদু হয়েছিল।

কে একজন বলেছিল—লাউডার।

অংশু বিরক্তিভরে বলেছিল—না! ঠিক ডাক হয়েছে। লাউডার হবে না। প্রেমের অভিনয় চীৎকার করে ঢাক বাজিয়ে হয় না। ডিস্টার্ব করবেন না। প্লিজ! তবে একটু ড্রাই হয়েছে।

আবার এই জায়গাটা থেকে আরম্ভ করতে হয়েছিল। সীতা আবার ঠিক এসে ডেকেছিল—মধুকর! তারপর চলেছিল অভিনয়ের মহড়া। আগামীকালের জন্ম প্রস্তুতি। ঠিক চলছিল! শুধু সীতা প্রাণহীন! শুধু বলেই গিয়েছিল। বলেই যাচ্ছিল প্রমটার যেমন বলাচ্ছিল। কিন্তু কেঁপেছিল সে সারাক্ষণ। মুখখানা বিবর্ণ। তবু সে পার্টটা চালিয়ে গিয়েছিল। সিন শেষ করে বাইরে এসে সে বসে পড়েছিল। অনেকক্ষণ হাঁপিয়েছিল। একান্ত অসহায়ের মত

তার সে মুখ মনে রয়েছে অংশুমানের। সেই মুখের ছায়া যেন কালকের অচেতন সীতার মুখে ভেসে উঠেছিল।

•

রঞ্জন এসে পাখাটা খুলে দিল। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে সীতা। সম্ভবতঃ কাঁদছে। অংশুমান দৃশ্য বদল হতে এসে দাঁড়াল সেখানে। বলল—মরে শুয়ে থাকার সিনে আজকে ওকে শুতে হবে না। এমনি করতে বল।

তবে স্টেজ রিহারস্তাল দেখে ষোড়শী সংঘের সভ্যদের অসন্তোষের শেষ ছিল না। অংশুমান বলেছিল—কি করব? উপায় কি? তবে—। থাক। যা হয় হবে। তার একটা প্রত্যাশা ছিল।

* * *

পরদিন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এযুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের সামনে অংশুমানের প্রত্যাশা আশ্চর্যভাবে সত্য হয়ে উঠল। সীতা এল যথাসময়ে। নীরব স্তব্ধ। এবং চোখ দুটি অত্যন্ত ধারালো মনে হল। কিছু পান করেছে কিনা সে নিয়ে মহিলারা একটু কানাকানি করলেন। কিন্তু কোন ব্যতিক্রম বৈলক্ষণ্য কেউ দেখতে পেল না। ওদিকে সীতা প্রথম দৃশ্যে ধারালো ছুরির দীপ্তি নিয়ে প্রবেশ করল। সে যখন বক্র তিক্ত হেসে বলল—যা আমার মন করায় আমি তাই করি ডাক্তারবাবু। আমার তো তা অন্যায় মনে হয় না। মনে হলে করব কেন? আর অন্যে তাকে অন্যায় বললে মানব কেন?

—মানবে না?

—না। আর পথ? কোন্ পথে মানুষ কোথায় কবে কোন্ স্বর্গে পৌঁছেছে বলতে পারেন? সেই মাটির ধুলোতেই তো সে চোখের জল ফেলে, শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর ছাই হয়ে কিংবা পচে মাটির ধুলোতেই মিশে যায়……। পাপ-পুণ্যের বিচার লোকে বলে ভগবানের হাতে। তিনি নেই বলেই আমার ধারণা। আমি মানি না। থাকলে তো এমনিতেই আমার সাজা হবে তাঁকে না-মানার জন্যে। তার উপর এই সব যদি পাপই হয় তবে তার সাজাটা বোঝার উপর শাকের আঁটিই হবে। ফাঁসির হুকুমের পর পাঁচ বছর কারাবাসের ব্যবস্থা হবে।

সে কথা শুনে লোকে শিউরে উঠল। স্তম্ভিত হল। কি প্রখরা কি উদ্ধত উগ্র মেয়ে! তারপর কিন্তু শেষ দৃশ্যে সে যখন বধূবেশে এল, তখন তার কণ্ঠ যেন বিরহবিধুরা চক্রবাকীর মত করুণ। এবং অভিনয়ের মধ্যে মনে হল অংশুমানের কাছে বসে থাকলেও একটা অদৃশ্য নদী তাদের মধ্যে বয়ে যাচ্ছে। যার অপর পারে সে বসে রয়েছে। কিন্তু সে আজও কাঁপছিল। থরথর করে কাঁপছিল। মুখের পেণ্টের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। পার্ট শেষ করে সে টলতে টলতেই বেরিয়ে গেল। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকেরা কাঁদছে। মাসীমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। বড়দিদি চুপ করে বসে আছেন। দুটি জলের ধারা তাঁর চোখের উপর চিকচিক করছে—তিনি মোছেন নি। মুছতে ভুলে গেছেন।

শেষ দৃশ্যে প্রবীণ ডাক্তার চিঠিখানা পড়েছিলেন। তারপর সুপ্রিয়া নার্সের গায়ে হাত

রেখে নাড়া দিয়ে ডাকার কথা—সুপ্রিয়া সুপ্রিয়া—মা। তাই করতে গিয়ে ডাক্তারবেশী বিমল গুপ্ত চমকে উঠেছিল। সীতা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

মাসীমা স্টেজের ভিতর ছুটে গেলেন। বড়দিদি এবং অন্য সভ্যরা ও কিছু নিমন্ত্রিতেরাও গেলেন স্টেজের মধ্যে। শচীনবাবুও গেলেন। ডাক্তারবেশী বিমল গুপ্ত স্টেজের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলেছিল—হিরোইন অজ্ঞান হয়ে গেছে। এখন—একটু—।

অর্থাৎ ভিতরে যাবেন না।

শচীনবাবু বললেন—একদিন আমার ওখানে তোমাদের সব নিমন্ত্রণ, বলো অংশুকে।

জ্ঞান হতে দেরি হয়েছিল সীতার।

স্টেজ থেকে বেরিয়ে সীতা টলতে টলতেই গ্রীনরুমে এসেছিল এবং এসেই নার্সের ভূমিকায় অল্প অল্প সেটে যেতে যেতেই পথেই লুটিয়ে পড়েছে জ্ঞান হারিয়ে। রঞ্জন তাকে তুলে পাখার তলায় শুইয়ে মুখে চোখে জল দিয়েও জ্ঞান ফেরাতে পারে নি। ডাক্তার ডাকতে হয়েছে। এর মধ্যে অংশুমানও এসেছে। সে ওর পাশে ঝুঁকে বসে আছে। ডাক্তার বলেছেন অত্যন্ত স্ট্রেন হয়েছে। খুব ইমোশনের সঙ্গে পার্ট করার জন্তে হয়েছে। এখন বিশ্রাম—ফুল রেস্ট। অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক শুইয়ে রাখুন। জ্ঞান অবশ্য একটু পরেই হবে। একটু গরম দুধ—না হলে জল দিন। ওই চোখের পাতা কাঁপছে। চোখ মেলবেন। কিন্তু ভিড় করবেন না! না।

আধঘণ্টা পর রঞ্জন সীতাকে বলল—গাড়ি আনতে বলি?

সীতা বলল—হ্যাঁ।

রঞ্জন বেরিয়ে গেল—অংশুমান সামনে চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল। সে বলল—সীতা!

সীতা তার মুখের দিকে তাকাল।

অংশুমান বলল—তোমাকে আমি ভালবাসি সীতা।

সীতা একটু হাসল কিন্তু কিছু বলল না।

রঞ্জন ফিরে এসে দাঁড়াল।—গাড়ি এসেছে।

সীতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমার মনকে আমি বুঝে দেখব অংশুবাবু। পরে—

—পরে?

—আজকেই—এখনি উত্তর চান?

—হ্যাঁ।

একটু চুপ করে থেকে সীতা বলল—না। তারপর বলল—অভিনয়—অভিনয় অংশুবাবু। ভুলে যান। অভিনয় শেষ হয়ে গেছে।

অংশুমান দৃঢ়কণ্ঠে বলল—না। অভিনয়ও সত্য হয়। জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি হারিয়ে মানুষ লুটিয়ে পড়ে ধুলোয়।

সীতা মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। অকারণে বা সাধারণের অগোচর কোন কারণে টপটপ করে চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল।

* * *

পরদিন থেকে—তাই বা কেন—সেই মুহূর্ত থেকেই সীতা এসেছিল তার জীবনে। এবং সে পৌঁছেছিল সীতার জীবনে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নয়।

মনে পড়ছে প্রথম কথাগুলো। সে নিজেই গিয়েছিল সীতার বাড়ি। প্রত্যাশা করেছিল দেখা হবে শচীনবাবুর বাড়িতে; তিনি সার্থক অভিনয় দেখে খুশী হয়ে সকলকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর বাড়িতে। কিন্তু সীতা সেখানে আসে নি। ট্যাক্সি করে নিজে অংশু গিয়েছিল তাকে আনতে। সীতা বেরিয়ে এসেছিল কিন্তু নিমন্ত্রণে আসতে চায় নি। বলেছিল—না মাফ করবেন—আর অভিনয় নয়। শেষ করেছি অভিনয়ের পালা।

অংশু বলেছিল—কিন্তু 'অভিনয় নয়ের' পালার নিমন্ত্রণ আমি তোমাকে কাল জানিয়েছি সীতা। তুমি কথায় তার জবাব দাও নি। কিন্তু চোখের জলে উত্তর দিয়েছ।

এবারও কথার জবাব না দিয়ে সীতা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

—সীতা!

—বল।

উল্লসিত হয়ে অংশু তার হাত ধরে বলেছিল—বলুনের বদলে বল বলেছ তুমি।

সীতা বলেছিল—তা বলেছি। কিন্তু অভিনয় করে আর নয়। ও আসরে তুমি আমাকে মাফ কর। আমি শচীনবাবুর বাড়িতে গিছলাম সকালবেলা। তিনি বলেছেন—সীতা, অংশু নাটক লেখে লিখবে। লিখুক। প্রয়োজন আছে। কিন্তু যদি তুমি ওকে ভালবেসে থাক তবে সীতা হয়েই ভালবেসো। হয়তো এ যুগ সীতার যুগ নয়। তবু এ যুগের সীতা হতে চেষ্টা করো।

সেদিন অংশুমান বলেছিল—তাই হবে।

* * *

কিছুদিনের মধ্যেই কানাকানি শুরু হয়েছিল পরিচিত মহলে। যে কানাকানি চিরকাল হয়ে আসছে, সমাজে সংসারে তাই। কলকাতায় সমাজ নেই, সীতা এবং অংশুর পরিচিত মহলে আছে, সেই দুই মহলই প্রখর এবং মুখর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওদের দুজনের কেউই তা গ্রাহ্য করে নি—না সীতা, না অংশুমান। কিন্তু সীতা মাসখানেক পর এসে বলেছিল—দেখ ওদের চাকরি ছেড়ে দিলাম। ওরা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে আমাদের ব্যাপার নিয়ে।

—বেশ করেছ। ওটা আমারও ভাল লাগছিল না। আমার বন্ধুদেরও ছেড়েছি এই জন্যে। রঞ্জনকে পর্যন্ত।

—একটা শান্ত সুস্থ জীবনের চাকরি খুঁজে দাও। মাসে শ'দুয়েক টাকা হলেই চলে যাবে। বাড়ি আছে। ভাড়া লাগে না। শুধু নিজের আর মায়ের খরচ।

—চাকরি করতেই হবে?

—হবে না? কারুর কাছে নিতে আমি পারব না। সে তোমার কাছেও না। তাহলে খেলাঘর পাকা-সংসারের চেহারা নেবে।

অংশু একটা চাকরিও তাকে যোগাড় করে দিয়েছিল। শচীনবাবুর সাহায্য নিতে হয়েছিল

—একটি শিশু এবং নারী প্রতিষ্ঠানের চাকরি। সেখানে শিক্ষিকার কাজ। তাতে খুশী হয়েছিল সীতা। এমনি কাজই যেন সে চাচ্ছিল। বড় বড় ধনীর বাড়ি সেজেগুজে গিয়ে মনোরঞ্জন করতে হয় না, কোম্পানির সহকর্মীদের সঙ্গেও মধ্যে মধ্যে যাওয়া আসা করতে হয় না। তাদের ইট ড্রিংক এণ্ড বি মেরী ক্লাবে হৈ হৈ করতে হয় না। স্মার্টনেসের খেলা খেলার বালাই নেই। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এ বেশ সুস্থ শান্ত জীবন—অথচ হৈ হৈ কর, তাদের নিয়ে খেলা কর, গান গাও, এ যেন একটা বড় সংসারের বড়দির কাজ। বিকেলে ছুটি। ছুটি হলেই অংশুর বাড়িতে এসে রান্না খাওয়া হাসি-ঠাট্টা অথচ একটা অতলস্পর্শী গভীর জলস্রোতকে মাঝখানে রেখে দুজনে দুপাশে বসে নির্নিমেষে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকা। সে স্রোতের খাত ওরা ইচ্ছা করে নিজেরাই খুঁড়ে রেখেছে। দুপাশ থেকে দুজনে হাত বাড়িয়ে পরস্পরকে ছুঁতেও পারে। সে ছোঁয়ার স্পর্শ দুজনের কাছে দুজনকেই আরও রমণীয় করে তোলে। তাই তাদের সারা জীবনের পাথেয়—এইভাবেই চলবে তারা জীবনে। তার বেশী নয়। ওই জলস্রোতে দুজনে পড়ে দুজনকে জড়িয়ে ডুবে ওরা মরবে না—মরতে পারবে না।

ফলে দুর্নামের আর অন্ত রইল না। তাতেও ওরা গ্রাহ্য করলে না। সীতার মা বিরূপ হলেন। ভাইরা প্রায় ক্ষেপে গেল। ওদিকে এই দুর্নামের জন্যে সীতার চাকরিটাও গেল।

অংশু বললে—তুমি ভেবো না এর জন্যে। আমার কাছ থেকে তুমি কিছু টাকা নাও। ধার বলে নাও। নিজে স্বাধীনভাবে কিছু করে আমায় শোধ দিয়ো। টাকাটা দিয়ে—

সীতা নতুন করে পড়তে শুরু করেছিল। এক বছর পর আই-এ পাসও করেছিল।

অংশু বলেছিল—এবার পড়া ছাড়।

সীতা বলেছিল—না। আমাকে তোমার যোগ্য হতে দাও।

ভুল বোধ হয় ওইখানেই হয়েছিল।

চিরাচরিত ধারায় এবং পথে সীতা তার যোগ্য হতে চেয়েছিল।

সে নিজেও কি ঠিক তাই চায় নি? শচীনদা সেদিন ছিলেন না। তিনি চলে গেছেন। তিনি সীতাকে বলেছিলেন—যদি ভালবাসো তা হ'লে সীতার মতই ভালবেসো। সীতা হয়েই ভালবেসো।

সেই সীতার মত—

'কায়েন মনসা বাচা' কায়মনোবাক্যে এক হয়ে ভালবেসো।

কল্পনা করতে তারও তো মন্দ লাগে নি। সে যদি বনবাসে যায় তবে সীতাও যাবে বনবাসে তার সঙ্গে। সোনার হরিণ ধরে দিতেও বলবে।

এ কালের মেয়েদের মত বন্ধু-বান্ধব থাকার কথা তো কল্পনা করে নি। মিছিলধারিণী ধ্বজা পতাকা বাহিনী রাজনৈতিক কর্মে নিয়োজিত-প্রাণা সীতার কথা কল্পনা করে নি।

তারা তাদের সমবয়সী বন্ধুদের বিচিত্র সহজ আধুনিক ছন্দে 'তুই' বলে; 'শোন্' বলে; 'ওরে' বলে; তাদের ভ্যানিটি ব্যাগে প্রসাধন দ্রব থাকে না, বিস্ফোরক পদার্থ থাকে। ছুরি থাকে ছোরাও থাকে। যারা রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব রাখে না তাদের ব্যাগে কি থাকে? সব—সব—সব থাকে, বা থাকতে পারে। একটি মেয়ের জীবনে যা প্রয়োজন হ'তে

পারে তাই থাকতে পারে।

সীতা তা পারে নি। সেও পারে নি।

কেন পারে নি?

কেন এমন হ'ল? এমন করে সব পাল্টে গেল কেমন করে?

দুই হাতে মুখ ঢেকে ভাবে অংশুমান।

সীতা এবং তার জীবন ঘটনা-চক্র বা ঘটনা-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে পরস্পরের দিকে এগিয়ে মিলতে এসেছিল এবং মিলতে চেয়েওছিল। কিন্তু আগেকার সমস্ত কালের সমস্ত বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে নূতন কোন বিধানের সাঙ্কেশন নিয়ে মিলতে চেয়েছিল; সেও চেয়েছিল সীতাও চেয়েছিল। শচীনদার ওই সীতা হয়ে মিলবার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে মনের ঘরের কুলুঙ্গীতে বেলপাতার মত রেখেও, চেয়েছিল। আবার বিবাহের চেয়ে বড়, এক-সঙ্গে অধিকতর বাস্তব এবং পবিত্রতর এক মিলনকে রূপ দিতে চেয়েছিল জীবনে। কিন্তু সব যেন কোন একটা অতি প্রচণ্ড শক্তিশালী অনিবার্যতা এসে ব্যর্থ করে দিল, তছনছ করে দিল।

১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত, মাস দিন এক একটি ক'রে গুণে হবে দু বছর সাত মাস কয়েক দিন।

এ সময়ের ডায়রী আছে তার।

জীবন তাদের আশ্চর্যভাবে মুখ ফেরাতে সুরু করেছিল।

মুখ ফেরাতে মানে, বাইরের জগতের সমস্ত ঝড়ঝাপটা বিক্ষোভ থেকে মুখ ফিরিয়ে দুজনে দুজনের দিকে মুখ করে একটু একটু করে এগিয়ে আসছিল।

পরিবর্তন তার থেকে যেন সীতার বেশী।

সে প্রতিষ্ঠার দিক থেকে মুখ ফেরাতে পারে নি। সভা সমিতি আন্দোলন এ সব থেকে একেবারে সংস্রব ছিন্ন করতে পারে নি।

সীতা পেরেছিল।

সীতা প্রথম পড়েছিল পড়া নিয়ে। এক বছরের কমাস বেশী সময়ের মধ্যে আই-এ পাশ করেছিল সে। পড়ছিল বি-এ। সকালে বা দুপুরে আসতো বাড়িতে, রান্নাবান্না কিছু করত নিজের হাতে, কিছু করাতো ভরত-হরিকে দিয়ে; (চাকরের আসল নাম বোধ হয় ভর্তৃহরি, তার থেকে ভরত-হরি। অংশুমান কখনও তাকে 'ভরত', কখনও বা 'হরি') নির্জন দ্বিপ্রহরে দুজনে খেতে বসত, গল্প করত। পড়াশুনার গল্প, জীবনের তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক; সে বিতর্কের মধ্যে সীতা চলে যেত, পৃথিবী পার হয়ে অন্য কোন গ্রহে, অংশুমানকে বলত, তুমি অংশুমান হয়েই তোমার আলো পাঠাবে আমার বুকে।

অংশুমান কিন্তু দুবছর পূর্ণ হ'তে হ'তেই অনুভব করলে—কোথা থেকে যেন উত্তাপ বিকীর্ণ হচ্ছে।

ক্রমে ক্রমে সে অনুভব করলে সে উত্তাপ তারই নিজের মনের অন্তর্লোক থেকে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু বলতে যেন সংকোচ হত।

সীতা? সীতার কথা সীতা জানে।

বিচিত্রভাবে নিজেদের একটা খুব আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে পরস্পরের কাছে মৃত ঈশ্বর বা বর্তমান কালের সব ধ্বংস করা যে জীবনতত্ত্ব তার নাম নিয়ে শপথ করেছিল—পরস্পরকে, আমরা বাঁধব না—বিবাহ নয় বন্ধন নয়,—দেহ দেওয়া নয় মন বিনিময় ক'রে—সে এক বিদেহী অস্তিত্বের মত মিলন একটা—।

একদিন সে সীতাকে বললে—সীতা আমি যে আর আত্মসম্বরণ করতে পারছি না।

সীতা হেসে বলেছিল—আমাদের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ কর। মনে নেই?

বাইরে একটা মিছিল যাচ্ছিল। ১৯২২ সাল সেটা।

চীনের আক্রমণ নিয়ে সোর উঠেছে তর্ক উঠেছে।

সেই সব শ্লোগান উঠছিল।

রাস্তার ওপাশের একটা নতুন রঙ ফেরানো বাড়ির দেওয়ালে শ্লোগানগুলোর কতকগুলো লেখা ছিল। সীতা এবং অংশুমান সেই লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে বসেছিল। পরস্পরের দিকে যেন তাকাতেও ঠিক পারছিল না।

যতক্ষণ ধরে মিছিলটা না-পার হয়ে গেল ততক্ষণ দুজনে কথা বলতে পারে নি। ওরা চলে গেলে অংশুমান ডেকেছিল—সীতা!

সীতা সাড়া দিয়েছিল—বল।

—আমি কি বলব—তুমি বলবে। আমি যা বলবার বলেছি।

সীতা বলেছিল—না বল নি। বন্ধুত্বের লক্ষণের গণ্ডী থেকে তুমি যখন বেরিয়ে কাছে আসতে বলছ তখন কোন নতুন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ বল। আমি নারী তুমি পুরুষ, আমার অতি নিকটতম কাছে তুমি আসতে পার। কিন্তু রাবণের মত নয়।

মুহূর্তে অংশুমানের মনে হয়েছিল—সীতা কৌতুকোচ্ছলা হয়ে উঠেছে। এবং উত্তরও দিয়েছিল সেই ঢঙে। বলেছিল—বল তা হ'লে কোন হরধনু ভাঙতে হবে।

সীতা বলেছিল—না অংশুমান, আমি কৌতুক বা পরিহাস করিনি। রাবণের কথাটা বলেছি—তার কারণ রাবণ হওয়া সোজা। কিন্তু বাল্মীকির রাম সীতা হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সে দুঃখ আমার সইবে না। তোমাকে জানি তুমি রামের নামে ঠাট্টা করে অট্টহেসে উঠবে। আমি লাঙলের ফালে ওঠা বসুন্ধরার মেয়ে নই। সাধারণ একটি মেয়ে, আমি আমার জীবনে যাকে অংশীদার করব সে আমার বর হবে আমি তার বধূ হব। তুমি আমাকে স্বামী হবার প্রতিশ্রুতি দেবে আমি তোমাকে স্ত্রী হবার প্রতিশ্রুতি দেব। বল কোন্ মন্ত্রে আমাকে গ্রহণ করবে বল?

—মানে বলছ—কি মত? তোমরা ক্রিশ্চান আমরা হিন্দু, যদিও তা নই আমি। তবুও কোন্ মতে হবে জিজ্ঞাসা করছ?

—হ্যাঁ।

গম্ভীর হয়ে উঠেছিল সে। বলেছিল—তার প্রয়োজন কি?

—প্রয়োজন নেই? চমকে উঠেছিল সীতা।

—কি প্রয়োজন ?

অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সীতা বলেছিল, অত্যন্ত ধীর ভাবে এবং মৃদুস্বরে বলেছিল—আমাকে ঘরণী করে আনবে—আমি ঘর চাইব—

—কেন এই বাড়িখানাই আমার বাড়ি—

—সে বাড়ি কাল কাউকে বিক্রী করলে অন্যের হবে। আমি যে ঘর চাইছি সে ঘর বাসাতেও পাতা হয়, গাছতলাতেও হয়, পাহাড়ের গুহার মধ্যেও হয়। আমার সংসার চাই—আমি সংসার পাতব।

—সীতা!

—বল!

—বিবাহ মানে মিথ্যা ঈশ্বরের শপথ করে মন্ত্র পড়ে বিয়ে কি রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে কোনটাকেই আমরা মানি নি এতদিন। তুমিও না—আমিও না। আজ তুমি তা চাও কেন ? কিসের ভয় তোমার—

একটু ভেবে নিয়ে সীতা বলেছিল—ভয় নয় অংশু। আমি তোমার সংস্পর্শে এসে অনেক বদলে গেছি। দেখ পুরুষ আর নারী যখন সামনা-সামনি দাঁড়ায় তখন চোখে, সারা দেহে, নিঃশ্বাসের উত্তাপে পরস্পরের জন্যে পরস্পরে চঞ্চল হয় প্রকৃতির নিয়মে। মানুষের প্রকৃতির নির্দেশ বেরিয়ে আসে মন থেকে। সে মন বলে, ওকে আমি চিরকালের জন্য চাই। চিরকালের জন্যই ওর একান্ত নিজস্ব হতে চাই। আর কাউকে চাইনে—মনে চাইনে, দেহে চাইনে—এমন কি কথার কথাতে চাইনে। ভালবাসা—

বার বার ঘাড় নেড়ে অংশুমান বলে উঠল—না সীতা। না। এ ভ্রান্তি—সাময়িক মোহ—এ সেই মিথ্যের পুনরুক্তি।

—তা হলে আমি উঠলাম অংশুমান।

চমকে উঠেছিল অংশুমান, বলেছিল—চললে কি ? সীতা!

—হ্যাঁ আমি চললাম। তুমিও ভেবে দেখো। আমিও ভেবে দেখব। যদিও আমার মনকে আমি জানি, ভেবে দেখবার কিছুই নাই—তবু বলছি ভেবে দেখব। তোমার দিকে 'আমি' আর তাকাতে পারছি না অংশুমান। আমি—।

চলে গিছল সীতা। বোধ করি 'আমি' বলে যে কথা বলতে চেয়েছিল তার ওই সুরু আমি শব্দেই সীতা কেঁদে ফেলেছিল। অংশুমান আর তাকে ফেরাতে চেষ্টা করে নি। সে ভাবতে বসেছিল।

না। না। না।

কিছুতেই সে ওই পুরানো প্রতিশ্রুতির মিথ্যার বোঝাকে সত্য বলে মাথায় ঠেকাতে পারবে না। বিবাহের চেয়ে বড়, শেষের কবিতার ভালবাসা, এ সবের উপরেও তার আর মোহ নেই। এ কল্পনাও মিথ্যার চেয়েও মিথ্যা। অসার। বস্তুজগতে বাস্তববাদী মানুষ সে। তার কাছে বিংশশতাব্দীর এই সপ্তম দশকে ইতিহাসের চরম যাচাইয়ে সব মিথ্যা, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। যা সে বিশ্বাস করে না।

হায় সীতা! তোমার পরিণতি শেষে এই হ'ল? কয়েক মিনিট চুপ করে ব'সে থেকে সে উঠে গিয়েছিল ঘরের ভিতর। ডায়রীটা এবং কলমটা এনে লিখতে বসেছিল।

কথাগুলি লিখে সে রাখতে চায়।

লিখেও রেখেছে। কাটা কাটা ছাড়া ছাড়া কথা। এই লেখা যে পরে সে কতবার পড়েছে তার ঠিক নেই।

আরও একটা প্রসেসন এসেছিল সেই সময়। ময়দান চলেছে সব। বড় সভা আছে। সীতা চলে যাবার এবং লিখবার জন্য কলম ধরার পাঁচ সাত মিনিট পর্যন্ত সেটা চলেছিল।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ তো প্রথম কথা বটেই। এ ছাড়াও মনে পড়ছে কোন কিছুর বিচার চাই শ্লোগানও ছিল। সম্ভবতঃ কংগ্রেসী নেতাদের বা মন্ত্রীদের। বে-আইনী আইন চলবে না চলবে না চলবে নাও ছিল।

ডায়রীতে সে সেদিন—নাটকের দৃশ্যে লাগাবার মত করে নিয়ে লিখেছিল—। এবং তার নতুন নাটকের মধ্যে সে তা লাগিয়েছে। মানুষ এ কথাগুলোকে মন দিয়ে শুনেছে; হাত-তালি দিয়েছে, ভাবিয়েছে।

কত শত সহস্র বৎসর ধরে মানুষ একটি প্রতিশ্রুতিতে নিজেকে আবদ্ধ করতে চাইছে—সঙ্গে সঙ্গে পরকেও দিচ্ছে একটি প্রতিশ্রুতি। কিন্তু প্রতিশ্রুতি সে রাখতে পারে নি। নিজেই নিজেকে ঠকিয়েছে। নিজের কাছে দেওয়া নিজের শপথ ভেঙেছে। পরকে দেওয়া শপথ ভেঙেছে। ন্যায়ের প্রতিশ্রুতি—নীতির প্রতিশ্রুতি—সত্যের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল। মিথ্যা হয়ে গেল। প্রমাণই হ'ল না কোনটা ন্যায়, কোনটা নীতি, কোনটা সত্য।

দুর্যোধনেরও একটা সত্য ছিল।

যুধিষ্ঠিরেরও ছিল।

ব্যাসদেব স্বর্গলোকে দুর্যোধনকে ইন্দ্রের সঙ্গে সমাসনে বসিয়ে তাকে তার প্রাপ্য দিয়েছেন। অবহেলা করতে পারেন নি। আবার যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গলোকে প্রথম নরক দেখিয়ে তবে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তা দিন। কিন্তু যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ্য স্থাপনের প্রতিশ্রুতিতে ব্যর্থ হয়ে মাথা নিচু করে স্বর্গের পথে হেঁটেছেন।

মনে পড়েছে বলহীন অর্জুনের হাত থেকে যদু কুলবধূদের জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ব্যাধেরা শবরেরা। এবং বধূগুলির একাংশ উচ্চহাস্য করতে করতে শবরদের আলিঙ্গন ক'রে তাদের সঙ্গিনী হয়েছে। যাবার সময় মৃত ভর্তাদের উদ্দেশে তারা যে থুথু ছুঁড়েছিল তা তাদের নিজের গায়ে পড়ে থাকলে তাই মেখে তারা প্রসাধন করেছে। হায় ধর্মরাজ্য! কাটা ঘুড়ির মত ভাসতে ভাসতে চলে গেল কোন্ নিরুদ্দেশে। হায় প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতির মধ্যেই মানুষের সভ্যতার জন্ম। মানুষ মানুষ হ'ল। জন্তু থেকে মানুষ হ'ল। ধর্ম ধরে দাঁড়াল। ধর্ম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—ধর্ম ঈশ্বরকে জানে—সে ঈশ্বরের প্রসাদ দেবে, তাঁর বাণী দেবে, তাঁকে এনে দেবে মানুষের কাছে, মানুষ সব পাবে। এ প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হয়ে গেছে। ধর্মের সব শপথ মিথ্যা—সব প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ।

তারপর রাষ্ট্র দিয়েছিল প্রতিশ্রুতি। সমাজ দিয়েছিল প্রতিশ্রুতি। অন্ন বস্ত্র শান্তি সুখ।

তাছাড়া আরও অনেক কিছু, তার স্বাধীনতা, তার সঙ্গে আরও কিছু। ওই ঈশ্বরের মত কিছু।

তাও সব ব্যর্থ হয়ে গেছে।

বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের সমস্ত ব্যর্থতা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠেছে—

ইনকিলাব—জিন্দাবাদ।

ওই যে যারা চীৎকার করছে ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়—তাদের শ্লোগান ওই সঙ্গে বলছে—বিলকুল সব ঝুট হ্যায়।

এমন ভাবে পৃথিবীর সকল প্রতিশ্রুতি, সকল তপস্যা মিথ্যা হয়ে যাওয়ার হতাশায় ক্ষোভে মানুষ আর কখনও এমন ক্ষুব্ধ হাহাকার ক'রে ওঠে নি। সব ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে আবর্জনার মত। ভাঙা ফুটো উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের মত।

সীতার বদলে এই মুহূর্তে তার অর্ধসমাপ্ত জীবন নাটকের নায়িকা হবার জন্য নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি ক'রে নমিতা মুখ বাড়ালে।—হ্যালো হ্যালো অংশুমান।

—কে?

—আমি কোন একজন নমিতা। চিনতে পার।

নমিতা তার বউদির বোন, যে তাকে উপেক্ষা ক'রে অল ইণ্ডিয়া সার্ভিসের একজন পান্টীঘরের নবীন ভদ্রাসন্তান চাকুরেকে বিয়ে ক'রে তার চোখের এলাকা থেকে দূরে চলে গিছল। যাকে সে লক্ষীর বাহন পেঁচা বলে এ সেই।

একেবারে নাটক সৃষ্টি ক'রে ঢুকল নমিতা। টেলিফোন বেজে উঠল।

ওই দিনই, যে দিন সে, সীতা চলে যাবার পর এবং প্রসেসনটা চলে যাবার পর ওই হঠাৎ ওঠা চিন্তার টুকরোগুলোকে ডায়রীতে লিখে রাখছিল—তখনই লেখার মধ্যে বাধার সৃষ্টি ক'রে টেলিফোনের রিঙ বেজেছিল।

দমদম এরোড্রোম থেকে টেলিফোন করছিল নমিতা।

—অংশুবাবু, আমি নমি। চিনতে পারছো আমাকে?

প্রথমটায় এক কথায় চেনা যায় নি। নমিতা নামটা তার জীবনের পথে কয়েকটা মাইল পোষ্টের গায়ে গায়ে খোদাই হয়ে আছে, তবু এক কথায় চিনতে পারে নি অংশু। অংশু ভাবছিল সীতার কথা। নমিতার কণ্ঠস্বর তাকে চমকে দিলে। সে আর দুটো লাইন লিখে ডায়রী বন্ধ করে উঠল।

সে লিখলে—"দেহের যে দেহের কাছে একটা প্রতিশ্রুতি আছে সীতা!

সে প্রতিশ্রুতি রক্তের স্রোতে স্রোতে কল্লোলিত। চোখের পাতায় দৃষ্টিতে বিদ্যুতের মত অহরহ প্রবাহিত। মুহূর্তে চমকে ওঠে।

দেহে বাস ক'রে দেহাতীত হ'তে চেয়ো না। তার নাম মৃত্যু।

মনের দোহাই দিয়ে নরনারীর প্রথম অধিকারকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তাকে চুলে আঠার

পাকিয়ে জটা করে তুলো না।"

এই পর্যন্ত তার ডায়রীতে লেখা আছে। তার পর আর নেই।

নমিতা এসে গেল।

নমিতা টেলিফোনের ওদিক থেকে মনে করিয়ে দিল—নমিতা তোমার বউদির বোন। তোমার এককালের কাব্যের নায়িকা। আমার জন্তে বিবাগী হয়ে তুমি বিয়ে করলে না। আমি কি করব বল? ওরা ধরে বেঁধে ফরেন সার্ভিসের অফিসারের কোটের সঙ্গে আমার শাড়ীর আঁচলখানা সেফটিপিন দিয়ে জুড়ে দিলে। প্রথম নেশা লাগল। সেই নেশায় উড়ে চলে গেলাম। অনেক দেশ ঘোরা হয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে দেশে ফিরেছি কিন্তু দেখা করি নি।

হঠাৎ চাপা হাসি যেন মিহি কণ্ঠস্বরের রেশমী চাদরের হিল্লোল বেয়ে এক ঝলক বাতাসের মত এসে তার কানে পৌছেছিল।

এ বাতাস সেই বাতাসের ঝলক—যাতে অলস ভ্রমরের কাছে নিয়ে আসে ফুলের গন্ধ। অংশুমানের চিত্ত চেতনা যেন চমকে জেগে উঠেছিল। সে সাগ্রহ উল্লাসে বলে উঠেছিল—নমি। আমি আর তুমি, অংশু আর নমির নমি।

—হ্যাঁ—ভুবন ভ্রমিয়া শেষে ফিরেছি তোমার দেশে। এবং পতিদেবতার সঙ্গে ঝগড়া করে ফিরেছি। তাই তো কাস্টমসএর বেড়া না-পার হ'তে হ'তেই তোমাকে খবর দিচ্ছি। তুমি এস। আমাকে সাহায্য কর। একেবারে কোন হোটেলে। বুঝেছ। পুরো স্বাধীন আমি। না। বাড়ির তাঁবেদারী এবং শুভাশুভের খবরদারীর মধ্যে আর না। এনাফ অফ ইট। যথেষ্ট হয়েছে অংশু। ওই সব অর্থহীন ঈশ্বর ধর্ম সভতা সতীত্ব ন্যায় নীতি ও সব দিয়ে আর চোখে কাপড় বেঁধে কানামাছি খেলতে রাজী নই আমি। হ্যাঁ তুমি এস।

আশ্চর্য রূপসী এবং উচ্ছল যৌবনা হয়েছে নমিতা। সর্বাঙ্গে বিশ্ব-সভ্যতার সেই শাখায় ফোটা ফুলের গন্ধ বর্ণ মোহ, যে শাখায় ফুল ফোটাতে প্রয়োজন হয় প্রচুর বিলাসের, অগাধ ঐশ্বর্যের।

কাস্টমসের বেড়ার গায়ে দাঁড়িয়ে সে পথের দিকেই তাকিয়ে ছিল। অংশুমানের মনে পড়েছিল উর্বশী কবিতার কটি ছত্র।

নহ বধূ নহ কন্যা সুন্দরী রূপসী। মনে পড়েছিল—তব স্তনহার হতে—। বুকের মধ্যে তার রক্তধারা নাচা নূতন নয়। কিন্তু এমন ক'রে কখনও সে বিহ্বল হয় নি।

নমিতা তাকে বলেছিল—কেমন দেখছ? খুব সুন্দর হই নি?

—হয়েছ।

—সে তো জানি। কিন্তু কেমন তুমি বলবে তো!

—বলব, অপূর্ব।

—যদি বলি তোমারই জন্তে।

—বলব মিথ্যে কথা।

—কেন ?

—তা জানিনে। তবে নিজের কথা জানি সেইটে বলি। বলি—দেহ দেহকে টানে এটা বাস্তব সত্য। কিন্তু মন মনকে টানে এটা মিথ্যে কথা। এই মুহূর্তে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতেও সংকোচ হচ্ছে না।

নমিতা অত্যন্ত সহজ হাসিতে যেন অকপট ভাবে স্বীকার করে বলেছিল—যা বলেছ। ওর মত মিথ্যে আর হয় না। এ যুগে যখন সমাজের ভয়, পাতিত্যের ভয়, শাস্ত্রের শাসনভয় ঘুচে গেছে তখন স্বীকার নিশ্চয় করতে হবে এ যুগে কেউ একজনের একা নয়। এবং তোমারও নই তা বলব না।

একটা নামজাদা হোটেলে সে তাকে তুলে দিয়ে এসেছিল। এবং সে দিন সে প্রমত্তের মত ছুটেছিল অতসীর খোঁজে।

গিয়েছিল সে অতসীর খোঁজে কিন্তু সীতাকেই তার সারাক্ষণ মনে পড়েছিল ট্যাক্সির মধ্যে। এ যুগের সকল ক্ষোভ সকল অবিশ্বাসের রূঢ়তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে সীতার ছবিকে মনের মধ্যে থেকে দূর করে দিতেই সীতাকে তাড়াবার জন্তেই সে অতসীকে মনে করেছিল। নমিতাকে মনে করতে তার ভাল লাগে নি। নমিতার দেহ নিয়ে কোন আকর্ষণ তার ছিল না, তা সত্য নয়, আকর্ষণ ছিল কিন্তু কোনও একটা বিচিত্র বোধ তাকে যেন বাধা দিয়েছিল।

মন তার উৎসাহিত না হয়ে পিছিয়ে এসেছিল।

সন্ধ্যায় নমিতার হোটেলেই মদ্য পান ক'রে ছুটে গিয়েছিল অতসীর সন্ধানে। নমিতা তাকে আকর্ষণ ঠিক করে নি। অতসীর কাছে তার কোন সংকোচ নেই। না—নেই।

কোন অপরিণত কৈশোরে দেহের আকর্ষণে সে এবং অতসী পরস্পরে মিলিত হয়েছিল। তার মধ্যে মন থাক বা না-থাক প্রকৃতির একটা অনিবার্য আকর্ষণ নিতান্ত ভ্রূণের মতই ছিল। বাস্তব হয়তো, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়, হয়তো নির্লজ্জ, কিন্তু কদর্য নয়। নমিতা দেহের আকর্ষণের মধ্যে বিলাসের নানান উপকরণে সাজিয়ে লালসাকে উদ্রিক্ত করে কেমন যেন অপরিচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অপবিত্র বলবে না। না। অতসী অপবিত্র। অতসীকে কিন্তু পায় নি। সে বয়ে গেছে আর ফেরে নি।

* * *

নমিতা মূর্তিমতী আধুনিকা ; ধনতান্ত্রিক দেশের আধুনিক যুগই যেন সে। অংশুমানকে নূতন করে কামনার শিখায় উজ্জ্বল এবং উত্তপ্ত করে জ্বালিয়ে দিয়ে আবার মাস দেড় দুই পরে চলে গেল। ঝড়ের মতই এসেছিল, ঝড়ের মতই চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—'ইউরোপে এস অ্যামেরিকায় এস। কি হবে তোমার বাংলায় বই লিখে ? এখানে জীবন কোথা। আমাকে দেখ! এ দেশে তুমি আমাকে স্পর্শ করতেই পারলে না। আমার তাতে ক্ষোভও নেই দুঃখও নেই। দেখ।'

নমিতা এ দেশের সংজ্ঞায় অসুখী। তার স্বামী তাতে তৃপ্ত নয়—তাতে আবদ্ধ নয়, সেও নয়। নমিতার এতে কিছু আসে যায় না।

নমিতাকে প্লেনে তুলে দিয়ে ফিরে এসে সে নাটক লিখবে ভেবেছিল। আবার সে কেঁদে

বসেছিল সেই পুরনো অসমাপ্ত নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক। মহাভারতের সত্যবতীকে নিয়ে নাটক। এবার নাম দিয়েছিল—'স্বর্ণমৃগী'।

প্রথম অঙ্ক—পরাশর ও সত্যবতী।

প্রায় দু'মাস পরে এল সীতা। সীতা দু'মাস পরে আসে নি। সীতা এসেছে ফিরে গেছে। অংশুমানের সঙ্গে দেখা হয় নি। অংশুমান নমিতার সঙ্গে ফিরেছে। কোন দিন বাড়ি ফিরেছে কোন দিন ফেরে নি।

সীতাকে দেখে অংশু যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। হয়তো বিবর্ণ। কিন্তু সীতা তাকে কিছু বলে নি।

বলেছিল—এত কি কাজ ছিল তোমার নমিতার সঙ্গে?

চমকে উঠেছিল সে।—নমিতার সঙ্গে?

সীতা বলেছিল—আমি জানি।

অংশু বলেছিল—ভাবছিলাম অ্যামেরিকা যাব।

—ও।

একটু পরে সীতা আবার বলেছিল—কি হল বল তো?

—কি হবে?

—এমনি করে বদলালে?

—বদলেছি? না। একটু পর বলেছিল—নতুন নাটক লিখছি। ভাবছি নিজেও নামব।

—আবার নাটক? নিজেও নামবে?

—নইলে?—

সীতা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে চলে গিয়েছিল।

আরও বদলাল অংশু। সে চলে যেত—বাড়িতে থাকত না। সীতা এসে বসে থেকে বাড়ি ফিরে যেত। খাবার তৈরি করে রেখে যেত।

যেদিন দেখা হত সেদিন জিজ্ঞাসা করলে বলত—কাজ ছিল। পাবলিশারদের সঙ্গে হিসেব চলছে। ঝগড়া হয়েছে। বই তুলে অন্য জায়গায় দেব। তার জন্যে যেতে হচ্ছে। কিংবা বলত—মিটিং ছিল।

একদিন বললে—একটা অভিনয় হবে। তাতে হিরোর পার্টের জন্যে ধরেছে। তাই গিয়েছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে সীতা বলেছিল—অভিনয় করবে?

—শক্ত পার্ট—

সেইদিন যাবার সময় সীতা বলেছিল—কাল আমি আসব না।

অংশু বলেছিল—ঠিক আছে। আমারও কাজ আছে।

—সেও আমি জানি।

—জান? আমি তো তোমাকে বলি নি।

—বল না তো কোন দিনই। আমি এসে ফিরে যাই।

চুপ করে থেকেছিল অংশুমান, জবাব দিতে পারে নি। জবাব খুঁজে পায় নি।

সীতা বলেছিল—আরও একটা কথা বলি।

না থেমেই সে বলেছিল—আর আসব না।

—আসবে না? মানে?

—ভাল লাগছে না।

—সীতা!

—তোমারও ভাল লাগছে না অংশু। তুমি বলতে পারছ না। খেলাঘর ভেঙে চলে যাবার সময় হয়েছে—

অংশুমান উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করেছিল। সীতাও উঠেছিল। কিন্তু অংশুমান বলেছিল—যেয়ো না।

—বল কি বলবে? রাত্রি অনেকটা হয়েছে।

—আজ যেয়ো না।

—অংশু!

অংশুমান তার হাত চেপে ধরে বলেছিল—না।

সীতা বলেছিল—অংশু!

—না! না! না!

সে পুরুষ!

বিংশ শতাব্দীর একষট্টি সালে তার বয়স তিরিশ বৎসর। সে বলেছিল—না যেতে পাবে না আজ!

* * *

স্মরণ করতে করতে অস্বস্তি বোধ করলে অংশু। জীবনে তার এই একটি অশান্তি অস্বস্তি। সকালে উঠে সীতা সেই চলে গেল। আর এল না। সেদিন সে উঠবার আগেই সীতা উঠে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় শুধু বলেছিল—এ কি হল বল তো?

অংশুমান উত্তর খুঁজে পায় নি।

সেদিন সকালে উঠে অংশু অশান্তি ভোগ করেছিল—দারুণ অশান্তি আর অনুশোচনা হয়েছিল—সে করলে কি? এ কি করলে সে! আশঙ্কা করেছিল—সীতা আসবে। এসে—। এর পর সে ভাবতে পারত না। সে একটা শব্দ করে উঠত। বিরক্তিসূচক শব্দ। কখনও—আঃ! কখনও—ছি ছি! কখনও মুখে কোন শব্দ করত না—অস্থির হয়ে উঠত।

কিন্তু সীতা আর আসে নি। চার বছর হয়ে গেল। রঞ্জনকে দিয়ে খোঁজ করে জেনেছে সীতা এখান থেকে চলে গেছে। সীতার মা মারা গেছেন। সীতাকে তিনি তাঁর বাড়ির অংশ দিয়ে গেছেন। সেই বাড়ির অংশ বিক্রি করে সে চলে গেছে। কোথায় গেছে ভাইরা

বলতে পারে না। জানে না তারা।

তাদের দুরন্ত ক্রোধ সীতার উপর ; কারণ মায়ের দেওয়া বাড়ির অংশ সে তাদের না দিয়ে চড়া দামে অন্য একজনকে দিয়ে গেছে। উত্তর কলকাতার বাড়ি, বেশ কয়েক হাজার টাকাই সে পেয়েছে।

সংবাদে বিস্মিত হয় নি অংশুমান। সীতা জীবনের হিসেবে পাকা। তা না হলে তার সঙ্গে ঘর বাঁধবার দাবি নিয়ে এসে ঘর বেঁধে বাকী জীবনটা অশান্তির আগুনে নিজেও জলতো, তাকেও জালাতো। তা সে করে নি।

অংশুমান সীতাকে মন থেকে মুছে ফেলে আবার তার জীবনের পরিত্যক্ত পথে ফিরে এল এবং দ্রুততর পদক্ষেপে যাত্রা শুরু করলে।

ছুটে চলেছিল সে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কয়েকটা বছরের সঙ্গে।

সীতা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে অংশুমান ভুলতে চেষ্টা করেছিল। অন্যায়ের কোন অনুশোচনা তার মনের মধ্যে এতটুকু অস্বস্তি রেখে যায় নি। যুগের সঙ্গে চলমান মানুষ সে। উরি গাগারিনের সঙ্গে সে শূন্যলোক পৃথিবী পরিক্রমা করে এসেছে। হাংগেরীর সময় সোবিয়েতের প্রতিবাদ করেছে। তাইওয়ানে অ্যামেরিকার প্রতিবাদ করেছে—ভিয়েৎনামে অ্যামেরিকার প্রতিবাদ করেছে। কেনেডীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। জওহরলালের মৃত্যুতেও কেঁদেছে। বিধান রায়ের মৃত্যুতেও বিষণ্ণ হয়েছে। কালের প্রবল স্রোতের টানে ভেসে চলেছিল তীব্রতম বেগে।

হঠাৎ কাল—। ১৯২২৷ সালের ১০ই জানুয়ারী।

কাল সে গিয়েছিল ইউ-এস-আই-এস্-এ।

নিজের নাটিকাগুলিকে নিয়ে একটি নাটিকা-সপ্তাহ করবে ঠিক করেছে। তাতে সে শুধু নাট্যকার এবং অভিনেতাই হবে না, নিজেই পরিচালনা এবং প্রযোজনা করে পরিচালক-প্রযোজকও হবে। সেই প্রোডাকশন সম্পর্কে বই সে ঘাঁটছিল—অ্যামেরিকান প্রোডাকশনের বই। এজন্যে শুধু সে ইউ-এস-আই-এস্-এই যায় না, রাশিয়ান এম্বাসী এবং সোবিয়েত দেশের আপিসেও যায়। সেই জন্য কাল ইউ-এস-আই-এস্-এ গিয়ে হঠাৎ চৌরিঙ্গীর পথে সমবেত কণ্ঠের জিন্দাবাদ মুর্দাবাদ আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসে দেখেছিল ছাত্রদের লম্বা শোভাযাত্রা চলেছে। তরুণ-তরুণী থেকে ছোট ছোট বাচ্চা পর্যন্ত। ফেস্টুন প্লাকার্ড নিয়ে আওয়াজ দিতে দিতে চলেছে—

—ভিয়েৎনাম থেকে—

—হাত হঠাও!

—অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদ—

—মুর্দাবাদ!

—ভিয়েৎকং মুক্তিসেনা—

—জিন্দাবাদ!

—লং লিভ—

—রেভেল্যুশন!

তাদের পাশে পাশে পুলিস চলেছে। পুলিসের জীপও আছে। ইউ-এস-আই-এস্'এর পাশটা—পুলিস কিছু দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। একবার এমনি একটা অ্যামেরিকাবিরোধী মিছিল ইট মেরে ডাণ্ডা মেরে ইউ-এস-আই-এস্'এর কাচগুলো ভেঙে দিয়েছিল—তাই এখানে এ সতর্কতা নিয়েছে পুলিস। সেদিন সে চটেছিল এই মিছিলওলাদের উপর। মারাত্মক ভাবে চটেছিল। কিন্তু আজ তার রাগ হল না। মনে মনে খবরের কাগজের হেডলাইনগুলো ভেসে উঠল। ঠিক ঠিক ভাষা তার মনে নেই, কিন্তু অ্যামেরিকা জেট বম্বার নিয়ে গিয়েছে ভিয়েৎনামে, এবং ঝাঁকে ঝাঁকে বম্বারগুলো উত্তর ভিয়েৎনামে কম্যুনিস্ট অঞ্চলে গিয়ে বম্বিং করে আসছে। একটা মেয়ের ছবি বেরিয়েছিল। সে মেয়েটির মুখভঙ্গি দেখে বোঝা যায় সে বুকফাটা কান্না কাঁদছে। তার সব গেছে। স্বামী পুত্র সংসার—সব—সব। কেন? তোমাদের গোটা প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেমে পাগল হয়ে এখানে লড়তে আসার কি প্রয়োজন? তাদের দেশের ভাগ্য তারাই নিয়ন্ত্রণ করুক। তোমাদের কি?

ওদিকে চীন। চীন অ্যাটম বোমা ফাটিয়েছে। তার অহংকার তারা এশিয়ার ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়েছে! ভারতবর্ষের উত্তরে থাবা গেড়ে বসে আছে। ভাবতে ভাবতে মাথা খারাপ হয়ে যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে।

ওদিকে আয়ুব খাঁ বিষ উদগার করছে—ফোঁটা ফোঁটা নয় গলগল করে বিষ ঢালছে। কচ্ছের রাণে ছোবল মেরে সাপের মত কামড়ে ধরে আছে অনেকটা অংশ।

এই এলোমেলো ভাবনার মধ্যে সে যে কখন রাস্তায় নেমে পড়ে ওই মিছিলের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করেছিল তা সে নিজেও জানে না। তবে অ্যামেরিকান কনসুলেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

একশো গজ দূরে পুলিসের ব্যারিকেড প্রসেসন রুখে দিয়েছে। একজন ছাত্রনেতা উঠে দাঁড়িয়েছে একটা কিছুর উপর। হাতে মুঠি বেঁধে চীৎকার করে বক্তৃতা শুরু করলে—বন্ধুগণ!—

কয়েক ছত্র শুনেই আর তার ভাল লাগল না। অত্যন্ত অভদ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বাক্যের সমষ্টি তাকে পীড়িত করলে।

সে সেখান থেকে সরে এল। একলা হাঁটতে হাঁটতে চলে এল সে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারে। রৌদ্রালোকিত মাঠে ঘাসের ডাঁটি ছিঁড়ে নিয়ে ছেলেমানুষের মত দাঁতে কাটতে লাগল।

বিকেল হয়ে আসছে। বড় বড় গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে মাঠের ধারে। গাড়ি থেকে নামছে সুন্দরী সুবেশা মেয়েরা, তার সঙ্গে কাচ্চাবাচ্চা এবং পুরুষেরা। এদের অধিকাংশই ভিন্ন প্রদেশবাসী। লক্ষপতি কোটিপতির দল। ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার এদের শতকরা নিরানব্বই জনেরও বেশী। অন্ত লোকে হয়তো বলবে একশো জনের মধ্যে একশোজনই। সে তা

বলবে না। একজন—অন্তত: একজন ভাল লোক আছে। নিশ্চয় আছে। নইলে দুনিয়া আছে কি করে? ওখান থেকে সরে এসে সে প্ল্যানেটোরিয়ামের পাশের বাগানটার ছায়ায় বসল।

সমস্ত দিনটাই মিছে গেল—বাজে বাজে এতদূর ঘুরল সে এই ছেলের দলের সঙ্গে!

হঠাৎ মনে হল সারা জীবনটাই সে এমনি করে মিছিমিছি ঘুরেছে। মিছিমিছি বই কি!

ভাবতে ভাবতে সে আকাশের দিকে তাকালে। কে জানে—চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার কি তারও উপরে অ্যাটম বোমা পেটে নিয়ে জেট প্লেন ঘুরছে না! অ্যামেরিকায় কোথায় কোন্ কণ্ট্রোল পোস্টে কেউ একজন একটা বোতাম টিপলেই একটা মারাত্মক খোনা আওয়াজ—যে আওয়াজের প্রতিধ্বনিতে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত শিরশির করে—সেই আওয়াজ তুলে একটা অতিকায় অ্যাটম বোমা নেমে আসতে আসতে ফেটে গিয়ে চোখ-অন্ধ-করে-দেওয়া ছটার উত্তাপে এবং একটা প্রচণ্ডতম শব্দ তুলে সমস্ত কলকাতা শহরটাকে গালিয়ে ঝলসে ছাইয়ের স্তূপ করে দেবে না! একটু ভয়ও হয় না আজ অংশুমানের।

হঠাৎ থিয়েটার রোড আর চৌরিঙ্গীর ক্রসিংয়ে ট্রাফিক পুলিসের হুইসিলটা অস্বাভাবিক জোরে বেজে উঠল। সশব্দে মোটরের ব্রেক কষার শব্দ উঠল। অংশুমান তাকিয়ে দেখলে পুব থেকে পশ্চিমের রাস্তায় ট্রাফিক বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে পুলিস।

এবার সামনে পেলে সে একখানা খালি ট্যাক্সি। সে ছুটে গিয়ে উঠে বসল।

* * *

ময়দানে মনুমেন্টের তলায় মিটিং হচ্ছে। মনুমেন্টের গা ঘেঁষে ফেস্টুন টাঙানো। ঝাণ্ডা উড়ছে। ইউনাইটেড ফ্রণ্টের মিটিং। এবার ইলেকশন। সমস্ত দল এবার কংগ্রেসকে হঠাতে বদ্ধপরিকর।

বাঁদিকে পুব পাশে মেট্রোর সামনে দর্শকের ভিড় জমেছে। ফার্স্ট শো ভাঙল—সন্ধ্যের শোয়ের দর্শকেরা ঢুকছে। গাড়ি গাড়ি গাড়ি। প্রাইভেট ট্যাক্সি, ডবল-ডেকার, লরী—তার সঙ্গে মানুষ মানুষ মানুষ। চলছে। চলছে। চলছে। ব্যবসাবাণিজ্য। ফেরিওলা—জুতো বুরুশ—পিকপকেট—নারীশিকারী পুরুষ—পুরুষসন্ধান। নারী। পুলিস স্পাই।

জীবনের স্রোত প্রচণ্ডবেগে বয়ে চলেছে। অসংখ্য ট্যাক্সিও তারই সঙ্গে চলেছে। মন্থর গতিতে। দ্রুত গতিতে। এর ওর পাশ কাটিয়ে। বুড়ো শিখ ড্রাইভার গাল দিচ্ছে পাশের ড্রাইভারকে। কখনও অন্য শিখ ড্রাইভারকে কিছু বললে হেঁকে। গীয়ার দিচ্ছে, ক্লাচ করছে, হর্ন মারছে। আশ্চর্য যান্ত্রিক হয়ে গেছে জীবন। অংশুমানের মন শূন্য।

গাড়িটা থেমে গেল। সামনে ধর্মতলা চৌরিঙ্গী বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যুর জংশন। মোড়ে লাল আলো জ্বলে উঠেছে। গাড়ির সারিগুলো থেমে গেছে। এখন পুব দিকে দক্ষিণমুখো গাড়ি ঢুকছে—চলছে দক্ষিণমুখে। পশ্চিম দিকে কার্জন পার্কে জনতা, পিঁপড়ের মত মানুষ। মানুষ। মানুষ। মানুষ। খাদ্য নাই। স্থান নাই। মানুষ। কোন কাগজে অংশুমান পড়েছিল আজ পৃথিবীতে সাড়ে তিনশো কোটি মানুষ—২০০০ খ্রীষ্টাব্দে মানুষ দ্বিগুণ হয়ে যাবে পৃথিবীতে। তার তিরিশ বছর পর ৭০০ কোটি হবে ১৪০০ কোটি!

কি করবে তখন মানুষ ?

মানুষ যা করবে তা করবে।

গাড়ির মধ্যে অংশুর জীবন অসহ্য মনে হচ্ছে। শীতের দিন তবু সে ঘামছে। পেট্রোলের গন্ধ। ধোঁয়া। দশটা বিশটা কি পঞ্চাশটা হর্নের একসঙ্গে শব্দ। ডবল-ডেকারের অসহনীয় অহংকারে অতিকায় দৈত্যের মত চাপা দেবার ভয় দেখিয়ে পাশ ঘেঁষে যাওয়া—এ অসহ্য মনে হচ্ছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে ভিখিরীরা ঘুরছে। এদেশের লোকই নয় এরা। অন্য প্রদেশ থেকে এসে চৌরিঙ্গীর এলাকাটা দখল করে বসেছে। তবু তো ফিটনের দৌরাত্ম্য গেছে।

সিটি পড়ল। লাল আলো হলুদ হয়েছে। এইবার সবুজ হবে। এরই মধ্যে গাড়ির সারি নড়ে উঠেছে। এই চলছে। অংশুমানের ট্যাক্সির পাশ দিয়ে একখানা ডবল-ডেকার একেবারে তেড়েফুঁড়ে গর্জন করে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। ক্রুড অয়েলের ধোঁয়ায় কালো হয়ে উঠল সামনেটা। প্রথমে আস্তে তারপর বিপুল গর্জন করে এগিয়ে চলল। ওপাশে একখানা লরী। ওরা রোলিং-স্টোন। ওদের পথ ছাড়।

পাঞ্জাবী শিখ ড্রাইভার তেতে উঠেছে। সে গলা বাড়িয়ে গাল দিলে ড্রাইভারকে। বাসের ড্রাইভার তার ইঞ্জিনের গর্জনের মধ্যে কিছু শুনতে পেলে না। সে গাল দিচ্ছে তার সামনের একখানা ট্যাক্সির ড্রাইভারকে।

এরই মধ্যে সামনে একখানা কালো রঙের প্রাইভেট। গাড়িগুলোর কতক চলেছে গভর্নমেণ্ট হাউসের দিকে। কতক চলেছে সামনে। কিছু ঘুরছে পূর্বমুখে ধর্মতলা স্ট্রীট বরাবর। ডবল-ডেকারখানা ঘুরছে ধর্মতলার দিকে। তার পিছনে আছে লরি একখানা।

আরে—আরে—আরে—।

বিচিত্র কৌশলে তাদের ডাইনে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চলল প্রাইভেটখানা।

পাঞ্জাবী শিখ ড্রাইভার বললে—মর যায়েগা শালা!

আশ্চর্য অশুভ বাক্য বের হল তার মুখে।

একটা প্রচণ্ড শব্দে অংশুমানের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল; সে চমকে উঠল।

নিশ্চয় সেই ডবল-ডেকারখানা! সামনে তাকিয়ে দেখে তার শরীর মন শিউরে উঠল; না ডবল-ডেকারখানা নয়, এটা একখানা হেভী ট্রাক, মেরেছে একখানা প্রাইভেটকে। পাশে মেরেছে। একটা দিক চড়চড় করে খানিকটা ছেড়ে গেছে, খানিকটা বসে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সিটি বেজে উঠল তিন-চারটে। তিন-চারজন টি-পি থাকে এখানে, তারা সশব্দে বাঁশী বাজিয়ে ছুটে আসছে গাড়িখানার দিকে। একজন দুই হাত প্রসারিত করে সব দিকে ট্র্যাফিক বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা অসহনীয় ব্রেক কষার আওয়াজ উঠল। এ আওয়াজে শরীর শিউরে ওঠে। জেট প্লেন নামবার সময় যে শব্দটা হয় অনেকটা তারই মত। শরীর ঠিক শিউরে ওঠে না, সমস্ত দেহের স্নায়ুশিরাগুলো যেন ওই শব্দে এঁকে-বেঁকে গুটিয়ে যেতে চায়। সাপ যেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়, শামুক যেমন খোলার মধ্যে ঢুকে যায়, না তার থেকেও শুঁয়োপোকা যেমন এঁকে-বেঁকে ছট্‌ফট করে ওঠে তেমনি হয়ে

যায়। তার সঙ্গেই দেহের এ রিফ্লেক্স অ্যাকশনের মিল বেশী। মানুষ বড়াই করে চেতনার চৈতন্যের—সে যে এ সময় কোথায় থাকে তার ঠিক থাকে না। নির্গুণ ব্রহ্মের মত অবাঙমনসোগোচর হয়ে যায়।

আশপাশ থেকে হুড়মুড় করে লোক এসে ভিড়ছে। ভিড় করে ঘিরে দাঁড়াচ্ছে। ওদিকে সামনে একদল লোক, একজন টি-পি ছুটছে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট ধরে।

অংশুমানের ড্রাইভার বললে—উ লরী ড্রাইভার কুদকে ছুটা হ্যায়। উয়ো ছুট রহা হ্যায়—উয়ো।

হ্যাঁ ওই ছুটছে। লোকটা প্রাণভয়ে ছুটছে। ধরা পড়লে তার আর রক্ষা থাকবে না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। ওই একটা গলিতে মোড় নিয়েছে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার বললে—লেকিন উসকা কসুর নেহি থা সাব। বিলকুল কসুর প্রাইবেট চালানেওলা বাবুকা। বাবু লরীকো ওভারটেক করনে কোশিস কিয়া। ই ভি টারন লিয়া উ ভি টারন লিয়া। লরী গিয়া পহেলে, প্রাইবেট পিছেমে টারন লেতে যানেসে লরীকে সাথ ধাক্কা লাগায়া। আজকালকা নয়া প্রাইবেট ব্রিফ টিনা হ্যায়। একদম। সে স্টীয়ারিং ছেড়ে দিয়ে ডান হাতের উপর বাঁ হাতে মুঠো বেঁধে মারলে ঘুঁষি। অর্থাৎ তুবড়ে গিয়েছে।

—জান নুকসান হুয়া? কোই মর গিয়া?

—ক্যা মালুম! ড্রাইব করনেওলা মর গিয়া হোগা। কেঁও কি ধাক্কা যো লাগা হ্যায় উ লাগা হ্যায় পিছেমে। মর গিয়া হোগা।

* * *

ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অংশুমান নেমে পড়ে এগিয়ে গেল অ্যাকসিডেণ্ট-হওয়া গাড়িখানার কাছে।

এ কি? এ যে সীতা! গাড়ির ভিতর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বা মরে গেছে। আর একটি শিশু।

সে যেন পাথর হয়ে গেল।

এমন কখনও অনুভব করে নি অংশুমান। সে যেন কেমন হয়ে গেল! অতর্কিত আঘাতে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তটিতে এবং চেতনা যেতে যেতে যাবার শেষ মুহূর্তটিতে যেমনটি হয় বোধ হয় তেমনি। আলো যেন নিভে গেল—অথবা বৃত্তাকারে সংকুচিত হয়ে এসে তাকে কেন্দ্র করে টেঁকে রইল; সব হারিয়ে গেল; সব থেমে গেল; সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল; কোথাও কোন শব্দ নেই—নিঃশব্দ হয়ে গেছে সব; ঠিক তেমনি একটি অনুভূতিতে অংশুমান আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

পুরাণে মানুষের পাথর হয়ে যাওয়ার কথা আছে।

ঋষি গৌতমের শাপে তাঁর ব্যভিচারিণী পত্নী অহল্যা পাষাণী হয়ে গিয়েছিল। অংশুমানের মনে হল সেও পাথর হয়ে যাচ্ছে।

অহল্যার প্রস্তরীভূত দেহের মধ্যে বন্দী আত্মার মতই তার আত্মা ও চেতনা যেন চীৎকার করে উঠতে চাইল কিন্তু পারলে না। গলা থেকে কোন স্বর বের হল না।

নিঃশেষে শব্দহীন হয়ে গেছে সংসার।

আলো যেন মুছে এসে এসে মাত্র আভাসে জেগে রয়েছে তার চোখের সামনে।

অংশুমান স্পষ্ট অনুভব করলে যে, পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে একটি লম্বা ধরনের গোলালো কক্ষপথে অনিবার ও নিরন্তর ঘূর্ণমানতায় ও চলমানতায় ঘুরে বেড়ায় সেই ঘূর্ণমানতা থেমে গেল, সেই বেগবানতায় একটা ছেদ পড়ে গেল। সামনে পা ফেলবার মত মাটি আর সংসারে নেই। এবং সে পা সে ফেলবেই বা কি করে, তার আর পা নাড়বার শক্তিই নেই। যে-পৃথিবী তার পৃথিবী—যে-পৃথিবীতে সে জন্মেছে—তার জীবন যৌবনের রাজত্ব সংস্থাপন করেছে সে পৃথিবী হঠাৎ একটি জীবনস্পন্দনহীন জড়পদার্থের জমাট স্তূপে পরিণত হয়ে গেল—তার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও যাচ্ছে পাথর হয়ে।

একটা শিশুর রক্তের স্পর্শ লেগে সমস্ত পৃথিবী পাথর হয়ে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে সেও পাথর হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেও সে যে কেমন করে চেতনার শেষ প্রান্তবিন্দুটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা সে বুঝতে পারছে না। নিভিয়ে-আসা প্রদীপের শলতের মুখে ক্ষীণতম শিখার আলোক ও উত্তাপ প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বেঁচে বা জেগে রয়েছে।

জীবনীশক্তি বা পরমায়ু বড় আশ্চর্য শক্তি! রক্তের স্রোত দেহ জমে পাথর হয় কিন্তু প্রাণ নিঃশেষিত হয় না। অথচ কত না সহজে মানুষ মরে হার্টফেল করে, অ্যাকসিডেণ্টে একমুহূর্তে মরে যায়।

একটা ছেলের রক্তস্রোত যেন গোটা পৃথিবীর বুকে একটা রক্তবন্যা এনে দিয়েছে মনে হচ্ছে। সব ডুবে গেল। শুধু সে আকণ্ঠ ডুবে আর ডুবছে না—মাথা জাগিয়ে সব দেখছে।

*　　　*　　　*

মোটরের একপাশে সীতা পড়ে আছে—অন্যদিকে রক্তে ভাসছে চার বছরের একটি শিশু। ছেলেটির বাঁ হাতখানা ভাঙা দরজার ভাঁজের মধ্যে চেপটে লেগে গেছে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সম্পূর্ণ।

ওঃ! সীতা! সীতার ছেলে! সীতার সিঁথিতে সিঁদুর।

সে নিজে সেই ছেলেটিকে দুই হাতের ভাঁজের উপর তুলে নিজের ট্যাক্সিতে চাপিয়ে নিয়েছিল—তার রক্তে তার শরীর তার কাপড়-চোপড় রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার পিছন পিছন দুজন লোক ছেলেটির অজ্ঞান মাকে (মা বলেই সবারই মনে হয়েছিল কারণ আর কোন মহিলা সে গাড়িতে ছিলেন না) এনে গাড়ির ব্যাক সীটে শুইয়ে দিয়েছিল। তখনই সে চমকে উঠেছিল। কারণ সে মেয়েটি সীতা! তখনই তার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—মন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

সীতা! এ ছেলে তাহলে সীতার ছেলে!

তখনও এ ছেলে তার কাছে শুধু সীতার ছেলে ছিল। তার বেশী কিছু না। মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছে (ধর্মতলা মোড় থেকে মেডিক্যাল কলেজই সব থেকে কাছে) সেই ছেলেটিকে তুলে দিয়েছিল স্ট্রেচারের উপর। সারাটা পথ সে একবার সীতার এবং একবার এই ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে আর হাজার বা অসংখ্য টুকরো টুকরো

বিক্ষিপ্ত চিন্তা মনের মধ্যে অন্ধকার রাত্রের জোনাকিপোকার মত এক একটি ছোট দীপ্ত রেখা টেনে দিয়ে দিয়ে চলে গেছে। সবগুলিকে জোড়া দিয়ে যে একটি লম্বা রেখায় যুক্ত করে কোথাও থেকে কোথাও পৌঁছুবে তার উপায় ছিল না কারণ বারেকের জন্য জলে উঠেই রেখাটি হারিয়ে বা নিভে গেছে অন্ধকারের মধ্যে।

সীতা!

সীতার ছেলে!

ছেলেটির বাঁ হাতখানা গাড়ির দুমড়ে যাওয়া দরজার সঙ্গে চেপটে গিয়েছে। চুরমার হয়ে গেছে ভিতরের হাড়গুলি। মাংস থেঁতলে গেছে। ওঃ কি রক্ত পড়ছে! ওঃ! ছেলেটা কি বেঁচে আছে?

সীতাও অজ্ঞান।

সীতার সিঁথিতে সিঁদুরের আভাস রয়েছে।

বিয়ে করেছে সীতা।

এইভাবে অসংলগ্ন টুকরো টুকরো চিন্তাগুলি মনের মধ্যে জোনাকির মত জলছিল আর নিভছিল। তারই মধ্যে এসে পৌঁছেছিল মেডিক্যাল কলেজে।

ছেলেটি তারই কোলে ছিল সেই গোড়া থেকে।

সীতার স্বামী এই ছেলেটির বাপ বলে যাকে সে মনে বুঝেছিল সে ভদ্রলোক—

তাঁরই দোষে অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। হ্যাঁ তাঁরই দোষে। তার ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিল ওদের পিছনেই। সে বলছিল কিছুক্ষণ ধরেই এ প্রাইভেট কি বেমক্কা ড্রাইভ করছে। অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে যাবে। গাড়ির ডান দিক দিয়ে পাস করতে যাচ্ছে। ক্যায়সা ড্রাইভ করতা হ্যায়! ঠিক তাই হল। একটা লরীর ডান দিক দিয়ে ওভারটেক করতে গেল; গেল গেল ঠিক ধর্মতলার বাঁকের মোড়ের উপর। আর লাগল। সে কি শব্দ! গাড়িখানার বাঁ পাশের পিছনের সীটটা একেবারে তুবড়ে ঢুকে গেল ভিতরে। পিছনের সীটে ছিল মা আর ছেলে। ছেলেটিই ছিল বাঁদিকের জানালার ধারে। বাঁ হাতখানা দিয়ে হয়তো দরজার হাণ্ডেলটা সে ধরে ছিল। অকস্মাৎ হয়েছে সংঘর্ষ। চেপটে ভেঙে থেঁতলে গেছে—ভিতরে কচি হাড় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বিচিত্র বিধান এই প্রকৃতিজগতের। অন্ধ সে বধির সে—তার বিচার নেই; ওই ভদ্রলোক বাপ ভদ্রলোকটির (তখন সে তাকে বাপই ভেবেছিল) অপরাধের ত্রুটিতে ঘটল সংঘর্ষটা আর সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর আঘাত, বলতে গেলে এ আঘাতের সামনের ধাক্কাটা এসে পড়ল এই ছেলেটির উপর আর ওই ভদ্রলোকটি আশ্চর্য নিরাপত্তার মধ্যে একেবারে অক্ষত রয়ে গেলেন। একেবারে অক্ষত। এমন অক্ষত যে তাঁকে হাসপাতালে আনবার প্রয়োজন মনে করে নি কেউ; তার বদলে নিয়ে গেছে থানায়।

ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে পৌঁছে দিয়ে অনায়াসেই সে চলে আসতে পারত; কিন্তু এমন ক্ষেত্রে অনায়াসে আসা গেলেও আসা যায় না; তার উপর ওই মেয়েটিকে সে সীতা বলে চেনার পর সে যেন কেমন কোন এক চোরাবালির বালুচরে পা দিয়ে আটকে গিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল।

সীতাকে আলাদা নিয়ে গেছে—একটা টেবিলে শুইয়ে দিয়েছে। ছেলেটিকে রেখেছে আলাদা। সে রইল। বাইরে দাঁড়িয়ে রইল—একান্ত অকারণেই দাঁড়িয়ে সঙ্গের কনেস্টবলটির সঙ্গেই কথা বলেছিল কয়েকটা।

ওই ছেলেটি সম্পর্কেই কথা। হঠাৎ রক্তের কথা উঠল। ডাক্তারেরাই এসে বললেন রক্তের কথা।

সে নিজে থেকেই বলেছিল—আমার কেউ নয় তবু রক্ত আমি দিতে পারি।

রক্ত নেওয়া হলে একজন ডাক্তার বলেছিল—বাঃ এক গ্রুপের রক্ত দেখছি। তাহলে ছেলেটি বেঁচে যাবে। একেই সুরাহা বলে।

তার নামটাম লিখে নিয়ে ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—অংশুমান চৌধুরী—মানে লেখক নাট্যকার অ্যাক্টর ডিরেক্টার—

মুখে হ্যাঁ বা না কোন কথা না বলে সে একটু হেসেছিল শুধু। তারপর নমস্কার করে চলে এসেছিল।

ডাক্তার যদি নাম শুনে বিস্মিত হয়ে তাকে প্রশ্নটা না করত এবং সে যদি ওইভাবে এক-টুকরো নীরব হাস্যের দ্বারা একটি নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করবার সুযোগ না পেতো তাহলে হয়তো বা আরও কিছুক্ষণ থাকত। ছেলেটির থেকেও তার আকর্ষণ ছিল সীতার উপর অনেক বেশী।

সীতা।

রামায়ণের সেই রামের সীতা নয়। অংশুমানের সীতা। সীতা একদা পাঁচ-ছ বছর আগে অংশুমানের প্রিয়বান্ধবী ছিল। এক সময় দুজনে ঘর বাঁধবার স্বপ্নও দেখেছিল। কিন্তু ওই ছোট্ট একটুকরো নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি হবার পর সে থাকে নি। অভ্যাসমত চলে এসেছিল। আরও একটা কারণ ঘটেছিল। ওই ভদ্রলোকটি, সীতার স্বামী ভদ্রলোকটি এই সময়েই থানা থেকে মেডিক্যাল কলেজে এসে পৌছেছিলেন। সীতা এবং ওঁর মধ্যে আর সে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে নি। ওদের ভাল লাগবে না। তার থেকেও বেশী হল তার ভাল লাগবে না।

বাড়ি ফিরে এসেও স্বস্তি পায় নি।

স্নানের ঘরে গিয়ে সীতা এবং ওই শিশুটির রক্ত মাখামাখি-হওয়া সেই সমস্ত কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলে স্নান করেছিল।

* * *

রাত্রিতে সারা রাত্রি ঘুম হয় নি। আজ ভোরে জেট প্লেনটা তাকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে।

এরই মধ্যে রঞ্জন এসেছে। আর একজন ভদ্রলোক এসেছেন।

মেডিক্যাল কলেজ থেকেই তাঁরা এসেছেন।

সীতা পাঠিয়েছে তাঁদের তারই কাছে। যে শিশুকে সে কোলে তুলে ইমার্জেনসী টেবিল পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল—যার জন্তে সে রক্ত দিয়েছিল সে তারই সন্তান। সীতা তাকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছে সে যেন দ্বৈপায়নের সৎকার করে। ছেলের নাম দিয়েছিল সে দ্বৈপায়ন।

সীতার আঘাত তেমন কিছু নয়। কালই ছেড়ে দিত। কেবল ওই শিশুটির জন্ত দেহ

নি।

সীতা মাস্টারী করে রানাঘাটের কাছে একটি স্কুলে।

তার দিদির বাড়ি সে এসেছিল ক'দিনের জন্য। ফিরে যাচ্ছিল তার কর্মস্থলে। দিদির বড় ছেলে গাড়ি চালাচ্ছিল। ট্রেনের সময় ছিল না। আর ভাগ্য!

ভাগ্য মানে না অংশুমান। কিন্তু সে কথা সে বলতে পারলে না। শুধু বললে—চল আমি যাই!

তারপর বললে—সীতার সঙ্গে কি দেখা হবে না? একবার?

চোখ থেকে কি জল গড়াচ্ছে তার?

চোখের জল সে মুছে ফেললে।

* * *

হাসপাতাল থেকে শিশুটির শবদেহ একখানা নতুন দামী তোয়ালে এবং নিজের ছেলে বয়সের একখানা কাশ্মিরী রুমাল শাল (একেবারে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান, জরীর কাজ করা শাল। মাঝে কোণাকুনি ভেঁজে তিনকোণা করে নিয়ে গায়ে দিতে হয়) দিয়ে জড়িয়ে বুকে করে নিয়ে যখন সে শ্মশানে এসে পৌছুল তখন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরে এসে পৌছেছে। সঙ্গে রঞ্জন ছিল। শিবকিঙ্কর এসে পৌছল আর একখানা ট্যাক্সিতে কিছুক্ষণ পর। কিছু ভাল চন্দন কাঠ এবং চন্দনের গুঁড়ো, দামী ধূপকাঠি আর গাওয়া ঘি নিয়ে এল সে। বরাত অংশুমানেরই।

কি যে তার মনে হল সে হাসপাতালে যাবার পথে—পথের মাঝখানে ওই বরাতগুলি দিয়ে তাকে নামিয়ে দিয়েছিল হ্যারিসন রোড সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যুর ক্রসিংয়ে। এগুলো নিয়ে এস তুমি।

ফুল আনলে রঞ্জন।

কেউ কোন প্রশ্ন করলে না। কোন কথাই তুললে না। নীরবে নিঃশব্দে পারলৌকিক ক্রিয়াগুলি সে করে গেল। চিতায় শুইয়ে দিয়ে আগুন দিয়ে গঙ্গার কিনারায় বসে গঙ্গার স্রোতের দিকে মুখ ক'রে বসে রইল।

চন্দনের গন্ধ উঠছে; ধূপকাঠি ঘি পুড়ছে। ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে। বাস, দেহখানা ছাই হয়ে গেলেই—

সব শেষ? না তো!

—অংশুমান। অংশু! ডাকলে শিবশঙ্কর।

ফিরে তাকাল অংশুমান।

বলতে হ'ল না শিবকিঙ্করকে তার বক্তব্য। সীতা এসে ঘাটের উপর চিতার অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে। সে জল দিয়ে চিতা নিভিয়ে দেওয়াটুকু শেষ করতে এসেছে। নির্নিমেষ :ত তাকিয়ে দেখছে। চোখে একফোঁটা জল নেই।

চিতা নিভল।

অংশুমান কলসী ক'রে জল এনে ঢেলে দিলে। একবার দুবার তিনবার। শেষবার

জল দিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। কলসীটা বাড়িয়ে ধরলে।

সীতা কলসীটা নিয়ে বললে—মুখাগ্নি করেছিলে?

—করেছি—মানে চিতায় আগুন দিয়েছি। মন্ত্র-টন্ত্র পড়ি নি। ওতে তো আমি বিশ্বাস করিনে।

সীতা কলসীটা নিয়ে ঘাটে নেমে গেল জল আনতে।

অংশুমান পশ্চিম দিকে তাকিয়ে ভাবছিল। ভাবছিল—এই কি ভবিষ্যৎ।

সীতা চিতা ধুয়ে—কখানা হাড় বেছে তুলে নিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিল। বললে—তুমি অমৃতলোক পাও যেন।

সবই মিথ্যে। অন্তত সত্য নয়। তবে তা নিয়ে কোন কথাই কেউ কাউকে বললে না। সীতা শুধু বললে—চললাম।

সে চলে গেল।

অংশু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এল শ্মশান থেকে। একবার মনে হয়েছিল সীতাকে ডাকে। কিন্তু না। সীতা ফিরবে না, ফিরতে পারে না। সেও তাকে ডাকবে না। তাকে ডাকা যায় না। না, যায় না। দু জনের পথ দু মুখে চলে গেছে। বিপরীত মুখে।

ভুবনপুরের হাট

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীচরণেষু,

আপনি সত্যবান, আপনাকে প্রণাম

তারাশঙ্কর

এক

সারালের হাট যাবা ?
আমার ঝিনঝিনি রোগ
নিয়ে যাবা ?

একটা গ্রাম্য ছড়া। কাটোয়ার কাছে 'সালার'—লোকের জিভের ডগায় কিভাবে 'সারাল' হয়ে গেছে তা পণ্ডিতেরা বলতে পারেন। কিন্তু লোক সারাল বলে—এবং সালারের হাট বড় হাট প্রাচীন হাট ; কারুর ঝিনঝিনি রোগ হলে লোকে বলে, সালারের হাটে গিয়ে বিকিকিনি করলে—বিশেষ করে বিক্রী করবার যদি কিছু থাকে তবে তার সঙ্গে নিজে থেকে 'ফাউ' দিয়ো, 'ফাউয়ে'র সঙ্গে তোমার ঝিনঝিনি রোগ সেরে যাবে। কিনবার বেলায় যদি ছ'পয়সা ন্যায্য দামের উপর একটা পয়সা বেশী গুঁজে দিতে পার তবে ঝিনঝিনি তার সঙ্গে দেওয়া হয়ে যাবে। সালারের হাটুরেরা নাকি খুব সাবধান হয়ে জিনিস বিক্রী করে, কখনও এক পয়সা ঠকিয়ে নেয় না, নিলেই ঝিনঝিনি রোগ নেওয়া হয়ে যায়।

ভুবনপুরের হাট খুব পুরনো হাট। ভুবনপুর অনেকগুলো এ অঞ্চলে ; গঙ্গার ধারে গঙ্গাভুবনপুর, ক্রোশ কয়েক পশ্চিমে বিপ্রভুবনপুর, তার ওধারে ছোটভুবনপুর। মাঠান অঞ্চলে শ্রীভুবনপুরের জমি বাংলাদেশের মধ্যে উর্বর, বিঘেতে বারো-চৌদ্দ মণ—ষোল মণ ধানও ফলে। এক বিঘে জমির দাম ওখানে অনেক, আড়াই হাজার টাকাতেও বিক্রী হয়েছে, উৎকৃষ্ট কনকচূড় ধান ফলে তাতে। এ জমির কনকচূড়ে খই হয় নিটোল বড় মুক্তার মত। ধানে যখন শীষ বের হয় তখন সুন্দর গন্ধে বেশ খানিকটা জায়গা ভরে যায়। কিন্তু হাটের ভুবনপুর শুধু ভুবনপুর, ভুবনেশ্বর অনাদিলিঙ্গ আছেন—তাঁর নামে ভুবনপুর। বাইরের লোকে বলে শিবভুবনপুর, কিন্তু এখানকার লোকে বলে শুধু ভুবনপুর—আদি ভুবনপুর—বিশ্বেশ্বরের কাশী, তারকনাথের তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথের দেবঘর, ভুবনেশ্বরের ভুবনপুর। শিবের সঙ্গে দুর্গার ঝগড়া হয়েছিল ; দুর্গা গয়না চেয়েছিলেন, কাপড় চেয়েছিলেন, শেষ শাঁখা চেয়েছিলেন। শিব বলেছিলেন—আমি ভিক্ষে করে খাই ওসব কোথায় পাব ? এতে একবার দুর্গা রাগ করে বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন। তারপর শিব শাঁখারী সেজে শাঁখা পরাতে গিয়ে দুর্গার মান ভাঙিয়েছিলেন। কিন্তু এ ঝগড়া তো মিটবার নয়, দুর্গারও গয়নার সাধ, শিবও ভিক্ষে ছাড়া কাজ করবেন না। ফিরেবারের ঝগড়ায় নাকি শিব বলেছিলেন—বাপু তোমাকেই তো লোকে দেবতাতে দৈত্যাতে সকলে বলে তিনভুবনের মালিক। তা নিজেই নিজের ব্যবস্থা তো করতে পার। আমাকে ছাড়ান দাও—আমি আপনার ভিখ মেগে শ্মশানে-মশানে চিতের চুলোয় রেঁধে বেড়ে খেয়ে গাছতলায় পড়ে থাকব। দুর্গা শিবকে শিক্ষা দিতে বিশ্বকর্মাকে বললেন—তুই ওই মণিকর্ণিকার শ্মশানে শিব যেখানে ত্রিশূল গেড়ে বসেছে—ওইখানেই একরাত্রে আমার রাজধানী তৈরী কর। বিশ্বকর্মা তাই করলেন ; দুর্গা সেখানে এসে রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা হয়ে বসে তিনভুবনের অন্ন হরণ করে কাশীতে অন্নকূট অন্নের পাহাড় তৈরী করে বললেন—যে হাত পাতবে, পাত পাড়বে সেই খেতে পাবে। শিব বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ভিক্ষে না পেয়ে কাশীতে এসে অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষের অন্ন খেয়ে বাঁচলেন। কিন্তু মনের দুঃখ তো গেল না। মনে মনে ভেবেচিন্তে একদিন নন্দীকে ডেকে বললেন—নন্দী, আমিও এক রাজধানী তৈরী করব। নন্দী বললে—খুব ভালো হয় দেবতা—মায়ের ওই দুটো ঝি জয়া আর বিজয়ার মুখনাড়া আর সহ্য হয় না।

—কিন্তু গড়বে কে? বিশ্বকর্মা বেটার মুরদ তো কাশী গড়া। ওর থেকে ভাল তো বেটা জানে না। আমার যে কাশী থেকে ভাল হওয়া চাই।

নন্দী বললে—ভাবনা কি দয়াময়। তোমার ভূতেরা রয়েছে। কত বেটা মন্দির-গড়িয়ে, কেল্লা-গড়িয়ে, রাজপ্রাসাদ-গড়িয়ে মরে ভূত হয়ে তোমার দরবারে রয়েছে। খাচ্ছেদাচ্ছে আর নাচছে তোমার ডম্বরুর তালে হরিনামের সঙ্গে। তাদের বলুন—দেবে বানিয়ে। বিশ্বকর্মা একরাত্রে বানিয়েছে, এরা এক প্রহরে বানিয়ে দেবে।

স্থপতি ভূতেরা শুনে খুব খুশী। বিশ্বকর্মাকে হারিয়ে দেবে। তারা বললে—ঠিক আছে ভূতভাবন আশুতোষ। দিচ্ছি বানিয়ে। শুধু গাঁজার হুকুম হয়ে যাক।

শিব বললেন—নন্দী, পাঁচশো মণ গাঁজা দাও বেটাদের। আর শোন—কাশীর সঙ্গে কিচ্ছুর মিল থাকবে না। নদীর ধারে নয়, ডাঙায়; পাথরকাস্তর নয়, মণিমানিক স্ফটিক মর্মর কিছু না। স্রেফ মাটি! আর আমার বাড়ীটা করবি, মাটির ভিত, বাতাসের দেওয়াল, আকাশের ছাদ! আর তোদের জন্যে মস্ত কেল্লা। বেলগাছ ব্যারাক, বটগাছ ব্যারাক, শ্যাওড়াগাছ ব্যারাক। লোকেদের জন্যে বাড়ি, মস্ত দিঘী জলের জন্যে আর একটা বাজার।

ভুবনপুরের লোকে বলে—ক্ষ্যাপা শিবের ক্ষ্যাপা খেয়াল, ভূতের দলের ভুতুড়ে কাণ্ড, একপ্রহর নাই যেতে তেপান্তরের মাঠের উপর জলটলোমলো সরোবর ঘিরে গড়ে উঠল ভুবনপুর। সরোবরের ঘাটের উপর মড়ার খুলির ঢিপি মাটি দিয়ে ঢেকে তারপর গড়ে উঠল ভুবনেশ্বরের আটন। আজও বিশটা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়। বাতাসের দেওয়াল আকাশের ছাদ সে লোকে দেখে না—দেবতায় দেখে। আর ভূতে দেখে। চারিপাশ ঘিরে বাবার ভূত-বাহিনীর কেল্লা বেল-মহল, বট-মহল, তারই মধ্যে মধ্যে শ্যাওড়া-মহল। বেলবাগানে ব্রহ্মদৈত্য সেনাপতির দল, বটবাগানে ভূতবাহিনী এবং শ্যাওড়াগাছ-মহলে প্রেতিনীবাহিনী বাসা নিলে। নন্দী ঢাক পিটিয়ে শিঙা বাজিয়ে মাটির ভুবনের মানুষদের জানিয়ে দিলে—ভুবনেশ্বরের ভুবনপুরে যারা বাস করবে তাদের ভূতের ভয় থাকবে না, প্রেতিনীদের নজর লাগবে না।

লোকেরা দলে দলে এল—মানুষে মানুষে ভরে গেল ভুবনপুর। কিন্তু বিপদ হল, খাবে কি? অন্নপূর্ণা তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মী কাশীতে, ভুবনপুরের দিকে পিছন ফিরে বসে আছেন। তখন শিব ডাকলেন গন্ধেশ্বরীকে। বললেন—গন্ধেশ্বরী, ভুবনপুরের মা হতে হবে তোমাকে। অন্নপূর্ণা আর লক্ষ্মীর অহঙ্কার ভাঙতে হবে। গন্ধেশ্বরী বললেন—বেশ! বসলাম আমি বাজারে আটন পেতে। মুগ মসুর ছোলা লঙ্কা তার সঙ্গে মসলা এ এই ভুবনেশ্বরের হাট ছাড়া মিলবে না। অন্নপূর্ণা কাশীতে থাকুন চাল আর ধান নিয়ে।

ভুবনেশ্বর বললেন—আর এই কথা রইল, শিববাক্য—ভুবনেশ্বরে যা আসবে বিক্রীর জন্যে

তা বিক্রী হবেই, ফিরে যাবে না। কুবেরের উপর আদেশ রইল সে কিনে নেবে সব।

তাই হল। ভুবনেশ্বরের হাট জমজমাট হয়ে উঠল। কুবেরের অনুচরেরা মনুষ্যজন্ম নিয়ে ভুবনপুরে গদি খুলে বসল। ধন্বন্তরীর শিষ্য এসে বসল কবিরাজ হয়ে, রোগ নিয়ে এলে এখানেই ভাল হবে। না হলে ভুবনেশ্বরের মাটি আছে চরণোদক আছে।

দিকদিগন্তর থেকে লোক আসে। খবর আসে কাশীতে অন্নপূর্ণা নাকি ভাবিত হয়েছেন। ভুবনেশ্বর বললেন—আমি যাচ্ছি না।

দেবতারা এলেন—প্রভু, কাশী ফিরে চলুন। এ কি ক্ষ্যাপামি করছেন!

ভুবনেশ্বর বললেন—কক্ষনো না। ব্রহ্মা বিষ্ণু এলেও না। আমি গন্ধেশ্বরীকে নিয়েই রাজত্ব করব এখানে!

দেবতারা হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। কয়েকদিন পরে গন্ধেশ্বরী কুবের দুজনে এসে শিবকে বললেন—মহা বিপদ!

—কি বিপদ?

—একটি সুন্দরী যুবতী এসেছে একটি ঝাঁপি নিয়ে। তার ভিতরে এনেছে তার মনের দুঃখ। কিন্তু সে কে কিনবে? আমরা কিনতে গেলাম, কিনে না হয় জলে ভাসিয়ে দেব। কিন্তু দাম শুনে পিছিয়েছি। সে দাম তো আমাদের কাছে নেই।

শিব বললেন—কি দাম চাইছে সে? রাজ্য? স্বর্গরাজ্য? মণিমানিক্য?

—না দেবতা। বলে এক ঝাঁপি সুখ নিয়ে এক ঝাঁপি দুঃখ বেচব।

—এই কথা! এর আর কি? চল, দিয়ে আসি এক ঝাঁপি সুখ। বিষ গলায় আছে দুঃখটা নয় বুকে রাখব, চল।

শিব এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়ালেন তো মেয়ের রূপ দেখে হতবাক্। একটু সামলে নিয়ে বললেন—দাও তোমার দুখের ঝাঁপি!

—আগে ঠাকুর সুখের ঝাঁপি দাও।

—ওহে কুবের আনো, একটা ঝাঁপি আনো!

ঝাঁপি নিয়ে বললেন—এই ঝাঁপি আমার বরে তোমার মনের সুখে ভরে যাক। দাও এবার তোমার দুখের ঝাঁপি।

মেয়ে সুখের ঝাঁপি নিয়ে দুখের ঝাঁপি দিয়ে শিবের জয় জয় ধ্বনি দিয়ে চলল—বললে—শিববাক্য সত্যি করতে শিবদূতরা কোথায় আছ—আমার পালানো স্বামীকে বেঁধে নিয়ে আমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে এস। স্বামীকে না পেলে মেয়েলোকের মনের সুখ কোথায়? হনহন করে চলতে লাগলেন কন্যে। এদিকে বেলগাছ শিমূলগাছ বটগাছ থেকে শিব-সৈন্যরা, পুরোভাগে স্বয়ং নন্দী ছুটে এল, দড়ি নিয়ে দড়া নিয়ে শিবকে বাঁধতে লাগল।

—একি? একি? একি? ওরে বেটারা ভূতেরা করিস কি? শিব রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন।

নন্দী বললে—চীৎকার করো না দেবতা! মুখ বুজে চুপ করে থাক। নিজে বর দিয়েছ—তার সঙ্গে তুমিই হুকুম দিয়েছ তোমাকে বাঁধতে। এখন আর চেঁচালে হবে কি!

বাঁধ ভুতেরা, ক্ষ্যাপা বাবাকে কষে টেনে বাঁধ। দেখিস যেন খুলে না পালায়। না ছেঁড়ে!

শিব রেগে চীৎকার করলেন—নন্দী!

নন্দী হাত জোড় করে বললে—দেবতা, তোমার চেয়ে তোমার বর বড়ো, বাক্যি বড়ো, কি করব বল! চিনতে পারছ না ও মেয়েকে? ও যে মা, মা দুর্গা!

শিব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—নে তবে চল নিয়ে। না বাবা একটু দাঁড়া। বলে ডাকলেন—দুর্গা, আমি হেরেছি, হার মানছি। চিনতে পারি নি তোমাকে, সকালে নেশা বড় কড়া হয়ে গিছল। চোখে দেখতেই পাচ্ছিলাম না। তা বেশ। হেরেছি যখন তখন নিজেই যাব আমি। কিন্তু আমার শখ করে তৈরী ভুবনপুর, এর একটা ব্যবস্থা করে যাও। স্বামীর কীর্তি এটা—নষ্ট হলে বদনাম তোমারই হবে!

দুর্গা হেসে বললেন—বেশ। আমি বর দিলাম—তোমার এতটুকুন অংশ এখানে থাকবে ভুবনেশ্বর শিব হয়ে, আমি থাকব গন্ধেশ্বরী হয়ে, আর এই হাট থাকবে। এই হাটে অবিক্রি কিছু থাকবে না। সুখের দামে দুখ বিকোবে। দুখের দামে সুখ। তবে আমার মতন পরানের আর্তি থাকা চাই। বিশ্বাস থাকা চাই। দোনামোনা, দেব কি দেব-না ভাব মনের কোণে থাকলে হবে না। দুখের বোঝা বেচতে এসে দ্বিগুণ হবে। সুখের বদলে দুখ পাবে না, সুখ বাড়িয়ে ঘর ফিরবে। এবার খুশী?

শিব বললেন—খুশী।

—তা হলে চল।

—চল। বাঁধন খুলতে বল।

দুর্গা শিবকে বললেন—বাঁধন খুলবে, কিন্তু নন্দীর কাঁধে চেপে আসতে হবে। নইলে তোমার চরিত্র জানি, কোথায় কোন কেঁচুনী পাড়ায় কোন কন্থেকে দেখে ভাগবে। নইলে চাঁড়াল পাড়ায় গাঁজার গন্ধে সেখানে গিয়ে জমে যাবে।

শিব চড়লেন নন্দীর কাঁধে, ষাঁড়টাকে সিংহের লেজে বেঁধে দেওয়া হল, মা দুর্গা সিংহতে চড়ে ফিরলেন কাশী।

এই এখানকার লোকপ্রবাদ। বাংলাদেশে শিব দুর্গার অনেক বিচিত্র কাহিনী। এটাও একটা। শিব বাংলাদেশে চাষ করেন, মা দুর্গা শাঁখা পরবার পয়সার অভাবে রাগ করে বাপের বাড়ী যান। শিবের চরিত্র পরীক্ষা করতে মা দুর্গা কেঁচুনী মেয়ে সাজেন, মাছ ধরেন। শিব তাঁর রূপে ভুলে, কেঁচুনী পাড়ায় এসে ঘোরাফেরা করেন, মাছ ধরেন কেঁচুনে পাড়ার কাদা ঘেঁটে মাছ-ধরা পুরুষদের সঙ্গে। ভুবনপুরে ভুবনেশ্বর ভৈরব আজও হাটের দিনে অদৃশ্য থেকে হাটের বেচা-কেনার তদ্বির করেন। গন্ধেশ্বরী পুজোর সময় মেলা হয়, সে সময়ে শিব পূর্ণ হয়ে ভুবনেশ্বরের মধ্যে অধিষ্ঠান হন।

ইদানীংকালে ১৩৩৫ সালে, আবার স্বাধীনতার পর ইংরেজী চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন সালে সেটেলমেণ্ট হয়েছে—তাতে সরকারী তদন্তে ধরা পড়েছে ও সব গালগল্প, কোন গাঁজাখোর পুরুত-টুরুতদের তৈরী, নেহাৎ করে ভুবনপুরে ওই বেল অশথ স্যাওড়া গাছের আধা জঙ্গল ঘেরা ঢিপির উপর একটা পাথর পুঁতে যাত্রী জমাতে এই কাহিনীর সৃষ্টি করেছিল। মুসলমান

আসলে ভুবনপুরের পাশের গ্রাম, সেটা গন্ধবণিক-প্রধান গ্রাম—সেই গ্রামে কাটোয়া অঞ্চল থেকে ফৌজদারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে পালিয়ে এসেছিলেন এই গ্রামে তাঁর আত্মীয় স্বজাতিদের কাছে। এবং নিপুণ ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন এই নবীন দে নামক ব্যক্তিটি ওই গ্রামে ব্যবসায় করতে গিয়ে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কোন বিরোধিতা না করে দেখে শুনে ক্রোশ দুই দূরবর্তী এই পতিত প্রান্তর বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। তখন এই পাঁচ ক্রোশ লম্বা লাল মাটি আর পাথর ভরা মাঠের নাম ছিল তিনভুবনের মাঠ। ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সেকালের সড়ক, সড়কের পাশে উত্তরের তিন ক্রোশ দক্ষিণে দু ক্রোশ দূরে দুখানি গ্রাম। এই বট বেল অশথের জঙ্গল ছিল ডাকাত ঠ্যাঙাড়ের আড্ডা। আর এই পাঁচ ক্রোশের মধ্যে কোন ভাল জলাশয় ছিল না। প্রান্তরটা বন্দোবস্ত নিয়ে নবীন দে এখানে কাটিয়েছিলেন একটি ছোট জলাশয় আর এই ডাকাত ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে রফা করে তাদের কিছু কিছু জমি দিয়ে বসত করিয়ে প্রজা বানিয়েছিলেন। তারপর খুলেছিলেন একটি চটি। এই ডাকাতেরাই ছিল এখানকার পাহারাদার। ক্রমে চটি থেকে করেছিলেন ধান চাল কেনার আড়ত। তারপর ছোট পুকুর কাটিয়ে বড় করে করেছিলেন সরোবর দিঘী। জল হয়েছিল বড় নির্মল; তলা থেকে জল উঠত। রাঢ় অঞ্চলে খোয়াই প্রান্তরে হাত কয়েক খুঁড়লেই যেমন ঝরনা ওঠে তেমনি ঝরনা পেয়েছিলেন দে তাঁর ভাগ্যক্রমে। ক্রমে চটি আড়ত জমে উঠল। বসবাসের বাড়ি করলেন দে। কয়েক ঘর আপন জন বসল আশেপাশে। তাঁর গুরুও এসে বাস করলেন এখানে; দে তাঁর বাড়ি করে দিলেন—জমিও কিছু দিলেন। এই গুরু এই ঢিপিটির উপর এসে বসতেন সন্ধ্যে সকাল। অনেক দূর দেখা যায়। নির্জন রাত্রে কিছু জপতপও করতেন। হঠাৎ তিনি একদিন স্বপ্ন দেখলেন। এই স্বপ্ন। এবং একদিন শিব সত্যই উঠলেন মাটি ফেটে। লোক ভেঙে পড়ল দেখতে। গুরু তখন বললেন—আগামী পূর্ণিমা—বৈশাখী পূর্ণিমা—নবীন, তুমি গন্ধেশ্বরীর পুজো আনো। আর এখানকার সকল লোককে বললেন—ওই সরোবর থেকে শিবের মাথায় জল ঢালতে হবে; এক হাজার আট ঘড়া জলে বাবার স্নান হবে।

দিঘীর নাম হল ভুবনদিঘী। তিনভুবনের মাঠের নাম হল ভুবনপুর। বাবার নাম ভুবনেশ্বর। লোক সমাগম হলেই দোকানদানি আসে, আপনিই এসেছিল। সেখানে বিকিকিনি হল খুব। দিঘীর পাড়ে ওই প্রবাদে হাটের পত্তন হল। শিববাক্য রক্ষা করতে নবীন দে হাটের সমস্ত অবিক্রীত জিনিস কিনে নিতেন। সে সব জিনিস গাড়ি করে পরের দিন মঙ্গল-বারে পাঁচ ক্রোশ দূরের গোপালগঞ্জের হাটে পাঠাতেন। লোকসান হলেও সে লোকসান ব্যবসায়ী নবীন দে সয়ে নিতেন। সোম শুক্র শিবের বার, সেই বারে বাবা ভুবনেশ্বরের হাট; শিবের পূজাও হত, তাতে প্রণামীও পড়ত। আবার হাটে তোলাও উঠত। প্রণামী এবং তোলা ছিল দুভাগ। প্রণামীর বারো আনা সেবায়েত গুরুর, চার আনা দে মশাইয়ের এবং তোলার বারো আনা দে মশাইয়ের চার আনা গুরুর। পরে ১৯০৩ সালে এ নিয়ে সেবায়েত গুরুবংশের সঙ্গে শিষ্য এবং ভূস্বামী দে বংশের মামলা হয়; শিষ্যেরা ভুবনেশ্বর ঢিপি উঠবার মুখে একটা বাক্স করেছিলেন এবং লোকজনদের ওখানেই দর্শনী দিতে বলেছিলেন। ওই দর্শনীতে পুকুর সংস্কার, ঘাট বাঁধানো ঢিবিতে উঠবার পাকা সিঁড়ি এবং উপরে পাকা চত্বরে

মার্বেল দেবার ব্যবস্থা হবে। এই মামলায় এই সব কথা প্রকাশ পায়। মামলার সোলেনামা ত্ব ঘরেই আছে। সোলেনামা নথিপত্র বের হয়েছিল সেটেলমেণ্টের সময়। তাতে আরও বিচিত্র কথা প্রকাশ পেয়েছে। শিষ্যরা আপত্তি জানিয়েছিল হাটের তোলায়। হাটের তোলা ভুবনেশ্বরের সেবায়েত বা পাণ্ডা পাবে কেন? ঐ হাটের জমি শিবের দেবত্র নয়। সেটা দে বংশের খাস।

গুরু বংশের বৃদ্ধ ত্রিপুরাচরণ মিশ্র জবাবে বলেছিলেন—হাট শিবের জন্য চলে, শিববার সোমবারে হাট বসে; শিবপূজার জন্য যারা আসে তারাই হাট করে। তা ছাড়া ব্যবসায় শূন্য বখরাদার হিসেবে এই মিশ্র বংশ চিরকাল পরিশ্রম করে এসেছে। নজিরস্বরূপ বলেছে—এক সময়ে এখানে মিথিলাভূমের অনুকরণে শিবরাত্রির সময় বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করবার প্রথা চালু করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তাঁরা নিজে মৈথিলী ব্রাহ্মণ। মিথিলায় মেলা আছে—যে মেলায় পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষের অভিভাবকেরা আসেন, দেব দর্শন করেন এবং পরস্পরের পুত্রকন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। ঐ মেলা এখনও মিথিলায় আছে। ভুবনপুরের হাটে শিবের বরে সুখ দুঃখ বিকিকিনি হয়, সুতরাং কন্যাদায় দুঃখ, পুত্রের বিবাহ সুখ বিনিময় শিব সাক্ষী করে করলে বিবাহ আনন্দের হবে এই বিশ্বাসের উপর ভরসা করেছিলেন। রামকেলির মেলায় বৈষ্ণবেরা বৈষ্ণবী খোঁজেন, বৈষ্ণবীরা বৈষ্ণব খোঁজেন, মালা বদল করেন। এখানেও তেমনি কিছু করার পরামর্শ গুরুর দেওয়া। শিষ্যরা তা নিয়েছিল। বিবাহ পিছু সওয়া পাঁচ আনা শিবপ্রণামী চার আনা হাটের কর হলে আয় অনেক হওয়ার কথা। চেষ্টা হয়েছিল। কিছুদিন চলেছিল। তারপর উঠে যায়। ১৮৮০।৮১ সালের কথা। ত্রিপুরাচরণ তখন যুবক। তাঁর মনে আছে। দে বংশের প্রবীণ পুরুষ শোভারাম দে দেখেছেন, তিনি বলুন। ওই প্রথাটা উঠে গেলেও এখনও লোকে বিয়ের সময় বাবার স্থানের সিঁদুর আর এই হাটের লাটাই কুলো কিনে নিয়ে যায়; তাতে নাকি বিয়ে সুখের হয়।

তখন ওই মামলায় একটা আপোসে সোলেনামা হয়। তাতে শিবের আয় গুরুর হয়, হাটের আয় শিষ্যের হয়। তবে একটা তরকারির তোলা গুরুর প্রাপ্য হয়। এক ঝুড়ি তরকারি। সে শিষ্যই তুলে দিয়ে পাঠাত। কিছু তরকারি শিবের দরবারেও পড়ে। তার মধ্যে কচুর ডাঁটি ওল উচ্ছে; নিমের সময় হোক বা না হোক—নিম, এই সবই বেশী। মধ্যে মধ্যে মিষ্টি, দুধ এবং সুগন্ধি আতপ আসে, মধুও আসে।

একটা ছড়া আছে এখানে—ভুবনপুরের হাট গেলে মাটি দিয়ে সরা মেলে, তিতো দিলে মিঠা মেলে, খুদ দিলে চাল পায়, অম্বলের রোগ যায়, দুখ দিয়ে সুখ পাবে—মন হারালে মন পাবে; এমনিতর অনেক বড় ছড়া। কচুর ডাঁটি, কলমীপাতা, শাকের নাম পাতা চোতা—যা নিয়ে যাবে তাই বিকোবে। দৈব ওষুধে শাক অম্বল গুড় মুড়ি প্রায় বারণ থাকে—এখানে বাবার ওষুধ খেলে শাক, সে এই হাটের শাক খেতেই হয়। খানিকটা দূরে ময়ূরাক্ষীর একটা বিল আছে সেখানে প্রচুর কচুর শাক আর কলমী শুষ্‌নে জন্মায়। বিলটা দে মশায়দের। শাখ খাওয়ার বিধানটা সেবায়েত মিশ্র মশায়দের।

এ সব ছোট কথা। বড় কথা ভুবনপুরের গঞ্জটা, হাটখানার পাশেই ওই সড়কটার

দুপাশে একসময় মস্ত গঞ্জ জমে উঠেছিল। এখনও ছোট নয় তবে ভাঙ্‌টা পড়েছে। ওই শিব মাহাত্ম্যে আর হাট মাহাত্ম্যে আর ওই দিঘীর জলের জন্তে ধান চাল কলাই মুগ লঙ্কা মসুরির গাড়ি এখানেই আঁট দিতো। ভুবনপুরের দু ক্রোশ দূরে গোপালপুর গন্ধবণিক-প্রধান সমাজ। যেখানে নবীন দে এসে প্রথম আশ্রয় নিয়েছিলেন সেইটেই ছিল পুরনো কালে বড় আড়তদারির গঞ্জ। আর উল্টো দিকে তিন ক্রোশ দূরে ছিল ছোট একটা বাজার; এই দুটোকেই কানা করে দিয়ে জমে উঠেছিল ভুবনপুরের হাট এবং আড়তদারির গঞ্জ। বছর চল্লিশেক আগে ভুবনপুর থেকে ক্রোশ তিনেক দূর দিয়ে পড়ল একটা লাইট রেলওয়ে। ওই গোপালপুর থেকে এক ক্রোশ তফাতে। তখন থেকে ভুবনপুরের হাটের বিশেষ ক্ষতি না হলেও আড়তদারী ব্যবসায় কিছু ভাঙন ধরল। গোপালপুরে বণিকেরা রেল স্টেশনের মুখে একটা গঞ্জ জমাবার চেষ্টা করলে এবং কিছুটা পেরেও উঠল। ষোল বছর আগে দেশ স্বাধীন হল। তার পর বছর দশেকের মধ্যে আবার দান ওল্টালো। এই সড়কটাকে সরকার করলে পিচ-দেওয়া পাকা রাস্তা। তার ওপর চলতে লাগল বাস লরী ট্রাক। একজন মরোয়াড়ী এসে করলে একটা রাইস্‌ মিল। তারপর হাট হালে অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটল। এই রাস্তার ধারে ধারে লোহার খুঁটি বসল দুসার। একসার টেলিগ্রাফের, তারপর সারি বসল, সে সব বড় বড় লোহার খুঁটির সারি; বসল জমির মাঝে মাঝে, তার উপর তিনটে মোটা তার চলে গেল, খুঁটিগুলোর গোড়াতে কাঁটা তার বেড়ে দিয়ে লাল রঙে মড়ার খুলি-আঁকা ছোট বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হল। তাতে লেখা থাকল—সাবধান। এ যে কল্পনার অতীত ব্যাপার। ইলেকট্রিক আলো জলবে!

ভুবনপুরের আড়তের এলাকার গ্রামে ইলেকট্রিক আলো জলল। জলল গোপালপুরেও, ওই স্টেশন এলাকাতেও। এ ইলেকট্রিক লাইন আসছে। মাইথন থেকে দুর্গাপুর হয়ে গোটা দেশে এদিক ওদিক নানান দিকে, বলতে গেলে দেশময়। এখন অবিশ্যি বড় বড় গাঁয়েই জলছে, ছোট গাঁয়ে কিন্তু ভিতরের দিকে যাচ্ছে না। তবে পরে নাকি যাবে। ভুবনপুরের হাটের ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু খুঁটির মাথাতেও একটা আলো ঝুলে গেল।

হাট বসে বেলা তিনটে থেকে। ভাঙতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। বা সন্ধ্যে হলেই ভাঙতে হয়। আলো জেলেও অবিশ্যি সোমের হাট্‌টা চলে; কেউ হেজাক জ্বালে, কেউ লণ্ঠন, কেউ কেরোসিনের দুমুখো কুপি। কিন্তু ঝড়ে বা বাতাসে অসুবিধে ঘটে, এবার সে অসুবিধে ঘুচল।

সব থেকে খুশী হল টিক্‌লির মায়ের গুষ্টি। আর ঠ্যাংকাটা চুনারিয়ার বাবা। আর শিবে জমাদার। সব থেকে অসুখী এবং অখুশী হল বুড়ো হেঁপো রাখাল। হেঁপো রাখাল গাঁজা খায়, ভিক্ষে করে, তার অখুশী হওয়ার কারণ আলো চোখে লাগলে তার ঘুম আসে না। বন্ধ ঘরে সে শুতে পারে না। ঘরদোরও নেই, পড়ে থাকে গুঁইদের কাপড়ের দোকানের বারান্দায়। তার থেকেও অসুখী মানে অত্যন্ত বিরক্ত হল চুনারিয়া। রাত্রে তার বাপকে ফাঁকি দিয়ে কোন গাছের আড়ে দাঁড়িয়ে কেউ ডাকলে সে উঠে যেতে পারবে না। টিক্‌লির চুনারিয়ার মত বাবার ভয় নেই, ওর মা সব জানে, সে সব থেকে বেশী খুশী হল—রাত্রের

খরিদ্দার এলে দূর থেকেই দেখতে পাবে ; চুনারিয়া খদ্দের ভাঙিয়ে নিলে সে ঝগড়া করতে পারবে।

এরা, হাটের আবর্জনা যেমন একপাশে ডাঁই হয়ে থাকে, তেমনি এই হাটেই এরা জমে আছে। এখানেই ও.দর জন্ম এখানেই ওদের মৃত্যু। এর মধ্যে আর বিশেষ মানে বিয়েটিয়ের খুব কড়াকড়ি নেই। হঠাৎ একদিন টিকুলির সিঁথিতে সিঁদুর চড়ে গেল, কে দিলে কেউ খোঁজ করলে না।

হঠাৎ এই ভুবনপুরের হাটে এল রূপসী মেয়ে মালতী। ভরা যৌবন। উনিশ কুড়ি বছরের অবিবাহিতা মেয়ে। আশ্চর্য মেয়ে। গায়ে সাদা সেমিজ, পরনে টকটকে রাঙা পাড় শাড়ি, কাঁধে একটা চ্যাঙারি আর একটি আধবুড়ী মেয়ের মাথায় একটা বড় ঝুড়ি চাপিয়ে হাটে এসে ঢুকে, তন্তুবায়দের চালার সামনে এসে বললে—ধরণী দাস, সুরভি গাঁয়ের ধরণী দাস, তাঁতের কাপড় বেচেন, তাঁর চালা কোন্‌টা বলতে পারেন ?

হাটে তখন লোকজন কম, সবে পসারীরা আসছে। খদ্দের সমাগম হয় নি। তবুও যে কিছু লোকজন এসেছিল সবার মুখ ঘুরে গেল ওই চালার দিকে। একটা ছোঁড়া কোমরে একটা লম্বা লাঠির গায়ে আড়াআড়ি ক্রুশের মত আর একটা খাটো বাঁশের লাঠি বেঁধে—তাতে কার, চাবকী, ফিতে, তার সঙ্গে চুলের কাঁটা হেয়ার ক্লীপ বিক্রি করে আর হাঁকে—দু-দু আনা, চাবকী ফিতে কার লম্বায় হাত চার। চুল বাঁধলে খুলবে না, চলে গেলে মিলবে না। জামাই বাঁধলে ছিঁড়বে না। জামাই বাঁধা কার, চুল বাঁধা ফিতে। দু-দু আনা! দু-দু আনা,—সেই ছোঁড়াটা চেঁচিয়ে হেঁকে উঠল—কুমকুমের টিপ তরল আলতা!

কথাটা তার বৃথা গেল না—মেয়েটা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হেনে বায়েকের জন্যে তাকিয়েই আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

তাঁতের কাপড়ের ওই ব্যবসায়ীটিই ধরণী দাস। সে প্রবীণ লোক। মালতীর মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—কি কাজ তোমার বাছা ? ধরণী দাসের সঙ্গে ?

—আপনিই। আমি চিনেছিলাম। তবু জিজ্ঞাসা করলাম। আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমার বাবা—

—তুমি শ্রীমন্ত দাসের কন্যে ?

—হ্যাঁ আমি মালতী।

—তুমি ? তুমি—কথাটা যেন বলতে পারছিল না ধরণী দাস।

মালতী বলল—আমি সাত দিন হল খালাস পেয়েছি!

ধরণী দাস বললে—আমি বাপের তুল্য মা—কিছু মনে করো না, জেলখানাতে তা হলে খারাপ ছিলে না তো! বড় সুন্দর হয়েছ তো দেখতে!

মালতী হাসলে, বললে—হ্যাঁ বাড়ীর চেয়ে অনেক ভাল ছিলাম। বাড়ীতে থাকলে ঝিগিরি করতে হত নয়তো শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বাঁদী খাটতে হত!

—তোমার তো চার বছর মেয়াদ হয়েছিল।

—হ্যাঁ। কিন্তু সাড়ে তিন বছরেই খালাস পেয়েছি।

আবার সে ছোঁড়াটা হেঁকে উঠল—কুমকুম তরল আলতা পাউডার স্নো সাবান, সস্তায় যায়। সস্তায় যায়!

আলুওয়ালা—সেও প্রবীণ লোক, সে উঠে দেখতে গিয়েছিল মালতীকে। সে ফিরে এসে তার চ্যাটাইয়ে বসতে বসতে বললে—রসিক নাগর, ও মেয়ে সোজা মেয়ে নয়, খুনে মেয়ে! বুঝে-সুজে সস্তায় বেচতে যেয়ো!

—খুনে? আঁতকে উঠল ছোঁড়াটা।

দুই

(ক)

শ্রীমন্ত বৈরাগী ভুবনপুরের হাটে মাথায় চ্যাঙারি করে মনিহারীর দোকান আনত। এবং অন্য অন্য দিন এ-গ্রাম ও-গ্রাম মাথায় বয়ে ফিরি করে বেড়াতো। মনিহারী বলতে সস্তা তেল সিঁদুর চাবকী মালা ফিতে, কার, হেয়ার ক্লিপ হেয়ার পিন, তালা চাবি, পেন্সিল রবার একসারসাইজ বুক, চিনে মাটির পুতুল, শ্লেট, শ্লেটপেন্সিল. প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ ধারাপাত, কাপড়ের সাবান, গায়ের সাবান, খুব সস্তা সেণ্ট—এই। এর সঙ্গে ছিল শ্রীমন্তের আসল মাছ ধরার সরঞ্জাম। দু'চারটে হুইল, তার সঙ্গে বিভিন্ন আকারের বঁড়শি, মুগার সুতো আর তগী মায় তগীর সুতো। এই সুতো ছিল শ্রীমন্ত দাসের নিজের হাতের পাকানো। আর ছিল ওর বন্ধু গোলক কামারের কাটা বঁড়শি। শ্রীমন্ত বলত স্পেশাল বঁড়শি। এই সুতো দিয়ে আধমণ বাটখারা ঝুলিয়ে রাখত একটা। তগীর বঁড়শি এবং সুতোতে ময়ূরাক্ষীর বিলে দু-দুটো মেছো কুমীর ধরা পড়েছে। একটার ছাল-চামড়া শ্রীমন্ত দাসের ঘরেই ছিল। নুন দিয়ে চামড়াটা শুকিয়ে নিয়ে তার ভিতরে খড় পুরে একটা ট্যারা-ব্যাঁকা কুমীর শ্রীমন্তের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল। নিজে ছিল পাকা মেছুড়ে। যে দিন ফিরিতে বেরুত না সে দিন বিলে যেত মাছ ধরতে। এবং রাত্রে গ্রামে সম্পন্ন গৃহস্থের পুকুর থেকে মাছ ধরত। সে মাছ-ধরা সাংঘাতিক মাছ-ধরা। সাত আট দিন ধরে ভাল মাছের পুকুরে চুপিচুপি গিয়ে একসময় একই জায়গায় চার খাইয়ে আসত। তারপর একদিন একটা কঞ্চির মাঝামাঝি জায়গায় কাপড়ে মোটা পরিমাণে চার বেঁধে সেটাকে পুঁতে দিত, জলের উপর বেরিয়ে থাকত আঙুল চারেক কঞ্চি। ওই মাথায় দু'তিনটে শামুকের খোলা সুতোয় গেঁথে বেঁধে দিত। এতে আটদিন একই জায়গায় গন্ধভরা খাদ্যের সন্ধান পেয়ে মাছেরা এসে জমত। ঘুরত। কঞ্চিতে বাঁধা কাপড়ের ভিতরের খাদ্যের জন্য ওটাতে ঠোকর মারত, তাতে জলের উপরে শামুকের খোলা-গুলো পরস্পরের সঙ্গে ঠোকর মেরে খুট-খুট-খুটু-খুট-খুটু-খুট শব্দ তুলত। তখন একদিন শ্রীমন্ত যেত রণসজ্জায় সেজে। রাত্রে গিয়ে একটা মোটা খাটো ছিপে মোটা তগীর সুতো পরিয়ে বড় বড় দুটো তিনটে বঁড়শি গেঁথে বঁড়শিগুলিকে ওই চারের থলির সঙ্গে সুতো দিয়ে বেঁধে দিত। এবং নিজে এককোমর জলে দাঁড়িয়ে পেটের নিচেই কাপড়ের থাঁজের উপর

ছিপটা রেখে এবং কোমরের সঙ্গে বেঁধে দু'হাতে শক্ত করে ধরে থাকত। বেশীক্ষণ লাগত না। প্রলুব্ধ মাছগুলো ওই বঁড়শি পরানোর সময় সরে গেলেও মানুষটা উঠে গেলেই আবার ছুটে আসত এবং চারের থলিতে ঠোকরাতে আরম্ভ করত। শামুকগুলো খুটুখুটু শব্দে বাজত।

এইখানেই শিকারীর কেরামতি। বাঘ শিকারী রাত্রে মড়ির হাড় চিবোনের শব্দে যেমন অন্ধকারে মাচায় বসে বুঝতে পারে এ শব্দ শেয়ালের, এ শব্দ নেকড়ের, এ শব্দ বড় ডোরাদারের—মাছ শিকারী শ্রীমন্তও তেমনি শব্দ থেকে বুঝতে পারত, এটা আড়াইসেরী এটা পাঁচসেরী এটা দশ এটা পনেরসেরী রুই বা কাতলা বা মৃগেল। অপেক্ষা করত সে এবং যেই পনেরসেরী রোহিতের ঠোকরে খটো খটো, খটো-খটো খটো-খটো—খটো খটো খটো খটো খটো শব্দ উঠেছে অমনি দুই হাতের প্রবল ঝাঁকি দিয়ে মাথার পিছন দিকে মারত ঘাই।

সবল সাহসী মরদ ছিল শ্রীমন্ত। সেই ঘাইয়ে পনেরসের রোহিত বঁড়শিতে গেঁথে তার মাথার উপর দিয়ে শূন্যমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হয়ে একেবারে পিছনে পাড়ের উপর ডাঙায় গিয়ে পড়ত। এ সহজ কথা নয়, এ প্রায় মাটির উপর দাঁড়িয়ে বাঘ শিকার, বাঘকে লাফের সঙ্গেই পেড়ে ফেলার মত কঠিন। কোমরে বাঁধা ছিপটার ঘাইয়ে যদি মাছটা পিছনের দিকে মাথা পেরিয়ে পড়ল তো শিকারীর জিত; যদি না পড়ল—মাছ যদি জলে থাকল বা একটু উঠে সঙ্গে সঙ্গেই জলে পড়ল তবে কোমরে ধাক্কা খেয়ে শিকারীকে জলে পড়তে হয় উপুড় হয়ে—এবং পনের বিশ সেরী মাছের জলের ভিতরে টানে ডুবতে হয় মরতে হয়। তবে মরে কমই। এ ক্ষেত্রে ঠিক মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ শিকারের সঙ্গে অনেক তফাত, কারণ বাঘ শিকারে এ রকম শিকারী অনেক বেশী মরে।

শ্রীমন্ত দাস এ শিকারে সুনিপুণ এবং দেহের দিক থেকেও সত্যিকারের মর্দানা পুরুষ। শুধু মর্দানা পুরুষই নয় সুপুরুষ ছিল শ্রীমন্ত।

ওই গোপালপুরের ভিক্ষাজীবী বৈরাগীর ছেলে বাচ্চা বয়স থেকে এই ভুবনপুরের দে মশায়দের বাড়ীতে খানসামাগিরিতে ভর্তি হয়েছিল। দে মশায়দের বাড়ীতে এবং জগৎপুরের বাজারে নূতন হাওয়া লেগেছে। প্রথম যুদ্ধের পর, ১৯২৬।২৭ সাল; একদিকে বন্দেমাতরম—অন্যদিকে মোটর গাড়ির আমদানি, একদিকে বিদেশে বিলেতে মানুষের আকাশে ওড়ার খবর—অন্যদিকে জাত জন্ম উঠে যাওয়ার ধুয়ো তোলার মধ্যে দেশের সব কিছু এলোমেলো উল্টেপাল্টে দেবার গাওনার গৌরচন্দ্র শুরু হয়েছে। দে মশায়রা ১৯২৪ সালে মোটর বাস এনে সার্বিস খুলেছিলেন—বাসখানার নাম ছিল 'জয় গন্ধেশ্বরী'। দে বাড়ির ছেলেরা ক্লাব করেছিল জগৎপুরে। ওদের দেওয়া চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিতে জুতো জামা ঘেরাটোপ ধাঁচের কাপড় এবং চশমা পরা মিডওয়াইফ এসেছিল।

আলখাল্লা-পরা, দাড়ি গোঁফ চুলওলা, করতাল-বাজিয়ে টহল-দেওয়া অবধূত বৈরাগী ছিল শ্রীমন্তের বাপ; অল্প-বয়সীর দল তখন তাকে অদভূত বলে ডাকতে শুরু করেছে। এই সব নানান কারণে শ্রীমন্ত বৈরাগী বাপ দাদার ধারা ছেড়ে অন্যরকম হয়ে গেল। বাবুদের মাছ ধরার শখ ছিল। সুতো বানানো ওখানেই শিখেছিল। মাছের নেশা ধরেছিল,

ওখানেই নেশা ধরেছিল। বৈরাগীর ছেলে হয়ে বোতল থেকে চুমুক দিতেও শিখেছিল। হঠাৎ তার নবযৌবনে ভুবনপুরের বাবুদের খানসামা শ্রীমন্ত, মালতীর মা, বিমলার প্রেমে পাগল হয়ে তাকে নিয়ে পালাল। তখন ২৭।২৮ সাল। বিমলা কোড়াদের মেয়ে, বালবিধবা এবং রূপসী। চরিত্র তার মন্দই ছিল। বাপের বাড়ি ভুবনপুর থেকে দেড় ক্রোশ দূরে ওই বিলের ধারে। শ্বশুরবাড়িতে নানা দুর্নাম রটাই নয় আরও বেশী ঘটেছিল; দুষ্ট বদমাইশের দল জোর করে ওকে রাত্রে তুলে নিয়ে গিয়ে মাঠে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। শ্বশুরেরা ওকে বাপের বাড়িতে ফিরে দিয়ে গিয়েছিল; বাপ মা নিরুপায়—ফেলতে পারে নি। দিয়ে গিয়েছিল বাবা ভুবনেশ্বরের সেবাইয়েত মিশ্র মশায়দের চরণতলে,—দুটো খেতে পরতে দেবেন, বাবার থানের আগ্‌নে ঝাঁট দেবে, বাসন মাজবে। তখনও তাদের বিশ্বাস ছিল বাবার স্থানে সেবা করলে মেয়ের পরকাল হবে, এবং জাগ্রত বাবা ভুবনেশ্বরের পরিচারিকার অঙ্গে আর কেউ হাত দিতে পারবে না। কিন্তু কলিকালে বিশেষ করে ইওরোপে প্রথম যুদ্ধের পর বাবা যে ঘুমিয়ে পড়েছেন সমুদ্রমন্থনের বিষের মত যুদ্ধের বিষে। পেট্রোল বারুদের ধোঁয়া, গ্যাস বোমার গ্যাস, কামান বন্দুকের আওয়াজ থেকে বাঁচবার জন্ম নাকে কানে তুলো গুঁজে না ঘুমিয়ে উপায় ছিল না তাঁর। ফলে এমন একটি সুন্দরী এবং লাস্যময়ী দেবতার দাসীর দিকে অনেক হাত প্রসারিত হল নির্ভয়ে।

ধরণী দাসও তখন জোয়ান। তাঁদের শাড়ি বেচে। তার মনে আছে যে দিন বিমলা কাঁখালে ঝুড়ি নিয়ে বাবার তোলা নিতে হাটে ঢুকেছিল ঠিক আজকের মালতীর মত সে দিনের কথা। বাবার থানের শেষ সিঁড়িতে যেই ঝুড়ি কাঁখে ঈষৎ বঙ্কিমঠামে হেলে বিমলা দাঁড়িয়েছিল অমনি গোটা হাটের মুখটা ফিরে গিয়েছিল বাবার থানের দিকে। অথচ এপাশে সড়কটা থাকায় হাটের মুখটা, তা দশ পনের বছরেরও বেশী হবে, বাবার দিকটা পিছনে ফেলে সড়কের দিকেই ঘুরে গেছে। বিমলা যখন মিশ্রঠাকুরের পিছনে পিছনে ঝুড়ি কাঁখে তার চালার সামনে দাঁড়িয়েছিল একটা পয়সার (তোলার বদলে) জন্ম তখন ধরণী পয়সাটা মিশ্র মশায়কে দিয়ে আজকের ওই কারওয়ালা ছোঁড়ার মতই আচমকা হাঁক মেরে উঠেছিল—মনমোহিনী লাল গামছা—পাকা রঙ—নিয়ে যাও! পাশের সকলে খিলখিল করে হেসেছিল। বিমলা ঘাড় ঘুরিয়ে মুখ মুচকে কটাক্ষ হেনে বলেছিল—ফড়িংখেকো গিরগিটির শখ দেখ—ময়না ধরে খাবে! হাটের এইখানটিতে হাসির হুট্টরোল পড়ে গিয়েছিল। ধরণীর মান বাঁচিয়েছিল বাবা ভুবনেশ্বর। হঠাৎ সকলের নজর পড়েছিল শ্রীমন্তের মনিব শৌখিন দেবাবু কোঁচানো কাপড় গিলেকরা পাঞ্জাবী পরে বাবা ভুবনেশ্বরের সিঁড়ির উপর ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বিমলাকে দেখছেন। ধরণী বলে উঠেছিল—গাছের শিরডগালে বাজপাখী! ময়না গেল! মনিবের পিছনে শ্রীমন্ত। তার গায়ে বাবুর পুরনো শৌখিন গেঞ্জি—পরনে শৌখিন পাড় ধুতি! সেও তাকিয়ে আছে বিমলার দিকে।

এর এক মাসের মধ্যেই শ্রীমন্ত বিমলা উধাও। পালাল পালাল ওই গন্ধেশ্বরী বাসে চড়েই পালাল! না-হলে হয়তো বাবার দাসী নিয়ে পালানো সম্ভবপর হত না—ওদের দুজনের

একজন হত খোঁড়া একজন হত কানা। পথেই আটকে যেত।

তিন বছর পর শ্রীমন্ত ফিরেছিল—বাবুর মৃত্যুর পর। সিঁথিতে সিঁদুরপরা বিমলা এবং শ্রীমন্তের সঙ্গে ছোট একটা মনিহারীর দোকান।

দোকান নিয়ে হাটে কিছুদিন আসেনি শ্রীমন্ত। তারপর এল হাটে। বিজ্ঞাপন একটা করেছিল। ওই সুতোয় গাঁথা বঁড়শিতে ঝোলানো একটা আধমণি বাটখারা, তার সঙ্গে গাঁথা একটা শোলার মস্ত বড় মাছ। ধরণী দাসের সঙ্গে শ্রীমন্তের আগে থেকেই সুখ ছিল। সে এসে ধরণীকে বলেছিল—তোমার চালায় একটু জায়গা দেবে একপাশে? দোকানটা খুলি!

ধরণী তা দিয়েছিল। শ্রীমন্ত কৃতজ্ঞতাবশে ধরণীকে নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে বিমলার হাতের ভাজা তালের বড়া এবং দোকানের মিষ্টি খাইয়েছিল। বিমলা একটু হেসে পুরস্কৃত করেছিল—সে শ্রীমন্তের সামনেই।

শ্রীমন্ত মধ্যে মধ্যে মাছও খাওয়াতো তাকে। অধিকাংশ দিন সে এই মাছ ধরার ব্যাপারে একটু চতুরতার আবরণ দিয়ে মাছ ধরত। পুকুরে চার খাওয়াতো রাত্রে। কাঠি গুঁজত রাত্রে। বিল থেকে মাছ ধরে ফেরবার পথে। এবং মাছ যেদিন ধরত সে দিনও ওই বিল থেকে ফেরার পথে মাছ মেরে গামছায় বেঁধে নিয়ে ফিরত। অবিশ্বাস করবার জো ছিল না। কেউ অবিশ্বাস করতও না। তার আগেই সে বিলে মেছো কুমীর মেরে কিস্তি মাত করে রেখেছিল।

মাছ মেরে নিজেরা খেতো—বন্ধুদের বিলুতো, বিক্রিও করত। ব্যবসাও ভালই চলছিল। অনেক জায়গার অনেক লোক এসে বঁড়শি সুতো তগী তগীর সুতো কিনে নিয়ে যেতো। কিন্তু যে শ্রীমন্ত অবধূত বৈরাগীর ছেলে থেকে বাবুদের খাস খানসামা—তারপর সেই খানসামাগিরি ফেলে বাবুর শিকার আত্মসাৎ করে পালায় এবং আবার ফিরে আসে (সে-বাবুর মৃত্যুর পর হলেও) সে শ্রীমন্ত সহজ জীব নয়। ধরণী দাস বলে, সহজ জীব, কৃষ্ণের জীব কৃষ্ণের দয়ায় বাঁচে। শ্রীমন্ত কারুর দয়ায় বাঁচে না। ও কামড় খায় না, আগে-ভাগেই কামড়ায়। শ্রীমন্ত সত্যই ওই বিমলাকে নিয়ে ভেগে গিয়ে যে সাহসে যে বুকের পাটায় আবার ফিরে আসে মাথা উঁচু করে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে সব বাক্য বলত তা খদ্দেরের পক্ষে হজম করা কঠিন ছিল।

সুতো নিয়ে বেশী টানাটানির পরখ করলেই শ্রীমন্ত একটা বঁড়শি সুতোয় বেঁধে বলত—নাও বাবা হাঁ কর দেখি, সোনা!

—হাঁ করব?

—হ্যাঁ! কয়েযে বিঁধে দি—তুমি টানো—ছিঁড়ে বেরিয়ে যাও। দেখো ছেঁড়া যায় কিনা! এর চেয়ে ভাল পরখ তো হয় না। না হয় রাখো। রেখে বাড়ি যাও।

একদিন তার পুরনো মনিবের এক মোসাহেব বন্ধু—শহরে আমমোক্তারি কি টাউটের কাজ করে—সে দে মশায়দের বাড়ি এসেছিল আদালতের কাজে। সেদিন ছিল হাট। হাটে এসে বন্ধুর পুরনো খানসামা শ্রীমন্তকে দেখে হয় স্নেহ নয় করুণা নয় একটা কিছু উথলে উঠেছিল, সবিস্ময়ে সে বলেছিল—আরে শ্রীমন্ত যে! এ্যাঁ!

শ্রীমন্ত উত্তর দেয় নি।

সে ফের ডেকেছিল—এই ব্যাটা শ্রীমন্তে!

শ্রীমন্ত মুখ তুলে গম্ভীরভাবে বলেছিল—কি রে ব্যাটা কি বলছিস?

—আরে!

—আরে কি? আরে? হ্যাঁ রে আমি তোর ব্যাটা? না আমি তোর বাবার চাকর? ব্যাটা!

আমমোক্তারবাবু রাগ করে বাবুদের বাড়ি গিয়েছিলেন নালিশ করতে। শ্রীমন্ত গিয়েছিল সেকালে কংগ্রেস আপিসে। কিন্তু একদিন বেকায়দা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ কিল মেরে বসেছিল দারোগার নাকে। থানা আগে ছিল গোপালপুরে, পরে সেটা ভুবনপুরে উঠে এসেছে। দারোগা ছিল শিবেন চাটুজ্জে; এক নম্বরের লম্পট আর ঘুষখোর। নজর দিয়েছিল বিমলার উপর। এখানে সঙ্গী জুটিয়েছিল শ্রীমন্তের পুরনো মনিবের খুড়তুতো ভাইকে। বিমলা এককালে যা ছিল তা ছিল কিন্তু শ্রীমন্তের কাছে সে ছিল সতী স্ত্রী। বিমলা বলে দিয়েছিল কথাটা। শিবেন দারোগা শেষ পর্যন্ত ওর নামে চুরির মাল সামলানোর চার্জ এনে বাড়ি তল্লাস করতে এসেছিল। এসে চাল ডাল এক করে তচনচ করে দিয়েছিল সব, কিন্তু চোরাই মাল কিছু মেলেনি। আর সামলাতে পারে নি নিজেকে শ্রীমন্ত, হঠাৎ দারোগার নাকে মেরেছিল একটি কিল। দারোগার নাক ভাঙেনি কিন্তু রক্তে সব ভেসে গিয়েছিল, এবং ফুলেও ছিল বেশ কয়েক দিন। আর বাবুর গালে মেরেছিল চড়। এবং হনুমানের মত লাফ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে হয়েছিল ফেরার। কিন্তু ফেরার ক'দিন থাকা যায়; ধরা পড়েছিল শ্রীমন্ত এবং জেলও হয়েছিল তার ছ মাস। তবে শিবেন দারোগাও থানা থেকে বদলী হয়েছিল, ওদিকে বাবুও সাবধান হয়েছিল। শ্রীমন্ত বলে গিয়েছিল—কিছু ভাবিসনে বিমলি, জেল হচ্ছে, শূলি ফাঁসি নয়, ছ মাস পর ফিরব, ফিরে যদি শুনি যে কেউ তোকে চোখের পাতার ইশেরা করেছে তবে তার চোখ উপড়ে নেব। তাতে মরি তো ফাঁসি যাব।

এই শ্রীমন্ত, এই শ্রীমন্তের মেয়ে মালতী। ওর বাবা ছেলেবেলায় ডাকত 'মালা' বলে।

মালতী খুন করেছে, করে চার বছর জেল খেটেছে। সেও শ্রীমন্তের ওই মাছ ধরার জন্যে।

প্রথমবার জেল থেকে ফিরে শ্রীমন্ত কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছিল। মেজাজটাকেও সংযম শৃঙ্খলার জুতো-পরা পায়ের মত, জামা-পরা শরীরের মত নরম আর ফরসা করে ভদ্র করে তুলেছিল। তারপর হল মেয়েটা। শ্রীমন্ত আরও হিসেবী হয়ে সংসারী হল। বছর তিনেকের মেয়েটাকে রেখে বিমলা গেল মারা। শ্রীমন্ত বেশ কিছুদিন বিয়ে করলে না। মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়েই ফিরত। হাটে আসত, মেয়েকে নিয়ে আসত। শ্রীমন্ত দোকান করত জিনিস বেচত, ফুটফুটে মেয়েটা ঘুরে বেড়াত হাটে। রূপ তার তখন থেকেই। কখনও বাপের পাশে বসে ছবির বই দেখত নয় একটা পুতুল নিয়ে খেলা করত। বিলে শ্রীমন্ত মাছ ধরতে যেতো মেয়ে যেতো সঙ্গে, চার মাখাতো, টোপ ঘাঁটতো গাঁথতো। বছর চারেক পর শ্রীমন্তের কি হল, কোত্থেকে নিয়ে এল এক নতুন বষ্টুমী। অল্পবয়সী নয়, পরিণত যুবতী! নিয়ে এল

আটচল্লিশ সালে। সে এক পূর্ববঙ্গের মেয়ে। নবদ্বীপ গিয়ে তাকে নিয়ে এল কণ্ঠীবদল করে। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল, স্বভাবটা কিন্তু ভাল ছিল না। প্রথম দোষ ছিল হাসি, যেমন তেমন কোন একটা সুড়সুড়ির মত কথা হলেই হি হি করে হেসে সারা হত। কথা-বার্তাতেও বেশ হিসেব ছিল না। বুড়ো বললে শ্রীমন্ত রাগত কিন্তু চাঁপা ওকে বুড়ো বলবেই। কথায় কথায় বলত, মরণ বুড়ার। কিংবা বলত, রকম দেখ বুড়ার! কিংবা বলত, হবে নি, বুড়া বয়সে এত ভাল? শ্রীমন্ত গর্জন করত। কিন্তু গর্জনে থামত না চাঁপা। শ্রীমন্ত তখন কিল বসাতো পিঠে।

চাঁপা কিছুক্ষণ কাঁদত তারপর গুম হয়ে বসে থাকত—তারপর হাসত, বলত, যার যেমন নেকন—আমার নেকনে সারা জীবনটাই ভাদর মাস। পাকা তাল দুপদাপ পড়ছেই পড়ছেই। ভাদরেরও সংক্রান্তি নাই গাছের তালেরও শেষ নাই। মাঝে মাঝে পালাত তালতলা থেকে অর্থাৎ বাড়ি থেকে। প্রথম দুবার মার খেয়েই রাগ করে পালিয়েছিল নবদ্বীপ। শ্রীমন্ত গিয়ে ধরে এনেছিল। তারপর না বলে গঙ্গাস্নান দশহরায়, এখান ওখানকার মেলায়, দু তিন দিন পর ফিরত। যেত পাড়ার লোকের সঙ্গে। সঙ্গে ঠিক নয় পিছন ধরে যেতো। এক আধবার একলাও গেছে। লোকে কিন্তু মন্দ বলত। তবু শ্রীমন্ত ওকে ত্যাগ করতে পারেনি। সম্ভবতঃ বেশী বয়সের মোহ। আর ওই মেয়ে মালতীর জন্য। মালতীকে চাঁপা বশ করে ফেলেছিল এবং ভালও বাসত। মালতীর সঙ্গে পুতুল খেলত। বাড়ির উঠোনে কুমীর মানুষ খেলত। মালতীর জন্যে খেলত তা নয়, নিজের জন্যেও খেলত। পালিয়ে গিয়ে নিজেই ফিরত চাঁপা; মালতীর জন্য কিছু না কিছু, কাঠের পুতুল, মাটির ঘোড়া কিংবা লোহার হাতা বেড়ি হাঁড়ি থালা খেলনা যা হোক নিয়ে ফিরত। ফিরত সময় বুঝে, অন্ততঃ বাড়ি ঢুকত যে সময়টা শ্রীমন্ত থাকত না সেই সময়ে। এবং মালতীর সঙ্গে খেলাঘর পেতে খেলতে বসত। শ্রীমন্ত বাড়ি ঢুকেই বলত—হুঁ—এই যে!

চাঁপা আড়চোখে চেয়ে দেখেই আপন মনেই বলত—পিঠের ফুলাটা পুরানো হয়েছে, কিল মার। মার আস্তে মার!

কিংবা বলত—মালা আয় তো রে মা—পিঠে চাপ তো! কিন্তু ফুলো পুরনোই হোক আর মালতীই পিঠে চাপুক কিল যা মারবার সে শ্রীমন্ত মারতই।

মধ্যে মধ্যে কিল না মেরে শ্রীমন্ত চাঁপাকে ঘর থেকে বের করে দিত। চাঁপা দরজায় বসে কাঁদত এবং বলত—দোর খুল গো, পায়ে পড়ি। কিল তোমার যত খুশী মার, দোর খুল।

দু'একবার শ্রীমন্ত রাগ করে নিজের চুল ছিঁড়েছে, খেদ করেছে—এ কি করলাম! এ কি পাপ ঢুকোলাম ঘরে! হে ভগবান্!

চাঁপা এসে বলেছে—পায়ে পড়ি এমন করো না। আমারে মার! যত খুশী মার! পিঠ আমার সুড়সুড় করছে!

এরই মধ্যে, অর্থাৎ সৎমা চাঁপা এবং বাপ শ্রীমন্ত দুজনের ঝগড়ার মধ্যে প্রায় আপন মনে বেড়ে উঠেছিল মালতী। চাঁপাকে যখন ঘরে আনে শ্রীমন্ত, তখন মালতীর বয়স ছিল বছর

ছয়েক। চাঁপার স্বভাবচরিত্র যেমনই হোক ওর মধ্যে বিষ বা কাঁটা এ দুটোর একটাও ছিল না। স্বভাবটা ছিল মিষ্ট। পালাতো ফিরে আসতো মার খেতো, সবের মধ্যেই সে হাসত এবং বেশ একটি রসিকতার অধিকারিণী ছিল সে। চাঁপার বয়স তখন বিশ থেকে পঁচিশের যে কোনটা হতে পারত। সে মালতীকে বাড়িতে দেখে মুখ ভারও করে নি আবার মায়ের স্নেহেও গ্রহণ করে নি। হেসেই সারা হয়েছিল মুখে কাপড় চাপা দিয়ে—মরণ, এত বড় মেয়ের মা হতে পারি নাকি ?

শ্রীমন্ত রাগ করেছিল। চাঁপা বলেছিল—রাগ কইরো না। ওর সাথে তোমার সম্বন্ধটা ডবল কইরা দিব। বাবারে মেসো কইবে আজ থেকা। আমি অর মা হইতে পারব নি মাসি হব।

মালতীর চিবুক ধরে বলেছিল—আমারে মাসী কইয়ো। হ্যাঁ সোনা।

মালতী হেসে বলেছিল—আমি সোনা নই, আমি মালা। মালতী।

—হুঁ। তুমি আমার সোনার মালতী গ! বেহুলার গান জান ?—"জলে ভেসে যায় গ সোনার মালতী।"

মালতী বলেছিল—তুমি তো বেশ ভাল গান কর মাসী!

—শুধু গান ? নাচতে পারি সোনা। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ কইরা দেখাব তোমারে!

চাঁপার স্নেহ-মমতা চাঁপা তাকে আপনার মত করে দিত, শ্রীমন্ত সেও তার স্নেহ দিত আপনার মত করে—তার মধ্যে স্নেহ অকৃত্রিম এবং অনেক হলেও যত্ন রক্ষণাবেক্ষণ যথেষ্ট ছিল না। সে বেড়ে উঠেছিল আপনার প্রাণশক্তিতে ইচ্ছামত রুচির মধ্য দিয়ে। গাছে চড়ত, সাঁতার দিত, পাড়ার মেয়েছেলেদের সঙ্গে দাপাদাপি করত। হি হি করে হাসত। রাগলে চিৎকার করে গাল দিত। ফল ফুল চুরি করত। কারুর বাগানে ভাল গাছ দেখলে সেটা কোন সময়ে ঢুকে উপড়ে ফেলে দিত। ভয় তার ছিল না। বাপের কাছ থেকে পেয়েছিল সাহস।

ভোরবেলাতেই ওই ছ বছরের মেয়ে একগাছি পাঁচন লাঠি হাতে বের হত গ্রামের পথে। গাইটাকে খুঁজতে যেত। ওদের একটা গাই ছিল ; সেটার স্বভাব ছিল বিচিত্র ; সন্ধ্যেবেলা গোয়ালে পুরতে গেলেই হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে উঠে অতর্কিতে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেত। সারাটা রাত্রি কারুর বাগানে গাছ খেয়ে, কারুর খামারে খড় খেয়ে, কারুর ক্ষেতে ফসল খেয়ে পেট ভরিয়ে সকালের আলো ফুটলেই নিরীহের মত কোন গাছতলায় শুয়ে রোমন্থন করত। মালতী ভোরবেলা যেত সেই গাই খুজতে। খুঁজে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনত। তারপর বেলা সাড়ে দশটার সময় গাইটার সঙ্গে আর দুটো গরুকে খুলে গ্রামের পথে পথে ওদের 'ডাকিয়ে' অর্থাৎ তাড়িয়ে নিয়ে প্রায় গ্রাম পার করে কোন পুকুরপাড়ে বা ঘাসভরা জমিতে লম্বা দড়ি বেঁধে খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে দিয়ে আসত। আবার বিকেলে গিয়ে নিয়ে আসত। সন্ধ্যের মুখে এক একদিন বের হত ছাগলের সন্ধানে। ছাগলগুলোকে সকালেই ছেড়ে দিত—তারা গ্রামের ভিতর ঘুরে খেয়েদেয়ে সন্ধ্যায় আপনিই বাড়ি ফিরত। যেদিন ফিরত না সেদিন মালতী বের হত এবং পথে যেতে যেতে এক এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে

ডাকত—এ র্ র্ র্—আ—। এ র্ র্ র্ র্!

সেদিন চাঁপা পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁসগুলোকে ঘরে ঢোকাতো।—কোর—কোর—কোর—তি—তি—তি। কোর—কোর—কোর।

অন্যদিন মালতীই ডাকত।

চাঁপা আসবার আগে পাঁচ বছর বয়স থেকে এসব দায়িত্ব মালতী নিজেই নিয়েছিল নিজের ঘাড়ে। চাঁপা এসে ওর কাজ বাড়িয়ে দিল কিছু। শ্রীমন্তকে বললে—মাইয়ারে ইস্কুলে দাও না ক্যানে।

—কি করবে? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিল শ্রীমন্ত।

—ল্যাখাপড়া শিখবে!

—নিয়ে?

—নিয়া আবার কি? স্বাশ স্বাধীন হইছে। মাইয়ারা চাকরি করছে। করছে না? ওই তোমাদের গেরামের স্বন্নকারদের মাইয়াটা বিধবা হইয়া ল্যাখাপড়া শিখ্‌ছিল বইলা চাকরি করছে ইস্কুলে। না শিখলে কি করত? ঝিগিরি।

কথাটা শ্রীমন্তের মন্দ লাগে নি। ফ্রি প্রাইমারি বালিকা বিদ্যালয়ে ভরতি করে দিয়েছিল মালতীকে।

যেদিন ছাগল হারাতো সেদিন মালতী জানতো তার কপালে আজ লাঞ্ছনা আছে। ছাগল যখন ফেরে নি তখন সর্বনাশী কারু বাগানে ঢুকে গাছ খেয়েছে কিংবা কারুর উঠানে ঢুকে রোদ্দুরে দেওয়া ছোলা মসুর খেয়েছে এবং ধরা পড়ে হয় বাড়িতে বাঁধা আছে নয় গেছে হাফিজ মিয়ার খোঁয়াড়ে। বাড়িতে বাঁধা থাকলে কপালে বকুনি আছে, খেতে হবে। খোঁয়াড়ে গেলে কাল সকাল ভিন্ন পাওয়া যাবে না এবং পয়সা লাগবে। সে যেত শ্রীমন্ত। ছাড়িয়ে নিয়ে ছাগলটাকে পিটতে পিটতে বাড়ি আনত, এবং বলত, পালাতে যদি না পারবি তো পরের বেড়া ভেঙে ঢুকলি কেন? বকুনি যা খাবার সে খেতো মালতী।

মুখ বুজেই দাঁড়িয়ে থাকত। ক্রমে তারা ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিত।—যা নিয়ে যা! কিন্তু বকুনি অসহ্য হলে অকস্মাৎ মালতী সাপের মত ফণা তুলত। বলত—খেয়েছে অবোলা জীব, বুদ্ধি নাই—তোমাদের লোকসান হয়েছে, ধরেছ বেশ করেছ কিন্তু খোঁয়াড়ে দাও নাই কেন? কোন্ আইনে বেঁধে রেখেছ? ছেড়ে দেবে তো দাও নইলে বাবাকে বলছি সে থানায় যাবে। বেঁধে রাখবার আইন নাই!

এ সব শিখিয়েছিল তাকে শ্রীমন্ত।

চাঁপা এসে তাকে অন্য শিক্ষা দিয়েছিল।

(খ)

চাঁপা এসে তাকে শিখিয়েছিল—মিষ্টি কথা বইলা, কিছুটা তোষামদ কইরা মন ভিজাইয়া কথা কইলি পর দেখবা কোন কষ্ট পাবা না। কড়া কথা নাই বা বললা মাসী!

সেদিন মার খেয়ে এসেছিল মালতী।

ছাগলটা গিয়ে ঢুকেছিল ভুবনপুরের শিবের পাণ্ডাদের এক শরিকের বাগানে। বাগান ওদের ছিল পুজোর ফুলের জন্য। সেই বাগানে ওরা সেবার নতুন করে শীতকালে মরসুমী ফুল লাগিয়েছিল। শখ, বাড়ির একমাত্র ছেলে এবং সেই বাড়ির মালিক তখন, বাপের অকালমৃত্যুর পর। তার মামার বাড়ি বর্ধমান শহরে, সেখান থেকে মরসুমী ফুলের চারা এনে লাগিয়েছিল। ফুলও হরেক রকম ফুটেছিল। ছেলেটির বয়স বছর বারো হলেও বেশ পোক্ত ছেলে এবং পাকা ছেলে। বাগানের মধ্যে চৌকি পেতে বসে থাকে, গান গায়। গলাটি ভাল। দেখতেও সুন্দর। বাড়িতে পিসিমা আছে—তার আদরের নিধি। বাপও ছিল ভাল গায়ক।

ছাগলটা তাদের বাগানে ঢুকে ফুল সমেত গাছগুলোর একটা দিক প্রায় মুড়িয়ে খেয়ে দিয়েছিল। ধরে তারা ছাগলটাকে বেঁধে রেখেছিল। মালতী খুঁজতে খুঁজতে পথ চলছিল আর ডাকছিল—এ—র্—র্—র্। এর্—র্—র্!

ছাগলটার অভ্যাস ছিল মালতীর ডাক শুনলেই সাড়া দেওয়া, সে দে'দের বাড়ির ভেতর থেকে ম্যা ম্যা শব্দে সাড়া দিয়েছিল। মালতী সেদিন ঘুরেছিল অনেক। তাদের বাড়ি দেগঞ্জ, সে গ্রামের শেষ প্রান্তে ভুবনপুরের শিবের সেবায়েতদের পাড়াটা যেখানে এখন এক-রকম মিলে গেছে ততদূর চলে গেছে লক্ষ্মীছাড়ি হতচ্ছাড়ি ছাগলটা! দেগঞ্জে না পেয়ে মালতী ভাবছিল হয়তো খোঁয়াড়ে গেছে কিংবা পাইকারেরা পথে পেয়ে নিজেদের পালে মিশিয়ে নিয়ে চলে গেছে কিংবা গেছে শেয়ালের পেটে। ছাগলটার আওয়াজ পেয়েই বাড়িতে ঢুকে সে আবার ডেকেছিল—এর্-র্র্ এর্-র্-র্!

ছাগলটাও সাড়া দিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গলায় কে ভেঙিয়েছিল—এ-র্-র্-র।—এস! তোমার ছাগল!

মালতী দেখেছিল দশ বারো বছরের দিব্যি কাত্তিকের মত একটি টেরিকাটা ছেলে! একগাছা কঞ্চি হাতে বেরিয়ে এসে বলেছিল—তোমার পিঠে ভাঙব!

থতমত খেয়ে চুপ হয়ে গিয়েছিল মালতী।

—এগিয়ে আয়! এদিকে আয়!

মালতী বলেছিল—ছাগল ছেড়ে দাও। বেঁধে রেখেছ কেন?

—দেব। আগে পিঠের চামড়া তুলব তোর তারপর দেব। পাঁঠা হলে কেটে খেতাম। মাদী ছাগল। খাবার জো নেই। তোর পিঠ ভাঙব।

—কি করেছে আমার ছাগল?

—দেখ্ কি করেছে! ওই দেখ্!

দেখে মালতীর সত্যিই আপসোস হয়েছিল—এক পাশটা ফুলে ভরা, অন্য পাশটায় একেবারে মাটি বের করে গাছ খেয়ে দিয়েছে। তবে খুব বেশী নয়।

—কি, চুপ করে কেন?

এবার মালতী বলেছিল—ওই তো এতটুকু জায়গা! ওই তো বাকী সবটাই রয়েছে।

—এতটুকু জায়গা? বেশ তোর মাথায় চুল তো দেখি অনেক—আর এক গোছা চুল কেটে নি!

—ফক্কড়ি করবার জায়গা পাও নি! ছেড়ে দাও ছাগল। খেয়েছে তো খোঁয়াড়ে দাও নি কেন? বেঁধে রেখেছ কোন্ আইনে? ছেড়ে দাও নইলে থানায় যাব!

—থানায় যাবি? আইন? যা—ছাড়ব না!

মালতীর আর সহ্য হয় নি—সে জোর করে ছাগল খুলতে গিয়েছিল। ছেলেটা তার চুলের মুঠো ধরে টেনে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল।

মালতী বাড়ি এসেছিল কাঁদতে কাঁদতে। বাপ শ্রীমন্ত শুনে রাগ করেই তার সঙ্গে গিয়েছিল সেই বাড়ি পর্যন্ত। তখন ভিতর থেকে চমৎকার গলায় ভাজা তান ভেসে আসছিল। কেউ —কে আবার হবে সেই ছেলে—তখন বাগানে চৌকি পেড়ে বসে আ-আ-আ-আ-আ-আ তোম না—তোম না—তেরি তোমনা দ্রোম না করে তান ভাঁজছিল।

শ্রীমন্ত মেয়েকে হেসে বলেছিল—এই বাড়ি?

—হ্যাঁ।

—এ তো খাসা গান গাইছে! খাসা গলা।

সে কথা মালতীরও মনে হয়েছিল কিন্তু মুখে কিছু বলে নি। বাপ বেটীতে বাড়ী ঢুকে দেখেছিল ওই ছেলেটিই বসে পাকা ওস্তাদের মত গালে বাঁ হাত রেখে ডান হাত নেড়ে নেড়ে তেরে তোম—দ্রোম না দ্রিম—দ্রিম লাগিয়ে দিয়েই মধ্যে মধ্যে গিঁঠকিরি ঝাড়ছে—আ-আ-আ। হা-হা-হা। সে যেন নদীর বুকে বর্ষার বাতাসের ঝাপটায় অসংখ্য ছোট ঢেউয়ের হিল্লোল খেলে যাচ্ছে। ওরা ঘরে ঢুকেও কিছু বলতে পারে নি, অমন গানের মাঝখানে কথা তুলে বাধা দিতে ইচ্ছে হয় নি। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনেছিল। একবার বরং মালতী বলেছিল —আমাদের ছাগল নিতে এসেছি—

শ্রীমন্ত বাধা দিয়েছিল—চুপ কর।

বেশ কিছুক্ষণ পর হা-হা, হা শব্দে গানে ছেদ টেনে থেমে ছোকরা বলেছিল—কি? ছাগল?

—হ্যাঁ। আমরা নিয়ে যাব!

—পুলিস কই?

—পুলিস? শ্রীমন্ত প্রশ্ন করেছিল।

—হ্যাঁ। তোমার কে হয়? মেয়ে? তুমি তো শ্রীমন্ত, হাটে মনিহারীর দোকান কর?

—হ্যাঁ। আমার মেয়েকে মেরেছেন কেন?

—তোমার মেয়ে জবরদস্তি ছাগলটা খুলে নিয়ে যাচ্ছিল কেন? পুলিসের হুমকি দেখায় কেন? দেখ তো কি করেছে গাছগুলোকে খেয়ে! আবার মুখের উপর উত্তর কত! অত্যন্ত মুখরা ঝগড়াটে মেয়ে!

শ্রীমন্তের মেজাজটা কিছুতেই গরম হয়ে ওঠে নি। আশ্চর্য! শুধু তাই নয়, মালতীরও মার খাওয়ার জন্য সে ক্ষোভটুকুও আর ছিল না। বরং লজ্জাই হচ্ছিল ওর।

শ্রীমন্ত বলেছিল—তা মেয়েটা একটুকু ইয়ে বটে! লে ঠাকুরকে প্রণাম কর!

মালতী কিন্তু তা করে নি। এবার গোঁ ধরে দাঁড়িয়েছিল।

ছেলেটি বলেছিল—নিয়ে যাও ছাগল। বেঁধে রেখো।

ঠিক দুদিন পর আবার। ওই যে সেদিন বিলিতী ফুলের রস পেয়ে লুব্ধ হয়েছিল সে আর ভুলতে পারে নি। আবার ছাগলটা গিয়ে ওদের বাড়ির বাগানে ঢুকেছিল। এবং বাঁধাও পড়েছিল।

সেদিন মালতী খবরটা শুনেছিল মাঝপথেই। শুনেছিল—ওই সেবায়েতদের বাড়িতেই আবার বাঁধা পড়েছে। গ্রামের মধ্যে না পেয়ে এ অনুমান মালতীরও হয়েছিল। কিন্তু সেদিন আর তার পা ওঠে নি। মাঝপথ থেকে বাড়ি ফিরে এসে বলেছিল—আমি পারব না। আবার হতভাগী সেই বাড়িতে গিয়ে ফুলসুদ্ধ গাছ মুড়িয়ে খেয়ে ফেলেছে। বাবা যাক। আমি যাব না।

চাঁপা বলেছিল—যাও না মাসী। বাপ তো তোমার মাছ ধরনে গেছে গিয়া। ফিরতি রাত পহর গড়াবে। যাও গিয়া মিষ্টি কইরা বইলা দেখ। মিষ্টি কথা বইলা কিছুটা তোবামদ কইরা কথা কইলি পর দেখবা কোন কষ্ট পাবা না! কড়া কথা নাই বা বললা মাসী!

—তুমি যাও না!

—আমি! অরে বাপ! বউমানুষ না। সাঁঝের বেলা, বেটাছেলে—।

—বারো বছরের বেটাছেলে? বড় তো নয়!

—সেই তো।

—সেই তো কি?

হেসে ফেলেছিল চাঁপা। বলেছিল—বড় হলি সমঝাবা মাসী। ছাওয়াল তো। বারো বছর বয়স। আমি তার সাথে কি কথা বলব? তুমি যাও। তুমি কইলি পর তার মন ভিজবে। বুঝলা!

কথাটা গন্ধে গন্ধে যেন কিছুটা বুঝেছিল মালতী। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—তার উপর শ্রীমন্তের মেয়ে চাঁপার ভালবাসার সৎমেয়ে। চাঁপা দুপুরে ঘরে খিল দিয়ে গান গায় নাচে—মালতীকে শেখায়। শ্রীমন্তের সঙ্গে চাঁপার কথাবার্তা হয়—সে তারা মেয়েকে গ্রাহ্য করে রেখে ঢেকে বলে না। তার অর্থ মালতী অক্ষরে অক্ষরে না বুঝলেও কিছু কিছু বোঝে।

সেই বুঝেই মালতী কথাটার উত্তরে মুখ মচকে হেসে বলেছিল—যাঃ! তুমি বড় ফাজিল!

চাঁপা গান গেয়েছিল আস্তে আস্তে—

> ফাজিল হইয়া রহিলাম সখি
> ফাউ দিলেও কেউ লয় না।
> ফাজলামি উছলাইয়া পড়ে
> যৈবন জ্বালা যে সয় না।

বলে হিহি করে হেসে উঠেছিল। তারপর বলেছিল—চল, আমি বরং সাথে যাই। আমি সান কাইড়া দাঁড়াইয়া থাকব—তুমি কথা বলবা।

—কি বলব? বলব হাতজোড় করছি পায়ে ধরছি ছেড়ে দাও।

—দোষডা কি? বামুনের ছেলে। ভদ্দর জন—

—না—পারব না।

—বেশ। বলবা না পায়ে ধরি হাতজোড় করি—কাজ নাই বল্যা।

—তবে?

—বলবা—ঠাকুর অবোলা ছাগলের দোষ ধইরা কি করবা? রাগ করতি নাই সোনা।

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল মালতী—রাগ করতি নাই সোনা?

—না বললি উপায় কি? কচি বাচ্চা দুটা ঘরে রইছে। দুধ না খাইয়া মরবে?—চল চল।

অগত্যা গিয়েছিল মালতী। পিছন পিছন চাঁপাও গিয়েছিল। সেদিনও খোকাঠাকুরটি বসে গান করছিল। সেদিন তান নয়, গান!

—ওই নীল উজল তারাটি!
কিবা সলাজ মাধুরী মাখানো অধরে
অমিয় মাখানো হাসিটি!

বাড়ির বাইরেই ওরা দুজনে থমকে দাঁড়িয়েছিল। মালতী হাত ইশারা করে জানিয়েছিল—ওই শোন্। আজ তার আরও ভাল লেগেছিল; কারণ গানটা আজ তেরে না—তেনা না-না-না নয়। কথা রয়েছে। এবং কথাগুলি কী সুন্দর! আকাশে সন্ধ্যেবেলা পশ্চিমদিকে যে নীল ধকধকে তারাটা ওঠে সেই তারাটির কথাটা মনে পড়েছিল। ভোরবেলা মধ্যে মধ্যে দেখা পুব আকাশের ভুক্কো তারাটিকে মনে পড়েছিল। গানটাও যাত্রাদলে শুনেছে গন্ধেশ্বরীতলায় তাও মনে পড়ল।

চাঁপা বলেছিল—অ বুনঝি এ তো বেশ গ! নীল উজল তারাটি।

মালতী বলেছিল—হ্যাঁ! কী সুন্দর গাইছে!

—তোমার অই তারাটি হইতে সাধ হইতেছে না মাসী?

—ধ্যেৎ! তারপর বলেছিল—ওসব বলবে তো বাবাকে বলে দেব!

—তোমার বাবার যে আমি ওই তারা গ!

—চুপ কর—কে দাঁড়িয়ে আছে।

সত্যিই আর একজন কেউ ওদের বাড়ী ঢুকবার ভাঙা আগড়ের দরজাটায় যেন দাঁড়িয়েছিল। সেও চুপচাপ গান শুনছে।

চাঁপা বললে—মানুষটা মরদ মানুষ বুনঝি!

—হ্যাঁ!

গাইয়ে কিন্তু খুব মত্ত হয়ে গান করছে। সেই মত্ততাতে সন্ধ্যাটাকেই যেন মাতিয়ে দিয়েছে! গান শেষ হতেই সামনের লোকটা এগিয়ে গেল বাড়ীর ভিতরে। চাঁপা বললে—চল চল বুনঝি, মানুষটা গেছে ভিতরে, আমরাও যাই। এই সময় কিছু বলতি পারবে না। হাজার হক মানুষের ছামনে ত।

বাড়ীর ভিতরে তারাও গিয়ে ঢুকেছিল। ঢুকেই দেখে সে এক কাণ্ড। যে লোকটি দাঁড়িয়ে গান শুনছিল সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে খোকাঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়েছে আর

খোকাঠাকুর যেন বোকা ঠাকুর সেজে গেছে। লোকটি হাত বাড়িয়ে খোকাঠাকুরের দুই কান ধরে বললে, নীল উজল তারাটি! ইস্কুলে যাও না কেন? এ্যাঁ?

মালতী খিল খিল করে হেসে উঠল। সেই হাসিতে খোকাঠাকুরের বোকামি বোধ হয় কেটে সে বলে উঠল—কান ধরবেন না শূদ্দুর হয়ে। আমি মন্তর নিয়েছি! গুরুর কান। ছেড়ে দেন!

—গুরুর কান? ভাল—চুল—চুল কার? খামচি কেটে লোকটি চুলের মুঠো ধরলে।

—ছেড়ে দেন।

—দেব। দিচ্ছি। ইস্কুল যাস্ না কেন?

—জ্বর হইছিল মাস্টারবাবু। আজ ভাত খাইছে। উ কি করছেন? ছাড়েন ছাড়েন। চাঁপা ঘোমটা-টা ঈষৎ সরিয়ে বলে উঠল।

মাস্টার একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু চুল ছাড়লে না।—জ্বর? এই চকচকে চেহারায় জ্বর? বললে সে। তুমি কে? সাক্ষী দিচ্ছ?

চাঁপা বললে—আমি পাটকাম করি—আসি যাই বাড়ি। আজ ক'দিন থেক্যা জ্বর! আজ ভাত খাইছে। মাথাডা কাগের বাসা হইয়া গেছিল গিয়া। তাই ত্যাল দিছে! মারেন ক্যানে?

মাস্টার এবার ছেড়ে দিলে। বললে—জ্বর তো এই শীতের সন্ধ্যেতে খোলায় হিমে বসে নীল উজল তারাটি করছে কেন?

খোকাঠাকুর এবার যা করলে তা কল্পনাতীত। চট করে বাগানের একটা পড়ে থাকা বাঁশের খুঁটি কুড়িয়ে নিয়ে সেটাকে বাগিয়ে ধরে বললে—বেশ করছি রে ব্যাটা বেশ করছি। তোর মুখে, তোদের ইস্কুলের ছাদ্দতে কেত্তন করছি। এখন যাবি না বাঁশের বাড়ী খাবি?

মাস্টার আর কথা বলে নাই, সে নীরবে পিছন ফিরে চলে গিয়েছিল, বাড়ী ঢুকবার দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বলেছিল—তোকে রাস্টিকেট করব।

—আমার কচু হবে। আমি বাবা ভুবনেশ্বরের মাথায় বেলপাতা চড়িয়ে খাই, মা গন্ধেশ্বরীর আটনে ফুল দি, মা সরস্বতীকে ডাকলে আসে। তোদের ইস্কুল আমি ছেড়ে দিলাম। যা!

মাস্টার তবু দাঁড়িয়ে ছিল। বোধ হয় এই মেয়েদুটির সামনে এই অপমান তার সহ্য হচ্ছিল না। সে বলেছিল—বেটা বাপকে খেয়েছে, মাকে খেয়েছে, বুড়ী পিসীমার আদরে বখে গিয়েছে! শেষ পর্যন্ত গাঁজা মদ খাবি, যা পাণ্ডারা চিরকাল করেছে!

খোকাঠাকুর বলেছিল—যাবি—না তোকে ওই ছাগলটার মত বেঁধে রাখব বিনা হুকুমে ঘরে ঢুকেছিস বলে? আমি আইন জানি।

মাস্টার এবার চলে গিয়েছিল।

খোকাঠাকুর এবার বাঁশটা ফেলে দিয়ে পৈতে ধরে বলেছিল—আমি শাপ দিলাম তোর অম্লশূল হবে!

তারপর বাঁশটা ফেলে দিয়ে রুক্ষস্বরে বলে উঠল—কি? আজ ফের ছাগল ছেড়ে দিয়েছ

তোমরা। এই মেয়েটা! আজ সত্যিই তোকে মারব!

—আগে শুনেন—কথাটা শুনেন সোনাঠাকুর!

—সোনাঠাকুর কি? এঁ্যা—? খোকাঠাকুরও এবার হকচকিয়ে গেল।

চাঁপা বলেছিল—সোনার পারা দেহের বরণ, বাঁশীর মতন গলার স্বর। তুমি ঠাঁকুর সোনার গৌর! তাই কইছি সোনাঠাকুর!

—ও বললে হবে না। রোজ রোজ ছাগলে গাছ খাবে আমি ছাড়ব না! বেঁধে রাখ না কেন?

—তাই তো কই সোনাঠাকুর কথাটা শুনেন। আমার বুনঝি গিয়া কইল—মাসী তুমি শুনলা না, সে কী গান! যেন বাঁশী! কদম্বমূলের বাঁশী! রাতে মাইয়া ঘুমায় না। আজ বললাম—যাও না গান শুইনা আসো, তা কয়, কী বইলা যাব। তো কইলাম—বুনঝি ছাগলডারে ছাইড়া দাও, ও ঠিক যাইবে গিয়া ওই ফুলের গাছের লোভে লোভে—ধরাও পড়বে, তখন তুমি যাইবে। তা অর সাথে আমিও আসলাম। কান জুড়াইয়া গেল সোনাঠাকুর তোমার গান শুইনা। তা অখুন ছাগলডারে ছাইড়া দাও, বাড়িতে দুইটা বাচ্চা কাঁইদা সারা হইল।

সোনাঠাকুর সত্যই ছেড়ে দিয়েছিল ছাগলটাকে বিনা বাক্যব্যয়ে।

চাঁপা মাসী পথে বলেছিল—বস' বুনঝি হেঁস্যা লই।

সত্যিই সে খুব হেসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মালতীও হেসেছিল। তার কাছে আজ সন্ধ্যে-বেলার সবটাই অপরূপ উপভোগ্য হয়ে রয়েছে। ওই গানখানা কী ভালই লেগেছে! গান শুনছে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে খুঁজছে নীল তারাটিকে। কিন্তু পশ্চিম দিকটা শিবঠাকুরের সেবায়েতদের বাড়ির চাল আর গাছপালার ঢাকা পড়ে আছে। দেখা যায় নি। আকাশে তারা আজ বেশী নেই। যা আছে সব যেন মিটমিটে হয়ে গেছে জ্যোৎস্নায়। আজ পূর্ণিমা কিংবা শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। শীতও বেশ পড়েছে। কিন্তু শীতের কথা মনে হয়নি। কী সুন্দর গান খোকাঠাকুরের! তারপরই খোকাঠাকুরের সঙ্গে মাস্টারের কী কাণ্ড! খোকা-ঠাকুর বেশ। বলে—গুরুর কান! খবরদার ধরবে না। মনে পড়লেই হাসি পাচ্ছে। তার-পর বাঁশের খুঁটি নিয়ে ঠাকুর একেবারে পুঁচকে ভীমের মত কাণ্ড বাধিয়ে দিলে! মাস্টার সুড়সুড় করে লেজ গুটিয়ে পালাল। মাস্টারের যে অন্যায়। এমন সুন্দর গলা, এমন সুন্দর গাইতে পারে, সে আপন বাড়িতে বাগানে বসে গান গেয়েছে তাতে আর দোষটা কি হল? ইস্কুল যায় না। তা পড়তে ওর ভাল লাগবে কেন? আর পড়ার দরকারটাই বা কি? যাত্রা-দলে চলে যাবে। গন্ধেশ্বরীতলায় কলকাতার বড় বড় দল আসে—তাদের দলের ছেলেদের গানও তো শুনেছে মালতী! তাদের ক'জনের এমন গলা! বেশ বলেছে—শিবঠাকুরের মাথায় বেলপাতা চড়িয়ে খাই, মা গন্ধেশ্বরীর পুজো করি, মা সরস্বতী আপনি আসে! তারপর চাঁপা মাসী! চাঁপা মাসী—খুব! খুব তুমি চাঁপা মাসী। খুব জাঁহাবাজ, খুব ফাজিল খুব ফক্কড়। কেমন না হেসে বেশ বিনিয়ে বিনিয়ে বললে—তোমার গান শুনবে—তা আসবার তো একটা ছুতো চাই। তাই ছাগলটা ছেড়ে দিয়েছে। আর কেমন ইনিয়ে বিনিয়ে বললে—সোনার

গৌরের মত চেহারা তোমার, বাঁশীর মত গলা—তুমি সোনাঠাকুর। সব মিলিয়ে ভারী মজার ব্যাপার মনে হয়েছিল মালার। কিন্তু চাঁপা মাসীর জিত—তাতে তার সন্দেহ ছিল না।

কথাগুলি ধরণী দাসকে শ্রীমন্ত বলেছিল পরের দিন শুক্রবারের হাটে। শ্রীমন্তকে কথাটা চাঁপা মাসী বলেছিল। সে বেশ হাত পা নেড়ে ভঙ্গি করে হেসে প্রায় উলটে পড়তে পড়তে বলেছিল।

শ্রীমন্ত প্রথম একবার চটে উঠে বলেছিল—ফ্যাকফ্যাক করে হাসে দেখ্!

চাঁপা আরও হেসে উঠেছিল। শ্রীমন্ত বলেছিল—নোড়া দিয়ে দাঁতগুলো তোর ভাঙব আমি।

চাঁপা বলেছিল—তুমি ঠকবা। খ্যাষম্যাষ আবার বাধাইয়া দিবা। তুমি এত চট ক্যানে গো কর্তা। তোমার দাঁত তো ভাংগে নাই!

শ্রীমন্ত বলেছিল—মালা, বল তো হাসির এত কি হল?

মালা বলেছিল—আমি পারব না। হাসি আসছে!

—তোরও হাসি আসছে?

—ও মানিক, তুমি যদি খোকাঠাকুরের বাঁশের খেঁটে নিয়া গুরুমশায় তাড়ানটা দেখতা! তা হলে তুমিও ভুঁয়ে পইড়া হাঁসতা।

না দেখেও কানে শুনে, ভুঁয়ে পড়ে না হলেও, যথেষ্ট হেসেছিল শ্রীমন্ত। কোন রকমে চাঁপাই কথাগুলি বলে শেষ করেছিল।

পরদিন খোকাঠাকুর হাটে এসেছিল পাণ্ডা সেজে। এর আগে পর্যন্ত ওর পিসীই আসত, বাবা ভুবনেশ্বরতলায় দাঁড়াত, হাটযাত্রী ও থানের যাত্রীদের পুষ্প দিত। অম্বলের ওষুধের গুঁড়ো দিত। পয়সা নিত। বাবার স্থানের প্রণামীর টাকায় দুপয়সা ভাগ নিত। দে'দের পাঠানো তোলার নিয়ম ছিল। তোলা পাবে পালিদার, তবুও একটা বেগুন দুটো মুলো চারটে আলু সে আঁচলে ভরে নিয়ে যেত জোর করে। বলত—নাবালক ছেলে। পাবে কোথা? বড় হলে নেবে না।

এ কথাতেও কেউ প্রতিবাদ করলে বলত—দেখ বাবা বকো না। আমার ভাইপো বড় হলে পাণ্ডাগিরি করতে আসবে না। এ দেখে নিয়ো।

পিসী ওকে অনেক সাধ আশা করে পড়তে দিয়েছিল, ছেলে চাকরি করবে। না হলে বড় ওস্তাদ হবে। নবু, অর্থাৎ খোকাঠাকুরের নাম নবগোপাল, নবগোপালের বাবাও ওস্তাদি করে বেড়াত। নামও ছিল এ অঞ্চলে। তখন দেশে গানের বেশ চল্‌তি হয়েছিল, বিশেষ করে ভদ্রঘরের মেয়েদের বিয়ের জন্যে। মেয়েরা এখানকার ইস্কুলে মাইনর পর্যন্ত পড়ত, কেউ পাস করত কেউ করত না। কিন্তু ওতেই লেখাপড়াজানা বলে চলে যেত। কিন্তু শুধু লেখাপড়ায় বিয়ে হত না, বিয়ের সম্বন্ধ হলে পাত্রপক্ষ জিজ্ঞেস করত—গানটান জানে?

করত ঠিক নয়, শহরবাজারে এ জিজ্ঞাসা করে সুতরাং এখানেও করবে এ প্রত্যাশাতেও বটে, আবার শহরের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেব মেয়ের এই গোপন ইচ্ছাতেও বটে রেওয়াজটা

উঠেছিল। নবুর বাবা নিত্যগোপাল মিশ্রেরও গলা খুব ভাল ছিল, গান তারও ছিল জন্মগত সম্পত্তি—শিখেওছিল সে ভাল ওস্তাদের কাছে। ওস্তাদের কাছে গানও শিখেছিল নেশাও শিখেছিল। নেশা অবিশ্যি শিবঠাকুরের পাওয়ারা করে। তারপর ওস্তাদি করে বেড়াত। গ্রাম অঞ্চলে তখন থিয়েটারেরও চলন হয়েছে—থিয়েটারেও বৈতালিক সেজে গান গাইত—রোজগার কিছু হত। এই সময়েই গাঁয়ে এসেছিল নতুন ডাক্তার নিশিবাবু। ডাক্তারখানার চাকরি নিয়ে এসেছিল—সঙ্গে স্ত্রী আর দুই মেয়ে। মেয়েদের ইস্কুলে ভরতি করেই ডাক্তার কর্তব্য শেষ করে নি—প্রাইভেট মাস্টার রেখেছিল; বড় মেয়ে তখন মাইনর ক্লাসে পড়া শেষ করেছে। তার সঙ্গে নিত্যগোপালকেও রেখেছিল গান শেখাবার জন্যে। তারপর দেখা-দেখি দে বাবুদের বাড়িতেও রেওয়াজ ঢুকেছিল।

নিত্যগোপাল হঠাৎ মারা গিয়েছিল তিরিশ বছর বয়সে। তখন স্ত্রীর কোলে নবগোপাল তিন বছরের ছেলে। নবগোপালের আগে দুটি সন্তান হয়ে মারা গেছে। নবগোপালের পাঁচ বছর বয়সে মারা গেল মা। পিসী ছিল বাড়িতে—মকু বা মোক্ষদা ঠাকরুন—সেই মানুষ করেছিল ভাইপোকে। এবং ছেলেবেলাতেই বাপ মা খাওয়াতে প্রত্যাশা করেছিল ভাইপো মস্ত লোক হবে।

নবগোপালের জন্যে প্রাইভেট মাস্টারও রেখেছিল। কিন্তু নবগোপাল ইস্কুলে ফেল করলেই মাস্টার বদলাতো। এই কানধরা মাস্টার এবারকার বরখাস্তকরা মাস্টার।

নবগোপাল কাল সন্ধ্যেতেই পিসীকে বলে দিয়েছে—ও পড়াশুনো আমার দ্বারা হবে না। কাল থেকে আমি বাবার থানে যাব। কুলকর্ম করব।

পিসী বাদপ্রতিবাদ করেছে কান্নাকাটি করেছে কিন্তু নবগোপাল অনড়। বারো বছর বয়সে সে বাইশ বছরের মত আইন শিখেছে; সে বলেছে—তুমি আমার গার্জেন নও। সংসারে বাপ মলে মা গার্জেন হয় যার বাপ মা দুই মরে তার কাকা টাকা গার্জেন হয়। তুমি পিসী, ভিন্ন গোত্র—তুমি গার্জেন হতেই পার না। আমি নিজেই আমার গার্জেন।

সে আজ স্নান করে পাটের কাপড় পরেছে, কপালে ছাইয়ের একটা লম্বা তিলক কেটেছে, হাতে বেতের একগাছা ছড়ি নিয়ে দস্তুরমত পাণ্ডা সেজে হাটের এবং ভুবনেশ্বরের ঢিপির মুখটাতে দাঁড়িয়েছে।

শুক্রবারের হাট বড় হাট নয়। সোমবারের হাট বড়। সোমবারে চার দিনের অর্থাৎ সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতির হাট পড়ে, শুক্রবারে তিন দিনের—শুক্র শনি রবি; এ ছাড়া সোম-বারটা শিবের পূজোর প্রশস্ত বার। তবে শুক্রবারে লোকে বাবার থানে ঢেলা বাঁধতে আসে। ভুবনেশ্বরের থানের ওপাশে যেখানে এককালে বট অশথ শিমুল বেলা গাছে বাবার ভূত-বাহিনীর কেল্লা ছিল সেখানকার কয়েকটা প্রাচীন বটগাছ আজও আছে—সেগুলো থেকে অসংখ্য ঝুরি নামে, লোকে এসে পুকুরে ভুবনদিঘীতে স্নান করে গোপন মনস্কামনা বাবাকে জানিয়ে ভিজে চুলে ভিজে কাপড়ে ওই ঝুরিতে একটি পাথর কি ঘুটিং কি ইঁটের টুকরো বেঁধে দিয়ে যায়। এতে নাকি মনস্কামনা পূর্ণ হতেই হয়। যখন হয় তখন লোকে আবার এসে

বাবাকে প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে ঢেলাটি খুলে দিয়ে যায়। কারুর কারুর ঢেলা আপনিই খসে যায়। কেউ কেউ এসে খানিকটা চুন গাছের গায়ে লেপে দেয়। এটার মধ্যে নিহিত অর্থ বা মনের অভিপ্রায় বুঝতে কারুর বাকী থাকে না—লোকে বুঝতে পারে কারুর উপর বিশেষ আক্রোশ করে চুন লেপেছে—এর ফলে যার উপর আক্রোশ তার গায়ে এমনি সাদা দাগ শ্বেতি রোগ হয়ে ফুটে বেরুবে। শুক্রবারে চুনুরীরা চুন নিয়ে আসে—একেবারে বাবার থানের কাছটাতেই বসে।

কাউকে ঢেলা বাঁধতে বা চুন লেপতে দেখলেই পাণ্ডারা গিয়ে কাছে দাঁড়ায়, বলে—সংকল্প করে বাঁধতে হয় বাবা। সংকল্প কর। বল—অদ্য পৌষ মাসে কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে আমি—বল, নাম বল নিজের—হ্যাঁ তারপর মনে মনে বল, সংকল্পের কথা বল—যা সংকল্প—দারিদ্র্যমোচন চাও তাই বল—মকদ্দমায় জয় চাও তাই বল—কাউকে যদি ভালবাস তাই বল—বল অমুককে—ব্রাহ্মণ হলে দেবী বল শূদ্র হলে দাসী বল—তস্য মনপ্রাপ্তি হেতু অদ্যমহং লোষ্ট্রবন্ধনং করিষ্যে। বাবা ভুবনেশ্বর সত্য হলে পূর্ণ হবে। তবে মনকে যাচাই কর বাবা এ কামনা সত্য না মিথ্যা। হ্যাঁ! বাঁধ বেশ ভাল করে বাঁধ। হ্যাঁ। এখন এস—চরণোদক খাও আর পুষ্প নিয়ে যাও—রেখে দিয়ো যত্ন করে। দক্ষিণে দু পয়সা পাঁচ পয়সা যা ইচ্ছে দাও। এক পয়সায় দক্ষিণে হয় না। কাঞ্চনমূল্য কিনা! বাবাকে প্রণামী এক পয়সা দিতে পার। ভুবনেশ্বরের হাট—মা গন্ধেশ্বরীর দরবার, এখানে দুখ দিয়ে সুখ পায়, রোগ দিয়ে আরোগ্য পায়, সোনার হরিণের মত পালানো মন জালে পড়ে; খোদ বাবার বর আছে।

কথার শেষে হেঁকে ওঠে—হর হর বোম্ হর হর বোম্। বোম্ ভুবনেশ্বর বিশ্বনাথ!

বিকেলবেলা হাট—হাটুরেরা অধিকাংশই আসে বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে। গাড়িতে আসে মাল—ভারে আসে মাল—মাথার ঝুড়িতে আসে মাল। আপন আপন বাঁধা জায়গায় বড় বড় চ্যাটাই বিছিয়ে মাল ঢেলে সাজায়। শীতকালে তরকারির মরসুম। নানান তরকারি। বেগুন, মূলো, নতুন আলু, কাঁচা কুমড়ো, লঙ্কা, নতুন পেঁয়াজ, এমন কি কপি মটরশুটিও আজকাল আসে। ফুলকপিটা কম—বাঁধাকপি একটু দেরিতে হলেও প্রচুর আসে—আর সে সব কপি খুব বড় বড়। ওই ভুবনপুরের যে বিলটায় শ্রীমন্ত মাছ ধরত সেই বিলের ধারের জমিতে এবং ময়ূরাক্ষীর চরে খুব বড় রকম কপির চাষ হচ্ছে। কপি তো কপি এখন দুটো চারটে হাঁস আসে মুরগী আসে। মুরগীর হাঁসের ডিম আসে। মাছ এখানে বড় আসে না, মেছুনীরা ডালায় করে পাড়ায় পাড়ায় নিত্য বেড়ায়। তবে বড়সড় মাছ পেলে হাটে এনে বসে। নিয়মিত মাছ আসে কাঠ মাছ। কই মাগুর ল্যাটা। 'উরো' হাড়ির পেশা হল ওই গ'ড়েতে ডোবাতে বিলে লোপা দিয়ে কাঠ মাছ ধরা। মাছ ধরে এনে বাড়িতে বড় হাঁড়িতে জিইয়ে রাখে, হাটের দিন উরোর বউ খালুই ভরতি করে এনে হাটে বসে। বসে ঠিক কুমোরদের মাটির জিনিসের পাশে, তার পাশে বসে যত তালপাতা খেজুরপাতার ডালাই ও চ্যাটাই; তার পাশে বসে মাছ ধরা পলুই বাঁশের মোড়া ডালা কুলো ঝুড়ি এবং মাথালীওয়ালারা। দু'চারটে ফুলের সাজিও থাকে। খেজুরপাতার কাজ করে বীরবংশীরা তার পাশেই বসে হাঁস ও হাঁসের

ডিমওয়ালী ছুনো গাঁয়ের রুইদাসদের মেয়ে ছুজন। সরু গলায় হাঁকে—হাঁস লেবা গো? হাঁস। ডিম লেবা গো? ডি—ম হাঁ—স।

বেশ বলার ঢঙটি। প্রথম ঠাণ্ডা গলায় বলে—হাঁস লেবা গো? তারপর চেঁচিয়ে ওঠে—হাঁ—স! তারপর সমান জোরে বলে—ডিম লেবা গো—? তারপর গলা নামতে থাকে—ডি—ম! হাঁ—স! মধ্যে মধ্যে হাঁসটার বুকে বা পাঁজরায় আঙুল দিয়ে টিপে দেয়—সেটাও ডেকে ওঠে প্যাঁ—ক প্যাঁক শব্দ করে।

ওসমান পাইকার দড়ি বেঁধে একটা খাসি ও ছাগল নিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁকে—খাছি—খাছি ছাগল—গরুর মতন দুধ! বলে হাঁকে। ওর পাশে পায়ে পায়ে বাঁধা কয়েকটা মুরগী থাকে। ওসমান পাইকারের খদ্দের সব বাঁধা আছে। দে বাবুদের ছোকরারা। সাবরেজিস্ট্রার। দারোগা। ছু'-একজন ইস্কুলমাস্টারও আছে। হাটের কলরব কোলাহল ছাপিয়ে ওসমানের গলা শুনলেই তারা আসে খাসি ছাগলের দর করতে এবং মুরগী কিনে থলের মধ্যে পুরে নিয়ে যায়। ওসমানের পাশে বসে হামিদন চাচী। সে হাঁকে—মুরগীর এণ্ডা! মুরগীর এণ্ডা!

এরা সব বসে হাটের পিছন দিকটায় একপাশে।

সামনে বসে ফলওয়ালারা। ফল আর কি? গ্রীষ্মকালে আম জাম কাঁঠাল ফুটি আসে। ময়ূরাক্ষীর ধারের তরমুজও আসে। শীতের সময় শাকআলু, নারকুলে কুল আসে—কিছুদিন থেকে কমলালেবু আসছে। ডাব এখানে কম। তবে ছু'চারটে থাকে। আর বারোমাস হিন্দুস্থানী সাহানীরা নিয়ে আসে কাগজে মোড়া খেজুর, শুকনো বেদানা, বাক্সবন্দী দাগিধরা আঙুর কিসমিস আর অল্পস্বল্প বাদাম পেস্তা।

এ একেবারে বাবার থানের সামনে। তার পাশেই ধরণী দাসের একখানি চালা। কাপড় মশারি গামছা। তারই আধখানায় শ্রীমন্তের মনিহারী আর মাছ ধরার সরঞ্জাম। তার পাশে গোবিন্দ বণিকের কাপড় জামা ফ্রকের দোকানের চালা। চালার সারি চলে গেছে ছু'পাশে। মিষ্টির দোকান। তেলেভাজার দোকান। আরও কতকগুলো মনিহারীর দোকান। এ ছাড়াও ভুবনেশ্বরের থানের সিঁড়ির মুখ থেকে রাস্তার ছু'ধারে চ্যাটাই পেতে অনেক দোকান বসে। তার মধ্যে কুম্ভকারদের মাটির ঘোড়ার দোকান অনেক পুরনো। বাবার থানে ঘোড়া কিনে দিয়ে যায়।

প্রবাদ বিশ্বেশ্বরের ওখানে ষাঁড় বাঁধা আছে, এখানে ভুবনেশ্বর তাই ঘোড়ায় চড়েন। তবে ঘোড়াগুলির একটা পা ছোট। অর্থাৎ খোঁড়া। ভান ঠ্যাংটি লটরপটর বাঁ ঠ্যাংটি খোঁড়া বাবা ভুবনেশ্বরের ঘোড়া। ওই ঘোড়ায় চড়ে নাকি বাবা রাত্রে মা গন্ধেশ্বরীর আটন পর্যন্ত যান।

টিকুলির মা এখানে এসেছিল যখন ভরতি যুবতী। এসেছিল গঙ্গারামের সঙ্গে। টিকুলিই এখন প্রায় যুবতী হয়ে উঠেছে। টিকুলির মা বলে সে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনেছে।

চুনারিয়ার বাবা সেও বুড়ো—সেও বলে শুনেছে।

জমাদারেরা এখানকার তিন পুরুষের ঝাড়ুদার—তারা বলে তারা বাপ দাদার কাছে শুনেছে।

এ ছাড়া আর আছে খানদুয়েক বইয়ের দোকান। লক্ষ্মীর পাঁচালী কৃষ্ণের শতনাম থেকে সুরথ-উদ্ধার গীতাভিনয়—সচিত্র প্রেমপত্র—তার সঙ্গে গুম খুন বশীকরণ-বিদ্যা কামরূপতন্ত্র—তার সঙ্গে প্রথম ভাগ ধারাপাত পর্যন্ত।

এই কোলাহলের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে পাণ্ডাদের ওই জোর হাঁক শোনা যায়—হর হর বোম্। বো—ম ভুবনেশ্বর।

সেদিন শীতের দিনটি বেশ মৌজের শীতের দিন ছিল। আগের রাত্রে শীতটি জমাট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বেলা দুটো নাগাদ রোদটি চড়ে ভারী মিঠে লাগছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ সুমিষ্ট কিশোর কণ্ঠে খোকাঠাকুর নবু হেঁকে উঠেছিল—

বাবা ভুবনেশ্বরো মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করো!

হর হর বোম্! হর হর বোম্! বো—ম্ ভুবনেশ্বর!

ধরণী দাস সবিস্ময়ে তাকিয়ে বলেছিল—নিত্যঠাকুরের ছেলে! ও তো ইস্কুলে পড়ত! ওর পিসী বলত নবু হাকিম হবে! তা—

হেসে উঠেছিল মালতী। হি-হি-হি-হি-হি!

শ্রীমন্তও না-হেসে পারেনি। শীতের দিনে মাছের সরঞ্জামের বিক্রী কম। তার জন্যে মেজাজ শ্রীমন্তের ভাল থাকে না। তবু শ্রীমন্ত হেসেছিল।

ধরণী বলেছিল—হাসলে যে!

শ্রীমন্ত বলেছিল—ঠাকুর আচ্ছা ঠাকুর। কাল—

মালতী আবার খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

শ্রীমন্ত সবিস্তারে বলেছিল আগের দিনের সন্ধ্যার বিবরণ। ধরণী দাসও খুব হেসেছিল। বলেছিল—এ ছেলে যে আঁটি হে। পুঁতলে গাছ হয়। এ্যাঁ?

—যে-সে আঁটি নয়। ম্যাজিক আঁটি। কাং গঙ্গারামের ম্যাজিক আঁটি মনে পড়ে?

গঙ্গারাম বলে একজন বাউণ্ডুলে ভেলকিবাজিওলা কিছুদিন ভুবনপুরের হাটের বটতলায় বাসা নিয়েছিল। সে সাপ ধরত। সাপের বিষ গেলে গাঁজার সঙ্গে মিশিয়ে খেতো। এসেছিল ওই টিকুলির মাকে নিয়ে। তখন টিকুলির মা যুবতী। সেই গঙ্গারাম খেলা দেখাত ম্যাজিক আঁটির। একটা শুকনো আঁটি মাটিতে পুঁতে জল ছিটিয়ে ঝুড়ি ঢাকা দিত। তারপর ঝুড়ি তুললেই গাছ দেখা যেত!

ধরণী দাস বলেছিল—ঠিক বলেছ! তাই বটে। মাস্টারকে বাঁশের খেঁটে নিয়ে—। বলতে বলতে একটা কোঁক শব্দ করে হেসে উঠেছিল হা-হা শব্দে।

মনে আছে ধরণীর ঠিক এই সময়টিতেই একটা হৈ হৈ শব্দ উঠেছিল বাবুলের চাষী হরিদাসের বেগুনের ওখানে।

—মার—মার—মার!

—কি হল? ঘাড় তুলেছিল ধরণী দাস।

—আবার কি? চুরি! শ্রীমন্ত বলেছিল।

মালতী ছুটে দেখতে গিয়েছিল। চুরিই বটে। মরি বাউড়িনী দর করতে বসে কখন

একটা বেগুন আঁচলে পুরেছিল দেখতে পায় নি হরিদাস। দরে বনল না বলে যেই মরি উঠেছে অমনি নজরে পড়েছে হরিদাসের। সঙ্গে সঙ্গে সে ধরেছে তার হাত চেপে। হাত চেপে ধরতেই বেগুনটা পড়েছে মাটিতে। ওদিকে হরিদাসের কিল পড়তে শুরু করেছে মরির পিঠে। শুধু হরিদাসের নয়, আরও অনেকের। আরও অনেক কিলই পড়ত মরির পিঠে। কিন্তু ওই খোকাঠাকুর এসে দুই হাতে ভিড় সরিয়ে ধমক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল এবং সব থামিয়ে দিলে। ছেলেটির জোর আর কতটুকু, কিন্তু হঠ যাও হঠ যাও বলে এমন চীৎকার করলে এবং চীৎকারের মধ্যে এমন একটা তেজ ছিল যে সকলেই হঠে গিয়ে জায়গা দিলে তাকে ভিতরে ঢুকতে। তারপর সে দু'হাত তুলে বলল—থাম সব থাম।

কপালে ছাইয়ের তিলক, গলায় পৈতে, ধবধবে রঙ, সুন্দর চেহারা খোকাঠাকুর যেন ভেলকি লাগিয়ে দিলে। এমন একটি মানুষকে তারা অমান্য করতে পারলে না। খোকা-ঠাকুর বয়সে বাচ্চা হলেও তার ভেতর থেকে যেন অন্য একটা মানুষ বেরিয়ে এল। এবং বিচারও সে করলে। মরি বাউড়িনীর চুল খুলে গিয়েছিল—ছিঁড়েও গিয়েছিল অনেকগুলো, গায়ের কাপড়ও খুলে গিয়েছিল—ছিঁড়েও গিয়েছিল—ধুলো লেগেছিল সর্বাঙ্গে কিন্তু সে এতক্ষণ ঠিক কাঁদে নি, শুধু চীৎকার করছিল। প্রতিটি কিল চড়ের সঙ্গে চেঁচাচ্ছিল—ওরে বাবারে! বাবারে! আর মেরো না। বাবারে! মারে বলে। এবার কিল চড় থেমে যেতেই সে পরিত্রাতা খোকাঠাকুরের চরণ ধরে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল—ওগো ঠাকুর গো—মরে গিয়েছি—বাবাগো! আর মেরো না—বাঁচাও গো! তোমার পায়ে ধরি বাবাগো!

লোকেরা হেসে উঠল হো-হো করে।

ঠাকুর বললে—থাম! থাম!

থেমে গেল সকলে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলে—বেগুন চুরি করেছিলি ক্যানে?

—দোষ হইছে বাবাগো! নাক মলছি কান মলছি—আর কখুনও করব না গো! বেশী লিই নাই—একটো লিয়েছিলাম বাবাগো। তার তরে কিল খেয়েছি বিশ গণ্ডা—আর মেরো না বাবাগো!

খোকাঠাকুর বললে—কেউ যাও তো চুন্নুরীদের কাছ থেকে চুন নিয়ে এস! যাও! মুখে লেপে দাও হারামজাদীর!

লোকে উৎসাহিত হয়ে উঠল। বুঝেছে সকলে মরির মুখে চুনের হিজিবিজি এঁকে দেবে। মরি তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল—ওগো ঠাকুর গো, একটো বেগুনের তরে চুন দিয়ো না বাবাগো! ফুল হয়ে ফুটে উঠবে গো! বাবা শিবের থান গো!

কিন্তু ছাড়লে না ঠাকুর। মরির দুই গালে কপালে চুনের দাগ দিয়ে বললে—যা!

মরি উঠেই কোন রকমে হাট থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাল। খানিকটা দূর গিয়ে তার চেহারা পাল্টাল—কোমরে কাপড় জড়িয়ে মাথার এলোমেলো চুলগুলো হাতে জড়িয়ে নোটন বাঁধতে বাঁধতে চেঁচাতে লাগল—যত দোষ মরির। মরি মরা কিনা বুড়ী কিনা তাই। ওই যে টিকলি কাঁচা লঙ্কা নেবু মুঠো মুঠো তুলে এক-কোঁচড়ে করেছে, আলু নিয়েছে—তার

বেলাতে? ওই চুনারীরা, উ যে কমলানেবু লিয়েছে! এঁ্যা! ওই যি বাবুরা লঙ্কা নেবু দেখতে গিয়ে পকেটে ভরেছে—দেখুক পকেট দেখি! উ! চুনে আমার কিছু হবে না। ধুয়ে দিলে উঠে যাবে। একটো বেগুনের লেগে বিশ গণ্ডা কিল!

হাট তখন আবার বিকিকিনিতে কারবারে মগ্ন হয়ে গেছে। হরিদাস হাঁকছে—এই বেগুন বাকুলের বেগুন। মাখন মাখন! মাখন ফেলে খেতে হয়।

—নতুন আলু। নতুন আলু।

—চার হাত কার! চাবকী ফিতে।

ধরণী দাসও হেঁকে উঠল—তাঁতের শাড়ি! নকশীপাড়! চৌখুপী ডুরে! লাল গামছা!

দুটি রসিকা বেশ-বিলাসিনী মেয়ে ওর দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। ধরণী দাস হেঁকে তাদের আহ্বান করলে—এস!

শ্রীমন্ত হাঁকলে—তরল আলতা! গন্ধতেল!

মেয়ে দুটি থমকে দাঁড়িয়ে এ ওর গা টিপে হেসে ইঙ্গিত করে দাঁড়িয়ে গেল। একজন বললে—সস্তা না আক্রা?

মালতী কখন ফিরে এসে বাবার পাশে বসেছিল। সে বললে—বাবা খোকাঠাকুর!

খোকাঠাকুরই বটে। সে মেয়ে দুটোকে বললে—এই সব! শুনছিস?

—ও বাবা—ডেঁকা ঠাকুর!

'ডেঁকা'র মানে কেউটে গোখরোর বাচ্চা! তারা সরে দাঁড়াল!

নবু ধরণী দাসের দোকানে দাঁড়িয়ে সেদিন চেয়েছিল গামছা।—বেশ বড় আর মোটা থাপি গামছা আছে? ও লাল গামছা নয়। সাদা জমি। আছে?

—আছে বইকি! কি করবেন?

—কি করে গামছা নিয়ে?

ধরণী দাস অপ্রস্তুত হয় নি—বলছিল—গামছায় গা মোছে আবার গায়ে দিয়ে ঘুরেও তো বেড়ান গো আপনারা!

মালতী বলে উঠেছিল—পাণ্ডারা গামছা পুজোও করে। বামুনেরা কাপড়ের ওপর জড়িয়ে ভাত রাঁধে পরিবেশন করে।

—উ। সেই মেয়েটা। বলে ছাগলের জন্তে পুলিসে খবর দোব। ভারী মুখরা।

—আর তুমি যে বাঁশের খেটে নিয়ে মাস্টারকে মারতে যাও!

—বেটা আমার গুরুর কান ধরলে ক্যানে?

একখানা বড় গামছা বের করে ফেলে দিয়ে ধরণী দাস বললে—এই আছে। পছন্দ না হলে, তোয়ালের মত বুনন একরকম সাড়ে তিন হাত গামছা উঠেছে—সাঁইতের হাট থেকে এনে দোব সোমবারে।

—ঠিক দেবে তো? আমি সেই রকম খুঁজছি।

—আমি না যাই শ্রীমন্ত যাবেই। ও এনে দেবে।

—কি শ্রীমন্ত?

—হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দোব।

—হ্যাঁ—না হলে এবার তোমার ছাগল আমি ছাড়ব না।

—আমরা বেঁধে রেখে দোব। আর যাবেই না।

মালতী বলে উঠেছিল।

—মন্তরের চোটে আমি নিয়ে আসব ছাগল।

মালতীর মুখ শুকিয়েছিল।

শ্রীমন্ত বলেছিল—আমি ঠিক এনে দোব—দেখবেন আপনি।

যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে নবু বলেছিল—তুমি সাঁইতে প্রতি হাটে যাও?

—প্রতি হাটে যাই না। রবিবার বড় হাট—রবিবারে যাই।

—আমার আর একটি কাজ করে দেবে?

—কি বলুন?

—আমার বাবার ডুগি তবলা আর পাখোয়াজ ছিঁড়ে পড়ে আছে। সাঁইতের হাটে শুনেছি বায়েনরা আসে—তারা খুব ভাল ছাওয়ায়। ওগুলো ছাইয়ে এনে দিতে পার?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদের নামসংকীর্তনের দলের খোল ওরাই ছাইয়ে দেয়। আলাপ আছে আমার সঙ্গে। দেবেন। মুশকিল নিয়ে যাওয়ার আনার।

—তা একটা মুনিষের দাম আমি দোব।

—আর কি দেবে বাবাকে মজুরি?

মালতী আবার বলে উঠেছিল।

—তুই হলে কচুপোড়া দিতাম। শ্রীমন্তকে আশীর্বাদ করব।

—উহুঁ। আমাদের বাড়িতে এসে একদিন গান শোনাতে হবে।

—তা শোনাব!

বলে চলে গিয়েছিল নবুঠাকুর। ধরণী দাস শ্রীমন্ত মালতী ওর যাবার পথের দিকেই তাকিয়েছিল। হাট তখন জমে উঠেছে—প্রায় চারটে সওয়া চারটে বাজে। লোক জমজম গমগম করছে। শীতের কাল, ধান উঠেছে—পয়সা আছে লোকের হাতে; তা ছাড়া গরম নেই। খারাপের মধ্যে শুধু ধুলো। ওদিকে গন্ধেশ্বরীতলায় গদিতে গদিতে ধানের গাড়ি লেগেছে। ওদিকে গঙ্গার ধার থেকে এসেছে শাঁকআলু রাঙাআলু, লঙ্কা মসুর ছোলা। কেনাবেচার দারুণ মরসুম। জমাট ভিড়ের মধ্যে মাথায় খাটো বাচ্চা ঠাকুর মিশে গেল। ধরণী দাস বললে—পাকা পাণ্ডা হবে ঠাকুর।

—কই গো লাল গামছা ডুরে শাড়ি? কই দেখাও? কই তোমারই বা তরল আলতা কই?

মেয়ে দুটো আবার ফিরে এসেছে। ধরণী বললে—এস। এস বস ভাল করে। দাঁড়িয়ে কি দেখা হয়?

শ্রীমন্ত বললে—যা তো মালা ঠাকুরকে বলে আর আজই যেন ডুগি তবলা পাখোয়াজ পাঠিয়ে দেয়।

মালাকে ইচ্ছে করে তাড়ালে শ্রীমন্ত। মেয়ে ছুটো রসিকার ওপরে কিছু। ওদের নিয়ে খানিকটা ডগমগ রসের কথার খেল্ খেলবে।

মালা ঠাকুরকে ভিড়ের মধ্যে পেলে না। সে গিয়ে বাবার থানের গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইল। লোকে পাথর বাঁধছিল সেখানে। সেও একটা পাথর বাঁধবে ঠিক করলে—তার যেন ওই ঠাকুরের মত বর হয়। খুব আড়ালে গিয়ে কিন্তু বাঁধতে গিয়েও বাঁধলে না। ছি! আর—ঠাকুর যে বামুন!

তিন

(ক)

কথা তো আজকের নয় অনেক দিনের—।

মালতী হাটে ধরণী দাসের চালায় বসে মনে মনে হিসেব করে দেখলে সে প্রায় ন' বছর আগের কথা! সেদিনও সে বাবার পাতা দোকানের পাশে এইখানেই বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসেছিল। এই খুঁটিটাই বোধ হয়।

মালতী জিজ্ঞাসাও করলে—জেঠা, সেই খুঁটিগুলোই আছে? রঙ করেছ—নয়?

ধরণী দাস বললে—না মা। নতুন খুঁটি। দেখছ না হাটের উন্নতি! এখন কি আর পুরনোতে চলে? যেমন কাল তেমনি চাল। হাট জাঁকল। ওঁইরা দালান-বাড়ি করলে। শ্রীমতীর মিষ্টির দোকানের সামনে পাকা বারান্দা টানলে। সত্যও তাই করলে। ওই দেখ সরকারদের ছেলে কাঠের কারবার করেছে—চেয়ার টেবিল বানাচ্ছে। ওই দেখ পশ্চিম পাশে ইঁট ফেলেছে—এই পাশের ক্রকওলা পাকা করবে চালা—ইলেকটিরি লেবে সব। আমি মশারি বেচি মোটা কাপড় বেচি—আমি পাকা করব কি করে—আমি ভোগপুর থেকে ওই বাঁশ আনলাম। দেখছ না কেমন সোজা আর মোটা বাঁশ! সরল। তাতে রঙ লাগালাম। আর কি করব? ইচ্ছে ছিল থাম করে টিন দি। আছে ইচ্ছে। তা তোমরা ভাগ না ছাড়লে তো পারছি না! তোমার বাবা আমাকে দুশো টাকা নগদ দিয়ে চালার অর্ধেক কিনেছিল। জোর করে কি না-জানিয়ে পাকা না হয় কবে করে নিতে পারতাম—তা ধম্মকে জবাব দোব কি?

মালতী চুপ করে রইল। সে ভাবছিল।

ধরণী দাস বললে—আমি মা বলেছিলাম তোমার বাবাকে। বলেছিলাম—শ্রীমন্ত, সব বেচে মানুষ খায় ভাই, ধম্ম বেচে খায় না। তু ওই বামুনের ছেলের সম্পত্তি—সম্পত্তি আর কি, পুকুরের অংশ আর পাঁচ বিঘে ডাঙা জমি—ও নিয়ে তু ভাল করলি না!

একটু থামল সে। মালতীও চুপ করে রইল। দুজনের কাছে এবার হাটের শোরগোলটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। যেন পিছন দিক থেকে ঘুরে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল হাটটা। উঃ কত লোক! আগের কালেও লোক অনেক হত, কিন্তু এত নয়। একটু উপর দিকে চাইলে শুধু মাথা মাথা আর মাথা। ঘোমটার কাপড়ও আর দেখা যায় না। একটু নীচে তাকালে

জামার ছিট আর খালি গা। মেয়েদের গায়ের কাপড়ের নানান রঙ। আর কোলাহল। কত ভদ্রলোক। হাল ফ্যাশানের মেয়ে, চোখে চশমা পায়ে জুতো একদল। ওই সামনে ওপাশে কে একজন বেশ একটা বড় সাদা রঙের মোরগকে ডানায় ধরে মাথার উপরে তুলে ধরেছে—মুরগীটা চেঁচাচ্ছে ক্যাঁ ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দে। কোন যন্ত্রণা পাচ্ছে। ওঃ তখন মুরগী কিনত লোকে বেশ লুকিয়ে ; এখন হাতে তুলে ধরে লোকটা হাঁকছে—বিলিতী মুরগী! বিলিতী মুরগী!

দুজন খদ্দের এসে দাঁড়াল।—মশারি, বেশ ভাল খাপি, আছে?

—আছে বইকি, এস। বস। ক' হাত?

—বেশ বড় চাই। ছেলেপিলে নিয়ে শোবে, পাঁচজন ছ'জন।

—চার হাত পাঁচ হাত দিই?

—দাও।

ধরণী দাস মশারি বের করে ফেলে দিলে সামনে।—দেখ। দেখ বুনন দেখ। সুতো দেখ। খুলে দেখ—মাগো। হ্যাঁ। জিনিস লেবে বাবা দেখে লেবে! দেখ—

সে উঠে দাঁড়াল—এই দেখ আঠারো ইঞ্চি দাগা গজকাঠি। তোমার হাত বড়—এক ইঞ্চি বড়। লাও মাগো!

মালতীর চোখের সামনে থেকে হাটটা আবার সরে যাচ্ছে। হাটটা যাচ্ছে না তার চোখের দৃষ্টি যাচ্ছে। মনের ভিতরের দিকে যাচ্ছে।—হ্যাঁ, নবুঠাকুর খোকাঠাকুরকে তার বাবা ঠকিয়ে নিয়েছিল। ঠকিয়ে নয়, ভুলিয়ে। ওই ডুগি তবলা পাখোয়াজ ছাইয়ে এনে দেওয়া নিয়ে খোকাঠাকুরের সঙ্গে আলাপ শুরু। ডুগি তবলা পাখোয়াজ তার বাবাকে দিয়ে গিয়েছিল ঠাকুর। পয়সাও দিয়েছিল, একটা মজুরের দাম, সাঁইতে নিয়ে যাবার জন্যে।

মনে আছে মাসী বলেছিল—তা সোনাঠাকুর আমাগো মজুরিডা?

খোকাঠাকুর বলেছিল—আর তো পয়সা আনি নাই। শ্রীমন্ত তো চায় নাই।

—আমার কপাল! নিজে মালারে বলেছ—দিব।

মালা বলে উঠেছিল—গান শোনাবে বলেছ।

—অ! তা গান কি যখন তখন হয়?

শ্রীমন্ত বলেছিল—যেমন তেমন গান যখন তখন হয়। গ্যান না গেয়ে।

খোকাঠাকুর বেশ আসন করে বসেছিল। তারপর একটু গুন গুন করে সুর ভাঁজতে শুরু করেছিল। শ্রীমন্ত বলেছিল—দাঁড়ান দাঁড়ান খোলটা আনি। সে খোল পেড়ে এনে ডান হাতে চাঁটি এবং বাঁ হাতে গুব্ শব্দ তুলে বলেছিল—নেন।

খোকাঠাকুর বলেছিল—না। রেখে দাও। বাঁধা নাই। ঢ্যাব-ঢ্যাব করছে। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলেছিল—গানের অপমান হয় ওতে। রাখ। বলে সে গান গেয়েছিল। গানটার ক'টা কলি আজও মনে আছে।

এ ফুল খুঁজে নিতে হয় এ ফুল খুঁজে নিতে হয়,
দুনিয়ায় কোন বনে সে কোন কোণে সে

কোন মনেতে ফুটে রয়।

এ ফুল করতে আহরণ কত চাই নিশি জাগরণ—

আর মনে নেই। সুন্দর সুর ছিল। ভারী সুন্দর। গানটা একবার নয় দুবার গাইয়েছিল চাঁপা মাসী। তারপরও মধ্যে মধ্যে বলত—সেই গানটি গাও ঠাকুর। তারিফ করত—যেমন সোনাঠাকুর তেমনি সোনা গান!

বাড়িতে যখন তারা দুজনে শুধু থাকত তখন চাঁপা মাসী এই গান গাইত। নাচত। বলত, তুমিও গাও মাসী। এস দুজনায় নাচি। নাচের গান। একলা হয় না।

সেও গাইত—সেও নাচত। চাঁপা বলত—এ ফুল পেল্যা মালা গেঁথে পর্যা যমুনায় ঝাঁপ খাইতাম মাসী। জান?

সে প্রথম প্রথম ভাবত স্বর্গের পারিজাত। একদিন বলেছিল—পাবে কোথা? স্বর্গের পারিজাত—

চাঁপা মুখ হাত নেড়ে বলেছিল—না গো মাসী না। এই পিথিমীতেই ফোটে। তার কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল—প্র্যামের ফুল গো কন্তে—প্র্যামের ফুল।

প্রেমের ফুল! লজ্জা হয়েছিল মালতীর। প্রেম কি সঠিক জানত না তখন কিন্তু লজ্জা-মাখানো মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ পেতে আরম্ভ করেছে। এবং এটাও জেনেছিল প্রেম হয় পুরুষে মেয়েতে। বিয়ের সঙ্গে কাছাকাছি। প্রেম হলে বিয়ে হয়, বিয়ে হলে প্রেম হয়। চাঁপার কথায় লজ্জা পেয়ে সে বলেছিল—ধের্-র।

চাঁপা বলেছিল—হঁ গ। বুঝবা পরে! বলেই গেয়েছিল—এ ফুল করতে আহরণ কত চাই নিশি জাগরণ। কন্তে, রাত জাইগা প্র্যামের কথা কইতি নিশি ভোর হইয়া যায়। ফুটবে—তোমারও ফুটবে গ। তা সবার তো ফুটে না। বিয়া সাদী হইলেও না। ফুটলে পাগলিনী হয় রাধার মত।

কত কথাই মনে পড়ছে!

বাবার তার অন্যায় হয়েছিল—সেই দিনই খোকাঠাকুরকে গাঁজা খাইয়েছিল। না কোন বদ মতলব করে খাওয়ায় নি। তখনও কোন বদ মতলব তার ছিল না। তার বাপ বষ্টম মানুষ, বষ্টমের ধর্ম পালন করবার মধ্যে মাংস খেতো না, চৈতন রেখেছিল, গলায় কণ্ঠি নিয়েছিল আর গাঁজা খেতো। গাঁজা ধরণী জেঠাও খেতো। এখনও নিশ্চয় খায়। সেদিন খোকা-ঠাকুর যখন গান গাইছিল তখনই সে গাঁজা টিপছিল। খাওয়ার সময় তখন তার। খোকা-ঠাকুর গান শেষ করবার পর উঠে দাঁড়িয়ে শ্রীমন্তের গাঁজার সরঞ্জামপত্র দেখে বলেছিল—বাঃ এ তো তোমার অনেক তরিবত হে! চন্দনের গন্ধ উঠেছে!

—তরিবত না করলে খেয়ে সুখ হয় ঠাকুর?

তার বাবা তখন শ্বেতচন্দনের কাঠটা থেকে ধারালো ছুরি দিয়ে হালকা হাতে চেঁচে তার গুঁড়ো বের করছিল মেশাবে বলে।

খোকাঠাকুর বলেছিল—তা বটে। তা নইলে শিব খাবে ক্যানে? এ্যাঁ!

শ্রীমন্ত বলেছিল—তুমি খাও না ঠাকুর? শিবঠাকুরের পাওা তুমি!

—উহুঁ! গলা খারাপ হয়ে যাবে।

—গলা খারাপ হবে? কে বললে তোমাকে? অত বড় ওস্তাদ শরৎ মুখুজ্জে—বাবা, গাঁজা না খেলে গলাই খোলে না। বলে ধ্যান আসবে কিসে? ধ্যান না হলে গান হয়?

—তা বটে। ধ্যান না হলে গান হয় না।

—দেখ না খেয়ে!

—উহুঁ—মাথা ঘুরবে। সিদ্ধি খাই। তাতেই যে নেশা!

—সিদ্ধির নেশা পাজী নেশা। চিতিসাপের বিষ! ও খেও না!

—সত্যি শরৎ ওস্তাদ খায়?

—এই গাঁজার কলকে ছুঁয়ে বলছি। ভুবনেশ্বরের দিব্যি!

—শরৎ ওস্তাদের কাছে একদিন নিয়ে যাবে আমাকে?

—যেতে হবে ক্যানে—বল তুমি আমি নিয়ে আসছি তোমার বাড়ীতে! গোটা পনের টাকা দিয়ো গাঁজা দিয়ো। ভাল করে খাইয়ো। মুখুজ্জে মশায় তাতেই খুশী!

—যদি মাসে দু দিন করে গান শিখি? তবে কত নেবে?

—জিজ্ঞাসা করব। তবে তোমার মত শিষ্য পেলে তো আহ্লাদ করে শেখাবে গো! তোমার বাবার সঙ্গে ভাল পোটু ছিল। গাঁজা মদ দুজনে অনেক খেয়েছে, আনন্দ করেছে! বলব?

—বলো!

—বলব। এই কালই বলব। সাঁইতের ওদিকে অনেক শিষ্য তো। পেরায়ই দেখা হয়। আমার হাতের গাঁজা খেতে খুব পছন্দ! বলে—এমন তারটি কারুর টেপাতে আসে না শ্রীমন্ত।

তখন টিকের আগুনটি আলগোছে হাতে তুলে কলকের ওপর চড়িয়েছে তার বাবা। চড়িয়ে কলকেটি এগিয়ে বললে—দাও পেসাদ করে দাও। মনে মনে বাবা ভুবনেশ্বরকে ডেকে বল—খাও বাবা। তার পরেতে দাও আমার হাতে দাও, আমি ছেঁদে ধরি, ধরতে ঠিক পারবে না। আস্তে আস্তে ফুসফুস করে টান, উড়িয়ে দাও। হ্যাঁ আস্তে আস্তে। এইবার জোরে জোরে ওড়াও। দাও এইবার একটান দম দাও! ফেলো না ফেলো না। ধরে রাখ। তা বেশ পড়ে গেল, ভাল হল—পেরথম দিন কম নেশা হবে।

কম নয়, ওতেই বেশ নেশা হয়েছিল খোকাঠাকুরের। বাবা যখন টেনে যাচ্ছিল তখন খোকাঠাকুর বসেই ছিল—ভাম হয়ে বসে ছিল। একটি কথা বলেনি। মনে আছে মালতী একটু দূরে বসে অবাক হয়ে দেখছিল। এইটুকু ছেলে—! ঠাকুরের মুখখানা দেখতে দেখতে কেমন বোকা বোকা হয়ে যাচ্ছিল। চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল।

তার বাবা টানা শেষ করে কলকেটা ঠাকুরের দিকে বাড়িয়ে ধোঁয়া গিলে দম ধরে বসেছিল—কথা বলবার জো ছিল না—বলতে গেলেও ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ঠাকুরের

সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না। তার বাবা বাঁ হাতে ঠেলা দিয়েছিল। ঠাকুর এতক্ষণে বলেছিল—উ ?

বাবা হুস্ করে ধোঁয়া আকাশের দিকে ছুঁড়ে শেষ করে বলেছিল—লাও, আর এক দম!

ঠাকুর জড়ানো গলায় বলেছিল—না। তারপর কথা-বার্তা নেই সটান হাত ছড়িয়ে পা ছড়িয়ে সেই দাওয়ার উপর শুয়ে পড়েছিল।

—এই দেখ—শুলে যে!

ঠাকুর কি বলতে গিয়েছিল কিন্তু পারে নি, কোঁক কোঁক শব্দ করে হেঁচকি তুলতে শুরু করেছিল। তারপর বলেছিল—জল খাব।

চাঁপা গ্লাসে করে জল এনেছিল তাড়াতাড়ি। এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়েছিল ঠাকুর। তার বাবা একটা ঘটিতে জল এনে মাথায় দিয়েছিল থপথপ করে, মুখ চোখেও বুলিয়ে দিয়েছিল।

চাঁপা বলেছিল—কর কি? শীতের দিন—

হেসে শ্রীমন্ত বলেছিল—কিচ্ছু হবে না। ঠাকুর এখন ডুব সাঁতার কেটে ভুবনদিঘী পেরিয়ে যাবে।

ঠাকুর সত্যিই বলেছিল—আরও খানিকটা মাথায় দাও।

সেদিন তার বাবা ঠাকুরকে সঙ্গে করে তার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। আশ্চর্য, পরদিন ঠাকুর নিজেই এসেছিল তাদের বাড়ী'—শ্রীমন্ত!

চাঁপা হেসে উঠেছিল। তার খিলখিল হাসি আর থামে না। মালতী জিজ্ঞাসা করেছিল—হাসছ ক্যানে? তার রাগ হচ্ছিল।

চাঁপা বলেছিল—মাসী মাছটা কাতলা গ।

—মাছ?

—ওই ঠাকুর। চায় খাইতে আসছে। গাঁজা—গাঁজা।

ঠাকুর ঘরে ঢুকে বলেছিল—কই শ্রীমন্ত?

চাঁপার হাসি বেড়ে গিয়েছিল। মালতী বলেছিল—বাবা তো সাঁইতে গিয়েছে।

—অ। ফেরে নি?

—না ফিরুক—তুমি বইস! আমি তোমারে খাওয়াব গ। বলে ঘরে গিয়ে একটা পুরিয়া এনে ঠাকুরকে দিয়ে বলেছিল—গুঁড়া কইরা বিড়ির ভিতর দিয়া খাও। বিড়িটা খুলে ফেলাও। হ্যাঁ।

বিড়ি খেয়ে ঠাকুর বলেছিল—এ ভাল। হাঙ্গাম নাই। আর কালকের মত মাথা ঘোরে না। না একটু একটু ঘুরছে।

তারপর চুপ করে গিয়েছিল। ওদিকে চাঁপা খিলখিল করে হেসেই চলেছিল। একটু পর ঠাকুরও হাসতে লেগেছিল। তাদের সঙ্গে মালতীও হাসতে সুরু করেছিল। কিছুক্ষণ পর মাসী তাকে বাতাসা জল খাইয়ে গান গাইতে বলেছিল—ঠাকুর গেয়েছিল একখানা নয়, তিন চারখানা। মাসী তার আগে দোর বন্ধ করেছিল। নইলে গান—এমন সুন্দর গান শুনে

পড়শীরা তো না-এসে থাকবে না।

এরপর তার বাবা জুটিয়ে দিয়েছিল ওস্তাদ শরৎ মুখুজ্জেকে। শরৎ মুখুজ্জে খুব খুশী হয়েছিল ঠাকুরের গলা শুনে। বলেছিল—খুব বড় ওস্তাদ হবে হে তুমি!

মুখুজ্জের আসর পড়েছিল নবুঠাকুরের বাড়িতে। মাসে দু'দিন আসতেন, থাকতেন তিন চার দিন করে। খোকাঠাকুরের বাড়িতে ছোট ছেটে ভোজ হত। ঠাকুরের পিসী চীৎকার করত। কিন্তু নবু বলত—চেঁচাবে তো যেখানে যাবে যাও। এ বাড়িতে চেঁচিয়ো না। আমার গুরু।

পিসী বলত—আসবে কোত্থেকে রে? ওরে ও হারামজাদা! পুঁজি তো পাঁচ বিঘে জমি আর দে পুকুরের বারো আনা অংশ। বাবার থানে বছরে ষোল দিন পালি!

ঠাকুর বলত—আকাশ থেকে আসবে, মাটি ফুঁড়ে আসবে—তোমাকে ভাবতে হবে না।

আসত তাই। নবু ধার করে আনত। দিত তার বাবা।

এই টাকা দিতে গিয়েই মালতী এক দিন নয় দু'তিন দিন পিসী ভাইপোর ঝগড়া শুনে এসেছিল। ঠাকুর তখন বিকেলে তাদের বাড়িতেই একবার নয়, মুখুজ্জের সঙ্গে সকাল বিকেল রাত্রি তিনবার চারবার গাঁজা খাচ্ছে। বিকেলে আসরটা তাদের বাড়িতেই বসত। মুখুজ্জে আসতেন, খোকাঠাকুর আসত, মুখুজ্জে মশায়ের দুজন তিনজন শিষ্য আসত। গাঁজা খেতেন।

মুখুজ্জে মশায়ই মালাকে ইস্কুলে দিতে বলেছিলেন শ্রীমন্তকে। বলেছিলেন—হ্যাঁরে বাবা শ্রীমন্ত, মেয়ের বয়স কত হল রে?

—আট বছর হবে মুখুজ্জে মশায়!

—ছেলেবয়সে বিয়ে দিবি নাকি?

—না না না। সে কাল আছে না কি?

—তবে? ইস্কুলে দিস না কেন রে? এঁ্যা! মেয়েরা হাকিম হচ্ছে রে। ভোটে দাঁড়াচ্ছে। জুতো পায়ে দিচ্ছে। স্বাধীন দেশ! ইস্কুলে দিস। না হয় গলা থাকে তো গান শেখা। রেডিয়োতে গ্রামোফোনে গান গাইবে রে।

শ্রীমন্ত বলেছিল—গলা টলা নাই। তা বলেছেন ভাল। ইস্কুলেই দোব।

—হ্যাঁ। দিয়ে দিস। দিদিমণিতেই তো পড়ায়? না কি?

—হঁ্যা তিনজন দিদিমণি আছে।

—তা হলে তো ভাল রে। দে ভরতি করে দে। তুই একটু দেখিয়ে দিস প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ—তার পর ও ঠিক পড়বে। এখানে পাস করলে দিবি সাঁইতেতে। ওও দিদিমণি হয়ে যাবে। তোর বাবা ছিল অবধূত—ভিক্ষে করত। তুই খানসামাগিরি আরম্ভ করেছিলি, এখন দোকানদার হয়েছিস। তোর মেয়ে তো আর তেলক কেটে চুড়ো বেঁধে খঞ্জনি বাজিয়ে গান করে বেড়াবে না! ও দিদিমণি হবে! আমার ছেলেটাকে দেখ না ইস্কুলে দিয়েছি—বলেছি গান শিখিস তো রেডিয়ো গ্রামোফোনের গান শেখ। তা শিখেছে। আবার পড়ছেও। আবার হিন্দু মহাসভা করে। গান গাইতে পারে তো! ওপ্‌নিং সং গায়।

শ্রীমন্ত বলেছিল—ছেলে আপনার খুব মুখোল চোখোল!

—হ্যাঁ রে। নইলে দীভার হবে কি করে? পড়েও মন্দ নয়। তা তোর মেয়ে তো খুব চটপটে। মুখ চোখও বেশ ভাল—রংও মাজা মাজা। চুলও এক পিঠ—বেশ দিদিমণি হবে রে! তা দিদিমণিগুলো দেখতে কেমন রে?

—কালোকোলোই বটে তবে সেজেগুজে থাকে তো! নে নে সেজে ফেল্। ও—নবু সাজছ। নাও নাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে। নাও। সূর্যি ডুবব ডুবব করছে। বলেই হুঁ-হুঁ করে তান ভাঁজতে শুরু করেছিলেন।

এরপর থেকেই সে ইস্কুলে যেতে শুরু করেছিল। প্রথম ভাগ পড়া ছিল। কিন্তু প্রথম ভাগের ক্লাস থেকেই শুরু করেছিল। সকালবেলা ওই পালান হুড়কো গরুটাকে খুঁজে দড়ি দিয়ে বেঁধে বাড়িতে এনে দিয়ে শ্লেট বই বগলে ইস্কুলে যেত।

ইস্কুলটা ছিল নবঠাকুরদের বাড়ির সামনে। একটা পুকুরের এপাড় আর ওপাড়। নবু-ঠাকুর সকালবেলা থেকেই তানপুরোতে গ্যাঁও-গ্যাঁও সুর তুলে কেবলই করত আ-আ-আ। আ-আ-আ। আ-আ-আ। আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ—। চড়িয়ে চড়িয়ে যেত। আবার নামাতো—আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ।

আর ওপাড়ে পুকুরের ঘাটে বসে ঠাকুরের পিসী কোন দিন নেকনকে গাল দিত। কোন দিন মরা ভাই ঠাকুরের বাপের জন্য কাঁদত। ঠাকুর ওকে ভেন্ন করে দিয়েছিল। পিসী দে বাবুদের বাড়ি ভাতরান্নার কাজ নিয়েছিল।

মেয়েরা ঠাকুরকে ভেঙাতো—এ্যা—এ্যা—এ্যা। দে বাবুদের মেয়ে সে আবার বলত—ব্যা—ব্যা—ব্যা। ছাগল ডাক! ঘণ্টা পড়ত—ওরা ইস্কুলে ঢুকত। ওদের ক্লাসে আট দশটা মেয়ে একসঙ্গে শুরু করত—ঐ কয়ে য-ফলা ঐক্য—ঐ কয়ে য-ফলা ঐক্য। অন্য ক্লাসে এক-সঙ্গে মেয়েরা পড়ত—হুগলী জেলায় মহম্মদ মহসীন নামে এক মহাত্মা মুসলমান ছিলেন। হুগলী জেলায়—।

কোন ক্লাসে দিদিমণি বলতেন—এক লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশো পঁচিশ। লেখ এক লক্ষ পাঁচ হাজার—।

এর মধ্যে ঠাকুরের গলা মধ্যে মধ্যে শোনা যেত—মধ্যে মধ্যে শোনা যেত না। টিফিনের ঘণ্টা বাজলেই মেয়েরা সব বেরিয়ে এসে নামত পুকুরঘাটে। পরিষ্কার ন্যাকড়ায় বাঁধা মুড়ি কারুর মুড়কি—জলে ডুবিয়ে নিয়ে বারান্দায় বসে খাবে। ওপাড়ে তখন বিপন জেলেরা বাপ বেটা বসে তামাক খেতো আর জাল ফেলবার জন্যে হাতের উপর জাল সাজাতো। ঠাকুর দাঁড়িয়ে থাকত। মাছ ধরবে। ওস্তাদ আছেন শিষ্য আছেন—মাছ চাই। বড় মাছ শেষ হয়েছে—এখন চুনো মাছে দাঁড়িয়েছে। পুকুরটা ঠাকুরের। জেলেদের কাছে ভাগে দেওয়া ছিল। ওই বিপনের কাছে। মাছ ধরিয়ে ঠাকুর চান করত এই পুকুরেই। সময় ঠিক বাঁধা ছিল। ওদের ছুটি হত দশটায়। ঘণ্টা বাজলে মেয়েরা কলরব করে বের হত—তখন পুকুরে একগলা জলে দাঁড়িয়ে ঠাকুর সেই তান ছাড়ত—আ-আ-আ।

মেয়েরা হেসে সারা হত। সেও হাসত। একগলা জলে দাঁড়িয়ে—!

মালতীর মায়া লাগত। বেশ তো নিজেই গাইছ ঠাকুর। কি সুন্দর গলা! কি সুন্দর

গান।—এ ফুল খুঁজে নিতে হয়। সে সব ছেড়ে গলাটাকে ইচ্ছে করে মোটা করে কি যে আ-আ-আ করছে ঠাকুর! শরৎ মুখুজ্জে ওস্তাদ না মাথা! বলবার জো নাই। ওর বাবা শ্রীমন্ত এই বয়েসে মুখুজ্জের কাছে বাজনা শিখছে।

কত দিন বলি বলি করেও বলতে পারে নি মালতী। ঠাকুর স্নান সেরে উঠে চলে যেত। ভুবনেশ্বরতলা যাবে। পাণ্ডাগিরি আছে। সিঁদুরের ফোঁটা পরবে, আজকাল আবার বাবার রুদ্রাক্ষ-মালাটা গলায় ঝুলাচ্ছে।

কত দিন হাত মুখ ধোবার অছিলা করে সে এপাড়ের ঘাটে নেমেছে। জল দুলিয়েছে হাত দিয়ে পা দিয়ে। কিন্তু ঠাকুর আপন মনেই হয় আ-আ করত, না হয় স্নান সেরে জয় শিব শঙ্কর, জয় ভুবনেশ্বর, হর হর হর ব্যোম বলতে বলতে উঠে চলে যেত।

এই পুকুরটা।

এরই কথা বলেছে ধরণী জেঠা। এইটেই নিয়েছিল তার বাবা ঠাকুরের কাছে। এই পুকুর থেকেই—।

হঠাৎ একটা উচ্চরোলের হাসি হাটের সব গোলমাল ঢেকে দিয়ে সব মানুষের চুল ধরে ঝাঁকি দিয়ে টানলে -বললে—ফিরে তাকাও!

কি হল?

একটা জায়গায় লোকজন ভয়ে যেন পালাতে চাচ্ছে? মেয়েরা চেঁচাচ্ছে—ই বাবারে! ও মারে! ই—! ই! ই!

পুরুষেরা ধমক মারছে—এই— এই!

কতকগুলো সাঁওতাল মেয়ে হাততালি দিয়ে হি-হি করে হাসছে। দূরে পুরুষেরা হো-হো শব্দে হাসছে।

কি হল?

হঠাৎ ওই জনতার মধ্য থেকে একটা মুখ-পোড়া বীর হনুমান লাফ দিয়ে উঠে একজনের ঘাড়ে চড়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে উপ শব্দ করে আবার লাফ দিল। এবার মাটিতে। হনুমানটার এক হাতে একটা লাউ। সেখান থেকে লাফ দিয়ে হাট পার হয়ে উঠল গিয়ে সরকারদের কাঠের কারখানার চালে—সেখান থেকে কাছের বটগাছটায়।

একজন রসিক হেঁকে উঠল—জয় রাম!

(খ)

ধরণী দাস বললে—বড় উপদ্রব করছে বেটারা! একটা সন্ন্যেসীর দলের বাসা হয়েছে ওই পল্টনবাগানে। পল্টনবাগান ওই অশথ বট বেলগাছের আধা জঙ্গলটা। যেখানে শিবের ভূতবাহিনী থাকত। সেটেলমেণ্টে বলে এই রাস্তাটা ছিল মুরশিদাবাদ থেকে নবাবী সড়ক। এ পথে পল্টন চলত। বর্গী হাঙ্গামার সময় এখানে ছাউনি পড়েছিল। গাছগুলো তখনকার। পল্টন থেকেই বট অশথের ডাল পুঁতেছিল। বেড়া দিয়েছিল।

মালতী বললে—মস্ত বড় হনুমান।

—সব পুরুষ। বললাম তো সন্ন্যেসীর দল। সেদিন তাড়া খেয়ে একটা আমার চালায় ঢুকে সব তছনছ ক'রে দিয়েছে!

খদ্দের একটি ছিল—সে তাঁতের শাড়ি দেখছিল। যারা মশারি কিনতে এসেছিল তারা কখন চলে গেছে মালতীর খেয়াল হয়নি। সে সেই সব পুরানো কথাই ভাবছিল। খদ্দেরটি বললে—আর কিছু কম করেন।

—আর কম হয়? তৈরী খরচ উঠবে না! আর হবে না। ওই দশ টাকাই লাগবে। আনা পয়সা ছেড়ে দিলাম। যান। বাজারে দোকানে গেলে সাড়ে বারোর কম পান তো আমার কাছে আসবেন আমি অমনি দোব। বলছেন মেয়েকে দেবেন। যান, নিয়ে যান। আমরাও কন্যের পিতা।

—দেন।

লোকটি টাকা দিয়ে কাপড়খানা নিয়ে চলে গেল। হাটের হাসি থেমে গেছে—আবার সব যেন জমাট বেঁধে গেছে মাটিতে পড়া মিষ্টির উপর পিঁপড়ের চাপের মত। না। বড় বুনো মৌমাছির চাকে চাপবাঁধা মৌমাছির মত। ভন-ভন-ভন-ভন শব্দ উঠছে। মৌমাছিগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়ে সরছে নড়ছে চলছে। মধ্যে মধ্যে একটা ছুটো যেমন পাখার শব্দ ক'রে ওড়ে তেমনিভাবে চেঁচাচ্ছে, কমল, আলুর দর কমল! কেউ একটা হাতঘণ্টা নেড়ে দিচ্ছে। একজন ফিরিওলা চোঙা মুখে লাগিয়ে হাঁকছে। একজন কে শাঁখের মত কি বাজাচ্ছে।

কারা সার্কাসের ঢাকের মত ড্রাম বাজিয়ে ঢুকছে—টেরা টাম—টেরা টাম—টেরে—টের—টেরে—। সঙ্গে একটা বাখারির মাথায় একটা চৌকো বোর্ডে রঙীন ছবি। একজনের পরনে পাজামা—একটা ছিটের কামিজ—উস্কোখুস্কো চুল—সে একটা চোঙা মুখে তুলে বলতে লাগল—ভুবনপুর টকী—। নতুন ছবি। নতুন ছবি! প্রেমের পিদিম। প্রেমের পিদিম। শ্রেষ্ঠাংশে সুনেত্রা বরুণ। আর দু'দিন মাত্র। একজন কাগজ বিলুচ্ছে।

খদ্দেরের দেওয়া নোটটা মুড়ে গেঁজলেতে পুরতে পুরতে ধরণী বললে—ব্যবসা আর করা লয় মা। এ আর চলবে না। বুঝেছ! চুরিচামারি না করতে পারলে, খদ্দেরের গলা কাটতে না পারলে লোকসান। এই তো বিক্রি করলাম চল্লিশ টাকার ওপর—চারটে টাকাও থাকবে না। তাঁত নিয়ে বসে আছি। সুতো নাই। আছে সুতো—বেলাকের দাম দিতে হবে। ইদিকে বাজারে আগুন লেগেছে। গবরমেণ্টার ঠুঁটো হয়ে বসে আছে। করছে অনেক। রাস্তা ঘাট হাসপাতাল ইস্কুল—

ধরণীর কথায় বাধা দিয়ে মালতী বললে—পাণ্ডাদের চলতি এখন কেমন জেঠা?

—ওদের ভাল মা। ভাল চলছে। এই তো দু'তিন বছরের মধ্যে কজনাই ঘরে টিন দিলে! লোকের হাতে নগদ পয়সা আসছে যাচ্ছে তো বেশী। মানত ঢেলা বাঁধা এসব বেড়েছে। গিয়েছিলে বাবার থানে?

—না।

—গেলেই দেখতে পাবে। দে মশায়রা পাকা চত্বর করেছিল বাবার—তার চারিদিকে

সব নাম নিকে নিকে মার্বেলের ট্যাবলেট বসিয়েছে। শুনছি ওই মিলওলা মাড়োয়ারী নাকি এবার লাভ করেছে খুব, এসে মানত করেছিল। সে বাবার থানের চারিপাশে গোলথাম করে তার ওপর গম্বুজ করবে। ঢেলা বাঁধা তো রাশি রাশি! দেখে এস ক্যানে নিজের চোখে!

মালতীর মনে পড়ল তারও বাঁধা একটা ঢেলা আছে। সেও বেঁধেছিল। খুব ছেলেবয়সে একদিন বাঁধতে গিয়ে লজ্জা করে বাঁধে নি। পরে বেঁধেছিল। বর কামনা করেই বেঁধেছিল। কিন্তু খোকাঠাকুর নয়। খোকাঠাকুর তখন দেশ ছেড়ে নিরুদ্দেশ। বেঁধেছিল বসন্ত—শরৎ মুখুজ্জের, ওস্তাদের ছেলের জন্যে। তার বয়স তখন এগারো। বসন্তের বয়স পনের ষোল। বসন্ত সেবার ভোটাভুটির সময় এই ভুবনপুরে আদি চাটুজ্জেকে ভোট দাও করে বেড়াত। আদি চাটুজ্জে হিন্দু মহাসভার লোক। বসন্ত গান গাইত—

দ্রৌপদী কাঁদে দুঃশাসনেরা রজস্বলার টানে বসন—
পাণ্ডব নত মস্তকে বসি—জাগো নর নারায়ণ!

তারপর বক্তৃতা করত। বলত—কংগ্রেস জুয়ো খেলতে গিয়ে আজ হাত পা বাঁধা দাসে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানে মেয়েদের ইজ্জত যাচ্ছে—চীৎকার করে কাঁদছে তারা। দাসেরা কিছু বলবে না। বলবার ক্ষমতা নাই। দাস। ক্লীব। এখন মানুষকে উঠে দাঁড়াতে হবে। নরের বুকে নারায়ণের বাস। ঘুমুচ্ছেন তিনি। তিনি জাগুন।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত শুনে।

বসন্ত থাকত ভুবনপুরে। ওই খোকাঠাকুরের বাড়িতে আড্ডা করেছিল। গ্রামের কতকগুলো ছেলে জুটিয়েছিল। শরৎ মুখুজ্জের শিষ্যরা প্রায় সবাই তার কথায় সায় দিত। শরৎ ওস্তাদ নিজে বলে দিয়েছিলেন। বসন্ত মাইনে পেত আদি চাটুজ্জের কাছে, শরৎ ওস্তাদ বাড়িটার জন্য ভাড়া নিত। খোকাঠাকুরের বাড়িটা তখন শরৎ ওস্তাদ দখল করতেন। বলতেন—নবু আমাকে দিয়ে গিয়েছে।

খোকাঠাকুরের পিসী তার এক বছর আগে মারা গেছে। নবুঠাকুর কেঁদুলীর মেলায় গিয়েছিল। সেই মেলা থেকে আর ফেরে নি। সঙ্গে শরৎ ওস্তাদ তার বাবা শ্রীমন্ত ধরণী জেঠা এরাও গিয়েছিল। ফিরে এসে বলেছিল—বাউলদের সঙ্গে সে চলে গিয়েছে। যাবার সময় দেনার দায়ে শ্রীমন্তকে পুকুর আর জমি বিক্রি করে গিয়েছে। বাড়িটা শরৎ ওস্তাদকে দিয়ে গিয়েছে। আর ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাগিরির পালা ছেড়ে দিয়েছে শরিকদের। পাণ্ডাগিরির দান বিক্রি চলে কেবল পাণ্ডাদের মধ্যে। সে বাউল হয়ে গিয়েছে—তার জাতও গিয়েছে; বিক্রি করতে দান করতে চাইলেও নাকি তা হত না।

খোকাঠাকুরের জন্যে কাঁদে নি কেউ। ছিলই না কেউ। জ্ঞাতিরা খুশী হয়েছিল, পালা বেড়েছিল তাদের। শরৎ ওস্তাদও না। বলেছিল, তাদের বাড়িতেই বলেছিল—ওর ওই নিয়তি। বুঝলি শ্রীমন্ত। প্রথম যখন আমার কাছে স্যাড়া বাঁধে, শিষ্য হয় তখন ওর গলা শুনে আর দু'একখানা গান শুনে ভেবেছিলাম খাঁটি মাল হবে। কিন্তু তার পরে দিন যত গেল তত দেখলাম বাজে ভুসি মাল। তিন চার বছর ওর সারগমই হল না। ধ্রুপদ ধামার

ওর হবে না। কোন কালে হবে না।

চাঁপা মাসী শুধু দুঃখ পেয়েছিল। চোখ দিয়ে তার জল পড়া সে দেখেছে। দুঃখ 'সেও পেয়েছিল। কিন্তু চাঁপা মাসীর মত না। খোকাঠাকুরের এমন ধর্ম ধর্ম বাতিক হয়েছিল আর গাঁজা খেয়ে খেয়ে এমন বোকা বোকা চোয়াড়ে চেহারা হয়েছিল যে কেমন খারাপ লাগত।

চাঁপা মাসী সেদিন ওস্তাদকে বলেছিল—তা কইবেন না ওস্তাদ। গান সে ভাল গাইত। আপনি অরে শেখান নি। অই আপনারে আনল, সেবা করল আর আপনি স্থাশের বাড়ির বড়লোক সাকরেদ পাইয়া অরে স্থাখলেন না, তুচ্ছ করলেন।

শরৎ ওস্তাদ বলেছিল—এই—এই—এ মেয়েটা বলে কি? ও শ্রীমন্ত, তোর পরিবার বলে কি? এঁ্যা? তোদের মেয়ে ইস্কুলে পড়ছে। ফেল হল ক্যানে? এঁ্যা? শিখলে শিখতে পারার বিদ্যে চাই। না কি? তুলো পাকিয়ে শলতেতে তেল টানে—পিদিম জ্বলে, কাপাস গাছের কাঠি কি ছাল দিয়ে শলতে করলে ধরে, না জ্বলে? মাথা নাই। যা ছিল তা—

বলতে দেয় নি চাঁপা মাসী—সে বলেছিল—সিটি কইবেন না ওস্তাদ! মাথা তার ছিল না, সিটি লয়। সি আমারে বলত—বলত—বৈরাগী বউ, ওস্তাদ আমারে শিখায় না। আমারে মনে মনে তুচ্ছু করে। গরীব বইলা তুচ্ছু করে। মুখ্যু বলে—বোকা বলে। এখুন বড়লোক শিষ্য জুটছে তো! আপনি তারে তুই তুই করতেন—কড়া কথা কইতেন—কথায় কথায় বলতেন গাড়োল তুই একটা। আর বাবুদের ছেল্যাদের বলতেন—বাবু আপনি। হাজার ভুল তারা করলেও কত মিঠা কথা বইলা বার বার দেখাইয়া দিতেন—

—এই—এই—এই! এ মেয়ে বলে কি? আরে বাবুদের ছেলে আর নিত্য পাওার বেটা নবা গেঁজেল কি সমান নাকি? এঁ্যা—

—আপনি গুরু, শিষ্য তো সবাই সমান—

—না। এ মেয়েটা ওঠালে আমাকে।

তার বাবা শ্রীমন্ত ছিল না সেখানে তখন। উঠে গিয়েছিল ঘরের মধ্যে। কেন্দুলী মেলা থেকে আতর এনেছিল গাঁজার মেশাবে বলে, ঘর থেকে তাই আনতে গিয়েছিল—এই মুহূর্তে বাইরে এসে ধমক দিয়ে বলেছিল—মারব তোকে একথাপ্পড়। উঠে যা বলছি, এখান থেকে উঠে যা।

হেসেছিল মাসী অভ্যাসমত। কিন্তু সেদিন খিলখিল করে হাসে নি। একটু কেমন ভিজে ভিজে হেসে বলেছিল—তা মার না ক্যানে। মার খাইবার তরেই তো আমার পিঠখান্ বিধাতা গড়ন কইরাছিল। আর সইতেও পারি। তবে হক কথা কইব। তুমি তারে ঠকাইয়া পুকুর জমি লইয়া লিলে—

আরও জোরে ধমক দিয়েছিল শ্রীমন্ত।—ঠকিয়ে নিয়েছি?

—লও নাই? বুকে হাত দিয়া কও!

এবার চুলের মুঠো ধরেছিল শ্রীমন্ত।—টাকা দিই নি তাকে দফায় দফায়? পাঁচ দশ বিশ? হিসেব করে দলিল করে দিয়ে গেছে সে। তোর যে টান খুব দেখি!

ওস্তাদ বলেছিল—এই এই। ছাড়, ছাড় শ্রীমন্ত। মেয়েদের চুল ধরতে নেই ধরতে

নেই। ছাড়। বলছে ও বলুক—বলতে দে। তুই এত চটছিস ক্যানে, তোর তো দলিল আছে। সে তো লিখে দিয়েছে।

মালতী সেদিন দাওয়ার একপাশে একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল সারাক্ষণ।

শ্রীমন্ত ছেড়ে দিয়েছিল চাঁপার চুলের মুঠো।

চাঁপা কিন্তু তবু চুপ করেনি। সে বলেছিল—দলিল কইরা দিছে—তোমার হাতে দলিল রইছে—সেটার কথা আমি কই নাই। হিসাবের কথা কইছি। সে তো হিসাব রাখে নাই।

—আবার!

চাঁপা তখনও বলেছিল—আর ওস্তাদ গুরু বেরাহ্মণ। গুরুর কাছে আপন পোলা আর শিষ্যে তফাৎ নাই। আপনকার পোলা আইসা তার ঘরে বইসা তারে কি মারটা মারল। গালে পাঁচ পাঁচটা আংগুলের দাগ দড়ার মত হইয়া উঠল। কিছু কইলেন না আপনি?

—এই। আরে কি বলব? তাতে আমি কি বলব? বসন্ত ইস্কুলে সেকেন ক্লাসে পড়ে। ভাল ছেলে। তার সঙ্গে মুখ্যু পাঙার ছেলে তক্ক লাগিয়ে দিলে। সে দিন ভূমিকম্প হয়েছিল রাত্রে—তা সকালে বসন্ত বলেছিল ঋষি ছুতোরকে ভূমিকম্প কি করে হয়। মুখ্যুর ডিম অজ মুখ্যু—গাঁজা সাজছিল—একেবারে বিজ্ঞ পণ্ডিতের মত মাথা নেড়ে বললে—কিচ্ছু জান না তুমি! ভূমিকম্প হয় বাসুকী মাথা নাড়লে। বাসুকী নাগ হাজার ফণার উপর পৃথিবীকে ধরে রাখে তো, তা মধ্যে মধ্যে এ-ফণা থেকে যখন ও-ফণায় নেয় তখন ভূমিকম্প হয়—আর যখন পাপ বেশী হয় তখন মাথা নাড়ে। তখনই ঘর দোর ভাঙে। মানুষ মরে। এই তর্ক। তা গাঁজাল তো! বসন্ত বলেছিল গাঁজাখোরের আর কত বুদ্ধি হবে! তা বেটা বলে কি—তোমার বাবাও তো—মানে আমি—আরে বেটা আমি তোর গুরু, বলে তোমার বাবাও তো গাঁজা খায়। এই বসন্ত বসিয়ে দিয়েছিল চড়। দেবে না!

চাঁপা মাসী বলেছিল—আপনি কথাটা সত্য কইলেন না ওস্তাদ! তারে আপনার পোলা শুধু গাঁজাল কয় নাই, কইছিল গাঁজালের ব্যাটা গাঁজাল তোর বুদ্ধি আর কত! তখুন সে কইছিল—তোমার বাপও তো গাঁজা খায়! তা ঢিল মারলে ত' পাটকেলটি খাইতেই হবে!

—হবে? খাইতেই হবে? বাঙাল কিনা! আরে বসন্তের বাবা তোর গুরু, তোর বাবা তো বসন্তের গুরু নয়! বসন্ত বলতে পারে। কিন্তু ও বলে কি করে?

কথাটা ওইখানেই চাপা পড়েছিল বিপন জেলে আসায় সেদিন। বিপনের সঙ্গে এসেছিল সুরেন সাহা। বিপন এসে বলেছিল—দাসজী, আমি যে এলাম আপনকার কাছে। শুনলাম আপনাকে ঠাকুরমশায় পুকুর লিখে দিয়ে গিয়েছে দেনার দায়ে। তা আমার যে ভাগে মাছ ফেলা আছে।

শ্রীমন্ত বলেছিল—হ্যাঁ। পুকুর আমি কিনেছি বিপন।

—দলিলটো একবার—

—তা দেখ না। তা দেখ না। আমি সাক্ষী! সই করেছি। তা দেখা রে শ্রীমন্ত—দেখিয়ে দে, দেখিয়ে দে দলিল। ইস্ট্যাম্পের ওপর। দেখা! কে দেখবে? অ সুরেন। এস। এস দেখ!

তার বাপ দলিল বের করে এনে দেখিয়েছিল।

মালতী এবার এগিয়ে এসে উঁকি মেরে দলিলটা দেখেছিল। দেখেছিল খোকাঠাকুরের সইটা। লেখাটা তারই মতন বাঁকা বাঁকা গোটা গোটা।

তার বাবা পরের দিনই পুকুরের মাছ ধরিয়ে বিপনের ভাগ দিয়ে পুকুর নিজস্ব করেছিল।

(গ)

মালতীর কপাল কুঁচকে উঠল। মনে পড়ল একটু আগে ধরণী জ্যাঠা বলেছে সে তার বাবাকে বলেছিল সব বেচে মানুষ খায় শ্রীমন্ত, ধম্ম বেচে খায় না। বামুনের ছেলের পুকুরটা জমিটা নিয়ে তুই ভাল করলি না!

ওই পুকুর নিয়েই তাদের সর্বনাশ হয়েছে, তাকে খুনের দায়ে পড়তে হয়েছে এটা সত্যি। কিন্তু অধর্ম কোথায় করেছে তার বাপ! দলিলের সইটা তো এখনও সে চোখে দেখতে পাচ্ছে!

মালতী ভুবনেশ্বরের উঁচু আটনটার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ধরণীর দিকে তাকালে। ধরণী জ্যাঠা চশমা চোখে খাতা নিয়ে বোধ হয় আজকের হিসেব টুকছে। তাকে ভুবনেশ্বরের আটনের দিকে তাকিয়ে চিন্তামগ্ন দেখে আর কথা বলে নি। আপন কাজ করছে। বেলা পড়ে এসেছে। সূর্যের আলো ভুবনেশ্বরের পশ্চিমে বট অশত্থ বেলাগাছের মাথার উপরে উঠেছে। হাটে এর মধ্যেই কখন ধবধবে জামা-কাপড়পরা বাবুদের আমদানি হয়েছে। একদল কিশোরী মেয়ে—সকলেই শহরের মেয়ের মত ঝকঝকে—তারা এসে ঘুরছে। মিল থেকে এসেছে সাঁওতাল মেয়েরা। এরা আর আগেকার সাঁওতাল নয়। মেঝেনরা সব জামা পরেছে, রঙীন শাড়ী পরেছে। চোখের দৃষ্টিতে বোঝা যাচ্ছে একটুক্ষণ আগের হাট ক্ষণে ক্ষণে পালটে পালটে অনেক পালটে গেছে। কিন্তু শব্দ সেই এক! সেই একটা বড় বুনো মৌমাছির চাকের চারিপাশে যে গুন-গুন ভন-ভন শব্দ ওঠে সেই শব্দ!

ইস্কুল আপিস সব বন্ধ হয়ে গেছে। চারটে বেজে গেছে হয়তো আধঘণ্টার উপর। ইস্কুলের ছেলেরা, ইস্কুলের মেয়েরা, মাস্টারেরা, আপিসের বাবুরা এসেছে হাটে। চেহারা পালটেছে হাটের।

মুরগীওয়ালারা জোরে হাঁকছে—মুরগী ডিম হাঁসের ডিম হাঁসের ডিম—মুরগী ভাল মুরগী!

কারওয়ালাগুলো উৎসাহিত হয়ে উঠেছে ইস্কুলের মেয়েদের দেখে। তারাও সুর করে জোর গলায় গাইছে—চার হাত কার, চার হাত ফিতে—লম্বা লম্বা—শক্ত শক্ত। চুল বাঁধলে খুলবে না। মন বাঁধলে ছিঁড়বে না!

—ওরে শম্ভু, তেল বাতি কর আলোতে। চিমনি ভাল করে মোছ। ধরণী দাস হেঁকে বললে শম্ভুকে। শম্ভু ধরণী দাসের কাপড়ের মোট বয়ে নিয়ে যায়। ধরণী দাস নিজের পিঠেও একটা মোট বেঁধে নেয়। সন্ধ্যের পরও হাট আজকাল চলে কিছুক্ষণ। আলো জ্বালতে হয়। তরকারির ফড়েরা কেউ লম্প জ্বালে, কেউ হ্যারিকেন। বিনোদিনীর দোকানে গুঁইদের দোকানে জ্বলে হেজাক আলো।

মালতী ঘুরে বসে জিজ্ঞাসা করে বসল—আচ্ছা জেঠা, তুমি বললে ওই পুকুরটার কথা!

—ওইটেই তো অনর্থের মূল মা। বল বটে কিনা। ওর জন্তেই তো তোমার দণ্ড। কী করতে কী হয়ে গেল!

—তা গেল। কিন্তু বাবা তো ঠকিয়ে নেয় নি। তুমি অধম্ম বললে। বাবাকে বলেছিলে বলছ। কিন্তু আমি তো দলিল দেখেছি!

ধরণী দাস তার মুখের দিকে চাইলে মাথাটা হেঁট করে চশমার ফাঁক দিয়ে। একটুক্ষণ পর বললে—মা, দলিলের সময়ে আমি ছিলাম, আমিও কেন্দুলী গিয়েছিলাম। তা ছাড়া কত টাকা সে নিয়েছিল তাও জানতাম। টাকা তো সব শ্রীমন্তও দেয় নাই, আমার কাছে থেকে নিয়ে দিয়েছে। সব ওই ওস্তাদের জন্তে। এ তো দেখেছ—ওস্তাদ আসত, সঙ্গে কোনবার দুজন কোনবার তিনজন শিষ্য আসত। তা ছাড়া এখানকার দুজন তিনজন, দিনে না-খেলেও রাতে খেত। ওস্তাদ লুচি খেত। গাঁজা খেত বলে ক্ষীরের মত দুধ খেত। তা ছাড়া বিকেলে মিষ্টি। সে অনেক কাণ্ড। খোকাঠাকুর মানুষটা তো আধপাগল। প্রথম প্রথম খুব উৎসাহ করে করেছিল। শেষ নগদ শ তিন চার যা ছিল পুঁজি ফুরোল। পিসী গাল দিতে লাগল। পিসীকে ভেন্ন করে দিলে। ঘটি বাটি বাঁধা আরম্ভ হল প্রথম। তোমার বাবাই এনে দিত। নিজে অনেক বাসন নিয়েছে। আমাকেও দিয়েছে মা। ওদের বাড়িতে একটা বড় গাগরা ছিল, বড় বড় কড়াই ছিল, সেগুলো গন্ধবেনেরা নিয়েছে। তার পরে ধার —কোন দিন পাঁচ কোন দিন সাত। কোন দিন দশ। এই করে শ তিনেক টাকা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম শ্রীমন্তকে—দিচ্ছিস—নিবি কি করে? আর ওই হতভাগা ছেলেটার দোষ তো কিছু নাই। ওকে বেঁধে করবি কি? শ্রীমন্ত বলেছিল মা, এই কাপড়ের পাটে বসে বলছি—সন্ধ্যে হয়ে এল—মিথ্যে বলি তো ভগবান দেখবেন; বলেছিল—ও মরবে তো আমি কি করব বল? ও তো মরবেই। আমার বাপু পুকুরটি চাই। কেন্দুলীতে যখন ঠাকুর বললে—আমি চললাম, বাড়ি আর যাব না। সে একবারে গিরিরঙা কাপড় বাউলদের মত পরে। তখন তোমার বাবা বললে—যাবে তো? আমার টাকা? আমার টাকা কে দেবে? কম টাকা নয়! পাঁচ ছ শো! তা ঠাকুর বললে—টাকা তো আমার নাই। তা আমার জমি আছে নিস। দিলাম তোকে। শ্রীমন্ত বললে—জমি তো ডাঙা জমি। মাপে কম। পাঁচশো ছশোর বেশী হবে টাকা—শোধ হবে ক্যানে? তোমার পুকুরটা সমেত দিতে হবে। ঠাকুর বললে—তাই দিলাম—এখন দশ বিশ টাকা আর থাকে তো দে। ভিক্ষে শিখতে সময় লাগবে তো! শ্রীমন্ত বললে—দশ টাকা দোব। কিন্তু ইস্ট্যাম্প কিনে আনি, লিখে দিতে হবে। বললে—আন।—দিলে সই করে। ওস্তাদ বললে—তোর বাড়িটা কি করবি? আমাকে দে ক্যানে? বললে—তা নিয়েন, বাস করেন। ওস্তাদ বললে—কত দাম নিবি? বললে—গুরু আপনি—আমাকে গালমন্দ যাই করুন—গুরু। দাম আর আপনার কাছে নোব না। ওস্তাদ বললে—তা হলে লিখে দে! তাও লিখে দিলে।

শম্ভু হ্যারিকেন জেলে এনে চালায় ঝোলানো দড়িতে টাঙিয়ে দিলে। ধরণী দাস হাত

জোড় করে প্রণাম করে একখানা টিকে ধরাতে বসল—তার উপর এক কাঁকর ধুনো ফেলে দিয়ে ধূপ দেবে।

টিকে ধরাতে ধরাতে বললে—তোমার বাবার দোষ তত নাই মা'যত দোষ যত দায় শরৎ ওস্তাদের। খোকাঠাকুর ওকে সেবা যত্ন ভক্তির শেষ রাখে নাই। কিন্তু ওস্তাদ তাকে এমন করত না শেষটায় যে সবার মনেই লজ্জা হত। গরু গাধা, বোকা মাথামোটা, ডাকনাম ছিল—

মালতী বললে—তা জানি, চাঁপা মাসীর সঙ্গে ঠাকুরের ভারী ভাব ছিল। চাঁপা মাসীকে বলেছিল ঠাকুর।

—হ্যাঁ মা। ঠাকুরের ধ্রুপদ ধামার বড় তালের গানে ঝোঁক ছিল না। ওস্তাদের ঝোঁক ছিল বড় তালের ওপর। ওকে শেখাবেনই। আর ঠাকুরের মন অন্য দিকে। তা ছাড়া যেমন অনেক ছেলের অঙ্কে মাথা থাকে না তেমনি উদিকে মাথাও ছিল না। তার ওপর গাঁজা খেয়ে খেয়ে কেমন হয়ে গিয়েছিল ঠাকুর। বুঝেছ। ভাম হয়ে থাকত। আসল কথা মনে মনে দুঃখ হয়েছিল। সব চেয়ে দুঃখ ওস্তাদ বাবুদের ছেলেদের গান শেখাতে যেতেন ওদের বাড়ি—ওকে চাকরের মত খাটাতেন, যা তা বলতেন। অথচ সে বাবুদের ওরা হল গুরুবংশ! ভারী লেগেছিল মনে। ওস্তাদের ছেলে বসন্ত—সে তো চড় মারত। তার ওপর কেন্দুলীতে গিয়ে এক কাণ্ড হল। আমরা বাসা করলাম। মেলা দেখছি। ঠাকুর হারালো। দেখ দেখ কোথা গেল, দেখ! শেষে পাওয়া গেল—এক গাছতলায় এক দল বাউল বসেছে—একজন বাউল গান করছে—ঠাকুর তন্ময় হয়ে শুনছে! শরৎ ওস্তাদের ছাত্র ঋষি ছুতোর এসে খবর দিলে। ঠাকুর নইলে রান্না চাপছে না। ওকেই রাঁধতে হবে। শেষে ওস্তাদ-গিয়ে ওকে ধরে নিয়ে এসে যা তা গালাগাল! সে যা তা মা! ঠাকুর কিছু বললে না। রান্নাবান্নাটি করে, সবাইকে দিয়ে থুয়ে, হাত পা ধুয়ে বেরিয়ে গেল। সারারাত ফিরল না। পরদিন দশটা এগারটা পর্যন্ত না। শেষ অজয়ের ঘাট থেকে শ্রীমন্ত ধরে আনলে, তখন কাপড় গিরিরঙ করে পরেছে, কাছা দেয় নি। বলে আমি বাউল হয়েছি। আর ঘর যাব না। তোমরা ফিরে যাও। আমি ওই বুড়ো বাউলের সঙ্গে যাব। ওর কাছে গান শিখব সাধন করব। বাস্। তখন শ্রীমন্ত লিখে নিলে।

ঢং ঢং শব্দে ভুবনেশ্বরতলায় আরতি হচ্ছে। কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। হাটের সব দোকানদার ক'ড়ে একবার উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে প্রণাম করলে।

একজন খদ্দের এসে দাঁড়াল—ভাল মশারি আছে?

—আছে! বের করলে ধরণী দাস।

—এ না। এ তো তাঁতের। ভাল, নেটের মত—

—না তা নেই। সে.নেবেন তো, গুঁইদের ঘরে নাই?

—না। বললে গন্ধেশ্বরীতলায় বাজারে যান।

—হ্যাঁ, তাহলে তাই দেখুন। তবে তার চেয়ে এতে বাতাস ঢুকত ভাল। সেই আসল নেট তো পাবেন না!

ভদ্রলোক। অর্থাৎ কাপড় জামা চশমাপরা বাবুলোক। একটু থমকে দাঁড়িয়ে ভেবে

বললে—মশারিটা ফেলে এসেছি। অন্যের মশারিতে শুতে পারি নে। দিন তাই একটু বড় দেখে দিন। কোথায় যাব গন্ধেশ্বরীতলা। দিন।

—পছন্দ করে দেখে নেন নিজে।

—আপনি দিন। ওর আবার পছন্দ! দিন। একখানা দশ টাকার নোট ফেলে দিয়ে বললে—যা দাম হয় নিন। বাকীটা ফেরত দিন। না গুনেই টাকাটা পকেটে ফেলে মশারিটা বগলে পুরে চলে গেল।

ধরণী দাস বললে—ভাল খদ্দের বাবুলোক। এজেণ্টো ফেজেণ্টো বটে।

মালতী ও কথার কোন জবাব না দিয়ে বললে—আচ্ছা জেঠা, ঠাকুর লিখে দিলে যদি তবে বাসুদেব তামাকওলা পুকুর নিয়ে হাঙ্গামা লাগালে কি করে? ঠাকুর কি ওকেও বিক্রি করেছিল?

—না না। সে লোক সে নয়। সে বুদ্ধিও তার ছিল না। পুকুরটা ছিল দে বাবুদের ছ'আনি তরফের। ছ'আনি তরফের বুড়ো কর্তা ঠাকুরের বাবাকে মৌখিক দান করেছিলেন। লিখে কিছু দেন নি। তখন ঠাকুরের বাবা নিত্য ঠাকুরেরও বয়স ষোল সতের বছর। বাবুদের বাড়িতে এক বড় ওস্তাদ এসেছিল। তার সঙ্গে বাজাবার গাইবার কেউ ছিল না এখানে। নিত্যঠাকুর সাহস করে এগিয়ে গিয়ে গেয়েছিল। গাঁয়ের মান রেখেছিল। বুড়ো দে কর্তা খুশী হয়ে বলেছিলেন—কি চাও বল। নিত্যঠাকুরের বুড়ো বাপ বলেছিল—কর্তা, আপনার অনেক পুকুর। ওইটে ওকে দেন। কর্তা বলেছিলেন—তাই দিলাম। সে তো এক,কাল ছিল মা! তখন এই ছিল। তারপর এবার জমিদারি উঠবার পর সরকারী সেটেলমেণ্ট এল। তখন দে বাবুরা খতেন দেখতে গিয়ে দেখলে পঁচিশ ছাব্বিশ সালের সেটেলমেণ্টে পুকুর তাদের হয়ে আছে। তারা শ্রীমন্তকে টাকা চাইলে—দে কিছু। শ্রীমন্ত গোঁয়ার—দিলে না। তখন ওই তামাকওলা বাসুদেব এসে বললে—আমাকে দিন বাবু—হামি লিব। দিয়ে দিলে দে বাবুরা। বাসুদেব ফৌজদারি করলে। মামলা হল। আদালত থেকে ইনজাংসন হল। মাছ ধরা বন্ধ রইল। কিন্তু তোমার বাবা অনেক যত্নে বড় বড় মাছ করেছিল। দশ সের বারো সের। সে সইতে পারলে না। রাত্রে চুরি করে ধরতে গেল জোতেনে।

(ঘ)

—যে মাছটা সে রাতে ধরেছিল সেটা বলে পনের সের ছিল। তুমি তো সঙ্গে ছিলে। নয়?

মালতী বললে—হ্যাঁ। ক'দিনই তো ধরছিল বাবা! গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিত রান্না করলে গন্ধ উঠবে বলে। আমি সঙ্গে রোজই থাকতাম। আমিই বয়ে এনেছিলাম সেদিন। মাছটা ঘাইয়ের জোরে ডাঙায় পড়লেই হাতে আমার খেঁটে থাকত তাই দিয়ে মারতাম। মাছটা মরে যেত। বয়ে আনতাম।

মনে পড়ছে মালতীর। তখন সে মস্ত মেয়ে। আদালতে বিচারের সময় বয়স তার পনের

বছর বলেছিল ডাক্তার। ডাক্তার পরীক্ষা করেছিল তার বয়স।

বেশ হাঁপালো মেয়ে ছিল সে। তখন থেকে এখন তিন বছর পর আর একটু বেড়েছে মাথায়। তার বেশী নয়। দেহ অবশ্য অনেক ভরেছে। কিন্তু তখনও সে প্রায় যুবতী মেয়ে। মনে পড়ছে ভোরবেলার সেই গরু আনা কাজটি তার তখনও ছিল। সে গরুটা ছিল না। অন্য গাই। গাইটার স্বভাবও সেটার মত ছিল না। কিন্তু তার বাবা—শুধু তার বাবাই বা কেন তারা সবাই গাইটাকে সেই স্বভাব তৈরী করে দিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা প্রথম প্রথম তারাই তাকে বাড়ি থেকে বের করে খানিকটা দূর তাড়িয়ে দিয়ে আসত। কিন্তু প্রথম কিছুদিন সে বাড়ির পাশে পাশেই ফিরত, হাম্বা হাম্বা করে ডাকত। তারপর চুরি করে খাওয়ার স্বাদ বুঝে সেও গাইটার মত সারারাত্রি নির্বিবাদে এখানে ওখানে খেয়ে পেটটা জয়ঢাকের মত ফুলিয়ে কোন গাছতলায় বসে রোমন্থন করত। ভোর হলেই মালতী বের হত—এক হাতে দড়ি এক হাতে পাঁচন লাঠি। গ্রামের ছেলে ছোকরারা লোভীর মত তার দিকে তাকাতো। এখন সে যথেষ্ট সুন্দর হয়েছে কিন্তু তখনও সুন্দর ছিল। আর সুন্দর হবার কতগুলো নিয়ম সে শিখেছিল। শিখিয়েছিল ওস্তাদের ছেলে বসন্ত। মাথায় তেল সে কম দিত। চুলগুলো রুখু হয়ে ফুলো ফুলো হয়ে থাকলে তেলমাখা খোঁপাবাঁধা চুল থেকে ভালো দেখায় এ তাকে বসন্ত শিখিয়েছিল। বসন্তই তাকে ব্লাউস পরতে বলেছিল। গ্রামে ভদ্রলোকের মেয়েদের মধ্যে ব্লাউস এলেও শ্রীমন্ত বলত—ক্যানে রে? ও ক্যানে? সামিজ হলেই তো হয়! কিন্তু মালতী একা শ্রীমন্তের কথার অধীন নয়। শুধু তার শিক্ষাতেই সে চলে না। তার শিক্ষা তিনজনের কাছে। শ্রীমন্তের কাছে—চাঁপা মাসীর কাছে—বসন্তর কাছে।

সেই ভোটের সময় বসন্ত যখন ছেলেমেয়ে নিয়ে ঝাণ্ডা উড়িয়ে বেড়ায় আর জাগো নারায়ণ বলে গান করে, বক্তৃতা করে তখন থেকে বসন্তের প্রতি সে মুগ্ধ। কি বক্তৃতা সে করত! টগবগ করত রক্ত।

বসন্ত তাকে ওই গানগুলো শিখিয়েছিল। বলত—একাল কি সেকাল যে ঘরে জুজুবুড়ির মত বসে থাকবি? না তেলক কেটে চুড়ো বেঁধে খঞ্জনি বাজিয়ে গান করে ভিখ মেগে বেড়াবি? তুইও যা যে ওই দে বাবুদের মেয়েরাও তাই সে।

তখনও সে ইস্কুলে পড়ত! আপার প্রাইমারি ফার্স্ট ক্লাসে। এক এক ক্লাসে দু বছর করে সে থেকে থেকে ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছিল।

সেইবার থেকেই মেয়েদের বড় ইস্কুল হবার কথা হল। বসন্ত শ্রীমন্তকে বলেছিল—শ্রীমন্ত মালতীকে ইস্কুল হলে ভর্তি করে দিতে হবে। তোমার তো এই এক মেয়ে।

শ্রীমন্তও তখন বসন্তের চেলা হয়েছে। দে বাড়ির ওরা আগে সাহেবের অনুগত ছিল, তারা এখন কংগ্রেসে ঢুকি-ঢুকি করছে। চিরকালকার বেকার বাউণ্ডুলে জেলখাটা গৌরীনাথ তখন কংগ্রেসী পাণ্ডা হিসেবে চাকলার মাতব্বর হয়েছে। শ্রীমন্ত কোন কালেই কাউকে মানতে চায় না। তবু দে বাবুদের মানত বড়লোক বলে এবং এককালে ওদের ঘরে কাজ করেছে বলে। কিন্তু গৌরীনাথকে মানবে কেন? সেই বা কিসে কম? বসন্তের সঙ্গে তার

বেশ বনেছিল। বসন্ত বেশ ভাল কথা বলে! বাহাদুর ছেলে! তার উপর শরৎ ওস্তাদ তার গুরু। বসন্তের কথা শুনে শ্রীমন্ত বলেছিল—তা বেশ। দোব ভক্তি করে!

বষ্টুমদের চিরকালের চিহ্নের মধ্যে তার গলায় মিহি কণ্ঠি ছিল। এটা তার বাপেরও ছিল। চাঁপা মাসী তিলকও কাটত। কণ্ঠি পরে তাকে মানাতো ভালো। আয়নায় সে তা পরখ করে দেখেছিলে গলাটা কেমন লম্বা আর ন্যাড়া দেখায়! কণ্ঠি পরলে ভালো দেখাতো।

সকালে উঠে সে যখন গরু খুঁজতে যেত তখন দে বাড়ির কটা ছোঁড়া, ক্যানেল আপিসের ক'জন ছোকরা বাবু তাকে দেখবার জন্যে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকত, তখন ক্যানেল হয়েছে দেশে। কেউ দাঁতন করবার অছিলায়, কেউ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আনমনে সিগারেট টানবার অছিলায়, কেউ বা পায়চারি করবার অছিলায় দাঁড়িয়ে থাকত। ও মুখ নামিয়ে খুব অল্প একটু হাসি হাসতে হাসতে চলে যেত। কখনও চোখ তুলে তাকালেই দেখত ওরা ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

মালতী আপন মনে যেন গরুটাকে বকত—পেলে হয়! বজ্জাত গরু, পাঁচনের বাড়ি পিঠের ছাল তুলব। আবার ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থাকে, যেন কত ভদ্রলোক। দোব চোখে খুঁচে! বজ্জাত গরু কোথাকার!

বলত বটে মুখে কিন্তু মনে মনে শুধু কৌতুকই নয়, একটু খুশী খুশী ভাব অনুভব করত। চাঁপা মাসীর কাছে এ-সব সে অনেক শিখেছিল তখন। চাঁপা মাসীর বয়স তার থেকে খুব বেশী নয়—বছর ষোল সতের বেশী। তখন চাঁপা মাসীকে মনে হত ভরতি যুবতী। সে নেচে গেয়ে রঙ্গরসে দিন কাটাতো। আগে আগে বরং গঙ্গাস্নানে পালাতো—কখনও নবদ্বীপ যেতো, ফিরে এসে বাবার কাছে মার খেতো। কিন্তু ক্রমে পালানো ছেড়েছিল, ঘরেই ওই সব করে দিন কাটিয়ে দিত। দুজনের মধ্যে বেশ সখী সখী ভাব ছিল। শ্রীমন্ত বাইরে গেলে—বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময় ঘরে দুজনে শুয়ে নানান রঙ্গরস করত। গোটা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা ভাল করে সে চাঁপা মাসীর কাছে শিখেছিল।

সে নিজেও এসে বলত—ওই গরুটাকে ফিরিয়ে এনে এক একদিন বলত এইসব ছোকরাদের কথা। বলত—আমি কি বললাম জান? বলে সব বলত।

চাঁপা মাসী বলত—অন্তরে বেথা লাগছে, বেথা! মনে মনে?

—ক্যানে বেথা কিসের?

চাঁপা মাসী হেসে বলত—তা হলে ভয় নাই। নিশ্চিন্তি। বেথা, বেথা লাগলেই বিপ—দ। বুঝলা!

—বিপদ কিসের?

—কিসের? অ-মাঃ। বিপদ লয়? বেথা হইলেই বুঝবা সেটা বেথা নয়—প্র্যাম! কৃষ্ণেরে কদম্বতলে দেইখ্যা না শ্রীমতীর কেমন বেথা লাগল! কেমন কিছু ভাল লাগে না, বুকটা বেথা বেথা করে! তখুন বৃন্দে বলছে—"রাধার কি হইল অন্তরে বেথা!" বৃন্দে শুধায়—কি রকম বেথা গো শ্রীমতী? শ্রীমতী রাধা কয়—বৃন্দা যেন কেমন কেমন! কিছুতে মন লাগে না। ঘরে না কামে না—বুকের ভিতরটা কাঁদি কাঁদি করে। কাঁদতি পাইলা বড়

আরাম লাগে সুখ লাগে। বৃন্দে তখন কয়—তবে আর ই আর কিছু নয়—এ প্র্যাম!

মালতী খিলখিল করে হাসত! ভারী মজা লাগত! কিন্তু কারুর সামনে বললে মালতীর ভাল লাগত না। কার সামনে আর, বাবার সামনে মাসী তাকে কিছু বলত না—যা বলত বাবাকেই। তাকে কারুর সামনে বলার মধ্যে বসন্ত আর দে বাড়ির মেয়ে গোপা। গোপা তার সখীও ছিল। আর বসন্তের মিটিং টিটিংয়ে যেতো। সে তাকে বই দিতে আসত। নভেল। নভেল পড়ত তারা, বই লাইব্রেরী থেকে এনে দিত বসন্ত।

মাসী বলত—কি সব বইগুলা পড় মাসী। ছাই লাগে আমার। আঃ লিখন পঠন শিখি নাই—শিখলে কীর্তনের বই গানের বই পড়তাম। অঃ কী যে রস তার মধ্যে!

মালতী বলত—তোমার মুণ্ডু!

—হায় হায় গ। না খাইয়াই কও আমার মুণ্ডু!

গোপা মুচকে মুচকে হাসত। বসন্তের সামনে বললে সে বলত—বেশ বেশ। শোন—আমি পড়ি। তুমিও তো না খাইয়াই কইতেছ খারাপ! শোন! বসন্ত তাকে শরৎবাবুর বই পড়ে শুনিয়েছিল।

বই শুনে চাঁপা মাসী কেঁদেছিল। বলেছিল—তাই তো গ বসন্তমানিকই তো ভাল! বড় ভাল লাগল।

বসন্ত তখন তার বাপকে খোকাঠাকুরের দেওয়া ওই বাড়িতেই থাকে। শরৎ ওস্তাদ এখানে একটা স্থায়ী আড্ডা করেছে। জায়গাটা বাড়ছে। শরৎ ওস্তাদ নিজেই বলে—ভুবনেশ্বরের ভুবনপুর, দেবী গন্ধেশ্বরী, কালিতে অন্নপূর্ণার কাল গেছে—দেখ না ভুবনেশ্বর কাশীর চেয়ে বেড়ে যাবে।

ওই খোকাঠাকুরের বাড়িতে একটা গানের ইস্কুল খুলেছিল। সপ্তাহে তিন দিন ইস্কুল হত। মেয়েদের জন্যে বিকেলে দু'ঘণ্টা—তারপর ছেলেদের জন্যে সন্ধ্যে থেকে দু'ঘণ্টা। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা পড়ত বেশী। সবাই এখন মেয়েদের বিয়ের জন্যে লেখাপড়া শেখাচ্ছে গান শেখাচ্ছে। শুধু লেখাপড়া হলেই বিয়ে হয় না, সব পাত্রপক্ষ এসেই মেয়ে গান জানে কি না জিজ্ঞাসা করে। শ্রীমন্ত মালতীকেও ভরতি করে দিয়েছিল। তার মাইনে লাগত না।

ওই বাড়িতে থাকত বসন্ত। তিন দিন বাবার কাছে খেতো তিনদিন রান্না করে খেতো। তখন ভোট হয়ে গেছে। ভোটে হিন্দু মহাসভার আদি চাটুজ্জে হেরেছে। বসন্তের সঙ্গে চাটুজ্জের ঝগড়াও হয়ে গেছে। বসন্ত গাল দিত—চাটুজ্জে তার মাইনে দেয় নি। হিন্দু মহাসভাতে চাটুজ্জে নালিশ করেছে—বসন্ত হাজার টাকার হিসেব দেয় নি। বসন্ত হিন্দু মহাসভা ছেড়ে কংগ্রেসের মেম্বার হয়েছে। তবে গৌরীনাথ মুখুজ্জে কংগ্রেসের লীডারের সঙ্গে ঝগড়া ছিল তার। সে নিজে দল করেছিল। থানার দারোগা শিবরাম সিংয়ের সঙ্গে ভাব ছিল। এখানকার ঝগড়াতে ফৌজদারিতে যে তার কাছে আসত তাদের সাহায্য করত। তা ছাড়া মিটিং করত। গান্ধী জন্মদিন—স্বাধীনতা দিবস—গণতন্ত্র দিবস করত। শোভাযাত্রা বের করত—তারপর হাটতলায় মিটিং হত।

বক্তৃতা করত বসন্ত। খুব ভাল লাগত মালতীর। শুধু মালতীর কেন সবারই ভাল লাগত।

মালতী আর গোপা মিটিংয়ের প্রথমেই গান গাইত। দুখানা গান খুব ভাল করে নারান ওস্তাদই শিখিয়ে দিয়েছিল। একখানা—হও ধরমেতে বীর হও করমেতে বীর হও উন্নত শির হবে জয় আর জনগণ-মন অধিনায়ক জয় হে!

মাথায় লম্বা লম্বা চুল বসন্তের, খাঁড়ার মত নাক, বড় চোখ—দোষের মধ্যে রঙ কালো আর রোগা; লম্বা ঢিলে পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে যখন জমিদারদের বড়লোকদের ব্যবসাদারদের গাল দিত তখন মনে হত চোখ দিয়ে আগুন ছুটত। বলত একদিন জবাবদিহি করতে হবে তার দিন এসেছে। এই সব মানুষদের ওপর এরা হাজার হাজার বছর ধরে যে অত্যাচার করেছে তার জবাব দিতে হবে। পায়ের তলায় এরা মানুষকে দুই পায়ে দলেছে। গোলাম করে রেখেছে। এদের অন্ন কেড়ে খেয়েছে—দুঃশাসনের মত এদের মেয়েদের ওপর অত্যাচার করেছে। এদের মেয়েরা যখন বেনারসী শাড়ি পরেছে—মুরশিদাবাদি সিল্ক পরেছে—বিলিতী ফিনফিনে শাড়ি পরেছে তখন সাধারণ মানুষেরা ছেঁড়া কাপড় পরেছে। বামুন যারা তারা এদের অস্পৃশ্য করে রেখেছে। মানুষ অস্পৃশ্য? কে বললে? এক ভগবানের গড়া মানুষ—সবারই দুই হাত দুই পা, সবাই মায়ের কোলে জন্মায়, এই ভগবানের পৃথিবী—ভগবানের গড়া সূর্যের আলো—ভগবানের বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচে—তারা জাতে ছোট বড় কিসে? মানুষ মানুষ। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। একজাতি। ভেদ নাই। এই গান্ধীজীর বাণী এই ভারতবর্ষের কবির বাণী—এই নতুন ভারতবর্ষের নতুন বিধান।

এ বক্তৃতা বসন্ত অনেকবার করেছে। কিন্তু প্রথম যেবার শোনে মালতী সেবার তার চোখে জল এসেছিল।

মিটিং থেকে প্রায়ই সে তাদের বাড়িতেই আসত। তার বাবা তার তল্পিদার ছিল। জিনিসপত্র নিয়ে আসত শ্রীমন্ত। বসন্ত তাদের বাড়ি চা খেয়ে যেত। শুধু চা নয়, ওর বাবা ওস্তাদজী না থাকলে বসন্ত ওদের বাড়িতেই খেতো। এই বক্তৃতা যেদিন প্রথম দেয় সেইদিন ওদের বাড়ি এসে বসন্ত বলেছিল—শ্রীমন্ত, রাত্রে তোমার বাড়িতে খাব।

শ্রীমন্ত বলেছিল চাঁপাকে—ঘি আছে তো? না ফুরিয়েছে?

বসন্ত বলেছিল—ঘি কী হবে?

শ্রীমন্ত বলেছিল—ওই লুচি ভাজবে কিসে?

—লুচি কী হবে? লুচি আমি খাই না। বড়লোকে খায়। আমি ভাত খাব। তোমাদের সঙ্গে রান্না হবে।

—তাই হয়!

—হয় কী—হবে। মিটিংএ কী বললাম শুনলে না? জাত আমি মানি না।

শ্রীমন্ত বলেছিল—তা জাত আর কে মানে বল? সবাই এখন সবার হাতেই খায়। তা হলেও ঢাক বাজিয়ে কেউ খায় না।

—আমি ঢাক বাজিয়ে খাব।

রাত্রে খাবার সময় শ্রীমন্ত ছিল না। রাত্রির প্রথম প্রহরে সে একবার পুকুরপাড়ে যেত। নিজে ছিল পাকা মেছুড়ে, সে পুকুরটির পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুনত কোথাও ঝুন ঝুন শব্দ

উঠছে কিনা। মানে কেউ চারা কাঠি বেঁধেছে কি না জোতানে মাছ ধরবার জন্যে। তারপর চারিপাশে জলের কিনারায় কিনারায় পা বুলিয়ে দেখত কেউ সেরেস্তা অর্থাৎ ভাগ ফেলেছে কি না, মোটা সুতো পায়ে ঠেকে কি না। খুব যত্ন করে মাছ লাগিয়েছে শ্রীমন্ত।

বসন্তকে খেতে দিয়ে চাঁপা মাসী বলেছিল—মালতীকে দিয়া মাছ রান্না করাইছি। সবটুকুন খাও। কেমন লাগে কও।

মাছ মুখে দিয়ে বসন্ত বলেছিল—খুব ভাল।

চাঁপা মাসী হেসে বলেছিল—এইবার তো জাতি দিলা কুল দিলা—

—জাতি কুল আমি মানি না। দেব কি?

—ওই একই কথা গো মশয়। এখন মালতীকে বিয়া কইরা লও না ক্যান? তোমার পিছে পিছে ফিরে!

—বিয়ে—মালতীকে? কী রে মালতী?

মালতী যে মালতী সেও কথা বলতে পারে নি।

বসন্ত হেসে উঠেছিল। হেসে বলেছিল—বৈরাগী বউ বেশ আছে। বিয়ে কর বললেই বিয়ে হয়?

—তবে কিসে হয়? পয়সা টাকা?

—উঁহু—ভালবাসা! ভালবাসা হয় তো হবে বিয়ে।

রাত্রে চাঁপা মাসী বলেছিল—মাসী! প্র্যাম কর তবে!

সে বলেছিল—কী যে বল মাসী! ওসব বল না! কিন্তু পরদিন সকালে উঠে গরু খুঁজতে যাবার আগে বাসী কাপড় ছেড়ে কাচা কাপড় পরে গিয়ে উঠেছিল ভুবনেশ্বরতলায়।

সকালবেলা হাটতলা খাঁ-খাঁ করে। চালাগুলো পড়ে থাকে—পাকা দোকান গুঁইদের অনেক কাল থেকে—তাদের একটা মুখ পুবের বারান্দায় হাটের দিকে, অন্যটা দক্ষিণ দিকে সদর রাস্তাটার দিকে, হাটের দিন পুবের বারান্দার দরজা খুলে দোকান বসে, অন্য দিন দক্ষিণ দিকের দোর খুলে দোকান বসে। বিনোদিনীর সত্যর সুরেশের মিষ্টির দোকানগুলোও তাই, দুমুখো দোকান। কিন্তু এত সকালে তাদের দোকানও খোলে নি তখন। তারপর হাট ছাড়িয়ে রাস্তাটা চলে গেছে—তার দু'ধারে অনেক দূর পর্যন্ত বাজার। নানান ধরনের বাজার। মিষ্টি দর্জি মনিহারী, পান সিগারেট, মুদিখানা; দু'চারখানা ধানের আড়ত—একটা হোটেল আছে—ওষুধের দোকান আছে—ভূষণ পালের একবারে শেষে থাকে উরো হাড়িরা—উরো কাঠ মাছ বিক্রি করে—ক'ঘর আছে তারা বাখারি থেকে জাফরি ঝুড়ি কুলো তৈরী করে। তারপর হাসপাতাল। আগে ছোট দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল—তারপর চার বেডের হাসপাতাল হয়েছিল। দিয়েছিল বাবুরা। তখন অর্থাৎ যে দিন ভোরবেলা মালতী গরু খুঁজতে বেরিয়ে গিয়েছিল ভুবনেশ্বরতলায় তখন সত্য বড় কুড়ি বেডের হাসপাতাল হয়েছে। আগে মুসলমানদের কবরখানা ছিল। তার পশ্চিম দিকে বাবা ভুবনেশ্বরের অশথ বট বেলের জঙ্গল। আগের কালে রাত্রে কেউ এদিকে আসত না। বলতো বাবার বেহ্মদত্যি ভূত পেত্নীদের সঙ্গে কবরের মামদো ভূতদের দাঙ্গা লাগে।

সেই ভোরে রাস্তাতেও লোক ছিল না। হাটেও না। হাটে শুধু ধুলো আর পাতা। এখানে ওখানে গোটাকয়েক কুকুর। গোটাকয়েক ছাগল চরে বেড়াচ্ছিল গাছতলায়। গাছতলায় ক'খানা গাড়ি—রাত্রে ধান চাল এসে পৌঁছে আঁট দিয়েছিল। গাড়োয়ানরা চাটাই পেড়ে ঘুমুচ্ছিল।

আর ছিল হাটের স্থায়ী বাসিন্দে, টিক্‌লি, টিক্‌লির মা। চুনারিয়া, চুনারিয়ার বুড়ো খোঁড়া আধকানা বাবা। টিক্‌লি তার থেকে কিছু বড়। চুনারিয়া তার বয়সী। হাটের গাছতলায় বাঁশের কাঠামো করে তালপাতায় ছাইয়ে এখানে আজীবন রয়েছে। টিক্‌লির মা এসেছিল যুবতী বয়সে। লোকে বলে ভালো ঘরের মেয়ে—ওকে এনেছিল গঙ্গারাম বাজিকর। সাপের ওস্তাদ, কামিখ্যে কামরূপের বিদ্যে জানা লোক, সেই ওকে নিয়ে হাটে এমনি ঝুবড়ি বেঁধেছিল। তারপর গঙ্গারাম পালাল এখানকার ওই উরোদের বাড়ির একটা মেয়েকে নিয়ে। টিক্‌লির মা থেকে গেল। ভিখ মাগতো খেতো। তারপর টিক্‌লি হল। টিক্‌লি এখন সাজেগোজে। ধরণী শেঠার দোকানে কেনা ডুরে কাপড় পরে। ও-ও ব্লাউস পরে। সন্ধ্যে হলেই চুল বেঁধে সেজেগুজে বেরিয়ে গ্রামের ভিতরের বাজার দিয়ে গন্ধেশ্বরীতলা পর্যন্ত ঘুরে আসে। চুনারিয়াও যায়। তার সাজগোজ কম। তারপর ওদের দেখা যায় বাবা ভুবনেশ্বরতলার পশ্চিম উত্তরে বট অশথ বেল গাছের জঙ্গলে। গাছের আড়ালে হারিয়ে যায়। অন্ধকার রাত্রে তো যায়ই, জ্যোৎস্না রাত্রে মধ্যে মধ্যে গাছের ফাঁকে যে জ্যোৎস্না পড়ে তারই মধ্যে হয়তো এখনি দেখা যায় আবার পরক্ষণেই হারায়। শব্দ শোনা যায়। শিস ওঠে। এ শিস দেয় ও শিস দেয়। ফিস্‌ফিস কথা হয়। কখনও চীৎকারও ওঠে। চীৎকার করে ছুটে পালায়। কোন কোন দিন সকাল পর্যন্ত গাছতলায় পড়ে থাকে। রোদ চোখে লাগলে ঘুম ভেঙে উঠে আসে নিজের ঝুবড়িতে। এসেই আবার শুয়ে পড়ে।

টিক্‌লির মা গাল দেয়।—মরবি, মরবি! কোনদিন সাপে কেটে নয় কোনদিন কোন হারামজাদার হাতে মরবি। গলা টিপে মেরে দিয়ে যাবে। নয়তো গলাটা দুফাঁক করে দেবে।

টিক্‌লি বিড়বিড় করে।

চুনারিয়াকে ওর বাপ পেটে।—খানকী কসবী কাঁহাকা। হারামজাদী।

চুনারিয়া মার খায় আর বলে—আজ আমি চলে যাবো। তু থাক বুড়ো—ভিখ মেঙে সৎপথী হয়ে থাক। ভগোয়ান ধরম তোর সেবা করুক। তোর গাঁজার পয়সা চাই। সন্ধ্যে-বেলা দারু ভি চাই। কাঁহাসে মিলবে দেখ্‌ব আমি।

চুনারিয়ার বাবা বলে—কইকো সাদী কর, খাটনী কর—কামাই কর। তা না। হে ভগোয়ান! রাত্রে রাত্রে ফিরে এলে বুড়ো, হয় বুঝতে পারে না, নয়তো জানতে পেরেও কিছু বলে না। ভোর হলে ফিরে এলে জমাদার বুলাকীর বুড়ী পরিবার ওকে সারাদিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথা বলে। বলে—আর বাবা একঠো বেটী নেহি। থাকলে কেমন হত। হায় হায়। মিঠাই খাইতাম। দারু পিতাম। আঃ—হায়রে!

জমাদার বুলাকীর তিন বেটা তিন ঘর, ওরা বুড়ীকে খেতে দেয় না—বুড়ীও হাটে ঝুবড়ি

বেঁধেছে। ছেলেদের বাড়ী ওই উরো হাড়িদের বাড়ির কাছে হাসপাতালের ধারে। ওদের হাটের পালা আছে। যার যেদিন পালা সে এসে হাট সকালবেলাতেই ঝাঁট দেয়। হাটে ওরা তোলা পায়। আর হাটে জড় হয় যে গোবর, খড় পাতা তা ফেলে একটা সারের গর্ততে। সার বিক্রি হয় অনেক টাকায়। টাকায় একগাড়ি দর। দুশো আড়াইশো গাড়ি সার হয় বছরে। সেটা পায় দে বাবুরা। তার একটা অংশও ওরা পায়। হাট ঝাঁট দিতে ওরা খুব ভোরেই আসে। হাটের ধুলোয় পয়সা আনি দু'আনি সিকি আধুলি টাকাও পড়ে থাকে। তবে খুচরোই বেশী। রাত্রে হাট ভাঙে। ভোরবেলা যার পালি তাদের দুজন তিনজন আসে। ঝাঁট দিয়ে যা প্রথমেই মেলে তা মেলে, তারপর জড়করা ধুলো ঘেঁটে দেখে। হাটময় ধুলোর উপর ধান-মেলার মত পা বুলিয়েও দেখে।

সেদিন ভগীরথ জমাদারের পালি ছিল। ভগীরথ বসে বিড়ি টানছিল। ওর বউ আর বেটী ঝাঁট দিচ্ছিল—ছোট দুটো ছেলে ছুটে বেড়াচ্ছিল আর মধ্যে মধ্যে কখন পা বুলিয়ে কখনও হাতে ঘেঁটে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠছিল—আ মিলছে রে বাপ্! চৌ আনি রে!

কখনও কখনও সোনার নাকচাবি কানের দুলও মেলে। খসে পড়ে যায়, ধাকাধাক্কিতে যায়। কারুর বা ছেনতাইয়ের সময় ছেনতাইকারীর হাত থেকে ফসকে পড়ে যায়। ভগীরথের সামনে চার পাটি ছেঁড়া জুতো রয়েছে। একেবারে ছেঁড়া। পরে এসেছিলে, পায়ে পায়ে চাপাচাপিতে ছিঁড়ে গেছে—ফেলে দিয়ে গেছে। ভগীরথ বেচে দেবে জুতো-সিলাইওয়ালাদের।

ভুবনেশ্বরতলায় দীঘির ঘাটে থাকে ক'জন কানা খোঁড়া ভিখিরী। ওরা সব একা একা। ওদের ঝুবড়িও নাই। পড়ে থাকে ঘাটের ধারে। বর্ষার সময় গাছতলায় যায়। শীতের সময়েও যায়।

ভগীরথ জিজ্ঞাসা করেছিল মালতীকে—মাল্‌তীবিটিয়া, এত সোকালে কাঁহা যাবি গো মা? আঁ?

মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে পারে নি মালতী। বলেছিল—বাবার থানে যাব—পেনাম করব।

ভগীরথের ওই বাচ্চা দুটো মালতীকে দেখে যেখানে ছড়া গেয়ে উঠেছিল যেটা ওরা বাঙালী মেয়ে দেখলেই গায়।—বাংগালী বেটিয়া জুত্তি শাড়ি পিহিন করকে মেম বনাইলা!

ভগীরথ ধমক দিয়েছিল—এই! বদমাস কাঁহাকা!

মালতী হেসে হাট পার হয়ে দীঘির ঘাট পাশে রেখে পথ ধরেছিল। ঘাটের পুবদিকে বাবার থান। বাবার থানে প্রণাম করে পথ ধরেছিল উত্তরমুখে আমগাছের তলা দিয়ে। আমগাছতলায় ইঁট বিছিয়ে সারি সারি চৌকির মত বসবার জায়গা আর রাশি রাশি কাটা চুল। এখানে নাপিতরা বসে। চুল কাটে। মানতেও চুল দেয় আবার হাটের লোক এমনিও কাটে। সে পার হয়ে দীঘির উত্তরপাড়ে অশথ বট বন। তার ভিতরে ভিতরে গিয়ে একটি কাঁটার জঙ্গলওয়ালা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছিল। এখানকার বটগাছটা প্রকাণ্ড। আর অসংখ্য ঝুরি। এত দূরে ঝুরিতে ঢেলা খুব কম লোকেই বাঁধতে আসে। ওখানেই ঢেলা বাঁধবে ঠিক করেছিল। কিন্তু বাঁধতে গিয়েও বাঁধে নি। চোখে পড়েছিল ওই কাঁটা জঙ্গল

থেকে একটা কুঁচের লতা উঠেছে পাশের গাছটায়। কুঁচগাছেও অনেক কাঁটা। তা হোক। ওই কুঁচলতার সঙ্গেই একটুকরো দড়ির পাড় বের করে সে একটি ঢেলা বেঁধেছিল।

বেঁধে—মনে মনে বলেছিল বসন্তের সঙ্গেই যেন তার বিয়ে হয়। হোক সে বামুন। ওকেই যেন সে পায়।

আসবার সময় আবার বাবাকে প্রণাম করে গ্রাম পার হয়ে বাইরের মাঠে মাঠে ঘুরে সেই শিমুলতলায় গিয়ে উঠেছিল কিন্তু গরুটা পায় নি। গরুটা ছিল না। সেখান থেকে আরও ক'জায়গা ঘুরেও পায় নি। মনে মনে ভারী রাগ হয়েছিল। ভয় হয়েছিল। বাবার সকালে গাঁজা খাবার সময় বাড়িতে থাকবেই। কি বলবে সে?

ভুবনেশ্বরকে ডেকেছিল—বাবা, ওকে যেন কেউ খোঁয়াড়ে দিয়ে থাকে। পোড়ারমুখী যেন বাড়ি গিয়ে না থাকে।

বাবা ভুবনেশ্বর কথা শুনেছিলেন—গাইটা খোঁয়াড়ে গিয়েছিল। শিমুলতলায় বসে থেকে পোড়ারমুখী তাকে মালতী নিতে এল না দেখে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বাড়ি ফিরছিল—তখন গাইটা দুধ দিচ্ছিল না—নতুন বিয়ানের সময় আসছিল, বাছুরের টান ছিল না, পথে ঢুকেছিল গন্ধবণিকদের খামারে—তারা ধ'রে সঙ্গে সঙ্গে খোঁয়াড়ে পাঠিয়েছিল।

(৬)

তাতেই বাবা ভুবনেশ্বরের উপর ঢেলা বাঁধার উপর বিশ্বাস হয়েছিল তার অনেক। সে বিশ্বাস তার আরও দৃঢ় হয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই। সেদিন মহাউল্লাসে বসন্ত তাদের বাড়ি এসে ঢুকেছিল—শ্রীমন্ত ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

শ্রীমন্ত বাড়ি ছিল না। হাটে গিয়েছিল। হাটবার সেটা তাও মনে হয় নি বসন্তের। চাঁপা মাসী বলেছিল—কি ইনকিলাব হইল গো? সে তো হাটে গেছে!

—মালতী কই?

—সে ঘরে ঘুমায় বুঝি।

—তুলে দাও। তুলে দাও। মালতী! মালতী!

ঘরে সত্যিই শুয়েছিল মালতী। ডাক শুনে উঠে এসেছিল। বসন্ত বলেছিল—ইনকিলাব জিন্দাবাদ। কংগ্রেসের জয়। জমিদারি উচ্ছেদ বিল পাস! কালই প্রসেসন বার করতে হবে।

মালতী জেলখানায় গিয়ে অনেক শিখেছে। কিন্তু সেদিন তার মনে হয়েছিল এ জমিদারি উচ্ছেদ হয়েছে বসন্তের বক্তৃতাতে। সে তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। চাঁপা মাসী যে চাঁপা মাসী সেও সেদিন রঙ্গরস না করে বসন্তের তারিফই করেছিল, শুধু বলেছিল—হ্যাঁ মানিক তুমি একটা বাঘের মতুন মানুষ বট! করলা শেষ!

পরদিন মিছিল হয়েছিল। মিছিল নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল কংগ্রেস পাণ্ডা গৌরীনাথের সঙ্গে বসন্তের। দে বাবুরা ভুবনপুরের জমিদার। ছত্রিশ কোটি যদুবংশের মত অনেক ভাগ হলেও দে বাবুরা খুব প্রতাপ দেখাবার চেষ্টা করত। বিশেষ করে ছোট ভাগীরা। মুখ্যু, গাঁজাল

মাতাল শরিকরা খুব চেঁচাতো। তাদের খুব গ্রাহ্য না করলেও মোটা শরিক এবং যারা ব্যবসা করে অবস্থাপন্ন তাদের গ্রাহ্য করতে হত। তারা নানা ছুতোয় মামলা মকদ্দমা করে লোককে জব্দ রেখেছিল। সব জায়গাতেই তারা প্রধান ছিল। ইউনিয়ন বোর্ড থেকে সব ভোটে তারা দাঁড়াত। বসন্তের সঙ্গে এ নিয়ে ঝগড়া অনেক হয়েছে। বক্তৃতা যতই করুক বসন্ত, ভোটে তারা বসন্তকে হারিয়ে দিত। দু'এক বছর আগে ইউনিয়ন বোর্ডে বসন্তকে এমন হারিয়েছিল যে মালতীরও খুব লজ্জা হয়েছিল। শুধু চৌদ্দটা ভোট পেয়েছিল বসন্ত আর দে বাড়ীর শিবচন্দ্র দে পেয়েছিল আশি ভোট। বসন্ত প্রসেসনটা নিয়ে দে বাড়ির সামনে খুব ধ্বনি দিয়েছিল। ইনকিলাব জিন্দাবাদ থেকে জমিদার ধ্বংস হোক। ধ্বংস হোক। ইংরেজের কুত্তা বরবাদ। ভারতমাতা কী জয়! আরও অনেক।

সেদিন দে বাবুদের বাড়ীর দরজা বন্ধ ছিল—কেউ বের হয় নি তারা। আবার প্রসেসনেও খুব লোক হয় নি। বসন্ত প্রসেসন করবে শুনে গৌরীনাথ কংগ্রেস লীডার বারণ করে পাঠিয়েছিল—প্রসেসন না করাই উচিত। করো না।

বসন্ত শোনে নি। কিন্তু লোকও বেশী হয় নি। দে বাবুদের ভয়েই হোক আর গৌরীনাথ বারণ করাতেই হোক, কুড়ি পঁচিশজনের বেশী লোক ছিল না। প্রসেসনের আগে মালতী আর গোপা দুজনে ফ্ল্যাগ নিয়ে চলে—তার মধ্যে গোপা আসে নি।

দে পাড়ায় যখন শ্লোগান দিচ্ছিল তখন গৌরীনাথ এসে বলেছিল—এসব কী হচ্ছে! এদের বাড়ির দোরে এসব কী? ছি—ছি—ছি!

বসন্ত এক কথায় বলেছিল—আপনার হুকুম আমি মানতে বাধ্য নই।

মালতীর বাবাও ছিল প্রসেসনে। বসন্তের পিছনেই ছিল। সে বলেছিল—খুব দরদ যে তোমার হে বাপু! আমাদের কংগ্রেস বড়লোকের কংগ্রেস নয়। তোমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। দোব এখান থেকে ঘাড় ধরে ভাগিয়ে!

বসন্তই থামিয়েছিল। কিন্তু প্রসেসন সে ভাঙে নাই। তবে বেশী দূর বা বেশীক্ষণও চলে নাই। তাড়াতাড়ি হাটতলায় এসে মিটিং না-করেই শেষ করেছিল।

সেদিন হাটে তখন একদল বাজিকর এসে বাজি দেখাচ্ছিল। একজন বেটাছেলে কপালের উপর একটা বাঁশ খাড়া করে রেখেছিল—বাঁশের মাথায় একটা ন-দশ বছরের রোগা মেয়ে খেলা দেখাচ্ছিল।

প্রসেসনের সবাই ওই খেলার চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে খেলা দেখেছিল। সে ছিল বসন্তের পাশে দাঁড়িয়ে। বাঁশের ডগা থেকে মেয়েটাকে উঁচুতে ছুঁড়ে তুলে দিয়েছিল লোকটা। মেয়েটা উপরে উঠে ডিগবাজি খেয়ে নীচে পড়ছিল, লোকেরা চমকে উঠেছিল—পড়বে—মেয়েটা পড়বে মাটিতে আছাড় খেয়ে, মরবে এই আশঙ্কায়। সে বসন্তের গা ঘেঁষে এসে তার হাত চেপে ধরেছিল। বসন্তও তার হাত চেপে ধরেছিল এবং হেসে বলেছিল—দেখ না। বসন্তের কথা সত্যি। লোকটা দুই হাত মেলে মেয়েটাকে লুফে নিয়ে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সেদিন খেলার শেষেও সে তার হাত ধরেই বাড়ি ফিরেছিল। সদর রাস্তা দিয়ে ফেরে নি। ফিরেছিল গ্রামের বাইরে বাইরে মাঠের পথ ধরে। বসন্তই

বলেছিল—চল্ একটু ঘুরে যাই। সেও বলেছিল—চল।

চুপচাপ চলছিল মাঠের পথে হাত ধরাধরি করে। গরুর গাড়ির মেঠো পথ। আকাশে চাঁদ ছিল জ্যোৎস্না ছিল। ভারী ভাল লাগছিল। বসন্ত যে বসন্ত সেও ওইসব কথা না বলে মাঠের দিকে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে বলেছিল—বাঃ সুন্দর জ্যোৎস্না হয়েছে তো!

সেও তাকিয়েছিল আকাশের দিকে। চাঁদ ছিল মাঝ আকাশে আর একেবারে একদিকে ছিল ধকধকে নীল একটি তারা। তার মনে পড়ে গিয়েছিল খোকাঠাকুরের মুখে শোনা সেই গানটি—নীল উজল তারাটি—।

হঠাৎ বসন্ত বলেছিল—হ্যাঁরে মালতী!

—এঁ্যা!

—বৈরেগী বউ তোর চাঁপা মাসী একদিন বলছিল তোকে বিয়ে করতে।

মালতীর বুক ঢিপঢিপ করে উঠেছিল। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

বসন্ত বলেছিল—তুই আমাকে ভালবাসিস?

মালতীর হাত ঘেমে উঠেছিল, বলতে কিছু পারে নি। অথচ গ্রামের অন্য কেউ হলে মালতী বলত—না মুখে কিছু বলত না—একটি চড় কষিয়ে দিত আগে তারপর বলত—এই নে জবাব। আজ কিন্তু হ্যাঁও মুখে ফুটল না।

বসন্ত বলেছিল—বাসিস? বল না?

সে এবার মৃদুস্বরে বলেছিল—সেদিন ভুবনেশ্বরতলায়—

—কী?

—না। সে বলতে আমি পারব না।

—বলতে পারবি না? কেন?

—না।

—কী? দৈববাণী হয়েছে? না স্বপ্নটপ্ন হয়েছে?

—তুমি বড় ইয়ে বসন্তদা। কিচ্ছু মান না তুমি।

—কিচ্ছু না, রাজা জমিদার ভগবান কিচ্ছু না। কিন্তু বল কি হয়েছে ভুবনেশ্বরতলায়?

চুপ করে রইল মালতী। কিন্তু তার হাত ঘামছে। বলতে চাচ্ছে অথচ বলতে পারছে না। বসন্ত বললে—বেশ বলিস নে। কিন্তু ভালবাসিস কিনা বল? সেদিন থেকে আমার মন মধ্যে মধ্যে তোর কথা নিয়ে খুব চঞ্চল হয়। মনে হয়—

—কী?

—ভারী ভাল লাগে তোকে!

এবার কোনক্রমে মালতী বলেছিল—বসন্তদা!

—বল? আমাকে ভাল লাগে তোর? ভালবাসিস?

মালতী প্রাণপণে বলতে চেয়েও বলতে পারে নি—বাসি। সেদিন ভুবনেশ্বরতলায় ঢেলা বেঁধে এসেছি। গলা শুকিয়ে আটকে গিয়েছিল। কোনক্রমে বললে—সে তোমাকে কাগজে লিখে দেব।

বসন্ত থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে দুই হাতে তার কাঁধ দুটো ধরে বলেছিল—তাহলে তুই ভালবাসিস! এবং সঙ্গে সঙ্গে সবলে তাকে বুকে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল।

থরথর করে কেঁপে উঠে মালতী বলেছিল—বসন্তদা! বসন্তদা!

কোন বাধা মানে নি বসন্ত। সে তার মাথার চুলের উপর কপালে চুমু খেয়েছিল।

—না—না—না। বলেছিল মালতী—কিন্তু সে 'না' দুর্বল 'না'—সে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ দুর্বল। চাঁদের আলোয় সেই খোলা মাঠের মধ্যে বসন্তের বুকে মুখ রেখে সে সেদিন আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিল।

হঠাৎ একটা সাইকেলের ঘণ্টা বেজেছিল পিছনে। চমকে ছেড়ে দিয়েছিল বসন্ত। সে হাঁপাচ্ছিল। তবু সভয়ে ফিরে দেখেছিল একটা সাইকেল আসছে কিন্তু খুব কাছে নয় একটু দূরে। সামনে একটা কী পড়েছে। সাদা মত দেখাচ্ছিল। একটা গরু। লোকটাকে নামতে হয়েছিল। গরুটা পথ ছাড়ে নি। তার উপর মেঠো পথ। গরুটাকে পাশ কাটিয়ে লোকটা সাইকেলে চড়েছিল। বসন্ত বলেছিল—দাঁড়িয়ে থাকিস নে, চল।

চলতে চলতে মৃদুস্বরে সে সভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—দেখেছে, নয়?

—না বোধ হয়। তারপরই সে বেশ জোর গলায় বলতে শুরু করেছিল—জমিদারি একটা পাপ। একটা জঘন্য প্রথা। উঠে গেল—এই হল স্বাধীনতার আসল কাজ! আজ আর মানুষকে কতকগুলো পচা লোককে রাজা বলে প্রণাম করতে হবে না। বাবু মশায় বলতে হবে না। এরপর বড় বড় জোতদারগুলো যাবে।

বাইসিকেলওয়ালা পার হয়ে গিয়েছিল ওদের।

মালতী জিজ্ঞেস করেছিল—কে?

—সরকারী লোক। এখন তো হরদম আসছে!

—আমাদের দেখেনি—না?

—না। আর দেখলেই বা। আমি তো জাত ধর্ম এসব মানি না। বামুন বোষ্টুম কি হিন্দু মুসলমান এসবও মানি না। তোকে আমি বিয়ে করব। বিয়েও মানি না। তবু নিয়ম আছে বলে বিয়ে করব। তাও রেজেস্ট্রি করে।

—রেজেস্ট্রি করে?

—হ্যাঁ। নইলে তো বিয়ে সিদ্ধ হবে না।

রেজেস্ট্রি বিয়ে মালতী শুনেছে। ভাল করে না জানলেও জানে। তবু মন কেমন খুঁতখুঁত করছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা কিছু করতে পারে নি।

এরপর ওরা গ্রামের মুখে এসে পড়েছিল।

বসন্ত বলেছিল—বাবার জন্যে পারছি না—জানিস! বাবা তো গোঁড়া বামুন। নাহলে—

তারপর হঠাৎ বলেছিল—আমার সঙ্গে চলে যেতে পারবি?

বুক তার ধড়ফড় করে উঠেছিল—চলে যেতে?

—হ্যাঁ। লুকিয়ে রাত্রে উঠে—

—কোথায় যাবে?

—কলকাতা। কিংবা অন্য কোথাও!

সে চুপ করেছিল। কথাটার উত্তর দিতে পারে নি। মনের ভিতর থেকে মধ্যে মধ্যে মন বলে উঠেছিল—যাব। হ্যাঁ-যাব। কিন্তু মুখে বলতে পারে নি। যতবার বলতে চেয়েছিল ততবার আটকে গিয়েছিল।

বাড়িতে এসে দেখেছিল সে এক বিশ্রী কাণ্ড। বাবা রুদ্রমূর্তিতে আস্ফালন করছে। যা মুখে আসছে তাই বলে গালাগালি করছে।

চাঁপা মাসী বলেছিল—দে বাবুদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে বাবার। হাটতলা থেকে বাবা আগেই চলে এসেছিল আবগারির দোকানে যাবার জন্যে। গাঁজা ছিল না। সূর্যাস্তের পর আবগারির দোকান বন্ধ হয়। আবগারির দোকানে দে বাবুদের একজন গোমস্তা, সে আপিং খায়, আপিং কিনতে এসেছিল। সেখানে এই শোভাযাত্রা আর ওদের আস্ফালনের জন্যে গোমস্তা বলেছিল ভেণ্ডারকে। বলেছিল—জান হে সাহা যদি এমন আইন হয় ভগবানের রাজ্যে যে ব্যাঙগুলো সব হাতির সমান হবে। তা হলে কী হয় বল তো?

হেসে ভেণ্ডার বলেছিল—আপনিই বলুন।

—ব্যাঙগুলো গ্যাঙর গ্যাঙর করে চেঁচায় আর পেট ফোলায়। ফোলাতে ফোলাতে ফটাস্। বুঝেছ!

শ্রীমন্ত রাগ সামলাতে পারে নি—বলেছিল—চোপ্ রে বেটা চোপ্—ছুঁচোর গোলাম চামচিকে—চোপ্। হাতি নয় বেটা—ছুঁচো ছুঁচো।

এই থেকে শেষ পর্যন্ত অনেকটা এগিয়েছে। শ্রীমন্ত গোমস্তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। গোমস্তা নাকি গেছে দে বাবুদের কাছে। বাবুদের চাপরাশী এসেছিল। শ্রীমন্ত তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছে—বলেছে—ভাগ্ ভাগ্—আমি কারুর প্রজা নই গোলাম নই—আমি কারুর ডাকে যাই না।

বসন্ত শ্রীমন্তের হাত ধরে বলেছিল—এস আমার সঙ্গে। দেখি।

বসন্তের সে ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে মালতীর মনটা গৌরবে ভরে উঠেছিল। সেও তাদের সঙ্গে গিয়েছিল। তারপর যা হয়েছিল সে মালতী কল্পনা করে নি।

দে বাবুর সঙ্গে সমান জোরে তর্ক করেছিল বসন্ত।

দে বাবু বসন্তের মুখের সঙ্গে পেরে ওঠে নি। চোখ দিয়ে তার আগুন বের হচ্ছিল। সে বলছিল—অত্যাচারীর জাত আপনারা—ব্রিটিশদের গোলাম—মানুষের রক্ত শুষে বড়লোকই করেছেন তার কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে আজ। আজ আপনার রক্তচক্ষুকে কেউ ভয় করে না। আরও আসছে দিন। আরও আসছে। এই বাড়ি ঘর ইঁট কাঠ সব যাবে—

দে বাবু চাপরাশীকে বলেছিলেন—দে—বের করে দে ঘর থেকে দে।

চাপরাশী বসন্তকে ঠেলা দিয়েছিল। তারপর হাতাহাতি হয়েছিল—এরই মধ্যে বসন্ত একটা পড়ে থাকা রুল কুড়িয়ে নিয়ে মেরেছিল চাপরাশীর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়েছিল।

মালতীর ইচ্ছে হয়েছিল চীৎকার করে উঠতে—এ কি করলে বসন্তদা? কিন্তু গলা দিয়ে

আওয়াজ বের হয় নি। বসন্ত এসে তার হাত ধরে টেনে বলেছিল—চল!—শ্রীমন্তকে ডেকেছিল—শ্রীমন্ত।

চলে তারা এসেছিল সেদিন। এবং ফিরে এসেই বসন্ত বলেছিল—আমি চললাম শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত বলেছিল—কোথায়?

—এখন সাঁইতে যাচ্ছি। তারপর দরকার হলে কোথাও গিয়ে থাকব। তুমিও বরং ক'দিন সরে থাক গ্রাম থেকে।

শ্রীমন্তও চলে গিয়েছিল। বলে গিয়েছিল—তোদের ভয় নেই। তবে তোরা ওদের ডাকে যাস নে। আমি কাছেই থাকব। তেমন হলে ঠিক ফিরব।

ওদের উপর কোন কিছু জুলুম হয় নি। তবে মামলা হয়েছিল। পুলিস বাবুদের মুখ তাকিয়ে ঘর চড়াও হয়ে দাঙ্গা ডাকাতি এই রকম মামলা করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আদালতে তা টেঁকে নি। তবে বেকসুর খালাসও পায় নি শ্রীমন্ত বসন্ত। ওদের তিন মাস আর ছ' মাস জেল হয়ে গিয়েছিল! শ্রীমন্তের তিন মাস বসন্তের ছ' মাস। মালতীকেও আদালতে টেনেছিল। কিন্তু সে বেকসুর খালাস পেয়েছিল।

পুলিস বসন্তকে কম্যুনিস্ট বলেছিল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন উকিলকে—জমিদার ধনীদের সঙ্গে ঝগড়া করলেই সে কম্যুনিস্ট হয় নাকি? তা হলে তো কংগ্রেস জমিদারি উচ্ছেদ সমর্থন করে—তারাও কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছে। এ ছোকরা তো সেদিন কংগ্রেস ফ্ল্যাগ নিয়েই শোভাযাত্রা করেছিল। তাতে অবশ্য রক্ষাও পায় নি বসন্ত।

জেলে যাবার সময় বলেছিল—কংগ্রেস ছাড়লাম আজ। মালতী—খবরদার আর ওদের ডাকে যাবে না।

তা যায়নি মালতী। গৌরীবাবু দু' একবার ডাকতে পাঠিয়েছিল—সে বলেছিল—না।

শ্রীমন্তের দোকান মালতীই চালাতে লেগেছিল। বাপের দোকানে বাপের পাশে বসে বেচাকেনা সে দেখছিল—বাড়িতে শ্রীমন্ত না থাকলে খদ্দের এলে সে-ই জিনিস বেচত। বাপের জেল হলে সে-ই হাটে দোকান নিয়ে এসে বসত ধরণী জেঠার দোকানের আধখানাতে।

ধরণী জেঠাও বলত—বেশ করেছ মা ওসবে যাও নি। ওসব ওই গৌরীবাবুদেরই ভাল। ইউনাইন বোডের পেসিডেন—ভোট মিটিং ওরা করে ওদেরই ভাল। শ্রীমন্তকে কতবার বলেছি—তুই ওসব করিস না। আর ওস্তাদের ছেলের কথা বাদ দাও। মহীরাবণের বেটা অহিরাবণ মাটিতে পড়ে পড়ে যুদ্ধ করে—এ মা তার চেয়েও সরেস। ওস্তাদের বেটা লাটসাহেব। এই রকম ভুঁইফোড় সেকালে ছিল না মা। এই একালে হয়েছে। দু' পাতা ইংরেজী আর ওই বন্দেমাতরম্—বুয়েচ—এতেই ওদের ডিম ফুটে সাপের ডেঁকা হয়ে জন্ম। ইসব মা বলতে গেলে গান্ধীই করে গেল!

মালতী মনে মনে হাসত। হাসির কারণ অনেক। ইউনাইন বোড, পেসিডেন—তারপর এই ভয়—এতে ওর হাসি পেত। আবার বলত—তোমাদের সময়টা এখন খারাপ মা!

চাঁপা মাসীও বলত—মাসী সময়টা খারাপ পইড়েছে। সাবধানে চলবা।

তবে চাঁপা ধরণী জেঠার মত নয়। বসন্ত সম্পর্কে বলত ইবার পোলাটা লীডার হইয়া গেল। জ্যাল খাটল। ইবার উ ঠিক ভোট করবে। দেখিয়ো তুমি। তবে হাঁ। সাহস আছে—বুকের পাটা আছে! তা আছে! ইবার আর নাগাল পাবা না। দেইখো!

মনে মনে সে বলত—দেখো তুমি!

হঠাৎ এরই মধ্যে ঘটে গেল আর একটা কাণ্ড। খোকাঠাকুরের কাছে কেনা পুকুরটা গন্ধেশ্বরীতলার তামাকওয়ালা বাসুদেব দোবে একদিন দখল করে বসল জোর করে।

চাঁপা মালতীকে নিয়ে গিয়েছিল ছুটে।

মালতী চীৎকার করে বলেছিল—এ কি দোবে মশায় আমাদের পুকুরে জোর করে মাছ ধরাও ক্যানে? এ কি মগের মুলুক না জোর যার মুলুক তার এর দেশ!

বাসুদেব বলেছিল—এ পোখোর আমি কিনলাম দে বাবুর কাছে!

—পুকুর দে বাবুর নয়। পুকুর আমাদের। খোকাঠাকুরের কাছে কিনেছি আমরা!

—পুকুর খোকাঠাকুরের বাপকে দে বাবু ভোগ করতে খেতে দিয়েছিল—বিক্রি করে নাই। দান ভি করে নাই। মুখে বলিয়েছিল—তোমার পোখোর নাই—ওটাতে মাছ ফেলাও, খাও। তবে দান কি বিক্‌রী ই করতে কোন ক্ষমতা উকে দেয় নাই। কুনো দলিল থাকে তো দেখাও। কোর্টে যাও।

ধরণী জেঠার কাছে গিয়েছিল মালতী। ধরণী জেঠা বলেছিল—তাইতো মা এ তো খুব ঘোর প্যাঁচের কাণ্ড। দলিল তো কিছু করে দেয় নি দে বাবু। সে আমলের লোক—তাদের মুখের কথার দাম ছিল। তা বলতে তো পারছি না। চল বরং ওই ভূতি সরকারের কাছে চল। ও আইনকানুন বোঝে। এ চাকলার জমি জেরাত স্বত্ব এসব ওর সব জানা। ও বলতে পারবে।

ভূতি সরকার বলেছিল—প্যাঁচের ব্যাপার বটে। জটিল ব্যাপার। গত সেটেলমেণ্টে পরচায় পুকুর দে বাবুদের নামে। নাখরাজ। তারপর বাবু মুখে দান করলে। কোন দলিল করে দেয় নাই। নাখরাজের সেস দিতে হয়। তাও ঠাকুররা কখনও দেয় নাই। ওই দে বাবুরাই দিয়ে এসেছে। আর পাঁচটা নাখরাজের সঙ্গে যেমন দিত তেমনি দিয়েছে। প্রমাণ ছিল দখল; তা বাসুদেব বেদখল করে দিলে। শ্রীমন্ত জেলে। এখন দখল করে নিলে, বেদখল করা সহজ নয়। মুশকিল বটে বাপু। আসল ব্যাপার—শ্রীমন্ত বাবুদের সঙ্গে ঝগড়া করে এল। ওই বসন্ত ছোকরার সঙ্গে নাচল। বাবুদের রাগ হয়ে গেল। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল ফাঁক। দলিল নাই, সেস বাবুরা দেয়, পরছা বাবুদের নামে; শ্রীমন্ত জেলে—ওরা বাসুদেবকে ডেকে দিয়ে দিলে দুশো টাকাতে। বাসুদেব দোবের ব্যবসা ওই, ফৌজদারি মামলা কেনে। মুশকিল বটে বাপু। তা থানায় একটা ডায়েরী করে রাখ। ফৌজদারি করে তো আটকাতে তোমরা পারবে না। মেয়ে-ছেলে হাজার হলেও।

কথাটা শুনে মালতী বলেছিল—আমি যাব।

তার মনে পড়েছিল বসন্তের দৃষ্টান্ত। সে একদিন এখানকার ইস্কুলে ছেলেদের ইস্কুলে যেতে

বারণ করেছিল। শোভাযাত্রা বের করবে। তার জন্যে সে কতকগুলো ছেলের ইস্কুল ঢোকা বন্ধ করতে রাস্তার উপর শুয়ে পড়েছিল। সে তাই করবে। শুয়ে পড়বে পুকুরঘাটে, যখন জাল তুলবে তখন পথ বন্ধ করে শুয়ে পড়বে।

তাই সে করেছিল। কিন্তু ফল কিছু হয় নি। বাসুদেব তাকে লোকজন সাক্ষী রেখে পাঁজাকোলা করে তুলে উপরে এনে শুইয়ে দিয়েছিল। মালতী রাগে কেঁদে ফেলে বাসুদেবকে গালাগাল করে নিষ্ফল হয়ে ফিরে এসেছিল।

তিন মাস পর ফিরল শ্রীমন্ত। এ শ্রীমন্ত আরও উগ্র শ্রীমন্ত। সে ফৌজদারি করবার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু বাসুদেব থানায় খবর দিয়ে আদালত থেকে শ্রীমন্তের উপর নোটিশ করালে। যেন সে পুকুর দখল করতে হাঙ্গামা করতে না যায়।

শ্রীমন্তও গেল থানায়। সেও পালটা মামলা করে নোটিশ করালে বাসুদেবের উপর। এরই মধ্যে ঘটে গেল চরম দুর্ঘটনা।

ওঃ। শরীরটা শিউরে ওঠে সে কথা মনে পড়লে। অন্ধকার রাত্রি ছিল—

হাটের আলোর ওধারেও তেমনি অন্ধকার থমথম করছে। হাটটা ভাঙছিল তখন। ধরণী দাস জিনিসপত্র বাঁধছে। বাঁধছে ধরণীর মুটেটা। ধরণী জেঠা তহবিল মিল করছে। আলু পেঁয়াজওয়ালারা বিক্রি না হওয়া আলু পেঁয়াজ বস্তায় পুরছে। বেগুনওয়ালারা এখনও হাঁকছে—সস্তা বেগুন—সস্তা বেগুন।

কতকগুলো ছোট ছেলে পড়ে থাকা আলু পেঁয়াজ লঙ্কা পুঁইয়ের পাতা শাক কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

খিলখিল করে কে হাসছে? চুনারিয়া? টিকৃলি?

না। তারা নয়। অন্য কেউ। হাটে অনেক চুনারিয়া টিকৃলি আসে। কি বলছে? কথাগুলো ভেসে এল—ও মাঃ! আমার জন্যে ভাবছ? কার সঙ্গে যাব? আমার মরা সোয়ামী ভূত হয়েছে হে। আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

বুঝতে পারলে মালতী কোন যুবতী বিধবা বলছে কথাটা। সাহস তার খুব।

ধরণী বললে—মা এলে—তা ঝুড়িটাও খুললে না। বসেই থাকলে। এবার তো হাট ভাঙছে মা। বাড়ী যাব। তুমি বাড়ি যাও।

—হ্যাঁ জেঠা যাব। আজ আর খুললাম না। খুলতে ইচ্ছেও হল না। বসে বসে দেখলাম আর ভাবলাম। কাল থেকে নানান কথা মনে পড়ছে।

—পড়বেই মা। পড়ারই কথা। কিন্তু তুমি কি দোকান করবে মনে করেছ?

মালতী বলল—করতে তো হবে কিছু! খেতে তো হবে। মাসী ভিক্ষে করে। আমি তো তা পারব না।

—হাঁ চাঁপাবউ ভিক্ষে করে। আমি বলেছিলাম মা। চাঁপাবউ কাজকর্ম করে তো খেতে পার। মুড়ি ভেজে দিতে পার, জল তুলে দিতে পার লোকের। অনেক বাড়ি হয়েছে।

লোকেরা সকলে ঝি রাখতে পারে না, ঠিকেতে জল তুলিয়ে নেয়। পাঁচ সাত বাড়ি ঠিকের কাজ করলে পঁয়ত্রিশ টাকা চল্লিশ টাকা হবে। তা বললে—তাও করব। কিন্তু বোষ্টুমের মেয়ে গৌর বলে ভিক্ষা করে ধম্মটা রাখি। দিনে তো গৌর নাম হরির নাম হয় না—ভাসুর! দেখ তোমার ভাই বোষ্টুম হয়েও নাম করত না। খেটে খাওয়ার গরবে বিষয়ের তাপে সব ভুলেছিল। কী লোভ আর কী হিংসে বল; কথা হল কেউ মাছ ধরবে না—কেউ পুকুর দখল করবে না আদালতে বিচার না হওয়া পর্যন্ত। তা সে ধৈর্য হল না। জোতানে চুরি করে মাছ ধরতে গেল।

(চ)

বড় বড় মাছ অনেক যত্নে তৈরী করেছিল শ্রীমন্ত। দশ সের, বারো সের, দু'একটা পনের ষোল সেরও ছিল। সেগুলো রুই বা মিরগেল। পাঁচ সাত সের মাছ ছিল অনেক। মধ্যে মধ্যে লোকের ক্রিয়াকর্মে বিক্রি করত শ্রীমন্ত। আশী নব্বুই একশো টাকা মন।

সেই মাছগুলো সবই প্রায় ধরিয়ে নিয়েছিল বাসুদেব দোবে। গাঁয়ে বিলি করে দিয়েছিল প্রথম দিন।

বাসুদেব দোবে হিন্দুস্থানী বামুন, নিজে মাছ খায় না কিন্তু ছেলেপিলেরা খায়। মাছের জন্ত বাসুদেব পুকুর কেনে নি! পুকুর কিনেছিল পুকুরের জন্ত সম্পত্তির জন্ত। সস্তায় সম্পত্তি সে কিনেছে। তাই সে কেনে। বিবাদী সম্পত্তি সস্তায় কেনাই তার কাজ। মামলা মকদ্দমাও সে বোঝে। জানে।

শ্রীমন্তের আক্ষেপের সীমা ছিল না। জেদেরও অন্ত ছিল না। সে মামলার জন্যে ওস্তাদকে ধরেছিল। ওস্তাদের সঙ্গে শহরে যেত মামলা করতে। মামলার গতি শামুকের চেয়েও আস্তে। সেই গতিতেই মামলা চলছিল। শ্রীমন্তের ধৈর্য থাকতে থাকতে ভেঙে গেল। আশ্বিন মাস। ভরা পুকুর। চড়া রোদের সময় মাছগুলো খাবি খায়। যখন বর্ষণের ঢল নামে তখন পাড়ের ধারে ধারে এসে দামদল নেড়ে বেড়ায়। বড় বড় মাছ।

একদিন গভীর রাত্রে গিয়ে সে চারাকাঠি পুঁতে এল। মাছগুলোকে জোতানে ধরে খেয়ে শেষ করবে সে। কোন দিন সে এক সময়ে বের হত না। কোন দিন দুপুর রাতে, কোন দিন শেষ রাতে, কোন দিন লোকজন শোবামাত্র সে গিয়ে চার ফেলে আসত। চারাকাঠির মাথাটা এমন সুন্দর কৌশলে পুঁতেছিল যে সে ছাড়া আর কেউ ধরতে পারত না। মালতীকে সঙ্গে নিয়ে যেত। মালতী পাহারা দিত—সে চারা ফেলত জলে। নিঃশব্দে নেমে চারার থলি বেঁধে দিয়ে আসত সাত দিন পর প্রথম মাছ ধরেছিল জোতানে। মালতীর হাতে দিয়ে ছিল একটা খেঁটে। মাছটা মাটিতে আছড়ে পড়বামাত্র সে খেঁটে দিয়ে মাথায় মেরে মেরে ফেলত। তারপর মাছটা নিয়ে বাড়ি এসে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলত। মাছ রান্না করলেই জানাজানির ভয় ছিল।

চারটে মাছ মারবার পর পাঁচ দিনের দিন।

সেদিন পড়েছিল একটা রুই মাছ। বারো সের রুই। বাপ মেয়ে মাছটা বাড়ি এনে ফেলে হাঁপাচ্ছিল। চাঁপা দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীমন্ত সেদিন মাছটা পুঁততে গিয়ে পোঁতে নি। বলেছিল—রুইমাছ—কেটে ফেল। মুড়োটা আর পেটিটা রাখ। বাদবাকীটা পুঁতে দেব। কাট!

মালতী মাছ কুটত ছেলেবেলা থেকে। চাঁপা বলত—ওরে বাবা—ও রক্ত দেখবারে আমি পারি না বাপু!

মালতী হাসত।

মালতী মাছ কুটছিল। বঁটিটা ছিল শ্রীমন্তের বরাত দিয়ে তৈরী করানো ধারালো বঁটি। মুণ্ডটা কেটে ফেলেছে। পেটের ভিতর থেকে নাড়ীভুঁড়িগুলো বের করছে—শ্রীমন্ত উপু হয়ে বসে সতৃষ্ণ নয়নে দেখছিল আর আক্রোশভরেই বলছিল—শালা।

বারবার বলছিল। একবার দুবার বলে তৃপ্তি হচ্ছিল না তার। ঠিক এই সময় চাঁপা বারান্দা থেকে একটা ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠেছিল—আঁ—।

কি হল তা বুঝবার আগেই পাঁচিলের উপর থেকে সশব্দে লাফিয়ে পড়েছিল বাসুদেব দোবে।

—শালা—চোট্টা—হারামি কাঁহাকা!

শ্রীমন্ত বলশালী লোক। কিন্তু বাসুদেব আরও বলশালী; তার উপর অতর্কিতে লাফিয়ে পড়ে শ্রীমন্তকে নীচে ফেলে তার গলাটা টিপে ধরেছিল।—শালা চোট্টা!

শ্রীমন্ত আত্মরক্ষার কোন সুযোগ পায় নি—শুধু একটা শব্দ তার গলা থেকে একটা বীভৎস গোঙানির মত বেরিয়ে এসেছিল।

সে হতভম্ব হয়ে বঁটির উপরেই বসেছিল। চাঁপা ছুটে গিয়ে বাসুদেবকে ধরে টেনেছিল পিছন থেকে—ও গ মইরা গেল—মইরা গেল—ও গ।

বাসুদেব একটা হাতের ঝাঁকানি দিয়েছিল তাকে। এমন সজোরে সে ঝাঁকানি যে চাঁপা পড়ে গিয়েছিল আছাড় খেয়ে। তবুও সে চীৎকার করেছিল—মালতী!

মালতীর মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। রাগে তার কোন জ্ঞান ছিল না। সে বঁটিটা তুলে নিয়ে ছুটে এসে একটা কোপ বসিয়ে দিয়েছিল বাসুদেবের ঘাড়ে। বাঁ কাঁধে গলার নীচে বঁটিটা প্রায় আধখানা বসে গিয়েছিল।

বাসুদেব একটা চীৎকার করেছিল। জন্তুর মত। আ—। তার সঙ্গে চাঁপা সভয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল—ও গ—কি করলা মালা গ!

ওদিকে সদর ভেঙে ঢুকেছিল বাসুদেবের লোকেরা।

মালতীর চোখের সামনে আর কিছু ছিল না। ছিল রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে যেন গাঢ় কাল রঙের অনেকটা কিছু। কিন্তু গরম। উঃ কী গরম!

শ্রীমন্ত মরে নি। মরেছিল বাসুদেব। হাসপাতালে দুজনকেই নিয়ে গিয়েছিল। শ্রীমন্তও অজ্ঞান ছিল। বাসুদেবও কিছুক্ষণের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার আগে সে

বলেছিল—ওই মেয়েটা—ওই মালতী বঁটি দিয়ে কুপিয়ে দিলে আমাকে।

হাসপাতালে মরবার আগেও তার একবার জ্ঞান হয়েছিল—তখনও সে বলে গিয়েছিল একথা পুলিসের কাছে—একজন হাকিমের কাছে।

মালতীও অস্বীকার করে নি। বিহ্বলের মত হয়ে গিয়েছিল—তার মধ্যেই সে বলেছিল—হ্যাঁ। বাবা গোঙাচ্ছিল, চাঁপা মাসী ছাড়াতে গেল—তাকে ঝটকা মেরে ফেলে দিলে—আমি মাছ কুটছিলাম বঁটি নিয়ে—আমি বঁটিটা নিয়ে গিয়ে কোপ মারলাম।

* * *

সারা রাত্রি হাজতে সে উপুড় হয়ে পড়েছিল। ঘুম আসছিল কিন্তু আতঙ্কে ভেঙে যাচ্ছিল। আধ ঘুমের ঘোরে সে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠছিল। একটা আতঙ্কিত কান্না—উ—!

ওঃ—সে কী রাত্রি!

সকালে উঠে তার দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। থানার দারোগার মায়া হয়েছিল। তের চৌদ্দ বছরের মেয়ে! তাকে খাইয়েছিল স্নান করিয়েছিল। তারপর তাকে সদরে চালান দিয়েছিল।

সে মিথ্যা কথাও বলে নি। ছোট আদালতেও না—দায়রা আদালতেও না। চাঁপা মাসী ওস্তাদকে সঙ্গে করে সদরে এসে তার সঙ্গে দেখা করেছিল। তখনও শ্রীমন্ত হাসপাতালে। সেও জখম কম হয় নি। গলাটা তার বসে গিয়েছিল। দায়রা আদালতে তার বিচারের সময় শ্রীমন্ত এসেছিল। সেই শক্ত জবরদস্ত চেহারা তার বাবার—সে যেন ভেঙে চুরে কী হয়ে গিয়েছিল। শুধু হাড় শুধু হাড়। চোয়ালটা উঁচু হয়েছে। কনুর হাড়গুলো উঁচু হয়েছে। চোখ দুটো বসে গেছে। গাল তুবড়ে গেছে। ভয় করত। আর হাঁপাতো গলাটা ধরা ধরা হয়ে গিয়েছিল।

শুধু কাঁদতো। আদালতের মধ্যেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত আর চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে আসতো অনর্গল।

সে নিজে প্রথমটা বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। জেলখানার উঁচু পাঁচিলওয়ালা বিরাট ঘেরার মধ্যে আর একটা ছোট ঘেরা জায়গা। সেটা মেয়েদের জেল। মেয়ে কয়েদী পাহারা দেয়। একখানা বড় লম্বা ঘরে মেয়ে কয়েদীরা থাকে। তখন আটজন ছিল। তিনজন মুসলমানের মেয়ে। পাঁচজন হিন্দু। একটি অল্পবয়সী বামুনের বিধবা ছিল। বিধবা হওয়ার পর তার ছেলে হয়েছিল। সেই ছেলেকে সে গলা টিপে মেরেছিল। তিনজন মেরেছে স্বামীকে। বাকী তিনজন চোর। একজন ছিল আধবয়সী। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খুব কথা। সুন্দর কথা। গান গাইতো ভাল। সে বলত—আমি কিছু করি নি। কিন্তু অন্যেরা বলত—মেয়েদের ভুলিয়ে সে বাড়ি থেকে বের করে এনে বিক্রি করত। আবার বেশ্যাবৃত্তিও করাতো। তার জন্যে জেল হয়েছে তার।

সব কথা তার ভাল মনে পড়ে না ওই সময়কার। সে যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। একটা দুরন্ত ভয় ছিল—খুন করলে ফাঁসি হয়। সে খুন করেছে।

জোবেদা ছিল আধবয়সী মেয়ে। বুড়ো মোক্তারের স্ত্রী। আশনাই ছিল তার মোক্তারের

মহুরীর সঙ্গে। তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিষ দিয়ে মেরেছিল স্বামীকে। ছেলে হয় নি বলে বুড়ো মোক্তার আবার বিয়ে করতে যাচ্ছিল। জেল হয়েছে দশ বছর। সে মহুরীর পাঁচ বছর।

জোবেদা তাকে বলেছিল—ভেবো না মেয়ে। ফাঁসি তোমার হবে না। আমি আইন জানি। তোমার বয়স কম। তা ছাড়া তোমার বাবাকে খুন করছিল—তুমি তাকে বাঁচাতে বঁটির কোপ মেরেছিলে রাগের মাথায়। খুন করব বলে কোপটা মার নি।

ওই আধবয়সী সুশীলা বলেছিল—ভাবিস নে ছুঁড়ী তুই বেকসুর খালাস পাবি। কচি মুখ—ঢলঢলও আছে। আদালতে ফ্যালফ্যাল করে তাকাবি। খুব ভাল মানুষ সেজে থাকবি। বুঝলি—ওই মুখ দেখেই সব ভুলবে। উকিল ফুকিল সব। যেমন এখন তাকিয়ে আছিস আমাদের দিকে এই তাকানি তাকালেই হবে।

সত্যই সে বিহ্বলের মতই তাকিয়ে থাকত। ওই উঁচু দেওয়াল—এত লম্বা একখানা ঘর—উঁচু ছাদ; এক আকাশের আলো আর বাতাস ছাড়া বাইরের কোন কিছু আসত না। শব্দও না। মধ্যে মধ্যে কখনও সখনও হঠাৎ হয়তো একটা গোলমাল ভেসে আসত। জোবেদারা কৌতূহলী হয়ে উঠত—কী হল?

মেয়ে মেটকে জিজ্ঞাসা করত—কী হয়েছে আজ বাইরে? জান?

কখনও খবর মিলত কখনও মিলত না। ওদেরও কৌতূহল ফুরিয়ে যেত। প্রথম প্রথম ওর এই ধ্বনি শুনেও কোন কৌতূহল কোন প্রশ্ন মনে জাগত না। শুধু আলো আর রৌদ্রের মধ্যে যেন খানিকটা মনে হত এই সংসারের মধ্যেই আছে সে। এই দেওয়ালের বাইরে সেই পৃথিবী আছে যেখানে ভুবনপুরের হাট বসে। রাস্তা দিয়ে লরী যায়। গাড়ি যায়। যেখানে চাঁপা মাসী আছে। বাবা আছে।

রাত্রে মনে হত বসন্তের কথা। রাত্রে জেলখানাটাই সব পৃথিবী হয়ে উঠত। মনে হত এর বাইরে আর কিছু নাই। তখন মনে হত বসন্ত তো এখানেই আছে। প্রথম দু' দিন তার মনে হয় নি। তৃতীয় দিনে হঠাৎ মনে পড়েছিল বসন্তকে। বসন্ত জেলে আছে। আর এই জেলেই আছে। রাত্রে শুয়ে ভাবত প্রশ্ন করত—কোথায় আছে বসন্ত? কি করে খবর তাকে পাঠাবে।

জোবেদাদের তখন নাচগানের আসর বসত।

ওই প্রৌঢ়া গান করত—জোবেদা বসে শুনত। নাচত হামিদা আর কমলা বলে দুজন। বামুনের বিধবাটি পিছন ফিরে শুয়ে থাকত। ও মেয়েটা ছিল কেমন। ও নাকি লেখাপড়া-জানা মেয়ে।

সুশীলা অশ্লীল গান গাইত। ওরাও অশ্লীল ভঙ্গী করে নাচত।

মালতী ভাবত বসন্ত কোথায় আছে? কী করে দেখা হবে?

ক্রমে সে সহজ হয়ে এল। সব সয়ে গেল। জানালার ধারে বসে থাকত আর ওদের কথা শুনত। বেশ লাগত। রাত্রে নাচগান তাও দেখত শুনত।

এরই মধ্যে বিচার আরম্ভ হল। ক'দিন একজন উকিল এসেছিল। তাকে বলেছিল—

অনেক কথা বলেছিল। কিছু মনে থাকে নি। একটা কথা মনে আছে—বলেছিল—তুমি একটি কথা বলবে। আমি নির্দোষ!

প্রথম যেদিন জেল থেকে বেরিয়ে জালঘেরা গাড়িতে শহরের ভিতর দিয়ে আদালতে এসেছিল সে সেদিন সারা পথটা ওই জালে মুখ রেখে চোখ চেয়ে দেখতে দেখতে এসেছিল।

ওঃ কত লোক। ওই রাস্তায় কত লোক কেমন চলেছে! কত আলো কত কলরব। ভুবনপুরের হাট মনে পড়েছিল।

আদালতে বাবাকে দেখেছিল। চিনতে পারে নি তাকে সে প্রথম দৃষ্টিতে। ওই রোগা চোখবসা—এ যেন সেই দুর্দান্ত সবল বাবার প্রেত। কঙ্কাল! সে কেঁদেছিল। তার বাবাও কেঁদেছিল।

আদালতে দাঁড়িয়ে আবার সে বিহ্বল হয়ে গেল। জজ সাহেব জুরী উকিল চাপরাশী কনেস্টবল অনেক লোক দেখে বুক তার টিপ-টিপ করতে লেগেছিল, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল জোবেদা তাকে মিছে কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছে, প্রৌঢ়া বিরাজ তাকে ঠাট্টা করেছে। এরা সকলেই কিভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে! সকলের দৃষ্টিতে দেখেছিল সে তিরস্কার! কেমন হয়ে গিয়েছিল সে!

একজন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি দোষী না নির্দোষ?

সে বিহ্বলের মতই বলেছিল—এঁ্যা?

—তোমাদের গ্রামের বাসুদেব দোবেকে তুমি বঁটির কোপ মেরে খুন করেছ? পুলিস বলছে—

আর কিছু বলতে দেয় নি সে, সে কথার মাঝখান থেকেই বলতে আরম্ভ করেছিল, হ্যাঁ আমি মাছ কুটছিলাম বঁটিতে। বাসুদেব পাঁচিল ডিঙিয়ে লাফিয়ে বাবার উপর পড়ে বুকে বসে গলা টিপে ধরেছিল। চাঁপা মাসী চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল—মরে গেল। বাসুদেব তাকে হাতের ঝটকা দিয়ে ফেলে দিলে—আমি উঠে বঁটিটা নিয়ে পিছন থেকে ওর ঘাড়ে কোপ মারলাম!

তার উকিল কি বলতে গিয়েছিল কিন্তু তাকে বলতে দেয় নি। জজ সাহেব বারণ করেছিল। আবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি তাকে মেরেছিলে সে তোমার বাবাকে মারছিল বলে? না তার ওপর তোমার রাগও ছিল?

সে বলেছিল—রাগও ছিল। আমাদের পুকুর জোর করে কেড়ে নিয়েছে সে। জোর করে মাছ ধরাচ্ছিল—আমি ঘাটে সত্যাগ্রহ করে শুয়েছিলাম—আমাকে কাদা মাখিয়ে জোর করে তুলে নিয়ে পথের উপর ফেলে দিয়েছিল।

এখন সে বুঝেছে সেদিন ওসব কথা বলতে হত না। বলতে নেই।

চাঁপা মাসী মিথ্যে কথা বলেছিল একটু। বলেছিল বাসুদেব তাকে ঝটকা মেরে ফেলে দিলে তার জ্ঞান হারিয়েছিল। যখন জ্ঞান ফিরে পেলে তখন দেখেছিল অনেক লোক বাড়িতে। বাসুদেব দোবে রক্তে ভাসছে—পড়ে আছে, তার কাঁধে কোপের দাগ।

তিন বছর জেল হয়েছিল তার।

তিন বছর জেল তাকে খাটতে হয় নি—দু' মাসের উপর কমে গেছে। খালাস পেয়ে কাল সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরেছে।

জেলখানায় সে অনেক বড় হয়ে গেছে। বয়সে বেড়েছে। রূপ তার নাকি আশ্চর্য রূপ হয়েছে। মাজা শ্যামবর্ণ রঙ তার ফর্সা গৌরবর্ণে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয় চাঁপা মাসী বলেছে—কী কইব মাসী! দেইখ্যা মনে লয় যেন কোন রাজকন্যে দাঁড়াইল আইসা। আ মরি—মরি—মরি!

বাবার কথা মনে করতে করতেই সে স্টেশন থেকে নেমে একটা রিকৃশা করে এসেছিল বাড়ি। স্টেশনে রিকৃশা দেখে একটু অবাক হয়েছিল। এখানে রিকৃশা? তারপর পিচ দেওয়া পথটা। তারপর এক জায়গায় অনেক লরী। রিকৃশা ড্রাইভার বলেছিল এটা লরীর আড্ডা। স্টেশন থেকে মাল নিয়ে যায় ভুবনপুর। মিলের চাল নিয়ে এসে পৌঁছে দেয় স্টেশনে। তারপর দেখেছিল লম্বা লম্বা খুঁটির মাথায় তার। শুনেছিল ইলেকট্রিক লাইট হয়েছে। বাবা শ্রীমন্ত মারা গেছে দু'বছর। জেলেই খবর পেয়েছিল। তখন সে বহরমপুর জেলে। প্রথম শোকটা খুব লেগেছিল। ক'দিন অনেক কেঁদেছিল। তারপর জেলের মতই সয়ে গিয়েছিল। ওকে বলেছিল মেয়ে কয়েদী সুষমা। বেশ্যা ছিল সে। মস্ত বড় ডাকাতের প্রেয়সী ছিল। খুন করেছিল সেই ডাকাতকেই। সে ভালবেসেছিল অন্য মেয়েকে। সুষমার বাড়িতে তার সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল ডাকাতির মাল। বারো বছর জেল হয়েছে। বয়সে সে অনেক বড়। তবু ভালবাসত মালতীকে। সে মালতীকে বলেছিল—কাঁদিস নে মালতী। এখানে কাঁদতে নেই। জেলখানা না গুমখানা। গুম হয়ে থাকবি। কাঁদবি নে। কী হবে কেঁদে!

তবুও সে কেঁদেছিল। থামতে পারে নি। সুষমা বলেছিল—কাঁদতে তো তুই পারছিস? কান্না তোর আছে? আমাদের তো নেই। চোখের জল বোধ হয় শুকিয়ে গেছে।

তাই গিয়েছিল ক'দিন পর। এর মাসখানেক পর চাঁপা যখন ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, বসন্ত সঙ্গে নিয়ে এসেছিল চাঁপাকে—সেদিন চাঁপা কেঁদেছিল মালতী কাঁদে নি। তার চোখ ছিল বসন্তের উপর।

বসন্তের সঙ্গেই কথা হয়েছিল তার চোখে চোখে। বারবার বিষণ্ণতাকে মুছে দিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠেছিল।

আজ স্টেশনে নামবার আগে বাবার কথা তার মনে পড়েছিল। সেই মনে পড়াটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরেছিল। ইচ্ছে করে চেষ্টা করে অন্য মানুষ অন্য চিন্তাকে দূরে ঠেলে রেখেছিল। বারবার বসন্ত যেন বাবাকে ঠেলে মনে আসতে চাচ্ছিল। কিন্তু সে তা দেয় নি। এখানকার নানান পরিবর্তন দেখে বিস্ময়—সেও বাবাকে তার আড়াল করে এসে দাঁড়াতে চাইছিল। চোখের সামনেকার প্রত্যক্ষ বাস্তব লরী ইলেকট্রিক পোস্ট পিচের রাস্তা গার্লস স্কুলের বাড়ী মিলের চিমনি দত্তদের নতুন মটরকার এগুলোকে তো সরানো যায় না। এরই মধ্যে দিয়ে বাড়ীর সামনে এসেও আশ্চর্যভাবে বাবা সব কিছুকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। চোখ দুটোর দৃষ্টি হয় থেকেও ছিল না নয়তো বিচিত্রভাবে ভিতরের দিকে ফিরেছিল। এ বিচিত্র

অভিজ্ঞতা মালতী জেলখানা থেকে নিয়ে এসেছে। হয়তো জেলখানাতে এ সকলেরই হয়। নানান জনের নানান হৈচৈএর মধ্যে অকস্মাৎ চোখের দৃষ্টি বিচিত্রভাবে যা চোখের উপর নেই তাই দেখত। দেখত সে বসন্তকে।

বাড়ীর দরজাতেই চাঁপা মাসী সামনেই দাঁড়িয়েছিল। বসন্তকে প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু সে ছিল না। তবু তার জন্তে কিছু মনে হয় নি। অবকাশই হয় নি। বাবা—তার বাবাকেই মনে পড়ছিল। বুকের ভিতরটায় একটা আবেগ যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

চাঁপা মাসীর পরিবর্তন চোখে পড়েও পড়ে নি। কপালে তিলক নাকে রসকলি। চুড়ো করে চুল বাঁধা, গলায় মোটা তুলসীর মালা। চাঁপার চিঠি থেকে জানে চাঁপা ভিক্ষে করে ধর্মের অঙ্গ হিসেবে। সে ভগবান ভজে।

মালতীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল। মুখে সে সোচ্চারে বাবা বলে কাঁদতে পারে নি। চাঁপা তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবাক হয়ে দেখছিল। হঠাৎ সে তার হাতে ধরে বলে উঠেছিল—কী কইব মাসী! দেইখ্যা মনে লয় যেন কোন রাজকন্যা দাঁড়াইল আইসা। মরি—মরি—মরি!

তার কথার সুরে আশ্চর্য অকৃত্রিম মিষ্টতা ছিল। যেন মধুর মত। মুহূর্তে বাবা মন থেকে অদৃশ্য হয়েছিল। প্রসন্ন হাসির মত একটি ভাললাগার সুর জেগেছিল মনে। লজ্জাও হয়েছিল। একটু হেসে বলেছিল—বল কী মাসী!

—কী কইব রে কন্তে। মাসী সম্বন্ধ ভুলতে চাইছে মন। মনে সাধ লিছে তোমারে আমার রাধা কইরা আমি হই সখী বৃন্দা!

মালতী এবার আরও হেসে ফেলেছিল—বলেছিল—মরণ!

তিন

বাকী দিনটায় কোন কথা বিশেষ হয় নি। প্রতিবেশীদের দু' চার জন দেখতে এসেছিল তাকে। তারা তাকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। বিস্ময় মালতীর রূপ দেখে আর তার সাজ-সজ্জার মার্জনা দেখে।

খুন করে যারা সাজা পায় তারা জেলখানা থেকে এমন সেজে-গুজে চোখ মুখ নিয়ে ফেরে কী ক'রে।

একজন জিজ্ঞাসা করেই বসল—এই সব কাপড়-জামা তোকে দিয়েছে জেলখানায়?

মালতী বলেছিল—আজকাল জেলখানায় যে ভাল খাটনির জন্তে মজুরী দেয়। টাকাটা জমা থাকে। আসবার সময় দেয়। তা থেকেই কিনেছি আমি।

—কী খাটনি তোকে খাটতে দিত? ঘানি ঘোরাতে হত?

হেসে উঠেছিল মালতী।—ঘানি? কেন ঘানি ঘোরাতে দেবে কেন?

মালতী আর ক্যানে বলে না—কেন বলে। তারপর বলেছিল—মেয়েদের ঘানি ঘোরাতে

হয় না। অন্য কাজ দেয়। কাজ শেখায়। তাঁতের কাজ, শেলাইয়ের কাজ, শতরঞ্জি বোনাও কেউ কেউ শেখে। পুতুল তৈরীর কাজ আছে। যারা ওসব পারে না করে না তাদের চাল ডাল বাছতে দেয়। বই পড়তে দেয়।

—ও মা! তা হলে তো ভাল। খাওয়াদাওয়ার ভাবনা নাই—দিব্যি সুন্দর রূপ হয়েছে তোর। এ রূপ তোর ঘরে থাকলে হত না।

—যাও না, গিয়ে থেকে এস না, তোমারও রূপ খুলবে।

সে কিন্তু গায়ে মাখল না কথাটা, হেসে বললে—তোর রূপ ছিল খুলেছে। রূপ না থাকলে খুলবে কী করে বল? আমি গিয়ে কী করব?

মালতী বলেছিল—তোমার মত তো খুলবে! কত্তার চোখ জুড়োবে।

—বয়স হয়ে গিয়েছে লো। আর তোর মত কী বুকের পাটা আছে লো! যে খুন করে জেলে যাব!

আর একজন মাঝখানে পড়ে বাধা দিয়ে বলেছিল—কী সব কথা বল পাল খুড়ী—ওগুলান কী কথা নাকি? খুন কী ইচ্ছে করে করে নাকি—না করতে পারে মেয়েছেলেতে? হয়ে যায়! ওসব কথা ছাড়।

—ছাড়বে কেন বউদিদি! খুন মেয়েতেও করে; করতে পারে। আমাদের সঙ্গে প্রায় একশো-সোয়াশো মেয়ে ছিল—তার মধ্যে খুন করে দশ বছর বারো বছর যাবজ্জীবন জেল খাটছে এমন মেয়ে অনেক ছিল গো।

—বলিস কী?

—হ্যাঁ গো। আর মজার কথা জান—বেশীর ভাগ খুন করেছে স্বামীকে না-হয় ভালবাসার লোককে। বিষ দিয়ে বেশী—একটা মেয়ে স্বামীর মাথাটা একটা মোটা পাথর দিয়ে ছেঁচে দিয়েছিল।

—হেই মা গো! কী করে দিলে?

—শুধিয়েছিলাম। তা সে হেসে বললে—কি করব? দেওরের সঙ্গে আশনাই ছিল যে। সে আশনাই এমন হল যে স্বামী কাঁটা হয়ে উঠল। স্বামী চাকরি করত দু'কোশ দূরে বাবুদের বাড়িতে। সন্দেহ করে রাতে এসে ডাক দিত। দু' একদিন পেরায় ধরে ফেলেছিল। অসহ্য হল। সেদিন ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিল। দুজনায় শুয়ে আছি। সে ঘুমোল আমার ঘুম এল না। ঘরের দরজায় খিল ছিল না—একটা আধমুনে পাথর ঠেসান দিয়ে বন্ধ থাকত। আমি উঠলাম—ঘুমিয়েছে—এইবার যাব দেওরের কাছে। নড়তেই বলে—কি? দুবার তিনবার। তারপর তখন নাক ডাকছে তার। উঠে বেরিয়ে যাব, দোর খুলতে গিয়ে পাথরটাকে আলগোছে সরিয়ে দোর খুলব—পাথরটা তুলেছি। তুলেই মনে হল—ঘুমিয়েছে নাক ডাকছে—এই সময় দিই না পাথরটা দিয়ে মাথাটা ছেঁচে! দিলাম তাই। তা এক ঘায়েই ঘায়েল—। গোঙাল দু'বার। আমিও আর দু'ঘা দিলাম। তা জান—ওই হারামজাদা দেওরই দিলে সাক্ষী। ছাড়া পেলে তার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে!

—ও বাবাঃ! কী সর্ব না—শ!

—কোন্ জাত মালতী ?

—জাত ছোট বটে তার। কিন্তু ভাল জাত যাদিগে বল—বামুন কায়েতও আছে। মুসলমানদের মিয়া ঘরও আছে। লেখাপড়া জানাও আছে।

—লেখাপড়াজানা ? বামুন কায়েত ?

—হ্যাঁ। নির্মলা দিদি বামুনের বিধবা মেয়ে যুবতী মেয়ে—আমার সঙ্গে খুব ভাব ছিল। তার সন্তান হয়ে গেল বিধবা অবস্থায়। ছেলেটাকে মেরেছিল গলা টিপে। তারপর বেশ ভাল ঘরের গিন্নী ছিল—সধবা—লেখাপড়াজানা সুরেশ্বরী দেবী—নিজের ছেলে হয় নি। সতীনপো ছিল—তাকে বিষ দিয়ে মেরেছিল। জোবেদা বিবি মোক্তার আর মিয়া লোকের পরিবার। ছেলে হয় নি। স্বামী নিকে করবে ঠিক করেছিল—স্বামীকে বিষ দিয়েছিল। জোবেদা বিবি আচ্ছা মেয়ে। আইন জানে। আমাদের সব দরখাস্ত লিখে দিত। আর—।

সরস স্মৃতি স্মরণের কৌতুকে হেসে উঠে বললে—যা গল্প বলত না রাত্রে।—ওঃ!

—খুব ভাল গল্প জানে ?

—শুধু গল্প—নাচ—। নাচত। আর এক আধবুড়ী বেশ্যা ছিল —সে গাইত।

—নাচগান ? নাচগান হয় নাকি ?

—আদ্ধেক রাত। আমরা জন দশেক এক ঘরে থাকতাম—সে একেবারে রোজ রাত্রে চলত। ওয়ার্ডার ধমক দিত। জেলারকে বলত। জেলার এসে মাঝে মাঝে বলত—এসব না। এসব না। এসব চলবে না। তা জোবেদা বিবি যা বলেছিল না! হেসে উঠল মালতী। বললে—জোবেদা বিবি মুখের উপর বললে—সাহেব, আমরাও তো মানুষ গো। তার উপর যুবতী মেয়ে। আমাদের যৌবনজ্বালা আছে। গান গেয়ে গল্প করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। তাতেও আপনারা আপত্তি করবেন ? জেলার মুখ রাঙা করে চলে গেল। জোবেদা বিবির রেমিশন কাটলে। তাতে জোবেদা বিবির বয়েই গেল!

ওরা অবাক হয়ে গেল শুনে। এবং মালতীকে দেখে।

মালতীর যেন একটা নতুন চেহারা বেরিয়ে এসেছে কখন এই কথাবার্তার অবসরে!

প্রথম জনা প্রবীণা পাল গিন্নীর বিস্ময় চাপা পড়ে গেল, রসপ্রাবল্যের মধ্যে জিজ্ঞাসা করলে —এত সব কয়েদী তো থাকে—সব ডাকাত চোর খুনে—এদের সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো পারে ? দেখা হয় না লো ? মাগোঃ! কী করে থাকে এদের মধ্যে লো! এঁ্যা—তেড়ে আসে না ?

নবীনা বললে—খুড়ী তুমি বাপু কিছু জান না। মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে থাকে নাকি। জেল আলাদা আলাদা। জেলের ভেতরেই মেয়েদের জন্যে আলাদা জেল থাকে।

—বহরমপুরে একটা জেল আছে সেটা শুধু মেয়েদের জন্যে। আরে আরে। এই ছোঁড়ারা এই—।

কয়েকটা ছোঁড়া উঁকি মারছিল। তারা খুনে মালতীকে দেখতে এসেছে। সভয়ে উঁকি মেরে দেখছে। মালতী তাদেরই বললে—এই ছোঁড়ারা—এই।

তারা পালাল ভয়ে।

মালতী খিলখিল করে হেসে বলল—হ্যাঁ আমি খুনে। বঁটিটা এখনও আছে—নাক কেটে দেব। পালা! মধ্যে মধ্যে এখনও খুন চাপে আমার!

বলতে বলতে সে ক্ষোভে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। কী যেন একটা তীক্ষ্ণ কাঁটার মত তাকে বিদ্ধ করেছে ছেলেগুলোর ভয়ার্ত দৃষ্টির মধ্য দিয়ে—এই কৌতূহলী মেয়েদের কথার ভিতর দিয়ে। বিদ্ধ হয়তো করেছে অনেকক্ষণ কিন্তু যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে তাকে ধৈর্যহারা করেছে এই মুহূর্তে। সে উঠে পড়ল। বললে—পাল দিদি আর পারছি না আমি। বাড়ী যাও তোমরা।

ওরা চলে গেলে সে চাঁপাকে বলেছিল—মাসী এক গ্লাস জল দাও। তেষ্টা পেয়েছে।

চাঁপার বিস্ময়ের সীমা ছিল না অকস্মাৎ এক নতুন মালতীকে দেখে! কিন্তু সে কোন কথা বলে নি। নীরবে দেখছিল শুনছিল।

খাবার জল দিয়ে চাঁপা তাকে বলেছিল—মাসী একটা কথা বলব?

—কি বল? তোমারও ভয় হচ্ছে না কি?

—না মাসী। আমারে তুমি জান। ভয় আমি পাই না। তারপরেতে মাসী এই দুঃখের দিনে গৌরচাঁদে ভইজা ভয়ডর আমার কিছু নাই।

—তোমার গৌর তোমার থাক। গৌরভজা ছাড়া যা বলবে বল!

—বিয়া করবা? মালাচন্দন?

—বসন্তদা' কোথা মাসী?

—বসন্ত? আমার কপাল কন্তে। সি অখন মস্ত বড় লোক গ। লীডার হইছে। গোটা জিলা ঘুরে বেড়ায়। কলিকাতা যায়। মিটিং করে বক্তৃতা করে। গেরামে গ্রাশে অখন তার খাতির কত!

—এখানে থাকে না?

—থাকে। দু' দিন চার দিন। সেই খোকাঠাকুরের বাড়িটা বিক্রি কইর‍্যাছে মেয়ে ইস্কুলকে। সেখানে তাদের বোর্ডিং হইছে। ওই হাটের উধারে জায়গা কিন্যা একটা বাড়ি বানাইছে। সেখানে থাকে। সে অখন ইখানকার খবর লিখে খবরের কাগজে।

—কবে আসবে জান?

—তা কি কর‍্যা কই। তবে আসবে—হয়তো কাল আসবে। ঠিক তো কিছু নাই।

—আমাদের বাড়ি আসে না?

—আস্তে। দু' মাসে এক দিন তিন মাসে এক দিন।

—আমার কথা জিজ্ঞাসা করে না?

—তা করে। সি করে।

—করে? তবে সেই একবার দেখা করে আর একবারও গেল না কেন? আমি চিঠি লিখেছিলাম—তারও উত্তর পাই নাই।

—সে কইছে আমারে। বলে—মালা চিঠি দিছে। দিব আমি জবাব দিব। আর

দেখা করতে আমি গেছি, সি কাজ কাজ কইরা পাগল। যায় কখন। তারে যদি অখন দেখ মাসী তুমি বলব না কি এই বসন্ত সেই জনা। আমি তো মাসী অরে প্রণাম করি। কি সব কথা বলে! কিন্তু তার কথা অত কইরা জিজ্ঞাসা করছ—

—সে আমাকে কথা দিয়েছিল মাসী—বলেছিল আমাকে বিয়ে করবে তার বাবা মারা গেলে। আমি ভুবনেশ্বরতলায় ঢেলা বেঁধেছিলাম।

—মালতী!

চাঁপার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় উৎকণ্ঠা যেন উপচে পড়ল।

—কেন মাসী?

—ইটা কী কও? সে বামুন আমরা বষ্টুম—

—সে তো জাত মানে না মাসী! তা ছাড়া আমাকে কথা দিয়েছিল!

—মালা!

—মাসী!

একটু চুপ করে থেকে চাঁপা বলেছিল—সি তুমি ভুল্যা যাও!

হেসে মালতী বললে—ভোলা শক্ত মাসী। এই কাণ্ড ঘটবার আগে সে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে—। সে অকুণ্ঠিতভাবে সেদিনের কথাগুলি বলে গেল। কোন সংকোচ তার হল না। একবারের জন্যেও কথা মুখে আটকাল না।

কথাগুলি বলে বলে তার মুখস্থ হয়ে আছে। কতবার বলেছে সে জেলখানায় কত জনের কাছে তার হিসেব নেই। নতুন মেয়ে কয়েদী এসেছে—তার কাছে তার কথা শুনেছে নিজের কথা বলেছে। খুনের ঘটনাটাও বলেছে। কিন্তু তার মধ্যে এই কথাগুলিই সব থেকে ছিল তার নিজের প্রিয় কথা—যে শুনত তার কাছেও মনে হত এই কথাকটিই প্রাণে ধরার কথা। মনে ধরার কথা।

কত রাত্রি সে মনে করেছে বসন্তকে। কোন দিন কেঁদেছে। কোন দিন জেল থেকে বেরিয়ে বিয়ের কল্পকথা তৈরী করেছে মনে মনে।

গাইগরুটা ডেকে উঠল। চাঁপা বললে—অ মা! সুরভি আইচে। সন্ধ্যা লাগছে লাগে। উঠল চাঁপা। মালতী বললে—সেই গাইটা?

—না মাসী। স্যা দেহ রাখছে। ইটা তার সেই বড় বেটীটা।

—চল দেখে আসি। বিইয়েছে?

—হাঁ। বকনা হইচে। ভাল বকনা।

—কত দুধ দেয়?

—তা স্যাড় স্যার দেয় কষ্টে। আজ তোমারে ক্ষীর কইরা দিব।

সে একটা বোগনো বের করে নিয়ে বের হল।

—দু'বেলা দুধ দোওয়াও না কি?

—হ। দুধ গাইটা বেশী দেয়। টেক্কা দুহাইলে দু' স্যার খুব দেয়। তা আমি দুহাই না মাসী। থাক অর কষ্টে থাক। তাই সকালে এক স্যার মাপ দেখ্যা বোগনা ভরতি হইলেই

ছেড়া দি। তা পরেতে বাচ্চাটা খায়। আমি চল্যা যাই জল তোলার কাজে। চার পাঁচ বাড়ি কাম সের‍্যা ফিরে বাচ্চাটা বেঁধে মাটারে ছেড়ে দিই। বলি যাও মাঠে ঘাস খাইয়া আস। পরের বাড়ি যাইও না লক্ষ্মী। তা অমন বজ্জাত ছিল-অর মা, বেটী অমন লয়। কারুর বাড়ি ঢুকে না। পেরথম পেরথম দিগদড়ি দিয়া বেঁধ্যা দিতাম। দেখতাম টাইনা খুঁটা তুলেও মাঠে পুকুরধারেই চর‍্যা বেড়ায়; কারু বাড়ি মাড়ায় না। তখন থেকে ছেড়্যা দি। সুরভি আমার পুকুরধারে চরে ঘাস খায়—প্যাটটা অমন কইরা ফিরে আসে ঠিক সময়টিতে। ডাকে। আমি গিয়া দুহাইয়া লই। সোকালের এক সের দুধ রোজদারদের ঘরে দি। ই বেলারটা গোরাচাঁদের ভোগ দি। প্রসাদ পাই। আজ তোমার কল্যাণে গোরাচাঁদে ক্ষীর খাওয়াইব। কইব অরে তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া কইরো না যেন। দুঃখ দিয়ো না।

মালতী হেসে বলল—দুঃখ আমি পাব না মাসী। ওই সাধ্যি তোমার গোরাচাঁদের হবে না। সুখ আমি আদায় করে নেব।

—ঠাকুর দেবতারে অই কথা কয় না।

—কয় মাসী! জেলে বসে ওই কথা আমরা রোজ কইতাম। জোবেদা বিবির তিরিশ বছরের জেল হয়েছিল—সাঁইত্রিশ আটত্রিশে খালাস পাবে। ছেলে হয় নি। যুবতী লাগে। বলে এবার গিয়ে সুখ ঠিক খুঁজে নেব! শেষ না হয় বাঈজী হব।

শিউরে উঠে চাঁপা বললে—ও কথা কয় না মাসী। ছিঃ!

রাত্রিকালে দুজনে শুয়ে জেলখানার জীবনের কথা বলেছিল। তা থেকে এসেছিল ভবিষ্যতের কথায়। চাঁপা বলেছিল—তুমি ভাইবো না মালা মাসী। আমি পাটকাম করি—ভিক্ষা করি। ঘরটা আছে। গাইটা আছে। তোমারে খাওয়াইতে আমি পারব। তারপরে তোমার জেহেল তো যে কারণে হইছে—কি কারণে তুমি কোপটা মারছ সেও সকলে জানে। রূপবতী কন্যা বিয়া তোমার হবে।

মালতী বলেছিল—সে তুমি ভেবো না মাসী। সে আসুক।

—কে? বসন্ত?

—হ্যাঁ!

—মাসী!

—কি?

—কি আর কইব? মনে তো লয় না আমার!

—তা না নিক।

—তা হলে দেখ!

সকালে উঠে বাপের মনিহারী দোকানের পড়ে থাকা জিনিসগুলো দেখতে দেখতে বলেছিল—মাসী, আমি দোকান করব। বাবা যেমন করত।

—দোকান করবা? পারবা?

—পারব মাসী। বাবার থেকে ভাল পারব।

—বাবার থেক্যে ভাল পারবা? বিস্ময় এবং কৌতুক দুই-ই প্রকাশ পেয়েছিল চাঁপার

মধ্যে।

—হ্যাঁ। দেখো তুমি! খদ্দেরের ভিড় লেগে যাবে। আমার দরে দর করলেও শেষ যা বলব তাতেই নেবে। বাবা এক পয়সা লাভ করত আমি চার পয়সা লাভ করব। করব না?

—কি কর‍্যা বলব বল?

—আমি মোহিনী মন্তর শিখে এসেছি।

—সত্যি?

—তুমি বড় বোকা মাসী। আগে তোমার বুদ্ধি ছিল। গৌর ভজে বুদ্ধি তোমার শেষ হয়ে গেছে। আমার মত সুন্দরী যুবতী দোকানদারের দোকানে ভিড় করবে না লোকে?

চাঁপা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এ কন্তে কয় কী?

মালতী আবার বললে—হেসে কথা কইলে যে দর বলব তাই দিয়ে জিনিস নেবে।

—মালা!

—কি?

—তোমার বাক্যি শুইনা ভয় করে মাসী! এ তুমি কী হইছ গো?

মালতীর ভুরু কুঁচকে ওঠে, বলে—তার মানে? কী হয়েছি?

—তুমি নিজে বুঝতি নার?

—কী বলছ কী?

—তুমি বুঝতি পারছ না—কী কইরা বুঝাই!

মালতী বলেছিল—তোমার সঙ্গে বকতে আমি পারি নে বাপু! যাই হোক তুমি আমার জন্তে ভেবো না। ভাবতে হবে না। আমি তোমার থেকে অনেক ভাল বুঝি। তোমার পাপ পুণ্যি ধম্ম ও আমার জন্তে নয়। আমার মত জেলখানায় থাকলে বুঝে আসতে। তোমার ঝিগিরি আর ভিক্ষের পয়সায় আমার পেট ভরবে দু'মুঠো খেয়ে। তাতে আমার মন ভরবে না। যাও বকিয়ো না—নিজের কাজে যাও।

বিকেল হতে-না-হতে সে ঝুড়িতে পুরনো পড়ে থাকা মাল নিয়ে হাটে এসেছিল। ধরণী দাসের দোকানের জায়গাটা ধরণী দাস অন্য কাউকে দিয়েছে কি না সে জানে না—দিয়ে থাকলে জোর করে বসবার মতলব নিয়েই এসেছিল। ধরণী দাস তাকে সস্নেহে আহ্বান করতেই কেমন যেন নরম হয়েছিল মনটা। তারপর হাটের দিকে তাকিয়ে পুরনো কথা মনে করে এ মালতী যেন পুরনো মালতী হয়ে গিয়েছিল। বসে বসে ভাবতে ভাবতে হাটটা শেষ হয়ে গেল।

রাত্রি অনেকটা হয়ে এসেছে।

ক'টা? সাড়ে সাতটা আটটা তো হবেই।

ধরণী দাসকে বললে—আজ চলি জেঠা! আসছে হাট থেকে আমি বাবার মত এসে বসব কিন্তু। বাবা যা দিত তাই দেব।

ধরণী বললে—মা, তোমার বাবা প্রথমে আমাকে দুশো টাকা দিয়ে দোকানটার তিন

ভাগের এক ভাগের অংশীদার হয়েছিল। তারপরে তোমার মামলার সময় বিক্রি করেছিল—আমি একশো টাকা ধরাট দিয়ে তিনশো দিয়েছিলাম। তা—। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—দেখ আমার ইচ্ছে মেঝেটাকে বাঁধিয়ে পাকা থামটাম গেঁথে ভাল রকম দোকান করি। এর মধ্যে—।

—কিছুদিন তো দেন! তারপর না হয় আমি আলাদা চালা করে নেব!

—কত দিন?

—এই দু' তিন মাস!

—দু' তিন মাস?

—দু' তিন মাস ভিন্ন কি করে হবে জ্যাঠামনি? আবদারের স্বরে মালতী বলে উঠল।

ভারী ভাল লাগল দাসের। মেয়েটা জেল খেটে তো বড় ভাল হয়েছে। কথাগুলি যেমন মিষ্টি তেমনি সাজানো! ক্ষীণ একটি হাসি তার মুখে দেখা দিল। সে বললে—বেশ বেশ মা। তাই বেশ। তাই হবে। তবে বুঝছো তো মা আমিও তো ছা-পোষা মানুষ! তা এমন করে বলছ। তা বেশ।

মালতী মনে মনে বললে—মরণ তোমার! দাঁড়াও না। বসি তো একবার!

দাস আবার বললে—চললে তা হলে?

—যাই। রাত তো অনেক হল।

—হ্যাঁ। তা সদর রাস্তা হয়ে যেয়ো। আলো হয়েছে। ভুবনপুর আর সে ভুবনপুর নাই মা। এই দু' বছরে একবারে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। নানান ধরনের লোক! সুন্দরী যুবতী মেয়ে!

মালতীর মুখের ডগায় এল—ওরে বুড়ো! রসিক তো খুব তুমি!

মনে পড়ল জেলখানায় ছিল গোপিনী বলে একটা মেয়ে! তার কাকা তাকে ভোগ করেছিল গোপিনীর খারাপ স্বভাবের সুযোগ নিয়ে। গোপিনী খুব হাসত। হেসেই বলত——ওহে সব দেখেছি। কাকা বাবার সহোদর—চুল পেকেছে—বিধবা মেয়ে আমি—আমি মজলাম বাড়ির চাকরের সঙ্গে। কাকা তারপর—।

কথাগুলো গোপিনী বলে যেত খুব রসিকতা করে। তারপর বলত—শোধ তার নিলাম—একদিন সব চুরি করে চাকরটাকে নিয়ে ভাসলাম। কপাল আমার! হারামজাদা শহরে এসে মদ ধরলে—তারপর চোর হল। চুরি করে একদিন গয়না আনলে। সেখানা পরতে সাধ হল—রেখে দিলাম। একদিন ধরা পড়ল। তারপর সকালে বাড়ি তল্লাশী। বেরিয়ে গেল গয়নাখানা। শুধু গয়নাটা নয় কাপড় পেলে কিছু। হয়ে গেল জেল। তারপর ঘুরে ঘুরে এই তিনবার আসা হল।

ওরে বুড়ো! মুখে সে বললে—তাই যাব জেঠা!

পথে নেমে মনে হল শিবকে প্রণাম করবে না? পরক্ষণেই মনে হল শিব না ছাই। চলতে লাগল সে গন্ধেশ্বরী বাজার হয়ে।

পথে ইলেকট্রিক লাইট। অনেক দোকানও হয়েছে। ও দোকানটা কার? দ্বিজপদ

চন্দের। হেজাক জ্বলছে। ওঃ দোতলা বাড়ী হয়েছে। এপাশে মুসলমান বোর্ডিং। তার পাশে কাটা কাপড়ের দোকানে মেসিন চলছে। তারপর ভকতের কাপড়ের দোকান। তারপর খানিকটা একটু অন্ধকার। রাস্তার আলো ছাড়া দোকানে এখানে লণ্ঠনের আলো। তারপর থানা। এপাশে হোটেল। এখানেও হেজাক জ্বলছে। পথের ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছে। বাইসিক্ল চলছে। ঘণ্টা বাজছে। বাবুদের মুখে সিগারেট জ্বলছে। ও বাবা এ যে চায়ের দোকান হয়েছে। হেজাক জ্বলছে। এপাশে ইলেকট্রিক লাইট। এইটেই ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের আপিস! তারপর ময়রার দোকান। এপাশে ওষুধের দোকান। তারপরই আলোঝলমল গন্ধেশ্বরী বাজার। এখানে গোলদারী দোকান বেশী। ওঃ এটা কার দোকান? এত মনিহারী—এত আলো! ও মা কাপড়ও রয়েছে!

—এই—এই! এই শূয়ার! শূয়ারের বাচ্চা!—এই!

ফোঁস করে মালতী ঘুরে দাঁড়াল।—এই এমন করে মেয়েছেলের গা ঘেঁষে যাস। এই! —সে খানিকটা অনুসরণ করতে চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না। ওর কথায় চারিদিকের মানুষ থমকে দাঁড়িয়ে গেছে—হটে যাবার পথ নেই। একজন প্রশ্ন করলে—কী হল? কী ব্যাপার?

—ওই—ওই চলে গেল। ওই শূয়ারের বাচ্চা, ওই পাঁঠাটা আমার গা ঘেঁষে এমন করে গেল! হারামজাদা—

—কে রে? কে রে? ধর ধর ধর!

রব উঠল চারিদিকে কিন্তু ধরা গেল না। সে চলে গেছে। কোন গলিপথে ঢুকে গেছে। একজন জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কোথায় যাবে বাছা?

—গাঁয়ের ভেতর। এই গাঁয়ের আমি। আমাকে চিনতে পারছেন না কুণ্ডু মশাই? আমি মালতী—শ্রীমন্ত দাসের মেয়ে!

বৃদ্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে—তাই তো! শুনছিলাম বটে তুই ফিরেছিস। তোর চেহারাটা নাকি খুব সুন্দর হয়েছে। তা এত সুন্দর তা ভাবি নি রে! তা গিয়েছিলি কোথায় এই রাত্রে?

—কোথায় যাব! হাটে গিছলাম। দোকানের জিনিসগুলো পড়ে ছিল নিয়ে গেলাম।

—দোকান? দোকান করবি নাকি?

—তাই ঠিক করেছি। করতে তো কিছু হবে!

—তা বেশ। হ্যাঁ। যা হয়ে গেল তাতে তো আর সবার মত ঘর সংসার এসব হওয়া কঠিন। মানে বিয়ে-টিয়ে তো—। হ্যাঁ তার থেকে দোকান ভাল। তা জিনিস-পত্র দরকার হলে নিস। আমি তো এখন খুব বড় দোকান করেছি। তোর বাবা আমার কাছে নিত। তুইও নিস। এক নিবি এক দিবি।

হঠাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে গান বেজে উঠল। লাউডস্পীকারে গান শুরু হল কোথাও।

মনের রাধার কোন ঠিকানা কোন ভুবনের কোন ভবনে?
বলতে পারে কোন সজনী কোন স্বজনে!

কুণ্ডু বলে উঠল—সিনেমা ভাঙল রে। ক্যাশ মিল কর। ঘড়িতে ক'টা বাজছে?

—আটটা।

—ঠিক আছে। নে।

মালতী জিজ্ঞাসা করলে—সিনেমা বুঝি এই দিকে হয়েছে?

—হ্যাঁ! ওই সেই গন্ধেশ্বরী বিসর্জনের বাজি পোড়ানোর ডাঙাটায়।

মালতী ওখান থেকেই মোড় ফিরল। এবার তাদের পাড়ার রাস্তা। অবশ্য পাড়ায় পাড়ায় কম যেতে হবে না। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার পথ। তবু এ পথেও আলো আছে।

গানটা বেজেই চ'লেছে।

কোন নগরে কোন গেরামে কোন বিপিনে কোন বিজনে?

বলতে পারে কোন সজনী কোন স্বজনে?

বেশ গাইছে। গলাও যেমন মিষ্টি গানটিও তেমনি ভাল। বেশ গান—"মনের রাধার কোন ঠিকানা কোন ভুবনের কোন ভবনে?"

বাড়ি এসে ঢুকল সে, ডাকলে—মাসী!

চাঁপা উত্তর দিল—আস! আমি ঠাকুর শয়ান দিতিছি। বস। সে ঝুড়িটা নামিয়ে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসল। গানটা বাজছে—

ঘুরে দেশে দেশান্তরে

এলাম শেষে তেপান্তরে

রাধার দিশে পেলাম না রে, শুধাইলাম জনে জনে।

বলতে পারে কোন সজনী কোন স্বজনে?

চাঁপা বেরিয়ে এল। বললে—এমন করে বসলা মাসী?

সে একটু ম্লান হেসে বললে—গান শুনছি!

—বেশ গানটি না মাসী?

—হ্যাঁ ভাল গান। গলাটিও মিষ্টি!

—চা খাবা মাসী? চা করব?

—কর। বলে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

বেশ গানটি, সুরটি গানটি গলাখানি কেমন যেন মনটিকে ভিজে ভিজে করে দিয়েছে।

হায় কি তারে পাবো নাকো

ভুবন খুঁজে এই জীবনে—

মনের চকোর কেঁদে মল

চাঁদ উঠেছে কোন গগনে!—

প্রাণের কথায় লেখনগুলি

লিখে লিখে রাখি তুলি,

ডাকঘরে হায় নিলে নাকো ফিরে দিলে ডাক পিয়নে।

বলতে পারে কোন সজনী কোন স্বজনে?

মনটা কেমন হয়ে গেছে। মনে পড়ছে বসন্তকে। বসন্ত এল না! চাঁপা চা নিয়ে এল। গেলাস ভরতি করে নামিয়ে দিয়ে বললে—খাও।

—দাও!

—মনটা খারাপ ক্যানে মাসী?

—জানি না।

চার

আট দিন পর: পরের শুক্রবারে ভুবনপুরের হাটে মালতী বেশ ভাল করে দোকান সাজিয়ে বসল। বলতে গেলে তার কপাল খুলে গেল।

সোমবার হাটেই সে প্রথম বসেছে। কিন্তু দু' দিনে বেশ গুছিয়ে কিছু করতে পারে নি। শনিবার দিন কুণ্ডুর দোকান থেকে আশি টাকার মাল কিনেছিল। তাই দিয়েই করেছিল সোমবারের হাটে দোকান।

কুণ্ডু মশাই পঞ্চাশ টাকার বেশী ধার দিতে চায় নি প্রথমটা। কিন্তু মালতী বলে কয়ে বুঝিয়ে আশি টাকার ধারই নিয়েছে। বেগ তাকে খুব বেশী পেতে হয় নি। কুণ্ডু নিজে থেকেই শেষ পর্যন্ত অনেক বেশী ধার দিতে চেয়েছে। প্রথম ধরেছিল পঞ্চাশ। তার বেশী নয়।

সে বলেছিল—পঞ্চাশ টাকায় কী মাল হবে বলুন! ক'টা জিনিস হবে? লাভই বা কী করব?

কুণ্ডু কেঠো লোক, সে বলেছিল—তা আর আমি কী করব বল!

—আপনারা বলবেন না তো আমি কী করি?

—বিয়েটিয়ে করে ঘর সংসার করগে। দোকান করা কি মেয়ের কাজ?

রাগে নি মালতী। বলেছিল—আজকাল মেয়েতে সব করে। হাকিমিও করে। বলে হেসেছিল।

—তুই তাই করগে।

—লেখাপড়া তো সামান্য জানি। জানলে করতাম। আর বিয়ে আমাকে কে করবে?

কুণ্ডু বলেছিল—তা বটে। কিন্তু তুই টাকা না দিলে আমি কী করব? কিসে নোব? তোর বাবা তো মামলাতেই সব ফুটিয়ে গিয়েছে। বাড়িখানা ছাড়া তো কিছু নাই!

—আমি তো আছি। আমি তো পালাচ্ছি না।

—পালালেই বা ধরে রাখবে কে? যে ইনকিলাব মিনকিলাব করিস! তার ওপর যা চোখ মুখ হয়েছে। ঘরে তাগিদ করতে গেলে বঁটি নিয়ে তেড়ে আসবি। তার ওপর সেই বসন্ত লীডার আছে। বাবাঃ!

মালতী বলেছিল—তবে যাই কুণ্ডু মশায়!

—যাবি?

—যাব না তো কী করব? পঞ্চাশ টাকার মালে কী হবে? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে কী হবে?

—দাঁড়া দাঁড়া!

—দাঁড়াব?

—না, বসবি। এক কাজ করিস তো ধার দোব আমি।

—কি বলুন?

—হাটে যদি মনিহারীর সঙ্গে একটা তেলেভাজা চা সিগরেট পানের দোকান খুলতে পারিস তবে অনেক টাকার মাল দোব আমি।

অবাক হয়েছিল মালতী। বুড়ো বলে কী? কী ব্যাপার? উ—বুড়ো চেয়ে তাকে দেখছে—যেন গিলছে! সেই সুশীলা বলত—'দিষ্টি দিয়ে গেলা।' সব—সব—সব রে সব বেটাছেলে। চোখ দেখলেই বুঝতে পারবি।

বুড়ো কুণ্ডু বলেছিল—শোন, ওই শ্রীমতী আগে আমার দোকানে মাল নিত। বুঝেছিস—। আমার সঙ্গে সই সাঁতালি সম্পর্ক পাতিয়েছিল। তা এখন দোকান জমেছে, পাকা ঘর করেছে। গুমোর হয়েছে। মাল আনে এখন ওই সাঁইতে থেকে। সেখানে নিন্দে করে এসেছে—আমি গলা কাটি। এখানে পাঁচজনাকে বলে। মেয়ের দোকান—লোকে ভিড় করে যায়। তা তুই মেয়ে—সুন্দরী মেয়ে যুবতী মেয়ে—তুই যদি দোকান করিস—ওই খাবারের দোকান তো দালান দিবি দেখবি। তোর সৎমা রয়েছে। সে পারবে খাবার তৈরী করতে। একটা ছুটো ছোঁড়া রেখে দিবি। পারবি?

একটু অবাক হয়েই চেয়ে রইল সে কুণ্ডুর দিকে। বুড়োর মনের রাগটা গলাকাটা অপবাদের জন্যে—না শ্রীমতী সই সম্পর্কটা ভেঙেছে বলে ঠিক বুঝতে পারলে না। কুণ্ডুর এককালে এদিকে নামডাক ছিল রসিক মানুষ বলে। মদ খেতো, মেলা করত। মনিহারীর দোকান নিয়ে যেত মেলায়—তার কল্যাণে অঞ্চল জুড়ে মাসী ছিল পিসী ছিল দিদি ছিল মা ছিল—আবার সই সাঁতালিও ছিল। ছিল অনেক।

কুণ্ডু বলেছিল—কি, জবাব দে। পারবি না? এমন চটকের চেহারা তোর!

মালতী ফিক্ করে হেসে বলেছিল—সই পাতাতেও হবে না কি?

কুণ্ডু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তুই ছুঁড়ি পারবি। তা দেখ তোর বাবা আমাকে কাকা বলত। সম্পর্কে তুই নাতনী। পাতালে দোষ ছিল না। তবে সে যাক। সে সব দিন গিয়েছে। বয়স সোত্তর পেরিয়ে গিয়েছে। এ বছরটা কত তা বলতে নেই। আসছে বছর তেরাত্তর হবে। ও থাক।

—ভয় করছে?

—বড় কাজিল তুই ছুঁড়ি। না রে কুণ্ডুর ও ভয় নাই। কুণ্ডু কঞ্জুস ব্যবসাদার। বুঝলি। সে জলে নেমেছে, পাক কখনও মাখে নাই। তুই সে সব বুঝবি না। বোষ্টুমের মেয়ে হয়ে সই সাঁতালির রসের মর্ম তুই জানিস নে। তোরই বা দোষ কি—সে সব শুকিয়ে গেল। মজে গেল যে!

—শেখান না আমাকে ?

—তা বেশ। আগে তোর দোকান হোক। হাটে গিয়ে হাটের ধুলো তুলে তোর কপালে দিয়ে ফাগধুলোর মত হাটধুল পাতিয়ে আসব। তা হলে ওই আজ নিয়ে যা—আশি টাকার মালই নিয়ে যা। বিক্রি করে টাকা দিবি—আর ফেরত মাল যা বিক্রি হবে না মনে হবে ফেরত দিবি।

সোমবার সে শুধু মনিহারী নিয়েই বসেছিল। লোকের ভিড় তার দোকানে হয়েছিল। অনেক ভিড়। মালতী বেশ ভাল করে সেজেও ছিল। সাজসজ্জা সে জেলখানাতে শিখে এসেছিল। বহরমপুরে মেয়েদের জেলখানায় শতখানেক মেয়ে-কয়েদী থাকত। ভদ্র শিক্ষিত মেয়ে কম হলেও আট দশ জন ছিল। ক'জন বেশ্যাও ছিল। তার মধ্যে ছিল নীহারদি। লেখাপড়াজানা মেয়ে। কোন ব্যবসা আপিসে চাকরি করত। টাইপ করত। ওই আপিসের একজন খদ্দের তাকে অনেক টাকা দিয়ে কি সব কাগজ চুরি করিয়েছিল। তার জন্তে নীহারদিকে আপিসের মালিকের ছেলের সঙ্গে প্রেম করতে হয়েছিল। মালিকের ছেলে বিয়ে করে নি। তার ঘরে গিয়ে তাকে মদ খাইয়ে তার ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে নিয়েছিল—তার সঙ্গে টাকা আর হীরের দামী আংটি ছিল, তাও নিয়েছিল—লোভ সামলাতে পারে নি। ওই হীরের আংটি থেকেই ধরা পড়েছিল সে। জেল হয়েছিল আড়াই বছর। সে জেলখানাতে এমনভাবে সাজত যে সকলেই তাকে অনুকরণ করত। নীহারদি কালো লম্বা মেয়ে। তার সাজের সব থেকে বাহার ছিল চুলের কায়দায়। চুলে সে তেল দিত না। রুখু চুলগুলি ফুলে ফেঁপে মুখখানাকে ঘিরে পড়ে থাকত। হাতের চাপে চাপে তাকে ঢেউখেলানো করে নিত। নীহারদিদি টিদিরা জন কয়েক উঁচু ক্লাসের ছিল। ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস কয়েদী। প্রথম প্রথম মিশত না থার্ড ক্লাসদের সঙ্গে। তারপর কিছুদিন না-যেতেই তারাও এসে ওদের সঙ্গে মিশত। হাসত গাইত। নীহারদি তো নেচেছে পর্যন্ত। নীহারদির কাছে সে পড়ত। নীহারদি তাকে কিছু পড়িয়েছিল। আর তার নাম দিয়ে সব প্রেমের নভেল আনাত। সে পড়ত তারা শুনত। শেষদিকটায় নীহারদিদিই ছিল তার গুরু। তার কাছে সে অনেক শিখেছে।

সেই নীহারদি'র কাছে শেখা চুলের বাহার—রুখু চুল এলো করে পিঠে ফেলে সে দোকানে বসেছিল। ভিড় এসে জমেছিল। তার বেশীর ভাগ ছোকরা বাবুর দল। কিন্তু এক সিগরেট ছাড়া কিনবার জিনিস তারা পায় নি কিছু। দু' একজন ছেলেদের নাম করে দুটো মারবেল দুটো পেন্সিল কিনেছিল। ইস্কুলের ছোকরারাও ভিড় করেছিল। ইস্কুলের মেয়েরাও এসেছিল। তারা বরং কুম-কুম কাঁটা ফিতে চুলের ক্লিপ কিছু কিনেছিল। একজন ছোকরা বাবু তো তাকে স্পষ্ট করেই বলেছিল—দোকানে কিনব কি গো ?

অনেক পিছন থেকে কে বলে উঠেছিল—দোকানদারনীকেই কিনুন না।

—কে রে—উল্লুক ইতর! বক্তা বলে উঠেছিল।

মালতী রাগে নি। সে হেসে বলেছিল—হাটের কথা ধরতে নেই বাবু—ও ছেড়ে দিন।

আবার কে বলে উঠেছিল—ভুবনপুরের হাট বাবা। বাবা ? ভুবনপুরের হাট বাবা ?

বুকের বেথা নিয়ে যাবা।
দুখের বদলে সুখ পাবা।

মালতী হেসে বলে উঠেছিল—জয় বাবা ভুবনপুরের জয়!

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হেসে উঠেছিল। কিন্তু ভদ্র লোকটির মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন—বড় অভদ্র সব এখানে।

মালতী বলেছিল। আপনি রাগ করছেন কেন বাবু! এখানকার হাটের এটা পুরনো ছড়া।

মন কিনলে মন বিকায়
তেতোর বদলে মিষ্টি পায়।

—অনেক বড় ছড়া। তা কিনুন না বাবু কিছু যা হোক কিনুন। কিছু লাভ করি। ঘরে গিয়ে হিসেব করব আপনাকে মনে করব।

ধরণী দাস অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার প্রগল্‌ভতা শুনছিল আর দেখেছিল। সেদিন যে মেয়েটিকে দেখেছিল এ তো সে নয়। এ আর একজন। এর সংকোচ নেই লজ্জা নেই একেবারে—কি বলবে?—একবারে, কথা সে খুঁজে পেলে না। পেলে খুঁজে।—এ মেয়ে সাংঘাতিক! এ মেয়ে সব পারে!

ভদ্রলোক কিনেছিলেন সব মারবেলগুলো, আর কিনেছিলেন প্ল্যাস্টিকের সস্তা খোঁপার ফুল। সাঁওতাল মেয়েদের দেবেন! আর মারবেলগুলো রাস্তার ছেলেদের।

সে দিন সবসুদ্ধ টাকা দশেক বিক্রি হয়েছিল। কয়েক আনা কম।

ধরণী দাস হাট ভাঙবার সময় বলেছিল—তুমি পারবে মা।

মালতী হেসে বলেছিল—দেখি জেঠা। তবে মনিহারী চলবে না। এ পাড়াগাঁয়ে ফিরি না করলে লাভ হবে না। অন্য কিছু করব। আপনার দোকানে বসা হবে না!

—কী করবে?

—দেখি!

হাটের বোঝাটা গুটিয়ে সে উঠছে এমন সময় ডুগডুগি বেজে উঠেছিল—লাল একটা ঝাণ্ডা উড়িয়ে তিন-চারজন ছোকরা এসে মুখে চোঙা লাগিয়ে বলে গেল—মিটিং হবে। কাল এই হাটে জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতার প্রতিবাদে সভা হবে। জবরদস্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলবার উপায় নির্ধারণ করা হবে। কম্যুনিস্ট নেতা বিমল ঘোস বক্তৃতা করবেন। দলে দলে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান করছি।

মালতী একবার যেন চমকে উঠেছিল। মিটিং হবে। সে আসবে না? সে তো কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছে। সে?

পরক্ষণেই সে বলেছিল—আমি একটু আসছি কাকা। বলেই সে ভাঙা হাটের ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। হাট পার হয়ে ভুবনেশ্বরতলাকে ডাইনে পাশ কাটিয়ে গিয়ে ঢুকেছিল সেই জঙ্গলের মধ্যে। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে গাছটার কাছে। অন্ধকারে ঠাওর করতে পারে নি। হাত বুলিয়ে দেখতে চেয়েছিল কাঁটা আছে কি না পাতার মধ্যে

ডালের গায়ে। কাঁটা থাকলে সেটা কুঁচলতা হবে। অল্পবয়সী একটা অশত্থগাছে কুঁচের লতা উঠেছিল—তাতেই সে কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে ঢেলা বেঁধেছিল। কাঁটা হাতে ঠেকেছিল কিন্তু ঢেলাটা আছে কি না বুঝতে পারে নি। একটা টর্চ নিয়ে এলে হত।

ফিরে এসে হাট থেকে বেরিয়ে গন্ধেশ্বরীতলা হয়ে কুণ্ডু মশায়ের সঙ্গে দেখা করে সে বলে এসেছিল—তা হলে আমি ওই দোকানই করি দাদু?

—দাদু বলছিস? ছলা করে না সত্যি?

—এই দেখুন—ছলা করে কেন বলব?

—বিশ্বাস নেই। জানিস বুড়ো বয়স হলে ছুঁড়িরা ছলাকলা করে ঠকাতে চায়। রাত্রিবেলা—চোখের নজর খাটো। ঠিক তো ধরতে পারছি না মুখ দেখে।

মালতী নিজের মুখখানার উপর ইলেকট্রিক আলোটা পুরো ফেলে বলেছিল—দেখুন।

—উঃ! তুই সহজ পাত্র নস। রাতের আলোয় কালোকে গোরো লাগে। তার ওপর বুড়োর চোখে যুবতী মেয়ে! দাদু হব কি না আজ বলব না। কাল বলব। না কাল নয় দশ দিন পরে বলব। তবে কাল আসিস। তোর রূপে মজি নাই, তোর মায়ায় গলি নাই। আমার রাগ ওই শ্রীমতীর ওপর, বুঝলি না। বিধবা হল মেয়েটা—চটক ছিল মুখ ছিল আর দুখ ছিল না। আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত। বয়স আমার ছিল তখন—আর ওই ভালবাসতাম রস মস্করা। লোকে মন্দ বলত ওকে। স্বামীর সামান্য দোকান ছিল। আমার কাছে এসে বলেছিল—বেয়াই আর তো চলে না। ওকে আমি বলতাম বেয়ান; ও বলত বেয়াই। আমি বলেছিলাম—দোকান কর ভাল করে, আমি মূলধন দিচ্ছি ধারে মাল। সেই কিনা বলে আমাকে বুড়ো! আমি গলাকাটা মহাজন! আমি খুঁজছিলাম যুবতী মেয়ে—মুখোল চোখোল—দোকানে বসলে বোলতার ঝাঁক জমবে—তা না মেনেও তার অধিক খদ্দের জমবে। তোর দুই আছে। তোর বিয়েটিয়ে হবে না। কেউ করবে না। শেষ অটালে অপথে যাবি—তার চেয়ে দোকান কর। কাল আসিস।

এই কথাগুলি ভাল লেগেছিল মালতীর। বুড়ো হুঁশিয়ার বটে—স্পষ্টাস্পষ্টি কথাও কয়। সে বলেছিল—বেশ তাই হল। কাল আসব।

—কি কি লাগবে ফর্দ করে আনিস।

—তা কি আমি জানি দাদু। সে আপনি করে দেবেন।

—এই মরেছে। তোকে বসতে বললে যে গলা জড়িয়ে ধরে বসতে চাস।

—বসলেও ডান দিকে বসব দাদু—বাঁয়ে বসব না।

—বলিহারি, বলিহারি। খুব বলেছিস। তা আসিস—তাই হবে।

পরের দিন সকালে কুণ্ডু কড়াই গামলা পেতলের থালা ছাকনা হাতা চাকা বেলন বঁটি থেকে সব কিনে দিয়েছিল। মায় একখানা ছোট বেঞ্চি একখানা বড় বেঞ্চি, তার সঙ্গে ছোট একটা টেবিল একখানা লোহার চেয়ার দুটো টুল পর্যন্ত। বড় বেঞ্চিতে রেখে ছোট বেঞ্চিতে বসে লোকে খাবে, মালতী চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর কাঠের বাক্স রেখে পয়সা নেবে, টুলে বসে উনোনে খাবার তৈরী করবে। তা ছাড়া দুখানা কাঠের বড় পরাত খান দুই ছোট পরাতও

কিনে দিলে। নিজে হাটতলায় গিয়ে ছুতোর ডাকিয়ে বাঁশ কাঠ দিয়ে ফ্রেম তৈরী করিয়ে, বাড়ির থেকে টিন দিয়ে ঘিরে ছাইয়ে দু'দিনের মধ্যে ঘর তৈরী করে দিলে। মেঝের উপর খুব যত্ন করে ইট বিছিয়ে জোড়গুলো সিমেন্টের পয়েন্টিং করে মেরে দিয়ে বললে—নে এইবারে কম্‌পিলিট।

প্রথম দিন শ্রীমতী প্রথমটা খানিকটা হতভম্ব গোছের হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে খোদ কুণ্ডুকে দেখে। তারপর ব্যাপারটা আঁচ করে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল—এসব কি হবে?

সেটা মঙ্গলবার দশটা নাগাদ। কুণ্ডু বলেছিল—বাঘের বাজি হবে।

—বাঘের বাজি? অবাক হয়েছিল শ্রীমতী।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বাঘ না বাঘিনী। মালতীর দোকান হবে। মালতী আমার জায়গাটা ভাড়া নিয়েছে। দোকান করবে।

—মনিহারী?

—চপ কাটলেট সিঙাড়া কচুরি চা—পান সিগারেট। তার সঙ্গে থাকবে দু চারটে মনিহারী। বিস্কুট। পাউরুটি।

—হুঁ। তা—। চুপ করে গিয়েছিল শ্রীমতী। তারপর নিজের দোকানে গিয়ে এক অজ্ঞাতজনকে বাক্যবাণে জর্জরিত করবার জন্য চোখা চোখা বাণ নিক্ষেপ শুরু করেছিল।—সেই বলে যে এল্লত যায় না ধুলে। এই বুড়ো বয়স। এই এক বছর বুড়োর পরিবার মরেছে। বাড়িতে আধবুড়ো বেটা গিন্নাবান্নী বড় নাতিপুতি—তার না কি আঠারোবছুরী বষ্টুমী সাজে? ছি-ছি-ছি! লজ্জার ঘাটে আর মুখ ধোও নাই। যমের বাড়ি গিয়ে জবাব দেবে কি?

কুণ্ডু বুড়ো রাগে নি। খিকখিক করে হাসতে শুরু করেছিল। —খি-খি-খি। খি-খি-খি।

কিছুক্ষণ পর চলে যাবার সময় মালতীকে বলে গিয়েছিল—কাজ করিয়ে নে পছন্দ করে। হ্যাঁ! আর খবরদার মেজাজ খারাপ করিস নে। খবরদার।

কুণ্ডুর একখানা রিকশা আছে। সেই রিকশাখানায় চেপে চলে গিয়েছিল। মালতী এবার গিয়েছিল ওই বটগাছ-তলার দিকে যেখানে ঘন জঙ্গলের মধ্যে কাঁচাবয়সী অশথ-গাছটায় কুঁচলতা উঠেছে। লতাটা ভরে ফাটা শুকনো ফলের মধ্যে দানার মত লাল কুঁচ থরে থরে থরে রয়েছে। অনেক পাশ ফ্যাকড়া বেরিয়েছে। তার মধ্যে হালের বাঁধা দু-দশটা ঢেলা ঝুলছে কিন্তু পুরনো ঢেলা কই? পিছন দিক দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সে। এবার নজরে পড়ল—হ্যাঁ রয়েছে; ঝুলছে পুরানো ঢেলাগুলো! তারটা? কই তারটা? লম্বা মত এক ঘুটিং। বেশ মাঝে খাঁজ আছে। বেছে বেছে পছন্দ করে কুড়িয়ে এনেছিল সে। যেন খসে পড়ে না যায়। কই? দড়িটাও শক্ত দড়ি ছিল। তার শক্ত কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে বেঁধেছিল।

ঢেলা খসে পড়ে গেলে বুঝতে হয় সে কামনা পূর্ণ হল না। বাবার ইচ্ছে নয় পূরণ করার। আর না খসলে বুঝতে হয় পূর্ণ হয়নি কিন্তু পূর্ণ হবে। পূর্ণ হলে নিজে হাতে ঢেলা খুলে দিয়ে যেতে হয়।

ঢেলাটা ঝুলছে।

খুশী মন নিয়ে ফিরে এসেছিল সে। পথে সেদিন ভুবনেশ্বরকে প্রণাম করেছিল।—বাবা ভুবনেশ্বর মনের বাঞ্ছা পূরণ করো! তার মনের মধ্যে ভুবনেশ্বরতলার সেই পুরানো গান গুঞ্জন করে উঠেছিল।

শ্রীমতী তখনও বাক্যবাণ বর্ষণ করে যাচ্ছে। এবার তার উপর। বেশ বলে শ্রীমতী। খাসা বলে। ওর তীরগুলো বেঁকে গিয়ে মানুষকে লক্ষ্য বেঁধে। মানুষ পুব দিকে থাকলে ও দক্ষিণ মুখে দাঁড়িয়ে পশ্চিম কোণ মুখে তীরটা ছাড়ে। তীরটা বেঁকে পাক খেয়ে পশ্চিম থেকে উত্তর, উত্তর থেকে পাক খেয়ে পুব মুখে এসে মানুষকে বেঁধে। বুকে বেঁধে। লালঝাণ্ডা-ওলারা মিটিং করবে ওবেলা—তারা শ্রীমতীর চেয়ে ভাল বলতে পারবে না।

বেশ বলেছে—নব যুবতী, নব যৌবন। তাই ভাঙিয়ে খাবি তো মরতে ভুবনপুরের হাটে তেলেভাজা নিয়ে বসলি ক্যানে? যা না বাবু শহরে যা বাজারে যা। এমন রসিক বুড়ো এখানে একটা—তাও মিন্‌সে গলাকাটা কিপ্‌টে। সেখানে গণ্ডায় গণ্ডায় পাবি!

* * *

শুক্রবার হাটের দিন সকালবেলা দোকান খুলেছিল। আমের শাখা টাঙিয়েছিল। দুটো কলসী দিয়েছিল জলভরা। তার উপরে দুটো শুকনো নারকেলও পাঠিয়ে দিয়েছিল কুণ্ডু মশায়। ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাদের একজনকে ডেকে তাকেই প্রথম চা খাইয়েছিল। চায়ের প্রথম খদ্দের হয়েছিল কুণ্ডু নিজে।

চাঁপা মাসীর এতে খুব মত ছিল না। সে বলেছিল—মালা এ তুমি কি করছ আমি বুঝি না। ভাল লাগে না আমার। কুণ্ডু মশায়কে নিয়া দু দশজনে যা কইত্যাছে তা ভাল না মাসী!

—কি বলছে? কৌতুকভরে সে প্রশ্ন করেছিল। সে তা অনুমান করতে পারে। কুণ্ডু বুড়ো এইভাবে তাকে দাদনের ধারের প্যাঁচে ফেলে শেষ পর্যন্ত তাকেই কিনে বসবে।

চাঁপা বলেছিল—তা তুমি বুঝ না? শুন নাই শ্রীমতীর মুখে?

—শুনেছি। তা দেখি না খেলে!

—না না। ই ভাল না। অর সঙ্গে খেলা যায় না!

—যায়। আমি পারব! আমি খুনে মেয়ে মাসী!

—মালা! হাতজোড় করি তোমারে!

—বেশ, তোমাকে যেতে হবে না মাসী। তুমি যা করছ তাই কর। তোমাকে টানব না আমি। কিন্তু আমি এ সুযোগ ছাড়ব না। আমি করব কি বলতে পার? হ্যাঁ। আছে। ওই শ্রীমতী বলেছিল বাজারে গিয়ে রূপ যৌবন ভাঙিয়ে খেতে। বল, তাই যাব?

—খেটে খুটে খেতে পার মাসী। এই তো কাল দে'য়া কইছিল—তোমার সখী গোপার বাবা। কইছিল—কিছু শিক্ষা করলে পারত। হাসপাতালের কাজ, সিলাইয়ের কাজ। সরকার থেক্যা সিলাইয়ের কল কিনবার টাকা মিলত। এ দোকান করা—।

—উঁহু মাসী। এ আমার নেশা লেগেছে। তুমি না-পার—

—আমার পারা না-পারার কথা না মাসী।

—তবে আবার কি? বউমের মেয়ের ভিখ মেগে না খেলে অধর্ম হবে?

—তাও না মাসী!

—তবে কী?

—ঠিক বুঝাবারে পারছি না। তুমি এই সব করবা—ঘর-সংসার করবা না?

—ঘর-সংসার? মানে বিয়ে? তা জানি না মাসী।

—তার আশায় তুমি থাইক না।

—না হয় থাকব না।

—না হলি?

—মাসী, গাঁয়ের মেয়েদের ইস্কুল হয়েছে। দেখেছ দিদিমণিদের? তারা ক'জনে বিয়ে করেছে?

—সে আমি ভাবি মালতী। হদিস পাই না।

—আমার হদিসও খুঁজো না মাসী।

—অরা বিদ্যা নিয়া থাকে—

কথা কেড়ে নিয়ে মালতী বললে—আমি এই নিয়ে টাকা নিয়ে থাকব। তুমি বকো না। এখন বল—কাজ ছেড়ে দিয়ে দোকানের কাজ করবে? না লোক দেখব আমি?

—তোমার কাজই করব মাসী। তোমারে কন্তের মতন, ছোট বোনের মতন পেলেছি। ভালবাইসা ফেলেছি মায়ের মতন। তোমার কামই করব!

বিকালবেলা হাটের সময়। দুপুরবেলা থেকে তারা দোকানে এসে খাবার তৈরী করতে শুরু করেছিল। কুণ্ডু প্রথম দিনের জন্তে একজন ঠাকুরকে পাঠিয়ে দিয়েছিল যে সিঙাড়া কচুরির কাজ জানে, তেলেভাজা ভেজিটেবল চপও করতে পারে।

শ্রীমতীও তার দোকান বেশ করে সাজিয়েছে। কতকগুলো রঙিন কাগজের মালা এনে টাঙিয়ে দিয়েছে। আর একটা করেছে—ওই আধকানা খোঁড়ার মেয়ে চুনারিয়াকে ফর্সা কাপড়চোপড় পরিয়ে তার দোকানে বাহাল করেছে।

চুনারিয়ার বাবার একটা মোটা কালো দড়ির মত পৈতে চিরকাল আছে। বলে—হামি ব্রাহ্মণ। তার মেটে রঙ—চুনারিয়ার তামাটে রঙ তার কথার সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়। সে বামুন না বেদে না কি এ কথা কোন কালে কেউ প্রশ্ন করে নি। আজ সেটাকে কাজে লাগিয়েছে শ্রীমতী। চুনারিয়া রাত্রিকালে সেজেগুজে ঘুরে বেড়ায় পথে পথে, ভুবনেশ্বরতলার অশথ বট বেলের জঙ্গলে—এও সবাই জানে। কিন্তু ভুবনপুরের হাটে ও কথা কেউ তুলবেই না। চুনারিয়া দোকানে চা দেবে বাসন ধোবে। লোককে জিজ্ঞাসা করে বেড়াবে—আর কি লিবেন বাবু? সঙ্গে সঙ্গে মুচকে হাসবে। কিন্তু শ্রীমতীর ভুল। চুনারিয়া ভুবনপুরের হাটে ধুলোর সামগ্রী। ও মানুষের চোখে পড়েও পড়ে না। মালতীর মোহ তার থেকে অনেক বেশী।

টিকুলি তার কাছে এসেছিল। বলেছিল—আমাকে রাখ তুমি।

মালতী হেসে বলেছে—কী করবি ? তোর হাতে তো কেউ খাবে না।

টিক্‌লি বলেছিল—খাবে না। তবে লোক ডাকব। এই দোকানে এসো। আর এঁটো বাসন ধোব। লোক আসবে। বলে হেসেছিল।

মালতী তাকে নিয়েছে। বলেছে—থাক।

ভুবনপুরের হাট। এ হাটে সব বিকোয়—সব চলে।

চেয়ারে বসে হাটের দিকে তাকিয়ে ছিল মালতী। মনে তার সত্যই একটা নেশা। হয়তো কাজের নেশা। তার সঙ্গে ভবিষ্যতের নেশাও বটে। বেশ লাগছে তার। সকালবেলাতেই চা সিঙাড়া সিগারেট বিস্কুট বেশ বিক্রি হয়েছে। লোক সকালবেলা থেকেই আছে। খদ্দের নয় হাটুরে। গাড়ি করে যারা মাল নিয়ে আসে। ট্রেনে যারা স্টেশনে নেমে মুটে করে, ভাড়াটে গাড়ি করে মাল নিয়ে আসে তারা এসেছে। খদ্দেরও কিছু কিছু এসেছে। তাদের হাট করা ছাড়াও কাজ আছে। কারুর কাজ আছে থানায়, কারুর কাজ আছে রেজেস্ট্রি আপিসে, কারুর আছে বি-ডি-ও আপিসে; কারুর আছে ইস্কুলে কারুর মেয়ে ইস্কুলে। মেয়েরা পড়ে বোর্ডিংয়ে থাকে—তাদের সঙ্গে দেখা করবে। কেউ গ্রাম থেকে চাল যোগায় বোর্ডিংয়ে। সকালে যারা এসেছে, যারা হাটতলার সামনে দিয়ে গেছে তারাই থমকে দাঁড়িয়েছে টিনের তৈরী নতুন দোকান এবং দোকানের দোকানদারনীকে দেখে! একেবারে শহুরে মেয়ে! তারা সকলে এসে চা খেয়ে গেছে। সিগারেট খেয়ে গেছে। কুণ্ডু মশায় হিসেবী লোক। সিগারেট দিয়েছে বিশ বাক্স। আর বেশীর ভাগ দামী সিগারেট। বলে দিয়েছে—সস্তা রাখবি নে মালতী। তোর দোকান সস্তার নয়। টিক্‌লিকে রাখছিস রাখছিস—ওকে সাজাবি নে। ও ঝি—ঝিয়ের মত থাক। হুঁ!

সকালবেলা চল্লিশ কাপ চা বিক্রি হয়েছে। সিগারেট পুরো এক টিন। পঞ্চাশটা সিগারেট। বাক্সও চার বাক্স। বাক্সের সঙ্গে টিনও কটা দিয়েছে কুণ্ডু। টিন হলে ইজ্জত বাড়ে, আর খোলা খুচরো সিগারেট বেশী বিক্রি হয়। হিসেবটা বুঝিয়ে দিয়েছিল কুণ্ডু।

আলুওয়ালারা গাড়ি থেকে বস্তা নামিয়ে ঢেলে চুড় দিয়ে সাজাচ্ছে। তামাকওয়ালারা এসে গেছে। কাটোয়ার ফলওয়ালারা টবের বাক্সের ওপর ফল সাজাচ্ছে। ফিতে কার ক্লিপ ফিরিওয়ালা এসেছে। তারা গাছতলায় বসে বিড়ি খাচ্ছে। তাকাচ্ছে তার দোকানের দিকে। টিক্‌লি তাদের মধ্যে মধ্যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। শ্রীমতীর ওখান থেকে চুনারিয়াও ডাকছে। হাসছে। এই একদল আট-দশজন হাটুরে বোঝা মাথায় এসে ঢুকল। পাশের গাঁয়ের নামকরা চাষীর দল। ভুবনপুরের হাটে ওদের বেগুন মুলোর জন্যেই বেগুন মুলো বিখ্যাত।

চাঁপা মাসী বললে—মাসী অই আকুলের মাঠের বেগুন আইল। বেগুনীর লাইগা বেগুন কিন্না লও। লম্বা গোল বেগুন। লম্বা ফালি গোল চাকতি দুই ভাল হবে।

মাসীর নেশা ধরেছে। প্রথম এসে চুপচাপ কাজ করছিল। মধ্যে মধ্যে থমকে কাজ বন্ধ করে কিছু ভাবছিল। এখন সে ঘোর কেটে গেছে। কথা বলছে টিক্‌লিকে। বরাত করছে। কাজ করছে।

সে বললে—যাও না। বেছে পছন্দ করে নিয়ে এস।

ওই এল চ্যাটাইওয়ালীরা। ওই ওরা মুসলমান মেয়ে খেজুর চ্যাটাই আনছে। ওই মোড়া ঝুড়ি ঢুকছে।

মাসী টাকা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মালতী বললে—শোন।

—কী?

—ঝাল দেখে লঙ্কা এনো। আর—

—কও।

—দুখানা রঙকরা খেজুর চ্যাটাই আর মোড়া—তা সে হাটের শেষে কিনলেই হবে।

ওই আসছে মনিহারীওলা একজন। পুরনো লোক—তার বাপের আমলের। ও-ও মাছ ধরবার সরঞ্জাম বেচত। এখনও বেচে। ওই ধরণী জেঠা। ওই জামা-কাপড়ওয়ালারা ঢুকছে। ওই ঢুকছে বইওলা দুজন। ওই রঙীন পট ছবিওলা। ওর কাছে খানকয়েক ভাল মেয়ের ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার কিনতে হবে। টাঙিয়ে দেবে টিনের দেওয়ালের গায়ে গায়ে। ওই ঢুকছে আর একদল হাটুরে। ওই দুখানা গাড়ি লাগছে। কুমড়ো লাউ বোঝাই গাড়ি—এরা সব ময়ুরাক্ষীর ধারের। ওই বাঁধাকপির গাড়ি। এবার হুড়হুড় করে ঢুকছে হাটুরেরা। ঢুকবার মুখেই থমকে দাঁড়াচ্ছে—হাটের মাটিতে আঙুল ঠেকিয়ে সেই ধুলোমাখা আঙুল কপালে ঠেকিয়ে হাটে ঢুকছে। ছুটে ঢুকছে। ভাল জায়গা দখল করবে। এরা সব মুসলমান। ভাল ভাল চাষী। আর ব্যবসাতেও খুব সৎ। ওদের মাল অবিক্রি যায় না। প্রবাদ থাকলেও আজ আর ভুবনপুরের হাটের সে নিয়ম নেই যে অবিক্রি মাল হাটের মালিকেরা কিনে নেবে।

ওই একদল সাইকেল চড়া খদ্দের এল। সব সাইকেল ধরে হাটে ঢুকছে। রাখবে ওই কাঠের দোকানের সামনের বটতলায়। শেকল জড়িয়ে তালা দিয়ে রেখে হাটে ঢুকছে। ওই ওরা এই দিকে তাকাচ্ছে। তাকে দেখছে। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটল তার। একটু সরস কৌতুক মনের জমিতে ঘাসের পাতার মত গজিয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল। এলোচুলের রাশিটাকে একবার মাথা ঝাঁকি দিয়ে সামনেটায় হাত বুলিয়ে ঠিক করে নিলে। কাঁধের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে আবার বসল।

পিছন থেকে টিকুলি বললে—ওই একদল আসছে।

—দেখ চায়ের জল ঠিক ফুটছে কি না।

কয়লার উনুনে মস্ত একটা এ্যালুমিনিয়মের ডেকচিতে জল ফুটছে চায়ের। টিকুলি বললে—টগবগ করে ফুটছে জল।

মালতী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে—কড়াই চড়াবেন ঠাকুর মশায়, না যা ভাজা আছে তাই দেবেন?

ঠাকুর বললে—ওই ঠিক আছে। কড়াই তো এই নামিয়েছি।

এক সঙ্গে আটজন এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে। মালতী বললে—আসুন।

তারা এসে বসে পড়ল বেঞ্চের উপর। বড্ড ঘেঁষাঘেঁষি হচ্ছে একজনের জায়গা হচ্ছে না।

মালতী নিজের চেয়ারখানা এগিয়ে দিলে। —বসুন

যে দাঁড়িয়েছিল সে বললে—নতুন দোকান করলেন ?

—হ্যাঁ। আপনাদের ভরসাতেই করলাম।

ছোকরা বিগলিত হয়ে বললে—নিশ্চয়। আমরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে তাই তো বলছিলাম। পুরানো দোকানটা ওই শ্রীমতীর—ওটা নোঙরা। এখানে আর দোকান ছিল না বলেই খেতাম। সুন্দর দোকান করেছেন। বেশ পরিষ্কার।

হাসি পাচ্ছে মালতীর। সে হাসি চেপেই বললে—কী দেব ?

—চা দিন তো আগে।

—না, একটা করে সিগারেট দিন আগে। বাঃ ক্যাপস্টান রেখেছেন গোল্ডফ্লেক রেখেছেন। দিন একটা করে ক্যাপস্টান দিন।

—আর খাবার ? চপ আছে। দেব ?

—চপ ? বাঃ! ওদের বেগুনী তেলেভাজা সার। দিন দিন!

টিকুলি ফিকফিক করে হাসছে। একজন বললে—আরে এ কী করছে এখানে ?

—ও এঁটো বাসন ধোয়।

—খাবার চোর না তো ?

—না না। গরীব মেয়ে—

—গরীব ?

—ক্যানে গো ? আমি বড়লোক নাকি ? উঃ। টিকুলি বলে উঠল। তারপর হঠাৎ ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল—উঃ আমি ছোটলোক। টিকুলি ছোট জাত—

—এই চুপ! যা এখন বাইরে বোস। যা!

টিকুলি বাইরে গিয়ে বসল।

হঠাৎ হাটের কলরব ছাপিয়ে গ্রামোফোন বেজে উঠল।

> ভুবন হাটে সওদা এনে আমার হারালো মূলধন!
> তেল লবণের পোঁটলা বাঁধলাম হারালাম রতন।
> সখি রে—খুঁজে পাই না আমার মন।

কোথায় বাজছে ? প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে খুঁজতে লাগল মালতী, কোথায় বাজছে গ্রামোফোন ? শ্রীমতীর দোকানে ? টিকুলি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে—তাই। ওখানেই বাজছে।

ও। শ্রীমতী গ্রামোফোন বাজিয়ে খদ্দের টানছে। হাসলে সে।

যতই বাজাও শ্রীমতী, তোমার মূলধন হারিয়েছ সজনী! সে কথা বলে কাঁদালেও লোকের মায়া হবে না।

> হাটে এসে ঘাটে বসলাম ঝাঁপ দিলাম জলে—
> এক ডুবেতে মানিক পেলাম (তাতে) রূপ যৈবন ঝলে।

ফের ডুবে হারাল মানিক গেল রূপ যৈবন—
আমার হারাল মূলধন।
ভুবন হাটে সওদা এনে আমার হারাল মূলধন।
শূন্য হাটে কেঁদে কেঁদে গেল রে নয়ন!

একজন বলে উঠল—সেই! মনের রাধার! নবীন বাউল!

—মনের রাধা?

—নিশ্চয়ই!

—ওর তো 'মনের রাধা' একখানার কথাই জানি!

—এটাও। বাজি রাখ। বেশী না—একবাক্স সিগারেট!

ওদিকে সামনে খদ্দের এসে দাঁড়িয়েছে। ছোকরারা বেশ! ওঠবার নাম নেই! কথাগুলো বলছে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। মালতী হাসলে। বেশ লাগে! খারাপ লাগে না। কিন্তু বেশ লাগলে তো চলবে না। সে টিকৃলিকে বললে—বসে কী করছিস? গান শুনলে চলবে? বাসনগুলো ধুয়ে ফেল। নতুন খদ্দের এসেছে। শুনছিস!

টিকৃলি এসে দাঁড়াল বেঞ্চির সামনে। মালতী নতুন খদ্দেরদের বললে—এই যে এঁদেরও হয়ে গেছে। একটু দাঁড়ান। ওঁরা উঠুন।

বাধ্য হয়ে তারা উঠল। নতুন খদ্দের এসে বসল। টিকৃলি খাবার বেঞ্চের উপর ন্যাতা বুলিয়ে দিল। ওরা একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। বুঝলে মালতী। সে বললে—দাঁড়ান আমি একবার মুছে দি। এগিয়ে গেল সে। একজন বলে উঠল—থাক থাক এই হবে।

—হবে? দেখুন! না হয় তো আমি আর একবার মুছে দি।

একজন বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ শহরে যারা চা দেয় দোকানে তাদের জাত কে দেখে? আর জাত গিয়েছে বাবা। সাহেবরা জাত মারা আরম্ভ করেছিল—দেশ স্বাধীন হয়ে খতম হল। নাও বস।

—কি দেব? খাবার কিন্তু টিকৃলি ছোঁয় না। ওসব ঠাকুর তৈরী করছে। আমরা দিচ্ছি!

চাঁপা বেগুন ফালি করছিল, সে বললে—আমরা খুব শুদ্ধ করে সব করি। আর বষ্টম ব্রাহ্মণের দাস। আমাদের হাতে খাইতে দোষ কি। তা ছাড়া ই তো তাও নয়।

প্লেটে চপ সাজাতে লাগল মালতী। কড়ায় বেগুনী ভাজা হচ্ছে। ওরা বেগুনীর বরাত করলে।

ওদিকে হাটে গোলমাল উঠল। ছুটো লোকের মাথার চুল ধরে টানছে চাল-ধানের কারবারী বামুনদের ছেলে জগন্নাথবাবু। টেনে হাটের বাইরে নিয়ে যাবে। লোকজন সেই দিকে তাকিয়ে আছে। কতক লোক হাট-করা ছেড়ে ওই দিকেই চলছে।

কি হল? মালতী তাকিয়ে রইল। খদ্দেররাও ওই দিকে তাকিয়ে খেতে লাগল। টিকৃলি ছুটে বেরিয়ে গেল।

মালতী হেঁকে বললে। শিগ্‌গির ফিরবি টিক্‌লি!

দোকানের ভিতর থেকে একজন খদ্দের হাটের একজনকে জিজ্ঞাসা করলে—এই সুরন্দ, কি হল হে?

সুরন্দ দোকানের সামনে দিয়েই যাচ্ছিল, সে দাঁত মেলে হেসে বললে—পিক্‌পকেট। পকেটকাটা! হাতে হাতে ধরেছে জগন্নাথবাবু।

—মার—মার শালাদের। এল কোথা থেকে? এখানকার?

—না, হিন্দুস্থানী। বেটারা হাটে হাটে ঘোরে। আজ সকালে ট্রেনে এসেছে বোধ হয়। ফিতে কারওয়ালা একজন বলছিল— পরশু সাঁইতেতে দেখেছে। সাঁইতের হাটে সেদিন একজনের আশী টাকা গিয়েছে। ওই বেটারাই নিয়েছিল।

মালতী চুপ করে বসে রইল। তার জেলখানার কথা মনে পড়ছে। আধবয়সী ভুবন আর ছুকরী সন্ধ্যা পকেটকাটার দায়ে জেলে এসেছিল। গল্প করত তারা। জেলখানায় কেউ লুকোয় না কিছু।

খুব জটলা হয়েছে লোক দুটো আর জগন্নাথবাবুকে ঘিরে। হঠাৎ কানের এপাশ থেকে ডুগডুগি বেজে উঠল। খুব জোরে বাজাচ্ছে। বাজিকরদের ডুগডুগির মত। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে মালতী। বাজিকরই বটে। একটা ভালুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমগাছতলায়।

—ওরে বাবা! জান মালতী দিদি! ওদের তিন রকম পোশাক পরা।

টিক্‌লি ফিরে এসেছে। খদ্দের একজন জিজ্ঞেস করলে—তিন রকম কি?

টিক্‌লি বললে—ওই তো ওপরে পাজামা—তার ভিতরে হাফ পেণ্টল—তার নিচে কাপড় পরে আছে!

—কি পেলে?

—মেলাই জিনিস পেয়েছে। পুলিসে দেবে!

—আবার পুলিসে ক্যানে রে বাবা—ভুবনেশ্বরের দরবারে। এখানে তো নগদানগদি শোধ হল বাবা। দুখের বদলে সুখ, মনের বদলে মন। চুরির বদলে মার। সে তো পেয়ে গেল। আবার পুলিসে ক্যানে।

—তা যাই বল তুমি। ভুবনেশ্বরের হাটের সে মাহাত্ম্যি এখনও আছে। সেদিন সুখো ঘোষাল কাঁদছিল মেয়ের বিয়ে ভেঙে গেল বলে। কেমন তো! কাল সুখো ঘোষালের সঙ্গে দেখা। খুব ব্যস্ত হয়ে চলছে। আমি মাঠে ধান কাটা দেখছি। জিজ্ঞাসা করলাম—ঘোষাল, কোথা হে এমন হনহন করে? বেশ ফুর্তি ফুর্তি লাগছে! তা ঘোষাল একগাল হেসে বললে—তা ফুর্তি বটে ঘোষ। মেয়ের বিয়ে পাকা হয়ে গেল—একবারে বাবার থানের সিঁদুর নিয়ে লগ্নপত্র করে লিখে দিয়েছে। হাতজোড় করে পেনাম করে বললে—বাবার মাহাত্ম্যি মিথ্যে লয় ঘোষ। সেদিন হাটে গেলাম—বাবার ওখানে খুব কাতর পেনাম করে বললাম—বাবা, তোমার এখানে কষ্টে দায়ে পড়ে এসেছি তুমি উদ্ধার কর। তারপরেতে গন্ধেশ্বরীতলার বাজারে দে'দের দোকানে চাটুজ্জের সঙ্গে দেখা। দে মশায় জানত ব্যাপারটা। সে মাঝখানে থেকে পড়ে কথা বলে দিলে পাকা করে। চাটুজ্জের ছেলে ওর এক মাস্টারনীকে দেখে মনে

মনে ক্ষেপেছিল—তাকেই বিয়ে করবে। চাটুজ্জে আমার কাছে পেকাশ করে নাই কিন্তু বলে ফেললে দে'কে। দে ওর ছেলেকে ডেকে বুঝিয়ে ধমক দিয়ে রাজী করে বললে—চাটুজ্জে পাকা করে ফেল আজই। লগ্নপত্র করে সই করিয়ে দিয়ে বললে—চলে যাও বাবার থানে। সিঁদুর লাগিয়ে লিয়ো। তা দে'র কাছেই যাব। এক বাকুড়ি জমি আছে আমার দে'র জমির পাশেই—সেটা বিক্রি করতে হবে বিয়ের জন্তে—তা ওঁকেই দোব আমি। তাই চলেছি ভাই।

—তা হলে জমি মাহাত্ম্য—বাবা মাহাত্ম্য ক্যানে বলছ?

—বলব নাই বা ক্যানে হে? বাবা মাহাত্ম্য না থাকলে তোমার সেই বাঁধা ঢেলা খসে পড়ে যায়? বাবা তা পুরণ করবেন ক্যানে? পরের ঘরের বিধবা কন্তে—

—এই দেখ, খবরদার! মুখ সামলে কথা বলো! তুমি দেখেছিলে আমার ঢেলা-বাঁধা?

—তুমি নিজে বলেছ আমাকে! বল নাই?

—না। চীৎকার করে উঠল লোকটি।

—হ্যাঁ। বলেছ। এ লোকটিও সমান জোরে চীৎকার করে উঠল।

এ লোকটি উঠে পড়ল। মালতীর কাছে এসে বললে—একটা চপ এক কাপ চা। কত? সে ফেলে দিলে একটা সিকি।

মালতী মনে মনে হাসছিল। খুচরো পয়সা হাতে নিয়ে বললে—সিগারেট দোব?

—না। পয়সা নিয়ে চলে গেল। কিছুদূর গিয়ে সে ফিরে এসে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বললে—তুমি? তুমি এ দোকানে যে চা চপ খেতে টেনে এনে ঢোকালে সে কথাটা বলব?

এ লোকটি বললে—বল না! তুমি কেন, আমিই বলছি। বললাম দোকানটি ভাল—দোকানদারনীটি আরও ভাল। চল সুন্দর মেয়ের হাতের চা খেয়ে আসি। কি গো আমি খারাপ কথা বলেছি? এটা খারাপ কথা হল? তুমি কিছু মনে করলে?

মালতীর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। তবু সে বললে—না না। এ খারাপ কথা হবে কেন? আমি কিছু মনে করব কেন?

চাঁপা বললে—দুঃখী কন্তে বাবু—আপনারাই ভাই বন্ধু বাপ জ্যাঠা। আপনাদের ভাল লাগে সিটা তো অর ভাগ্যি!

—ঠিক কথা। আমি ঢেলা বাঁধতে যাচ্ছি না—

ভালুকওলা এসে সামনে দাঁড়াল দোকানের।—চা মিলবে?

আশপাশের লোকেরা বিশেষ করে একদল মেয়ে দোকানে ঢুকে পড়ল—মা রে!

—ডর নেহি মা। কুছু বলবে না।

—তা হোক। সরাও তুমি! আর চা কাপে মিলবে না—তোমার কিছু আছে? আমাদের আজ ভাঁড় নেই।

—এই সর হে। ওহে বনকে ভালুকওয়ালা। ভালুক সরাও বাবা!

চাঁপা বলে উঠল—সরকার মশয়। ভুতি সরকার মনে লাগে?

হ্যাঁ ভূতি সরকারই বটে। পায়ের নিচের দিকের কাপড় হাঁটুর কাছে তুলে গুঁজে, ফতুয়া গায়ে দিয়ে কালো নধর চেহারা ভূতি সরকার এসে ঢুকল।—চিনতে পারিস তো মালতী? আরে! তোকেই চিনতে কষ্ট হচ্ছে! বা বা বা—এ তুই খাসা হয়েছিস রে! রাস্তায় দেখলে মনে হত শহুরে মেয়ে বুঝি! বা বা! আমি তো ছিলাম না এখানে, ছিলাম বর্ধমানে। তোর সখী গোপার সম্পত্তি নিয়ে গোল বেধেছে, গোপার বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। সে অনেক হাঙ্গামা। তা আজ নেমেই শুনি তুই এসেছিস—শুধু আসা নয় হাটে রেস্টুরেন্ট করেছিস। আর গাঁ তোলপাড় করে দিয়েছিস। গোপাও যে এল আমার সঙ্গে। সে বিধবা হয়েছে শুনেছিস তো?

তা মালতী জানে। বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই বিধবা হয়েছে। চাঁপা বলেছে। সে জানে। খুব দুঃখ সে পায় নি। সে খুশী হয়েছে—বিধবা হলেও গোপা আজ বউ—তার ঘর আছে বাড়ি আছে। চাঁপা বলেছে বেশ ভাল ঘরের বউ গোপা।

গোপার ভাসুর ভোটে জিতেছে—আইন সভার সভ্য হয়েছে। তাকে জিতিয়ে দিয়েছে বসন্তদা। এই ভোটে জিতে বসন্তদা'র নাম হয়েছে। লীডার হয়েছে।

ভাসুরের সঙ্গে গোপার স্বামীর খুব বিবাদ ছিল। সে সব সে শুনেছে।

মালতী সরকারকে আহ্বান জানিয়ে বললে—আসুন বসুন।

চাঁপা বললে—সরকার মশয়ের গুণের কথা চিরকাল মনে থাকবে। তোমার সাথে তিনবার দেখা করছি জেলে, উনিই লিখে দিয়েছেন দরখাস্ত। তিনবারই।

সরকার বললে—তা কি বেশী করেছি কিছু। বসল সরকার।

মালতী বললে—চা খাবেন তো?

—খাব না? তা নইলে ঢুকলাম ক্যানে দোকানে? দে চা দে। চপ দে! আর ও কি ভাজছে—বেগুনী? দে ও-ও দে চারটে।

চপ ভেঙে মুখে দিয়ে বললে—বেশ হয়েছে খাসা হয়েছে। আর বেশ করেছিস এ রেস্টুরেন্ট করেছিস। তুই দোকানে বসলে খুব বিক্রি হবে।

তা মালতী জানে।

—বুদ্ধি তো কুণ্ডুর। খলিফা লোক। ওর সঙ্গে দলিল টলিল কিছু করেছিস নাকি? দেখাস! ওই দেখ একদল ইস্কুলের ছেলে আসছে। ঠিক এখানে আসছে দেখিস। আমি উঠি। বেগুনী বরং ঠোঙায় দে বাড়ি নিয়ে যাই।

চাঁপা জিজ্ঞাসা করলে—গোপার কি হল সরকার মশয়?

—কি হবে? থানা পুলিস করে গোপাকে নিয়ে এলাম। মামলা দায়ের হল।

—গোপা এসেছে? মালতী প্রশ্ন করলে।

—হ্যাঁ। সে কি সোজা ব্যাপার? ওর ভাসুর আবার এম-এল-এ। কত্তালোক বড়লোক। তা আমিও ভূতি সরকার। মামীমার খেল জানি। তবে বসন্ত আমাদের বসন্ত, খুব করেছে। খুব। ভারী তেজী ছোকরা। সে খুব করেছে, খুব বললে। খুব

করলে। বলতে গেলে গোপার ভাসুর এম-এল-এ হয়েছে সে তো ওরই জোরে অনেকটা। টাকা থাকলে তো ভোট মেলে না। সে বলব পরে। তোমাদের খদ্দের এসেছে।

সত্যিই খদ্দের এসেছে—দল বেঁধে ছেলেরা ঢুকছে। দশ বারো জন। মালতী কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বসন্তের কথা জিজ্ঞেস করা হল না। বসন্ত? কোথায় সে? সে খুব করেছে। খুব বলেছে! সে এল না—তাকে দেখতে এল না? খদ্দেররা কথা বলছে। মালতীর খেয়াল নেই। সে সামনে হাটের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। গোপা। বসন্ত। বসন্ত গোপা! কেমন সব যেন, ঘষা কাচের ওপারের মত দেখা যাচ্ছে না!

—মালতী!

মালতী উত্তর দিল না।

—খদ্দের আসছে।

মালতী বললে—দেখ মাসী কি চাই।

চাই সবই চাই। ছেলের দল; বেগুনী খাবে চপ খাবে শিঙারা খাবে, চা খাবে। দু একজন ছাড়া সকলেই প্রায় সিগারেটও নেবে।

চাঁপা ঠাকুরকে বললে—আপনিও হাত লাগান ঠাকুর!

ঘষা কাচের ওপারের মত সব মিলিয়েই যাচ্ছে না, জেলখানার পাঁচিলের ঘেরার মধ্যে যেমন বাইরের শব্দও আসত না তেমনি শব্দও শুনছে না মালতী।

বসন্তদা। বসন্ত গোপা! বসন্ত গোপার জন্যে অনেক করেছে!

এরই মধ্যে শুক্রবারের হাট শেষ হয়ে গেল।

চাঁপা বললে—মালতী। কি হইল তোমার? উঠ।

—ও। হ্যাঁ। বাড়ি যেতে হবে। কই সেই লোকটা এসেছে? যে রাত্রে থাকবে?

—আসছে। ওই তো বইসা রইছে বাইরে।

—টিকলি কই?

—অ—মাঃ। সি সন্ধ্যা হইতে উধাও। উ দুকান থেক্যা চুনারিয়া ইখান থেকে টিকলি দুই জনই ভাগছে সেই সন্ধ্যাবেলা। ডাকিনীর মতন ঘুরছে কোথা!

—হুঁ।

হাটের বাতি নিভছে।

শুধু মাঝখানে পোতা খুঁটিতে একটা ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে। এত বড় হাটের মধ্যে কেমন আবছা আবছা মনে হচ্ছে। হাটুরেরা প্রায় চলে গেছে। যাদের গাড়ি আছে তাদের গাড়ি বোঝাই হচ্ছে। ধরণী জ্যাঠার চালা অন্ধকার। চলে গেছে ধরণী জ্যাঠা। হঠাৎ তার মনে হল—ভুল হয়ে গেছে, ধরণী জ্যাঠাকে চা খাওয়ালে হত ডেকে। কিছু বেগুনী চপ ঠোঙায় মুড়ে দিয়ে এলে বুড়ো খুশী হত।

বসে বসে সে গুনে গুনে টাকা পয়সা থাক্ করে সাজালে। জুড়লে কাগজে লিখে। ষাট টাকা দশ আনা তিন পয়সা।

বাঁধলে সে টাকা থলেতে পুরে।

কিছু খাবার রাত্রে দোকানে শোবার লোকটিকে দিয়ে আর একটা ঠোঙা তার হাতে দিয়ে বললে—এটা টিকৃলিকে দিয়ো।

চাঁপা বললে—মালা!

—মাসী!

—না, চল পথে বলব।

পথে নেমে দুজনে পথ চলতে চলতে হঠাৎ চাঁপা আবার বললে—টিকৃলিটারে কাল জবাব দিয়ো। অরে কাজ নাই। মেয়েটা ভাল না।

—ভাল আর মন্দ মাসী। তার সঙ্গে আমাদের কি বল?

—তুমি কিছু বুঝতে পার নি?

—কি?

—টিকৃলিটার বাচ্চা হবে?

—বাচ্চা হবে?

—হ্যাঁ। পোয়াতি মাইয়াটা। কোথা আমাদের দোকানে আঁতুড় ঘর কইরা দিবে! না!

—হ্যাঁ। তা সত্যি। তবে মাসী ওর মায়ের ঝুবড়ি আছে গাছতলা আছে—আমাদের দোকানে আসবে কেন?

—ছুঁত পবিত্ত আছে মাসী—

হেসে উঠল মালতী। তারপর হঠাৎ সে চুপ হয়ে গেল! বললে—থাক মাসী—ভাল লাগছে না। মন তার আবার সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যেন শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

বসন্ত! বসন্ত গোপা! বসন্ত একবার এল না! বসন্ত গোপার জন্যে অনেক করেছে! সব মিথ্যে। ভুবনপুরের হাটের কথা মিথ্যে ভুবনেশ্বর মিথ্যে। দুখের বদলে সুখ তেতোর বদলে মিষ্টি মেলা দূরের কথা এখানে কিছুই মেলে না। বসন্ত গোপার জন্যে অনেক করেছে। আর সে সাত দিন এসেছে—একবার এলও না!

পাঁচ

—অনেক কিনা হিসেব করি নি। তবে হ্যাঁ করেছি বই কি। আমার যা করা উচিত, যা পারি, তাই করেছি। বসন্ত নিজেই বললে।

তিন দিন পর সোমবার দিন সকালেই বসন্ত এল। নিজেই এল। চাঁপা মালতী উঠে ভোরবেলা থেকেই হাটের দোকানে যাবার ব্যবস্থা করছিল। হাটবারে তাই যায় ওরা। অন্য দিন দেরিতে যায়। হাটের কাছেই সাবরেজেস্ট্রি অপিস—একটু তফাত—লোক জন রেজেস্ট্রি আপিসে রোজই আসে। আপিসের সামনে সদর রাস্তার উপর চা খাবারের দোকানও

আছে। ভিড় সেখানেই জমে বেশী তবে হাটের ভিতরের দোকানেও কিছু কিছু বিক্রি হয়। মালতীর দোকানে সব থেকে বেশী হয়। হাটের দিন ভোরবেলা থেকেই জোর বিক্রি। যারা গাড়ি করে মাল আনে আগের রাত্রে তারা সকালে উঠেই চা খায়। ভুবনেশ্বরতলায় এখনও যাত্রী হয়; রোগের জন্যে আসে, মানতের জন্যে আসে—তাদের মধ্যে রোগীরা, মানত-করিয়েরা পূজো না দিয়ে খায় না, কিন্তু সঙ্গের লোকজনে খায়। সোমবার এই সব লোকের জন্যে মুড়কি বাতাসা মণ্ডা বিক্রি হয়। সে সব নিয়ে সোমবার সকালে চাঁপা আলাদা বসে।

ভোরবেলা ওরা সব সাজিয়ে গুজিয়ে তৈরী করছে এমন সময় দরজায় ডাক উঠল—মালতী! কই মালতী?

মালতী চমকে উঠেছিল।—কে? বুকের ভিতরটা ধড়ধড় করে উঠছিল। কার গলা? সে—সে নয়?

—কই বষ্টমী মাসী কই?

—আরে—! বসন্ত সোনা! কি ভাগ্য কি ভাগ্য—আস আস।

মালতী যেন পাথর হয়ে যাচ্ছিল। শুধু বুকের ভিতরটার আলোড়ন বেড়েই চলেছিল। অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। ধবধবে পাজামা পরা—লম্বা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি গায়ে—চোখে চশমা—মাথার চুলগুলো রুখু লম্বা এলোমেলো—এ বসন্ত যেন আলাদা মানুষ!

বসন্তও ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মালতীর দিকে। এই—সেই মালতী?

মালতী নিথর হয়ে দাঁড়িয়েও তা অনুভব করলে—তার কান দুটো মুহূর্তে গরম হয়ে উঠল। একবার চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে আবার সে চোখ নামালে। চাঁপা বললে—কি দেখছ সোনা? এঁ্যা?

অসংকোচেই বসন্ত বললে—মালতীকে দেখছি বষ্টুমী মাসী। কি সুন্দর হয়েছে মালতী! শুধু তো তাই নয় এ যে একেবারে মডার্ন মেয়ে!

চাঁপা মালতীকে বললে—প্রণাম কর মালা!

মালতী এবার এসে তাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আর তুমি?

—কি আমি? আমার আবার কি হল?

—একবারে শহরের লীডার—চোখ মুখ দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে!

চাঁপা বললে—বস বস বসন্ত সোনা। সে একখানা আসন পেতে দিলে।

মালতী তার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। আশ্চর্য—শক্ত মুখরা মালতী কেমন যেন নুয়ে পড়েছে —বোবা হয়ে গেছে।

চাঁপা বললে—চা খাবা না বসন বাবা?

—খাব না? তোমাদের বাড়ী ভাত খেয়েছি। এখন আবার চায়ের রেস্তোঁরা করেছ। চা খাব না? কাল রাত্রে সব শুনলাম। শুনে মনে মনে তারিফ করলাম। বা মালতী! ঠিক করেছিলাম সকালে উঠে একেবারে হাটে যাব—রেস্তোঁরায় ঢুকে বসে বলব—চা দিন তো! অবাক হয়ে যাবে তোমরা।

হেসে উঠল সে।

মালতী হাসলে না। বললে—গোপাদের বাড়ী উঠেছ বুঝি?

—হ্যাঁ। আর কোথায় উঠব? গোপার দুর্ভাগ্যের কথা তো শুনেছ! আমি তাতে জড়িয়ে পড়েছি। এসেছিও ওদের কাজে।

—হ্যাঁ শুনেছি। সরকার মশাই বলছিল তুমি অনেক করেছ।

একটু হেসে বসন্ত বললে—অনেক কিনা হিসেব করি নি। তবে হ্যাঁ করেছি বৈ কি। আমার যা করা উচিত, আমি যা পারি, তা করেছি।

বসন্তকে বর্ধমানে নিয়ে গিয়েছিল গোপা। গোপার বিয়ে হয়েছিল বর্ধমান থেকে কয়েক ক্রোশ দূরের এক গ্রামে। দত্তদের বাড়িতে। জমিদার ব্যবসাদার দুই-ই তারা। গোপার শ্বশুর রায় সাহেব। স্বাধীনতার পরও তারা কংগ্রেসের সঙ্গে আপোস করতে পারে নি। গত ইলেকসনে জনসংঘের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গোপার ভাসুর; তাতে হেরেছিলেন। হঠাৎ যিনি জিতেছিলেন তিনি মারা যাওয়াতে আবার ভাসুর দাঁড়িয়েছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ইনডিপেনডেন্ট ক্যাণ্ডিডেট হয়ে। তখন গোপার সদ্য বিয়ে হয়েছে। গোপা স্বামীকে বলেছিল—ভাসুরকে বল আমাদের গাঁয়ের বসন্ত বাড়ুজ্জেকে আনতে। খুব ভাল বলতে পারে। এ সব খুব বোঝে। কি যে বক্তৃতা দেয় কি বলব!

বসন্তকে সেই কথাতেই নিয়ে গিয়েছিল গোপার ভাসুর। বসন্ত সত্যিই কাজ করে নিজের কৃতিত্ব প্রমাণ করে, ইলেকসনেই সর্বেসর্বা হয় নি, গোপার ভাসুরের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছিল। ইলেকসনের পরও তাঁর কাছে থাকত। একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করিয়েছিল। সম্পাদক হয়েছিল বসন্ত।

তারপর হঠাৎ মারা গেল গোপার স্বামী। তার মাসখানেকের মধ্যে গোপার শ্বশুর।

গোপার সন্তান হয় নি। গোপার ভাসুর বললেন—সব সম্পত্তি আমার। শুধু তাই নয়, স্বামী থাকতে গোপা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করত, সে বন্ধ করে দিলেন। সূত্র সিনেমা দেখা নিয়ে। বাড়ীর গাড়ি নিয়ে। তিল থেকে তাল হল। গোপার বাবা গেল তাকে আনবার জন্য। তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

ঝগড়া লাগল বসন্তের সঙ্গে।

বসন্ত ওই কাগজেই লিখলে—যে লঙ্কায় যায় সেই রাবণ হয়। যে নেতা হয় সেই দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হয়। সেই হিটলার হয়। সেই মাথা নিতে চায়। মানুষের অধিকার পদদলিত করে, নারীকে শৃঙ্খলে বাঁধে। দাসী করে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের নেতা—দত্ত মহাশয়!

শুধু তাই নয়, দত্তকে মুখের উপর বলেছে—আমি প্রায়শ্চিত্ত করব আমার পাপের। আমি গ্রামে গ্রামে যাব—মিটিং করব। বলে আসব আপনার অত্যাচারের কথা।

দত্ত ভয় পেয়ে গোপাকে বাপের বাড়ি আসতে দিয়েছিলেন—গহনাগুলি দিয়েছেন। সম্পত্তি ব্যবসা মামলায় যা হবে।

বসন্ত বললে—কতটুকু বল ? গোপার শ্বশুরের সম্পত্তি—তা তার তিন চার লাখ টাকা দাম। তার সে কতটুকু পেয়েছে বল ?—

একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুনছিল মালতী। বসন্ত থামল। সে আস্তে আস্তে বললে—আমি ? আমার জন্যে কতটুকু করেছ বল ?

হাসলে বসন্ত। বললে—তোর জন্যে কি করার ছিল বল ?

—কিছু ছিল না ?

—বল—কি ছিল ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মালতী বললে—না। কিছু ছিল না। আমারই ভুল। বলে সে হঠাৎ উঠে ঘরে চলে গেল।

—আরে! মালতী!—মালতী!

তাকে অনুসরণ করে ঘরে গিয়ে ঢুকল বসন্ত। মালতী গিয়ে ওদিকের জানালাটা ধরে দাঁড়িয়েছে। বাইরে তাকিয়ে আছে।

—মালতী! আবার ডাকলে বসন্ত।

—মালতী! বসন্ত তার পিঠে হাত দিয়ে ডাকলে।—মালতী!

মালতী ঘুরে তাকাল। সে কাঁদছে। দুই চোখ থেকে জল গড়িয়ে নামছে।

—তুই কাঁদছিস!

স্থির দৃষ্টিতে মালতী তার দিকে তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত সে দৃষ্টি। বিস্মিত হল বসন্ত সে দৃষ্টি দেখে। স্থির নিষ্পলক!

—বসন্ত চা এনেছি!

চাঁপা ঘরে ঢুকেছে চা হাতে নিয়ে। কিন্তু তাতেও তার সংকোচ নেই চাঞ্চল্য নেই। মালতীর দৃষ্টি দেখে সে শঙ্কিত হয়ে ডাকলে—মালতী! মালা!

মালতীর দৃষ্টি যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল—সে চীৎকার করে উঠল—মা—লী!

—মালতী!

মালতী ছুটে এল তার দিকে হিংস্র জন্তুর মত—যাও—যাও বলছি!

সভয়ে পিছিয়ে গেল চাঁপা। অস্ফুট কণ্ঠে বললে—মালা!

—মেরে ফেলব তোমাকে। যাও!

চাঁপা চলে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মালতী ফিরল বসন্তের দিকে। তার চোখ এখনও জ্বলছে। চোখের জলের নিচে দৃষ্টির সেই আগুন যেন অনেক রঙ ফুটিয়ে তুলছে ক্ষণে ক্ষণে।

বসন্ত দেখছে। সে চঞ্চল হয় নি। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু হাসি বরং ফুটে উঠেছে তার মুখে। মালতী বললে—ওই মাঠের পথে একদিন—। মনে আছে ?

—মনে আছে তোর সে কথা ? বসন্তের মুখের একপাশে হাসিটা বেশী করে ফুটে।

—তুমি আমাকে বিয়ে করবে বলেছিলে। আমাকে জড়িয়ে ধরে—। এবার ভেঙে

পড়ল মালতী! ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। বসন্ত এসে তার মাথাটা বুকে টেনে নিলে।

মালতী বললে—জেলখানায় আড়াই বছর আমি শুধু তোমাকে ভেবেছি। তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি।

বসন্ত তাকে ছেড়ে দিয়ে বললে—বল মালতী। সে কথা আমি ভুলি নি। আমার মনে আছে।

—না না—নেই। তবে তুমি আস নি কেন এতদিন?

—কাজে—

—কাজ! গোপার কাজ!

—না। কাজ, কাজ! আমার কাজ! আমার এখন অনেক কাজ।

—জানি। তুমি এখন মস্ত বড় লোক। অনেক নাম তোমার।

—তবু আমি তোকে ভুলি নি। তোকে আজও ভালবাসি।

মালতী দুই হাত বাড়িয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তার মুখে মুখ রেখে বললে—তোমাকে নইলে আমি বাঁচব না। না—না—না! আবার সে কেঁদে উঠল।

—বসন! বসন্ত!

বাইরে থেকে চাঁপা ডাকছে।

ক্ষিপ্তের মত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে সে দরজার দিকে। চীৎকার করে বলতে গেল—না! কিন্তু তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বসন্ত বললে—একটু পরে বষ্টম বউ।

—তোমারে ডাকত্যাছে। দশ বারো জন লোক আসছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

—কি বিপদ! ছাড় মালতী! দেখি। আমি তোকে আজও ভালবাসি মালতী। ছাড়।

মালতী ছেড়ে দিল তাকে। আশ্চর্য—সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল তার মুহূর্ত-পূর্বের হিংস্র-ক্ষুব্ধ মুখে। বললে—বড় লোক হওয়ার বিপদ! যাও।

বসন্ত বেরিয়ে গেল।

মালতী চোখ মুছলে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে বের হতে যেন লজ্জা হচ্ছে তার। চাঁপা মাসীর কাছে লজ্জার যেন শেষ নাই। একটা অপরাধবোধ তাকে যেন নুইয়ে ফেলছে। ছি-ছি-ছি! পাগলের মত কি করলে সে! কয়েক মুহূর্ত পর নিজেকে সামলে নিয়ে বাইরে এল সে। ডাকলে—মাসী!

চাঁপা উপু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে মাটির দিকে তাকিয়ে। জিনিসপত্র সাজানো পড়ে রয়েছে। দোকানের লোকটা বসে আছে উঠোনে। চাঁপা একটু হেসে বললে—কও মাসী কি বলছ?

—রাগ করেছ?

—রাগ? হাসলে চাঁপা। না। ঘাড় নাড়লে।

—আমার মাথার ঠিক ছিল না মাসী।

—ও কথা থাক মালতী!

—ও আমার শ্যাম মাসী!

—মালা! তেমনি ভজতে পারবা কন্যা?

—পারব মাসী!

—শ্যামে বিশ্বাস কর মালা?

—না—তা করি না!

—তবে? তা নইলি হয় না মাসী।

—দেখো!

লোকটি বসে বিড়ি টানছিল। বিড়িটা ফেলে দিয়ে বললে—দেরি যে অ্যানেক হয়ে গেল গো! হাটের দিন! চলেন!

—ওঠ মাসী!

—চল।

হাট জমেছে কলরব উঠছে। আজ হাট জমাট বেশী। আজ অনেক কাঠের গাড়ি এসেছে, শালের গদি—তৈরী দরজা বোঝাই গাড়ি এসে আঁট দিয়েছে অশথ বট জঙ্গলের মধ্যে। ওরা যাচ্ছে বৈরিগীতলার মেলায়; বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় মেলা। তার উপর সামনে শ্রীপঞ্চমী শীতলাষষ্ঠী। ইস্কুলের ছেলের দল, বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়ের দল ভেঙেছে সরস্বতী পুজোর হাট করতে; গৃহস্থেরা এসেছে ষষ্ঠীর হাট করতে। ডাঁটা এসেছে আজ গাড়ি বোঝাই করে। ষষ্ঠীতে ডাঁটা বিশেষ করে কাটোয়ার আলমপুরের ডাঁটার আজ খুব চাহিদা। মটর কলাই বেগুন শিম এও এসেছে প্রচুর। মটর সেদ্ধ শিম বেগুনের তরকারি আর ডাঁটা পোস্তর তরকারি শীতলাষষ্ঠীর অনিবার্য অঙ্গ। চাই-ই। ওপাশে কাঠের দোকানের বটতলার পাশে পাইকারেরা খাসী এনেছে অনেকগুলো। সরস্বতী পুজোর জন্যে ছেলেরা মেয়েরা কিনবে—ষষ্ঠীর দিনে বাবুরা দিনে বাসী খেয়ে রাত্রে বাইরের বাড়িতে ইঁটের উনোন করে মাংস খিচুড়ি খাবে। শীত আর ক'দিন। ওদিকে কুমোরেরা বিক্রির জন্যে ছোট ছোট সরস্বতী এনেছে। দু চারখানা মাঝারি প্রতিমাও আছে। আজকালকার কলকাতার ফ্যাশনের সরস্বতী।

একজন কারওয়ালা ফিরি করে বেড়াচ্ছে—বাসন্তী রঙ বাসন্তী রঙ। আজ কার ফিতের সঙ্গেও লোকটা বাসন্তী রঙ এনেছে। মেয়েরা বাসন্তী রঙে কাপড় ছুপিয়ে পরবে।

মালতীর দোকানেও আজ খদ্দের বেশী।

মালতী আজ যেন ফুটে ওঠা পদ্মের মত ঢলঢল করছে। জীবনে আনন্দের রৌদ্রের ঝলক পড়ে যেন সব কটি দল মেলে ফুটে উঠেছে।

জীবনের কামনা সহস্র ধারায় ঝরে পড়ে লজ্জা সংকোচ সংস্কার সব কিছুকে ঐরাবতের মত ভাসিয়ে দিয়েছে। যে যা বলবে বলুক। যা হবে হোক। তার ভাবনা নাই চিন্তা নাই আশঙ্কা নাই। সে নির্ভর। বসন্ত তাকে ভালবাসে। মধ্যে মধ্যে সে খিলখিল করে হাসছে।

শ্রীমতীর দোকানে গান বাজছে গ্রামোফোনে—

মিলনমধু মাধুরীভরা স্বপন রাতি ফুরায়ো না।
এ সুখ মম শেফালী সম ঝরায়ো না। ওগো ঝরায়ো না।

ভারী ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে পারিপার্শ্বিক ভুলে গিয়ে গুনগুন করে সুরে-স্বর মেলাতে চেষ্টা করছে।

তার দৃষ্টি আজ আর যথা কাচের মত কিছু দিয়ে ঢাকা নয় কিন্তু সব যেন একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। লোক লোক আর লোক—কালো মাথা—ঘোমটা দেওয়া মেয়েদের মাথা। তারই হাজার মুখ, চকিতের মত একটা মুখ চোখে পড়ছে—চকিতে মিলিয়ে যাচ্ছে—সে হেঁট হয়ে জিনিস কিনছে কিংবা পিছন ফিরছে। কিংবা এদিক থেকে কতকগুলো মাথার পিছন দিক তাকে ঢেকে দিচ্ছে। সব অর্থহীন তবু ভারী ভাল লাগছে।

ঝনঝন শব্দ উঠল। চাঁপা আপসোস করে বলে উঠল—ভাঙলি!

ফিরে তাকালে মালতী। ধুতে গিয়ে ক'খানা ডিস দুটো কাপ ভেঙে ফেললে টিক্‌লি। অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে সে। মালতী রাগ করতে পারলে না। হেসে বললে—ভাঙা টুকরোগুলো কুড়িয়ে ওই ময়লা ফেলা টিনটার মধ্যে ফেলে দে। চল আমি বাসনগুলো ধুয়ে দি।

কোমরে কাপড় জড়িয়ে সে এগিয়ে গেল।

'টিনের দেওয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে কে মৃদুস্বরে বলছে—মেয়েটা কিন্তু চমৎকার দেখতে ভাই!

—হাসি দেখেছিস?

মালতীর শুনেই হাসি পেয়ে গেল। খুক খুক করে হাসতে লাগল।

বাসনগুলো ধুয়ে সে চাঁপার সামনে নামিয়ে দিয়ে তৈরী চায়ের কাপগুলো তুলে তুলে খদ্দেরদের সামনে ধরে দিতে লাগল।

—কাপড় রাখবেন? কাপড়! ডুরে রঙীন কাপড়।

কাপড়ওলা এসে দাঁড়িয়েছে।

—খুব রসিক তুমি! কাপড় রাখবার সময় বটে।

কাপড়ওলার পিছন থেকে কে বললে—এই সর না হে! এই!

বুকখানা ধ্বক করে উঠল মালতীর। বসন্তের গলার আওয়াজ। ভরাট গলা—শুধু ভরাটই নয় গম্ভীরও বটে! মাঝারি মাথার মানুষ—কাপড়ওলার পিঠের বোঝার ওদিকে শুধু চুল দেখা যাচ্ছে। কাপড়ওলাটা লম্বা।

—শুনছ।

কাপড়ওলা সরে দাঁড়াল। মৃদু মৃদু হাসছিল বসন্ত। হেসে বললে—চা খেতে এসেছি। বসন্তের সঙ্গে ক'টি ইস্কুলের ছেলে।

সেই মুহূর্তে শীতের দিনেও যেন ঘাম ফুটে উঠলে মালতীর কপালে। সে হেসে বললে—

আসুন। এস বলতে পারলে না!

বসন্ত ঢুকল দোকানে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বললে—আরম্ভ ভাল হয়েছে। কিন্তু ঘর পাকা করতে হবে। ইলেকট্রিক লাইট নিতে হবে।

তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললে—ও-সব দেশের কথা হাটে হয় না ভাই। অন্য সময় আমার কাছে এস।

ছেলেরা বললে—কোথায় যাব? কখন যাব?

—যেয়ো না। কাল বিকেলে—এই মালতীর বাড়ি চেন? ওদের বাড়ি যেয়ো! ওখানে থাকব।

মালতী খুশী হয়ে উঠল। নিজের চেয়ারখানা তুলে তাকে দিয়ে বললে—বসুন।

—বসলাম। খুব ভাল করে চা তৈরী কর। সিগারেট রয়েছে দেখছি—দাও আমাকে এক বাক্স দাও।

সিগারেট দিয়ে এগিয়ে গেল মালতী। চাঁপা চায়ের জল নামিয়েছিল তার কাছে গিয়ে বললে—সর মাসী আমি তৈরী করি।

চাঁপা জিজ্ঞাসা করলে—চপ দিব?

—না থাক।

বসন্ত বললে—সে শুনতে পেয়েছিল কথাটা—বললে—চপ না, বেগুনী ভেজে দাও দেখি! বেশ ভাল করে ভাজ।

মালতীর বড় ভাল লাগছে। বসন্ত এসেছে দোকানে। সে তা হলে দোকান করাকে খারাপ ভাবে নি! ভারী ভাল লাগছে। চিনি একটু বেশী দেবে কিনা ভাবছে!

—বসন্ত। ভাল ভাল ভাগ্য ভাল। দেখা পেলাম।

—কি—কি খবর?

—হাট করতে এসেছি।

ফিরে তাকালে মালতী। বেশ কাপড়জামা-পরা বয়স্ক ভদ্রলোক। লোকটি ভিতরে এসে বসল।

বসন্ত বললে—দু কাপ চা কর।

লোকটি বললে—চা আমি খাব না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব তোমাকে?

—বলুন।

—এই কাণ্ডটি তুমি কেন করলে?

—কাণ্ড আমি অনেক করি। আপনি কোন্ কাণ্ডটির কথা বলছেন! বলুন আগে!

—আমার ভাগ্নের বিয়ে কায়স্থের মেয়ের সঙ্গে দিলে কেন? জাতটি মারলে কেন? তুমিই তাকে প্ররোচিত করেছ!

—প্ররোচিত সে হয়েই ছিল! বললে বিয়ে করব ওকে! আমি দোষের কিছু দেখি নি। বললাম—কর।

—দোষের কিছু নেই? ব্রাহ্মণের ছেলে—কায়স্থের মেয়ে—

বাধা দিয়ে বসন্ত বললে—না। কিছু দোষের নেই।

—তুমি হিন্দুসভার—

—আমি কোন সভার লোক নই! আমার মত আমার। আমি স্বতন্ত্র! হিন্দু কায়স্থতে বিয়ে কি—আমি ও বিয়েরই প্রয়োজন মনে করি নে। ওটা সমাজের একটা চাপানো নিয়মের নামে অনিয়ম। ভালবাসা হয় পুরুষে নারীতে—ভালবাসা হলে তারা একসঙ্গে বাস করবে। এর মধ্যে আবার বিয়ের ঘটা কেন?

—তুমি অতি পাষণ্ড!

—আপনারা ভণ্ড। ধর্মের ষণ্ড!

—বসন্ত!

—ধমকাচ্ছেন কাকে? হাসলে বসন্ত।

আশ্চর্য! বসন্ত হাসতে হাসতেই কথা বলছে। একটা সিগারেট শেষ করে আর একটা ধরাচ্ছে। মালতী চায়ের কাপ হাতে বসেই আছে। উঠে দেবে কি না বুঝতে পারছে না।

বসন্ত লক্ষ্য করে বললে—চা দাও মালতী!

মালতী চায়ের কাপ এবার গিয়ে নামিয়ে দিলে।

লোকটি এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিল এবার অকস্মাৎ যেন বলে উঠল—নিজে? নিজে কি করবে?

—আমি? আমার অনেক কাজ মুখুজ্জেমশাই। বিয়ে করবার ফুরসত নেই। আর ইচ্ছেও নেই। বিয়ে আমি করব না। হাসলে বসন্ত।

—ব্রহ্মচারী হবে? এদিকে তো মদ ধরেছ শুনেছি।

—মিথ্যে শোনেন নি! তা ধরেছি। রাত্রে খাই স্বাস্থ্যের জন্যে। আর ব্রহ্মচারী থাকব তাও বলি নে। যদি কাউকে ভালবেসে ফেলি তবে তাকে বলব—এস আমরা দুজনে ঘর বাঁধি। বাঁধে ভাল। না বাঁধে, যে এইভাবে বাঁধতে চাইবে তাকে খুঁজব।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বসন্ত বললে—খাসা চা করেছ! দাও দাও মুখুজ্জেমশায়কে এক কাপ দাও। খান! খেয়ে মেজাজ ঠাণ্ডা করুন।

লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে চলে গেল। বসন্ত হা-হা করে হেসে উঠল। চার পাঁচ-জন খদ্দের এসে ঢুকল।

—কই, দুটো করে চপ আর চা।

বসে পড়ল তারা বেঞ্চের উপর। বসন্ত উঠল।—চললাম। দাম নিবি নে?

স্তব্ধভাবে তাকাল মালতী। বললে—না।

বসন্ত হাসতে হাসতে দোকানের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল—সমস্ত হাটটা ভাল করে দেখে বললে—ওঃ আজ লোক যে খুব। ওঃ।

চাঁপা মাসী বললে—হবে না? তুমি শহরে থাইকা সব ভুলে গেছ গিয়া। হইছ—

—কেন তাতে কি হল? কি ভুললাম?

—আজ হাটটা কিসের মনে করতি পার ?

—ও। হ্যাঁ হাঁ। সরস্বতী পুজোর হাট। তাই এত ইস্কুলের ছেলে বালিকা বিত্তালয়ের দিদিমণিদের ভিড়।

—শুধু ওদের। সরকারী আপিসের বাবুদের আছে। ছুটা আছে। কেলাবের আছে। ইস্টিশানের আছে। সেদিন ক'টা গোনলাম মালতী ? দশখানা না ? হাটের একখানা

—হ্যাঁ।

—হাটেও সরস্বতী ? কি সরস্বতী—লাভবিত্তের সরস্বতী ?

—সে যা বল। তোমরা পণ্ডিত লোক। নীডার মনিষ্যি। শুধু সরস্বতী পূজা না। পরদিন অরন্ধন—বাসী খাওন। শীতলাষষ্ঠীর হাট।

—টিকৃলি! ডাকলে বসন্ত। টিকৃলি তাকাল তার দিকে।

বসন্ত বললে—যা তো দেখে আয় তো মুরগীর দর কি রকম ? সরস্বতী পুজো শেতলা-ষষ্ঠী—লোকে মুরগীটা খাবে না! যা। মা সরস্বতীর জয়জয়কার হোক।

—তুমি খাবে ? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে চাঁপা।

—ও তুমি বুঝি জান না ? মা সরস্বতী মুরগী খুব ভালবাসে। তা নইলে লোকে এত বিদ্বান হয়!

চাঁপা হেসে উঠল। মালতী বললে—খদ্দের কি চাচ্ছে দেখ মাসী!

একদলে পাঁচজন খদ্দের এসে ঢুকল—বাঃ বেশ দোকান হয়েছে। ঝরঝরে—

হাটের মাঝে পরম কৌতুকভরে হরি—বো—ল ধ্বনি দিয়ে উঠল লোকেরা। তার মধ্যে থেকে ভিড় ঠেলে দুজন লোক পর পর বেরিয়ে এল।

—আয়! আয়—আয়।

—চল—চল।

—হ্যাঁ আয়!

—হ্যাঁরে চল! চল না।

—আয়। আমি বাবার সামনে ফেলে দোব পয়সা। তোকে কুড়িয়ে নিতে হবে।

—নিশ্চয় নোব। বাবার মাথায় দে না তু।

—ঝুঠ হবে।

—তুই শালার যে হয়েছে। শালা আমার বন্ধু। হাটধুল। জোচ্চোর কোথাকার!

বলতে বলতে দোকানের সামনে দিয়েই চলে গেল তারা ভুবনেশ্বরতলার দিকে।

ঠাকুর বললে—তুই মিতনে ঝগড়া লাগল। তরকারিওলা মিতন পাল আর বোর্ডিংয়ে চালের যোগানদার মিতন পাল। আজব ব্যাপার!

মালতীও জানে ওদের। বাপের আমলে ওদের দেখেছে। বাবার কাছে ধরণী জেঠার কাছে শুনেছে, তখন বলত—দশ বছর আগে ওরা হাটে হাটধূল পাতিয়েছিল। দুজনেই মৃত্যুঞ্জয় পাল। তরকারিওলা মিতন পালের জমি-জেরাত ছিল না—তরকারি কিনে হাটে আনত। চাল কিনত বাজারে। চালওলা মিতন চাল বেচে হাট করে নিয়ে যেত। দুজনের

এক নাম শুনে বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। চাল বেচে কিছুটা চাল—কোন দিন এক সের কোনদিন দেড় সের চাল চালওয়ালা মিতন তরকারিওয়ালা মিতনকে দিত খাবার জন্যে।—পায়েস'করে খেয়ো। বাস্‌ওয়ালা চাল। তরকারিওয়ালা মিতন কোনদিন কচি লাউ দিত পায়েস করে খাবার জন্যে। কোনদিন দিত ভাল বেগুন—পুড়িয়ে খেয়ো হাটধূল। একেবারে মাখনের মত। তখনকার দশ বছর তারপর আড়াই বছর বারো বছরের উপরের দুই হাটধূলের বিবাদ—এমন বিবাদ দেখে দেখে তারও বিস্ময় লাগল!

মালতীর দোকানের একজন খদ্দের হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে হাত তুলে চীৎকার করে উঠল—এ—খা—নে! চাটুজ্জে এখানে—। ঘো—ষ।

এবার কানে ধরা পড়ল হাটের কোলাহল ছাপিয়ে যে কয়েকটা চীৎকার উঠছে তার মধ্যে একটা ডাক—চাটুজ্জে—চাটুজ্জে!

কারওলা হাঁকছে মধ্যে মধ্যে—এই কা—র।

কেউ হাঁকছে—আলমপুরের ডাঁটা। ফু—রিয়ে গেল।

কেউ হাঁকছে—বেগুন!

—বাঁ—ধা—ক—পি! তার মধ্যে একজন হাঁকছে চা—টু—জ্জে!

দোকানের লোকটি সাড়া দিলে উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে—শুধু সাড়া পেলে চলবে না দেখতে পাওয়া চাই। হাটে এখন শুধু মাথাই দেখা যাচ্ছে। কালো চুল। মেয়েদের ঘোমটার সাদা কাপড়গুলো তার মধ্যে ছিটেফোঁটার সৃষ্টি করেছে। মধ্যে মধ্যে রঙিন কাপড়ও আছে। সেগুলো সাদা কাপড়ের ঘোমটার মত চোখে ঠিক পড়ে না।—চাটুজ্জে—এই যে! ঘো—ষ!

ঘোষ এসে দাঁড়াল, বললে—বেশ যা হোক। চা খেতে বসে গিয়েছেন?

—ভারী তেষ্টা পেয়েছিল। সেই রাত থাকতে বেরিয়েছি। বস, খাও এক কাপ চা খাও। দুটো চপ খাও। পেট ঠাণ্ডা করে হাট করবে।

—নতুন দোকান!

—হ্যাঁ। ভাল দোকান!

—দোকানদারনী আরও ভাল!

মালতীর ভুরু কুঁচকে উঠল।

চাঁপা বললে—আপনারা ভাল কইলেই আমরা ভাল। নইলে মন্দ!

মালতী এবার হেসে বললে—আপনাদের ভরসাতেই তো দোকান! আপনারা ভাল করে খান! তবে তো!

—তা হলে আরও দুটো করে চপ দাও।

—দাও মাসী।

—কোথায় বাড়ি তোমার? কোথেকে এলে গো? পূর্ববঙ্গের রেফুজী বুঝি। তোমরাই এসব পার। আমাদের দেশের মেয়েদের এ সাধ্যি নাই!

—আমি এখানকার মেয়ে।

—এখানকার ? কার মেয়ে গো ?

—আমার বাবার নাম ছিল শ্রীমন্ত দাস।

লোকটি হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মালতী বুঝলে সে চিনেছে তাকে! লোকটার হাঁ কি বিশ্রী! সামনের ক'টা দাঁত নেই। বাকী ক'টা কাল হয়ে গেছে। ভয় পেয়েছে নাকি ? হাসি পাচ্ছে তার। তবু সে বললে—শ্রীমন্ত দাস এখানে মনিহারীর দোকান করত। তার মেয়ে বাসুদেব দোবেকে কেটেছিল মাছ কোটা বঁটি দিয়ে—

—হ্যাঁ।

মুখ থেকে খানিকটা চপ পড়ে গেল চপের ডিসের উপর।

মালতী অন্য দিকে মুখ ফেরালে। অন্য সব দিকেই হাট। হাটটায় এখন কোলাহল কেমন মৌমাছির চাকের গুনগুনানি গানের মত একটানা সুরে চলছে। লোক দুটি ফিসফিস করে কি বলছে। ইচ্ছে হচ্ছে তাকাতে কিন্তু পারছে না। তাকালেই হেসে ফেলবে সে। বসন্ত চলে গেছে। ওই মুরগীর দর করছে। পাইকার ওকে বার বার সেলাম করে কথা বলছে।

—পয়সা। পয়সা নাও গো।

সেই লোক দুজনের একজন—ইনি চাটুজ্জে। একখানা পাঁচ টাকার নোট ফেলে দিলে। তারপর বললে—খাবার তোমার ভাল। বেশ চপ করেছ।

—আপনার দশ আনা হয়েছে। চারটে—

—ঠিক আছে—কেটে নাও। এক বাক্স সিগারেট দাও। জুড়ে নাও ওর সঙ্গে।

—দু' বাক্স নাও।

—দু' বাক্স ?

—বৃষোৎসর্গের হাট—তাতে দু' বাক্স সিগারেট। বেশী হল ?

—তবে দু' বাক্সই দাও। আর একটা কথা।

—বলুন।

—তোমাদের দোকানের এই পাশে টিনের দেওয়ালের গায়ে আমাদের হাটের জিনিস রাখব। কিছু মাটির বাসন ভেতরে রাখব, নইলে ভেঙে দেবে।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলে—সরস্বতী পুজো ? কোথাকার গো ?

—না না। শ্রাদ্ধ। যাও ঘোষ এইখানে কপিগুলো চালতে বল। যাও।

ঘোষ চলে গেল।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলে—কার শ্রাদ্ধ ? কে মারা গেলেন ?

—শ্রাদ্ধ নয় সপিণ্ডিকরণ। বর্ষার সময়—দশ দিনে সব হয়ে ওঠে নি। এখন হচ্ছে। জগৎপুরের হে। মানববাবুর পিতার শ্রাদ্ধ। জীবনবাবুর। ওঁদের তো নিয়ম আছে। অন্নপ্রাশন—পৈতে—বিয়ে—শ্রাদ্ধ—এই দশকর্মের হাটবাজার ভুবনপুরের হাট ছাড়া হবে না।

জগৎপুরের বাবুদের উন্নতি এই হাট থেকে। তিন পুরুষের আগের পুরুষ নাম ছিল নরপতি চাটুজ্জে। মানববাবুর বাবা জীবনবাবু—তার বাবা গণেশবাবু—তার বাবা নরপতি

চাটুজ্জে। নরপতি গরীব ব্রাহ্মণ। ভুবনপুরের দে বাড়িতে খাতা লিখতেন—মাইনে ছিল—খাওয়াদাওয়া আর পাঁচ টাকা মাইনে। খাতা লেখা ছাড়া ব্রাহ্মণ অতিথ এলে রান্না করেও দিতে হত। দে বাড়িতে তখন রাঁধুনী বামুন কি ঠাকরুন থাকত না। দে মশায়দের অনেক ব্যবসা ছিল! ধান চাল কলাইয়ের বাঁধি কারবার—তেল ঘি নুন মশলার গদি—কাপড়—সব রকম ব্যবসাই ছিল। নরপতি চাটুজ্জের মালিক এর সঙ্গে খুলেছিলেন তুলোর কারবার। শিমুল তুলো পাড়িয়ে চালান দিতেন। আট ক্রোশ দূরে বিখ্যাত শ্মশানঘাট। সেখান থেকে শ্মশানের তোশক বালিশের তুলো কিনে তাও চালান দিতেন কলকাতায়। শ্মশানের তুলো চণ্ডালেরা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে গাদা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিত। একবার নরপতি একটা ছোট গাঁট কিনেছিলেন—সে গাঁটটা দে মশায়রা নেন নি তার দুর্গন্ধের জন্য। সেটা দু' টাকায় কিনেছিলেন নরপতি বিছানা তৈরি করাবেন বলে। দুর্গন্ধ দূর করবার জন্য খুলে ছাড়িয়ে রোদ্দুরে দিতে গিয়ে তার মধ্যে একটা নোটের বাণ্ডিল পেয়েছিলেন। সেই টাকায় মূলধন করে ব্যবসা ফেঁদে জগৎপুরের চাটুজ্জে বাড়ি ধনী। নরপতি লক্ষপতি হয়েছিলেন—কলকাতাতেও গদি খুলেছিলেন বড়বাজারে। কিন্তু ক্রিয়াকর্মের হাট ভুবনপুরের হাট ছাড়া হবে না এই আদেশ তিনি উইলে রেখে গেছেন। এমন কি এখনকার মালিক মানববাবুর বিয়ে হয়েছিল কলকাতার কিন্তু তত্ত্বীর হাট এখান থেকে গিয়েছিল।

দু'গাড়ি বাঁধাকপি—সে ছোট একটা ঢিবির মত জড়ো হয়ে উঠল। তার পাশে আলু। বড় বড় নৈনীতাল আলু। ভুবনপুরের হাটে নৈনীতাল আলুও আসে। ভাল খাস নৈনীতাল। মটরশুঁটি দু' বস্তা। মস্ত ক্রিয়া হবে—সপ্তগ্রামী নেমতন্ন।

মালতীর দোকানের ভিতরে এক কোণে মাটির গেলাস জড়ো করছে একজন লোক। চাটুজ্জে বাড়ির রাখাল বাগাল মান্দর বা মুনিষ জন কেউ হবে। তা হলেও লোকটি ভারী সুন্দর দেখতে। সুন্দর গড়ন সুন্দর মুখশ্রী।

—হাঁ মা, ওই কি? দোকানে কি ভাজছে—চপ না কি বলছে—কত দাম?

মালতী ফিরে তাকাল। কালো একটি মেয়ে। অল্পবয়সী। হাতে পয়সা নিয়ে নাড়ছে এবং চপের দাম জিজ্ঞাসা করতেও খুব সংকুচিত হয়ে উঠেছে।

টিকুলি জিজ্ঞাসা করলে—কি লো চপ খাবি? খুব ভাল—খা।

মালতী বললে—দু' আনা একটা।

মেয়েটি একথার জবাব দিলে না—হঠাৎ বোঁ করে ঘুরে হনহন করে হাটের ভিড়ের ভিতর মিশে গেল।

মালতী ডাকলে—শোন শোন।

কিন্তু সে ফিরল না।

টিকুলি বললে—এত পয়সা কোথা পাবে?

মালতী বললে—তুই চিনিস?

—হ্যাঁ, হাটে আসে।

—কোথায় বাড়ি?

—ওই কোমরপুর। স্বামীর ঘর করে না, বাপের ঘরে থাকে। বলি সেডা করিস না ক্যানে—তো বলে মন।

—খারাপ মেয়ে?

—তা লাগে না। খেটেখুটে খায়। হাটের বায়ে ঘুঁটে নিয়ে আসে গাঁয়ে বাজারে বিক্রি করে।

মালতীর ভাল লাগল, বললে—ওকে বলিস না আমাদের ঘুঁটে দেবে। যা—দেখে ডেকে নিয়ে আয়। একটা চপ দেব।

টিকলি চলে গেল। ঠাকুর বললে—আরে বাসন ক'টা ধুয়ে দিয়ে যা।

মালতী বললে—কি কর কি মাসী! রাখ। কে কত জন আসছে—বামুন কায়েত তো না। নানান জাত।

—এখনই এক মিয়া খাইয়া গেল। আমি চিনি।

মালতী হেসে উঠল, বললে—জেলে জোবেদা বিবির বাসন ধুয়েছি মাসী।

—সি জেহেলে দোষ নাই। জেহেলে বৃহৎকাষ্ঠে বিস্থাতে—ইসবের কথা পৃথক!

মালতী বললে—চা খাবারের দোকানও পৃথক মাসী। তাছাড়া এটা তো হাট গো। ভুবনপুরের হাট। এখানে মুসলমানেরাও মানত করে ঢেলা বাঁধে। আগের কালে ওই অশথ বটের জঙ্গলে মোরগ ছেড়ে দিয়ে যেত।

—হ—রি—বো—ল!

কোমরভাঙা এক ভিখিরী এসে সামনে বসল। ভিখিরী আসে হাটে। কানা খোঁড়া কুষ্ঠরোগী—আবার বাউল আসে। আলুর দোকানে একটা দুটো আলু, লঙ্কাওয়ালা দুটো লঙ্কা, বেগুনওয়ালা কখনও একটা পোকা-লাগা বেগুন দেয়, পেঁয়াজ দেয়, বাকী যারা বড় জিনিসের কারবারী তারা কানা খোঁড়া কুষ্ঠরোগীদের এক একটা পয়সা দেয়—বাকী লোকে ভাগিয়ে দেয়। তবে আলখাল্লাপরা বাউল বা গেরুয়াপরা ভৈরব ভৈরবী এদের ফেরায় না। এবং প্রত্যেক হাটে আসেও না।

কোমরভাঙা খোঁড়া বসে বসে হাঁটে। সে আবার হাঁকলে—হ—রি—বো—ল।

মালতী বাসন ধুতে ধুতেই বললে—এ খোঁড়া কতদিন এসেছে? কোথেকে এল? সে বুড়ো খোঁড়া কোথায় গেল?

খোঁড়া বললে—মেদিনীপুর থেকে এসেছি মা! তুমি দোকান করেছ। তা তোমার ভাল বিক্রি হবে। খুব ভাল হবে। ও বুড়ীর দোকানে কেউ যাবে না দেখো!

চাঁপা দুটো বেগুনী দিলে—এই নিয়া যাও।

—একটা কি নতুন করেছ দিবে না? লোকে বলছে ভাল খেতে।

মালতী একটা ভাঙা চপ তার হাতে দিল। সে সেটা মুখে পুরে খেতে খেতে বসে-হেঁটে এগিয়ে গেল।

টিকলি ফিরে এল, বললে—পেলাম না তাকে। একজন বললে সে ছুটতে ছুটতে পালিয়েছে।

মালতীর মনে পড়ছিল পুরনো কালের খোঁড়াকে। এ ক' হাটের মধ্যে তার কথা মনে হয় নি, আজ এই খোঁড়াকে দেখে মনে পড়েছে। বললে—সে বুড়ো খোঁড়ার কি হল মাসী ?

—সে মাগী স্থাহ রাখছে। আহা জলে ডুব্যা মরেছে গ !

—জলে ডুবে ?

—হঁ গ। রাত্তিরে পড়ে গেছিল একটা ডোবায়।

খোঁড়াটা মরেছে। খালাস পেয়েছে। কিন্তু ভুবনতলার হাটে তার স্থান খালি পড়ে নেই, ঠিক আর একটা খোঁড়া এসেছে।

ধরণী জেঠা দোকানের সামনে দিয়ে বলতে বলতে যাচ্ছিল—ভুবনপুরের হাট—আজ জুড়লে কালকে ফাট। যাঃ বাবা—দশ পনের বছরের পিরীত—গেল ! থমকে দাঁড়াল ধরণী। হেসে বললে, বাঃ এতো জোর চলছে তোমার মা !

মালতী বললে—চা খান।

—তা বেশ, খেয়ে যাই। তুমি দোকান করেছ ! ভিতরে ঢুকল ধরণী। একজন খদ্দের বললে—কি হল দাস ? মিটল ? পারলে মেটাতে।

—নাঃ। ওই আর মেটে ? এমনি করে চড় কিল ঘুষির পর ? কেস্ হয়ে গেল। দুজনেই গেল থানায়।

ওই চালওলা মেতন আর তরকারিওলা মেতন। দুজনেই গেছে থানায়।

ধরণী বললে—দোষ দুজনারই। আগে এ ওর কাছে ছাড়া তরকারি কিনত না—এ ওর কাছে ছাড়া চাল কিনত না। এখন তরকারি মেতনের অবস্থা ফিরেছে—জমি কিনেছে, ধান হয়। চাল কম কেনে। চাল মেতন ক্রমে এর-ওর কাছে তরকারি কেনে। আজ চাল মেতন দাঁড়কার লালচাঁদের কাছে পাঁচ মন আলু কিনছিল। এই তরকারি মেতনের রাগ। এসে বলে—তুমি তো খুব ভদ্দনোক হে বাপু। চৌদ্দ আনা পয়সা তোমার কাছে কিছু লয় ! তুমি বড়নোক, আমার কাছে অনেক। চেলো মেতন বলে—কিসের পয়সা। কি বলছ তুমি ? তরী মেতন বলে—তুমি আমার কাছে কুমড়ো নিয়ে গিয়েছ মনে নাই ? কুমড়ো চেলো মেতন নিয়েছিল। সি আমি জানি। আমার দোকানে চেলো মেতন গামছা কিনতে এসেছিল কুমড়ো ঘাড়ে করে। বাহারের কুমড়ো। আমি শুধিয়েছিলাম, মেতন এ কুমড়ো আচ্ছা কুমড়ো। কোথা কিনলে হে ? আমাকে বলেছিল—আমি আবার কোথা কিনব ? হাটধুল এনেছিল আমার জন্যে। লোকে দেড় টাকাও দিতে চেয়েছিল। দেয় নাই। আমি বললাম —এমনি তা হলে ? তা বললে—না, চৌদ্দ আনা কেনা দাম—ওই দামে দিলে। তা নগদ না ধার তা আমি শুধুই নাই। এখন তরী মেতন বলছে—দেয় নাই। চেলো মেতন বলছে —দিয়েছি। তাই নিয়ে তক্কাতক্কি। আমাকে সাক্ষী মানলে। যা জানি বললাম। কুমড়ো নেওয়াও বটে দামও চৌদ্দ আনা বটে। এখন ধার কি নগদ কি করে বলব ? তখন চেলো মেতন বললে—ঝুঠ হবে। ঝুঠ হবে—তোর। বাস, তরী মেতন ঠাস করে মেরে দিলে চড়। অমনি চেলো লাগালে ঘাড়ে ধরে কিল। শেষ দুজনেই গেল থানায়। নাও এখন ফৌজদারী

মামলায় সাক্ষী দাও। হাটের প্রেম তাই বটে। সস্তা দাও মিতে—না দিলেই খারাপ লোক। আজ তুমি সস্তা দাও তুমি মিতে—কাল আর একজনা দিলে সেই মিতে। দেওয়া থোওয়ার ব্যাপার। একটা কথা আছে—ভুবনপুরের হাট আজ জুড়লে কালকে ফাট। সে সব হাটেই।

মালতী শুনছিল বসে। তার ভালই লাগছিল। কথা সত্যিই বলেছে ধরণী জেঠা। মিছে বলে নি। ধরণী দাস উঠে বললে—বেশ চা মা। ভাল চা। লাও পয়সা লাও।

—না। আপনার কাছে পয়সা নিতে পারব না আমি!

—না না মা, ও করে না। লোকসান হবে। তোমার এটা ব্যবসা।

—যে ব্যবসাতে জেঠার কাছে খাইয়ে দাম নেয় সে ব্যবসা আমি করি না!

ধরণী দাস কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না, জগৎপুরের চাটুজ্জে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললে—আমার সেই লোকটা কোথায় গেল? ওই যে মাটির বাসন সাজাচ্ছিল?

মালতী ঘরের কোণের দিকে তাকালে। সত্যিই তো সে লোকটা নেই। মাটির গেলাস কপ্‌টেগুলো সেই আধসাজানো হয়ে পড়ে আছে। সে কই?

মালতী বললে—তা তো জানি নে! কোথাও গিয়ে থাকবে!

—কোথা গেল?

—তা কি করে জানব বলুন? বলে তো যায় নি। এত লোকের ভিড়ের মধ্যে দেখি নি তো।

—লক্ষ্মী! ওরে ও লক্ষ্মী! লখা—আ—লখা—আ। কি বিপদ! ঢাল—কুমড়োগুলো ঢাল ওই বাইরে।

বস্তা বস্তা কুমড়ো এনেছে। ঢালতে লাগল।

মাসী কুমড়োগুলো দেখে হঠাৎ বলে উঠল—আঃ একটা বিলাতী কুমড়ার জন্য! আর এত বিলাতী কুমড়া! আঃ! গড়াগড়ি যায়। এঁ্যা!

চাঁপার আপসোস হচ্ছে—একটা বিলাতী কুমড়োর জন্যে দুই মেতনের এত বড় ঝগড়াটা হয়ে গেল!

মালতী হাসলে। চাঁপা মাসী বেশ!

আবার বসন্ত এল। পিছনে একটা লোক একটা হেজাক বাতি জেলে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এল। বসন্ত বললে—এই নে এটা রাখ। জেলেই নিয়ে এলাম। রাখ রে রাখ।

মালতীর মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল একবার, পরক্ষণেই সে দীপ্তি রইল না। বললে—কোত্থেকে আনলে?

—আনলাম। এত খবরে তোর দরকার কি? পেলি—দোকানে টাঙিয়ে দে। শুনলাম, গত হাটে শ্রীমতী হেজাক জেলেছিল। ধর। হাসলে বসন্ত।

বসন্ত দোকানে ঢুকে বসল—বললে—আর এক কাপ চা দে।

চাঁপা বললে—নতুন দেখি বসন্ত মানিক!

—হ্যাঁ নতুন।

মালতী চায়ের কাপ এনে সামনে নামিয়ে দিলে। প্রশ্ন তার মনে উঠেছিল কিন্তু চারজন

খদ্দের বসে খাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করা হল না।

বসন্ত আলোটা টাঙাবার জন্যে তার বেঁধে আংটা তৈরী করে এনেছে। ঠাকুর টিকুলি সকলেই খুশী হয়ে উঠেছে আলো দেখে। ঠাকুর আলোটা টিনের চালের বাঁশে তারের আংটা লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে বললে—বাঃ!

বসন্ত চা শেষ করে উঠে যাবার সময় মালতী বললে—বসন্তদা।

বসন্ত ঘুরে দাঁড়াল।

—আলোটার কত দাম নিলে?

—কেন?

—দামটা দিতে হবে তো!

বসন্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে—ওটা তোকে আমি দিলাম।

—দিলে?

—হ্যাঁ। সে আর দাঁড়াল না চলে গেল। মালতী তাকিয়ে রইল আলোটার দিকে। দিনের আলো শেষ হয়েছে কিন্তু রাত্রির অন্ধকার এখনও ফোটে নি। আলোর দীপ্তি এখনও ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে। মালতীর মনটায় যেন কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। বসন্ত যেন দিনের আলোর মধ্যে ওই হেজাক আলোটার নিষ্প্রভ দীপ্তির মত নিষ্প্রভ হয়ে গেছে হঠাৎ। আজ প্রথম হাটের সময় যে-কথাগুলো সে ওই লোকটাকে বলেছে সেই কথাগুলো তার মনে ঘুরছে। বসন্ত যেন তার অচেনা মানুষ হয়ে গেছে। বুঝতে পারছে না। জোবেদা বিবি বলত—শুনে রাখ তুই ছুঁড়ি কচি; শুনে রাখ তোর কাজে লাগবে—

হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল শ্রীমতী। কাল মোটা শ্রীমতীর পরনে হাতিপাঞ্জা শাড়ি, হাতে দুগাছা সোনার রুলি; মাথার চুল টেনে বাঁধা, ছোট্ট একটা ঝুঁটি। কানে দুটো ফুল—নাকে নাকচাবি, গালে পান। শ্রীমতী মোটা বিশ্রী কিন্তু চোখ দুটো বড় বড়। এখনও তার বাহার আছে। শ্রীমতী দুই হাত কোমরে রেখে বেশ ভঙ্গি করে দাঁড়াল। মালতী প্রশ্ন করলে—কি পিসী?

কাটা কাটা কথায় শ্রীমতী বললে—কি আবার! দেখতে এলাম।

—কি?

—আলো!

চাঁপা বললে—নতুন এল।

—হুঁ বসন্ত ঠাকুর দিয়ে গেল। শুনেছি। তাই দেখতে এলাম। বলি হেজাক আলো তো দেখেছি। তা প্রেমমার্কা হেজাক আলোর আলো কেমন খুলেছে তাই দেখতে এলাম।

মালতী বললে—তোমার হেজাকটা বুঝি এখন বিরহ-মার্কা হয়ে গেছে পিসী!

—কি? কি বললি বেহায়া ছুঁড়ি—

—যা বলেছি তুমি শুনেছ।

—মালতী!—চীৎকার করে উঠল শ্রীমতী।

মালতী চট করে একখানা ছাঁকনা হাতে নিয়ে বললে—শোন পিসী। এর পর বেশী

চেঁচাবে তো এই ছাঁকনার ঘায়ে মুখটা তোমার ছেঁচে দেব।

শ্রীমতী পিছিয়ে গেল সভয়ে। মালতী চীৎকার করে উঠল—হ্যাঁ জেলেছি—প্রেমমার্কা হেজাকই জেলেছি। বেশ করেছি। আমি বেহায়া—আমি জেলখাটা মেয়ে পিসী—তুমি যাও। তুমি যাও।

চাঁপা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে ডাকলে—মাসী! মালতী! কন্তে!

মালতী যেন পাগল হয়ে গেছে অকস্মাৎ। সে থরথর করে কাঁপছে। দেখতে দেখতে লোক জমে গেছে। হাটের লোকেরা যারা সামনের ফাটল পথ ধরে যাচ্ছিল তারা থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, যারা দূরে ছিল তারা ছুটে এসেছে। আরও আসছে। শ্রীমতী ভিড়ের মধ্যে মিশে নিজের দোকানে চলে গেল। ভুবনেশ্বরতলায় কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। অন্ধকার ক্ষণে ক্ষণে গাঢ় হয়ে উঠছে। হেজাক আলোটার আলো ক্রমশঃ শুভ্র দীপ্তিতে ঝলমল করে উঠছে।

মালতীর এতক্ষণে যেন সংবিৎ ফিরল। সে ছাঁকনাখানা ফেলে দিয়ে বললে—দোকানে একটু ধুনো দাও মাসী! সামনে ভিড় করবেন না। সরুন। আর তো কিছু নাই—। সে বসল তার চেয়ারে।

ভিড় সরতে লাগল। একজন কে বললে—লে বাবাঃ আজ হাটে নারদ এসেছে!

জগৎপুরের চাটুজ্জে এসে ঢুকল দোকানে—সঙ্গে ঘোষ। শুধু ঘোষ নয় আরও তিনজন লোক। তাদের বললে—নে সব তুলে গাড়িতে বোঝাই কর। আগে মাটির বাসনগুলো নে বাবা। দোকান জুড়ে আছে। নে। দেন গো আমাদের চা দেন দেখি। চপ খানকতক ভেজে ঠোঙায় মুড়ে দেন।

চাটুজ্জে বসল। ঘোষ বললে—দেখো বোতল না ভাঙে। চপ নেওয়া মিছে হবে।

মালতী নিজে হাতে ওদের চায়ের কাপ নামিয়ে দিলে। আবার সে শান্ত হয়ে গেছে। বললে—শিঙাড়া কচুরি?

—ডিম দাও দুটো করে। বেশী নয়। হ্যাঁ আর শিঙাড়া গোটাকতক দাও তো ঠোঙায় করে গাড়োয়ানদের জন্তে।

মালতী ফিরে তাকাল যে বাসন তুলছিল তার দিকে। তার মনে পড়ে গেল সেই ছোকরার কথা। প্রিয়দর্শন সেই নথার কথা। হঠাৎ কোথায় চলে গিয়েছিল সে। সে প্রশ্ন করলে—তাকে পেলেন? সেই নথাই আপনাদের?

হেসে উঠল চাটুজ্জে—বলবেন না আর তার কথা। বেটার শ্বশুরবাড়ি কাছেই। অবিশ্যি যাবার কথা বলে এসেছিল। বলেছিল হাটের কাজ সেরে শ্বশুরবাড়ি যাবে। কাল ফিরবে। তা বেটার আর তর সয় নাই—বেটা সেই চারটের সময়েই ভেগেছে।

একটা বড় চণ্ড শব্দ করে ভুবনেশ্বরতলার কাঁসর ঘণ্টা থামল। ধ্বনি উঠল অনেক লোকের মিলিত কণ্ঠে—জয় বাবা ভুবনেশ্বর!

"বাবা ভুবনেশ্বরো মনের বাঞ্ছা পূরণ করো।" হাটুরেরা দাঁড়িয়ে উঠে প্রণাম করছে।

ছয়

চাঁপা বাড়িতে জিনিসপত্র সামলে গা ধুয়ে মালতীর অপেক্ষায় বসেছিল। মালতী হাটের দোকান বন্ধ করে ভুবনেশ্বরতলায় প্রণাম করে আসছে। চাঁপা তার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল, যুবতী মেয়েকে রাত্রিকালে একলা ভুবনেশ্বরতলায় আর ভাঙা হাটে কি করে রেখে আসবে। মালতী হঠাৎ রেগে উঠেছিল। মালতীর যেন আজ কি হয়েছে। বলেছিল—আমার পাশে সে রাত্রে দাঁড়িয়ে থেকে বাসুদেব দোবেকে কোপ মারা বন্ধ করতে পেরেছিলে? আমাকে তুমি রাগিয়ো না মাসী। তুমি বাড়ি যাও। তুমি থাকলে হবে না আমার। যাও।

চাঁপা করুণভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—আজ তুমি এমন কেন করছ মালা?

মালতী বলেছিল—মাসী পায়ে পড়ি তুমি যাও।

পরক্ষণেই বলেছিল—এই টিকুলি তো থাকল আমার সঙ্গে। ও বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—টিকুলি! মালা—

—বুঝেছি মাসী। টিকুলি সঙ্গে থাকলে লোকে বেশী মন্দ বলবে। বলুক মাসী—বলতে দাও। লোকে যা বলবে আমি তাই। যাও তুমি, ভয় নেই।

চাঁপা অগত্যা একলাই বাড়ি এসে গা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে বসে আছে। মালতী এলে সে গৌরাঙ্গকে শয়ন দিয়ে জপ করবে। এর মধ্যে উনোনে কাঠকুটো দিয়েছে। ধোঁয়াচ্ছে। জ্বললেই দুটো ভাতেভাত চড়িয়ে দেবে। দাওয়ায় হেজাক বাতিটা জ্বলছে। মালতী এসে নিভুবে।

—বৈরেগী বউ! মালতী!

ডাক শুনে সচকিত হয়ে উঠল চাঁপা। বসন্ত ডাকছে। বসন্ত এসেছে। মালতীর জন্য সে শঙ্কিত হল, উৎকণ্ঠিত হল। বসন্ত এসে যদি শোনে মালতী এখনও হাটতলায় ঘুরছে, আসে নি, একা ঘুরছে তা হলে সে রাগ করবে—নিশ্চয় করবে। পুরুষেরা করে। কি করবে সে? একজেদী রাগী মেয়েটা নিজের সর্বনাশ একবার করেছিল, আবার করবে।

—মালতী! মালতী!

চাঁপা অগত্যা দরজা খুলে দিল।

বসন্ত বললে—কি গো? এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলে না কি?

—ঘুমাইব? সেই কপাল গরীবের? দীভার মানুষ এই কথা কইলা কি করে? নাও—বস। সে একখানা আসন পেতে দিল।

বসন্ত বসে বললে—মালতী কই?

—সে!—একটু থেমে ভেবে নিয়ে বললে—কি যে তার আজ হইছে সেই জানে বসন। সে আজ যেন ক্ষেইপা গিয়া—সে কি মূর্তি মা! যেন রণরঙ্গিনী।

—শ্রীমতীর সঙ্গে তো?

—তুমি শুন্যাছ ?

—শুনি নাই ? শুনেছি। হাটের গোল !

—বড় তেজী কন্যাটা—কি যে কপালে আছে ওর—

—ভালই আছে। ভেবো না। আমি শুনে কি খুশী যে হয়েছি। সেই জন্যে তো এলাম।

—বল কি ? সত্যি খুশী হইছ ?

—নিশ্চয় সত্যি।

একটু চুপ করে থেকে চাঁপা বললে—তুমি অরে ভালবাস বসন্তসোনা—কন্যাটাও ভালবাসে। হাটের মাঝে কইল কি—হাঁ হাঁ—ও আলো আমার প্র্যামের আলোই বটে। তা—। আবার একটু থেমে বললে—তুমি ওরে বিয়া কর বসন। তুমি নিজে জাতি মান না। লীভারও বট। গাশে নামও হবে। ধর্ম্মও হবে বসন।

হাসলে বসন্ত। বললে—কি দরকার। ওবেলা তো বলেছি। মালতী যদি সত্যিই ভালবাসে তবে না হয় তোমাদের রাধার মত কলঙ্কিনীই হবে। মাথায় করে নেবে।

—কি বল বসন। রাধা কি মানুষের কন্যা হতে পারে ?

—হয়। হতে পারলেই হয়।

মালতী ঠিক এই মুহূর্তে বাড়ির বাইরের দরজায় ঢুকে থমকে দাঁড়াল। বললে—বসন্তদা ?

—হ্যাঁ রে ? এসেছিস। ভাল হয়েছে—জিজ্ঞেস কর চাঁপা বউ। ওকেই জিজ্ঞাসা কর।

—কি ? মালতী রাধা হতে পারে কি না ?

—হ্যাঁ। তুই শুনেছিস ? বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলি বুঝি ?

—শুনছিলাম।

—তা হলে, বল—শুনিয়ে দে মাসীকে। তুই শ্রীমতীকে বলেছিস হাটে, তা ওর বিশ্বাস হয় নি।

মালতী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না বসন্তদা। কথাটা তখন রেগেই বলেছি। নইলে মাসী ঠিক বলেছে। মানুষের মেয়ে রাধা হয় কি হয় না জানি না তবে আমার কান্নাকাটি পোষাবে না। ও-বেলাতেও অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা যখন হয়েছিল তখনও মাথার ঠিক ছিল না। কি বলতে কি বলেছি! জোবেদা বিবির কথাটা মনে পড়ে নি। জোবেদা বিবি বলেছিল—কেতাবের কথা,. গানের কথা মিছে কথা রে মালতী। মরদগুলা হল শয়তান বদমাশের জাত। ওরা মরদ কোকিলের মত, ডাকে ভাল কিন্তু বাসা বাঁধে না। দু'দিন পাশে পাশে থাকে—ওড়ে এক সঙ্গে। তারপর ছেড়ে পালায়। কোকিলের মেয়ে কাঁদে না। কাকের বাসায় ডিম পেড়ে খালাস। মানুষের মেয়েরা তা পারে না—কাঁদে! বলেছিল—মালতি, শাদি না করে মহব্বতি যদি কোন মানুষের মেয়ে করে তবে সে যেন গলায় দড়ি দেয়, নয় তো—

চুপ করে গেল মালতী।

বসন্ত তার মুখের দিকে তাকিয়েই ছিল। বিচিত্র চরিত্র বসন্ত একালের বিচিত্র নবভাবের মানুষ—সে কৌতুক অনুভব করছিল মালতীর কথা শুনে। মালতী চুপ করতেই সে বললে—নয় তো—কি ?

—সে খারাপ কথা। জেলখানায় কথাটা বেরুতো, আটকাতো না। এখানে কেমন আটকে যাচ্ছে জিভে। নিজেরই আশ্চর্য লাগছে।

—বুঝেছি জোবেদা বিবি হয়তো বলেছে বেশ্যা হয়! হয়তো ঠিকই বলেছে। কিন্তু আমি তো তেমন ভালবাসার কথা বলি নি রে। আমার ইচ্ছে তুই এ যুগে এখানে একটা আশ্চর্য মেয়ে হয়ে উঠবি। পড়বি। চিরদিন কেন দোকান করবি ? পড়ে কাজ করবি আমার সঙ্গে! কত মেয়ে একালে লীডার হচ্ছে। বিয়ে করছে না—সারাজীবন দেশের কাজ করছে।

—না। বিচিত্র হেসে মালতী বললে—না। ও আমার পোষাবে না। সাধও নাই। তুমি বরং অন্য মেয়ে-চ্যালা দেখো।

—তুই পারতিস মালতী।

মালতী বললে—না পারতাম না। আমার বড্ড মাথা ধরেছে বসন্তদা—আমি শুচ্ছি গিয়ে। যাবার সময় ওই আলোটা নিয়ে যেয়ো।

পরের দিন সকালে চাঁপা আর মালতী দোকান খুলে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে বসতে না বসতে খদ্দের এল। শ্রীমতীর দোকান এখনও খোলে নি। ঠাকুর এখনও আসেনি। টিকৃলি বসে আছে। টিকৃলি বললে—ঠাকুর হয়তো আসবে না দিদি।

—আসবে না ? কে বললে ?

—কাল ঠাকুর বলছিল।

—কি বলছিল ?

—বলছিল—এত খাটুনি। আমি পারব না। মাইনে কম।

—মাইনে তো আমি ঠিক করিনি। কুণ্ডুমশাই ঠিক করে দিয়েছে।

—তা জানি না।

—তুই একবার দেখে আয় না।

টিকৃলি দেখতে গেল। ঠাকুর থাকে খানিকটা দূরে গন্ধেশ্বরী বাজারের কাছে। বামুনের ছেলে ঠাকুর। প্রৌঢ়বয়সে কেলেঙ্কারী করে ফেলেছে। একটা ছোটজাতের মেয়েকে নিয়ে ঘর করছে। রান্না খুব ভালই জানে। এককালে দে বাবুদের কলিকাতার গদিতে কাজ করত। সেখানে রান্নাবান্না শিখেছিল ভাল। তারপর সেখানেও ওই একটা খারাপ মেয়ের পাল্লায় পড়ে। বহুকষ্টে সেখান থেকে মুক্ত হয়ে দেশে এসে আবার ওই কাণ্ড করে দেশের সমাজে পতিত হয়েছে। লোকে কেউ বাড়িতে ওকে রাখে না। সামাজিক খাওয়াদাওয়াতেও ওর স্থান নেই। এতদিন এখানে ওখানে ফিস্টিটিস্টিতে রান্না করে দিত। আর কুণ্ডুর দোকানে বসে থাকত। কুণ্ডুর প্রিয়পাত্র। কুণ্ডু গাঁজা খায়—সেই গাঁজা তৈরী করত ঠাকুর।

কুণ্ডুই দোকানে ওকে একটা কাজ দিয়েছিল—সেটা প্রায় চাকরের কাজ। মালতীকে দোকান করে দিয়ে কুণ্ডুই তাকে পাঠিয়েছে। সমাজে না চলুক, ঘরে না চলুক, চা চপের দোকানে কথা উঠবে না এটা কুণ্ডু জানে। লোকটি মন্দ নয়। ভালই। হঠাৎ তার মাথায় মাইনের পোকা উঠেছে। একালের ধর্মই এই।

এদিকে খদ্দের এসেছে। এরা হাটে ঘাটের যাত্রী। মানে রাত্রে সড়ক ধরে গরুর গাড়ি করে যাচ্ছিল—পথে ভুবনপুরের হাটে গাড়ি নামিয়ে বিশ্রাম করছে। সকালবেলা প্রাতঃকৃত্য করে আবার রওনা হবে। কিংবা হয়তো গন্ধেশ্বরী বাজারেই বেচাকেনা করবে। হাটে গাড়ি রেখে ঘুমিয়েছে। সারাদিন এখানে বেচাকেনার কাজ সেরে রওনা দেবে। কিংবা রেজিস্ট্রি আপিসে এসেছে। দলিল রেজিস্ট্রি হবে। দূরে বাড়ি। রাত্রে এসে প্রথম আপিসেই কাজ সেরে ফিরবে।

ভুবনপুরের রেজেস্ট্রি আপিস প্রায় হাটের সামনে—সড়ক রাস্তাটার ওপাশেই, রাস্তার উপরে। বলতে গেলে রেজেস্ট্রি আপিসও হাটের সামিল। কেবল ওদের লাইনটা আলাদা। হাটের ওদিকটায় রাস্তার উপরে পাঁচ সাতখানা ঘরে রেজিস্ট্রি আপিসের দালালরা কাজ করে। দলিল লেখে। সনাক্ত দেয়। তবে দলিলের মাথায় শ্রীদুর্গা সহায়ের পাশে ৺ভুবনেশ্বর সহায় লেখে। অনেকে ভুবনেশ্বরতলায় এসে প্রণাম করে বলে—বাবা সাক্ষী, খুশী হয়ে বেচলাম—ছেলেপিলে নিয়ে ভোগ কর। আর একজন বলে—বাবার দয়ায় এই বিক্রির দামেই তোমার কাজ সুশেষ হোক। দুঃখ থাকলে ঘুচুক। অভাব থাকলে মিটুক। তারপর প্রসাদী মণ্ডা খেয়ে দীঘির ঘাটে জল পান করে বাড়ি যায়। আজকাল একটা কুয়ো হয়েছে। দীঘির জল দূষিত হয়। সে জল খায় না। তবে স্পর্শ করে।

নিজেই চা তৈরি করলে মালতী। খদ্দের চারজন। চার কাপ চা সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে—বিস্কুট দোব? ভাল বিস্কুট আছে।

—বিস্কুট? তা দাও খান চার করে। শিঙাড়া হয় নি?

—না। বাসী গরম করে আমরা দিই না। এই সব তৈরী হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হয়ে যাবে।

ফিরে এসে সে মাসীর সঙ্গেই লাগল। শিঙাড়া নিমকির বিক্রি বেশী সকালবেলা, ওগুলো তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। শরীর ভাল নেই। কাল রাত্রে তার ঘুম হয়নি। জেগেই ছিল প্রায় শেষ রাত্রি পর্যন্ত। ভোর রাত্রে একটু তন্দ্রা এসেছিল কিন্তু সে তন্দ্রাই। এলোমেলো স্বপ্নে ভরা।

কাল রাত্রে সে বসন্তকে কথাগুলো বলে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। মনটা তার কেমন হয়ে গিয়েছিল। এখনই রাগ হচ্ছিল—তারপরই তার মন যেন কান্নায় ছুয়ে পড়ছিল। আবার কিছুক্ষণ পর মন ফিরছিল দোকানের কাজের দিকে। তখন কান্না রাগ দুই ঝেড়ে ফেলে দিতে চাচ্ছিল সে। আবার কিছুক্ষণ পরেই আপনাআপনি মন উদাস হয়ে পড়ছিল।

—তুমি নিজে লেগে পড়েছ যে গো?

মালতী ময়দায় জল দিয়ে নিমকির ময়দা মাখছিল। সে মুখ তুলে তাকালে। ঠাকুর বলছে। ঠাকুর এসেছে। তার ভুরু কুঁচকে উঠল। কালকের মনের সেই অবস্থা যেন এখনও রয়েছে। থাকারই কথা। হঠাৎ রাগ হয়ে যাচ্ছে। ভুরু কুঁচকেই সে বললে—খদ্দের এসেছে। টিকলি বললে—তুমি আজ আসবে না—মাইনে—।

থেমে গেল সে। মনে হল খদ্দেরদের সামনে মাইনের কথা তুলে ঝগড়া না করাই ভাল।

চাঁপা বললে—থাক না মালা। ওই কথাগুলি হবে অখন। নাও অখন কামে লাগ বাবাধন। এত বেলা করে মানিক!

ঠাকুর গায়ের কাপড় খুলে দড়ির আলনায় ঝুলিয়ে দিতে দিতে বললে—মাইনের কথা আমি বলি নাই। ও টিকলি ভুল শুনেছে। গা জর জর করছে কাল রাত থেকে। তাই বললাম—কাল তো মঙ্গলবার, হাট নাই, কাল হয়তো—। নাও সর।

মালতী ছেড়ে দিয়ে এসে তার জায়গায় বসল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। মনটা তার আবার উদাস হয়ে উঠেছে। কাল রাত্রে বসন্ত তাকে তারপরও ডেকেছিল।

—মালতী! শোন।

সে জবাব দিয়েছিল—না বসন্তদা ওই সব কথা আমি শুনতে পারব না। লীডার হতে আমি পারব না। তোমার ওই ভালবাসা আমার সহ্য হবে না। আমি সামান্য মেয়ে—তার উপর জেলফেরত। তুমি মস্ত লীডার মানুষ। তুমি ফিরে যাও আলোটা নিয়ে যাও। আর বললাম তো শরীর আমার ভাল নাই!

বসন্ত এরপর চলে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর চাঁপা তাকে ডেকেছিল।

—কত হল আমাদের?

—চার কাপ চা, ষোলখানা বিস্কুট। আট আনা।

—বিস্কুট এক পয়সা করে?

—হ্যাঁ।

এক টাকার নোট ফেলে দিয়ে লোকটি বললে—বিড়ি দু' বাণ্ডিল।

দাম কেটে নিয়ে পয়সাগুলি নামিয়ে দিলে মালতী। লোকটি বললে—সুপুরি মসলা কিছু নাই?

—এই যে। সুপুরির ডিসটা বের করতে ভুলে গেছে মালতী। মন তার এখনও কালকের কথায় ঘুরছে। কালকের কথাই তো নয় সে কথা আজকের কথাও বটে। শুধু আজকেরই বা কেন? আসছে কালের কথাও বটে। পরশুর কথাও বটে। সে জেলখানায় প্রথম ধাক্কা সামলাবার পর থেকে বসন্তর কথাই ভেবে এসেছে। মধ্যে মধ্যে জোবেদা তাকে বলত—মালতী, জেল থেকে খালাস পেয়ে খুব হিসেব করে চলবি। খবরদার—অনেকে ভুলাবে তোকে। ভয় দেখাবে। খুন করে জেল হয়েছে তোর। খুব শক্ত হবি। শাদি করিস্ যদি আটঘাট বেঁধে শাদি করবি, খাঁটি শাদি। যেন ঝুটা শাদি না হয়। আর

দেহটাই যদি বেচতে হয় তবে গাঁয়ে থাকিস্ না শহরে যাস্। প্রেমের ভুলে ভুলিস্ না। খবরদার। সে হাসত। বলত—আমার শাদি ঠিক হয়ে আছে। সেও জেলখাটা লোক জোবেদা দিদি। জোবেদা বিবি তার গল্প শুনেছিল। জানত। সে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিল—সেই একদিন মাঠের মধ্যে তোকে বুকে নিয়েছিল বলে বলছিস্? ছোকরা বলছিস্ বামুন। বক্তৃতা করে। একটু থেমে হেসে বলেছিল—তোর জেল আর তার জেল এক নয় মাল্‌তী। সে জেল থেকে বাহিরে আসলে তার কালোরঙ গোরা হবে। খাতির বাড়বে। সে শাদি করবে এ আমার মনে নেয় না রে। তার রাগ হত। সে শুধু বলত—তুমি তাকে জান না জোবেদা দিদি! জোবেদা জবাব দেয় নি এর। সে রাত্রে শুয়ে কল্পনা করত বসন্ত তাকে দেখবামাত্র দু' হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নেবে। তারপর বলবে—তোর জন্যে আমি বসে আছি। চল্ সদরে গিয়ে রেজেস্ট্রি করে আসি। তারপর জেলখানার উঁচু ছাদ আর মোটা দেওয়ালের মধ্যে সে নানান কল্পনা করত। বিয়ের পর কি করবে? কল্পনা তার লীড়াময়ী করারই ছিল। কিন্তু সে কল্পনার সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিশত জোবেদা বিবি নীহারদিদির নানান কল্পনার গল্প। বাধাবন্ধ পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায় সমস্ত চুরমার করে ভেঙে দেওয়া সে এক কামনা-বাসনার রাজ্য বল রাজ্য, সংসার বল সংসার।

জোবেদা বিবি ছিল সব থেকে সমঝদার—সব থেকে বেশী জানা মেয়ে। আইন জানত—মানুষের মন বুঝত। বিচার করত পণ্ডিতের মত। তর্ক করত উকিলের মত। বসন্তর চেয়েও ভাল। যেবার সেই বড়লোকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সতীনপোকে বিষ দিয়ে মেরে জেলে এল সেইবার তাকেই বলেছিল জোবেদা বিবি। জোবেদা বিবি সন্ধ্যের পর জমিয়ে বসে খারাপ গল্প বলছিল—সেই বড়লোকের স্ত্রী দূরে বসে ছিল। সে হঠাৎ উঠে এসে বলেছিল—তুমি কি? এই সব গল্প এই সব কথা বলছ?

জোবেদা তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল, তারপর তার চোখ জলে উঠেছিল।—তুমি কখনও ভাব নি? না? মনে মনে?

—না।

—মিছে কথা। দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার, সতীনপোকে বিষ দিয়ে মারে যে সে এসব ভাবে নি? সতী আমার! পুণ্যবতী আমার! তুই জপ করিস। তোর ইষ্টদেবতা আছে—বল্ তাকে সাক্ষী করে বল্—ভাবিস নি?

—না—না—না! সে আমার দিকে খারাপ চোখে চাইত তাই—

—মিছে কথা মিছে কথা! তুই চাইতিস—সে চাইত না—হয়তো বাপকে বলে দেব বলেছিল তাই তুই তাকে বিষ দিয়ে মেরেছিস। দেখ্ আমি স্বামীকে মেরেছি আর একজনকে ভালবাসতাম বলে। তুই আমার চেয়েও পাপী, ভালবাসার লোককে পেলিনে বলে বিষ দিয়ে মেরেছিস!

সে বড়লোকের মেয়ে কেমন হয়ে গিয়েছিল। এক কোণে তার খাটে গিয়ে উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে শুয়েছিল।

জোবেদা বলেছিল—পাপ! পুণ্যি! কিসের পাপ পুণ্যি! তারপর সে মানুষের মনের

যে চেহারার কথা বলেছিল তা শুনে সবাই শিউরে উঠেছিল কি না জানে না মালতী। তবে সবাই চুপ করে শুনেছিল, অনেকে মুচকে মুচকে হেসেছিল কিন্তু মালতী মনে মনে শিউরে উঠেছিল। আবার অবাকও হয়েছিল। যেন সত্যিই বলছে জোবেদা।

পরে জোবেদাকে সে এ কথা বলেছিল। এক শান্ত অবসরে, নিভৃতে। জোবেদা হেসে বলেছিল—তোর মনটা কচি রে মালতী। বড় বাচ্চা আছিস তুই! মানুষের মন রে—সে সুখ নইলে বাঁচে না। সুখের পথে পাপ পুণ্য বাছাবাছি তার নাই। বাছতে সে চায় না। এ হল দুনিয়ার নিয়ম। মানুষ পাপ পুণ্য বেছেছে তৈরি করেছে। দুঃখ সয়ে পুণ্য করে কেঁদে যারা সুখ পায় তাদিকে সেলাম। পাপ করে লজ্জায় ভয়ে বিষ খায় গলায় দড়ি দেয়, আবার পুণ্যি করার দুঃখ সইতে না পেরে গলায় দড়ি দেয় বিষ খায়। এও যেমন ঝুট সেও তেমনি ঝুট। দেখ্—আমি নিজের সুখের জন্য স্বামীকে বিষ দিয়েছি। ওই বড়লোকের বউটা আরও পাপী। তুই পাপী নস। বাপকে বাঁচাতে হঠাৎ খুন করে ফেলেছিস। আমি জজ হলে তোকে খালাস দিতাম। তবু তুই দাগী হয়ে গেলি। বাইরে গিয়ে শুধু এই মনে রাখিস—দুঃখ কাউকে দিস না। দুঃখ করে সুখও খুঁজিস না। আবার সুখের লেগে পাগল হয়ে সুখ খুঁজিস না।

আড়াই বছরে আকণ্ঠ কামনার তৃষ্ণা নিয়ে সে ফিরেছিল। দেহের রোম কূপে কূপে তার কামনা। কিন্তু বসন্ত তার জন্যে ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করেছে এই আশাও তার ছিল অফুরন্ত। সব আশ্চর্যভাবে যেন গোলমাল হয়ে গেল। বেরিয়ে এসে সাত আট দিন—যত দিন বসন্ত আসে নি তত দিনও তার স্বপ্ন আশা সব ঠিক ছিল ; তার জেলখানার বাতাসে জলে তৈরী বাসনার রাজ্যের সঙ্গেও কোন বিরোধ ছিল না। ভুবনপুরে ঢুকে সে আশ্চর্য হয়েছিল—কিছুই চেনা যায় না। সব বদল হয়ে গেছে। বদল ঠিক নয় সব যেন উজ্জ্বল ঝকঝকে ঝলমলে হয়ে উঠেছে। তার আশাও আরও উজ্জ্বল হয়েছিল। বসন্ত উজ্জ্বলতর হয়েছে মাসী তাকে বলেছিল। কাল সকালে বসন্ত যখন বিয়ে না-করে ভালবাসার কথা বলছিল তাতেও সে নেশার ঘোরে সায় দিয়েছিল। কিন্তু কাল বিকেলে হাটের সময় বসন্ত ওই একটি লোককে যে সব কথা হাসতে হাসতে বললে তাতে তার একটা আতঙ্ক হয়ে গেল, যে আশা তার উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল সে আশা কালো হয়ে গেল। বসন্ত হয়তো দেবতা। না হয়তো খুব খারাপ। দু'দিক দিয়েই হাত বাড়ানো তার নাগালের বাইরে।

—"বিয়ে আমি করব না।" এ কথাটায় সেই মাঠের কথাটা মনে পড়েছিল।—"আমি তোকে ভালবাসি। জাত মানি না। বাবা মরলেই তোকে আমি বিয়ে করব।"

খচ করে বুকে যেন একটা খোঁচা বিঁধেছিল।

যেমন একটা নিষ্ঠুর কোপের মত আঘাত সে অনুভব করেছিল—বাসুদেব দোবেকে কোপাবার পর তার রক্তাক্ত দেহ দেখে—তেমনি নিষ্ঠুর আঘাত। জেলে ঢুকবার সময় যেমন ভয় হয়েছিল তেমনি ভয়। আদালতে রায়ের সময় যেমন সে অসাড় হয়ে গিয়েছিল তেমনি অসাড় হয়ে গিয়েছিল সে।

তাই রাত্রে হাটের পর মাসীকে বাড়ী পাঠিয়ে সে গিয়েছিল ভুবনেশ্বরতলায় ওই কুঁচলতা

জড়ানো অশথগাছটার দিকে। একটা টর্চ নিয়ে গিয়েছিল। আর একটা ছাঁকনা। সেই ছাঁকনার আঘাতে সে সেই বাঁধা ঘুটিংকে কেটে কেটে ফেলে দিয়ে বাড়ী ফিরেছিল।

ভুবনপুরের হাটে কতজনের বাঁধা ঢেলা খসে পড়ে যায়। ভুবনেশ্বর বলেন 'পূরণ' হবে না। ঢেলাগুলো মাটির তলায় ধুলোর মধ্যে হারিয়ে যায়। লাভের আশায় এসে কতজন লোকসান করে ফিরে যায়। তার ঢেলাটাও যাক্!

বাড়ি ফিরে বসন্তকে ফিরিয়ে দিয়েও সে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। ভাবছিল। কখনও কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু কাঁদেনি। কখনও কখনও দারুণ ক্রোধ হচ্ছিল—সেও সে সামলাচ্ছিল। কখনও ইচ্ছে হচ্ছিল সে নিজেই মরে। কিন্তু তাও যেন পারা যায় না। থমকে দাঁড়াতে হয়। ভয় করে।

মাসী এসে তাকে ডেকেছিল। দরজা খুলে দিয়ে সে ফিরে এসে আবার শুয়েছিল বিছানায়। মাসী মাথার শিয়রে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিল—মালা!

মালতী উত্তর দেয় নি।

মাসী বলেছিল—লেখাপড়া শিখ্যা—বসন্ত যা কইল—লীডার হতে পারবা না?

—না!

আবার কিছুক্ষণ পর মাসী বলেছিল—এর থেক্যা চল মাসী আমরা নবদ্বীপ যাই। মাসী বুনঝি—মা বেটী—

মধ্যপথেই মালতী বাধা দিয়ে বলেছিল—না!

আবার কিছুক্ষণ পর মাসী বলেছিল—কি করবা?

—যা করছি। ভুবনপুরের হাটে বেচাকেনা করেই চলবে মাসী!

—সারাজীবন মালা—

—হ্যাঁ মাসী। অনেক লাভ করব। পয়সা করব। হাসব খেলব—কেটে যাবে।

মাসী আর কথা বলেনি।

মালতী বলেছিল—আলোটা নিয়ে গেছে মাসী?

—হুঁ।

—চল মাসী ভাত খাইগে। ক্ষিদে পেয়েছে। কাল একটা হেজাক বাতি কিনব।

নিমকি শিঙাড়া ভাজার গন্ধ উঠছে। দালদার গন্ধ। শব্দ উঠছে—দালদা ফুটছে কড়াইয়ে।

দুজন লোক হাটের সীমানায় ঢুকছে। এখনও ওপাশের দোকানগুলো খোলেনি। এখনও সকাল রয়েছে। খাঁ-খাঁ করছে হাটতলাটা। জমাদার বসে ঝিমুচ্ছে। হাটের দিন জমাদারেরা আকণ্ঠ মদ খায়। শুঁইদের দোকানে ঝাঁট পড়েছে। আশ্চর্য আজ শ্রীমতীর দোকান এখনও খোলে নি। কতকগুলো হনুমান লাফালাফি করছে খেলা করছে শুঁইদের ছাদে। গাছের উপর বসে গোদাটা মধ্যে মধ্যে চেঁচাচ্ছে।

মাসী বললে—টুলু চৌধুরী আসে, সঙ্গে মক্কেল যেন শাঁসালো! ঠাকুর চেন না কি?

ঠাকুর দেখে বললে—না। বাইরের লোক।

—বেশ শাসালো লাগে না ?

—হ্যাঁ।

—এই দিক পানে আসে।

—চা খাবে। ওই তো আঙুল দেখাচ্ছে। টিকৃলি বেঞ্চিটা মোছ! ভাল করে।

মালতী তাকিয়ে দেখল। হ্যাঁ টুলু চৌধুরী তো। এসে অবধি ওকে দেখে নি মালতী। টুলু চৌধুরী রেজেস্ট্রি আপিসে দলিল লেখে। এখানকার জায়গা জমির খবর খতিয়ান দাগ নম্বর সব ওর হাতে। আবার মামলা মকদ্দমার তদ্বির করেও বেড়ায়। বয়স হয়েছে অনেক। বসন্ত ওকে বলত—টুলু পাণ্ডা। একালের আসল পাণ্ডা। ভুবনেশ্বরের পাণ্ডা। আর টুলু হল বিষয়েশ্বরের পাণ্ডা। রেজেস্ট্রি আপিসটা হল বিষয়েশ্বরের মন্দির। ভুবনেশ্বর আদর কম হওয়ায় একালে বিষয়েশ্বর হয়ে বসেছেন। ভুতি সরকারকেও তাই বলত।

ভুতি এবং টুলুর সামনেই বলত।

টুলু বলত—থাম রে বাবা থাম। নবুঠাকুরের ভিটেতে বসে শীতারির আপিস করেছিস। ওই ভিটের দলিল কেন্দুলীর মেলায় এই পাণ্ডা ছিল বলেই হয়েছিল। আমি লিখেছি দলিল। খতেন দাগ নম্বর সব আমার ঠোঁটস্থ—তোর বাবা হাতে ধরে বললে লিখে দিলাম। শ্রীমন্ত দুটো টাকা দিয়েছিল তার দলিলের জন্য। তোর বাবার কাছে পয়সা নিই নি! আজ বলবি বইকি পাণ্ডা।

হঠাৎ খোকাঠাকুরকে মনে পড়ে গেল। তার গান করা মনে পড়ল। তার বাবার সঙ্গে গাঁজা খাওয়া মনে পড়ল। তারপরই মনে পড়ল ধরণী জেঠার কথা।—মা এককথায় দলিলে সই করে দিয়ে চলে গেল।

বসন্ত বলত—পাগলা! একটা উল্লুক!

ওস্তাদ বলত একটা গর্দভ! মাথায় গোবর পোরা আছে!

টুলু চৌধুরী আর সেই ভদ্রলোকটি এসে দোকানে ঢুকল। টুলু বলল—বেশ ভাল চায়ের দোকান হয়েছে তোমার মালতী। আমাকে চিনতে পারছ তো?

মালতীকে উদাসীনতার মধ্যেও সচেতন হতে হয় খদ্দের এলে। এ ক'দিনেই তা একটু একটু করে অভ্যাস হয়ে আসছে। সে একটু হেসে বললে—চিনতে পারব না কেন? আপনি টুলুকাকা!

—ঠিক চিনেছ। দাও আমাদের চা দাও। আর খাবার কি হয়েছে? নিমকি শিঙাড়া। তাই দাও। ঠাকুরও ভাগ পেয়েছ। ঠাকুর, ইনি শহরের লোক। খাস বর্ধমানের। ভাল করে ভাজ। বুঝলে!

মালতী নিজে উঠে এসে বেঞ্চিটা পরিষ্কার করে দিলে। এবং চায়ের জায়গায় এগিয়ে গেল। টুলু চৌধুরী আর বর্ধমানের ভদ্রলোকটি মৃদুস্বরে কথা বলতে লাগল। হঠাৎ টুলু বললে—মালতী ওই ভাল সিগারেট কি আছে দাও দেখি।

ভদ্রলোকটি বললে—গোল্ডফ্লেক। টিন রয়েছে—খোলা না গোটা আছে?

—গোটাও আছে। মালতী চায়ে দুধ মেশাতে মেশাতে বললে। চা দু' কাপ এনে

নামিয়ে দিয়ে সিগারেটের টিন এনে দিলে। টুলু বললে—মালতী ইনি বসন্তের খোঁজে এসেছেন। বসন্ত তোমার বাড়িতে আছে না কি?

মালতী চকিত হয়ে তার দিকে তাকালেন। খপ্ করে রাগ হয়ে গেল তার। ভুরু কুঁচকে বললে—আমার বাড়িতে?

—হ্যাঁ। উনি ট্রেন থেকে নেমে গিয়েছিলেন গোপার বাবার ওখানে। তা ওরা বলেছে এখানে নেই, কোথা তারা জানে না। তা বসন্ত একখানা বাড়ি করেছে—সেখানে গিয়েছিলেন—সেখানেও আসে নি। ওইখানে শ্রীমতী বললে তোমার বাড়িতে উঠেছে।

বেশ কঠিন কণ্ঠে মালতী বললে—না। আমার বাড়িতে কেন উঠবেন তিনি? তবে কাল এসেছিলেন।

—হ্যাঁ সেই তো! কাল দোকানে এসেছিল। শ্রীমতী বললে নতুন হেজাক বাতি কিনে দিয়ে গিয়েছে। তারপর—

—হ্যাঁ সন্ধ্যের পরও একবার গিয়েছিলেন। তা আমার বাড়িতে উঠবেন কেন?

—তুমি রাগ করছ ক্যানে! আগে তো বসন্তের তোমাদের বাড়িতে আড্ডা ছিল। তোমাদের বাড়িতে ভাত পর্যন্ত খেতো।

স্তম্ভিত হয়ে গেল মালতী। কি বলতে চায় টুলু চৌধুরী?

টুলু বললে—খেতো না?

মালতী বললে—খেতো। থাকত। আড্ডা ছিল আমাদের বাড়িতে!

—তাই তো বলছি।

—তখন তার ভাল লাগত—আমাদেরও ভাল লাগত—

—ভাল লাগত?

—বেশ ভালবাসতাম। আসত থাকত খেতো। এখন ভাল লাগে না ভালবাসি না। কাল এসেছিলেন—চলে গেছেন। কিন্তু আপনি চান কি? বলুন তো!

ভদ্রলোকটি বললে—তুমি মিছে চটছ বাপু। সে কোথায় উঠেছে তাই জানতে চাচ্ছি।

—তা আমি জানি না।

—তোমাকে বলে নি?

ঝট করে মনে পড়ে গেল বসন্ত বলেছিল সে গোপাদের বাড়িতে উঠেছে। তবু সে বললে—না।

টুলু বললে—ভালবাসা চটল কি করে মালতী? কাল তো তোমার দোকানে নতুন হেজাক কিনে টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছে শুনলাম।

—আপনাদের হল?

—ঠাকুর আর দুটো শিঙাড়া আর দুটো নিমকি দাও।

ভদ্রলোকটি বললে—তুমি তাকে বলে দিয়ো বর্ধমানের—

মাঝপথে বাধা দিয়ে মালতী বললে—মাপ করবেন—আমি কাউকে কিছু বলতে পারব না।

—তাতে তার ভাল হবে—

—তার ভাল সে দেখবে। তার ভাল মন্দর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

বিশ্বভুবন যেন তেতো হয়ে গেল এই সকালবেলায়।

তেতো মন নিয়েই বসে ছিল। খদ্দের আসছে যাচ্ছে। বেশীর ভাগ আজ রেজেস্ট্রি আপিসের খদ্দের। মালতী চুপ করে বসেই ছিল। এর মধ্যে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল। হনুমানগুলো খেলা করছিল গুঁইদের ছাদে এবং তার পাশের আমগাছে। দুটো বাচ্চা হনুমান লাফালাফি করতে করতে ইলেকট্রিকের তার লাফিয়ে ধরে আর্তনাদ করে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে। মরে গেল। মা-টা ছুটে এল—এসে তার সে কি আকুতি! নেড়ে চেড়ে ডেকে—সে আকুতি দেখে মালতীর চোখে জল এল। মা শেষ পর্যন্ত মরা বাচ্চাটাকেই বুকে তুলে এক হাতে ধরে গাছের উপর উঠে গেল।

বসে থাকতে থাকতে তার অকস্মাৎ মনে হল সেও ঠিক এমনি করে মরা ভালবাসা বুকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে!

—সেই চপ না কি বলে—আছে? একটি তরুণ আর একটি তরুণী। বিস্ময়ের সীমা রইল না মালতীর। কালকের সেই লখাই আর সেই কালো মেয়েটি যে চপ কিনতে এসে দাম শুনে পালিয়েছিল।

—তুমি তো লখাই?

—হ্যাঁ।

—তুমি তো কাল চপ কিনতে এসেছিলে। দাম শুনে পালিয়ে গেলে?

লখাই বললে—না। উ কাল আমাকে দেখে পালিয়েছিল।

—তোমাকে দেখে? কেন?

—উ আমার বউ। আগ করে তিন মাস বাপের বাড়ী পালিয়ে আইচে। চপ খেতে মন হয়েছিল। কিনতে এসে আমাকে দেখে—

একটু হেসে চুপ করে লখাই।

মালতী বললে—তাই তুমিও বুঝি পিছন পিছন ছুটেছিলে!

—হুঁ। এখন বাড়ী চললাম ওকে নিয়ে। তা বলি—খা চপ খা। কাল তো খেতে এসে খেতে পাস নাই!

প্রসন্ন কৌতুকের আনন্দে মুহূর্তে মালতীর মুখ হাসিতে ভরে উঠল। সে একা নয়, চাঁপা হেসে উঠল, ঠাকুর হেসে উঠল, টিক্‌লি খিলখিল করে হেসে উঠল। মেয়েটা লজ্জায় ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বললে—খাব না আমি চপ। তুমি চল!

মালতী বললে—না—না—না! বস তোমরা দুজনে বস। ভেতরে এসে বস। ঠাকুর চপ তৈরি করে দাও। সব ছেড়ে চপ ভাজ। সব তো ওবেলার জন্যে তৈরী করাই আছে?

—দশ মিনিট। এখুনি দোব।

মেয়েটি কিন্তু কিছুতেই ভেতরে এল না। দোকানের একপাশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। হাসিমুখে চেয়ে রইল মালতী ধুলোভরা বে-হাটবারের হাটের দিকে। চোখ এক-

বারও পড়ছে না যেখানটায় হনুমানটার বাচ্চাটা পড়ে মরেছিল সেখানটার দিকে।

হাটতলায় রোদ ঝলমল করছে। সকালবেলা পুবদিকের ক'টা বড় বটগাছের ছায়া পড়ে। সূর্য গাছগুলোর মাথায় উঠেছে। অল্প অল্প গরম হয়ে রোদ মিষ্টিও হয়েছে। মালতীর মনের মধ্যেও খুশীতে ভরে গিয়েছে। বসন্ত না, টুলু চৌধুরী না—কোন কিছু নেই সেখানে। মনের এক কোণে ওর বাস্‌দেবের মাথাটা পড়ে থাকে—সেটা আছেই, পচে না। ভুবনেশ্বরতলায় বাঁধা ঢেলা পড়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে লাখে লাখে কিন্তু বাস্‌দেবের মাথাটা মনের মধ্যে পচেও না হারায়ও না। সেটা আশ্চর্যভাবে যখন তখন মনের চোখে পড়ে। বেশী করে খুশীর সময়। গোল মাথাটা যেন ঢালে গড়িয়ে এসে মাঝখানে থামে। সেটাও আসছে না।

ভুবনপুরের হাটমাহাত্ম্য সত্যি। এই সুখ এই দুখ, এই দুখ এই সুখ। আজ লাভ কাল লোকসান, কাল লোকসান পরশু লাভ। আজ জুড়লে কালকে ফাট এই হল ভুবনপুরের হাট। আজ ফাটলে কালকে জোড়া যার হয় না তার কপাল পোড়া।

চমকে উঠল মালতী।

গোঁ গোঁ শব্দে প্রবল গর্জন করে খান তিনেক জীপ গাড়ি রাস্তা থেকে বেঁকে হাটের ঢালে বট অশথের বেরিয়ে থাকা শিকড়গুলোর উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ঢুকে পড়ল হাটে। সামনের জীপে একজন হাত বাড়িয়ে পথ দেখাচ্ছে। যেতে যেতে থামল জীপখানা। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের গুলো।

টপ টপ করে নেমে পড়ল হাওয়াই সার্ট পেণ্টুলুন পরা দেশী সায়েব। আট দশ জন।

—দেখ—চা দেখ। জলদি করতে বল।

একজন ব্যস্ত হয়ে এসে বললে—ভাল কাপ ডিস আছে তো? দেখি!

মালতী ব্যস্ত হয়ে বললে—নতুন আছে স্যার, বের করে দিচ্ছি!

স্যার সে জেলখানায় শিখে এসেছে। পোশাক দেখে রকম দেখে বুঝেছে এরা সরকারী কর্মচারী।

চায়ের কাপ কেনা ছিল। থাকে দোকানে। চায়ের কাপ ডিস ভাঙছেই ভাঙছেই। সব কাপ ডিস বের করে ও নিজেই ধুতে বসে গেল।

একজন কর্মচারী জিজ্ঞেসা করলে—ওইটে তো বট অশথতলা ভুবনেশ্বরের?

ঠাকুর বললে—আজ্ঞে হাঁ।

কাপ ডিস ধুয়ে এনে সাজালে মালতী টেবিলের উপর। জলটা এখনও ঠিক ফোটে নি। সে এগিয়ে এসে বললে—বিস্কুট আছে ভাল। দোব স্যার?

সকলেই তার দিকে বিস্মিত হয়ে চেয়ে রয়েছে। মালতী রাঙা হয়ে উঠল একটু। মুখ নামিয়ে বললে—দোব স্যার?

—কি বিস্কুট?

—থিন অ্যারারুট—সার্কাস—

—বাঃ! দাও চারখানা করে দাও।

মালতী বয়াম খুলে বিস্কুট বার করতে লাগল। শুনতে পেলে একজন বলছেন—ভদ্র-লোকের মেয়ে মনে হচ্ছে। চায়ের দোকান করছে। দোকানের মালিকের আইডিয়া আছে!

মনে মনে প্রচুর কৌতুক অনুভব করলে মালতী। চাঁপা অবাক হয়ে গেছে মালতীর কথা-বার্তা বলবার রকম দেখে। এতটুকু ভয় নেই। তা মালতীর নেই। জেলে জেলার জেল-সুপারদের সে দেখেছে—মধ্যে মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন। তাদের সঙ্গে কথা বলারও অভ্যাস আছে। বিস্কুট বের করে সে ঠাকুরকে বললে—ঠাকুর বেঞ্চি দুখানা বের করে দাও। সাহেবরা বসুন।

এর মধ্যে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। টুলু চৌধুরীও আছে।

সায়েবরা চা খেয়ে খুশী হয়ে দাম দিয়ে বললেন—বেশ তোমাদের সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ওপারে আমাদের সেটেলমেন্টের ক্যাম্প পড়ছে। দোকান ভাল করে কর!

জীপ হাঁকিয়ে চলে গেল সায়েবরা ওই অশথ বট বনের ওদিকে। দোকানের সামনে দিয়ে—ভুবনদীঘির হাটের উপর দিয়ে—চুলকাটার জায়গাগুলো মাড়িয়ে মড় মড় করে গোঁ গোঁ করে চলে গেল।

মালতী খুশী হয়ে গেছে খুব। সায়েবরা সব খুশী হয়েছে। এতটুকু ভুল করে নি। এতটুকু ভয় করে নি।

ঠাকুর বললে—মাসী এবার আরও লোক রাখ। খদ্দেরের ভিড় খুব হবে।

মালতী ভাবছিল চেয়ার টেবিল হলে ভাল হয়। আরও জায়গা হলে ভাল হয়।

টিকলি ছিল না—সে ওই লখাই আর তার বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে গিয়ে-ছিল। সে ফিরে এল। বললে—মজার খবর মালতীদিদি! চিমতী দোকান খোলে নাই ক্যানে জান? সে, তার কে হয়—বিধবা অল্পবয়সী মেয়ে, তাকে আনতে যেয়েছে! দোকানে বসাবে!

মালতী হাসলে। কিন্তু সে নিয়ে মনে তার কোন চঞ্চলতা এল না। দোকানের কথা ভাবছিল। ভাল সুন্দর দোকান।

সাত

দু'বছর পর। ভুবনপুরের হাটে সোমবারের হাটের সকালবেলা। হাট বিকেলে বসে কিন্তু সকাল থেকেই যেন হাট বসে গেছে। অনেক মানুষ এসে জমেছে হাটতলায়। অন্ততঃ একশো দেড়শো। দোকানও এসে বসে গেছে। তবে তরকারির কাঁচা বাজার নয়। তাল-পাতার চ্যাটাই কুলো ডালা আসে নি। তবে মোড়া এসেছে—খেজুর চ্যাটাই এসেছে। খাসী মুর্গী আসে নি তবে একটা গাছতলায় ডালে কাটা পাঁঠা ঝুলছে। কার ফিতে ফেরিওলা এখনও আসে নি। খাবারের দোকান খুলেছে, চায়ের দোকানে লোকের ভীড়ের শেষ নেই। ধরণী দাস প্রভৃতিরা কাপড়ের দোকান খুলে বসেছে। পান বিড়ি সিগারেটের

দোকান বসেছে—টবের বাক্স নিয়ে ফলওয়ালা দোকান তুলেছে।

হাটের চেহারাও পালটে গেছে। হাটের মাঝখানের জায়গাটা ঘিরে চারিপাশেই কায়েমী দোকানঘর গড়ে উঠেছে। পাকা ইঁটের দেওয়াল পাকা ছাদ। পাকা দেওয়াল টিনের চাল। মাটির দেওয়াল টিনের চাল খড়ের চাল। একখানা দুখানা নয়।

টুলু চৌধুরীই শুনছিল, শুনে হরিপুরের বিশিষ্ট সম্পত্তিশালী এককালের জমিদার পাটু চক্রবর্তীকে বললে—তের নয় বারো। ওই যে ফলওয়ালার আর তরকারি পরোটার দোকান ওটা একখানাই। মাঝখানে পাঁচিল থাকলেও চাল একটা। মালিক একজন। ভাড়াটে দুজন। আমাদের হরি মিস্ত্রি পাণ্ডা ছিল—তার পরিবারের গহনাটহনা বেচে ঘরটা করলে, প্রতুল ঠিকেদার ঠিক এক মাসে তুলে দিলে। ওই ঘর করে ভাড়া দিয়ে বিধবা বেঁচে গেল। দুটো দোকানে তিরিশ টাকা ভাড়া। প্লট একটা—ভুবনপুর মৌজার তিনশো চার খতেনের হাজার পঁয়ত্রিশ নম্বর প্লট।

পাটু চক্রবর্তী বসেছিল গাছতলায় একটা মোড়ার উপর। নতুন মোড়া। একখানা খেজুর চ্যাটাইয়ে তার কর্মচারীরা বসে আছে। দাঁড়িয়ে আছে টুলু চৌধুরী।

সব সেটেলমেণ্ট আপিসের মামলায় এসেছে। কারও উপর নোটিশ হয়েছে—কাগজ দেখাতে হবে। কেউ এসেছে ডিসপিউট দিতে। তার জমি অপরের নামে রেকর্ড হয়েছে। কিছু নিরীহ মানুষ কিছু জটিল চরিত্র বিষয়ী লোক। নিরীহদের জমি তাদের নামে ওঠে নি। কুটিল চরিত্রের বিষয়ীরা এসেছে সম্পত্তি বেনাম করে রেকর্ড করাতে, অপর একজন বিষয়ীর সঙ্গে এক জমি নিয়ে জটিল জট পাকিয়ে। এখন থেকেই তারা সাবধান হচ্ছে। জমিদারি গিয়েছে—জমিও নাকি পঁচিশ তিরিশ একরের বেশী থাকবে না, সেগুলি এখন থেকেই তারা দলিল করে ছেলে বউ মেয়ে নাতিদের নামে আলাদা আলাদা নামে রেকর্ড করাচ্ছে। জমিদারেরা জমিদারির খাস পতিত যা জমিদারির স্বত্বের সঙ্গে জড়ানো—পতিত জমি, মাঠের পুকুর, বিল, খাল সেগুলিকে যা পাচ্ছে সেলামী নিয়ে বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। নইলে জমিদারির সঙ্গে ওগুলিও চলে যাবে সরকারের হাতে। পুরনো আমলের চেক কেটে পুরনো স্ট্যাম্প ডেমিতে লিখে দিচ্ছে। চাষীরা বুভুক্ষুর মত গিলছে। চাষীদের যাদের জোতজমা আছে তাদের অবস্থা এখন ভাল। ধানের দর দশ টাকার নীচে নামে না। আসাঢ় মাস থেকে উঠতে উঠতে ষোল সতের আঠারোতে ঠেকছে। তাদের জমির ক্ষুধা আশ্চর্য। ডাঙা বাছে না, খাল বাছে না, বিল বাছে না—নিয়েই যাচ্ছে। তারাও আইন জানে। জমিদারের থেকে কম বোঝে না। তাদেরও সমস্যা আছে পঁচিশ একর তিরিশ একরের—তারাও এসেছে সেটেলমেণ্ট আপিসে। এদের চোখে স্ফূর্তি, মুখের কথায় কৌতুক। ঠোঁটে হাসি। যারা নিরীহ তাদের চোখ মুখ দেখলেই ধরা যায়। শঙ্কিত ত্রস্ত দৃষ্টি। সর্বাঙ্গে একটি অসহায় অক্ষমতার ক্লান্তি। এরা আজ দু'বছর হাঁটছে এখানে। প্রথম প্রথম কম ছিল—এখন যত দিন যাচ্ছে তত বেশী লোক আসছে, পাঁচ দিন সাত দিন অন্তর আসছে। দিনের পর দিন পড়ছে। অনেকে দিন না থাকলেও আসছে। সেটেলমেণ্টের কর্মচারীরা বলছে—কাজ পাহাড়ের মত—সে হাত ঠেলে কতটুকু ঠেলব। আমরা তো হাতী নই।

জানোয়ার নই—মানুষ।

লোকে বলছে ঘুষের প্যাঁচ।

দুই-ই সত্যি। এই দুই সত্যের টানা পোড়েনে ভুবনপুরের হাটে নিত্য হাটের মত ভিড়। এই ভিড়ের পায়ে পায়ে চারিপাশে আর ঘাসের চিহ্ন নেই। হাটের মাঝখানটা খাল হয়ে যাচ্ছিল বলে ইঁট বিছিয়ে জোড়ের মুখে মুখে সিমেন্টের পয়েন্টিং হয়েছে। দোকানীরা যাদের জমি নিজের ছিল তারা কায়েমী ঘর করেছে। পাণ্ডারা দে বাড়ীর শরিকেরা আপন আপন জায়গায় ঘর তুলে ঘর ভাড়া দিয়েছে। তার মধ্যে দোকান বসে গেছে। মোড়াওয়ালা খেজুর চ্যাটাইওলারা এখন রোজ আসে। রোজই পাঁচটা-দশটা মোড়া বিক্রি হয়। খেজুর চ্যাটাই কেনে লোকে বসবার জন্যে। কাঠওয়ালার দোকানে চেয়ার টুল বিক্রিও হয়, ভাড়াও মেলে।

পাটু চক্রবর্তীর মোড়াটা কিন্তু বাড়ী থেকে আনা। চামড়া দিয়ে বাঁধানো। শান্তি-নিকেতনী মোড়া। টুলু চৌধুরীরও এখন খুব চলতি, বলতে গেলে সেটেলমেণ্ট আদালতে উকিল মোক্তারের কাট কাটে। হাটের মধ্যে নতুন আপিস করছে। রেজিস্ট্রি আপিসের কাজের জন্যে পুরনো আপিসটা ঠিক আছে—সেটা ওর ছেলে চালায়। পাটু চক্রবর্তী টুলু চৌধুরীর মক্কেল। পাটু চক্রবর্তী এই প্রথম আসছে বলতে গেলে। এবার সত্ত্বের একটা জটিল প্যাঁচ। তবে এর আগে রেজিস্ট্রি আপিসে এসেছে বছর দেড়েক আগে।

চক্রবর্তী দেড় বছর আগের সঙ্গে এখনকার হাটের চেহারা দেখে বিস্ময় প্রকাশ ঠিক না করলেও তারিফ করছিল। কায়েমী ঘরের সংখ্যা গুনতে গিয়ে তার হল তেরখানা—টুলু চৌধুরী সংশোধন করে বললে—বারোখানা। টুলু চৌধুরীর একটু বেশী কথা বলা অভ্যেস, না বললে তার চলেও না; খতেন নম্বর প্লট নম্বর আপনি বেরিয়ে আসে মুখে।

চক্রবর্তী চারিদিক তাকিয়ে দেখে বললে—মালতী রেস্টুরেণ্টটা কিন্তু আচ্ছা হয়েছে। অল্প জায়গার উপর সুন্দর করেছে। দেড় বছর আগেও টিনের চাল টিনের দেওয়াল ছিল। একে-বারে পাকা দালান বানিয়ে ফেললে। ইলেকট্রিক লাইট!

টুলু বললে—ওর কথা বাদ দেন। খুনে মেয়ে—জেল খাটা মেয়ে—পাখোয়াজ মেয়ে। তার ওপর জেলে যাবার আগে শাগরেদ ছিল বসন্ত বাঁড়ুজ্জের। গান গেয়ে মিটিং করে বেড়াত।

—অকর্ম কিছু নাই—না?

—শুনি তো! কুণ্ডুকে শুষে নিলে! কুণ্ডুর জায়গাতেই তো ঘর! কুণ্ডু লিখে দিয়ে গিয়েছে, একতলায় ওই দোকান-ঘর আর একখানা ঘর সে-ই করেও দিয়েছে। ওপরতলাটা ও নিজে করেছে।

—শুনেছি বটে। বুড়ো বয়সে কুণ্ডুর মতিভ্রম হয়েছিল। পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। প্যারা-লিসিস।

—হ্যাঁ। তখন মেয়েটা সেবা করেছে ওর। তা করেছে! ও এক আশ্চর্য মেয়ে মশাই। প্রথম বললাম না বসন্তের মেয়ে-চেলা ছিল। তখনই বসন্তের সঙ্গে খারাপ হয়েছিল। ও আর

গোপা। বসন্ত তো কেষ্ট ঠাকুর। হাজার গোপিনী। সব নাকি ওর বান্ধবী। প্রথম প্রথম বলত বিয়ে করবে না। ব্রহ্মচারী থাকবে, লীডারি করবে। এ মেয়েটা মানে মালতী যখন জেল থেকে ফিরল তখন বসন্ত গোপার সঙ্গে জড়িয়েছে। এটা কি করবে? ও কুণ্ডুকে ধরলে! তা বসন্তও গুছিয়েছে গোপাকে বিয়ে করে। এও গুছিয়েছে!

একজন কর্মচারী ছুটে এল—বাবু, সায়েব ডাকছে। খুব চটেছে।

চক্রবর্তী বিষয়কর্মে ধীর মানুষ, বিচলিত সহজে হয় না, সে বললে—ক্যানে হে? খিদে লেগেছে সায়েবের, সবুর সইছে না?

টুলু বললে—বলছি আপনাকে লোকটা রগচটা। টাকাটা আগে থেকে দিয়ে রাখলে ঠাণ্ডা থাকত।

—তুমিই তো দেরি করলে। কথায় মজে গেলে। তা মজার কথায় মজে সবাই। তুমিও মজেছ আমিও মজেছি। নাও--টাকা নিয়ে যাও।

কর্মচারী বললে—আপনাকে যেতে হবে। ডাকছে।

—আমাকে যেতে হবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

টুলু বললে—চলুন না। কি হবে! একবার তো হাজরে দিতেই হবে!

উঠল চক্রবর্তী বাবু। মোটা মানুষ, তার উপরে মানুষের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা অভ্যাস। তবু চলতে হচ্ছে দায়ে পড়ে একে পাশ কাটিয়ে ওকে এড়িয়ে। হাটের প্রাঙ্গণটায় এখনও সকালের রোদ উঠতে দেরি আছে। উঠলে আরও একটু আরাম হবে। অগ্রহায়ণের শেষ। শীতও এবার ঘন। হাটের দোকানে কেনা বেচা চলছে। বেশীর ভাগ খাবার পান বিড়ির দোকানে। চায়ের দোকানে বেশী ভিড়। মালতী রেস্টুরেণ্টে ছখানা টেবিলে ছাব্বিশ সাতাশখানা লোহার চেয়ারের একটাও খালি নেই। শ্রীমতীর দোকানেও ভিড়। শ্রীমতীর দোকানও বেড়েছে। মাটির ঘরে পাকা থামের উপর টিনের চালের বারান্দা ছিল—সেটা ছাদ হয়েছে। পাশে একখানা ঘর বেড়েছে। উপরে কোঠা হয়েছে। টুলুর আপিস শ্রীমতীর কোঠায়। সে বললে—দাঁড়ান আমি জামাটা পালটে আসি। জামাটায় ঘামের গন্ধ। অফিসারটা চটে ঘামের গন্ধে।

শ্রীমতীর দোকানেও সামনে চেয়ারে বসে আছে একটি যুবতী বিধবা মেয়ে। সুন্দরীও বটে যুবতীও বটে, হাসেও খুব। কিন্তু একটু বেশীরকমের হালকা—অশালীন।

শ্রীমতী চক্রবর্তীকে চেনে। সে হেসে বললে—বাবু যে গো!

—হ্যাঁ চিনতে পারছ?

—আপনাকে চিনতে পারব না?

—না। বুড়ো হয়েছি তো।

—আমি হই নাই না কি? তা চা খান!

—না। ডাক পড়েছে। সায়েব নাকি কামড়ায় দেরি হলে!

হেসে উঠল শ্রীমতী। তারপর বললে—ওঃ নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে গো!

—কালের মহিমে! তা ইটি কে?

হেসে শ্রীমতী বললে—আমার সম্পর্কে বুনঝি! তা কি করি বলুন। হরকল্লা ছুকরি এসে পাশে দোকান করলে। আমার দোকান কানা পড়ল। বুড়ীর দোকানে খাবে না কেউ। তাই ছুঁড়ীই আনলাম। নমস্কার কর না লো সাবি—!

সাবি হেসে ফেলেই নমস্কার করলে—নমস্কার বাবু! আসবেন—এখানেই চা খাবেন যেন।

টুলু চৌধুরী এসে পড়ল।—চলুন।

শ্রীমতীর দোকান ছাড়িয়ে মালতীর দোকান। অনেক ভিড়। ভিতরে চারটে বাচ্চা ছেলে খাটছে। ঠাকুর দুজন। পুরনো ঠাকুরের সঙ্গে এখানকার আর একজন ছোকরা কাজ করে। আগে চাকরের কাজ করে বেড়াত—হারাধন নন্দী। চাঁপা নেই। চাঁপা নবদ্বীপ চলে গেছে।

কুণ্ডুর বাড়িতে মালতী যাওয়া আসা শুরু করতেই সে একদিন বলেছিল—মাসী এবার আমায় বিদেয় দাও।

মুখের দিকে তাকিয়ে মালতী বলেছিল—ভাল লাগছে না মাসী?

সে বলেছিল—না!

মালতী বলেছিল—তা হলে যাও। মাসে মাসে আমি টাকা পাঠাব কিছু করে।

—না। দরকার নেই!

মালতী বলেছিল—বেশ!

কথা তার মনে অনেক এসেছিল কিন্তু সে জিজ্ঞাসা করে নি।

* * *

আজও মালতী চাঁপার কথা ভাবছে। চাঁপা মাসীর চিঠি এসেছে। অসুখে পড়েছে চাঁপা মাসী। কিছু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। চুপ করে ভাবছে আর সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ভুবনপুরের হাটে এমনি করেই চেয়ে রইল সে। যে চেয়ে থাকার মধ্যে দেখা কিছুই হয় না। মনের মধ্যে হিসেব করে আর স্মরণ করেই বেলা কাটে। অভ্যেস হয়ে গেছে। কচিৎ কখনও হঠাৎ কিছু কিছু শোরগোল তুলে ঘটলে সেটা দেখা হয়ে যায়।

সে ভাবছিল চাঁপা মাসীকে সে নিয়ে আসবে।

একবার মনে হচ্ছিল আনবে—খুব করে সেবা করবে। তারপর বুঝিয়ে বলবে—মাসী আমি পাপ যাকে বল তা করি নি। করি নি। করি নি। যাকে পাপ বল মাসী তা দূরের কথা মনও দিই নি। তবে খেলা করাকে যদি পাপ বল আমি পাপী। আমার মন দেওয়া ভালবাসাটুকু সেই হনুমানের বাচ্চাটার মত মরে গিয়েছিল; কিছুদিন মরা বাচ্চাটার মত মরা ভালবাসা বুকে ধরে বসেছিলাম। মিথ্যে বলব না। বলবই বা কেন মাসী! আমার আশা নাই—আমি আমার নিজের হাতের বাঁধা ঢেলাটা খুলে দিয়ে এসেছি। মিছে বলব না—সাধ হয়। সাধ আছে। না থাকলে তো চলে যেতাম শহরে বাজারে গো! তাতে আর কত কলঙ্ক হত? যে কলঙ্ক মাথায় চাপছে একটার পর একটা তার চেয়ে কি সে বেশী ভারী

হত? হত না। আমার সাধটা যে কিছুতেই ছাড়তে পারছি না গো! আমার সাধ ত বসন্তকে ঘিরে নয় মাসী। যে দিব্যি করতে বল করতে পারি। তোমাকে ছুঁয়ে বলতে পারি। বসন্তকে নিয়ে সাধ করেছিলাম—বসন্তের দোষ দোব না—দোষ আমার হিসাবের ভুলের। বসন্তের পাপ-পুণ্যও নাই। ও যে কি তা আমি জানি না। ওর ভয়ও নাই ভাল-বাসাও নাই। ওর কাজ আছে আর মেয়েদের মন নিয়ে খেলা আছে। গোপা আমাকে নিজে বলেছে ওর বিধবা হওয়ার পর যখন ভাসুরের সঙ্গে মামলা বাধে, তখন বসন্ত ওর ভাসুরেরই একখানা সাপ্তাহিক চালাতো। তার চাকর। তবু সে তার মনিবের প্রতিবাদ করেছিল—ঝগড়া করেছিল—ভাসুরের কাগজেই ভাসুরের কীর্তি প্রকাশ করে দিয়েছিল। সেই যে যেদিন গোপা ভুবনপুরে এল পরদিন এল বসন্ত। সেই যে গো যেদিন আলো নিয়ে কাণ্ড—যেদিন চমকালাম বসন্তের কথা শুনে—যেদিন তার সঙ্গে চুকিয়ে দিলাম। বললাম—আলোটা নিয়ে যাও; বিয়ে না করে মন দিয়ে ভালবাসা—ও আমার সাধ্যি নাই! পরদিন এল টুলু চৌধুরী বর্ধমানের বাবুটিকে নিয়ে। সেদিন কি হয়েছিল জান? বসন্ত কাগজের দলিল চিঠি সব সরিয়ে নিয়ে চলে এসেছিল—তাতে ছিল গোপার ভাসুরের মৃত্যুবাণ। ওরা পুলিশে খবর দিয়েছিল।

—চার কাপ চা—চারটে চপ—আটখানা নিমকি!

নড়ে উঠল মালতী। চোখ তুললে। একসঙ্গে খদ্দের এসে দাঁড়িয়েছে। যে চাকরটা ওকে খাবার দিয়েছে সে যা দিয়েছে তা বলে। মালতীকে হিসেব করে দাম নিতে হবে।

মালতী হাসলে একটু। হেসে কথা বলতে হবেই। বললে—এক টাকা চার আনা।

দেড়টা টাকা দিয়ে ভদ্রলোক বললে—বাকীটা সিগারেট। উইল্‌স।

মালতী সিগারেট বের করে হাতে হাত ঠেকিয়েই দিলে সিগারেটগুলি।

তারপর মসলার প্লেট বাড়িয়ে ধরলে।

চলে গেল ভদ্রলোক।

তারপর মাসী আবার একদিন টুলু চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেদিন তোমার গৌরাঙ্গের ঝুলন ছিল—তুমি দোকানে এস নি; তখন আমার সঙ্গে বসন্তের ছাড়াছাড়ির কথা রটেছে। কথা কি করে রটে তা তুমি জান, তার উপর ভুবনপুরের কথা। কথায় আছে 'হাটের মাঝে পড়ল কথা এক নিমিষে যথা তথা।' তার উপর ভুবনপুরের হাট। টুলু চৌধুরী বলেছিল—টিকলি বলেছে। তা হবে। টুলু বলেছিল—আমি যদি লিখে দি যে চোদ্দ পনের বছরে জেলে যাবার আগে বসন্তের চেলাগিরি যখন করতাম তখন থেকে গোপা আমি দুজনেই তাকে ভালবাসতাম। সেও আমাদের দুজনকে ভালবাসত। আমাকে বলেছিল—বিয়ে করব। ও জাত মানে না—কিছুই মানে না। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি সে আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে না। তার কারণ গোপাকে সে ভালবাসে। তার সঙ্গে তার গোপন আসক্তি হয়েছে।

বলেছিল—এ তো মিথ্যে বলা হবে না। ও গোপাকে ভালবাসে। না হলে তোমাকে কথা দিয়ে এখন না বলছে কেন? আর তুমি তো হাটে বলেছ ওকে ভালবাসার কথা। কথাগুলো লিখে দিলে তোমাকে গোপার ভাসুর এক হাজার টাকা দেবে। আর ওকে তোমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করবে।

আমি বলেছিলাম—না। তবে গোপাকে ও যে ভালবাসে তার প্রমাণ পেয়েছিলাম, বুঝতে দেরি হয় নি। তোমাকে বলি নি। হনুমান মা-টার মত মরা ভালবাসা বুকে করে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম।

ভালবাসা ভুবনপুরে কেন তিনভুবনেও বোধ হয় নেই। হয়তো থাকে—তা যেমন জন্মায় তেমনি মরে। মন দিয়ে মন পাওয়া যায়—মন আর মানুষ দুটো পাওয়া যায় না। মানুষ নিজেকে দিয়ে আর একটা মানুষকে পায়, সেখানে মানুষের সঙ্গে মন থাকে না। মন মানুষ দুই দিয়ে দুই পেলেও হয় কি জান—আপন আপন মন ঘুরে নেয়। গোপার বেলাতেও তাই হয়েছে মাসী। আমার মনও আমার আছে—আমার আমিও আমার মাসী—কাউকে দিইনি। দিয়েছি—হাসি দিয়েছি—কথা দিয়েছি। পেয়েছি পয়সা টাকা। সুখ—হ্যাঁ সুখও বটে বইকি!

—পাঁচ কাপ চা দশখানা বিস্কুট। একবাক্স সিগারেট ক্যাপস্টেন।

এক দল খদ্দের এসে দাঁড়িয়েছে, পয়সা দেবে।

—আমার এক কাপ চা শুধু।

—একটু দাঁড়ান। এঁরটা নিই। মিষ্টি হাসে মালতী। —একটু। একে একে। আমি তো একা মানুষ!

দশটা শিঙাড়া বারোখানা নিমকি, দুটো বড় রসগোল্লা এনে দিয়েছি!

মোটরের হর্ন বাজছে। সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পের জীপ বেরিয়ে যাচ্ছে কোথাও।

গাছ থেকে একটা চিল ছোঁ মেরেছে একজনের হাতের ঠোঙায়, সে ঠোঙায় মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছিল।

বেলা একটা বাজছে। এখন চায়ের দোকানে ভিড় কমেছে। তবে শিঙাড়া কচুরি বিক্রি চলছে। মালতী উঠল। স্নান করবে খাবে। তারপর এসে আবার বসবে। ঠাকুরেরা চাকরেরা পালা করে উঠে যাবে স্নান করবে। সেটেলমেণ্টের মক্কেলরা খেতে যাচ্ছে। এখন হোটেলে ভিড়। তিনটে হোটেল হয়েছে। খুব চলতি তাদের। দীঘির ঘাটে স্নান করছে। অনেকে কুয়োতলায় মাথা ধুচ্ছে। হাটের আঙিনা খালি করে মক্কেলরা সব উঠে হাটের বাইরে গাছতলায় ডেরা পাতছে। সোমবারের হাট। হাট বসবে। ভুবনেশ্বরতলায় পাণ্ডারা এসে জমেছে। এখন তাদের চলতি খুব। হাটের আমদানি এরই মধ্যে এসে ঢুকতে শুরু করেছে। শীতের মরশুম এখন তরকারির সময়, তার উপর এবার তরকারি জন্মেছে ভাল। এবং ভুবনপুরের হাটের পাশে সেটেলমেণ্ট ক্যাম্প বসায় হাটে আমদানি হচ্ছে দূরদূরান্তর থেকে। সেটেলমেণ্ট ক্যাম্প এখন নামেই ক্যাম্প—আপিস হিসেবে ক্যাম্প বলা চলে। নইলে আপিসের জন্য বাড়ি করে দিয়েছে পাণ্ডাদের অবস্থাপন্ন শরিক দেবেন মিশ্র। ওই

অশথ বট বেলতলার ডাঙা পাণ্ডাদের। সেবাইত সূত্রে দখল করে ওরা।

আরও বাড়ী তৈরী হচ্ছে। অন্য পাণ্ডারাও দেখাদেখি তৈরী করাচ্ছে। মামলাও চলছে ডাঙা নিয়ে। পাণ্ডাদের সঙ্গে পাণ্ডাদের।

•

বাড়ীতে কুয়ো আছে মালতীর। ছোট্ট উঠোন। এল্ শেপের খানিকটা বারান্দা। রেস্টুরেন্ট ঘরখানা ছাড়া দুখানা ঘর। ঘর দুখানা মালতী ইস্কুলের দিদিমণিদের ভাড়া দিয়েছিল। কিন্তু দিদিমণিরা উঠে গেছে। মালতীর এখানে দুর্নাম অনেক। ইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটি আপত্তি করেছিল। কিছুদিন সেটেলমেণ্টের বাবুদের দিয়েছিল। তাতেও কাদের নামে দরখাস্ত হয়েছে। একটা বেশ্যা শ্রেণীর মেয়ের বাড়ীতে ভাড়া আছে সরকারী কর্মচারীরা। তারাও উঠে গেছে। তাতে লোকসান খুব হয় নি মালতীর। বাইরের দিকে দরজাওয়ালা ঘরখানাকে ভাড়া দিয়ে বাকী ঘরখানা থাকতে দিয়েছে বুড়ো ঠাকুরকে। বুড়ো ঠাকুরের আশ্রিতা মেয়েটাও থাকে। সে মালতীর কাজ করে দেয়। বাচ্চা চারটের একটা সেও এখানে থাকে।

স্নান সেরে উনোনে ভাত চড়িয়ে দিয়ে মালতী জানালার ধারে বসেছিল। দোতলায় থাকে সে। ঘরদোরগুলি বেশ গোছানো সাজানো। বাড়ীখানা সত্যিই তাকে কুণ্ডু করে দিয়ে গেছে। ওই বর্ধমানের বাবুটি যেদিন এসেছিল তার মাস তিনেকের মধ্যে কুণ্ডুর অসুখ হল। অসুখ হল প্যারালিসিস। ছেলেরা বউরা তাকে নিয়ে বিব্রত হল। তারা বললে নার্স রাখতে। কিন্তু তা রাখলে না কুণ্ডু। সে বাড়ীর একটা একপাশের ঘরে থাকতে লাগল। মোটা টাকা দিয়ে চাকর রাখলে। হাসপাতালে মরতে যাবে সে? সে নিজে গড়েছে এত বড় ব্যবসা এত ভাগ্য—মেলায় মেলায় ঘুরেছে। এতকাল পর শেষ কাল সবারই আসে সবারই আসবে কিন্তু এতকাল ঘুরে সে ঘরে মরবে না? মালতী কুণ্ডুর উপকার ভোলেনি। বরং তার দহরম-মহরম একটু বেশীই হয়েছিল।

ওই হেজাক আলোর কথাটায় সে হাটেই শ্রীমতীকে চেঁচিয়ে যা বলেছিল তাতে গাঁ কেন চাকলায় গোলগোলাট হয়েছিল কথা অনেক রঙচঙ মেখে। আর বসন্ত নিজেই কুণ্ডুর দোকানে আলোটা কিনবার সময় বলে এসেছিল—কি টাকা আপনি দিয়েছেন কুণ্ডুমশাই হিসেব করে রাখবেন—ওটা আমি দিয়ে দোব। তারপর মিষ্টি মিষ্টি অথচ খুব ধারালো—যাকে মিছরীর ছুরি বলে তাই দিয়ে আঘাত করেছিল কুণ্ডুকে। একটা আঠারো বছরের মেয়ে—আর আপনার বয়স কত? সোত্তর? আপনার বড় নাতনীর ক'টি ছেলে হয়েছে কুণ্ডুমশাই!

কুণ্ডু অদ্ভুত চরিত্রের লোক—সে খুব হেসেছিল। বলেছিল—তা বেশ তো বসন্তবাবু। আপনার বাবা শরৎ ওস্তাদের আমি ভক্ত ছিলাম; কত খানাপিনা করেছি আনন্দ করেছি। ওস্তাদ আমাকে তবলা শেখাতে চেয়েছিল—তা একতালায় কাওয়ালীতে ঠেকে গেল তালে। বলেছিলাম—আমার বাজিয়ে কাজ নাই ওস্তাদ আমার শোনাই ভাল। সে বলেছিল—সেই ভাল কাকা। আমাকে কাকা বলত। তা সে সম্বন্ধ আপনার সঙ্গে ধরে কাজ নাই, আপনি লীডার মানুষ। তা বেশ তো—আপনার বয়স চব্বিশ পঁচিশ। নতুন কালের মানুষ—লীডার।

ওকে নিয়েই আপনি যা হয় করুন।

বসন্ত বলেছিল—আপনারা জাল ফেলে মানুষ ধরেন। ওটা গুটিয়ে তুলে নিতে হবে। আমি দিয়ে দোব ওটা। বুঝেছেন!

পরদিন তখন বসন্ত বর্ধমানের ওই বাবুটি আসার খবর পেয়ে সাইকেলে করে সাঁইতে হয়ে চলে গেছে কোথায়। সাপ্তাহিক কাগজের আপিসের কাগজপত্র সে সরিয়ে নিয়ে এখানে এসেছিল। সেদিন পড়ন্ত বিকেলবেলা কুণ্ডু নিজে এসেছিল মালতীর দোকানে। বে-হাটবার মঙ্গলবার ছিল। মালতীর মন তখনও ওই সদ্য মরা বাচ্চা বুকে-করা হনুমান-মা'টার মত। অবুঝ কান্নায় ভরে আছে। ডাকলে সাড়া দেয় না নড়ে না। লাফালাফি করে বেড়ায় না। অথচ তার কল্পনায় আর সে তখন বসন্তকে নিয়ে ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারছে না। চুপ করে বসে আছে।

কুণ্ডু এসে হেসে বলেছিল—হ্যাঁরে আমি যে একবার এলাম। একটা কথা তোকে বলতে এলাম।

মালতী বলেছিল—বলুন।

—বলছিলাম তুই কি দোকান করবি না?

—কেন? এ কথা বলছেন কেন?

—বসন্তবাবু কাল হেজাক আলো কিনে আনলে আর বললে সে তো অনেক কথা! তবে বুঝলাম তুই দোকান বোধ হয় করবি না।

ঠিক সেই সময়েই একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জেলে নিয়ে এল ঠাকুর। টিনের চালের বাঁশে টাঙিয়ে দেবে। কুণ্ডু বলেছিল—এ কি? লণ্ঠন ক্যানে রে? হেজাক কি হল?

মালতী বলেছিল—সে আমি ফিরে দিয়েছি কুণ্ডুমশাই—সে যার জিনিস সে নিয়ে গিয়েছে।

—নিয়ে গিয়েছে? সে কি?

—আমি ফিরে দিয়েছি, বললাম তো।

—ফিরে দিয়েছিস? বাজারে হৈচৈয়ের জন্যে? দূর দূর দূর!

—বাজারে হৈচৈয়ে কি হবে আমার কুণ্ডুমশাই? আমি c লখাটা মেয়ে।

—তবে?

—সে অনেক কথা।

—বলা যায় না?

—খুব যায়। তার সঙ্গে কি আমার পোষায় কুণ্ডুমশাই! সে এক মানুষ আমি আর এক মানুষ।

কুণ্ডু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলেছিল—দেখ্ ওই শ্রীমতীর আমি অনেক করেছি। মেয়েটা সে আমলে বড় তুফানী মেয়ে ছিল! কথা কইত বড় ভাল—হাসত ভাল, চলত ভাল। আমার সেকেলে মুখ রে—খারাপ কথা বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে। ওকে ভাল লাগত। আমার বাড়ী যেত। আমার পরিবারের সঙ্গে ভাব ছিল। তার কাছে গান গাইত নাচত। হরকল্লা

মেয়ে ছিল। খারাপও ছিল। আমাকে পাকড়াবার ওর তাক ছিল। তা কুশু মাছ ধরত জলে নামত না। হানিময়রা—বড়জোর হাত টানাটানি। কিছু মনে করিস না।

মালতীর মন মানুষের মন। সে মন কথায় কথায় মরা বাচ্চাটার কথা ভুলে গিয়েছিল; বুক থেকে নামিয়ে কখন পাশে রেখেছিল খেয়াল নেই। সে কুশুর কথায় হেসেই বলেছিল—আমিও জেলে আড়াইবছর ছিলাম। বলুন আপনি।

কুশু বলেছিল যা জোবেদা বলত। বলেছিল—জেল যে সংসারটাই জেল রে। মনে মনে যা হয় যা বলি! তা থাক। যা বলছিলাম। শ্রীমতী অনেক ঝঞ্ঝাটে অনেকবার পড়েছে। ওর স্বামী ওকে ছেড়েছিল। আমিই তাকে ডেকে বুঝিয়ে বলেছিলাম ঘরের পাগল ছেড়ে দিলেই পথে ন্যাংটো হবে। ধরে নাও। ঘরে রাখ। টাকা দিয়ে ব্যবসা করে দিয়েছিলাম, টাকা ওরা দিয়েছে। দেয় নাই তা বলছি না। বেশই সদ্ভাবে ছিল। এক নিচ্ছিল এক দিচ্ছিল স্বামী মরল। ওই হাটের জায়গা আমারই। সস্তা দামে দিলাম। হাট তখন জমছে। এতকাল ভাড়ার বাড়ীতে দোকান করত। হাটে দোকান করে ফাঁপল। গাঁঠ লাগল আমার ছ'মাস আগে, পরিবার যখন মরল তখন। পরিবার ভুগে মরেছিল। গ্রহণী রোগ। দিন রাত্রি বিছানা কাপড় ময়লা করত। গায়ে গন্ধ ঘরে গন্ধ। বউরা করে। কিন্তু দায়ে পড়ে। শিয়রে একা আমি। যেদিন মারা যায় সেদিন ঘরে আর কেউ থাকতে পারে না। ও আসত, বাইরে দাঁড়িয়ে দেখে যেত। সেদিন আমি বলেছিলাম—শ্রীমতী আজ রাতটা তুই থাকবি? তা আমি পারব না—বলে পালিয়ে এল। ছুটে পালাল—যেন আমি ধরে বেঁধেই ফেলব। তারপর সেই রাত্রে সে মরল। আমি গাঁয়ের, গাঁয়ের কেন চাকলার একজন বড় মহাজন ব্যবসাদার—লোক এল—পুরুষ মেয়ে তত্ত্ব করে গেল। কিন্তু ও এল না। উপরন্তু কানে এল সেদিন যাবার সময় আমাকে গাল দিতে দিতে গিয়েছে। বলে গিয়েছে—তোর দোকান ধারে নি—আমি তোর খাতক, তাই বললি ওই নরককে রুগীর নরক ঘাঁটতে! যা তোর দোকানে আর নোব না। মহাজন। গলাকাটা মহাজন। তারপরও এসেছিল দোকানে মাল নিতে, আমি দিই নি। সাঁইতেতে গিয়ে আমার নামে যা তা বলে এসেছে। বলেছে—আমি বলেছি তুই থাক রাত্রে শ্রীমতী, মরা আগলে বসে আছি রঙ্গরসে সময়টা কাটবে ভাল। তা বলুক। বুঝলি ওতে আমার ছ্যাকা লাগে না। দাগও লাগে না। আমি বলি নাই। যদি বলতামও তাতেও লজ্জা পেতাম না। কিন্তু বলে এসেছে আমি গলাকাটা জোচ্চোর ব্যবসাদার! ও আমার সহ্য হয় না। আমাকে শূল বেঁধে। কাঁকড়া বিছের কামড়ের চেয়েও জ্বালা করে। সাঁইতেতে মাল নামিয়ে এখান পর্যন্ত এনে আমি সাঁইতের দরে মাল দি। আমার এত নাম। কখনও খদ্দেরের ওপর নালিশ করি না। যা হোক তা হোক করে শোধ নি। আমার রাগ সেইখানে। এ আমার মনসার রাগ। বুঝলি। তাই তোকে দেখে তোর চেহারা দেখে আর ব্যবসা করবি শুনে রাত্রে মনে হল তোকে যদি পাশে ওই দোকান করে বসিয়ে দি তা হলে ওকে মারতে পারব। তাই তোকে বললাম—তুই রাজী হলি—বসিয়ে দিলাম। তুই না করিস তো আমি দোকান তুলব না, আর এক জনকে এনে বসাব।

মালতী বলেছিল—আমি দোকান করব কুশুমশাই। বললাম তো তার সঙ্গে আমার

হয়ে গিয়েছে।

কুণ্ডু উঠে পড়েছিল। বলেছিল—তা হলে আমি যাই। একটা আলো এখুনি জেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরা আলো জেলেছে তোকেও জালাতে হবে। কাল একটা গ্রামোফোনের ব্যবস্থা করব। বুঝলি। পারিস তো কাল যাস একবার।

বিশ মিনিটের মধ্যে একটা আলো জেলে নিয়ে এসেছিল। এ আলোটা বসন্তের আলো থেকে বড়, দামী, দেখতেও ভাল।

শ্রীমতী দোকানে ছিল না। সকালে টিক্‌লি বলেছিল ওর কোন বোনঝিকে আনতে গেছে।

সেদিন দোকান থেকে ফেরার পথেই মালতী গিয়েছিল কুণ্ডুর বাড়ী। কুণ্ডুর বাড়ী পাকা বাড়ী, কিন্তু নিজে থাকে মাটির দেওয়াল খ'ড়ো চালের বাংলাবাড়ীতে। নিজের চাকর আছে। খ'ড়ো ঘর হলেও ইলেকট্রিক আলো পাখা আছে।

কুণ্ডু হেসে বলেছিল—মরতে রাত্রে এলি ক্যানে?

—রাত্রেই এলাম!

—আমার বদনামের শেষ নাই, তোরও হবে! মরবি।

—আমি জেলখাটা মেয়ে আমার ভয় নাই। আপনি সব কথা বলে এলেন—আমার সব কথা বলে যাই!

—ভাল ভাল ভাল। রাধার বৃন্দে ছিল। তোর আমি। মনের কথা বলবার তো লোক চাই!

—না। রাধা আমি নই—হব না।

—ক্যানে?

—রাধার মতন আমি কাঁদি না। কাঁদতে আমি পারি না।

—সাবাস, সাবাস, সাবাস! কিছু খাবি?

—না। বৃত্তান্তটা বলে চলে যাব। আপনি মহাজন আমি খাতক। আপনি যেচে ডেকে বসিয়েছেন দোকানে। সবটা না বললে চলবে না। জীবনের প্রায় সব কথাই সে বলেছিল। বলে বলেছিল—ভুবনপুরের হাটে মন দিয়ে মন পাওয়া যায় বলে। আমি ঢেলা বেঁধেছিলাম খুলে দিয়েছি কালকে। মন দিয়ে মন নিয়ে আমার কাজ নেই। ওর মত মিছে কথা আর হয় না। মন মানুষ মিললে তবে মেলে। মানুষ নিজেকে দিয়ে মানুষকে পায়—তাতে মন পায় না এ হয়। আবার পায় এও হয়। কিন্তু মন দিয়ে মন মানুষ বাদ দিয়ে এ হয় না।

—ওরে! চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল কুণ্ডুর। অবাক হয়ে শুনছিল সে মালতীর কথা। কথা শেষ হতেই চোখ বিস্ফারিত করে বলেছিল—ওরে! তুই এত কথা জানিস!

—শিখেছি জেলে, জোবেদা বিবির কাছে।

—সেটা কে রে?

মালতী জোবেদার গল্প বলেছিল তাকে। কুণ্ডু হাত জোড় করে নমস্কার করে বলেছিল

—ওরে বাপরে! কালী তারা বলব না কিন্তু এ যে ডাকিনী যোগিনী রে!

ঢং করে ঘড়িতে আধ ঘণ্টা বেজেছিল। চশমা চোখে দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কুণ্ডু বলেছিল—ও বাবা সাড়ে এগারটা! দেখ দেখি ফ্যাসাদ!

—কি ফ্যাসাদ?

—এই রাত্রে বাড়ী যাবি।

—আমি চলে যাব দিব্যি।

—না। আলো নিয়ে দিয়ে আসুক তোকে। কলঙ্কে তোর ভয় নাই। হোক কলঙ্ক! তবে একটা কথা শুনে যা।

—কি?

—গোপাকে নিয়ে বসন্ত জড়িয়েছে। বর্ধমানের লোক আমার কাছেও এসেছিল। বসন্ত লুকিয়েছে।

বসন্ত লুকোয় নি ঠিক। বসন্ত বিচিত্র মানুষ। ও একজায়গায় থাকে নি, চারিদিকে ঘুরেছে আর গোপার ভাসুরের সঙ্গে লড়েছে। শুধু লড়া নয় লড়ে জিতেছে। বসন্তের হাতে এমন কাগজ কিছু ছিল যার ভয়ে গোপার ভাসুর গোপার সঙ্গে মিটমাট করতে বাধ্য হয়েছিল। পঁচিশ হাজার টাকা নগদ, গোপার স্বামীর জিনিসপত্র, বর্ধমানে একখানা বাড়ি দিয়ে মিটেছিল মকদ্দমা। তা ছাড়া নিজের গয়নাগাটি তো ছিলই। গোপা গিয়েছিল বর্ধমানে মামলা মিটমাটের জন্যে। মামলা মিটবার পর সে বসন্তের হাত ধরে গিয়েছিল বিয়ের রেজেস্ট্রি আপিসে। তারা বিয়ে করেছিল।

ভুবনপুরে কথাটা আসতে দেরি হয় নি। শুধু কথাই নয়, বসন্তও এসেছিল। এসে তার দোকানেও এসেছিল। চা খেয়েছিল কিনে।

যাবার সময় তাকে বলেছিল—ভুল—একটু ভুল আমার হয়ে গেল মালতী—কথাটা ঠিক রাখতে পারলাম না। তবে তার জন্যে দায়ী গোপা—না থাক—দায়ী তাকে করে লাভ কি? তবুও সংশোধন করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু উপায় ছিল না। গোপার সন্তান হবে।

মালতী অবাক হয়ে শুনেছিল।

এখনও মধ্যে মধ্যে আসে। মিটিং এখনও করছে। হাটেই মিটিং করে। একদিন মিটিংয়ে কে জিজ্ঞাসা করেছিল—নিজের কৈফিয়তটা দিন তো আগে! দে'দের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করলেন কেন? গোপাকে?

গর্জে উঠেছিল বসন্ত। —বিধবা বিবাহ আইনসংগত বলে, বিধবা বিবাহ ধর্মসংগত বলে। গোপা আমাকে ভালবাসত—আমি গোপাকে ভালবাসতাম বলে। আর জাতিভেদ? জাতিভেদ পাপ। জাতিভেদ অন্যায়। জাতিভেদ আমি মানি না!

আশ্চর্য, এক কথায় চুপ হয়ে গিয়েছিল সকলে।

বসন্ত সেদিনও এসেছিল। এখনও প্রায় আসছে। একটা গোলমালে পড়েছে। পড়েছে সেটেলমেণ্টের পাকে। ভুবনপুরের মাটিতেও বটে। ভুবনপুরের মাটিতে ওর পা বসে গেছে।

বাড়ী তৈরি করছে বসন্ত গোপার টাকায়। বর্ধমানের বাড়ী বিক্রি করে এখানে করবে। কিন্তু গোল বেধেছে জায়গাটা নিয়ে। ওই দেখা যাচ্ছে জায়গাটা—ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাদের জায়গার মধ্যে দশ কাঠা জায়গা। জায়গাটার ইঁট চুন বালি ঢালার পর পাণ্ডারা আপত্তি দিয়ে বন্ধ করেছে। জায়গাটা ছিল খোকাঠাকুরের। খোকাঠাকুর শরৎ ওস্তাদকে একটা স্ট্যাম্পে বসতবাড়ী লিখে দিয়ে গিয়েছে—বলে গিয়েছে নেবেন আপনি আমার যা আছে সব। কিন্তু দলিলের মধ্যে দাগ নম্বর দিয়ে এ জায়গাটা লেখা নেই। তখন এ জায়গাটা ছিল হাটের মানুষের ময়লামাটির জায়গা। এখন পাণ্ডারা আপত্তি করেছে—এ জায়গার মালিক তারা নিরুদ্দেশ খোকাঠাকুরের জ্ঞাতি হিসাবে।

গোপার কাছে বসন্ত টাকা নিয়েছে—প্রেস কিনবে কাগজ করবে। এখানেই করবে। গোপার সন্তান হয়েছিল মারা গেছে।

দুজনে দুজনকে আঁকড়ে ধরে ওরা মিটিং নিয়ে মেতে আছে। গোপা নাকি ভোটে দাঁড়াবে। গোপা তাকে বেশ হাসতে হাসতেই বলেছে কেমন ওরা মিটিং করে বেড়িয়ে ঘরে নিজে নিজেকে নিয়ে থাকে।

মালতী জিজ্ঞাসা করেছিল—বেশ সুখে আছিস গোপা?

—সুখ অসুখ বুঝি না—বেশ আছি। ও মদ খায় আমি সিনেমা দেখি। ও বান্ধবী নিয়ে থাকে। আমারও বন্ধু আছে।

তারপর কানে কানে বলেছিল—জানিস আমিও মধ্যে মধ্যে খাই।

—কি?

—মদ! পার্টি-টার্টিতে খাই তো। বাড়িতেও মধ্যে মধ্যে খাই। এ তো আজকালকার ফ্যাশন।

দুনিয়াতেই নিত্যি নতুন। ভুবনপুরেও তাই। হাটে তার মেলা বসে। সে পারলে না। সে চিরকেলে খেলা খেলে গেল। ভুবনপুরের হাটে আজ মন দিয়ে মন নিয়ে আজকাল কালপরশু ফেরত-ঘোরত হচ্ছে।

ভাতটা ধরল না কি?

তাড়াতাড়ি উঠে সে একটু জল দিয়ে নেড়ে দেখলে—হ্যাঁ ধরেই গেছে। আজ ভাগ্যে পোড়া ভাত। নামিয়ে ফেললে ভাতটা।

প্রায়ই হয়—নতুন নয়। সংসারে সেই বুঝি পুরনো থেকে গেল। নতুন হতে-হতে হতে পারলে না। মধ্যে মধ্যে ভাবে যদি সে গোপার মত ধরতে পারত বাঁধতে পারত বসন্তকে তবে সেও গোপার মত সুখ অসুখ না বুঝেই বেশ থাকত। মিটিং করত। বসন্ত মদ খেত, ও সিনেমা দেখত। পার্টিতে মদ খেত।

না তা সে পারত না। তার মধ্যে একটা আশ্চর্য তৃষ্ণা আছে।

শুধু মন নয় শুধু মানুষ নয়, মন মানুষ দুই নিয়েও হয়তো তার তৃষ্ণা মিটবে না। কিন্তু সে আর পারছে না জীবনকে টানতে! অথচ কলঙ্কের শেষ নেই।

ওঃ! প্রথম কলঙ্ক কুণ্ডুকে নিয়ে।

কলঙ্ক হল—মাসী চলে গেল। তার মন বললে—যাও।

কুণ্ডুর প্যারালিসিস হল। একলা একরকম পড়ে থাকত সেই বাংলোতে! সে গিয়ে দেখে তার মাথার কাছে বসে বললে—ঘরদোর যে বড় নোংরা হয়ে রয়েছে কুণ্ডুমশাই!

হেসে কুণ্ডু বলেছিল—কে করবে কাকে বলব? ছেলেরা বলে হাসপাতাল যাও। সে আমি যাব না। মরবার সময় আমার মাথার গোড়ায় তুলসীগাছ দেবে, মুখে দুধ গঙ্গাজল দেবে। আমি হাসপাতালে যাব?

—একটা নার্স রাখুন।

—নার্স? দূর দূর দূর!

—বেশ তো আমাকে রাখুন।

—তুই? তুই থাকবি?

—থাকব। দু'বেলা পরিষ্কার করে দিয়ে যাব।

—উহু—থাকতে পারবি?

—তা—। একটু ভেবে হেসে বলেছিল—পারব। রাখুন।

পাশের কামরায় জায়গা করে দিয়েছিল কুণ্ডু। ঢি ঢি পড়েছিল ভুবনপুরে। কুণ্ডুর ছেলেমেয়েরা বিরক্ত হল। তারা আপত্তি করলে। —কলঙ্কের কথাটা শুনছেন না?

কুণ্ডু বললে—না!

মাস দুয়েক সেবার পর সুস্থ হল কুণ্ডু। একটু একটু করে হাঁটছিল লাঠি ধরে।

ওদিকে দোকান দু'মাস লোকসান খাচ্ছিল। শ্রীমতী তার বোনঝিকে নিয়ে ব্যবসা জমিয়ে তুলেছিল। মালতী দোকানে আসছিল না কুণ্ডুকে ফেলে। কুণ্ডু শুনে বলেছিল—তা হবে না। চল রিক্সা করে নিজে যাব আমি।

দোকানে এসে ঠিকেদার ডেকে বলেছিল—তিন মাসের মধ্যে পাকা বাড়ী একতলা হওয়া চাই! করে দাও। দর বেশী দেব।

চার মাস লেগেছিল। ততদিন টিনের দোকানটা খানিকটা সরিয়ে চড়া ভাড়ার জায়গায় করিয়েছিল কুণ্ডু। চার মাস পর কুণ্ডু নিজে এসেছিল এই বাড়ীতে বাস করতে। দানপত্র করে দিয়েছিল বাড়ীটা মালতীকে।

দোকান সাজিয়ে কুণ্ডুই দিয়ে গিয়েছে।

মালতী দোকান করত—মধ্যে মধ্যে উঠে যেত। কুণ্ডুকে দেখে আসত। বাইরে খদ্দের আসত ভিড় করে। সে হাসতে হাসতে এসে চেয়ারে বসত।

তারপর কুণ্ডু মারা গেল। এই বাড়াতেই মারা গেল।

মাথার শিয়রে সে তুলসীগাছ দিয়েছিল। ছেলে বউদের ডেকে এনেছিল। তারা দুধ গঙ্গাজল দিয়েছিল।

তারপর একে একে কতজনের সঙ্গে কলঙ্ক হল। হিসেব নেই।

মন কখনও কখনও চঞ্চল হয়েছে। সেটেলমেন্ট আপিসের একটি অল্পবয়সী বাবু। বেশ

লাগত তাকে। সে মালতীকে চেয়েছিল। মালতী চঞ্চল হয়েছিল। কিন্তু শুনেছিল বাবুটির বউ আছে। সে তারপর থেকে রসিকতাই করেছে। তার বেশী নয়।

আরও কতজনের সঙ্গে। কিন্তু এ তার অসহ্য হয়েছে। আর পারে না। মধ্যে মধ্যে পালা শেষ করতে মনে হচ্ছে। তার কামনা বাসনা যেন মধ্যে মধ্যে নদীর বান ডাকার মত ডেকে যায়।

ভগবানকেও ডাকতে পারে না। ভগবানেও তো তার বিশ্বাস নেই। থাকলে, মাসী, মালতী তোমার কাছেই যেত!

শ্রীমতীর দোকানে গ্রামোফোন বেজে উঠল। নাচের গান বাজছে হাট শুরু হল।

না। এখনও দেরি আছে, দেড়টা বাজছে। ঠাকুর এসে দাঁড়াল। তরকারি এনেছে। আলুভাজা কপির তরকারি মাছের অম্বল। আবার ওটা কি?

ঠাকুর বললে—ডিমের ডালনা।

মালতী বললে—বাপরে এত কেন?

—খাও মা। পৃথিবীতে খাবে না তো করবে কি?

দপ করে রাগ হয়ে গেল। ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু আত্মসংবরণ করলে, বললে—না। নিয়ে যাও। ওটা নিয়ে যাও।

—খাবে না?

—না! বেশ চীৎকার করে উঠল।

ঠাকুর নিয়ে চলে গেল ডালনার বাটি। খেতে বসল সে। অকস্মাৎ কী হল তার সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একখানা দা নিয়ে বাসুদেবকে যেমন কেটেছিল তেমনি কাটতে ইচ্ছে করছে নিজেকে।

গ্রামোফোনে বেজে উঠল এবার আর একখানা গান।

মন অঞ্চল বিজনে............

ফিতে কারওয়ালা হাঁকছে তার জানালার নীচেই—ফিতে কার। কার ফিতে। জামাই বাঁধলে খুলবে না—

সে উঠে পড়ল। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে হাট বসে গেছে। আজ সকালে সকালে বসে গেল হাট। তবে বেলা দুপুর গড়াচ্ছে। এখন চায়ের খদ্দের কম। সিগারেট বিড়ি বিক্রি হবে।

সে হাত ধুয়ে একটু শুয়ে পড়ল। তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙল—ঠাকুর ডাকছে।

—মা—মা!

—কি?

—বসন্তবাবু গোপা এঁরা এসেছেন—ডাকছেন—

—বসন্ত গোপা? কেন?

—বসবেন একটু।

বিরক্তিভরে উঠল মালতী। দরজা খুলে বেরিয়ে এল। উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে গোপা।

বাইরের দরজায় বসন্ত রিক্শার ভাড়া মেটাচ্ছে। তার সঙ্গে একজন কে। একজন নয় দুজন। একজনের বিচিত্র পোশাক, গেরুয়া আলখাল্লার মত লম্বা জামা। পরনের কাপড়টা সাদা। মাথায় একটা গেরুয়া পাগড়ি, চোখে নীল চশমা, লম্বা চুল। মুখে বসন্তের দাগ। একজনের হাত ধরে ধরে ঢুকছে। অন্ধ না কি? কে? কাকে নিয়ে এল বসন্ত!

সম্ভবতঃ মিটিং করবে। এও একজন পাণ্ডা। বিরক্ত হল সে।

ভরাট গলায় বললে—এই বাড়ী?

বসন্ত বললে—হ্যাঁ।

লোকটি অন্ধই বটে। খুব সাবধানে ঠাওর করে পা ফেলছে। সে ডাকলে—মালতী!

—কে? বিস্মিত হল মালতী।

বসন্ত ডাকলে—মালতী!

মালতী সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

ওদিকে গ্রামোফোনে আবার বাজছে—এবার বাজছে তার রেস্টুরেণ্টে—বাজছে সেই গানটা—

প্রাণের রাধার কোন ঠিকানা কোন ভুবনের কোন ভবনে!

মালতী বারান্দায় নামল। নীরসকণ্ঠেই বললে—এস। কিন্তু তার সে ডাক কেউ শুনতে পেলে না। নীল চশমা-পরা পাগড়িধারী লোকটি বলে উঠল—হায় হায় হায়! তারপরই সে সঙ্গীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে হাত মেলে দিয়ে গেয়ে উঠল—

বলতে পারে কোন সজনী কোন স্বজনে!

ওরে—

ওরে কোন গেরামে কোন নগরে কোন বিপিনে কোন বিজনে!

ও আমার প্রাণের রাধার—

তারপরে হঠাৎ গান ছেড়ে দিয়ে বললে—গাবগুবাগুবটা কই—আমার গাবগুবাগুব।

বসন্ত তার গায়ে হাত দিয়ে বললে—হবে, পরে হবে।

—পরে হবে? কেন?

—ওই দেখ মালতী দাঁড়িয়ে।

—এঁ্যা! মালতী! বলিহারি বলিহারি বলিহারি! কই রে? দুষ্টু মেয়ে কই রে? বীর মেয়েটা কই রে? বাপকে বাঁচাতে বাসুদেবের মত পালোয়ান, অসুর রে একটা, তাকে কেটে জেল খাটলি—বীর মেয়ে তুই। কই রে তুই? আমি অন্ধ রে। তুই কই?

মালতী বললে—কে? তার বিস্ময়ের সীমা নেই। গ্রামোফোন রেকর্ডের গানের গলা আর এর গলা এক!

বসন্ত বললে—চিনতে পারছ না?

—চিনতে পারছে না! হা-হা করে হেসে উঠল লোকটি। তারপর গান ধরে দিলে—ওই নীল উজল তারাটি—!

খোকাঠাকুর? নবুঠাকুর? কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে! মুখে বসন্তের দাগে ভরা।

সে রঙ যেন থেকেও নেই। লম্বা—রোগা। চোখ নীল চশমায় ঢাকা। বলছে অন্ধ হয়ে গেছে। সেই দুটি চোখ! কী চোখ! আঃ—! মনের মধ্যে নিঃশব্দে উচ্চারিত হল একটি আঃ আর সঙ্গে সঙ্গে এ কী হল? চোখ জ্বালা করে উঠল—ঠিক জ্বালা করার মত—সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলে চোখে তার জল এসেছে। তার মনের মধ্যে ভাসছে খোকাঠাকুরের সেই রূপ সেই কান্তি! মাসী বলত—সোনাঠাকুর! আঃ! জল বুঝি গড়িয়ে আসছে। সে তাড়াতাড়ি মুছে ফেললে চোখের জল। তারপর এগিয়ে এসে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে।

—মালতী! বাঃ বাঃ—! প্রণাম করছিস। সে হেঁট হয়ে তার মাথার চুলে হাত দিলে। মালতী উঠে দাঁড়াল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে সে বললে—দাঁড়া দাঁড়া! দেখি দেখি কেমন হয়েছিস তুই! হাত দুখানি মাথার চুল থেকে কপালে তারপর বার কয়েক বুলিয়ে দেখে বললে—বা—বা—বা—এ যে তুই খুব সুন্দর হয়েছিস রে! খুব সুন্দর!

মালতী বুঝতে পারলে পাগলই হয়েছে খোকাঠাকুর। সে কথাটাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললে—তোমার একি চেহারা হয়েছে ঠাকুর?

—কি হয়েছে?

মালতীর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—দেখতে পাও না?

চোখের চশমা খুলে ফেললে খোকাঠাকুর।—কি করে দেখব?

ওঃ চোখ দুটো গলে গেছে! আঃ! আবার চোখে জল আসছে।

বসন্ত বললে—চল্ আর উঠোনে দাঁড়িয়ে নয়। একটু বসবার জায়গা দে! সকালে ট্রেনে চেপেছি হাওড়ায়। কি স্নান করবে তো?

—ওরে বাপরে! নইলে তো মরে যাব গো! কিন্তু সে পরে। আগে তোমার কাজ! হ্যাঁ যা করতে আসা। বুঝেছ! ওরে বাপরে, শুনে অবধি শান্তি নাই। দত্তাপহারী। বাপরে বাপরে! দলিলে না থাকলে কি হবে! আমি তো ওস্তাদকে বলে গিয়েছিলাম, যা আছে সব নিয়ো তুমি। গুরুদক্ষিণে দিলাম। টুলু সরকার সাক্ষী, ধরণী দাস আছে সাক্ষী, শ্রীমন্ত মরে গিয়েছে!

মালতী ঘরে জায়গা করে ওদের নিয়ে গেল। বসিয়ে একটা টেবিল ফ্যান লাগিয়ে খুলে দিয়ে বললে—একটু জল খাও বসন্তদা।

বসন্তদা বললে—চা দে!

খোকাঠাকুর—একটু জল, আমাকে একটু জল। আর আমার চেলাকে চা-টা দে। কি কি খাবে মনা?

মনা অল্পবয়সী ছেলে। সে বললে—চা-ই খাব।

মালতী চলে যাচ্ছিল। খোকাঠাকুর বললে—তোর লোকজনকে বল, তুই বস। তুই বস। ঠাকুর বললে—মাসী চলে গিয়েছে নবদ্বীপ। তোর সঙ্গে বনল না। তুই খুব ভাল দোকান করেছিস। পাকাবাড়ি হয়েছে। ইলেকট্রিক লাইট হয়েছে। খুব লাভ। বাহবা বাহবা! তা চাকরদের বল। তুই বস। কুশুর তুই খুব সেবা করেছিস শেষকালটায়। আমি বলি—বা বা বা।

মালতীর মন মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু আত্মসংবরণ করলে। বললে—একটু পর বসছি ঠাকুর। চাকরে কি পারে এসব? কতদিন পর এলে। তোমাদের যত্নটত্ন করি! বসন্তদা লীডার মানুষ। পান থেকে চুন খসলে মিটিংয়ে বলে দেবে কোন দিন। গোপা চান করবে ব্যবস্থা করে দি।

খোকাঠাকুর বলে উঠল—ঠিক ঠিক ঠিক! ঠিক বলেছিস! বা বা বা!

মালতী চলে গেল—শুনতে পেলে ঠাকুর গুনগুন করছে। প্রথমেই গোপাকে নিয়ে গেল কুয়োতলায়; স্নান করবে গোপা। গোপা তাকে বললে—খোকাঠাকুর এখন বিখ্যাত লোক রে! গ্রামোফোন রেকর্ডে ওর গান ওঠে। ওই যে 'কোন সজনী কোন স্বজনে' ও তো ওরই গান। বেশ ভাল টাকা পায়। কালচারাল ফাংশনে পয়সা দিয়ে নিয়ে যায়।

অবাক হবার শক্তিও নাই মালতীর। কেমন নির্বাক হয়ে গেছে ভিতরটা। যে কথা-গুলো বলে এল সেগুলো যেমন সে দোকানে বসে ভাবতে ভাবতেও হেসে খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলে—দাম নেয়, তেমনি ভাবেই বলেছে। আপনার মনের মধ্যে সে ভাবছে সেই খোকা-ঠাকুরকে সোনাঠাকুরকে আর এই শীর্ণ অন্ধ মলিন দেহবর্ণ লোকটিকে। কিছুতেই মিলছে না। শুধু মিলছে কথায় মনে—সেই মানুষটিই সেখানে।

অনেক নাম খোকাঠাকুরের অনেক আয় খোকাঠাকুরের। সে কথাটা তার মনে যেন ঢুকল না।

সে একটু হেসে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল চাকরের হাতে ট্রেতে চা চপ শিঙাড়া সাজিয়ে; নিজে হাতে নিয়ে এল শরবতের গ্লাস। আর একটিন গোল্ডফ্লেক সিগারেট। ঠাকুরের বিড়ি খাওয়া গাঁজা খাওয়া মনে পড়ল। ঠাকুর ঘরে বসে তখনও গুনগুন করছে। বসন্ত ব্যাগ থেকে কাগজপত্র বের করে দেখছে।

সে শরবতটি ঠাকুরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে—খাও।

—এয়ে মিষ্টি গন্ধ উঠছে রে। রোজ সিরাপ বুঝি। বা বা বা! তুই বড় ভাল হয়েছিস মালতী। বড় ভাল। জানিস চোখ গিয়েছে আজ পাঁচ ছ বছর। বসন্ত হয়ে গেল। তারপর থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম। আমি পারি। মুখে হাত বুলিয়ে বুঝতে পারি রূপ কেমন। আর গায়ের গন্ধে বুঝতে পারি মন কেমন। ওসব সাবান তেলের গন্ধ নয় রে! একটা গন্ধ আমি পাই। তোর গায়ের গন্ধ আমি পেয়েছি।

—খাও, শরবতটা খেয়ে নাও।

শরবতটুকু খেয়ে গ্লাসটা রাখতে যাচ্ছিল ইশারায় ইশারায়। মালতী তার হাত থেকে গ্লাসটা নিলে।—দাও। দিতে গিয়ে হাতে হাত ঠেকল।

—দাঁড়া—দাঁড়া।

হাতের উপর হাত বুলিয়ে বললে—দেখি। ভারী নরম হাত। ভারী মিষ্টি।

—ছাড়। নাও। সে সিগারেটের টিন এবং দেশলাই তার হাতে দিলে।—খাও। যে বিড়ি টানতে—তার উপর—

হা হা করে হেসে উঠল খোকাঠাকুর।—মনে আছে? হা—হা—হা—হা! একটানে

একটা বিড়ি টেনে শেষ করে দিতাম। আর সেই মাস্টারের কান ধরা। হা—হা—হা—হা—।

ঘরখানা কাঁপছে হাসিতে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে—কিন্তু আমি তো আর এসব খাই না রে।

—খাও না? এবার বিস্ময় লাগল মালতীর।

বসন্ত হাত বাড়িয়ে সিগারেট দেশলাইটা নিয়ে বললে—আমাকে দাও। গোল্ডফ্লেক! বাঃ!

—তা ঠাকুর যে এখন বিখ্যাত লোক—অনেক রোজগার—গোল্ডফ্লেক ছাড়া দিতে পারি? তা তুমিও বিখ্যাত লোক—তুমিই নাও!

বসন্ত বললে—হ্যাঁ। নবীন বাউল মস্ত লোক। বিখ্যাত লোক! আচ্ছা, আমি ক্যাম্প থেকে ঘুরেই আসি। তুমি বস নবু।

গোপা স্নান করছে। খোকাঠাকুরের সঙ্গের ছেলেটি হাট দেখতে গেল। চলে গেল বসন্ত। বসে রইল মালতী আর খোকাঠাকুর। মালতী বললে—তুমি এ সব ছেড়ে দিয়েছ? অবাক লাগছে!

খোকাঠাকুর হেসে বললে—গলা বসে যেতে লাগল। কিছুতেই সারে না। কোম্পানি বললে ডাক্তার দেখাও। ডাক্তার বললে ক্যান্সার হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। আমি বললাম—তা হোক গলাটা সারিয়ে দেন। ব্যাস তা হলেই হল। তা বললে সিগারেট বিড়ি গাঁজা খেলে গলা দিন দিন বসবে। ক্যান্সারও হবে। বুঝলি—কি করব? গান গাইতে পারব না? ওরে বাপরে বাপরে! দিলাম ছেড়ে।

—ক্যান্সার! এবার কেঁদে ফেললে মালতী। বললে—চিকিৎসা করাও নাই?

—করিয়েছি। পরীক্ষা-টরীক্ষা করলে। গলার মাংস-টাংস দেখলে। বললে, না ক্যান্সার হয় নি। তবে সিগারেট গাঁজা খেলে হবে। ক্যান্সার হলে গলাও বসে যাবে। গলা সারল। সেরে গিয়েছে। বলেই সে হাত বাড়িয়ে আ—বলে সুর ধরে গেয়ে উঠল—

কুল আর কলঙ্ক দুয়ের কারে রাখি বলবে কে সে?
কুল আমার সোনার শয্যে কলঙ্ক মোর কালো কেশে।
কুল রাখি না শ্যাম রাখি হায়—
কুল রাখিলে শ্যাম যে হারায়—
কুল হারালে অকূল পাথার—তল নাই তার ডুবি শেষে!
কুল গিয়েছে শ্যাম গিয়েছে—
সোনার রাধা লুটাইছে—
তবু রাধা কলঙ্কিনী নাম রটেছে দেশে দেশে।

মালতীর চোখের জল আর বাধা মানল না। গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। এ যেন তাকে নিয়েই গান। এ যে সেই। কুলও গেছে তার শ্যামকেও পায়নি। শুধু কলঙ্কের বোঝা বয়ে ভুবনপুরের হাটে সওদা করে চলেছে। জীবনে তার আকণ্ঠ তৃষ্ণা। এক মানুষের কাছে তার নিজের মন নিজেকে দিয়ে তাকে পায় নি, পেলে না। ভুবনপুরের হাটে শুধু পয়সায়

জিনিসে বিকিকিনি। তা ছাড়া সব মিথ্যে।

গানটা থামিয়ে খোকাঠাকুর বললে—গলার আমার কিছু নেই। গলা আমার ভাল হয়েছে। আরও খুলেছে। বুঝলি। এ গানেরও খুব কদর। খুব। গানও আমার। আমার। আমি লিখেছি! কি চুপ করে রয়েছিস যে! তারিফ করলি না? মালতী—চলে গেলি?

মালতী সরে গেল। খোকাঠাকুর হাত বাড়াচ্ছে তার মুখের দিকে। দেখছে আছে কি না।

খোকাঠাকুর আবার ডাকলে—মালতী! তোর গন্ধ পাচ্ছি তো। চলে তো যাস নি!

মালতী উঠে দাঁড়াল। চোখ মুছে বললে—কি খাবে বল তো? মাছ টাছ খাও তো?

—খাই। বুঝলি—মাংস একটু মাংস চাই।

—মাংস খাও?

—খেতে হবে। ডাক্তার বলেছে। জানিস মালতী ক্যান্সার তো হল না। হল কিন্তু টি-বি। দেখছিস না রোগা হয়ে গিয়েছি।

—টি-বি?

—হ্যাঁ। জ্বর হতে লাগল। তারপর মুখ দিয়ে গয়েরে রক্ত বেরুল। ভাবলাম গান গেয়ে গলা ফেটেছে। তা আবার ডাক্তার দেখালাম। ওরা ফটো টটো তুললে বুকের। বললে টি-বি। বলে হাসপাতালে যাও। আমি বলি—না। গান বন্ধ হবে। সিটিং হবে না। মরব—গান গেয়েই মরব। মরবার সময়ের জন্যে একটা গান লিখব। একটা লিখেছি সেটা ঠিক মরবার সময়ের নয় একটু আগের। শুনবি—

সঙ্গে ধরে দিলে গান—আ—!

মালতীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেছে। সে বলতে পারলে না—না থাক!

খোকাঠাকুর গান ধরে দিয়েছে।—

হাটের বেলা ফুরিয়ে গেল ঘাটের খেয়ার ঐ ইশারা।
মাথার বোঝা রাখব কোথায় পাথার নদী নাই কিনারা।
কই দরদী আপন জনা—
কে নেবে মোর মাথার সোনা—
মন মানে না ফেলতে জলে পাওনা আমার যত্নে গোনা।

থেমে গেল হঠাৎ, বললে—তুই কাঁদছিস আমি বুঝতে পারছি। থাক্!

মালতী চোখ মুছে বললে—তুমি কোথায় এসেছ এখানে? ওই জায়গা তুমি বসন্তকে দিয়েছ তাই বলতে সেটেলমেণ্ট আদালতে?

—হ্যাঁ রে। বসন্ত বাহাদুর খুব বাহাদুর—খুঁজে ঠিক বার করেছে। বুঝলি! বললে—আমি এসেছি—তুমি কিছু টাকা নাও। দিয়ে একটা লিখে দাও আমাকে। তোমার তো অভাব নাই।—তা নাই। তা আমি এখন ভাল পাই। তা পাই চাই নাই পাই, গুরুকে মুখে দিয়েছি—লিখতেই ভুল হয়েছে তা বলে টাকা নিতে পারি। তা ছাড়া বসন্ত বাহাদুর—

ভাল লোক—বুকের পাটাওলা মরদ। গোপাকে বিয়ে করেছে তো! চোর জোচ্চোরের কাজ করে নি তো! লীডার লোক। ভক্তি করি। এমন লোককে ভক্তি করি। বললাম —টাকা কেন লাগবে গো! টাকা কিসের! চল চল—বলে দিয়ে আসি। আমি দান করেছি। গুরুকে দিয়েছি—বসন্ত আমার গুরুপুত্র! চলে এলাম। বলে দোব—কাজ হয়ে যাবে। কাল চলে যাব। তোদের দেখা হল। ভুবনেশ্বরকে প্রণাম করে এসেছি। যাবার সময় আর একবার করব।

বাইরে হাট চলেছে। একটা বিরাট চাকে মানুষ মৌমাছি ভনভন গুনগুন করছে। মধ্যে মধ্যে দু'চারটে খুব উঁচু গলায় চীৎকার উঠছে।

হয় ঝগড়া বাদানুবাদ—নইলে কেউ কাউকে ডাকছে। নইলে কেউ উঁচুগলায় নিজের জিনিসের নাম করে চেঁচাচ্ছে। কিন্তু মালতীর মনে হল সমস্ত ভুবনপুর মধ্যরাত্রির মত স্তব্ধ নিস্তব্ধ। কোথাও কেউ জেগে নেই। তার মধ্যে সে হারিয়ে যাচ্ছে। কথা ফুরিয়ে গেছে—ভাবনা হারিয়ে গেছে—জীবনটাই বুঝি ফুরিয়ে যাবে।

* * *

বিচিত্র খোকাঠাকুর। নবীন বাউলের নাম শুনে সেটেলমেণ্ট আপিসের সায়েব বললে—গান শোনাতে হবে।

খোকাঠাকুর খুব খুশী, বললে—নিশ্চয়। ওই হাটতলায় কিন্তু।

হাটতলায় জোরালো ইলেকট্রিক লাইট জেলে আসর বসল। লোক খুব হয়েছিল। গোটা ভুবনপুরের লোক।

মালতী বারণ করলে—না। এ কি করছ?

সঙ্গের ছেলেটি নিজে বারণ করতে পারে নি, মালতীকে বলেছিল বারণ করতে। কিন্তু খোকাঠাকুর হা হা করে হেসে উঠল।

মালতী বললে—তুমি হেসো না ঠাকুর, নিজের ভালমন্দ বোঝ না।

অন্ধ খোকাঠাকুর পায়ে ঘুঙুর বাঁধতে বাঁধতে বললে—ওরে ভুবনপুরের হাটে গান গেয়ে যাই আমার প্রাণের ঝুলি উজাড় করে! বলেই উঠল—এ যে পদ হয়ে গেল রে! বাঃ বাঃ —বাঃ—

ওরে ভুবনপুরের হাটে আমার গান গেয়ে যাই
আমার প্রাণের ঝুলি উজাড় করে।
আমার দুখের বোঝা নামিয়ে দিয়ে সুখ নিয়ে যাই—
প্রাণের রসে তেষ্টা মেটাই কণ্ঠ ভ'রে।
ভুবনহাটের ধুলোর তলায়
হারিয়ে যাওয়া মানত ঢেলায়
কোন জাদুতে করলে মানিক পরব রে গলায়—
কামনারই সোনার সুতোয় গেঁথে পরে যাই।

এ সুখ আমি রাখব কোথা কারে দেব' রে।
আমার প্রাণের ঝুলি উজাড় করে!

অবাক হয়ে গেল মালতী। তার মুখে কথা সরল না। হাতে ধরে আসরে নামিয়ে দিলে, দেখতে দেখতে নবুঠাকুর আলাদা মানুষ হয়ে গেল। হাটের আসরে আলখাল্লা পরে মাতো-য়ারা হয়ে গান ধরলে—প্রথমেই ওই গান। তারপর গানের পর গান। সঙ্গে সঙ্গে ঘুঙুর পায়ে নাচলে। লোকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাহবা দিলে ও নিজেই। হায় হায় হায় করে সরস বাহবা নিজেই দিলে। কখনও বললে—আহা—হা।

সাড়ে দশটা বাজবার পর ভাঙল আসর। তারপরও তার রেহাই হল না। মালতী কেবিনের সামনে চেয়ার পেতে সেটেলমেণ্টের সায়েব বসল—মাঝখানে বসালে খোকা-ঠাকুরকে। বললে—এবার আপনার কথা শুনব।

নবুঠাকুর হেসে খুন।—কথা আবার কি।

—আপনার গল্প। এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন বাউল হয়ে।

নবুঠাকুর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বললে—মানুষের মন দেখুন। রাগ হয়ে গেল। দুর দুর দুর! মানে তখন মনে খুব দুঃখু ছিল। বুঝেছেন। গুরু মন্দ বলত, লোকে মন্দ বলত। গাঁজা খেতাম। হঠাৎ জয়দেবের মেলায় এক বাউলের গান শুনে খুব ভাল লাগল। তাকে ধরলাম! আমাকে শেখাবে? বললে—পারবি? বললে—তবে শোনা একপদ কেমন গান শুনি! তাকে তারই গান গেয়ে শুনিয়ে দিলাম। সে খুশী হল। বললে—চল। কষ্ট কিন্তু অনেক। ওস্তাদ ছিল মেলায়, শ্রীমন্ত ছিল। শ্রীমন্তকে পুকুর দিলাম। আঃ! ওই দেখুন। মুখের কথায় দান—বাবুরা কথা ফিরিয়ে কী কাণ্ডটা করলে দেখুন। মালতী মেয়েটা ভারী ভাল মেয়ে। ভারী ভাল লাগত! আমার গান শুনবার জন্যে ছুঁকছুঁক করে বেড়াত। তার কি হল দেখুন!

একটু চুপ করে থেকে বললে—তা যা হয়েছে তাই হয়েছে—ভুবনপুরের হাটে নিত্যি ফৌজদারি। ও মানুষের স্বভাব। মারে—মার খায়। দণ্ড ভোগে। ভুগেও কিন্তু মেয়েটা জিতেছে। কী ব্যাপার করেছে দেখুন!

কে বললে—আপনার কথা বলুন।

—আমার কথা? এও তো আমার কথা। মালতীকে দেখে যে কী আনন্দ হল! কী বলব। তেমনি আনন্দ বসন্তকে দেখে! বাহবা বেটাছেলে। তা আমিও বাহবা। বুঝেছেন। আমারও বাহবা আছে। কিছুদিন—দু'বছর ঘুরতে ঘুরতে বসন্ত হল। বুঝলেন। ভয়ানক বসন্ত প্রথম হল গুরুর। গুরু গেলেন—আমার হল। কি করে বাঁচলাম জানি না। বাঁচলাম—চোখ দুটি গেল। তারপর ঘুরি পথে পথে। গুরু বলেছিল যা তোকে দিলাম—তু নিজে অভ্যেস করিস—পথে পথে গেয়ে বেড়াস—লোকে শুনবে—তোরও অভ্যেস হবে। ওতেই যা পাবি তাতেই পেট ভরবে। যা ভাববি মনে ভাববি। বুঝলি—মনে রাখবি পাপ নাই—পুণ্যিও নাই। যাতে সুখ নাই তাতে পুণ্যি নাই—যাতে দুখ তাতেই পাপ। তবে

হিসেব। ওই হিসেব করে সুখ কোথা খোঁজ। খুঁজতে খুঁজতে কষ্ট পাবি—আবার আনন্দ পাবি—মনের ওই ভাব ছেঁদে গাঁথবি,—পদ হবে। গেয়ে গেয়ে বেড়াবি। তাই বেড়াচ্ছিলাম। একদিন এক জায়গায় নদীর ধারে অনেক গোলমাল। চোখে তো দেখি না। লাঠি ধরে হাতড়ে চলি। একজনকে বললাম—কি ভাই? না ছবি তুলছে। বায়স্কোপ। তখন সিনেমা ফিলিম জানতাম না। এখন অনেক শিখছি। অনেক। এখন বই পড়তে হয় লেখাপড়া করি। তা আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। কথা শুনে বুঝছি কিছু কিছু। এমন সময় ওদের একজন লোক আমার পোশাক দেখে বললে—কি? তুমি কি দেখছ?

—বললাম—শুনছি বাবা। শুনে বুঝছি।

—বাউলের পোশাক। গাইতে পার নাকি?

—তা পারি। শুনবেন? শোনানোই আমার কাজ বাবা।

বললে—বস তা হলে।

কিছুক্ষণ পর ওরা খেতে বসল। আমাকে বললে—খাবে? বললাম—দাও। বললে—মুরগী। বললাম যা দেবে বাবা তাই খেতে গুরুর আদেশ। তবে মুরগী খাই নাই—মাংসটা দিয়ো না—বাকী সব দাও।

খুব হাসি ওদের। তারপর গান শোনালাম। ওই গানটা—বুঝেছেন—প্রাণের রাধার কোন ঠিকানা; শুনে ওরা খুব খুশী। খুব। বললে—পূর্ণর থেকে কম যায় না। পূর্ণর গান তখন শুনি নাই পরে শুনেছি। ভাল ভাল খুব ভাল। সে যাক—ওরা তুলে নিলে গান—আমাকে কুড়িটা টাকা দিলে। একজনা ওরই মধ্যে আমাকে বললে—আমার সঙ্গে কলকাতা চল। ভাল হবে। নাম হবে। রেকর্ডে উঠবে গান। তা চলে এলাম। এই দু'বছর আগের কথা। লোকে বলে তিনি ঠকিয়েছেন আমাকে। আমার গান রেকর্ড করিয়ে আমাকে একশো টাকা দিয়ে রয়ালটি তিনি নেন। তাঁর কাছ থেকে এলাম আর একজনের কাছে। তারপরে চ্যালা জুটল। বাসা হল। এখন খুব খাতির করে লোক। তবে লোকে বলে আমাকে ঠকায়। আমি জানি। দু' তিন জন মেয়ে ধরেছিল! সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। ভাবি কি বিপদ! কেউ টাকা নিয়ে সরে। কেউ সুর শিখে সরে। কেউ বলে বিয়ে কর। তা বুঝলেন। বিয়ে কাকে করব! ওখানে আমার গুরুর হিসেব। যে মেয়ে আমার সব হবে। যে মেয়ে আমার মধ্যে ডুববে সে ছাড়া কাকে বিয়ে করব। তা গুরু ত্রাণ করলেন—যেই শুনলে আমার টি-বি হয়েছে অমনি সব ভাগল। আমি বলি টি-বি নয়। গুরুর আশীর্বাদ। জয় গুরু। বুঝলেন। একবার হাজার টাকা রাখলাম বালিশের নীচে—একটা মেয়ে দেখেছিল নিয়ে ভাগল। তারপরে বলে টাকা ধার চাই বাড়ীতে অভাব। পরিত্রাণ পেয়েছি। এখন আমাকে ভূতের মত ভয় করে।—

বলে হা হা করে হেসে উঠল।

তারপর বললে—আমার বসন্তদাদা গুরুপুত্র—আমার যা করলে তা গুরুপুত্র ছাড়া কে করবে? ভুবনপুরে নিয়ে এল। মাটির বাঁধন ঘুচিয়ে দিলে। ভুবনপুরের হাটে বলেই সুরে

গাইলে—আহা—

ভুবনপুরের হাটে আমার গান গেয়ে যাই।

বুঝলেন—এটা আজই বাঁধলাম।

মালতী নিজের চেয়ারটিতে বসে শুনছিল।

ঘুম এসেছিল বোধ হয়! টেবিলে মাথা রেখে যেন শুয়েছিল।

আসর ভাঙল—তখন রাত্রি বারোটা।

ঘরে বিছানায় বসেছিল নবুঠাকুর। তার শুয়ে ঘুম হয় নি।—ছেলেবেলার কথা মনে পড়েছে। ছবির পর ছবি ভেসে যাচ্ছে মনে!

মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছে কোথায় একজন কেউ জেগে আছে। বাকী সব নিস্তব্ধ। রাত্রি বোধ হয় তিনটে।

হঠাৎ যেন দরজা খুলে গেল!

নবু বললে—কে? তারপরই সে বললে—মালতী? গায়ের গন্ধ পেয়েছে সে।

মালতী বললে—হ্যাঁ!

—কি রে?

অসংকুচিত কণ্ঠে মালতী বললে—তোমার কাল সকালে যাওয়া হবে না। যেতে পাবে না।

—কেন রে?

—শুধু কাল নয় বরাবরের জন্যে। আমি তোমার সেবা করব।

—মালতী! মালতী! কাছে আয়—শোন।

মালতী এসে কাছে বসল তার। নবুঠাকুর তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বললে—আমার সেবা করবি? তুই আমার সেবা করবি?

—তোমার সেবা করব। তোমার চিকিৎসা করাব, তোমাকে বাঁচাব। ঠাকুর তোমার টাকা আমি চুরি করব না—ধার চাইব না। সুরও শিখব না। যদি পার তোমার নিজেকে আমায় দিয়ো!

—তুই কাঁদছিস? চোখের জল পায়ে পড়ছে। মালতী তুই আমায় নিবি?

মালতী তার পায়ে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে বললে—আমি আর পারছি না। তুমি আমাকে নাও।

নবু বললে—চল। আমার হাত ধরে নিয়ে চল—ভুবনেশ্বরতলায় বাবাকে সাক্ষী রেখে তোকে নিয়ে আসি। নে হাত ধর।

পথে কে কাতরাচ্ছিল জন্তুর মত। একটা মেয়ে। ও টিকলির বোন। পূর্ণগর্ভা ছিল। তার সন্তান হচ্ছে।

নবু বললে—কে? কি?

ওদিকে কে কাঁদছে। ও চুনারিয়া কাঁদছে। তার বাবার অসুখ ছিল।

সে বললে—কিছু নয়। চল।

ওরা ভুবনেশ্বরতলায় গিয়ে উঠল।

অরণ্য-বহ্নি

প্র স্তা ব না

আমার সঙ্গে একশো বারো বছর পিছনে চলুন।

১৮৫৪ সন। আজ ১৯২৬ সন—এখন থেকে একশো বারো বছর আগের কথা। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল।

তখন বাংলাদেশ বলতে বাংলা বিহার উড়িষ্যা তিন প্রদেশ একসঙ্গে। যে অঞ্চলের কথা বলছি, সে অঞ্চল উত্তরে ভাগলপুর থেকে গঙ্গার পশ্চিমে তিনপাহাড় রাজমহল থেকে দক্ষিণে বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষীর উত্তর এবং গোটা সাঁওতাল পরগনা এবং দেওঘর নিয়ে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা। আসুন সে-আমলে এই অঞ্চলটায় একটু ঘুরে আসি।

রাজমহল থেকে সমস্ত দক্ষিণ এলাকা তখন জেলা মুরশিদাবাদের এলাকা। এবং দেওঘর সাঁওতাল পরগনা নিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত। নবাবী আমলে এর সমস্তটাই ছিল বসতিবিহীন অরণ্যভূমি। ইংরেজের দেওয়ানীর পর পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময় থেকে এসব অঞ্চলে বন কেটে চাষের ক্ষেত তৈরী হচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় সাঁওতালদের গ্রাম থেকে সাঁওতালরা সমতলে নেমে এসে গ্রামে বসতি তৈরী করে জমি ভাঙছে। হিন্দু ব্যবসাদার গৃহস্থ এরাও চাষের ক্ষেত তৈরী করে অঞ্চলটার চেহারা অনেকটা পালটে দিয়েছে। ওদিকে গঙ্গার স্রোতকে পূর্বদিকে রেখে তার সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল রেখায় রেল-লাইন বসাবার কাজ চলছে পুরোদমে। মধ্যে মধ্যে নীলকুঠি বসিয়েছে সাহেবানেরা, তার সঙ্গে রেশম-কুঠি। খ্রীশ্চান মিশনারীরা পার্বত্য এলাকায় মিশন গেড়ে বসেছে।

গ্রামগুলি সবই প্রায় মাটির দেওয়াল, খড়ো চাল এবং খাপরার চালের বাড়ি-ঘরের গ্রাম। হাজারখানা ঘরের মধ্যে দশখানা বিশখানা পাকা বাড়ি। তাও সব ইদানীং তৈরী হচ্ছে। নবাবী আমলে রাজমহলে ছিল নবাবী মহল; বড় ব্যবসাদারদের পাকা বাড়ি। বীরভূমে রাজনগরে মুসলমান রাজা সাহেবের পাকা বাড়ি এবং তার অধীনে যে সব ছোট জায়গীরদার তালুকদার ছিল তাদের বাড়ি-ঘরের মধ্যে ছিল অর্ধেক পাকা অর্ধেক কাঁচা। দু-চারখানা গ্রাম অন্তর এক একখানা হিন্দুর গ্রামে দুটো চারটে কি একটা পাকা শিবমন্দির এবং মুসলমানদের গ্রামে ছিল পাকা মসজিদ—এ ছাড়া পাকা ঘর ছিল না। লোকেরা মৃত্তিকা দগ্ধ করে বাস করত না। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের পথ কাঁচা মাটির পথ।

অঞ্চলটাই পাথর কাঁকর আর লালমাটির অঞ্চল। শক্ত কঠিন রুক্ষ মাটি। লাল ধুলোয় ভরা। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে শালবনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। মধ্যে মধ্যে পড়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সে প্রান্তর ধূসর রুক্ষ, মধ্যে মধ্যে বড় বড় পাথরের চাঁই মাথা ঠেলে বেরিয়ে যেন থাবা গেড়ে বসে আছে। এরই মধ্যে আপনার চোখে পড়বে দু-চারটে পঁচিশ থেকে তিরিশ-চল্লিশ ফুট উঁচু পাথরের ঢিবি; তাকে ঘিরে জন্মেছে শালগাছ—কচিৎ কোথাও একটা বড় বটগাছও আপনার চোখে পড়বে।

তারপরই আবার পড়বে মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ শালজঙ্গল। মধ্যে মধ্যে কাঁঠালগাছ দেখতে পাবেন। হঠাৎ চোখে পড়বে কাঁচা সোনার বর্ণের শিমুল ফুলের মত বড় বড় ফুলে

ছেয়ে রয়েছে খানিকটা বনভূমি। গাছের শাখাপ্রশাখায় পাতা নেই; আঁকাবাঁকা কাণ্ডশাখা। ওই ফুলে শাখাপ্রান্তগুলি ছেয়ে আছে। বসন্তকালে শীতের শেষে পলাশ গাছে পলাশ ফুলও পাবেন।

কিন্তু মুগ্ধ হয়ে স্থান কাল ভুলে যাবেন না।

কাল ১৮৫৪ সন। এবং স্থান বর্তমান সাঁওতাল পরগনার পার্বত্য অরণ্য অঞ্চল। হঠাৎ হয়তো পথের উপর বেরিয়ে আসবে হেঁড়োল, নেকড়ে, হায়েনা। মাথার দিকটা উঁচু, পিছন দিকটা খাটো, গায়ের কালচে মেটে রঙের উপর ডোরা দাগ। নয়তো পাবেন, চিতাবাগ, গুলবাঘা; অবশ্য গরু বাছুর ছাগল ভেড়ার ওপরই এদের নজর বেশী; আপনি চঞ্চল না হলে আড়াল দিয়ে চলে যেতে পারে। কিন্তু 'ঝিঙেফুলি' চিতাও আছে। এরা মানুষকেও ছাড়ে না। নয়তো বেরিয়ে আসবে ভালুক। কখনও কখনও পথের ধারে গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে মুখ ঝুলিয়ে ঝোলে পাহাড়ে চিতি! পথের উপর পড়ে থাকতেও দেখতে পেতে পারেন। কখনও কখনও হরিণের পাল বনের এধার থেকে ওধারে চলে যাবে পথ পার হয়ে দুরন্ত বেগে ছুটে; দুটো চারটে জোয়ান হরিণ লাফ দিয়ে পেরিয়ে যাবে রাস্তাটার এমাথা থেকে ওমাথা। আর শুনতে পাবেন ক্যাওক্যাও শব্দ। ময়ূর ডাকবে গাছের মাথায় বসে। তার সঙ্গে নানান জাতির পাখীর কলরব। কল-কল-কল-কল!

একলা মানুষের বা একখানা গাড়ির এ পথ পার হওয়া সম্ভবপর নয়; দল বেঁধে জুটে যেতে হবে। গাড়ি হলে একসঙ্গে আট-দশখানা গাড়ি। আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে, বিপদ বুঝলেই সকলে মিলে চিৎকার দিতে হবে। চিৎকার শুনে জন্তুজানোয়ারও ঘাবড়াবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া মিলবে, পাহাড়ের মাথায় সাঁওতালদের গ্রাম থেকে পাহাড়িয়া সাঁওতালদের এবং নীচে নতুন আবাদী 'ডামিন' বা 'জঙ্গি' এলাকার গ্রাম থেকে সাঁওতালদের সাড়া পাবেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দল বেঁধে কাঁড় তীর আর তিন হাত লম্বা মোটা বাঁশের ধনুক এবং বল্লম হাতে ছুটে আসবে আপনাদের সাহায্যে। সঙ্গে করে আপনাদের পার করে এগিয়ে দেবে খানিকটা। আপনি খুশী হয়ে টাকাপয়সা দিলে তারা নেবে এবং খুশীও হবে, কিন্তু তার থেকেও তারা খুশী হবে আপনি যদি তাদের কিছু পুঁতির মালা দেন, রূপাদস্তার গয়না দেন কিংবা রঙিন সুতোর 'চাবকি' দেন। সব থেকে খুশী হবে ওদের যদি দু-চার সের নুন দেন। নুনের ওদের বড় অভাব। নুন ছাড়া খাওয়ার জন্য ওদের কেনবার কিছু নেই। বিদায় নেবার সময় ওদের হাতে হাতে হাত মিলিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বলবেন—জোহর, জোহর মাঝি হে!—অর্থাৎ নমস্কার, নমস্কার মাঝিমশায়। ওরা বিগলিত হয়ে যাবে। ওরা চলে যাবে। কাঁধে ধনুকটা ঝুলিয়ে কোমরে গোঁজা বাঁশের বাঁশীটা টেনে নিয়ে পাঁচ-সাতজন একসঙ্গে সুর তুলে ওদের গান ভাঁজতে ভাঁজতে চলে যাবে নিজেদের গাঁয়ে।

বলতে বলতে যাবে—দিকুগুলা (হিন্দুদের দিকু বলে) ভাল লোক। বুলুং [অর্থাৎ নুন] দিলে!—কি বলবে—পয়সা দিলে!

এদের ভয় করবেন না। এরা অরণ্য মানুষ, কালো রঙ, পরনে মাত্র একফালি কাপড়,

মাথায় বাবরি চুল; তাতে ফুল গোঁজে, কানে ফুল গোঁজে, পুঁতির মালা গলায় পরে হীরে-মণিমাণিক্যের কণ্ঠহার পরার আনন্দ উপভোগ করে। এরা বাঘ মারে, ভালুক মারে, কিন্তু এরা চোর নয়, লুঠেরা নয়; বাঘ ভালুক সাপ ছাড়া এ অঞ্চলের মানুষের কাছে কোন ভয় নেই।

মেয়েরা কষ্টিপাথরে খোদাই-করা সুঠামগঠন নারীমূর্তি। ডাগর চোখ, কপাল ছোট, মাথার চুল ঘন কিন্তু লম্বায় খুব দীর্ঘ নয়। সিঁথি কাটে না, সমান করে উল্টিয়ে টেনে চুল পাকিয়ে খোঁপা বাঁধে। খোঁপায় থাকে জিজির গাঁথা কাঁটা ফুল। কিন্তু তাও দেখা যায় না। সেখানে থোকা থোকা হলুদ ফুল আর লাল ফুল গুঁজে রাখে। মেয়েদের যদি কিছু উপহার দিতে চান তবে রঙিন উজ্জ্বল ফুল দেবেন। এদের পরনে দুপ্রস্ত সাঁওতালী তাঁতে-বোনা মোটা সুতোর কাপড়; রঙিন; একপ্রস্ত কোমর থেকে নীচের দিকে, অপর প্রস্তটাকে কোমরে একপ্রান্ত গুঁজে বুক ঢেকে পিঠ বেড়ে কোমরে আঁটসাঁট করে জড়িয়ে গোঁজে। গলায় ওই ওদের হীরে মানিক রঙিন পুঁতির মালা। রঙিন ফুলের সঙ্গে পুঁতির মালা আর একফালি আড়াই হাত লম্বা উজ্জ্বল রঙের কাপড় যদি দিতে পারেন তবে তো কথাই নেই। তবে ভাববেন না সে আপনার প্রেমে পড়বে; সে শুধু ফিক্ ফিক্ করে হাসবে এবং বলবে—দিকু তু বড় ভাল! তু বড় ভাল!—সেকালে ওরা হিন্দু ভদ্রলোকদের বাবু বলত না, বলত 'দিকু'। মুসলমানদের বলত, শেখ মোসল।

নব্বুই বছর বয়সের বৃদ্ধ প্রতিমা কারিগর নয়ন পাল ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ বাবু আমার কাছে পট আছে। এ কালের পট আছে। কিন্তু সে তো দেখাই নে কাউকে। বাড়িতে যত্ন করে রেখে দিয়েছি। মধ্যে মধ্যে নিজে কখনও-সখনও উলটে-পালটে দেখি। অন্যকে দেখাতে মানা আছে। পিতিপুরুষে বারণ করে গিয়েছেন। তবে—

তবে ভটচাজ মশায়রা আমাদের গুরুবংশ। যাঁর নাম করে এসেছেন আমার কাছে, তেনার কাছে আমি মন্ত্র নিয়েছি। তিনি আমার গুরু। তিনি যখন বলেছেন তখন—

তখন তো না বলবার সাধ্যি আমার নাই।

১৮৫৪ সনে বাংলাদেশে সাঁওতাল-বিদ্রোহ হয়েছিল। সাঁওতাল হাঙ্গামার বিবরণ বাল্য-বয়সে আমি শুনেছি আমার পিসীমার কাছে। আমার বাবার মামার বাড়ি সিউড়ির উত্তরে ময়ূরাক্ষীর ওপারে কানা ময়ূরাক্ষীর একেবারে উপরে, মহলপুর গ্রামে। পিসীমা আমার আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হত পঁচানব্বুইয়ের কাছাকাছি। সাঁওতাল হাঙ্গামার বিশ বছর পর তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। এবং বাল্যকালে থাকতেন তাঁর দিদিমার কাছে। সাঁওতাল হাঙ্গামার সময় তিনি যৌবন পার হয়ে পঞ্চাশের কাছে পৌঁছেছিলেন। তাঁর কাছে শোনা গল্প—বালক আমার কাছে ঘুম পাড়াবার জন্তে। বলতেন—"এই সিঁদুর দিয়ে রাঙিয়ে রক্তমাখা মুখ, হাতে এই রক্তমাখা টাঙি। কাঁধে তীর ধনুক। ধি-তাং-তাং, ধি-তাং-তাং শব্দে মাদল বাজাতে বাজাতে এসে পড়ল। যাকে দেখলে তাকে কাটলে টাঙির ঘায়ে। যে

পালাল তাকে মারলে কাঁড়। কাঁড় মানে লোহার ফলাওলা দু হাত লম্বা তীর। ভদ্রলোকে যে যেদিকে পারলে পালালে।"

মুখে তাদের বুলি—একবার বোল দুই হোনো।

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম।

তারপর প্রথম যৌবনে বীরভূমের গৌরবের ভাণ্ডারী ঐতিহাসিক সিউড়ির শিবরতন মিত্র মশায়ের সংগ্রহশালায় সাঁওতাল বিদ্রোহের পাঁচালী বা ছড়া পড়েছিলাম। পাঁচালী রচনা করেছিলেন মামুদবাজার থানার কুলকুড়ি গ্রামের অধিবাসী কায়স্থ-সন্তান রাইকৃষ্ণ দাশ। ভণিতায় আছে—

"কথা মিথ্যা নয়, কথা মিথ্যা নয়,—
সত্য হয় এই যে বিবরণ।
হরি হরি বল, দিন গেল অকারণ।"

এই ছড়ার মধ্যে পিসীমা যা বলতেন তারই উচ্চ এবং বহুবারধ্বনিত প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলাম। সেকালের 'সংবাদ প্রভাকরে'র ৫৩০০ সংখ্যায় পড়েছিলাম—"বাসেন্দা লোকেরা আপন ২ গৃহ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট স্কুল বন্ধ হইয়াছে। কালেক্টর সাহেব সরকারী টাকার সিন্দুক স্থানান্তরে রাখিয়াছেন। সাঁওতাল জাতিরা যদ্যপি অত্যাচারী সাহেবদিগের অত্যাচারের প্রতিফলন দিয়া ক্ষান্ত হইত তবে ক্ষতি ছিল না। কারণ যাহারা বলপূর্বক স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব নাশ করে তাহাদিগের প্রাণ বধ করিলেও ক্রোধানল শীতল হয় না। কিন্তু অসভ্যজাতিরা প্রজাপুঞ্জের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিতেছে। তাহারা যে গ্রাম দিয়া আসিতেছে সেই গ্রাম লুট ও অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিতেছে, শত শত মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট করিতেছে।"

"নারায়ণপুর গ্রামে ১০০০০ হাজার প্রজা ছিল—তাহাদিগের অধিকাংশ ধনাঢ্য—তাহারা কেহ নাই, স্থানে স্থানে মৃতদেহ পড়িয়া আছে। গৃহাদি সকল ভস্মীভূত হইয়াছে।"

"দুরাচারীরা স্ত্রীলোকদিগের আভরণ ও পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত লইয়া গিয়াছে, জননীর ক্রোড় হইতে শিশুসন্তানকে গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মুখেই বিনষ্ট করিয়াছে।"

"বারকুপ গ্রামের সাঁওতালরা গর্ভিণী স্ত্রীলোকের উদর চিরিয়া তন্মধ্যস্থিত শিশুসন্তান বাহির করিয়া হত্যা করে।"

এদের নেতা এই বিদ্রোহের মূল—সিধু আর কানু মাঝি। এরা রাজা হয়েছিল। এদের সেনাপতি ছিল ভৈরব মাঝি আর চাঁদ মাঝি।

শেষ পর্যন্ত এরা মরেছিল। বিদ্রোহ থেমেছিল। এর ফলে সাঁওতালদের জন্যে পৃথক জেলা তৈরী হয়েছিল—সাঁওতাল পরগনা।

ইতিহাস পড়ে একটি আদিম উন্নত জাতির বর্বর অভ্যুত্থান ছাড়া আর কিছু পাই নি। ভুলে যেতেই চেয়েছিলাম। এরা আজ নানান স্থানে এসে আমাদের সঙ্গে মিশেছে, গ্রামপ্রান্তে ঘর গড়েছে। সভ্যতার সংস্পর্শে এসে পরিবর্তন অনেক হয়েছে। পুরুষ নারীর চরিত্র বদলেছে। এদের সঙ্গে মিশেছি। ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। এরা আজও সরল আছে! তবু

সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা মনে করলে সরে পিছিয়ে এসেছি খানিকটা!

না—থাক।

হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটল।

মোটরে যাচ্ছিলাম—দুমকা থেকে সোজা যে রাস্তাটা চলে গেছে উত্তরমুখে সাহেবগঞ্জের দিকে এবং সাহেবগঞ্জ থেকে চলে গেছে ভাগলপুর—সেই রাস্তা ধরে ভাগলপুর। দুপাশে বন এবং পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চড়াই উতরাই। আধুনিক কালের মসৃণ পথ। প্রকৃতি বনফুলে সর্বাঙ্গ সাজিয়ে যেন ওই মনোরমা সাঁওতাল যুবতীর মতই পাহাড়ের পাথরের উপর ঘুমিয়ে আছেন। এই দেখবার জন্তেই মোটরে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ পথে বিপর্যয় ঘটল। মোটর বেগড়াল। একবার পথে নেমেছিলাম। গাড়িটার ইঞ্জিন বন্ধ করতেই দেখা গেল ওয়াটার পাম্প লিক করে জল পড়ছে। ড্রাইভার মল্লিক নিজে মেকানিক। সে সব রকম উপায় চিন্তা করে উপকরণ সঙ্গে রাখে। বের করলে খানিকটা সাবান। করে বললে—ওতে কিছু হবে না—সাবান গুলে নরম করে টিপে দিলেই লিক বন্ধ হবে।

মল্লিকের দাওয়াই কার্যকরী হল, গাড়ি চলল; পাকুড়ের রাস্তা ডাইনে রেখে হিরণপুরের হাটও ডাইনে ফেলে গাড়ি চলল। রাত্রি আটটা নাগাদ সাহেবগঞ্জ পৌছিবার কথা। কিন্তু আরও মাইল কতক এগিয়ে সন্ধ্যের মুখে এক জায়গায় পাশে একটা ঝরনা দেখে গাড়ি রুখলে, গাড়ির ভিতরে পায়ের কাছে উত্তাপ প্রবল হয়ে উঠেছে। রেডিয়েটার ক্যাপটা খুলতেই দেখা গেল খানিকটা গরম জল বার দুই টগবগ করে ফুটে উঠেই নীচে নেমে গেল। ওদিকে ওয়াটার পাম্প থেকে জল পড়ে গেল ছরছর করে। সম্মুখে প্রান্তর—অরণ্যময় প্রান্তর—দূরে গ্রামের চিহ্ন দেখা যায় না। চিন্তিত হয়ে বললাম—তাই তো মল্লিক—

—কিছু চিন্তা করবেন না—আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।

আবার সে সাবান গুলতে লাগল এবং সাবান গুলে ভাল করে লাগালে ওয়াটার পাম্পের চারিদিকে। চাকর রাম বালতি করে জল নিয়ে এসে ঢাললে। এবং গাড়ি আবার স্টার্ট দিয়ে মল্লিক চালাতে শুরু করলে। কিন্তু কিছুদূর এসে হঠাৎ একটা টং করে শব্দ হল। মল্লিক এবার বললে—সেরেছে!

অর্থাৎ ওয়াটার পাম্পের নিচের দিকটা খসে পড়ে গেছে। এবং সমস্ত জলটাই পড়ে গেছে মিনিটখানেকের মধ্যে।

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। নিরুপায় হয়ে ভাবছি কি হবে? এরই মধ্যে একদল মাঝি অর্থাৎ সাঁওতালদের সঙ্গে দেখা হল। তারা বললে—সামনে একটা সরকারী বাংলো আছে, বেশী দূর নয়—রশি দুই দূরে।

বললে—সিখানে যা তুরা। গাড়ি রেখে থাকবি। কাল বাসে চেপে যাবি সায়েবগঞ্জ—মিস্ত্রী লিয়ে এসে মেরামত করিয়ে লিবি। লইলেই এখানেই থাক। আর আমাদের বাড়ী যাবি তো আয়। দাকা (অর্থাৎ ভাত) দিব, সিম (অর্থাৎ মুরগী) দিব, আর হাঁড়িয়া (অর্থাৎ পচুই মদ) খাস তো তা দিব।—বলে খিলখিল করে হেসে উঠল।

বললাম—না—আমাদের গাড়িটা ঠেলে ওই বাংলোতে পৌছে দে। টাকা দেব আমি।

—টাকা? ক' টাকা দিবি?

—গেল টাকা। (অর্থাৎ দশ টাকা)

হাসলে মাঝিরা। বললে—উঁহু।

—কত টাকা নিবি বল?

—শায় টাকা। (অর্থাৎ একশো)

—শায় টাকা!

—হঁ। তুরা বাবু—অ্যানেক টাকা তুদের; দে শায় টাকা দে।—সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল মাঝিরা। একজন ওরই মধ্যে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বললে—না বাবু। তুকে ওরা মসকরা করছে। আমরা কুছু লিব না। চল—তুর গাড়ি ঠেলে উখানে দিয়ে আসি।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কিছু নিবি না?

—না বাবু। আমাদের লিতে নাই। বারণ আছে।

—বারণ আছে? কে এমন বারণ করলে?

—বারণ করে গেইছে আমাদের শুভোবাবু। সিধু আর কান্হু আমাদের শুভোবাবু ছিল। সাঁওতালরা যখুন হুলু করলে, মানে হুল হাঙ্গামা করলে, সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করলে তখুন তারা বলে গেইছে কি—দেখ্ মানুষের যখুন বিপদ হবে তখুন তাকে বাঁচাবি, রাখবি, নিজের জানটা দিবি, কিছু লিবি না তার কাছে; রাতে মানুষ এসে ঠাঁই চাইলে তাকে ঘরে ঠাঁই দিবি, নিজে বাহার শুবি। আমাদিগে টাকা লিতে নাই বাবু।

'আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। মনে পড়েছিল সাঁওতাল হাঙ্গামার কথা। মনে পড়েছিল আমার পড়া এবং শোনা সাঁওতাল অত্যাচারের কথা। তাদের বলবার মত কথা আমি খুঁজে পাই নি।

তারা আমার গাড়ি ঠেলে ডাকবাংলোর সামনে হাতাটার মধ্যে পৌঁছে দিয়ে চৌকিদারকে ডেকে এনে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিল। যাবার বলে গিয়েছিল—কুছু ভয় নাই বাবু, তু থাক। উ চৌকিদারটো মাহাতো বেটে—উ রাতে থাকবেক নাই, পালাবে। বুলে—রাতে উই আমাদের পুজোর জাগায় কি সব হয়। ডর লাগে। হাঁ বাবু, উইখানে আমাদের শুভোবাবু সিধু কান্হু তুদের দুগ্গাপুজো করেছিল সে হুলুর সময়। উইখানে সিধু কান্হু মাঠেক্‌রেনের দেখা পেলে। মাঠেক্‌রেন বুললে—তুরা শুভোবাবু হলি রাজা হলি—পুজো কর। খুব ধূম করে পুজো হল—বড় বড় কাঁড়া কাটলে। কিন্তুক কি দোষ হল—হেরে গ্যেল। সিধু মল গুলিতে। কান্হুর ফাঁসি হল। তাদিকে পুড়ায়ে উইখানে ছাই গেড়ে দিলে। উরা বুলে—সিধু কান্হু রাতে ওই জহর সর্ণায় (দেবস্থানে) এসে ঘুরে বেড়ায়। তাই ডরে পালায় চৌকিদারটো। তা পালাক। কুনো ভয় নাই তুর—তু থাক। সি কুছু করবে না। না। করবে না।

সেদিন রাতে আমার ঘুম হয় নি। মল্লিক আর রাম ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমি জেগে ছিলাম। স্যুটকেসে বীরভূম জেলার হ্যাণ্ডবুক ছিল, সেটা বের করে পড়তে বসেছিলাম। মনের মধ্যে আগের দিনের সংগ্রহ করা তথ্যগুলি ঘুরছিল।

বাইরে ছিল জ্যোৎস্না। আকাশ নীল; আকাশের চাঁদ শুক্লা দ্বাদশী কি চতুর্দশীর চাঁদের মত আকারের। বাংলোর পিছনে খানিকটা দূর থেকেই শালবনের সীমানা শুরু হয়েছে; শুধু শালবনই বা কেন, একটা পাহাড় যেন এখান থেকেই উঠেছে; জ্যোৎস্নালোকিত শালবনের ক্রমোচ্চ মাথাগুলি দেখে বুঝতে বাকী থাকে না যে যেমন যেমন পাহাড় ঢালু হয়ে উঠে গেছে তেমনি তেমনি গাছের মাথাগুলি উঁচু দেখাচ্ছে।

বসন্তকাল, শালবনে ফুল ধরতে শুরু করেছে, পাতা-ঝরা প্রায় শেষ হচ্ছে। পত্রহীন সরল দীর্ঘ শালকাণ্ডের ভিতরটায় আঁকাবাঁকা ফালি ফালি জ্যোৎস্না একটি অপরূপ চিত্রপট ফুটিয়ে তুলেছে। মধ্যে মধ্যে পাখী ডাকছে। কোকিল ডেকে চলেছে। পাপিয়া ডাকছে। মধ্যে মধ্যে কর্কশ স্বরে ডাকছে প্যাঁচা। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে মাদলের ধি-তাং ধি-তাং শব্দ।

আমি হাণ্টার সাহেবের বিবরণ পড়ছিলাম।

…Two brothers inhabitants of a village (Bagnadihi) that had been oppressed beyond bearing by Hindu usury, stood forth as the deliverers of their countrymen, claimed a divine mission, and produced heaven-sent tokens as their credentials. The god of the Santals, they said, had appeared to them on seven successive days; next as a flame of fire, with a knife glowing in the midst; then in form of the wheel of a bullock cart;…

আরও পেলাম—carried off Brahman priests to perform the great October festival (Durgapuja).

মনে মনে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছিলাম সেই সেকালের সাঁওতাল বিদ্রোহের মধ্যে দুর্গাপূজার সমারোহ। আমি জানি, বাল্যকাল থেকে দেখে আসছি বিজয়া দশমীর দিন সাঁওতালদের মহোৎসব। হাঁড়িয়া খেয়ে, আপন আপন সব থেকে উজ্জ্বল পোশাক পরে, মাথায় ময়ূরের পালক বেঁধে যুদ্ধনৃত্যের প্রমত্ততা। এ উৎসব তাদের আজও আছে। ভাবছিলাম আর তাকিয়েছিলাম জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমির দিকে।

হঠাৎ যেন মনে হল বনভূমের মধ্যে একজন কে দীর্ঘকায় কালো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছে ঠেস দিয়ে। স্থির—নিশ্চল। ধ্যানমগ্নের মত।

চমকে উঠেছিলাম।—কে? ও কি সিধু, না কানু?

সাওতালেরা বলে গেল লোকে বলে রাত্রে সিধু কানু এখানে ঘুরে বেড়ায়।

তাদের কেউ? একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম, ক্রমশঃ সমস্ত আকার অবয়ব যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। হাত দুখানি প্রশস্ত বুকের ওপর ভেঁজে রেখে পায়ের উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের প্রফিল দেখা যাচ্ছে। মাথায় বাবরি চুল তাও দেখতে পেলাম।

প্রথমটা ভয় হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে সাহস ফিরল। বিছানার উপর থেকে উঠে জানলাটার ধারে এসে আধখোলা জানলাটাকে পুরো খুলে দিয়ে দাঁড়ালাম।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই আছে। ও কে? সিধু? কারণ সিধুকেই ইংরেজরা আহত অবস্থায় ধরে এইখানেই গাছের ডালে ফাঁসি দিয়েছিল।

সাহস বাড়ছিল। মনে পড়ছিল মাঝিরা বলে গেছে সে কখনও অনিষ্ট করবে না।

সাহস করে ডাকলাম—গুভোবাবু! (অর্থাৎ রাজাবাবু) সিধু গুভোবাবু!

উত্তর পেলাম না। আবার ডাকলাম। এবার দেখলাম নড়ছে সে। সাঁওতাল পরগনার ফাল্গুন শেষের এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগল। গাছগুলো দুলে উঠল; একটা ঝরঝরে বাতাসের প্রবাহ বয়ে গেল অরণ্যলোকে অল্প খানিকটা আলোড়ন তুলে। একটা টানা শব্দের সঙ্গে শালগাছের পুরনো পাতা যা অবশিষ্ট ছিল ঝরে পড়তে লাগল। এবার দেখলাম গাছের দোলার সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ তরুণ জোয়ানটি আর মানুষ নয়, সেটা অন্য একটা গাছের ছায়া একটা মোটা শালগাছের কাণ্ডের উপর পড়ে এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিল—তাই দেখাচ্ছিল মানুষের মত।

ফিরে এসে শুয়েছিলাম! শুয়ে ওই সেকালের কল্পনা করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হাণ্টার লিখে গেছেন—Even in their moment of success, however, the Santals were not wanting in a sort of barbaric chivalry and gave fair warning of purpose to plunder a town before they actually came.

যে ছায়াটাকে ভ্রম করেছিলাম সিধু বলে, যার মূর্তিটি ওই স্থির ছায়ার মধ্যে মিশে সত্যই দাঁড়িয়েছিল, তার মধ্যে সেই barbaric chivalry-র আভাস দেখেছি। সিধুকে এখানেই ফাঁসি দিয়েছিল। হ্যাঁ সেই মূর্তির মধ্যে নির্ভীক এক কঠিন মানুষকে দেখেছি। সে রাজা হতে চেয়েছিল।

—আর কিছু দেখলি না তু?—এবার কণ্ঠস্বর যেন ঘরের মধ্যে।

—কে? চমকে উঠেছিলাম।

চোখ ফিরিয়ে ঘরের দেওয়ালে সেই মূর্তিকে দেখেছিলাম একবার। সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা হিমপ্রবাহ বয়ে গিয়েছিল। স্থির ভীতার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম তার দিকে।

মনে হল কষ্টিপাথরে গড়া মূর্তির মত মানুষটার মুখে একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা যেন বাটালিতে কাটা রেখার মত ফুটে উঠেছে। তার সঙ্গে প্রচণ্ড ক্রোধ। মুখখানা তার যেন ভয়ঙ্করতর হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠেছিলাম।

চেতনা হয়েছিল মল্লিক এবং রামের ডাকে। তারা ডাকছিল—বাবু! বাবু! বাবু!

ঘুম ভেঙে উঠে লজ্জিত হয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম ওই গাছের ছায়াকে ছায়ামূর্তি মনে করে, সাঁওতাল হাঙ্গামার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ফলে স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে সিধু এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল।

বাকী রাতটা আর ঘুম হয় নি।

পরদিন সারা দিনটা থাকতে হয়েছিল ওখানে। মল্লিক বাসে সাহেবগঞ্জ গিয়ে নতুন

ওয়াটার পাম্প কিনে এনে ফিট্ করতে করতে রাত্রি প্রায় এক প্রহর হয়ে গিয়েছিল। গোটা দিনটা আমি ঘুরেছিলাম ওই বনের মধ্যে। ঘুরেছিলাম বললে ভুল হবে, বনে ঢুকে সেই দেবস্থানটি আবিষ্কার করে সেখানেই কাটিয়ে এসেছিলাম। মনোরম স্থান। একটি প্রশস্ত পাথরের চত্বরের মত স্থান—প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু, চারিপাশে বড় বড় শালগাছ; পাথরের চত্বরটির একপাশ দিয়ে বেয়ে যাচ্ছে একটি ঝরনা। বেয়ে যাচ্ছে না, ধাপে ধাপে জলপ্রপাতের মত ঝরে পড়ছে, ঝরঝর শব্দ উঠছে অবিরাম। চত্বরটির পিছনে আর একটা প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু খাড়া পাথর দেওয়ালের মত খাড়া হয়ে আছে। সেই দেওয়ালের গায়ে একটি গুহা।

মা বোঙ্গার ঠাঁই। অর্থাৎ মা দেবতার স্থান। বুঝেছিলাম দুর্গাপূজার স্থান। আজও বিজয়া দশমীতে এবং একাদশীতে সাঁওতালেরা দলে দলে এসে প্রণাম করে যায়।

সেদিন সন্ধ্যার পরও অনেকটা রাত্রি পর্যন্ত ওখানে বসেছিলাম। যে মাঝারি একটি গাছের ছায়া বড় একটি শালগাছের গায়ে কালো মানুষের মত নিত্য ছায়া ফেলে, সেটিকেও আবিষ্কার করেছিলাম। তার গায়ে অর্থাৎ ছায়াপড়া শালগাছটার গায়ে হাত রেখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম চুপ করে। সিধু বলে আর ভ্রম হয়নি। সেদিন কিন্তু সাঁওতাল হাঙ্গামার কথাগুলি আবার যেন নতুন করে মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। এবং ছায়া জেনেও, স্বপ্ন জেনেও সেই কষ্টিপাথরে গড়া মূর্তি—সে সিধু হোক বা না হোক—তাকে ভুলতে পারি নি।

তাই বা কেন? দ্বিতীয় দিন রাত্রে অনেকক্ষণ মা বোঙ্গার চত্বরে কাটিয়ে বাংলোয় ফিরে এসে ওই জানলায় দাঁড়িয়ে আবার দেখেছিলাম ওই ছায়ার মধ্যে এক কায়াকে। কালো কষ্টিপাথরে গড়া এক কায়াকে ঠিক তেমনি করে দুই হাত ভেঁজে জড়িয়ে চওড়া বুকখানার উপর রেখে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছিল। সেদিন বাতাস বয়-নি, পত্রবিরল শালকাণ্ডগুলি বাতাসে নড়ে নি। গাছের ছায়া গাছের গায়ে স্থির হয়েই দাঁড়িয়েছিল।

ফিরেছিলাম পরদিন। চোখ বুজে ওই কথা ভাবতে ভাবতে ফিরছিলাম। সিধু কান্থর কথা। সাঁওতাল হাঙ্গামার কথা।

'সংবাদ প্রভাকরে'র একটা কথা মনে পড়েছিল—"সাঁওতাল জাতিরা যত্তপি অত্যাচারী সাহেবদিগের অত্যাচারের প্রতিফল দিয়া ক্ষান্ত হইত তবে ক্ষতি ছিল না। কারণ যাহারা বলপূর্বক স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ করে তাহাদিগের প্রাণবধ করিলেও ক্রোধানল শীতল হয় না।"

সেই ক্রুদ্ধ যন্ত্রণাকাতর মুখ—সে সিধুর কি না তা জানি না—তবে তার স্মৃতি আবার মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল।

'সংবাদ প্রভাকরে'র ওই ৫৩০০ সংখ্যাতে আর একটা সংবাদ আছে।

"জিলা ভাগলপুরের অন্তঃপাতি পর্বতসকলে সাঁওতাল নামে অগণ্য বন্য জাতি বাস করে। অতি অল্প দিবস হইল রাতাবন্দির সাহেবেরা রাজমহলের নিকট ঐ বন্য জাতির তিনজন

স্ত্রীলোককে বলপূর্বক অপহরণ করাতে তাহারা কতকগুলি লোক একত্র হইয়া উক্ত সাহেবদিগের প্রতি আক্রমণ করতঃ তিনজন সাহেবকে হত্যা করিয়া স্ত্রীগণকে উদ্ধার করে। অন্যান্য সাহেবরা ভয়ে পালায়।"

"এমত জনশ্রুতি যে ঐ সাঁওতালদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি···বুজরুক হইয়া (তিতুমীরের মত) আপন শিষ্যদিগের প্রতি আদেশ করে যে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে আমাদিগের রাজ্য হইবেক। অতএব তোমরা সাহসপূর্বক অস্ত্রধারণ করিয়া ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।"

আবার আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠল সিধু বা কানুর সেই নিষ্ঠুর ক্রোধরেখাঙ্কিত মুখ। চোখ দুটো রাঙা টকটকে—বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সম্মুখের দিকে।

হঠাৎ মনে হল—তাহলে কি—?

তাহলে কি ওই তিনজন সাঁওতাল যুবতীদের মধ্যে কেউ সিধুর বা কানুর আপন জন ছিল? বোন? স্ত্রী? কন্যা? প্রিয়া? যার জন্য এই ভারতবর্ষ বিজয়ী শ্বেতদ্বীপের শ্বেতাঙ্গ—যাদের সেকালে সারা দেশের লোক দেবতা বলে ধরে নিয়েছিল, যাদের বন্দুক, কামান পলাশীর আমবাগান থেকে দিল্লী পর্যন্ত সমস্ত পাথরের কেল্লা উড়িয়ে দিয়ে "রুল ব্রিটেনিয়া রুল দি ওয়েভস" গান গেয়ে সেকালে নিরন্তর মার্চ করে চলেছে, হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত রেল লাইন পেতে স্টীম ইঞ্জিন চালিয়েছে, যেখান থেকে বনপাশ গুস্করা ভেদে পার হয়ে বোলপুর আমদপুর সাঁইতে হয়ে পাহাড় সমান মাটি কেটে জলা নীচু জমিতে বাঁধের পথ তৈরী করে এগিয়ে আসছে, অজয় কোপাই ময়ূরাক্ষী বাঁশলই ব্রাহ্মণী নদীগুলোকে সাঁকোয় বেঁধে এখন তিন-পাহাড়ের পাহাড় কেটে চলেছে—তাদের বিরুদ্ধে তীরধনুক, টাঙি, সড়কি নিয়ে এরা রুখে দাঁড়াল কেন? কিসের জোরে? কোন্ আগুনের জ্বালায়?

আমার ছেলেবয়সে শুনেছিলাম, বলতেন আমার পিসীমা—ওরে বাবা বুকের ভেতর হীরের খনি আছে যম সেই খনি খুড়ে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যায় মানিক রতন। বুক হয়ে যায় 'খাঙার' (অর্থাৎ শূন্য গহ্বর)। তাতেই লাগে আগুন—সে আগুনের জ্বালা সয় না রে সয় না। যম নিজে নিয়ে গেলে উপায় থাকে না, নিরুপায়ে গলায় দড়ি দেয় বিষ খায় জলে ডুবে মরে। ছোটে যমের পিছনে। শোধ নিতে ছোটে। কিন্তু—। বিচিত্র হাসি হাসতেন তিনি। তাঁর বুকে মানিকের ভাণ্ডার খুঁড়ে গহ্বর করে, যম চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কলেরা রোগে স্বামী এবং পুত্র দুজনকে কেড়ে নিয়েছিলেন। পিসীমা মরতে চেষ্টা করেও মরতে পারেন নি, পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীপুত্র হারিয়ে একমাত্র ভাই বড়দাদার বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন।—সে আমাদের কুলীনদের বোন, আমার বাবা বলতেন—বোন ব্রাহ্মণের উপবীতের চেয়ে বড়, উপবীত থাকে গলায়, বোনের স্থান মাথায়।—তেমনি করেই রেখেছিলেন তিনি তাঁকে। এবং আমার মায়ের কোলে আমি আসতেই আমার মা আমাকে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর কোলে। আমাকে পেয়ে অগ্নিগর্ভ গহ্বরের মত তাঁর বুকে আবার বেরিয়েছিল স্নেহের ঝরনা। তার জলে বুকের গহ্বরের আগুন নিভে এসেছিল। তবু কখনও কখনও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠতেন, মাথা গরম হত; তখনই ওই কথা বলতেন। সারা জীবনটাই

তিনি যেন নিজের বুকের আগুনে নিজে জ্বলে দীর্ঘ জীবনের অবসান করে গেছেন।

কথাটা মনে থাকত না আমার, ভুলে যেতাম। কিন্তু তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর বয়সে প্রথম সন্তানশোক যেদিন পেলাম, সেই দিন প্রসঙ্গক্রমে আমাকে ওই কথাটা বলেছিলেন—সেদিন থেকে কথাটা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে আমার কাছে।

সিধু বা কানু যেই হোক—যাকে আমি ওদের ওই দেবস্থলে দেখেছি, দেখেছি, যার বুকের ওপর হাত, চোখ রাঙা, মুখের রেখায় রেখায় প্রচণ্ড ক্রোধের বহ্নিদাহের চিহ্ন, তারও যে বুকের গহ্বর শূন্য করে ওই সাহেবান ঠিকাদারেরা ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং শূন্য গহ্বরে আগুন জ্বলেছিল তাতে আমার সন্দেহ নেই।

আমি তার ছবিটা ভুলতে পারলাম না।

সিধু কানুর কথা খুঁজতে আমি সংকল্প করে বের হয়েছিলাম। শুরু করেছিলাম ময়ূরাক্ষীর উত্তর দিক থেকে। ওদিকে দুমকা এদিকে পাকুড় সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত খুঁজলাম। পেলাম না বিশেষ কিছু। সর্বত্রই এক কথা। সাঁওতালেরা ঘর জ্বালিয়ে গ্রাম লুঠেছে—মানুষদের কেটেছে। বড় বড় গ্রাম, বড় বড় রাজবাড়ি লুঠেছে। হিন্দু মহাজনদের কেটেছে। কালীমূর্তি স্থাপন করে তার সম্মুখে নরবলি দিয়েছে—এইমাত্র। সিধু কানুর আর কোন পরিচয় পাই নি।

গ্রামের পর গ্রামে যাই, প্রবীণ লোকেদের খোঁজ করে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু সর্বত্রই ওই এক কথা। এর বেশী কিছু না। তবে বলেন—কুলকুড়িতে যান; ওখানে কিছু খবর পাবেন।—কুলকুড়িতে গেলাম। সেখানে শুনলাম—সে শুনেছি, ব্যাটারা এসেছিল, কাটাকুটো করেছিল—তা সাহেবরা তখন পল্টন নিয়ে এসেছে মামুদবাজারে, সেখান থেকে কুক্ মেরে পালিয়েছিল। আপনি আবদারপুরে যান। প্রবীণ লোক আছে ধ্বজু মল্লিক—তিনি বলতে পারবেন।

পঁচাশী বছরের বৃদ্ধ ধ্বজু মল্লিক—একালে দুর্লভ সত্যবাদী ব্রাহ্মণ—তিনি বললেন—দেখুন বাবা অনেককালের কথা—আমরা জন্মাই নি। আমার পিতামহ তখন ছিলেন। বাবা বালক। ওরা আসবার আগেই আমরা পালিয়েছিলাম হরবোরা। এখানে ডাঙার ওপর তারা রান্না করে খেয়েছিল। এখানে ঘরদোরে আগুন লাগায় নি। মেয়েছেলের ওপর অত্যাচার শুনি নি। তবে সব লুঠেপুটে নিয়েছিল। আপনি—আপনি হিরণপুরের হাটের ওদিকে রামচন্দ্রপুর যান। সেখানে বৃদ্ধ হরিশ ভটচাজ আছেন—তাঁর জ্যেষ্ঠ পিতামহকে সাঁওতালরা নিয়ে গিয়েছিল জোর করে দুর্গাপূজা করাবার জন্যে। তাঁর নাম ছিল ত্রিভুবন ভটচাজ। তাঁর বংশ নেই। তাঁর ভাইয়ের নাতি হরিশ ভটচাজ—তাঁর কাছে খবর পাবেন। ওঁদের এক শিষ্য আছে—জাতিতে কুম্ভকার—তাকেও নিয়ে গিয়েছিল প্রতিমা গড়বার জন্যে। তাদের বংশ আছে—তাদের কাছে গেলেও খবর পাবেন হয়তো।

রামচন্দ্রপুরে হরিশ ভটচাজকে পাই নি। তিনি দেহ রেখেছেন কিছুদিন আগে। তাঁর

ছেলে দুজন—তাঁরা বাপের মৃত্যুর আগেই গত হয়েছেন। আছেন নাতিরা। নাতিরা আধুনিক। তাঁদের বড় নাতি এখনও বংশগত পেশা বজায় রেখেছেন; শিষ্যসেবক আছেন। নাম হরি ভটচাজ। তিনিই আমাকে সন্ধান দিলেন নয়ন পালের।

বললেন—যান চরণপুরে। সেখানে প্রতিমা কারিগর নয়ন পাল আছে; প্রায় নব্বুইয়ের কাছাকাছি বয়স। তার বাপ হাঙ্গামার সময় জোয়ান মানুষ ছিল, তার ঠাকুরদা ছিল নামী কারিগর। আমার বৃদ্ধ পিতামহের বড়ভাই ত্রিভুবন ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর গুরু। নয়ন পালের এই ঠাকুবাবা গড়েছিল সাঁওতালদের প্রতিমে আর গুরু ত্রিভুবন ভটচাজ করেছিলেন পুজো। নয়ন পাল আপনাকে খবর বলতে পারবে। আমি জানি তাদের বাড়িতে পট আঁকা আছে সাঁওতাল হাঙ্গামার। আগে গান গেয়ে পট দেখাতো। বলবেন আমার নাম করে। সে বলবে।

সেই নয়ন পালের বাড়িতে এসে কথা হচ্ছিল।

পাল প্রায় নব্বুই বছর বয়সেও বেশ সক্ষম রয়েছে। শক্ত কাঠামোর সোজা মানুষ; দাঁত প্রায় সব কটিই আছে; মাথার চুল পাকলেও এখনও তেল পড়লে কালো রঙের একটি আভাস ফুটে ওঠে।

খাপরার চাল মাটির দেওয়াল বাড়ি। ঘরখানা আগে একতলা ছিল, এখন কোঠা অর্থাৎ দোতলা করা হয়েছে। দেওয়ালের জোড় দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়।

আমাকে টুলের উপর বসিয়ে পাল আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—সিধু কানুর কথা শুনবেন?

বললাম—হ্যাঁ।

—কি করবেন?

—আমি বই লিখি—তাদের কথা লিখব।

—ব্রাহ্মণ আপনি?

—হ্যাঁ, তা বটি।

পায়ের সন্ধানে হাত বাড়িয়ে পাল বললে—পেনাম বাবা। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে—কি লিকবেন—এই অসভ্য কালো অসুরের মত সাঁওতালেরা কত মানুষ কেটেছিল? কত ঘর পুড়িয়েছিল? হায় হায় বাবা, তাই লোকে বলে। সিধু কানুর কপাল! ভৈরবের কপাল!

—না। তা হলে আপনার কাছে আসব কেন? রামচন্দ্রপুরের হরি ভটচাজ বললেন তাঁরা আপনাদের গুরুবংশ; তাঁর প্রপিতামহকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুজো করতে আর আপনার ঠাকুরদাকে নিয়ে গিয়েছিল প্রতিমা গড়তে। আপনার বাবা সাঁওতাল হাঙ্গামার পট এঁকে গিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাল বললে—হ্যাঁ, পট আঁকা আছে। আট-আটখানা পট বাবা। তা প্রায় বয়স হল পঁচানব্বুই একশো বছরের। আমার এক জেঠা ছিল—সে বাবা সিধু কানুর সঙ্গে এই রঙ্গে মেতেছিল। বুঝেছেন। সিউড়ী আদালতে

বিচার হয়ে তার জেহেল হয়েছিল সাত বছর্। নফর পাল নাম ছিল।

—পটগুলি আমাকে দেখাবেন ?

—দেখাব বইকি বাবা। গুরুবাড়ির আজ্ঞে নিয়ে এসেছেন। ,নিশ্চয় দেখাব। বাবা, যতন করে তোলাই আছে। ও কাউকে দেখাই না! বাবা, সে তো সোজা দব্য লয়। মনে করুন—বংশের কলঙ্ক আছে, আমাদের হিন্দু মহাজন জোতদারদের পাপের কথা আছে, সাহেবলোকের অত্যাচারের কথা আছে। দেখাতে নিজের লজ্জা হত। আবার আমাদের হিঁদু ভাইরা রাগ করত। সাহেবদের কালে তো বার করবার জো ছিল না। শুনতাম পট কেড়ে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেবে, ঘরদোর তছনছ করবে, কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে। তা সায়েবরা গিয়েছে, হিঁদু ভাইরা আছে, নিজেদের কলঙ্ককথা আছে—তুলে রেখেছি মাচানে। গুরু আজ্ঞে নিয়ে এসেছেন—আপুনি বই নেকেন। দেখাব বইকি। তা নিকেন —কবিকঙ্কণ ঠাকুর চণ্ডীতে কালকেতু ব্যাধের কথা যেমন করে নিকেচেন, মহিমে পেচার করেচেন, তেমনি করে নিকবেন। ভটচাজ মশায় বলেছিলেন আমার ঠাকুবাবাকে—ওরে সোজন (সুজন) এরা দু ভাই আর কেউ লয় রে—এদের একজনা হল কালকেতু ব্যাধ, বুঝলি, আর একজনা হল দক্ষযজ্ঞের বিরূপাক্ষ! বুঝলি! এরা এসেছে এই সব পাপতাপ অধম্মের শোধ নিতে রে। মা পাঠিয়েছেন আর মায়ের সঙ্গিনী জয়া বিজয়ার একজনা কেউ বটে ওই পাগলী বামনী বেটী—সিধু কানুর মাঠেকুরেন ক্ষ্যাপা মা।

বিরূপাক্ষ কালকেতু বুঝেছিলাম, কিন্তু মাঠেকুরেন, ক্ষ্যাপা মা বুঝলাম না। পাগলী বামনী বেটী! সে কে?

প্রশ্ন করলাম—তিনি কে? ওই মাঠেকুরেন ক্ষ্যাপা মা!

নয়ন পাল বললে—বাবা, তা হলে পট দেখুন আর গান শুনুন—সবই বুঝবেন। এমন করে আলতো আলতো করে বললে তো বুঝতে পারবেন না, রসও পাবেন না। লোকে বলে সায়েবরা নাকি নিকে গিয়েছে এসব কথা। তা আসল কথা তো তারা জানে না। আসল কথা হচ্ছে বাবা 'লীলা'। ভগমানের লীলা। ভগমান কখুনও কালা, কখুনও কৃষ্ণ। বুয়েচেন। যখন পাপ বাড়ে, পাপীর দাপ বাড়ে—ধম্ম যায়—মানুষের ঘরে জীবনে অধম্মের একাকার হয়, তখন মা কখুনও নিজে আসেন, কখুনও তাঁর ওই কালকেতু বিরূপাক্ষকে পাঠান।

কথারম্ভ

ভুবন পালিনী যিনি ভিখারী-ঘরণী তিনি
মহিষমর্দিনী জগমাতা—
অবধান অবধান—শোন তার কথা।
এ সংসারে হৈলে পাপ মাটিতে উঠিলে তাপ
তরবারি খাপ মধ্যে ফোঁসে—
আসন টলিয়া উঠে মুকুট নড়িয়া ওঠে
চোখে বুকে ফোটে রক্ত রোষে !
জয়া দেখে পেতে খড়ি কোথা কোন অত্যাচারী
পাপে ধরা ভারি করি নাচে—
মনে পড়ে চণ্ডিকার প্রতিজ্ঞা যে আপনার—
হরিতে ভুভার কথা আছে।

মোটা ভাঙা গলায় এই ক' লাইন গেয়ে নয়ন পাল পট খুলে ধরলে।

বললে—সে কাল বাবু মহাশয়—একশত দশ বছর আগে, তখনও সিপাহী হাঙ্গামা হয় নি। দেশ কাল তখন অন্য রকম ছিল। ছোট ছোট গেরাম; কোম্পানির আমল; তখন সন্থ দেশে পাহাড়তলির বন কেটে চাষ আবাদ করছে সাঁওতালেরা।—ছোট ছোট গাঁ গড়ছে। এ সব এলাকাকে বলত 'জঙ্গি', মানে জব্দ করা জমি, আর বলত ডামিন।

এ গ্রামটি দেখছেন—এর নাম 'পাঁচকাটিয়া'-'বায়াহেট'।

এটি হলগ্রামের বাজার। তখনকার আমলের বেশ বড় বাজার, আর এই যে দেখছেন লোকটা ঠেটি কাপড় আর ফতুয়া গায়ে খালি পায়ে একটা মোড়ায় বসে সুলফা খাচ্ছে এর নাম 'কেনারাম ভকত'। এর পাশে বসে কোট পাতলুন পরা টুপি মাথায় এখানকার দারোগা—মহেশ দারোগা। জবরদস্ত দারোগা। দু হাতে ঘুষ খেতো। সব চেয়ে বেশী ঘুষ দিতো কেনারাম ভকত। তার সঙ্গে দারোগার আর সুখের সীমা ছিল না।

এই যে আশেপাশে দেখছেন সাঁওতালরা কাজ করছে—জনকতক উপু হয়ে হাতজোড় করে বসে আছে, এরা সব হল কেনারামের দাদন দেনার মুনিষ।

বাবু, দাদন দেনার মুনিষ হল কেনা মুনিষ। দশ টাকা ধার নিলে একটা মুনিষ জনমকার মত বিকিয়ে যেত; টাকায় মাসে ছ' আনা সুদ, মাসান্তে দশ টাকার তিন টাকা বারো আনা সুদ, সে সুদ আসলে ভুক্তান হয়ে তের টাকা বারো আনা। পরের মাসে কুড়ি টাকার কাছ বরাবর পৌছুত। ফেরা মাসে কুড়ি টাকা হত সাতাশ টাকা চার আনা। এই শোধ দিতে সাঁওতালরা মহাজনের বাড়ি খাটতো। পেটভাতা। মজুরি নগদা নাই। তার মানে আজীবন টাকা শোধ হত না; মরলেও না; তার ছেলেপিলেদের শোধ দিতে হত। পালাবার জো ছিল না; তখন জঙ্গিপুরে 'মুনসুবি' (মুনসেফী) আদালত, সেখানে নালিশ ডিগ্রি করে, পরওয়ানা এনে গ্রেপ্তার করে জেল খাটাতো। মহেশ দারোগা তার কনেস্টবল নিয়ে এসে

বেঁধে নিয়ে যেত। কেনারাম দশটা টাকা তাকে নজরানা দিয়ে সেলাম করত। ভকত নিজে মাংস মাছ খেতো না, মদ খেতো না—বলতো সীয়ারাম সীয়ারাম। কিন্তু দারোগার জন্তে খাসী কেটে ভুনি খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াতো, মদের বোতল নামিয়ে দিত আর বলত—আরাম করেন দারোগাবাবু।

আর তার সঙ্গে দিয়ে যেত সেবাদাসী ; দারোগাবাবুর গা-হাত পা টিপে দেবে।

তার বাগিচাবাড়িতে আরামখানা ছিল পুকুরের পাড়ে, সেখানে আগে থেকে এনে মজুত করে রাখত ; তাদের কেউ ডাকতেই ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়াত ; কেনারাম হুকুম দিয়ে চলে যেত—দারোগাবাবুর হাত পাঁও পিঠ দাবিয়ে দে—আচ্ছা করকে ডলাই মলাই কর। হাঁ!

কাউকে ঘাড়ে ধরে এনে ফেলে দিয়ে কড়া সুরে চড়া করে বলত—আরে শালী কানিস কেনো ? পাঁও টেপ।

তারপর দারোগাবাবুর হাত।

এ সব মেয়ে মাহাতো থেকে হাড়ী বাগদী বাউড়ীদের ঘর থেকে আনত। টাকা পয়সা দিয়ে আনত ; কখনও জোর করে আনত। বলতে কেউ কিছু সাহস করত না। কেনারাম ভকতের বাড়িতে বরকন্দাজ আছে, লাঠিয়াল আছে ; তার গদি আছে—বড় ব্যবসা—সবার টিকি তার কাছে বাঁধা। কিন্তু সাঁওতালদের মেয়ের গায়ে হাত বাড়াত না। ওখানে ভয় করত।

কেনারাম এক নয়— প্রতি গাঁয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে রয়—
জুড়ে সারা দেশময় এই এক হাল—
বামুন কায়েত বন্তি ধনে মানে যার বৃদ্ধি
সব এককাল।

গাঁয়ে গাঁয়ে তখন এক হাল। বামুন কায়েত বন্তি প্রায় সবারই রক্ষিতা থাকে ; সবারই ঘরে দু-চারজন সাঁওতাল কেনা মুনিষ থাকে। জমিদার রাজা সবারই প্রায় এক হাল।

এতেই নাকি বাবু, মা চণ্ডীর টনক নড়ল, আসন টলল, মুকুট পড়ল, মা উঠে দাঁড়ালেন।

জয়া বিজয়া খড়ি পেতে দেখলে, বললে—পিথিমীতে বঙ্গদেশে পাতকের ঢেউ বইছে—দুখী জনের চোখের জলে বান এসেছে—

মা বললেন—আরও গুনে দেখ—

জয়া বিজয়া গুনে দেখল—খড়ির দাগে দাগে অঙ্ক বাড়ল ; তারপর বললে—মা, শ্বেতদ্বীপের সাদা মানুষেরা দত্যির মত দাপাদাপি করছে, পৃথিবীর বুক জুড়ে লোহার বাঁধন বাঁধছে। তাতে পাহাড় কেটে খাল কাটছে—খাল পুরিয়ে পাহাড় তুলছে। মানুষদিগে চাবুক মারছে। কুঠি করছে—সেখানে তারা গরীবের জাত মান গতর সব কিছু বরবাদ করছে—তাই তারা কাঁদছে।

মা হেসে বললেন—তার ব্যবস্থা করেছি, তোরা অভয় পাঠা। জানান দে—রামচন্দ্রপুরের ত্রিভুবন ভটচাজ ধার্মিক ভক্ত। তাকে জানান দে আমি ব্যবস্থা করেছি; আমার কালকেতু আর বিরূপাক্ষকে মর্ত্যে পাঠিয়েছি। আর পাঠিয়েছি আমার সঙ্গিনী ডাকিনীকে। ব্যবস্থা হবে হবে হবে।'

মা অট্টহাসি হাসলেন।

ঝড় উঠল সে হাসিতে। পৃথিবীর এই অঞ্চলে বনে বনে ঝড় উঠল। পশ্চিম আকাশে উঠল কালো মেঘ, বিদ্যুৎ চমকালো বাজ পড়ল—তিনপাহাড়ের রেলরাস্তা বন্দির সাহেবরা খানাপিনা করে তাঁবুর ভিতর মদ খেয়ে হুলাহুলি করছিল—তাদের তাঁবুর কাছে শালগাছের মাথা জলে গেল, সীতাপাহাড়ীর কুঠির পাশে সাহেবের আণ্টা ঘরের মাথার শিকটা বেঁকে গেল—বাড়ি ফাটল। কেনারামের বাগিচাবাড়ির পাশে তালগাছের মাথায় বাজ পড়ল। এরপর এল ঝড়। গোটা অঞ্চলটায় বনের মাথা আছড়ে পড়ল।

বাগনাডিহির সিধু কানু, বিরূপাক্ষ বা কালকেতু কি না সে কথা থাক। কিন্তু ঝড় একটা প্রচণ্ড প্রলয়ের মত হয়েছিল সে সময় ১৮৫৪ সালের বৈশাখ মাসে, এ খবর সত্য।

সেই ঝড়ের মধ্যে লুপলাইনের ঠিকাদার কোম্পানির একজন ছোকরা ইংরেজ কর্মচারী ঘোড়ায় চড়ে চলেছিল তিনপাহাড়ীতে তাদের ক্যাম্পের দিকে। দুপাশে শালবন, মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ—পাহাড়ে পথ। সেই পথ ধরে সে চলেছিল। গিয়েছিল সে শিকারে। পিঠে তার বন্দুক; কোমরে কিরিচ। বুকে চামড়ার বেল্টে লাগানো বারুদ এবং গুলির চামড়ার ব্যাগ, আর জিনের সঙ্গে ঝোলানো একটা থলিতে মদের বোতল এবং খাবার। দেশী রুটি কলা, ঝলসানো মুরগীর ঠ্যাং আর একটা বোতলে জল।

অল্প বয়স, দুরন্ত সাহস, দুর্দান্ত প্রকৃতি; লেখাপড়া জানে না ভাল, তবে মজুর খাটাতে পারে, বেপরোয়া চাবুক লাগাতে পারে, মদ খেতে পারে, আর পারে শিকার করতে; মাস আষ্টেকের মধ্যেই সে এই অঞ্চলে এসে তিনটে চিতাবাঘ মেরেছে, হরিণ মেরেছে দশ বারোটা, ভালুকও মেরেছে চারটে। ভয় করে শুধু সাপকে—আর কিছুকে নয়।

বনের ভিতর আজ সারা দুপুরটা ঘুরেও কিছু পায় নি। খুব বিরক্ত হয়ে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করে খানিকটা নির্জলা মদ খেয়ে সে ভাবছিল কি করবে।

হঠাৎ আকাশে যেন কেউ সীসে গলিয়ে ঢেলে দিলে। বনভূমি নিথর হয়ে উঠল। পাখীগুলো যেন ভয়চকিত স্তব্ধ হয়ে গেল। ডিউই সাহেব আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল প্রশ্নের সুরে—স্টর্ম?

নিজেই তার উত্তর দিয়েছিল—হ্যাঁ—ঝড়। ঝড় আসবে।

তা হলে? চারদিক তাকিয়ে দেখছিল ডিউই; কোথায় আশ্রয় নেবে। ঝড়ের সময় বনের ভিতর নিরাপদ নয়।

বন্দুকের গুলিতে ভেঙে পড়া গাছের ডালকে ঠেকানো যায় না। তা হলে?

পাহাড়ের কোন গুহা গহ্বর পেলে তার মধ্যে ঢোকা যায়, কিন্তু ভাট ডেভিল—সাক্ষাৎ

শয়তান ওই ফণাওলা সাপগুলো।

দাঁতের গোড়ায় থলিতে আছে তরল বিষ, তার মধ্যে আছে মৃত্যুর ঠোঁটের তীব্র লালা। ওয়ান কিস্—।

একটি চুম্বনে সব শেষ। ডিউই দেখেছে সাপে কাটায় মৃত্যু। গুহার মধ্যে কোন পাথরের ফাটল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে হঠাৎ ফণা তুলে গর্জন করে দাঁড়াবে।

মাই গড! না, সে পারবে না।

চিতা কি ভালুক থাকলে ডিউই ভয় করে না। তার সঙ্গীরা তাকে বলে 'ডেভিল ডিউই'। তা সে বটে। কিন্তু ওই ডেভিল—সাপ!

তার চেয়ে বন থেকে বেরিয়ে পড়া ভাল। খোলা মাঠও অনেক নিরাপদ।

সীসের বর্ণ আকাশ যেন একটু কালচে হয়ে এসেছে। দিগন্ত সে দেখতে পাচ্ছে না। নিশ্চয় দিগন্তের আকাশ কয়লার ধোঁয়ার মত কালো হয়ে উঠছে; ফুলছে ফাঁপছে। ঘোড়ার মুখ সে ফিরিয়ে নিল লাগাম টেনে। পেটে পায়ের গুঁতো মেরে শিস দিয়ে ঘোড়াটাকে দ্রুত চলতে ইশারা জানালে।

একটা ব্যর্থ দিন! বিফল দিন! মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। কিছু মেলে নি। এখন একটা মানুষ পেলেও সে তাকে গুলি করে মেরে দিনটাকে সফল করতে পারে।

ঘোড়াটা এই বন্ধুর চড়াই-উতরাইয়ে ভরা বনের মধ্যে একফালি পায়ে চলা পথে যথাসম্ভব দ্রুতপদে চলেছিল। মধ্যে মধ্যে পাথর উঠে আছে—গাছের শিকড় বেরিয়ে আছে; ওদিকে আকাশে একটা কালো ছায়া যেন ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে; বনের ভিতর ঘনপল্লব শালগাছের তলায় অন্ধকারের মত কিছু জমে উঠেছে। ডিউই অধীর হয়ে উঠল। সে চাবুকটা সপাং করে বসিয়ে দিল তার পিঠে!

সঙ্গে সঙ্গে চকমক করে উঠে খেলে গেল একটা আলো। বিদ্যুৎ। চোখ বুজে এল আপনি।

বৈশাখের মেঘের ডাকের একটা কর্কশ কড়কড়ে ডাক আছে। সেই ডাক ডেকে উঠল।

ঘোড়াটা চমকালো কিন্তু ডিউই চমকালো না। ভারী ভাল লাগল তার। মনে হল দূরে কামান দেগেছে কোম্পানির আর্মি—তার গর্জনটা ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে গুমগুম করে দূর থেকে দূরান্তরে চলেছে।

ওয়াণ্ডারফুল!

ঘোড়াটা কিন্তু হুঁচোট খেলে।

ডিউই একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে উঠল ঘোড়াটাকে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সমস্ত বনভূমিকে ঝলসে দিয়ে অতি তীব্র আলো খেলে গেল। মনে হল কালো আকাশটার চামড়া কে যেন একটানে ছাড়িয়ে সাদা ভিতরটা বের করে দিলে। যা নাকি অতি বীভৎস নৃশংস—যাতে ডেভিল ডিউই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল—মাই গড! চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই এক বিপুল গর্জন, কানের পর্দা যেন ফেটে গেল। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা গুলি-

খাওয়া হরিণের মত লাফ দিয়ে উঠেই পড়ে গেল—মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

ডিউইর বুকে কি গুলি বিঁধেছে?

ঘোড়াটা লাফ দিয়ে উঠল। অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে ডিউই—ডেভিল ডিউই ঘোড়াটার গলা জড়িয়ে ধরলে।

যখন তার চেতনা ফিরল তখনও সে ঘোড়াটার গলা জড়িয়ে ধরে আছে। ঘোড়াটা একটা ভেঙে পড়া গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঝড় বইছে প্রচণ্ডবেগে। প্রলয়ের ঝড়ের মত ঝড়। গাছের মাথায় মাথায় বিপুল গর্জন যেন বেয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দের মত।

ডিউই—ডেভিল ডিউই—সে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে প্রকাণ্ড গাছটা হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পার হয়ে লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টানলে, বললে—কাম অন, জাম্প, জাম্প—

কিন্তু ঘোড়াটা নড়ল না। সে পিছন দিকে টানছে। সে পারবে না। এই শাখা-প্রশাখা সমেত প্রকাণ্ড গাছটাকে লাফিয়ে পার হতে। ডিউই একমুহূর্তে অধীর অস্থির হয়ে উঠল।

—ইউ বডমাস—হারামজাড—!

এদেশের গালাগাল ডিউইর ভারি ভাল লাগে। অনেক গালাগাল সে মুখস্থ করেছে। তার মধ্যে অশ্লীল গালাগাল বেশী। আবার টানলে সে। কিন্তু ঘোড়া নড়ল না। ওদিকে ঝড়ের গর্জন বেড়ে উঠল—একটু দূরে কোথাও আর একটা গাছ ভেঙে পড়ল—শব্দ উঠল মড় মড় মড়। তারপর একটা প্রচণ্ড শব্দ।

ডিউই অস্থির অধীর হয়ে উঠেছিল—সে মুহূর্তে কোমর থেকে তার পিস্তলটা বের করে ঘোড়াটার কপাল লক্ষ্য করে গাছটার এপার থেকে ফায়ার করলে। ঝড়ের গর্জনের মধ্যে শব্দটা নগণ্য, তবুও যেটুকু উঠল সেটুকু একটা কঠিন নিষ্ঠুর শব্দ।

ঘোড়াটা একবার চমকে উঠে টলতে লাগল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। ডিউই ফিরে দেখলে না আর—সে সামনে এগিয়ে যেতে লাগল। পিঠে বন্দুক, কোমরে পিস্তল। বুকের বেল্টে ঝোলানো বারুদ গুলির চামড়ার ব্যাগ। কাঁধে ঝোলানো খাবার মদের বোতল, জলের বোতলের থলি।

চলতে লাগল সে সামনে পথ ঠাওর করে করে। বন আর বেশি নেই—ঘন পাতলা হয়ে এসেছে। গাছগুলো এখানকার ছোট ছোট। বড় গাছগুলো এখানে সর্বাগ্রে কাটা হয়ে যায়। কাটা শালগাছের গোড়া থেকে ঝাঁকড়া হয়ে ডালপালা বেরিয়েছে।

ডিউই বন পার হয়ে বেরিয়ে দাঁড়াল। আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, প্রলয়ের সূচনার মত ভয়াল ধূসর অন্ধকার। সমস্ত সম্মুখটা আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত লাল ধুলোয় ভরে গেছে। মোটা মোটা ধারায় বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে।

দেখতে দেখতে মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এল।

সামনেটায় যতটা বোঝা যায়, গ্রাম নেই, সমস্তটাই লালমাটি আর পাথর কাঁকর মেশানো একটা বন্ধ্যা প্রান্তর। শুধু শালগাছের ঝোপ, অর্থাৎ কাটা শালগাছের গোড়া থেকে বের হওয়া ডালপালার ঝোপ।

ছুটতে লাগল ডিউই। সে জানে এই রকম মেঘে সব সময়ে বৃষ্টির সঙ্গে শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে। বজ্রপাত হয়ে থাকলে, সেখানে মাটিতে শুয়ে থাকলে খানিকটা নিরাপদ হওয়া যায়, কিন্তু শিলা-বৃষ্টিতে রক্ষা নেই। অজস্র বুলেটের মত এসে সর্বাঙ্গ ছেঁচে দেবে। মৃত্যু অবধারিত।

বড় কষ্টকর মৃত্যু।

কারুর সঙ্গে লড়াই করে মরা যায়, কিন্তু অসহায়ের মত মরা বড় শোচনীয় মর্মান্তিক। সে দৌড়ুতে লাগল। অন্ধকার ঘন থেকে ঘনতর হয়েছে। পথ ঠিক করা যায় না। সে যাবে তিনপাহাড়ীর কাছে কণ্ট্র্যাক্টারস ক্যাম্পে। কিন্তু কোন দিকে যে সে চলেছে তার ঠিক নেই।

অবিরল বৃষ্টিধারায় সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে এক এক চুমুক হুইস্কী খেয়ে নিয়ে নিজেকে তাজা করে নিতে চেষ্টা করছে। হঠাৎ তার মনে হল সামনে একটা ছোট জঙ্গলের মত। হ্যাঁ একটা ছোট জঙ্গল। এখানে মধ্যে মধ্যে এমন জঙ্গল আছে। তার মধ্যে এদেশের ফকির এবং সন্ন্যাসীরা থাকে। না-হয় সিঁদুরমাখা পাথর থাকে, যাকে এদেশের বর্বরেরা পুজো করে থাকে। এমন জায়গায় আশ্রয় মিলতে পারে।

দ্রুতপায়ে হেঁটে এসে সে জঙ্গলের মুখে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, একটি আলোর শিখা যেন দেখা যাচ্ছে। ডিউই কোমর থেকে তার কিরিচটা খুলে ঢুকে পড়ল জঙ্গলটার মধ্যে। হাতড়ে হাতড়ে কোন রকমে আলো লক্ষ্য করে এসে পেলে পাথরে কাদায় গাঁথা দেওয়াল খাপরাচাল একখানা ঘর। ঘরখানার দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজার জোড়ের মুখ থেকে পাতলা ধারায় আলোর রেশ বেরিয়ে আসছে।

ডিউই হাঁকলে—এই কোন হ্যায় ঘরকা অন্দর? এই!

কেউ সাড়া দিলে না।

ডিউই আবার হাঁকলে—এই দরওয়াজা তোড় দেগা—এই কৌন হ্যায়!

মনে হল আলোটা নড়ল। ডিউই অধীর হয়ে বললে—খুলো খুলো—জলদি খুলো!

বলে মাটির উপর সজোরে লাথি মেরে বিক্রম জানালে।

এবার দরজা খুলে গেল। একটি প্রদীপ একটি হাতের আড়াল দিয়ে বাঁচিয়ে যে ডিউইর সামনে দাঁড়াল, তাকে দেখে ডিউই হতবাক হয়ে গেল। সে এক আশ্চর্য নারীমূর্তি। তার হাতের প্রদীপের আলো তারই মুখের উপর পড়েছে। রুক্ষ এলানো চুল, সে চুল অনেক, একরাশি। টিকালো নাক, বড় বড় চোখ—এদেশের আশ্চর্য সুন্দর, একটু শ্যামলা ফরসা রঙ (তাদের দেশের মেয়ের মত ফ্যাক-ফ্যাকে সাদা নয়), কপালে সিঁদুরের টিপ; মেয়েটি বললে—কে তুমি? কি চাই?

—হামি হুজুর আছে, আংরেজ আংরেজ!

—তা জানি সাহেব। কিন্তু কি চাই তোমার?

—পানিমে ভিজিয়েছি, বহুৎ ডুখ হইছে, হামি টুমার ঘরমে ঠাকবে! বকশিস মিলেগা।

—বেশ সাহেব, তোমাকে থাকবার জায়গা দিচ্ছি। চল।

—কাঁহা? হামি ঐ ঘরে ঠাকবে।

—তা হয় না সাহেব, এ ঘরে আমার ঠাকুর আছে। আর আমি নিজে মেয়েছেলে—আমি কোথা যাব? চল ওদিকে চালা আছে, সেখানে তোমাকে জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি। চল।

আশ্চর্য মেয়ে। ডিউইর বিস্ময়ের সীমা রইল না। মেয়েটা সাহেব দেখে ভয় করে না, সংকোচ করে না, অসংকোচে এমনভাবে কথার জবাব দিয়ে গেল! আশ্চর্য! এদেশের সণ্টাল মেয়েগুলো মাথায় কাপড় ঢাকা দেয় না, সামনাসামনি কথাবার্তা বলে—লজ্জা করে না, হাসে কিন্তু তারা বুনো জাত, অসভ্য জাত, তাদের স্বাস্থ্য আছে, যৌবন আছে—তারা লোভনীয় কিন্তু অত্যন্ত একগুয়ে। কিন্তু এই সব হিণ্ডু উইমেন তারা ভেরী শাই—মুখে কাপড় ঢাকা দেয়—অত্যন্ত কোমল অত্যন্ত মিষ্ট। তারা কথা বলে না। তারা ভয় পায়। কিন্তু এ মেয়ে আশ্চর্য! ডিউই আন্দাজ করে বুঝেছে এ মেয়ে সন্ন্যাসিনী—একলা ঘোরে। তারা হিমালয়া পর্যন্ত যায়। দূর থেকে সে দেখেছে কিন্তু এমন ভাল করে দেখে নি। আজ কাছ থেকে দেখে কথা বলে সে আশ্চর্য হয়ে গেছে।

মেয়েটি বেরিয়ে এল ঘর থেকে একটা ছোট ঝুড়িতে প্রদীপটা ঢাকা দিয়ে, এবং বললে—এস।

পাশেই একটি খাপরার চালা। সেই চালার একধারে একখানা খেজুরপাতার চ্যাটাই পাতা ছিল, সেইটে দেখিয়ে দিয়ে বললে—এইটে পেতে নাও সাহেব, নিয়ে বস কিংবা গড়াও। আর তো কিছু নাই যে আমি দেব।

ডিউই বললে—টুমি কে আছে লেডী?

—আমি সন্ন্যাসিনী ভৈরবী, সাহেব।

—টুমার আর কে আছে?

—কে থাকবে বল? আছেন আমার কালী মা। ওই ঘরে আছেন। নইলে তোমাকে ওই ঘরে ঠাঁই দিয়ে আমি এখানে থাকতাম!

—হুঁ! ঢন্তবাড আছে। লেডী। থ্যাঙ্ক ইউ।

মেয়েটি চলে গেল। ডিউই বসে রইল সেই চ্যাটাইয়ের উপর। তখন ঝড় কমে এলেও বয়ে চলেছে। বৃষ্টি চলছে। প্রান্তরের মধ্যে সেই ফুট চল্লিশেক উঁচু পাথরের স্তূপের চারিপাশে জন্মানো শালগাছের মাথায় শব্দ হচ্ছে একটানা। চারিদিকে পোকার ডাক তার সঙ্গে মিশছে। ডিউই একলা বসে ভাবছিল। ঘন অন্ধকার। তামাক ভিজে গেছে, দেশলাই ভিজেছে। নানান এলোমেলো চিন্তা। ক্যাম্পে আজ মৌজের দিন! ফুর্তি চলছে। মদ খাচ্ছে। খালি গায়ে বেরিয়ে এসে জলে ভিজছে। কিংবা হয়তো নাচছে।

এমন সময় একটি চৌকো কাচের লণ্ঠনে একটি প্রদীপ নিয়ে আবার সেই সন্ন্যাসিনী বেরিয়ে

এল। আলোটি নামিয়ে দিয়ে বললে—এটা তোমার কাছে রাখ সাহেব। অন্ধকারে ভূতের মত বসে থাকতে বড় কষ্ট হবে। আর এই দেখ, কিছু খাবার আছে, তুমি খাও—মেয়েটি নামিয়ে দিলে দুটো আম আর গুড়ের মেঠাই।

ডিউইর কানে কিছু যাচ্ছিল না। সে সেই লণ্ঠনের আলোতে সেই মেয়েটির মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। আশ্চর্য লাগছে।

সে আবার বললে—টুমি কে আছে?

—আমি? বলেছি তো সাহেব আমি ভৈরবী, সন্ন্যাসিনী। বুঝতে পারলে?

—হাঁ হাঁ বুঝে। ইখানে টুমি একলা ঠাকো? অ্যালোন?

—হাঁ। আমার ভৈরব মরে গিয়েছে। এখন মা কালীর পায়ের তলায় একলা পড়ে থাকি।

—টুমাকে হামি বহুট রূপেয়া ডিবে।

—না। সাহেব টাকা নিয়ে আমি কি করব? টাকা থাকলেই তো চোর ডাকাতে এসে লুঠে নেবে। এখানে আশপাশের গাঁয়ের লোক যা দেয়, তাতেই চলে যায়। নাও, তুমি খাও। এই রইল। এখানেই কষ্ট করে রাতটা কাটিয়ে দাও। কাল সকালে বরং যেয়ো। জল হল ঝড় হল, অন্ধকার রাত—আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, রাত্রে আর বেরিয়ো না।

বলেই সে উঠে চলে গেল।

ততক্ষণে ডিউই ডেভিল ডিউই হয়ে উঠেছে। বুকের ভিতরটায় এতক্ষণ, যতক্ষণ সে কথা-বার্তা বলেছে ততক্ষণ একটা লড়াইয়ের মত চলেছে। মেয়েটির সপ্রতিভতা তার আতিথেয়তা যেন মুখ বাড়ানো শয়তানকে বলেছে—নো নো, ইউ মাস্ট নট ডু ইট। শয়তান তাকে দাঁত ভেঙিয়েছে কিন্তু ঝাঁপ দিয়ে বের হতে পারে নি। মেয়েটি পিছন ফিরতেই সেই স্বল্প আলোকের মধ্যে ডিউই—ডেভিল ডিউই তার কালো চুলের রাশি এবং তার গতিশীল পরিপূর্ণ যৌবন দেহখানির দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দিগ্ধ নিঃশঙ্ক মন্থরগামিনী হরিণীর উপর সুযোগ-সন্ধানী বাঘের মতই মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল।

মুহূর্ত দেরি করবার অবকাশ নেই, হয়তো মিনিটখানেকের মধ্যেই মেয়েটি ঘরে গিয়ে ঢুকবে, দরজা বন্ধ করবে; ঘরে ঢুকলে আর এ সুযোগ ফিরবে না।

শী মে ফাইট, যুদ্ধ দিতে পারে। পারে নয়, দেবেই। তার ঘরে নিশ্চয় ওয়েপন আছে ডিউই জানে এদের হাতে লোহার ডাণ্ডার মাথায় তিনটে ফলা দেওয়া একটা অস্ত্র থাকে, দে অলওয়েজ ক্যারি ইট; তাছাড়া সে কালী মা দেখেছে—কালো নেকেড গডেস, চার হাত, হাতে একটা 'দাও' থাকে, সেটা 'টয় দাও' হলেও এই ব্ল্যাক নেকেড গডেসের সামনে 'গোট সাক্রিফাইস' দেয় এরা। তার জন্য একটা সত্যকারের 'দাও' থাকে। এরা 'খাণ্ডা' বলে। সে দেখেছে। সেটা হাতে নিলেও বিপদ। সে বন্দুক দাগতে পারে। কিন্তু তাতে কি লাভ। ডেড বডি নিয়ে সে কি করবে?

গেল, ভৈরবী ঘরে বুঝি ঢুকে গেল। অ্যানাদার হাফ এ মিনিট। ডেভিল ডিউই তোমার চান্স গেল! ইউ টাইগার জাম্প জাম্প—।

ডেভিল ডিউই নিজের কামার্ততা এবং পশুত্বের তাড়নায় নিজের অজ্ঞাতসারে একটা গর্জন

করে উঠল।

আ—বলে একটা শব্দ। শব্দটার কাজ হল। মেয়েটি চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—কি হল সাহেব? কি হল? সাপটাপ—

সে ভাবলে সাহেব বুঝি ভয় পেয়েছে কিছু দেখে। তখন ডেভিল ডিউই দাঁড়িয়েছে এবং তার কথা শেষ হতে হতে সে চালাটার উপর থেকে ঝাঁপ দিলে সেই সমতল-করা পাথরের উঠোনে। এবং এক লাফেই তার কাছে এসে পড়ে তার কাপড় ধরে হ্যাঁচকা টান দিলে নিজের কোলের দিকে।

মেয়েটি এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে সেই হ্যাঁচকা টানে কাত হয়ে আছাড় খেয়েই পড়ে গেল। শুধু তীব্র ক্রুদ্ধ কণ্ঠে একটা চিৎকার করে উঠল—সা—য়ে—ব!

ডেভিল ডিউই তখন হরিণীর পিঠে ঝাঁপ দেওয়া চিতাবাঘের মত তার বুকে চেপে বসে তার মুখে তার হাতের থাবা চাপা দিয়ে বলে উঠল——চিল্লাও মাৎ, চিল্লাও মাৎ!—তারপর হেসে উঠল।

এরপর খানিকক্ষণ একটা ধস্তাধস্তি। আঁচড়ে কামড়ে মেয়েটা তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। ডেভিল ডিউইর কামার্ততা তাতে যেন শতগুণে বেড়ে গেল। সেও তাকে আঘাত করলে, ঘুষি মারলে! মুখে কপালে।

বাঘের সঙ্গে হরিণী কতক্ষণ লড়বে? হতচেতন হয়ে গেল হরিণী। বাঘ এবার তাকে মুখে ধরে হেঁচড় দিয়ে তুললে সেই চালায়।

লণ্ঠনটা জ্বলছিল একধারে। ডিউই সেটাকে লাথি মেরে ফেলে দিলে—লণ্ঠনটা উলটে পড়ল পাথরের উঠোনে। দপ করে উঠে ভিতরের প্রদীপটা নিভে গেল।

নিবিড় অন্ধকার ভরে গেল ঠাঁইটা। শুধু ঘরের খোলা দরজাটা দিয়ে ভিতরের প্রদীপের দরিদ্র বিষণ্ণ আলোর ম্লান প্রতিচ্ছবিটা বেরিয়ে এসে দরিদ্র ভিক্ষার্থিনীর মত ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর ডিউই বেরিয়ে এল সেখান থেকে; নেমে এসে প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আন্দাজ করে উত্তর-পশ্চিম মুখে চলতে লাগল।

বোতলের মদ ফুরিয়ে এসেছে প্রায়।

জলের বোতল থেকে আন্দাজে খানিকটা জল মদের বোতলে ঢেলে তাতেই চুমুক দিতে দিতে সে এগিয়ে চলল—

আকাশে মেঘ তখন কাটছে। বৃষ্টি থেমে এসেছে। বাতাস আছে কিন্তু সে সামান্যই। গরমটা নিঃশেষে কেটে গেছে। শরীর যেন ঠাণ্ডা বাতাসে শিরশির করছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে সে খুঁজলে পোল স্টার কোথায় কোন্ দিকে? কিন্তু না, দেখা যায় না, সে আন্দাজ করেই চলল। কিরিচখানা খুলে হাতে নিলে। তারপর একটা অশ্লীল গান গাইতে গাইতে প্রান্তরের পথ ধরে আন্দাজ করে উত্তর পশ্চিমমুখে চলতে লাগল।

সে খুব খুশী। একটা আশ্চর্য রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চার।

নয়ন পাল পট দেখিয়ে বললে—দেখুন, পরের দিন মা কালীর থানে লোক জমেছে।

পরদিন লোক সব কান্দি করে কলরব—

লণ্ডভণ্ড পণ্ড সব—কালী ভগ্ন—মা ভৈরবী নাই।

নয়ন পাল বললে এই দেখুন বাবু, ওদিকে সেই কালবোশেখীর রাতে আর একটা বাজ পড়েছে বাগানডিহি সাঁওতাল গাঁয়ের 'জহর সর্ণা'য়।

আমি বললাম—সেখানে গিয়েছি, সে ঠাঁইটা দেখেছি। সেইখানেই তো দুর্গাপুজা হয়েছিল?

পাল বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি দেখেছেন—তা হলে বুঝতে পারবেন খুব ভাল করে। এই দেখুন সেই 'জহর সর্ণা'। সাঁওতালরা দেবতাকে বলে 'বোঙ্গা'। আর দেবতা যেখানে থাকেন, সেই ঠাঁইকে বলে জহর সর্ণা। সেখানে একটা বড় শালগাছ ছিল। ঠিক একেবারে পাহাড়ের যে দেওয়ালটা আছে তার মাথায়। সেই গাছটায় বাজ পড়েছে। গাছটা ঝলসে গিয়েছে। এখানেও লোকজনেরা ছুটে এসে ভিড় করেছে।

(ওদিকে) বাগানডিহির ধারে জহর সর্ণার পরে

উচ্চ শালবৃক্ষচুড়ে পড়িয়াছে বাজ—

সাঁওতালে দলে দলে ছুটে এসে কেন্দে বলে

হায় 'বোঙ্গা' একি কৈলে—করিয়াছি কোন্ মন্দ কাজ!

এই তো সেদিন, ১৯৬৫ সনে বর্ষার সময় কালীঘাটের মন্দিরের কলসচূড়ায় বজ্রপাত হয়েছিল; যার জন্য এই বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের আধুনিকতার তীর্থস্থল কলকাতায় পরদিন লোকের ভিড়ের অন্ত ছিল না। কাগজে ছবি বেরিয়েছিল ঊর্ধ্বদৃষ্টি উদ্‌গ্রীব মানুষদের, শুধু উদ্‌গ্রীবই বা কেন, তাদের মুখে চোখে উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। হায় কি হল! কি অপরাধ হল! এবং তার জন্য একটা বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান হয়ে গেছে।

১৮৫৪ সনের বৈশাখ মাসে বাগানডিহির জহর সর্ণার সব থেকে উঁচু শালগাছের মাথায় বাজ পড়েছিল—তাতে সাঁওতালরা হায় হায় করে সেখানে ছুটে এসেছিল স্বাভাবিকভাবে।

পটে সে ছবি ঠিক ফোটে নি। আমি মনে মনে দেখতে পাচ্ছি কি ব্যাকুলতা কি আশঙ্কা কি উৎকণ্ঠা তাদের মুখে চোখে দৃষ্টিতে।

বৃদ্ধ চুনার মাঝি দাঁড়িয়েছিল সকলের সামনে।

বৃদ্ধ চুনার এ গ্রামের সর্দার তো বটেই তা ছাড়া গোটা সাঁওতাল সমাজে সে সম্মানিত লোক। বুড়ো চুনার মাঝির উপাধিই হল 'মুর্মু ঠাকুর'; যার মধ্যে পরিচয় আছে যে সাঁওতালদের যখন নিজেদের রাজত্ব ছিল তখন তাদের বংশের পূর্বপুরুষ ছিলেন 'রাজা'। আজ তারা 'পুড়খানা জেটে' অর্থাৎ সাদা চামড়া ওই এংরেজদের অধীন হলেও তাদের সেকালের গৌরব তারা আজও ভোলে নি। দশ বিশখানা গ্রামের সাঁওতালরা তার কাছে আসে পরামর্শ শলার জন্য। এই জহর সর্ণার পাশে ওই যে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট পাথর আছে ওই পাথরটির ঠিক মাঝখানটি চুনার মাঝির জন্য নির্দিষ্ট। তার দু দিকে ডান বাঁ পাশে

আধগোল হয়ে বসে অন্যান্য মুর্মু উপাধিধারী সর্দাররা, তারপর অন্যান্য সর্দার মাঝিরা। বিবাদে বিসংবাদে বিচারের শেষ কথা বলে চুনার মুর্মু ঠাকুর।

সে হাঁটুর উপর হাত দুখানা রেখে একটু ঝুঁকে তাকিয়ে আছে সামনে খাড়া পাথরটার দিকে, যেটার উপরে আছে ওই, বজ্রাহত শালগাছটা। বিস্ফারিত দৃষ্টি তার। দুই পাশে তার চার ছেলে।

চাঁদ ভৈরব সিধু কানহু। চাঁদ ভৈরব প্রৌঢ় হয়েছে। পাকা চুল দু-চারগাছা দেখা যায় কানের পাশে কপালের ঠিক উপরে। সিধু কানহু বয়সে জোয়ান। কানু তৃতীয় ভাই সিধুর চেয়ে বড়, সিধুই ছোট তবে বড় ছোট বোঝাই যায় না—তারা যমজ সন্তানের মত। দেড় বছর দু বছরের ছোট বড়। তবু কানহু সিধু কেউ বলে না। সবাই সিধুর নাম আগে করে ; সিধু কানুর মধ্যে সিধু মাথায় লম্বা—বুকের পাটাও তার চওড়া এবং দুজনেই কষ্টিপাথরের মত কালো হলেও সিধুই যেন উজ্জ্বলতর জোয়ান এবং উজ্জ্বলতর কালো। তার উপর সিধু যেন থমথমে মানুষ ; সে গম্ভীর। গলার আওয়াজে গম্ভীর, চোখের চাউনিতে গম্ভীর ; কথাবার্তাও যেন ভারি ভারি।

সিধু চুপ করে বুকে হাত জড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে কানহু ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছে ওই বাজপড়া গাছটার দিকে।

পিছনে সাঁওতালরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। মেয়েরা শঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে আছে। এক বৃদ্ধা কাঁদছে—পাপ পাপ ; আক্কাই আক্কাই পাপে ভোরে গেল সব। আঃ আঃ—তা যেই বাবা বোঙ্গা চলে গ্যাল, তাই জানান দিলে বাজ ফেলে পুড়ায়ে দিলে গাছঠো। বলে গ্যেল আমি চললাম। আঃ আঃ।

হঠাৎ চুনার মাঝি সোজা হয়ে দাঁড়াল—তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে পাথরের দেওয়ালটায় হাত বুলিয়ে বললে—দেখ।

—কি ?

—ফাট—; পাথর—এতো বড়ো পাথরটোকে ফাঁটায়ে দিছে। গাছের মাথায় পড়ে এই দিকে নেমে গেল !

সত্যই এবার সবার চোখে পড়ল একটা লম্বা ফাট নেমে এসেছে গাছটার গোড়া থেকে এবং গোটা পাথরটা দু আঙুল কোথাও চার আঙুল চওড়া ফাটলে দুখানা হয়ে গেছে।

সিধু বললে—দেখ, ফাটের ভিতরে টিপিং টিপিং করে জল পড়ছে।

চূড়া মাঝির বুড়ী মা কপালে হাত চাপড়ে বলে উঠল—আক্কাই আক্কাই পাপে এই বড় পাথরখানা ফেটে দুঠো হয় গেল !

চুনার মাঝি দেখছিল—হ্যাঁ, ফাটলের ভিতর টিপ টিপ ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছেই বটে। সে বললে—হুঁ। ঝরছে বটেক।

সব মাঝিরাই ঝুঁকে দেখতে লাগল।

সিধু বললে—চূড়া কাকার মা বলছে আক্কাই হল আক্কাই হল। না। আক্কাই হল না। তা হলে জল পড়ত না টিপিং টিপিং করে। দেখবি দু দিন বাদে উথান থেকে পানি ঝরবেক।

ঝরনা বাইরাবে। ই লক্ষণ ভাল বেটে, খারাপ লয়। পাথর ফাটালে বোঝা। পানি দিলে।

চূড়া মাঝির মা একেবারে হাঁ হাঁ করে ঝাঁপিয়ে উঠল—কি ভাল বটে? ই বাজ পড়ল গাছটি উপর ভাল হল? আঁ? আয় বাবা গ আয় মা গ, ইগিধ্রা বুলছে কি? চুনারের ই বিটাটি এমুনি বটে। সব কথাতে কথা বুলবে। দেখবি দেখবি—আঁকাই হল, পাপ হল কি না দেখবি—

সিধু বললে—বুলতে হবে তুকে কি আক্কাই হল আমাদের। রুজ রুজ আমি শুনি তু বুলবি আক্কাই হছে, ই সব আক্কাই হছে—বল তু কি আক্কাই হছে।

—কি আক্কাই হছে? কি আক্কাই হছে?

—হাঁ হাঁ কি আক্কাই হছে—

—হছে না? পাহাড়ের মাথাতে ছিলাম, এই সব দিকুদের সঙ্গে মুসলাদের সঙ্গে সাত ছিল না, পড়খানা জেটে এই সায়েব লোকের সঙ্গে সাত ছিল না। শিকার করতিস—জোয়ার ভুট্টা লাগাতিস—বোঙ্গার পুজো করতিস, এখুন জমিনের লোভে পাহাড় থেকে নামলি, জাব মুলুকে গেরাম করলি, ধরতির বুকে ফাল চালছিস, ধান করছিস—তাথে কি হছে তুদের? আঁ? কি হছে?

উদ্ধত কণ্ঠে সিধু বললে—কি হছে? আমরা দাকা জম করছি, আমাদের জমিন হছে—

—হছে? কচু হছে! সব লিয়ে লিছে—দিকুরা সব লিয়ে লিছে। শুধু জমিন লিছে? জনম লিছে। লিছে না! তুরা জঙ্গিতে এসে দেনা করছিস—দিকুদের কাছে জনম বিকাইছে। গুলাম হছিস। তুরা রাস্তা বন্দিতে কাম করতে যাছিস! লোহার সড়ক হবে—লোহার ঘোড়ার গাড়ি ছুটবে। তুরা পাহাড় কাটছিস পথ বানাইছিস—পুয়সার লোভে ছুটছিস দলে দলে—মেয়্যাগুলোকে লিয়ে ছুটছিস। আমি কুছু জানছি না—তু.কুছু জানিস না—সিখানে ডবকা ডবকা মেয়্যাগুলাকে লিয়া ওই পুরখানা শালারা দিকু শালরা দাড়িওলা শালারা কি করছে তুরা জানিস না। পাপ হছে না! পুণ্যি হছে! তুরা দু ভাই—তু আর কানুহুর সঙ্গে ওই করন রায় মাঝির দু বিটী ফুল আর টুশকির হাঁড়কাবাঁদি করলে তুদের বাপ; সেই তখুন তুরা এতটুকুন—তুরা বড় হলি মরদ হলি। তুরা দু ভাই সাদী করলি না—পিরীত করলি লিটিপাড়ার বিশু মাঝির দুটো মেয়্যার সঙ্গে। কি হল? তাদের বাবা খাটতে গেল রাস্তা বন্দিতে—মেয়্যা দুটোকে লিয়ে গেল সোঙ্গে। দেখগা কি হল তাদের?—আক্কাই হল না?

সিধু শক্ত হয়ে উঠেছে। মুখ চোখ তার থম থম করছে। বড়ভাই চাঁদ এগিয়ে এল। সে তো জানে সিধু গোঁয়ার—রাগ হলে তার জ্ঞান থাকে না। বাবার ছোট ছেলে সে; তাদের ছোট ভাই সে, দেখতে বড় সুন্দর। ছেলেবেলা থেকে তার সমাদর। সে দুরন্ত, দুর্ধর্ষ। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। সে বদ্ধ গোঁয়ার। চাঁদ মাঝি তাড়াতাড়ি চূড়া মাঝির মায়ের কাছে এসে হেঁট হয়ে মুখের কাছে মুখ এনে বললে—ই কি কথা বুলছ গো মামা-মা (দিদিমা)। সে নতুন বয়েসে ছোকরা ছেল্যা মেলা দেখতে গেল টিলাপাড়ার ঝমরু মাঝির জাঁও বিটী দুটোর সঙ্গে। মেয়্যা দুটা খানিক তিড়িকপিড়িক মেয়্যা বটে। নাচলে হাঁসলে রগড় করলে। ছেল্যা দুটো

দু দিনের তরে ক্ষেপলেক উদিকে বিয়া করবে বুলে। কিন্তুক আমাদের বাপ চুনার মুর্মুক বটেক—সি তা শুনবেক ক্যানে? মানবেক ক্যানে? উদের সাদী তো সেই ফুল আর টুশকির সঙ্গেই হইছে—না কি? ই তুমি কি বুলছ? আর বিশু মাঝি তার বিটীদিগে নিয়ে রাস্তা বন্দিতে খাটতে গেইছে তো আমাদের কি? আমাদের গাঁয়ের পাপ কিসে?

—আর তুদের তেঁইয়াত ভগিনপোত যে তাদের সাতে গ্যেল তুদের বুনকে লিয়ে!

সিধু বড় ভাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে বললে—হাঁ, রাস্তা বন্দিতে খাটছে গেইছে—খাটবেক, রোজগার করবেক—এই এ্যাতো পয়সা আনবেক। তাতে পাপটো কুথা?

—কুথা? শুধাগা, ওই সব দিকুদিগে শুধাগা—ওই সব ভাল ভাল লোককে শুধাগা ওই সব সায়েব ঠিকাদারেরা কি করে? হঁ—কেউ জানে না বুঝি?

সিধু বললে—সি যিদিন শুনব, সিদিন এই কাঁড় আর ধেনুক নিয়ে যাব—গিয়া পেথম মান্‌কিকে আমার বহিনকে কাঁড় দিয়া বিঁধব—তারপরে যি পাপী তার ধরম লিবে, তাকে বিঁধব! আর যদি তু ইসব কথা বুলবি তবে তুকে আমি—

সে দাঁতে দাঁত টিপে পাগলের মত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বুড়ীর দিকে। হাতের পেশীগুলি শক্ত হয়ে উঠেছে তার। নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে সে সমস্ত অন্তরে অন্তরে। তবু বুড়ী তার সম্পর্কে মামা চূড়া মাঝির মা। তার মায়ের মাসী। তাই সে বলতে পারলে না, তোকেও কাঁড় দিয়ে বিঁধব আমি।

চুনার মুর্মু এতক্ষণ ধরে সেই ফাটলের ধারে কয়েকজন প্রৌঢ় ধার্মিক সাঁওতালদের নিয়ে বসে ভিতরের জল পড়া দেখছিল। দেখছিল জলটার রঙ কিরকম—লালচে না কালচে না সাদা। লালচে কালচে জল বের হলে সে লক্ষণ শুভ নয়। কালচে কাদাগোলা হলে অজন্মা হবে, লালচে হলে মহামারী হবে, সাদা হলে ভাল—সু বর্ষা হবে।

তারা কিন্তু এ জল দেখে বিস্মিত হয়ে গেছে, কারণ এ জলের রঙ পাতলা দুধের মত, বা জলমেশানো দুধের মত এবং এর স্পর্শ যেন গরম। ঠিক ভাল করে বোঝা যায়নি! কারণ ফাটলের অনেকটা ভিতর জল ঝরছে, তাও ফোঁটায় ফোঁটায়; অনেক বুদ্ধি করে তারা একটা কঞ্চির ডগায় খানিকটা ন্যাকড়া বেঁধে ফাটলে ঢুকিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে নিঙড়ে পরীক্ষা করে দেখছে।

একবার নয়, পাঁচ সাতবার দেখেও সন্দেহ মেটে নি। দেখেছে আর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে দুটি কথার একটি প্রশ্নই বার বার করেছে—কি রকম? কিন্তু উত্তর কেউ দিতে পারে নি।

—বড়ো মাঝি!

—হঁ!

—কি রকম?

ঘাড় নাড়তে নাড়তে চুনার বলেছে—কি রকম? তাই তো শুধাছি হে!

তাদের এই মৃদু প্রশ্নোত্তর এবং চোখের চাহনি দেখে ধীরে ধীরে ওখানকার সব মানুষই —সে নারী এবং পুরুষ সকলেই পায়ে পায়ে এগিয়ে জমাট বেঁধে স্তব্ধ বিস্ময়ে মনে মনে এই

প্রশ্নটিই উচ্চারণ করছিল—কি রকম ?

এরই মধ্যে বুড়ী চেঁচিয়েই চলেছিল। এবং মধ্যে মধ্যে সিধু কঠিন কণ্ঠে প্রতিবাদ করছিল। হঠাৎ মাঝখানে এসে পড়েছিল সিধুর বড়ভাই চাঁদ। আরও একজন—সে সিধুর বউ ফুল। সে নীরবে এই দিকে তাকিয়ে দেখছিল এবং শুনছিল।

হঠাৎ সিধুর উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে বাপ চুনার মাঝি মুখ ফিরিয়ে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল। —সিধু—বেটা।

সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল ফুল। কাছে দাঁড়াল।

বুড়ী তখন স্তব্ধ হয়েছে ভয়ে। সিধুর মূর্তি সত্যই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে! সিধু বলছে—পাপ পাপ! সব আমাদের পাপ! ঐ দিকুরা সব লিছে—ধান পান জমি কাঁড়া থালা বর্তন—সি আমাদের পাপ! আবার খেটে রোজগার করে আনছে তো সিটোও পাপ! তাহলে পুণ্যি কিসে রে বুড়ী—বল বল পুণ্যি কিসে হয় ?

চুনার মাঝি বললে—হাপেঃ!—গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে—থাম্!

সিধু বললে—থামব ক্যানে—বলুক, উ বলুক—

চুনার আবার বললে—হাপে ঃ!

বুড়ী এবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল—হাপেঃ! হাতম্ হাপেঃ!

চুনার বললে—শুন হে আমার কথাটি আগে শুন। বলে সে বাজপড়া গাছটার মাথার দিকে তাকালে; সঙ্গে সঙ্গে সকলেই তাকালে। চুনার বললে—দেখ মাথাটি শুকায়ে যেন ঝলসে গেইছে। হুঁ, লক্ষণটি খারাপ বটে।

বুড়ী বললে—হুঁ।—এবং সে তাকালে সিধুর দিকে। সিধু গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে আছে গাছটার দিকে।

চুনার বললে—হাতম্ হাপেঃ! কথা শুন আমার। গাছটি শুকাল, কিন্তুক পাহাড়ের পাথর ফাটায়ে পানি বাইরায়ে নিল। মারাংবোঙ্গা গাছ জ্বালায়ে দিয়ে মাটিতে নামলে। না নামলে তো পানি বাইরাইল ক্যানে? আর পানি লাল লয়, কালো লয়, কেমন দুধের পারা সাদা! কি বুলছে মারাংবোঙ্গা ই ঠিক বুঝতে লারলম। আমরা সব বুড়া মিলে বুঝতে লারলম। না কি হে ?

প্রবীণেরা পাশেই দাঁড়িয়েছিল—তারা সকলেই ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ। তা লারলম।

মান মাঝি—মান টুডু বললে—হুঁ। মন্দও লাগছে—না কি গো মঙ্গল ?

মঙ্গল হাঁসদা ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে—হুঁ। ভালও লাগছে। সাদা দুধের মতুন পানি। আবার গরম লাগছে। বকেশ্বর আছে বীরভূমে—সিখানে বাবা শিববোঙ্গা আছে—সিখানে এমুনি গরম জল!

চুনার বললে—তা হলে আমি বলি কি—

—হাঁ হাঁ—বল বল।

—বুলছি এইতো শনিচরবারে ইখানকার সব আমাদের মাঝির গাঁয়ের সর্দারেরা পরগনাতরা আসবেক; জমবে সব লিটিপাড়ায়। এই যে আমড়াপাড়ার কেনা ভকতের নতুন

দিকুরা সাঁওতালদের সব নিছে কেনেকুড়ে, দারোগার সঙ্গে জোট বেঁধেছে, তার লেগে সাহেবের কাছে দরখাস্ দিবে, আর ফিরতি পথে লাবড়াপাড়ার জঙ্গলের ধারে আমাদের জমায়েত হবেক। শলা হবেক। তখুন—।

ডগরু হেমব্রম বললে—হঁ হঁ হঁ। তখুন আমরা শুধায়ে দিব ইটি কি বটে—ভাল না মন্দ। খুব ভাল, কি বল গ?

—উঁ—হু—চুনার বললে—আমি বলি কি—

—কি বল!

—বলি কি—বলি এই গুরুমাঝি যারা তাদিগে না হয় লিয়ে আসব নেওতা দিয়ে। আঁ?

—হঁ। হঁ।

—তারা দেখুক নিজের চোখে। আঁ?

—হঁ। হঁ। খুব ভাল কথা।

—হঁ। খু—ব ভাল কথা। তা হলে এই কথা রইল।

—হঁ।

—তার আগে সব হাপেঃ। চুপ। চুপচাপ।

বৈশাখ মাস—গত রাত্রে এত ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে—কারুর চালা উড়েছে, কারুর ঘরের চালের খানিকটা উড়ে গেছে। রতন মাঝির বাড়িখানা একটেরে, জঙ্গলের গাঁ ঘেঁষে; অবশ্য গাঁয়ের কাছাকাছি জঙ্গলের গাছপালাগুলি সবই ছোট ছোট; তাও একটা ছোট গাছ মাঝ-বরাবর মুচড়ে ভেঙে রতনের ঘরের চালের মাথায় ঝুঁকে পড়েছে। একেবারে ভেঙে পড়লে চালাখানা মচকে যেত। কিংবা হয়তো ভেঙেও যেতে পারত। সকালে এতক্ষণ পর্যন্ত পাটকাম কারুর হয় নি। কাল রাত্রেই বাজটা যখন পড়েছিল, তখনই সকলে বুঝতে পেরেছিল বাজটা পড়ল জহর সর্দার সেই সব থেকে উঁচু গাছটার মাথায়। রাত্রে ঝড় বৃষ্টি থামলে দু-চারজনে এসেছিল, চুনার মাঝি—তার চার ছেলে, টুডু গুষ্টীর মান টুডু, হাঁসদাদের মঙ্গল, হেমব্রমদের ডগরু মিলে এসেছিল, কিন্তু ঠিক ঠাওর কিছু হয় নি। তাই সকালে উঠেই সব কাজ ফেলে মেয়েছেলে জোয়ান বুড়ো, সকলে গিয়েছিল জহর সর্দার বোঙ্গা যে গাছটিতে থাকেন সেই গাছের উপর বাজ পড়ল—গাছটা পুড়ে গেল। তাই দেখতে গিয়ে প্রায় আধপ্রহর কাটিয়ে বাড়ি ফিরল।

মেয়েরা ঘরের কাজে ব্যস্ত হল। পুরুষেরা গরু বাছুর মহিষ ছাগল ভেঁড়া ছেড়ে দিলে। বাঁধা রইল শুধু চাষের কাঁড়া আর দামড়াগুলা। গিদ্‌রা অর্থাৎ বাচ্চা ছেলেগুলো তাদের নিয়ে চলল গ্রামের ধারে। মাঠে ঘাস খাবে। মুরগীগুলোকে ছাড়লে।

মরদেরা তামাকপাতা পলাশপাতায় জড়িয়ে চুটি বানিয়ে চকমকির আগুনে ধরিয়ে ভাঙা চাল পরিষ্কার করতে লাগল। সাঁওতালপাড়ার জীবন সংসারের চাকায় ঘুরতে শুরু করলে।

উঁচু ডাঙায় সাঁওতালদের গ্রাম। এবং প্রত্যেকের ঘরের পাশে কতকটা করে খোলা পতিত জমি। কাঁকরে এবং পাথরে ভরতি। সেগুলো কালকের জলে বেশ ভাল নরম হয়েছে।

আজই তাতে চাষ দিতে পারলে সহজে চষে ফেলা যাবে। এই জমিতে তারা জনার লাগাবে। জোয়ার লাগাবে, মরদেরা কাঁড়া খুলে হাল জুড়লে।

চুনার বললে—আজ যে বসে থাকবেক, তার আর চাষ হবে না। চষে দে। চষে দে। হড়হড় করে হাল চলবেক।

দেখতে দেখতে গোটা গ্রামটা কর্মরত হয়ে গেল।

শুধু একজন ছাড়া।

সে সিধু। জহর সর্ণা থেকে সকলে চলে এল যখন তখনও সে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার আসবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তার বউ ফুল মেঝেন তাকে জানে—সে ফিরতে ফিরতেও বার বার ফিরে ফিরে দেখছিল সে আসছে কিনা। থমকে থমকে দাঁড়াচ্ছিল সে। তার জা তারই সমবয়সী টুশকি মেঝেন তার সঙ্গে ছিল। কথা বলতে বলতে আসছিল। কথা সবই এই কথা। আজকে বাগান-ডিহিতে কারুরই আর অন্য কোন কথা ছিল না। সকলেই ভয় পেয়েছে। তার উপর চুড়া মাঝির মা 'বুড়ী' যে সব অলক্ষুণে কথা বলেছে তাতে ভয় বেড়ে গিয়েছে। শুধু সিধু তার সঙ্গে তকরার করে খুব জোরে জোরে 'না না' বললেও তারা বিশ্বাস করতে পারে নি। মনে মনে দোষই দিয়েছে সিধুকে। ফুলের বার বার ইচ্ছে হয়েছে সিধুকে মিনতি করে বলতে—থাপেঃ থাম। ও গো থাম।

কিন্তু এত লোকের সামনেও বটে এবং নিজের স্বামী বলেও বটে, বলতে পারে নি। সিধুকে সে জানে। আজ ছ সাত বছর তাদের বিয়া হল, বেটা বেটী হল দুটো, তবু এখনও সে সিধুকে বুঝতে পারে না। তাকে কেমন ভয় লাগে। শুধু সন্ধ্যাবেলা হাঁড়িয়া জম করে নাচনের সময় সিধু যখন মাদল বাজায় তখন সব মেয়ের মধ্যে সে-ই মেতে ওঠে বেশী। তার মত নাচ আর কেউ নাচতে পারে না। তারপর বাকী রাত্রিটা, সেও এক এক দিন। তখন সিধু আর এক মানুষ। সে তখন ফুলের পালন করা দামড়া বাছুরটার মত অনুগত। আবার রাত পোয়ালেই যাকে তাই। শুধু ফুল কেন গোটা চুনারের সংসারটাই তাকে ভয় করে—তাকে নিয়ে বিব্রত।

ফুল থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সিধু কানুহু দুই ভাই বেশ পিছনে পড়ে গিয়েছে। টুশকি বলেছিল—দাঁড়ালি কেনে?

—উই দেখ দু ভেয়ে পিছাইছে; মতলব—উহা আসবে নাই।

—আসবে নাই তো করবেক কি বিধুয়া মিন্‌সেরা?

—গুজুর গুজুর করবেক দু ভেয়ে। আর কি করবেক? তু ডাক্।

টুশকির প্রতাপ আছে। সে মুখরা মেয়ে। ফুলের মত নরম মেয়ে নয়। সে পিছিয়ে খানিকটা গিয়ে বেশ উচ্চকণ্ঠে ডেকেছিল, শুনছ হে—হেই! হেই দু ভেয়েরা! বলি পিছাও কেনে হে? ঘরদুয়ারে পাটকামগুলা করবেক কে? বলি গিদরা চারটে কাঁদছেক, ভুখ লাগল, তাদের খেতে দিব, না ঘরে কাম করব? হঁ। আমাদিগে কিনে আনছিস না কি? গিদরাগুলা আমরা বাপের ঘর থেকে আনলম লয়? লাজ লাগে না তুদের?

টুশকির কথা বলবার একটি মনোরম উদ্ধত ভঙ্গি আছে, যা সকলের ভাল লাগে। যার জন্ত এই গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যেও সকলে একটু হেসে ফেলেছিল। চুনার মাঝি পর্যন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—দেলাঃ হো, হো সিধু হো কান্থ, দেলোঃ—জলদি সি—ধু—।

সিধু কান্থ তখনকার-মত ফিরেছিল। ফিরে কাজকাম সেরে, কিছু গাছের ডাল সরিয়ে, গরু বাছুর ছাগলগুলোকে বড় ভাই চাঁদের বারো বছরের ছেলেকে জিম্মা দিয়ে চুটি অর্থাৎ ওদের নিজের হাতে তৈরি বিড়ি খেতে বসেছিল।

সাঁওতালেরা ভোরবেলা ক্যানে ভাতে চারটি খেয়ে নিয়ে দিনের মত কাজে নামে। সে খাওয়া আজ হয় নি। ভোরবেলা আজ ভাত চড়ানো হয় নি। মেয়েরা ঘরের কাজ সেরে প্রহরখানেক বেলা হতে ভাত নামিয়েছিল। তাই কিছুটা খেয়ে ঘরে ঢুকে ঘরের কোণে পচাই মদের হাঁড়ি থেকে খানিকটা মদ ছেঁকে খেয়ে সিধু চুপ করে বসেছিল দাওয়ার উপর।

ফুল কাজ করতে করতে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হল? বসলি যে? হাল জুড়বি না?

—না।

—তবে কি করবি?

—ঘুমুবো।

—ঘুমুবি? কেনে?

—আমার মন! বলে খাটিয়াটার উপর গামছা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। ফুল আর কিছু বলতে সাহস করে নি।

তারপর কখন যে সে উঠে চলে গিয়েছে ফুল তা দেখতে পায় নি। কারণ সে তখন বাড়ির পাঁদাড়ে ঘুরছিল। সেখানে সে কতকগুলো কাঁকুড়ের খানা দিয়েছে, দেওয়ালের গায়ে ঝিঙের লতা উঠেছিল সেগুলো কালকের ঝড়ে পড়ে গেছে; কতকগুলো ভিণ্ডির গাছ হয়েছে। সে সবগুলোর তদ্বির করতে গিয়েছিল। তাদের বেটা বেটী খেলা করছিল উঠানে।

সিধু কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়েও ঘুমোয় নি। তার মনটা কেমন হয়ে গিয়েছে। আজ থেকে নয়, সে কাল সকাল থেকেই। মন অবশ্য তার ছেলেবেলা থেকেই চড়া। কেমন যেন চট করে খিঁচড়ে যায়। লোকে বলে, তার গায়ে অনেক জোর আছে…তার কাঁড় কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না; সে ধনুকের বাঁশটা পা দিয়ে চেপে দুই হাতে জ্যা টেনে একসঙ্গে চারটে পাঁচটা কাঁড় ছাড়তে পারে। এবং তাতেও তার লক্ষ্য মোটামুটি ঠিক থাকে। তাদের টাঙির এক কোপে সে একটা কাঁড়ার গলা দু ভাগ করে দিতে পারে। পারে সে অনেক কিছু। তার জন্মে তার গরব আছে দেমাক আছে, কিন্তু তার জন্মে মেজাজ তার খারাপ হয় না। মেজাজ খারাপ হয় লোকের অন্যায় দেখলে, অন্যায় কথা শুনলে।

কাল সকালে সে বুলুং অর্থাৎ নুন আনতে গিয়েছিল লিটাপাড়ার দিকে বারহেটের বাজারে।

বারহেটের বাজার বেশ বড় বাজার। ধান চাল ডাল কলাইয়ের আড়ত। বড় বড় কাপড়ের দোকান আছে। নুন-মশলা তেল থেকে শুরু করে কাঠ-লোহা সব মেলে। শৌখিন পুঁতি লাল গামছা ভালো কাঁকুই চাবকি ফিতে মাদুলি তক্তি, পিতলের ও রূপাদস্তার গহনা

তাও পাওয়া যায়। ওখানকার সব থেকে বড় কারবারী মহেন্দর ভকত; আমড়াপাড়ার কেনারাম ভকতের জ্ঞাতি ভাই। তা ছাড়াও মাহাতোদের দোকান আছে, বাঙালী দিকুদের ছোটখাটো কারবার আছে, আরও সব বাঙালী দিকু আছে—বামুড়ে অর্থাৎ বামুন আছে—আরও সব বাঙালী দিকু আছে—বামুড়ে অর্থাৎ বামুন আছে—তারা সব ওই দোকানে খাতা লেখে কাম করে।

সিধুর সঙ্গে গ্রামের আর কয়েকজন ছোকরা মাঝি ছিল, তারা সিধুকে সর্দারের মত মানে। সিধুর বয়স ২৮।৩০। দলের ছোকরারা প্রত্যেকেই বিশ কিংবা বাইশ। তারা নুন কিনবার নাম করে গেলেও আরো কিছু কিছু জিনিস কিনবার জন্ত দল বেঁধেছিল সিধুর সঙ্গে। সিধুর যেমন গোঁয়ার বলে অখ্যাতি আছে তেমনি বুদ্ধি এবং হিসেব-বোধের সুখ্যাতি আছে। তাকে সহজে ঠকানো যায় না। তারা নিয়ে গিয়েছিল প্রত্যেকে এক কেঁড়ে করে ঘি, আঁটি-বন্দী ময়ুরের পালক, তার সঙ্গে সিধুর ছিল তার শিকার করা বড় চিতাবাঘের নখ। দিকুর ছেলেদের গলায় সোনা রূপার তক্তির সঙ্গে গেঁথে দিলে খুব ভাল লাগে। কিন্তু সিধু এসব দিয়েও আড়াই সেরের বেশী নুন ছাড়া আর কিছু আনতে পারে নি। সে শুনেছিল ঘিয়ের সের ছ আনা, নুনের সের ছ পয়সা। কিন্তু তারা গিয়ে শুনলে ঘিয়ের দর চার আনা নুনের সের দু আনা।

সে বলেছিল—না। আমি শুনলাম ঘি ছ আনা সের।

ভকত হেসে বলেছিল—সে ভঁয়সা ঘিউয়ের দর মাঝি। গাওয়া ঘিউয়ের দর ছ আনা নয় পাঁচ আনা—টাকাতে 'পে' সের ; বলে তিনটে আঙুল দেখিয়ে ছিল। তারপর বলেছিল —ভঁয়সা ঘিউয়ের দর টাকাতে 'পোন' সের—বলে আর একটা আঙুল যোগ করে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল—মিৎ, বার, পে, পোন। টাকাতে পোন সের। মিৎ সের পোন আনা।

প্রথম সিধু এ দরে জিনিস দেয় নি ভকতকে। কিন্তু সকলেই বলেছিল সেই এক দর। তার ওপর দিতে গিয়েও তার বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না ; তার এক কেঁড়ে ঘিউ এক সেরের বেশী নয়। তার, আন্দাজ ছিল অন্তত আড়াই সের ঘি। ভকত তাকে দাম দিয়েছিল চার আনা, আর অল্প খানিকটা বাড়তি হয়েছিল বলে তার জন্তে এক আনা। এই পাঁচ আনা দাম দিয়েছিল তাকে।

বাঘের নখ কটার দাম পেয়েছিল তিন পয়সা আর ময়ুরের পেখমগুলার দাম এক পয়সা।

ঘিয়ের বেলায় মাপের সেরটা এক কেঁড়ে ঘিয়ে ভরে খানিকটা বেশী হল। কি করে যে কি হল সে বুঝতে পারে নি। সে শুনেছিল যে ওতেই তারা মারপ্যাচ করে ; সেই জন্তে মাপের বাঁশের চোঙটা সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়েছিল ভাল করে। কিন্তু কোন হদিস মিলল না। কিছু বুঝতে পারলে না। ভকতের নিজের বড় ঘিয়ের হাঁড়ির উপর চোঙটা রেখে ঘিটা গরম করে নিয়ে ঢালতে লাগল। ঢালছেই ঢালছেই, ভরছে না।

সে সব সমেত সাত আনা পেয়েছে, কিন্তু ছোঁড়াগুলা কিছুই পেলে না, কারুর সের আর ভরলই না।

ফুলের জন্তে রূপাদস্তার হাঁসুলী কিনবে, গিদরো চুটোর জন্তে বালা কিনবে ভেবেছিল।

পুঁতির মালা কিনবারও ইচ্ছে ছিল কিন্তু কিছুই কেনা হল না।

সে বুঝতে পেরেছিল যে ভকত দিকু তাকে ঠকালে। কিন্তু কিসে ঠকালে সে ধরতে পারে নি। মুখ তার রাগে থমথমে হয়ে উঠেছিল—বলেছিল—ই কি হল? ঘিউটো গেলো কোথা গ ভকত?

ভকত হি হি করে হেসে বলেছিল—ভূ-ত খেলে রে।

—ভূতে কি করে খেলে?

—না খেলে তো কাঁহা গেল? তু বল না। তোর চোখের সামনে তো মাপলাম।

—আমার ঘি ফিরে দে।

—ফিরে দেব? কি করে ফিরে দেব? আমার হাঁড়িতে ঢাললাম। ফিরে দেব কি করে? ভাগ্‌, বোদা কাঁহাকা!

চোখ দুটো হঠাৎ রাঙা করে এরপর ভকত হয়েছিল আর এক ভকত। গলাটা ঝেড়ে ষাঁড়ের মত গাঁক করে ডেকেছিল—ভূপ সিং।

দশ বারোজন পশ্চিমা দারোয়ান এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে—ভকতজী!

একজন সাঁওতাল ভকতের বাড়ির চাকর—সে ছুটে তাদের কাছে এসে বলেছিল—চেদা এনুত্রে কেনাম? রাগ করছিস কেনে? মাপ যা হল তার দাম লে, ঘি ফিরে লিবি কি কথা?

কথা তাদের নিজেদের ভাষাতেই হচ্ছিল। কিন্তু ভকত তাদের ভাষা জানে। সে বলেছিল—হাঁ। ন্যায্য দাম যা হল নিয়ে চলে যা। মাপ করে ঘি নিয়েছি, ফিরে দিব ই কোন্ কথা? আঁ? কোন্ আইনে তু ফিরে পাবি? বেশী চালাকি করলে থানাতে মহেশ দারোগার কাছে বেঁধে পাঠিয়ে দিব। হাজার সাঁওতাল আসছে, ঘি কিনছি, ধান চাল কিনছি, চালন দিব শহর মুলুকে। ঘি ফিরে লিবি?

চাকর সাঁওতাল বলছিল—তাই দে গো ভকতজী, তাই দামই দে। লে গো লে—কি নাম বেটে তুর?

—নাম আমার সিধুমুর্মু। বাগনাডির চুনার মুর্মুর ছুটু ছেলে বটি আমি।—বেশ অহঙ্কার করেই বলেছিল সে।

সে সাঁওতালটি বলেছিল—আয় বাবা! চুনার মুর্মুর বেটা তু! ছুটু বেটা! সে ডান কনুইয়ে বাঁ হাত ঠেকিয়ে ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেও দিয়েছিল, সে যখন নমস্কার করছে তাকেও করতে হবে বৈকি!

সে লোকটার বাড়ি সাহেবগঞ্জের দিকে। সে ভকত বাড়ির চাকর আজ সাত বছর। বাপ মরার সময় গেল্ (দশ) টাকা ধার করেছিল ভকতের কাছে···সেই টাকা শোধ করবার জন্যে আজও খাটছে। সে খাটে, তার স্ত্রী খাটে। খাবার ধান পায়। বাস্। আর কিছু না। লোকটার নাম নিমু হাঁসদা।

এমন চাকর ভকতের বাড়িতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন আছে। কেউ ভকতের দোকানে খাটে, বাড়িতে খাটে—বাকী সব খাটে ক্ষেতির কামে। গোটা বারহেটের বাজারে দিকুদের

বাড়িতে এমন চাকর আছে দেড়শো দুশো। বারহেট মস্ত বাজার। আগে বাজারটা ছোট ছিল। এখন রেলের রাস্তাবন্দি হচ্ছে, তার জন্যে এখান থেকে ঠিকাদাররা রসদ কেনে; তিনপাহাড় বারহারোয়ার কাছ থেকে তারা আসে গাড়ি নিয়ে। এরাও নিয়ে যায়। রাজমহল বাজারে যায় বড় বড় মহাজনেরা। মহিন্দর ভকত মাল পাঠায় রাজমহল। সাহেবদের নীলকুঠি আছে—সেখানেও সে মাল দেয়।

জিনিস ওই এক নুন ছাড়া আর কিছু কেনা তার হয় নি। আড়াই সের নুন—তাও সে কতটুকু! তাদের পাইয়ে মাপলে খুব জোর দু পাই ভরে এক মুঠা হবে। নুনের বাটখারা আলাদা। ধান যে বাটখারায় নেয় সে বাটখারা নয়! ছোট আলাদা বাটখারা। সরকারী আবগারী বাটখারা। সবাই বলে আলাদাই বটে।

সঙ্গের ছোঁড়াদের মধ্যে ঝিকরু মাঝি—সে তার সমবয়সী—সে এর আগে অনেকবার বারহেটে এসেছে। অন্য ছোকরারাও দু'চারবার এসেছে। কিন্তু সিধু সব থেকে কম এসেছে। তাকে তার বাপ দাদারা আসতে দেয় না। বলে মেজাজ খারাপ মারামারি করবে। ঝিকরু বললে—তা সিধু মিছা রাগ করিস হে।

তারা বারহেটের বাজারে লক্ষ্যশূন্যের মত ঘুরছিল—শুধু দেখা। কত দোকান কত বাড়ি—দিকুরা সব কেউ ঘোড়ায় চড়ে চলেছে, কেউ হেঁটে চলেছে। কত কেনাকাটা করছে। কত হাসছে। দোকানে দোকানে কত জিনিস। কত রঙ; কত সুন্দর। কিন্তু তাদের পয়সা নেই। শুধু দেখেই বেড়ালে। সিধু চুপ করেই চলেছিল। মনের ভিতর সেই ভকতের দোকানের রাগ যেন সাপের মত ফোঁসাচ্ছিল।

সে বেশ বুঝেছে তাকে ঠকিয়ে নিলে। কিন্তু কি করবে সে? কিছু সে বুঝতে পারছে না, বোঝাতে পারছে না, তা ছাড়া তারা এখানে ক'জন! কি করবে? বেশী জন হলেই বা কি করবে। 'পুড়খানা জেটেরা' অর্থাৎ ওই ছালচামড়াওঠা সদা রাঙা সাহেবগুলান এখুনি বন্দুক সিপাহী নিয়ে আসবে। দারোগা আসবে লালপাগড়ি বাঁধা সিপাই নিয়ে।

হঠাৎ সে থুথু ফেলেছিল। থু থু থু থু।

ঝিকরু জিজ্ঞাসা করেছিল—গলা শুকাল হে। খৈনী খাবে?

—না।

—তবে?

—দেখ কেনে আমাদের জাতভাই সাঁওতালগুলানকে কি বুলছে। গাল দিছে।

—দিবে না! উরা তো টাকা নিয়ে বিকাইলে হে।

—কত টাকা দাম দিলে হে? একটা হড় (মানুষ) বেটে!

—তা দশ টাকা আট টাকা। যে যেমুন। টাকা লিলে কেনে?

এর উত্তর খুঁজে পায় নি সিধু। চুপ করেই থেকে ছিল। বিশু মাঝি বলেছিল—ইবার ফিরে চল। মিছা ঘুরে ঘুরে কি করব? ধূপ বড়া চড়া হয়েছে, ফিরা চল। পথে ঝরনার ধারে খাজারি (মুড়ি) ভিজায়ে খেয়ে লিয়ে সিরিং করতে করতে চলে যাব।

—সিধু।

—হুঁ।

—চলা কানা। চল্। ফিরে চল্।

সিধু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। সামনেই একটা দিকু দোকানদার ছোট একটা দোকানে কাঁকুই, পুঁতির মালা, পিতলের গহনা বিক্রি করছিল। তার আপসোস হচ্ছিল সে কিছুই কিনতে পারলে না। মাত্র ছটা পয়সা তার মাথার পাগড়ির চাদরের খুঁটে বাঁধা আছে।

ঝিকরু বুঝতে পেরেছিল তার আপসোসের কথা। সে হেসে বলেছিল—তুর পেথম কিনা। তুকে তো তুর বাবা দাদারা আসতে দেয় না। তু রাগ করছিস! কিন্তুক মিছে রাগ সিধু। মিছে রাগ করছিস।

সিধু অকারণে ঠাস করে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলে। তারপর বললে—একটা হাড়ের (মানুষের) দাম দশ টাকা। ফিরে চল। ফিরে চল।

বলে পিছু ফিরে হনহন করে চলতে শুরু করেছিল। কোথাও দাঁড়ায় নি। পিছন ফিরে দেখে নি সঙ্গীরা আসছে কিনা। শুধু ভাবছিল একটা হাড়ের দাম দশ টাকা। বারহেটে থেকে বের হয়ে এসে একটা ছোট জঙ্গলে একটা ঝরনা পেয়ে ফিরে দেখলে সঙ্গীরা নেই, তারা অনেক পেছিয়ে পড়েছে, সে ঝরনার ধারে বসল সঙ্গীদের অপেক্ষায়। হঠাৎ ঝিকরুর কথার জবাব সে দিতে পারে নি। তাতে তার রাগ বেড়েই গেছে। এবং জবাব দিতে না পারলেও, অত্যন্ত অন্যায় মনে হয়েছে। নিয়েছিল কেন! টাকা নিয়েছিল কেন! কিন্তু একটা মানুষের দাম দশ টাকা! আজীবন খেটে তা শোধ যায় না!

ঝরনার জলে নেমে মুখ হাত ধুয়ে মাথার চাদরের পাগড়িটা খুলে রেখে মাথাটাও ধুয়ে ফেললে।

তারপর সঙ্গীদের অপেক্ষায় একটা শালগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রইল। বাঁশীটা গোঁজা ছিল কোমরে, সেটা খুলে বাজাতে মন লাগল না। বসেই রইল।

পাশে রাস্তা দিয়ে লোক আর চলছে না। বোশেখ মাস—দুপুর হয়ে এসেছে। বাড়িতে ভোরে ফ্যানভাত বেশ পেট ভরে খেয়ে এসেছে। কিন্তু তা কখন হজম হয়ে কোথায় গিয়েছে তার ঠিক নেই। খিদেতে পেট চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু সঙ্গীরা ফিরে না এলেও খেতে ইচ্ছে করছে না। তার সঙ্গে খানিকটা গুড় আছে, লঙ্কা আছে, ক্ষেতের বুটকলাই আছে। কাল রাত্তে ফুল চারটি বুটকলাই ভিজিয়ে সিদ্ধ করে দিয়েছে। বেশ বতর হবে। সকলকে দিয়ে খাবে এই ইচ্ছে। কিন্তু এরা এখনও আসছে না! কি হল? রাগ করলে? না। রাগ করবে না। কি করছে? দেখে বেড়াচ্ছে! দেখে বেড়াচ্ছে! শুধু দেখে বেড়াচ্ছে! ফ্যালফ্যাল করে দেখছে। থু থু! কি হবে দেখে? কি হবে?

তারা খরগোশ পাখী মেরে খায়—কুকুরগুলো জিভ হা হা করে বসে থাকে। টপটপ করে লাল পড়ে। এ ভাই। থু!

হঠাৎ তার অত্যন্ত রাগ হয়ে উঠল। এই দুষ্টু দিকুরা যদি একেবারে সব মরে যায় তো ভাল হয়। তারা সব দখল করে নেয়। মরংবোঙ্গা তা কেন করে না তা সে বোঝে না। না। উরা যদি রোগ হয়ে মরে যায় তো কি হবে? তাতে বুকের ঝালটা কি করে মিটবে?

তার চেয়ে মরংবোঙা যদি তাকে চড় দেয়—বলে, সিধু তুর বাপ দাদোর বাপ দাদোর দাদোর দাদো রাজা ছিল, তার টাঙ্গিতে হাতী কাটত সে। তার গায়ে কাঁড় বিঁধত না। আজ থেকে তু তাই হলি। যা তু চাই হলি। যা তু টাঙ্গি হাতে বেরিয়ে চলে যা—যত দিকু আছে ভকত আছে কেনারাম আছে মহিন্দর আছে দারোগা আছে সিপাহী আছে সব কেটে ফেলা। কচাকচ কচাকচ। তা হলে সে বেরিয়ে পড়ে সব ওই দুশমন দিকু আর পুড়খানা জেটেদের কেটে ফেলে রাজা হয়ে বসে। সাঁওতালদের সব ওই বাড়ি দেয়। তবে তবে তবে সে খুশী হয়। বোঙা হে! হে বাবা তুমি তাকে—

হঠাৎ শিকারী সাঁওতালের কানে এসে পৌছুল একটা শব্দ। খরখর শব্দ হচ্ছে। এই ছোট শালবনটার এই ঝরনাটার চারিপাশ ঘিরে অল্প ক'টি গাছ আর বাকী সব কাটা শাল-গাছের গুঁড়ি থেকে বের হওয়া ঝোপ। কোন ঝোপের মধ্যে কিছু নড়ছে—শুকনো পাতা পড়ে আছে ভিতরে, তার উপরে চলেছে। মাঝদুপুর হয়ে এসেছে। ঝোপের ভিতর যে সব ছোট জন্তু শুয়ে ঘুমোচ্ছিল তাদের কেউ তেষ্টায় জেগে উঠেছে। এখুনি মুখ বের করে চারিদিক দেখে খুরখুর করে ঝরনার ধারে এসে চুকচুক করে জল খেয়ে আবার ফিরে যাবে ঝোপের মধ্যে। অতি সন্তর্পণে সে কাঁধের ধনুকটা ঠিক করে নিয়ে গাছের আড়ালে বসল—দুটো কাঁড় ঠিক করে নিলে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

আরেঃ! ওপাশে একটা জলের ধারের ঝোপ থেকে ওটা কি। ছেয়ো রঙের গোল মুখ বের করে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে! ওরে শালা! 'রোগু' বটে—বনবিড়াল! হাঁ! শালা কি তাকে দেখলে নাকি? না হলে এমন করে মুখ ঢুকিয়ে নেবে কেন? কিন্তু খরখর শব্দটা তো ওখান থেকে উঠছে না। একটু এপাশ থেকে হাঁ, ওই যে একটা খরগোশ বেরিয়েছে। বেরিয়ে উবু হয়ে বসার মত বসে দেখছে। আর তার পিছনে দুটো বাচ্চা। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে জল খেতে বেরিয়েছে। হাঁ—। এতক্ষণে সে বুঝলে ব্যাপারটা, শালা শয়তান বন-বিড়ালটা ঠিক কান খাড়া করে মুখ বের করেছিল। শালা ওই ঝোপে ঘাপটি মেরে বসে আছে। খরগোশ তিনটি এগিয়ে আসছে খুরখুর করে। ওদিকে ওই বনবিড়ালটার মাথা বেরিয়েছে। বাগ পেলেই ঝাঁপ দেবে। কিন্তু সে কি করবে? খরগোশটাকে মারলেও বনবিড়ালটা ঠিক মুখে করে নিয়ে পালাবে।

শালা ওই দিকুদের মত। শালা।

কিন্তু সে খরগোশটা ছাড়বে? উঁহু। সেই মুহূর্তে ঠিক করে ফেললে মতলব। দুটোকেই মারবে সে এক কাঁড়ে। শালা বনবিড়াল দিক ঝাঁপ খরগোশটার উপর। খরগোশটা চেঁচাবে—একটু ঝটপট করবে···সেই মুহূর্তে সে ছাড়বে কাঁড়। এক কাঁড়ে দুটোকে বিঁধবে।

কাঁড় ধনুকে লাগিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসল। ওই শালা বনবিড়াল তৈরী হচ্ছে। দেবে লাফ এইবার। দিলে লাফ, এবং অব্যর্থ লক্ষ্যে মা খরগোশটার উপর পড়ে কামড়ে ধরলে তার ঘাড়।

সেও কাঁড় ধরে টান দিলে ধনুকে। লক্ষ্য করতে করতে তার মনে হল এ লক্ষ্য যদি ঠিক বেঁধে তবে নিশ্চয় মরংবোঙা তার উপর খুশী হয়েছেন। এবং সেই টাঙি তিনি তাকে নিশ্চয়

দেবেন যাতে সে ওই দিকুদিকে আর ওই সায়েবদিকে এমনি করে একসঙ্গে মেরে ফেলবে। ছেড়ে দিলে সে কাঁড়। একটা 'হিজ্' মত শব্দ করে কাঁড়টা বেরিয়ে গেল।

তারপরই উঠল একসঙ্গে দুটো জন্তুর ক্রুদ্ধ আর্তনাদ। হা হা, দুটোই গেঁথে গেছে এক তীরে। জয় মরংবোঙ্গা!

লাফিয়ে উঠে ছুটল সে এবং যেখানে জন্তু দুটো ছট্‌ফট্ করছিল যেখানে এসে দাঁড়াল। শালা বিড়ালটার ঘাড়ে কাঁড়টা ঢুকে খরগোশটার মাথায় ফেঁড়ে একেবারে মাটিতে গেঁথে গেছে। একসঙ্গে গাঁথা জন্তু দুটো একসঙ্গে মরণযন্ত্রণায় গর্জন করছে, কাতরাচ্ছে। শিকারী সাঁওতাল সিধুর এতটুকু কষ্ট হল না দেখে। মর মর, দুটোই একসঙ্গে মর!

শালা দিকু আর জেটে ওই সাদা সায়েব একসঙ্গে।

মর। ওদের যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে সিধুর মুখের চোয়ালটা কঠোর হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ একটা চ্যাঁ শব্দ শুনে ঘুরে তাকালে। আ!

একটা খরগোশের বাচ্চা ভয়ে লাফ দিয়েছিল কিন্তু ভয়ের মধ্যে দিক ঠিক করতে পারে নি—লাফ দিয়ে পড়েছে ঝরনার জলে। এখানে ঝরনাটা একটা চওড়া গর্তে ডোবার মত ভরে রয়েছে। জলটা অনেকটা স্থির। বাচ্চাটা খানিকটা সাঁতরে আর পারছে না। ডুবছে। ডুবতে ডুবতে চেঁচিয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য! সিধুর শক্ত চোয়ালটা মুহূর্তে শিথিল হয়ে গেল। মনে কি হল। কি হল তা ভাববারও অবকাশও ছিল না তার। এবং সে-বিচার করবার মত বুদ্ধিমান মানুষও সে নয়। সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঝরনার জলে। প্রায় এক-কোমর জল সেখানে। ডুবন্ত খরগোশের বাচ্চাকে সে তুলে নিয়ে একবার তার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে উপরে উঠে এল। তখন এ জানোয়ার দুটো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। খরগোশটা শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে মধ্যে মধ্যে; রোগাটা অর্থাৎ বনবেড়ালটা তখনও গোঙাচ্ছে—এক একবার একটু বেশী গর্জে গুটিয়ে ঝাপটা দিয়ে নিজেকে ছাড়াতে চাচ্ছে।

হাসলে সিধু—লে শালা, ছাড়া। লে লে। অঁঃ!

ঠিক সেই মুহূর্তে হাঁক এল—সিধু হে! অ সিধু!

সিধু সাড়া দিলে—হাঁ হে! হিজু মে। এইখেনে, হ! মজা দেখ হে!

ওদের দলের লোকেরাই শুধু আসে নি, তার সঙ্গে নিমু হাঁসদা এসেছিল এবং আরও ক'জন—তারাও বারহেটের ব্যবসাদারদের বাঁধা বা কেনা চাকর। তারা এদের এগিয়ে দিতে এসেছে আর সিধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এক ঠিলি হাঁড়িয়া এনেছে, বারহেটের বাইরে খানিকটা দূরে সাঁওতালপাড়া আছে, সেখানে গিয়ে নিয়ে এসেছে। ঝিকরুরা এর মধ্যে খানিকটা খেয়েছেও—মুখে গন্ধ উঠছে।

হাত বাড়িয়ে হাতে হাত ধরে কপালে ঠেকিয়ে সম্ভাষণ সেরে নিমু বললে—তু বীর বটিস হে। আমরা শুনি সব লোকে বলে চুনার মুর্মুর ছুটু ছেলে সিধু খুব তেজী বেটে আর বীর বেটে। হাঁ, তা দেখলম আজ। ওই ভকতের সঙ্গে এমুন করে কথা কেউ বুলতে লারে হে।

লোকটা বাঘ বেটে। মহেশ দারোগার সাতে খুব সাত। আসে· বোতলের মদ খায়। শালার অ্যাই প্যাট! একটা পাঁঠা খেয়ে লেয়। রাতে তিন চারটে মেয়েলোক লইলে হয় না শালার। আর শালা সায়েবদিগে সুদ্ধ ভয় করে না হে। কিছু মানে না—কোর্ট কাছারী হাকিম কিছু না। সি সব উর হাতধরা বেটে। তা ত'র সাতে তু—হাঁ খুব জোর জোর বুললি হে। আর ঠিক বুললি - উরা এমুনি চোরাই বেটে। কি যে করে হে ওই বাপের বাঁশের চোঙাতে—শালা এক কেঁড়ে ঘি গিলে ফেলায়!

সিধু বলল—তা তু তো আমাকে উদের হয়ে বাত বুললি। ই কথাগুলি তো বুললি না তখুন।

—আর বাবা, তা হলে আমার জান রাখতো নাই ভকত! বাবারে! ওই পশ্চিমা দারোয়ানগুলো আমাকে ঘরে ভরে পিটত। হয়তো মেরেই ফেলাত হে। তা ছাড়া বিপদ তুরও হত ভাই। দেখলি তো শালারা যমদূতের মতুন এসে দাঁড়িয়েছিল। কি করতিস তু বোল!

ওদের মধ্যে একজন ছিল লক্ষ্মণ—সে ছোকরা মানুষ, সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—উরা রাক্ষস বেটে সিধু ভাই, উরা রাক্ষস বেটে। রাক্ষসে হাড় মাস খায়, লহু চাটে—ই রাক্ষসরা সারা জীবন খেয়ে দেয় হে। তবু ছাড়ে না? এই দেখ কেনে ভাই, আমার বাবা দেনা লিয়েছিল এই এক কায়েত দিকুর কাছে 'গেল' টাকা (দশ টাকা) তা বাবা মরে গেইছে—আমি খাটছি। চাষে খাটি—ধান সব উই লেয়। তবু শেষ হয় নাই। হবেক না।

ওদিকে একজন বনবিড়ালটাকে পুড়িয়ে ঝলসে এনে তার চামড়া ছাড়িয়ে আবার একবার সেঁকে ঝলসে নিয়ে এল—খানিকটা নুন খানিকটা লঙ্কা' সের করে খাজারি অর্থাৎ মুড়ির সঙ্গে হাঁড়িয়া খাওয়া শুরু হল।

নিমু বললে—ওই দেখ কেনে লিটিপাড়াতে ভীম মাঝি জবর লোক। জমিন আছে। কাঁড়া আছে চারটে। তেজী লোক। আর লোক ভাল।

ঝিকরু বললে—তাকে আমরা জানি হে।

—জানবি বইকি—সে লিটিপাড়ার সর্দার।

—তা লয় হে। হাসলে ঝিকরু। বললে—একবার আমাদের সাতে লেগেছিল হে!

—কি বেপার? ভীম মাঝি তো ধার্মিক লোক—তবে খানিক তেজী বটে সিধুর মতুন।

—হঁ! ওই সিধুর সাতেই লেগেছিল। সে চেপে ধরেছিল সিধুর হাত। এক হেঁচকাতে সিধু ছাড়ায়ে লিলেক।

—বেটে বেটে!

—হঁ তো কি! সিধু কম লয় হে!

—হঁ তা মানছি। ভকতের সাতে বাতে বুঝলম। আর এই কাঁড়ে ইখানে বসে হুইখানে শালা রোগা আর খরগোশটাকে ধরতির সঙ্গে গেঁথে ফেলালছে—সি কম কথা লয়। কিন্তুক এমন হল কেনে? ভীম মাঝি সাতে—

সিধু চুপ করে বসেছিল—গামছায় খরগোশের বাচ্চাটাকে বেঁধে রেখেছে কোলের উপর—সেটা নড়ছে—সেইটার গায়ে সে কাপড়ের উপর থেকে হাত বুলোচ্ছে। আর মধ্যে মধ্যে সিদ্ধ বুট মুড়ি খাওয়াবার চেষ্টা করছে। দুই আঙুলে ধরে কাপড়ের বাঁধনের ফাঁক দিয়ে তার মুখের কাছে ধরছে। বাচ্চাটা খাচ্ছে না। তার নখ দিয়ে আঁচড়াতে চেষ্টা করছে।

ঝিকরু বললে—সি এক কাণ্ড বেটে হে! ভীম মাঝির গাঁয়ের লাল মাঝি আছে—তার সাতে সিধুর বুনের বিয়ে হল।

—হঁ! লাল তো এখন বড়লোক বেটে হে! সি তো রাস্তাবন্দিতে কাম করছেক। সিখানে সি সদ্দার হইছেক! মেলা টাকা পেছে!

সিধু বললে—হঁ। আমরাও শুনলম।

ঝিকরু বললে—সেই বিয়ার পরে সিধু কানু দুই ভাই গ্যেল কুটুমবাড়ি;—বলতে বলতে থেমে গিয়ে সিধুকে বললে—কি হে সিধু কথাটা বুলি? না শরম লাগবে, গোস্সা হবে? খিলখিল করে হেসে উঠল প্রথমে ঝিকরু তারপর বাগনাডির আর সকলে।

সিধু বললে—সিটো আর কি কথা হে। মরদ বটি—তখুন আবার ছোকরা বয়েস—তখুন ছুকরি দেখে মনটো খলোবলো করেছিল। তা ছাড়া মেয়ে দুটাও খুব তিড়িকপিড়িক ছুকরি। আমরা দু ভাই, তারাও জাঁও (যমজ) বুন। দু ভাইয়ের দুজনাকে মনে লেগে গ্যেল।

—হঁ! বুঝলে কিনা! লিটাপাড়া গিয়েছিল দু ভাই কানু আর সিধু—ইরাও দু ভাই জাঁও ভাইয়ের মতুন। হামদুটা। গিয়া পিরীতে পড়ে গ্যেল। তিড়িকপিড়িক মেয়া দুটো—

—সি দুটা কে বটেক হে? আমি লিটাপাড়া জানি। সেই টুকনী আর রুকনী?

—হঁ হঁ হঁ। সেই বেটে সেই বেটে। তা পিরীত হল তো খেপল দু ভাই। ওদিকে বিয়া করব।' ইদিকে বাবা সদ্দার মাঝি দুই ভেয়ের বিয়ের ঠিক করে 'হড়কবাদি' করেছে শিমুলতলীর মানী ঘরে—ধনরায় হেমব্রমের দুই বিটী টুশকি আর ফুলের সঙ্গে। তা সি ইরা মানবে না। বাপের সঙ্গে ল্যাই করে। হাপে হাপেতে চলে যায় লিটাপাড়া। সিখানে গিয়ে হৈ হৈ করে মাতন লাগায়। শালবনে গিয়ে ইরা বাজায় বাঁশি আর টুকনী রুকনী সিরিং (গান) করে নাচে হে! এই একদিন ভীম মাঝি তক্কে তক্কে গিয়া ধরলে—আর ধরবি তো ধর সিধুর হাত। বুললে—লিটাপাড়ায় মজা করতে আইছ হে! এস—আগে আমার সাতে মজাটো হোক তার পরেতে উদের সাতে লাচগান লাগাবে। এস। মুর্মুর বেটা দুটোকে আজ দড়ি দিয়ে বেঁধে কাঁড়ার গোঁজে বাঁধব। তার পরেতে কাঁধে হাল লাগায়ে জমিন চযব। এক বিঘা জমিন যদি চষে দিতে পার তবে তখুন কথা হবে। কানু ভয় খেয়েছিল, সিধু কিন্তুক এক হেঁচকাতে হাত ছাড়ায়ে লিয়ে বুলেছিল—তার পহেলে এস মাঝি দেখি কে কারকে জোয়ালে গতাবেক। কার জোর বেশী। তা ভীম মাঝির তখুন তাক্ লেগে গেইছে। ভীম মাঝি লাঙলের মুঠা ধরলে বড় বড় কাঁড়া হাল টানতে কুঁজ হয়ে যায়, তার সেই মুঠা এই ছোকড়া এক হেঁচকাতে ছাড়ায়ে লিলে! ডান হাতের মুঠা!

নিমু বললে—হঁ হঁ!

ঝিকরু বললে—তা ভীম মাঝি তখুন বুললে—হঁ হে, তু মরদের বেটা মরদ বটিস। তা চল্ দেখব তুর মদ্দানী। আমার ঘরে একটা ভালুক আছে, সিটার সঙ্গে আমি লড়াই করতাম হে তুমার বয়সে। এখুন আর লড়ি না। তু লড়তে পারবি? সেটার সঙ্গে?

সিধু বলেছিল—হঁ। চল্।

ভীম বলেছিল—তা পারলে তুকে আমার হড়কবাঁদি ভেঙে বিটী দুটোকে দিব।

ঝিকরু বললে—ওই স্থাখ ক্যানে সিধুর পিঠে ভাল্কা শালার নখের দাগ। অ্যা—ই ফালি করে চিরে দিয়েছিল। শালা ভাল্কা ক্ষেপে গেইছিল। না ক্ষেপলে কি হবে, সিধু তার বুকে বসে দুই পায়ে শালার ছামুকার পা দুটো চেপে দু হাতে টিপে ধরেছিল তার গলা। ভীম মাঝি বলেছিল—সাবাস! তু উঠ। খুব হইছে। সিধু বলেছিল—উঠে ছেড়ে দিব তো শালা ফের ধরবে আমাকে।

ভীম বলেছিল—না—আমি আটকাব—তু ছাড়।

সিধু বলেছিল—তুকে ধরবে। ক্ষেপে গেইছে শালা।

ভীম বলেছিল—না রে না। উ আমার পুষা বটে হে! আমাকে মানবেক। দে, তু ছেড়ে দে।

—দেখিস।

—হঁ, দেখেছি তু ছাড়।

সিধু তাকে ছেড়ে লাফায়ে উঠেছে আর শালা গাঁ গাঁ করে ছামনের পা দুটো হাতের মতুন বাড়ায়ে খাড়া হয়ে উঠেছে। তো ভীম সদ্দার ছামনে দাঁড়ায়ে তাকে বললে—হাপে হাপে হাপে! বেটা হাপে! তা শুনবে কেনে? সদ্দারকে জাপুটে ধরে কাঁধে দিলে কামড় আর পিঠে বসালে নখ। ধপাস করে জড়াজড়ি করে পড়ল মাটিতে। সদ্দার পড়ল হ্যাট তলাতে। শালা সিদিন মেরেই ফেলাতো হে। তা সদ্দারের কুকুরটো এসে শালার ঠ্যাঙ কামড়িয়ে ধরলেক। আর ইদিকে সিধু একটো টাঙি লিয়ে এক কোপ লাগালে শালার পিঠে। শালা সদ্দারকে ছেড়ে ফের ফিরল সিধুর ওপর। তখন সিধুর হাতে টাঙি। সে আলোপাথাড়ি দিলে শালাকে কোপায়ে। শালা পড়ে গ্যেল। ভীম সদ্দারের দুখ হল কিন্তুক সাবাস দিলে সিধুকে। আর বুললে—হাঁ, তু মরদ বটে, লড়েছিস, খুব লড়েছিস। উটাকে মারলি। তা—তা ভালই করেছিস। শালা এমুন হইছে? তা জানতম নাই। তু জিতেছিস; তা তুরা বিয়ে কর বিটী দুটোকে।

নিমু মাঝি বললে—সি বিটী দুটোর কার সঙ্গে বিয়া হইছে? ইয়ার সঙ্গে আর ইয়ার ভাইয়ের সঙ্গে? টুকনী আর রুকনী? কি বুলছিস হে? সি বিটি দুটো—তাদের বাবা বিশু তো—

সিধু বললে—হঁ হঁ। বিয়ার সব ঠিক হছে। আমার বাবা তখন ক্ষেপেছে। বলে আমি কথা দিলম। আমি বলি—তু কথা দিলি আর আমি মন দিলম। বিয়া আমি করব হে। আমি যাকে মন দিলম তাকেই আমি বিয়া করব। তোমার কথা থাকল কি না থাকল আমি জানি না। এই সব টানাটানি হচ্ছে। তখুন বিশুর কুটুম আইছিল বেনাগোড়ে থেকে।

তারা খুব টাকাওলা লোক। পাদরীদের সঙ্গে ভাব। কেরেস্তান হইছে। পোশাকের বাহার হইছে। পাদরীদেগে নিয়ে এল। পাদরীকে কে কি বলবেক! গুড়খানা জেটেরা খুনের জাত হে! বন্দুক দিয়ে গুলায়ে দেঁয়। পাদরী বলে সব কেরেস্তান হও। তা ভীম সর্দার সাহস করে মানা করলেক। পার্শ্টিন সাহেব সাঁওতালদের সাহেব—তার কাছে খবর পাঠালেক! কিছু হল নাই। শ্যাম সাহেব পঁদর দিন পরেতে ফিরে গ্যেল বেনাগোড়ে—তাদের সাথে বিশু শালাও চলে গ্যেল। রুকনী টুকনীও গ্যেল। শুনছি নাকি বিশুর কুটুমের সেই ছেল্যাদের সঙ্গে সাদী হইছে।

—বেঁচে গেইছে হে, বেঁচে গেইছে সিধু মুর্মু! বিটী দুটো এখুন তো রাস্তাবন্দিতে খাটে হে। তাদের সেঁাগুষ্টি গেইছে। উ মেয়্যারা ভাল লয়। খারাপ বলে লোকে।

সিধু চুপ করে রইল। মনে পড়ল তার রুকনীকে। রুকনীর সঙ্গেই তার প্রেম হয়েছিল আর টুকনীর সঙ্গে দাদা কান্‌হুর।

—লাও হে হাঁড়িয়া জম করো। উয়াদের লেগে ভেবো নাই। তিড়িকটিড়িক মেয়্যা দুটা যে কত ছোকবার সাথে তিড়িকটিড়িক করিছে তার টিকানা নাই হে।

সিধু এবার হাঁড়িয়ার পাত্রটা থেকে খানিকটা খেয়ে একমুঠো মুড়ি বুটকলাই সিদ্ধ নুন দিয়ে খেতে খেতে কাঁচা লঙ্কা দাঁতে কেটে খেতে লাগল।

—মাংস খাও হে। এই খোরগোশের মাংস লাও। হাঁ, তুমি জবর শিকারী বট হে।

সিধু বললে—লিব মাংস, এখুন ভীম মাঝির কথা বুল। ভীম মাঝির কথা বুলছিলে, মাঝখানে ঝিকরুটা সব ভুলায়ে দিয়ে পুরানো পিরীতের কথা তুললেক। উরি লেগেই তো মেজাজ আবার চড়ে যায় হে! কুন সময়ে কুন তান দেখ।

লক্ষ্মণ বললে—হুঁ। ঠিক বুলেছ। অমনি হঁয়ে যায়, কি করব কও? দুখ দুখ আর দুখ—দুখ তো পাহাড় হঁয়ে গেইছে হে। বুকে শালা চেপেই রইছে। তাই বুঝেছ ভাই। দুখ-দুখ আর কত করব হে। অমন একটা কাঁড়াকে এ—ই এইটুকুন থেকে পাললম, বড় হ'ল, জোঁয়ালে গতালম—বাস্, শালা কি হল কে জানে—সনঝেবেলাতে গোয়ালে ভরলম, সকালে দেখি শালা ঠ্যাং চারটেকে তুলে ঠিরকাটি করে দাঁত ছিকুড়ে হাই পড়ে আছে! যাঃ শালা, মরেই গেইছে। কাঁদলম—এখুনও কাঁদি হে। তা কাঁদব কত বুল?

সিধু বললে—তু থাম হে। তু একটো উজবুক।

—দেখ্ হে দেখ।

সিধু ঝিকরুকে অবজ্ঞা করে বললে—ভীম মাঝির কথা বুল ভাই নিমু। কি হল মাঝির? এত বড়ো একটা মাঝি হে। কি হইছে তার?

নিমু বললে—ভীম মাঝিকে এমুন হাঙ্গামায় ফেলালছে ওই দিকু কেনারাম ভকত। আমাদের ভকত বুলছিল কেনারাম তাকে জেহেলে দিবে।

—কেনে! কথাটা বললে ঝিকরু। ভীম মাঝির জেল হয়েছে এ কথাটা যে অসম্ভব।

নিমু বললে—ধান ধার লিয়েছিল। বারো শলি ধান। গ্যেলবার আকাড়া গেইছে! তা বারো শলি ধান লিয়েছিল, তার লেগে ইবারে বাঁধনার পরে হিসেব করে এল, কেনারাম

বুললে—সুদে আসলে একশো শলি হইছে। তা ধান ভাল হইছিল। জমিনও অনেকগুলান আছে। তা দিয়ে এল একশো শলি। তা পরেতেও ভীম মাঝি বাঁধলে দু দুটো ধানের বাখার। খবর শুনলে ভকত। শুনে দু মাস পরে এসে বুললে—ধান দে মাঝি। একশো শলি।

ভীম বললে—সি কি ভকত, সিদিন যি দিলম তোকে একশো শলি।

ভকত বললে—তা দিলি, সি তো তু তিন বছর আগে যে ধান লিয়েছিলি, তার দরুন বাকী ছিল আধ শলি।

—সি তো তুকে বলেছিলম আর দিতে পারব নাই গ। সিবার আট শলিতে তুকে একশো শলি দিলম। আধ শলি বলেছিলম দুব নাই।

ভকত বললে—তু বললি আমি বলি নাই। সিটো খাতায় লিখা ছিল, আমার মনে ছিল নাই। ইবার ধান নিয়ে গিয়ে খাতা লিখতে গিয়ে দেখি সেই আধ শলি ক বছরে একশো শলি হয়ে হাঁ করে রয়েছে। তুর ইবারকার একশো শলি যেমন লিখলম অমনি পুরনো হিসেব গিলে দিলে। কি করব? খাতার হিসেব সি যদি খেয়ে দেয় তো আমি কি করব। এখন সেটোই শোধ গেল, ইবারের একশো শলি আবার ই ক'মাসে বাড়ল, বেড়ে দেড়শো শলি ছাড়ায়ে গেইছে হে। তু তো ধরম মানিস। লক্ষ্মীর খাতা—সে খাতা খেয়ে দিলে আমি কি করব। তাকে খেতে দিতে কোথা থেকে ধান আনব বল।

ভীম মাঝি পেথম চুপ করে রইল। কি বলবে ভেবে পেল না। তারপরে বুললে—আবার একশো শলি দিব তো খাব কি গো ভকত? ভকত বললে—আবার লিবি। দিব। আর না-হয় তো তুর জমিন চার বিঘে লিখে দে! কি গো সব মাঝিরা বল কেনে, আমি অধরমের বাত বললম? সবাই চুপ করলে। কি বুলবে? ভকত তো ধরমের বাতই বুলেছে। লক্ষ্মীর খাতা খেতে চাইছে তা সে কোথা থেকে আনবে? দিতে হবে। সবাই চুপ। কিন্তুক ভীম বুললে—মাথায় তার খুন চাপল না ভুত চাপল—কে জানে, বুললে—না—জমিন দিব না।

ভকত বললে—তবে দে ধান দে।

হাঁকিড়ে উঠল ভীম—না না না। ধানও দিব না। তুর লক্ষ্মীর খাতা খেতে চাইছে—তু দেগা। আমি দিব না।

ভকত তখন তাতলে—বললে—দিবি নাই?

—না।

—দিবি নাই?

—না না না। দিব না দিব না দিব না।

তখন ভকত, সি কেনারাম ভকত, হুকুম দিলে চাপরাসীকে—লে তবে; ভাঙ মরাই। মাপ ধান।

ভীমের মাথায় খুন চাপল, সে আপন কাঁড় নিয়ে দাঁড়ালেক—যে আদমী মরাইয়ে হাত দিবেক তার জান লিব আমি। আর মাঝিদের বললে—নিয়ে আয় কাঁড় ধনুক। নিয়ে আয়।

তখুন কেনারাম বললে—থাক। তা হলে তোর কাঁড়া গরু বাছুর কোরক' করছি আমি—খোল্ কাঁড়া গরু খোল্। একটা কিছু দিতে হবেক। হয় ধান নয় জমিন, নয় কাঁড়া গরু।

—দিব না দিব না দিব না, বলে হাঁক মেরে গাঙাড়ে উঠল ভীম। কেনারাম ভকত খানিক ভাবলে, তাপরেতে বললে—এই গাঁয়ের লোক সাক্ষী রইল যে আমার কোরক ভীম মাঝি জবরদস্তি করে ফিরায়ে দিলে। আমি নালিশ করব। আদালতের কোরক আনব।

—বুঝলি কিনা বারহেটে মহিন্দর ভকতের উখানে এল কেনারাম। তাপরেতে দারোগাকে খবর গেলে। প্যাটমোটা মহেশ দারোগা এল—খানাপিনা করলেক। সিদিন তিনটে দিশু মেয়ে দিলে গা হাত পা টিপতে। তাপরেতে শলা করে জঙ্গিপুরের আদালতের সেই তকমাপরা প্যায়দা এল—সব দলবল নিয়ে কেনারাম গেলছিল আদালতের কোরক লাগাতে। তা ভীম তখুন পান্টিন সাহেব হাকিমের কাছে দরখাস পাঠালছে। জবাব আসে নাই। তবু সি গাঁয়ের লোক জুটায়ে কাঁড় ধনুক নিয়ে রুখে দিলেক। দিলে না কোরক করতে। ফেসাদ লাগল। ইবার অনেক সিপাই নিয়ে এসে ভীমকে ধরে নিয়ে গেলছে। জেহেলে ভরে রাখছে। লোকে বুলছে ফাটক হবে ভীম মাঝির।

ঝিকরু বললে—কই আমরা তো শুনলম নাই।

—কি করে শুনবি? তাকে তো ই পথে আনে নাই—ওই হেরণপুরের হাট হঁয়ে যে পথটো গেইছে উদিকে জঙ্গিপুর রাজমহল গঙ্গা পেরায়ে সেই পথে নিয়ে গেলছে।

—বড় ভাল লোক ছিল হে ভীম। জেহেলে দিলেক তাকে।

লক্ষ্মণ বললে—সাঁওতালরা বাঁচবেক নাই হে। মরবেক। বিলকুল সব মেরেই ফেলাবে হে। এক রক্ষে কিরিস্তান হলে। পাদরী বাবারা খানিক আদেক দেখে।

এ কথার উত্তর কেউ খুঁজে পেলে না। চুপ করে বসে রইল। সামনে খাবার পড়ে রইল, হাঁড়িয়া পড়ে রইল—সে খেতেও কারুর ইচ্ছে হল না। সিধুর কোলের মধ্যে গামছায় বাঁধা খরগোশের বাচ্চাটা চিৎকার করে উঠল—কখন যে সিধু তার মাথার উপর রাখা হাতটা দিয়ে সেটাকে মুঠো শক্ত করে চেপে ধরেছে তা সে নিজেও বুঝতে পারে নি! হঠাৎ চিৎকারেও সিধু বুঝতে পারলে না কি হয়েছে—কেন সেটা চিৎকার করছে! তার রাগ বেড়ে গেল। সে অকৃতজ্ঞ খরগোশের বাচ্চাটাকে ধরে মুঠোটা আরও কঠিনতর করে টিপে ধরে দাঁতে দাঁত ঘষে 'মর শালা' বলে আছড়ে ফেলে দিলে সামনের পাথরটার উপর। তারপর আবার বললে—শালা! বাঁচালম জল থেকে তুলে। তবু শালা চেঁচাইছে। শালা—

খরগোশের বাচ্চা বাঁধা গামছাটা হঠাৎ রাঙা হয়ে রক্তে ভিজে গেল। গামছাটা একটু নড়েই বাস্ স্থির হয়ে গেল।

লক্ষ্মণ বললে—মরে গেইছে।

সিধু বললে—হঁ। তারপর টেনে নিলে হাঁড়িয়ার ঠিলিটা।

ঠিলিটা তুলে কাত করে ধরে খানিকটা হাঁড়িয়া খেয়ে বললে—চল হে। উঠ সব!—বলে সর্বাগ্রে সে নিজেই উঠে দাঁড়াল। এবং বিদায় নমস্কারের জন্তে বাঁ হাত ডান হাতের কনুইয়ে ঠেকিয়ে বাড়িয়ে দিলে।

তার হাত ধরে নিমু বললে—তু আর বারহেটে আসিস না। খানিক 'সতর' (সতর্ক) হয়ে থাকিস। ভকত বড়া বদমেজাজী বটে। শালা বাঘের মতুন। বুঝলি—কখন যে ঝাঁপ দিবেক। তুকে উ চিনে রাখলে।

ঝিকরুর কি হল কে জানে, সে হঠাৎ আস্ফালন করে বলে উঠলো—শালা আমরাও পাদরীর কাছে গিয়া কিরিস্তান—

কথা সে শেষ করতে পারলে না। সিধু বাঘের মত হাঁক মেরে লাফ দিয়ে এসে পড়ল তার কাছে, তাকে মারবে সে।

কিন্তু বাধা দিলে নিমু মাঝি। সে দুহাত বাড়িয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললে—হেই ভাই! হেই সিধু মুর্মু!

সিধু থমকে গেল। হয়তো একটু লজ্জাও হল। মনে পড়ল আজই একটু আগে তাকে চড় মেরেছে। কিন্তু নিষ্ঠুর কথা না বলে পারল না; বললে—কিরিস্তান হবি? ফিরেবারে বুললে তুর জিবটো টেনে আমি ছিঁড়ে ফেলাব। আমার টুংরা কুকরনটাকে খেতে দিব। বলে দিলম। তারপর সে মুখে বললে—জোহর জোহর সবাইকে জোহর হে তুদের? অর্থাৎ প্রণাম প্রণাম সকলকে প্রণাম—বলে চলতে শুরু করলে। হঠাৎ মনে পড়ল গামছা-খানার কথা, নুন বাঁধা চাদরটারও কথা, ফিরে এসে সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে কাঁধে ফেলে চলতে লাগল।

কিছুদূর এসে দাঁড়াল সঙ্গীদের জন্যে। একটা দুরন্ত ক্রোধ তার মনের মধ্যে যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে। বারহেটের বাজারে যা হয়েছিল তা যেন আকারে উত্তাপে অনেক বড় অনেক প্রখর হয়ে উঠেছে।

অরণ্যবাসী আদিম মানুষের মন—তার উপর বাল্যকাল হতে দুরন্ত দুর্দান্ত সিধু। প্রতিহিংসা ক্রোধ সেখানে কালো কেউটে সাপের মত নিষ্ফল আক্রোশে ছোবল মারছে মাটির উপর পাথরের উপর।

তার থেকে ঝরছে সেই কামনার বিষ। সেই কামনা—'মরে যায় যদি সব দিকুরা সব পুড়খানা জেটেরা মরে যায়। যদি সে পায় মরংবোঙ্গার বর, তাকে যদি বোঙ্গা সেই টাঙ্গি দেয়—যাতে সবাইকে সে কেটে ফেলতে পারে।'

চকিতে মনে পড়ল কিছুক্ষণ আগে সেই বনবিড়াল আর খরগোশটাকে এক কাঁড়ে মারার কথা। সে মনে করেছিল যদি এক কাঁড়ে মারতে পারে দুটোকে তবে সে পাবে সেই টাঙ্গি।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল গামছায় বাঁধা মরা খরগোশের বাচ্চাটার কথা। মনটা কেমন হয়ে গেল। সেই গামছাটাকে টেনে নিয়ে গিঁট খুলে মরা বাচ্চাটাকে বের করে ফেলে দিলে ছুঁড়ে।

এঃ—পাথরে এমন আছাড় মেরেছে যে বাচ্চাটার মাথা চুর হয়ে গিয়েছে! এঃ।

সারা পথটা সে কারুর সঙ্গে কথা বলে নি। সঙ্গীরাও তাকে ডাকে নি, ডাকতে সাহস করে নি। অল্প পিছনে থেকেই তারা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে আসছিল।

সবই ওই ভীম মাঝির কথা, ভকতের কথা। আজকের কথা।

সে শুধুই ভাবছিল ওই কথা। অসম্ভব কথা সব।

এসে সে গ্রামের বাইরে এই জহর সর্ণায় দাঁড়িয়েছিল। ওই শালগাছটার দিকে তাকিয়েই সে বার বার মনে মনে বলেছিল—মরংবোঙ্গা হে! তুমি মেরে দাও—ওই শালা দিকুদিগে মেরে দাও। লইলে তুমার টাঙ্গি দাও। আমি সব কেটে দিব। মরংবোঙ্গা হে!

এতক্ষণে সঙ্গীরাও পাশে দাঁড়িয়ে বোঙ্গাকে নম করে নিলে।

সিধু ফিরে তাকালে ঝিকরুর দিকে। বললে—এমুন কথা আর কখনও বুলবি না। কখুনও না। ইথেই তো এই হাল হছে সাঁওতালদের।

সকলেই বললে—হঁ তা বটেক। ঠিক বুলেছে সিধু।

ঝিকরু কিন্তু মানতে পারল না। সে প্রথমবার চড় খেয়েও সহ্য করে গিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বারের এই অপমান তাকে অত্যন্ত আঘাত করেছে। বড় বেজেছে তাকে। তার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল—তারপর সামলে নিয়ে সে বললে—তা হলে বাঁচি কিসে বল হে? ভীম মাঝির মতুন লোকটা—। আর সে কথা খুঁজে পেলে না।

সিধু বললে—বাঁচবি। বাঁচবি। বুঙ্গা বাঁচাবেক। আমি ইশেরা পেলম।

চমকে উঠল সকলে।—ইশেরা পেলি?

সিধু বললে, তাহলে বুলি শুন, বোস।

সেইখানেই বসে সে তাদের বনবিড়াল আর খরগোশটাকে এক তীরে বেঁধার মধ্যে যে ইশারা পেয়েছে তাই বিস্তার করে বললে।

ঠিক এই সময় আকাশে প্রথম মেঘ চমকে উঠল।

সকলে আকাশের দিকে তাকালে। আকাশ যেন কালচে সীসের আস্তরণে ঢেকে গেছে। গাছপালা সব স্থির। পাতা নড়ে না। বড় শালগাছের মাথাটার দিকে তাকালে সিধু। সবুজ পাতাগুলোর গায়ে যেন ভুসো কালির আস্তরণ পড়ছে মেঘের ছায়ায়।

সিধু বললে—বাবারে, কারীদাং বিমীল বাকাপ পানা! (ভীষণ কালো মেঘ উঠল হে।)

—বিজলী মাল্‌কাও কানা! (বিদ্যুৎ চিকুরছে হে!)

—দা গায়! (জল হবে।)

—মারংহায়েদা গায়। (ঝড় হবেক হে।)

ঝিকরু বললে—আমার ঘরের চালটো আবার ফুটো আছেক হে।

—থাকবেক নাই! তু তো কেবল লেচে বেড়াবি হে।

—কি করব হে? দুখ আর কত করব বল্! হি হি করে হেসে উঠল। সাধে বলি হে—

বলেই জিভ কাটলে। বলতে যাচ্ছিল সে—সাধে কি বলি হে কিরিস্তান হয়ে যাই—পাদরী বাবাদের কাছে সুখে থাকি। কত-সুখ সিখানে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগের কথা মনে পড়ে চমকে উঠেছে। ভাগ্যিস সিধু শালগাছের মাথার দিকে তাকিয়ে আছে! কি ভাবছে! কথাটা শোনে নি। কিংবা গ্রাহ্য করে নি।

আবার একবার বিদ্যুৎ চমকাল। সিধু দেখলে কালো মেঘের গায়ে জলন্ত রূপালী আঁকাবাঁকা হিজিবিজি দাগে কত কিছু যেন লেখা হয়ে গেল।

সে বললে—বুঝলি হে?

—কি হে?

—আরও ইশেরা পাব হে। মনে লিছে কি জানিস?

—কি?

—ওই ডাক ডাকতে ডাকতে আর আগুন ঘুরাতে ঘুরাতে মরংবোঙ্গা ইবার নামবে মাটিতে। হঁ। মন লিছে আমার।

আকাশের দিকে তাকিয়েই বলছিল সে।

মেঘে তখন কড়কড়ে বৈশাখী ডাক শুরু হয়েছে। ঝিকরু তার ঠোঁটটা উলটে দিলে।

সনসন শব্দের একটা ইশারা আসছে বহুদূর থেকে। ঝড়! ঝড় আসছে!

—উঠ হে। চল্। চল, ঘরকে চল।

সিধু উঠল। কাঁধে চাদরে বাঁধা নুন আছে সকলের, বৃষ্টি পড়লে ভিজে যাবে। ভিজলে বুলুং পানি হয়ে গেল।

—চল্।

গ্রামের ধারে এসে তারা পৌছুল যখন তখন ঝড়ের মাতামাতি শুরু হয়েছে। খুব প্রবল তখনও হয় নি। মেয়েরা ছুটোছুটি করছে। জিনিসপত্র টেনে ঘরে আনছে। চ্যাটাই, খাটিয়া, মেলে দেওয়া কাপড়। শুকনো কাঠ, শুকনো পাতা। কতক মেয়েরা ছেলেদের নিয়ে গরু বাছুর ছাগল ঘরে ঢোকাচ্ছে; পুরুষেরা দাঁড়িয়ে দেখছে পশ্চিমের কালো মেঘের কোলে পুঞ্জীভূত লাল ধুলো।

—হু হু। মারংহায়দা, মারংহায়দা! ঝড়! ঝড়!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় প্রবলবেগে গোটা শালবনটাকে যেন শুইয়ে দিলে। তার সঙ্গে উড়ে আসা ধুলোর সব ধূলাকীর্ণ হয়ে সমস্ত আকাশ পৃথিবী এক করে দিলে।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। এবার জোরে। কড় কড় কড় কড়!

জিনিসপত্র সামলে ফুল বসেছিল দাওয়াতে। পাশে বসেছিল বড় ছেলেটা—কোলে ছিল তার ছোটটা। সে বলছিল—আর বাবারে।

সিধু এসে দাওয়ায় বসেছিল গম্ভীরভাবে, স্থির হয়ে মেঘের দিকে চেয়ে। মেঘ ডাকতেই ফুল উঠল—বড় ছেলেটাকে বললে—উঠ্ উঠ্। ঘরকে চল্। স্বামীকে বললে—উঠ্ হে। ঘরকে চল—

—তু যা হে, আমি দেখি—

ঠিক সেই মুহূর্তেই বাজটা পড়েছিল। সমস্ত বিশ্বসংসার যেন সাদা আলোর ঝলকানির মধ্যে হারিয়ে গেল।

এর কিছুক্ষণ পর পর্যন্তও সিধু যেন স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে বসে ছিল। তখন থেকেই তার

মনে হয়েছিল এটা সেই ইশারা যে ইশারার কথা তার মনে হয়েছিল। বোজার শাল গাছে পড়েছে পড়ুক। বোজা এবার গাছ থেকে তা হলে মাটিতে নামল। সে যা বলেছিল ঝিকরুদের তাই ফলল। বুকের ভিতরটা তার দগদগ করছে। সে তখন থেকেই করছে।

সেই ভকতের অপমান। তারপর ভীম মাঝির কথা। তার সঙ্গে রুকনীর কথা টুকনীর কথা। তার ভগিনপোত আর বোন মানকীর কথা।

কিরিস্তান হয়ে গিয়েছে রুকনী টুকনী। নিমু বললে—খারাপ মেয়্যা। মানকী আর তার ভগিনপোতের কথা বললে না বটে তবে মনে হল তারাও কিরিস্তান হয়ে গিয়েছে।

সেই কথা আজ অর্থাৎ ঝড়ের পরের দিন চূড়া মাঝির মা তুলেছিল। মনটা তার খারাপ হয়ে আছে। তার সঙ্গে গ্রাম জুড়ে এই মন্দ কথা—বোজার গাছের মাথায় বাজ পড়ল। এবার সর্বনাশ হবে। এ কথায় তার মন মেজাজ আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সে যা ভাবছে বুঝছে সে কথা কেউ বুঝছে না। কারুর সঙ্গে মিলছে না। মন তার আরও খিঁচড়ে যাচ্ছে।

একমাত্র কান্হু দাদা তার কথা বিশ্বাস করে। তাকে সে কথাগুলো বলেছে। সে বলেছে —হঁ। তু যা বুলছিস্ আমারও তাই লাগছেক হে। তবে এখন চুপ করে থাক। ভাল করে আরও বুঝ করে লে।

সান্ত্বনা তার এইটুকু। সব থেকে খারাপ লাগছে সে ফুলকে বলতে পারছে না। ফুল যে মেয়ে তাতে এ সব কথা শুনে বিশ্বাস তো করবেই না, উলটে ভয় পাবে এবং দিদি টুশকিকে বলবে। আর টুশকির যা কথা আর চেঁচানি সে পাড়া মাথায় করবে। আর বলবে। দেখ্ হে দেখ্ শুন্ সব শুন্, এই বিদুয়াদের কথাটো শুন্। ফুল হয়তো কাঁদবে।

মনে পড়েছিল তার রুকনীকে। রুকনী যে মেয়ে ছিল সে হলে তা করত না। কখনও না। হোক তিড়িকটিড়িক মেয়ে, হাসুক সে খিলখিল করে, ধেই ধেই করে বেড়াক সে ছুটে, হোক সে মরদের গায়ে পড়া, তবু সে মেয়ের জাত আলাদা। সে বিশ্বাস করত।

এই সবই সে ভাবছিল খাটিয়ায় কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সকাল। কাল প্রবল বৃষ্টি হয়েছে ঝড়ের সঙ্গে। বেশ মৌজ হয়েছে। তবু ভাল লাগে নি। হঠাৎ সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেছে। চলে এসেছে সে সেই জহর সর্ণায়। জহর সর্ণার পাশেই যে ছোট পাথরের চত্বরটায় তাদের গ্রামের পঞ্চায়েতদের মজলিস বসে সেখানে—যে জায়গায় তার বাপ চুনার মাঝি বসে—সে সেইখানে বসে পাথরে হেলান দিয়ে ভাবছিল।

ভাবছিল রুকনীর কথা। মানকীর কথা। টুকনীর কথা। তার ভগিনপোতের কথা।

মানকী তাদের ছোট বোন। সবচেয়ে ছোট। ভারী মিষ্টি মেয়ে, দেখতে বড় ভাল। কিন্তু তার বুদ্ধি কম, আর বড় বেশী ঝোঁক। সবচেয়ে তাকে ভালবাসত তারা দুই ভাই, সিধু আর কান্হু। ছেলে বয়সে তাদের তিনজনের একটা ছোট দল ছিল। ভাইদের সঙ্গে ছোট মেয়েটা সমানে ছুটত, ঘুরে বেড়াত। সিধু কান্হুর প্রথম কুকুর দুটোকে সেই বেশী যত্ন করত। ছোট ধনুক তীর নিয়ে তারা দু ভাই বের হত, সঙ্গে কুকুরের বাচ্চা দুটো যেমন

তাদের সঙ্গে ছুটত, দাঁড়ালে কাটা লেজ নেড়ে নেড়ে চারিপাশে ঘুরে ঘুরে নাচত, মানকীও ঠিক তাই করত।

তারা তখন মোষের শিংয়ের মাথা পরানো তীর নিয়ে ঘুরত, এই জহর সর্দার কাছে এসে ওই যে ভেঙেপড়া মুড়ো শালগাছটা আজও দাঁড়িয়ে আছে ওইটেকে চাঁদমারি করে তীর ছুঁড়ত, সঙ্গে সঙ্গে কুকুর দুটোর সঙ্গে ছুটত মানকী, তীর কুড়িয়ে আনবার জন্তে। তীর নিয়ে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করত। সে ষোল সতের বছর আগের কথা। তখন কানুর বয়স বারো বছর, সিধুর বয়স এগারোর কাছে। সিধুর চেয়ে মানকী তিন বছরের ছোট—তখন সে সাত আট বছরের 'হপন্‌কুড়ি'—ছোট মেয়ে। ঝাঁকড়া ছোট চুল—সেই চুলেই তার তখন ফুল গোঁজার শখ, দিনে দশবার ফুল এনে দিতে হত, নইলে কেঁদে কেটে তুমুল কাণ্ড করত। কারণ ছোট চুলে ফুল গুঁজতো আর পড়ে যেত, আবার তুলে পরিয়ে দিতে হত। বারকয়েকের মধ্যে ফুল যেত খারাপ হয়ে—তখনই সে ফুল ফেলে দিয়ে আবার নতুন ফুলের জন্ত আবদার ধরত। এ যোগাতো তারা দুই ভাই!

মানকী হবার কিছু দিন—বছর তিনেক পরেই মা মারা গিয়েছিল; চুনার মাঝির তখন অনেকটা বয়স—পঞ্চাশের উপর; চাঁদ ভৈরবের বিয়া হয়ে গিয়েছে—বড় বউয়ের দুটো গিদ্‌রা, মেজ বউয়ের একটা হয়ে আবার একটা পেটে; তা ছাড়া চুনার মাঝির বাড়ির পাশে থাকত তার দিদি, তার ছেলেপিলে ছিল না; ভাইয়ের খেতে খামারে পাটকাম করত; চুনার-ই তাকে খাবার ধান দিত, কাপড় দিত; বুড়ীও পাঁচরকম কাম জানত, ডালা কুলো বোনা— আর পারত পরিপাটি ঘর নিকানোর কাজ। দেওয়ালের বাইরে গোবর মাটির লেপন দিয়ে আঙুল দিয়ে এমন খেজুরপাতার ছক কাটত যে দাঁড়িয়ে দেখতে হত। চুনার সেই দিদিকে বলেছিল —কানু সিধু পাঁচ ছ বছরের হইছে, মানকী তিন বছরের। সব কটা বড়া বেবাগা বেটেক। দেখিস তো কাঁড়া গরু ছাগল চরাতে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে বনের ভিতর ঢোকে। বউ দুটোর কোলেপিঠে গিদ্‌রা গিদ্‌রী—আবার পেটে রইছে। তু এসে ইবার ঘরে থাক। উদিগে দেখ। বউটো মরে গেল। উরই সঙ্গে তুর বনত নাই। ইবার ঘরকে এসে থাক।

সেই পিসী, 'বড়কী হাতম' মানুষ করেছিল তাদের তিনজনকে। তবে সব থেকে মায়া ছিল তার মানকীর উপর। মানকীকে সে বের করে দিত তাঁর নিজের বালিকা বয়সের পুঁতির মালা লাল কাঁটির মালা। নিজের পয়সা থেকে কিনে নাকে পরিয়েছিল পিত্‌রার (পিতলের) মিনি। হাতমের (পিসীর) সঙ্গে 'হিলি'দের (বউদিদের) বনত না। ঝগড়া হত। মানকী ভাইপোদের কোলে করলে পিসী হাঁ-হাঁ করত। বলত—নামা, নামা বুলছি। তু কতুটুকুন—ওই ভারী গিদ্‌রা কোলে করে কুমড়োর মত ভাবাপারা হয়ে যাবি। নামা।

এমনি করেই পিসী চাঁদ ভৈরবের বউদের সঙ্গে আলাদা হয়ে একটা সংসার পেতে নিয়েছিল। 'হিলি'রাও খুব ঝগড়া করত।

চুনার চুপ করে থাকত। চাঁদ ভৈরব প্রথম প্রথম বউদেরেই বকত—তারপর ক্রমে আলাদাই হয়ে গেল। এদিকে কানু সিধু বড় হয়ে উঠল। অবাধ স্বাধীনতায় দুই ভাই এই

বাগনাডিহির চারিদিকের জঙ্গলে ছুটে বেড়াত। মানকী হত তাদের সঙ্গী। প্রথম যেবার একটা বড় হেঁড়োল মেরেছিল দুই ভাই সেবার মানকীও ছিল। কিন্তু মানকী হেঁড়োলটার নখের 'হাঁজর' (আঁচড়) খেয়েছিল কাঁধে। সে তারই নির্বুদ্ধিতা। দুটো পাথরের আড়ালে বসে দু ভাই হেঁড়োলটাকে দু পাশ থেকে মেরেছিল চার-চারটে কাঁড়। লোহার ফলাওলা কাঁড়। একটা বুকে একটা পেটে একটা কানের কাছে আর একটা কোমরে। হেঁড়োলটা চীৎকার করে মাটির উপর গড়াগড়ি খেয়ে যখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে তখন আচমকা মানকী সিধুর টাঙিটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল পাহাড়ের আড়াল থেকে এবং সেই টাঙিটা দিয়ে হেঁড়োলটাকে কোপাতে গিয়েছিল কিন্তু হেঁড়োলটা শেষ চেষ্টায় দাঁড়িয়ে উঠে তার কাঁধে দুই থাবা দিয়ে ধরেছিল। তবে পড়েও গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। ততক্ষণে সিধু কানু দুজনে ছুটে এসেছে এবং সিধু সেটার গলায় পা দিয়ে চেপে দাঁড়িয়ে কানুকে বলেছিল—শালার কোমরে মার টাঙি।

কানু তাই মেরেছিল। কোমরটা প্রায় আধখানা কেটে গিয়েছিল। সিধুর পায়েও আঁচড় মেরেছিল হেঁড়োলটা পিছনের পা বাড়িয়ে। কিন্তু 'হাতম' হাউমাউ করেছিল মানকীকে নিয়ে। বলেছিল—ভাই কিনা। ভাইরা 'সিসেরা'দের একেবারে দেখতে পারে না। ওরা হল ভাইদের চোখের কাঁটা।

মানকীকে বলেছিল—আবার যদি ভাইদের সঙ্গে যাবি তো তুকে আমি ঝাড়ু মারব। আর তু বড় হলছিস ডবকা হলছিস—আদাড়ে পাদাড়ে যাবি তো ভূতে দানা দত্যিতে তোকে ধরবে।

সারতে দু-তিন দিনের বেশী লাগে নি। কিন্তু মানকীকে হাতম চোখে চোখে রাখত। তাকে সাজাত গোজাত আর গল্প বলত।

বলত ভাই বোনের গল্প। "এই তুর মতুন (অর্থাৎ মানকীর মত) এক মেয়ে ছিল, আর ছিল তার সাত সাতটা দাদা। দাদারা আর দাদাদের বউয়েরা দু চোখে দেখতে লারত সিসেরাটাকে ছুটু বুনটোকে। বুনটো খুব ভাল ছিল—খুব ভাল।

সাত ভাই রাজার পখুর কাটছিল। বুন যেতো ভাইদিকে খাবার দিতে। পখুরটা কাটা শেষ হইছে—জল খানিক খানিক বেরালছে, তখুন একদিন বুনটা গেলছে খাবার দিতে আর ভাই সাতটা করলেক কি, গুজুগুজু করলেক—বুনটাকে আর কত খেতে দিব হে। তার চেয়ে এক কাম কর—উকে মেরে ফেলা, আর এই পখুরের মাঝখানে 'গাঢ়া' খুঁড়ে পুঁতে দে। সবাই বুললে—হাঁ হাঁ, খুব ভাল কথা ; বুনের লেগে বউরা হাসছে না, রাগ করছেক, আর খেতে দিতে হছেক। তা তাই কর।

তাই করলেক তারা। দিলে তাকে মেরে গাঢ়া খুঁড়ে পুঁতে। দিয়ে বাড়ি চলে গেল সাত ভেয়ে। গাঁয়ে গিয়ে বললেক তাকে বাঘে নিয়ে গেল। বউরা সব জানত! তারা ঘরে ঢুকে সাত বউয়ে হাসতে লাগল—হি হি হি—হি হি হি।

এখুন মরংবোঙা দেখলেক। সি বুললে—তু বাঁচ গ। তু ভাল মেয়া। জহর সর্দার মাডুলি দিস, আমাকে নম করিস। ভাল মেয়া তু বাঁচ।

বাঁচল ম্যেয়া। তবে ম্যেয়া হল না। ওই পখুরে যিখানে তাকে গেড়েছিল সেইখানটিতে একটি পদ্মফুল হয়ে বেঁচে গেল।

এখুন রাজা একদিন পখুর দেখতে এল। এসে দেখে পখুরের মাঝখানটিতে একটি রাঙা টুকটুকে পদ্মফুল ফুটিছেক। তা ভাল লাগল। তো চাকরদিকে বুললে—তুলে আন্ হে।

চাকরটা নামলেক জলে। তো হল কি? চাকরটো যত গেল ফুলটো ততো সরে সরে গেল, ইদিকে গেলে উদিকে যায় উদিকে গেলে ইদিকে আসে।

রাজা বুললে—ই তো মজার ফুল বেটে। ইটি আমি লিবই হে।

ফুল তখুন বুললে—

রাজা হাত বাড়ালে পায়—
চাকর বাড়ালে হারায়।
চাকরের হাত জোরে টেনে ছেঁড়ে—
রাজার হাত তোলে যতন করে।

রাজা তখুন নিজে নামল। নেমে খানিকটা গেলছে আর ফুলটি এসে আপনি রাজার হাতে লাগল। রাজা যতন করে তুলে এনে যেই পালকিতে উঠেছে আর ফুলটি সে-ই ম্যেয়া হয়ে গেল।

রাজা বুললে—আমি তুকে বিয়া করব। তু আমার রানী হবি।

ম্যেয়া বুললে—মরংবোঙ্গা তারই লেগে আমাকে তোর পখুরে পদ্মফুল করে ফুটালেক। আমি তুকে খুব যতন করব। তু শুশুড়ে ম্যেয়া আনবি, রেঁধে দিব। দাকা রেঁধে খেতে দিব। তোর গরুর যতন করব। ধান ভেনে চাল করব। আমি খুব ভাল ঘর নিকাতে জানি। পুঁতির মালা গাঁথতে পারি। তু আমাকে পুঁতির মালা দিস—গলাতে হাঁসুলী দিস—হাতে শাঁখের বালা দিস। আর লাল লাল ফুল এনে দিস খোঁপাতে পরব।

রাজা বুললে—হোক্। তাই দিব।

এই খুব মাদল বাজালে সিরিং করলে খুব নাচলে—হাঁড়িয়া জম করলে। খুব ভোজ করলে। অ্যানেক শূয়োর খাসী কাটলেক। এতোটো করে গুড় দিলে।

তখুন রাজার নতুন বউ বললেক—তুর যারা পখুর কেটেছে সাত ভাই তাদিকে ডাক। তারা আমার ভাই বেটে। তাদের সাত বউকে ডাক।

এই রাজা তাদিকে ডাকলেক।

তারা এল। এসে বুন রানী হলছে দেখে 'হাহাড়া' অর্থাৎ আশ্চর্য হলে গেল। 'আৎওৎ' মানে থতমত খেলে। আর খুব হিংসে হল। বুন তাদিগে যতন করে খেতে দিলে। তখুন, তারা মনে করলে বুনটাকে ওই উঠানে যে পাতকুয়াটি রইছে তাথেই ঠেলে ফেলে দিবেক।

বুন এল গুড় নিয়ে।

বড়কা দাদা বুললে—বুন জল আন্ হে।

বুন গেল কুয়ো থেকে জল আনতে। আর সাত ভাই সাত বউ তাকে ঠেল্যা ফেল্যা দিব বলে উঠল। যেই উঠল অমুনি বোঙ্গার হল গোস্সা। বোঙ্গা বুললে—মাটি, তু ফেটে যা।

যেই বলা, আর সাত ভাই আর সাত বউয়ের পায়ের তলা ফাঁক হয়ে গেল, কুমীরের হাঁয়ের মতুন। আর তারা তারই ভিতর কুথায় পড়ে গেল। বুন বললে—যাস না, ভাইরা যাস না। তখুনি মাটি আবার বুজে গেইছে।"

সিধুর সব মনে আছে। কিছু সে ভোলে নি।

বারহেটের নিমু মাঝি বললে—সেই মানকী কিরিস্তান হয়ে গিয়েছে। পিসী যতই যা বলুক মানকী সিধুকে কানুকে খুব ভালবাসত, তারাও বাসত। কিন্তু পিসী তাকে তিড়িক-টিড়িক ম্যেয়া করে দিলে। পাড়ার ছোকরারা তাকে দেখে ক্ষেপত। কিন্তু তার বাপ আর সিধু কানুর ভয়ে কিছু বলতে পারত না।

সিধু সেই সব ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। মানকীকে সেই বেশী রক্ষা করেছে সে সময়। চাঁদ ভৈরব দাদারা কি ভৌজিরা বকলে কিছু বললে সে ঝগড়া করত। বলত—বেশ করে। ফ্যাকফ্যাক করে হাসে তো কি হলছে? লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে—তাই বা কি হলছে? সাজগোজ করে বেশ করে। আরও করবেক!

বাবা চুনারও মধ্যে মধ্যে বকত। বলত—মুর্মু ঠাকুরের বাড়ির 'কুড়ি' অর্থাৎ বেটী তু। তুর লাজ নাই কেনে? বেহায়া কেনে তু? মুর্মু ঠাকুর সাঁওতালদের রাজা ছিল। হাঁ। সেই বাণী রাজা ছিল নরং বরু ধরতির সব চেয়ে উঁচু বরুর (পাহাড়ের) ধারে। সেখানে তাদিকে হারালে ওই হিঁদুদের এক রাজা ঠাকুর। তখুন সিথান থেকে পালায়ে এসে আবার বাণী রাজার ছেলে রাজা হল। সি কুথা বটে। সিথানে আমাদের জাতভাইরা আজও রইছে। সিথানে আবার এল তুরুকরা। তুরুকরা লড়াই করলেক—সি লড়াই খুব লড়াই। রাজার এক বেটী ছিল। সি বিটীকে বিয়া করতে ছত্রী রাজারা ক্ষেপল। তুরুকরা ক্ষেপল। তো লড়াই হল। লড়াইয়ে হারল মুর্মু ঠাকুর রাজা। মুর্মু ঠাকুর রাজাকে তুরুকরা বেঁধে ফেলালে। তখুন বিটী কি করলেক জানিস? বিটী লোক পাঠালেক কি—হাঁ আমি নিজে যাব কিন্তুক, তার আগে আমার বাবাকে ছেড়ে দিতে হবেক। তুরুক রাজা বললে—বেশ। তখুন রাজাকে ছাড়লেক আর বিটীর পালকি এল তুরুক রাজার কাছে। রাজা পালকি খুললেক—তখুন, দেখে বিটীটো বিষ খেয়ে মরমরো, মরছে। বুললেক—তুরুক আমি মুর্মু ঠাকুর রাজার বিটী—আমি ধরম দিব না হে। আমি মরলম। তখুন রাজা তার ছেলেপিল্যা নিয়ে সিথান থেকে চলে এল। এল হাজারীবাগের জঙ্গলে। সিথান থেকেও তাড়ালে তুরুকরা। তখন গেল রাঁচী। সিথান থেকে আমার বাবা আইছিল এই হাশ। তখুন আমি গিদ্‌রা বেটে। শুধা হাতমকে।

হাতম বলত—তু তাই রাজার ছেল্যা দেখে বিয়া দে বিটীরে, তবে বুঝি। উ রাজার ঘরের বিটী রাজার বিটীর মতুন হইছে। সাজে গোজে, হাসে, সিরিং করে। নাচে। দোষ কি করলেক?

চুনার বললে—সাঁওতালদের কপাল মন্দ হইছে দিদি। রাজা তো আর নাই গ। আমাদের জাতের রাজাগুলান আজ দিকু হঁয়ে যেইছে। বুলছে আমরা সাঁওতাল লই হে।

আমরা ছত্রী বেটে। আমরা মুর্মু লই। সিং হয়ে যেইছে তারা। আমরা কি করব? গরীব হয়ে যেইছি। খাটি খাই। জাতধরম মানি। মরংবোঙ্গাকে ছাড়ি নাই। কখুনও আবার যদি মরংবোঙ্গার ঘুমটো ভাঙে, সি যদি উঠে তখুন আবার হবে। এখুন যেমন কপাল তেমুনি চলতে হবেক।

মনে পড়ছে সেদিন নয়ন পাল তার পট দেখাতে দেখাতে বলছিল, এই দেখুন বাবুমহাশয়, এই একটা বাঁদরলাঠির গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে এই যে সাঁওতাল কন্তে, এই হল মানকী। তার দেখেন চুলে বাঁদরলাঠির হলুদ ফুল; এই দেখুন কেমন চোখ বড় বড়; গলার পুঁতির মালার সঙ্গে গেঁথেছে বাঁদরলাঠির ফুল। কালো রঙের লম্বা 'ছেয়ালো' মেয়েটাকে কেমন লাগছে! কন্তেটি নাকি সত্যিই সুন্দর ছিল। আর এই হল চুনার মাঝি, এই হাতম মানে পিসী —আর এই হল সিধু আর এই কানু। দুই ভাই চুনারের কথা শুনছে।

"চুনার বলে—শুন্ কুষ্টী মুর্মু ঠাকুর রাজগুষ্ঠী
মরংবোঙ্গার ছিষ্টি—অদৃষ্টের দোষে এই দশা—
প্রথমে দিকুরা তাড়ে তুরুকেরা তার পরে
বনে বনে ঘুরে ঘুরে হাতী থেকে হইলাম মশা।
তথাপি ধরমে মানি দিন খাই দিন আনি
দিকু করে টানাটানি দিনরাত সব কিছু ধরে—
সব দিই দিই না ধর্ম মুর্মু বোঝে তার মর্ম—
করে নাক ছোট কর্ম সাঁওতালে এই মান্য করে।"

নয়ন পালের পটের ছড়ায় আছে—চুনার মুর্মু ঠাকুর সেদিন বিটী মানকীকে উপলক্ষ্য করে বংশের অনেক কথা এবং অনেক উপদেশ সে ছেলেমেয়েদের দিয়েছিল।

কানু তাতে বলেছিল—আপা (বাবা), তবে তু পরগনাত হলি না কেনে?

পরগনাইত কতকগুলি গ্রামের খবরদারি করত। কথাটা আরবী বা পারসী কিন্তু এ পদের সৃষ্টি করেছিল সেকালে ইংরেজরা। এখনও সাঁওতাল পরগনায় পরগনাইত আছে। সেদিন পর্যন্ত ছিল। এখন পঞ্চায়েতী আমলে গিয়ে থাকলে থাকতে পারে।

সে যাক।

চুনার ছেলের কথা শুনে বলেছিল—সি তো 'পান্টিন' এর হাত। (মিস্টার পোটেন্ট ছিলেন সাঁওতালদের স্পেশাল অফিসার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে নতুন আবাদী জমি এলাকায় সাঁওতালদের কর্তা নিযুক্ত করেছিল, সাঁওতালেরা পোটেন্টকে 'পান্টিন' সাহেব বলত)। চুনার ভাই বলেছিল—সি তো পান্টিনের হাত বিটা। সি 'পুড়খানা জেটের' নোকরী হে। মুর্মু ঠাকুরের ছ্যেলা হয়ে নোকর হব কেনে হে! অ? তা পরগনাত চুনার মুর্মু ঠাকুরকে মানে কি না, বুল কেনে তু?

ছেলেরা চুপ করে ছিল। কথাটা চুনার মিথ্যে বলে নি। পরগনাইত ভগলু মাঝি এসে আগে হাত বাড়াত, তবেই চুনার মুর্মু হাত বাড়াত; বিচার হলে মাঝখানে বসত চুনার—তার

পাশে বসত পরগনাইত। তাও তারা দেখেছে।

চুনার সেদিন বেটী মানকীকে অনেক ভাল কথা বলে বুঝিয়েছিল। মানকী খুব কাঁদতে আরম্ভ করেছিল।—সে করলেক কি? কি মন্দ সে করলেক?

হাতম বলেছিল—কানিস নাই মানকী, উয়ার মুরদ নাই, ঘরকে ভাত নাই; উ আবার ধরম ধরম করছেক।

সিধুরও খুব ভাল লাগে নি। গাঁয়ের দু-তিনজনার অবস্থা তাদের থেকে ভাল। পরগনাইত ভগলু মাঝির কত ধান,—বড় বড় কাঁড়া—কত জমিন, তাদের বাবার সে সব নেই। বুড়া ঘরে বসে থাকবে আর মুর্মু ঠাকুরাই ফলাবে।

সিধুর সে সব মনে পড়ছিল।

তার জন্ম লিটাপাড়ার বিশু মাঝির ভাইপো লাল মাঝি এল—আর তার সঙ্গে লুকিয়ে পালিয়ে গেল মানকী। লাল মাঝি তাদের চেয়ে কিছু বেশী বয়সের ছোকরা—এই চুল এই বাহার, হাঁড়িয়া খায় আর গল্প করে বেনাগড়িয়ার; বেনাগড়িয়ায় তাদের কুটুম আছে লিটা মুর্মু; সে সাঁওতালদের বড় পুরুত কদমনায়েক আবার ওখানকার পরগনাইতও বটে। বেনাগড়িয়ার পাদরী বাবারা এসে সেখানে কিরিস্তানী গির্জা করেছে। পাদরী বাবারা তাকে খুব খাতির করে; লিটা মুর্মুও পাদরী বাবাদের কাছে যায়; লিটা মুর্মুর অনেক জমিন, অনেক কাঁড়া গরু। অনেক ধান পান। দিকুরা কিছু করলে পাদরী বাবারা খত পাঠায় বীরভূমের সাহেবের কাছে। অনেক ছোকরা সাঁওতাল কিরিস্তান হয়েছে; তারা লিখাপড়ি করছে। কুর্তা পরে তারা, দিকুদের মত বড় কাপড় পরে। পাদরীদের খত নিয়ে বর্ধমান মুলুকে রাস্তাবন্দিতে গিয়ে কাম পায়। অনেক পয়সা রোজগার করে তারা। লাল বছরে দু-তিনবার করে বেনাগড়িয়া যায়: পাদরী বাবাদের কাছে সে অনেক শুনেছে। লাল মাঝিকে সাহেব কতবার বলেছে বর্ধমানে কাম করতে যেতে, তা সে যায় নি। এবার সে যাবে।

এ গাঁয়ে লাল মাঝি এসেছিল হাঁসদাদের বাড়ি। লাল মাঝি, হাঁসদা। হাঁসদা হলেও লাল মাঝিদের খুঁত আছে, লাল মাঝির বাবা নিয়ম না মেনে এক হাঁসদা মেয়েকে বিয়ে করে সমাজে ছোট হয়ে গিয়েছে। অবশ্য লাল নিজে সে মায়ের ছেলে নয়। সে তার বাপের প্রথম স্ত্রীর ছেলে।

লাল হাঁসদাকে বড় বড় মাঝিরা ভাল চোখে দেখে নি, কিন্তু ছোকরাদের মধ্যে খুব জমিয়ে ফেলেছিল সে। সিধু কানুকে লাল কিন্তু খাতির করেছিল। সে সিধুর শিকার করা দেখে খুব খুশী হয়ে বলেছিল—আঃ, সিধু মুর্মু তু যদি বন্দুক পেতিস তবে তু আসমান থেকে চাঁদ পেড়ে আনতিস হে! বাহা বাহা! আচ্ছা তাগ তুর। আচ্ছা মরদ।

অশ্লীল কথা বলত লাল। বনের মধ্যে বীর সিরিং (শিকারের গান—অশ্লীল এর বিষয়-বস্তু) গেয়ে মাতিয়ে তুলেছিল।

এই লালের সঙ্গে একদিন রাত্রে পালাল মানকী।

হাঙ্গামা হয়েছিল তার জন্তে। গোটা বাগনাডিহি তীর ধনুক নিয়ে গিয়েছিল লিটাপাড়া।

কিন্তু মিটমাট না করে উপায় ছিল না। মানকী বিষ খেয়েছিল ভয়ে। কিন্তু অত্ত বিষ বলে বেঁচেছিল—তাই মিটমাট করে বাগনাডিহির লোকদের নিয়ে চলে এসেছিল চুনার মুর্মু, কিন্তু বলে এসেছিল—বিটীটো মরে গেইছে হে। উয়ার সঙ্গে আমার আর কিছু রইল না।

সিধু কানুর কষ্ট হয়েছিল তবু তারা বংশের অবমাননা গায়ে মেখে পারে নি, তারা লালের এবং মানকীর উপর খুব রাগ করেছিল। কিন্তু মাস তিনেক পর বারহেটের বাজারে আসা-যাওয়ার পথে লিটাপাড়ার বিশু মাঝি আর তার দুই যমজ বেটী টুকনী আর রুকনীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল জহর সর্ণার ধারে।

কানু আর সিধু দুই ভাই বসেছিল ওই মজলিসের পাথরটার উপর। লম্বা—ওই তাদের বোন মানকীর মতই লম্বা, আর ঠিক একরকম দেখতে দুই মেয়ে—বয়স পনের ষোল—বাপ বিশু মাঝির পিছু পিছু সেজেগুজে গান গাইতে গাইতে চলেছিল। সে সাজগোজ আবার যেমন তেমন নয়, বেশ ভাল। যেন শহুরে কিরিস্তানী ঢঙ। একজনের লাল পাড়। এক-জনের পাড় কালো। জহর সর্ণার ধারে পাথরের উপর বসে সিধু আর কানু দু ভাই মেয়ে দুটোকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল—তাদের চেহারার সাদৃশ্য দেখে। ঠিক একরকম।

বিশু মাঝি জল খেতে এসেছিল ঝরনায়। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দুটো, একেবারে শরক পাখীর মত কল কলে মেয়ে। বিশু জল খেয়ে গাছের ছায়ায় বসেছিল, আর মেয়ে দুটো জল খেতে নেমে হি হি করে হেসে এ ওর গায়ে জল ছিটিয়ে কলরব তুলেছিল।

নতুন জোয়ান দুই ভাইও চনমন করে উঠেছিল। সিধুর বুদ্ধি বরাবর প্রখর। কি করে ওদের সঙ্গে কথা কইবে ভাবছিল দুই ভাই-ই। কানু ভাবছিল ওই প্রবীণ মাঝিকে গিয়ে জোহর করে বলবে—বাড়ি কুথা হে? কুথা যাবিন?

কিন্তু তার আগেই সিধুর চোখে পড়েছে ঝরনার ধারে পাথুরে পাহাড়টার উপর ঘষঘষে ফুলের গাছে উজ্জ্বল হলুদ রঙের বড় ফুল ফুটে আছে থোকায় থোকায়। মেয়ে দুটো সেদিকে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। সিধুর মাথায় মুহূর্তে মতলব খেলে গেল। সে তার ধনুকটা তুলে কাঁড় জুড়ে নিশানা করে ছুঁড়লে তীর। একটা থোকাসুদ্ধ ডগাটা কেটে ঝপ করে পড়ে গেল ঝরনার জলে। দুই বোনেই কলরব করে উঠল। কিন্তু যার কাছে পড়েছিল সে লালপেড়ে কাপড়-পরা মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে বললে—আমি পেলম আমি দিব কেনে? তু উকে বুল—

সঙ্গে সঙ্গে কানু কাঁড় জুড়ে বলেছিল—দি ছি হে—তুমি লিবে ইবার!

কানুর প্রথম কাঁড়টা ঠিক লাগে নি, শুধু ক'টা ফুল ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার জুড়েছিল তীর। সিধু তাকে বলেছিল—তাড়াতাড়ি করছিস কেনে হে? মেয়েটা পালাবে নাই—দেখ হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তাক করে মার, উর মুখে যাবে পড়ে।

কানুর তীর এবার ভ্রষ্ট হয় নি।

এরপর কথা হতে বাধা হয় নি। অবশ্য বিশু মাঝির মারফতেই আলাপ আরম্ভ হয়েছিল। পরিচয় হতেই মেয়ে দুটোর একটা অন্যের গায়ে ঠেলা দিয়ে বলেছিল—হায় মা গ! ই

ছোঁড়ারা কে বেটে? মানকী বউয়ের ভাই বেটে। বলে হেসে সারা। অন্য মেয়েটি কিন্তু বলেছিল—অ। তুরা দু ভাই কান্থ সিধু। মানকী বউয়ের দাদা তুরা? অ। মানকী কেঁদে মরে তুদের লেগে আর তুরা, ধুর, ভাইরা এমুনি বটিস!

কান্থ সিধু কথা খুঁজে পায় নি। বুকে যেন খচ করে বিঁধেছিল। বিশু মাঝিও বলেছিল—ই, বউটো কাঁদে দুখ করে। তা—। হেঁ—তুরা মুমুঠাকুর বেটিস—লালের কুলে খুঁত আছে তা—একটু হেসে বলেছিল—বুন তো বেটে!

কান্থ বলেছিল—কিন্তুক চুনার মাঝির মানটো কেমন জান তো মাঝি!

—হু—জানে। সোবাই জানে। মান নিয়ে ধুঁয়ে খেছে। বেটী কাঁদছেক!—বলেছিল একটি মেয়ে।

বিশু বলেছিল—সি তো বেটে হে। কিন্তুক বাপের হিয়ে তো বটেক। এই দেখ কেনে আমার এই বিটী দুটো। ই দুটো 'জঁাও' (যমজ) বটেক! বিটী দুটো বড়া কলকলে খলখলে বেটে! লোকে বলে বজ্জাত, তা আমি তো—

বাধা দিয়ে একজন মেয়ে বলে উঠল—বজ্জাত বজ্জাত যারা বুলে সেই বিধুয়ারা বজ্জাত; বেশ করব আমরা কলকল খলখল করব।

—হাপেঃ! হাপেঃ! ইরা কুটুম বেটে!

—বেশ বেটে। আমরাও কুটুম বেটে।

বলে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, একজন হাসতেই আর একজন; দুজনের কণ্ঠের হাসি—সে যেন জলতরঙ্গ বেজে গিয়েছিল।

বিশু বলেছিল—এই দ্যাখ কেনে। কি বুলব হে? ইটা হল রুকনী আর ইটা টুকনী। জঁাও বুন। একরকম দেখতে। একটা হাসলে দুটা হাসে, একটা কাঁদলে দুটা কাঁদে।

—না, আমরা কাঁদি না। কেনে কাঁদব?

বিশু হেসে বললে—তেবে ল্যাই করিস—একজনার সাথে ল্যাই হল তো দুজনা লাগল। দুজনার সাথে লেগে গেল।

—ই। একজনার সাথে ভাব হল তো দুজনার সাথে হল।

আবার দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠেছিল তারা।

সিধু এবার বলেছিল—বেশ, বুলিস মানকীকে, আমরা দুই ভাই যাব।

—কবে যাবি?

—তুরা কবে ফিরবি বুল?

—কেনে? আমরা না ফিরলম তো তুদের কি?

—তুরা না ফিরলে মানকী জানবে কেমনে বুল?

—হেঁ! তা বেটে!

—আমরা কাল ফিরব হে। আজ রাতে থাকব। কাল বাজারে গয়না কিনব। তাপরেতে ফিরব।

—বেশ আমরা দুদিন বাদে যাব।

কানু আঙুল গুণে বলেছিল—তেঁহেঁ গাপা সেঁয়াং, লুখীবার শুকোল শনি। (আজ কাল পরশু, লক্ষীবার শুক্রবার শনিবার।)

—যাস—নেওতা দিলম হেঁ কুটুম। হাঁড়িয়া রাখব, দাকা রাখব, সিম (মুরগী) রাখব—আরও অনেক রাখব—যাস।

তাই গিয়েছিল তারা।

মানকীর সে কি আনন্দ! তার সঙ্গে লালের আর বিশু মাঝির দুই বেটীর। লিটাপাড়ায় ওদের ঘরে খুব বেশী কেউ আসে না। সর্দার ভীম মাঝি কড়া লোক। রাগী মানুষ। এদের সঙ্গে বেনাগড়িয়ার লিটা মুর্মুর সম্পর্ক থাকার জন্যে সে এদের উপর নারাজ। সে বলে—লিটা মুর্মু নামে মাঝি—সে বারো আনা কিরিস্তান হয়ে গেছে। তার সঙ্গে দহরম মহরম রেখে এরাও হয়ে গেছে আধা কিরিস্তান। অন্য ক'ঘরের মেয়েরা এসেছিল—তাদের সঙ্গে জন দু তিন পুরুষ। তাদের মধ্যে বিশু মাঝি আর তার দুই মেয়ে।

মানকী ছুটে বেরিয়ে এসেছিল—দাদারা হে!

তারপর তার সে কি কান্না! বিশুর দুই মেয়ে গোড়া থেকেই ছিল। বাড়ির দোরে তারা তিনজনেই দাঁড়িয়ে ছিল পথের দিকে তাকিয়ে।

সিধুর মনে আছে তারা সেদিন দুজনে ঠিক এক পেড়ে এক রকম শাড়ি পরেছিল। দুজনেই একসঙ্গে হেসে সংবর্ধনা করে বলেছিল—এস কুটুম, এস।

তারপর তারা বলেছিল—কি দেখছিস হে। মানকী বউ, খবরদার, কার নাম কি তা বুলবি না। চিনে লিতে হবে। ইশারা করবি না। তাহলে ল্যাই হবেক!

সন্ধ্যে তখন হয়ে এসেছে, মাদল পেড়ে লাল বলেছিল—কুটুম এল গান কর হে। পেথম আইছে কুটুম।

তারা চারটি মেয়ে—মানকী ওরা দুই বোন আর লালের এক দিদি কোমর ধরে দাঁড়িয়েছিল। বিশু বাজিয়েছিল বাঁশী।

লাল গান ধরেছিল।

ছবির মতন মনে পড়ছে সিধুর!

সিংগিডো দুবুই জান, কুপুল্‌কো হিজু জান

সাও নারিগা পাটী বিলাকম্

লাল বললে—সন্ধ্যের সময় কুটুম এল—ওরে বউ পাটি আন—পিড়ে আন—পেতে দে বসতে দে।

মানকী গাইলে—তার সঙ্গে সঙ্গে সব মেয়েরা—

গানুড়ুরো বানো জান পাটিয়া বানো জান—

বাড়িতে পাটি নাই পিঁড়ে নাই। কুটুম আমার হিয়ের কুটুম—বস বস এই আসনেতে মাটিতে বস।

নয়ন পাল বলেছিল—বুঝেছেন বাবু, এই এমনি করে ওরা খুব আপনার লোককে গান

গেয়ে মাটিতে বসায় ; নইলে অবিশ্যি মাদুর পেতে খাতিরে করে কুটুমদের বসায়। তার রকম আলাদা। কিন্তু মানকী আর লাল এমনি করেই দাদাদের হিয়েতে বসাতে চেয়েছিল।

কিন্তু ওই মেয়ে দুটো করলে কি জানেন ?

মেয়ে দুটো তিড়িকটিড়িক মেয়ে কিনা, রগড় নইলে থাকে না। তাড়াতাড়ি নাচের সারি থেকে বেরিয়ে এসে দুজনে দুখানা নতুন তালের চ্যাটাই আসন পেতে দিয়ে বলেছিল—না না, বউয়ের ভাই মাটিতে বসিস নাই। এই চ্যাটাইয়ে বস হে। তেবে—

আর একজন কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিল—চিনে নিয়ে বসিস বউয়ের ভাই। যে যাকে ফুল দিলি তার চ্যাটাইয়ে সেই বসবি। নইলে আমরা কথা বলব না হে। তুদিগে বুলব কানা। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

সিধু সর্বাগ্রে ঠিক রুকনীর আসন চিনে নিয়ে বলেছিল—এইটো আবার বেটে।

কানু বসেছিল আর একটায়।

এবার মানকী খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।—হেরে গেলি হে, হেরে গেলি। ননদেরা হেরে গেলি আমার দাদাদের কাছে।

সত্যই ওরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

—কি করে চিনলি হে ?

সিধু জহর সর্দার ধারে বসে ওই বাজপড়া শালগাছটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল পুরনো কথাগুলি। কাল রাত্রি থেকে তোলপাড় করছে। যে অবধি শুনেছে মানকী লাল কিরিস্তান হয়েছে, বিশুর মেয়ে রুকনী টুকনীও হয়েছে—তাদের আর বদনামের সীমা নেই, সেই অবধি তার মনে তোলপাড় করছে এই কথাগুলি।

তার উপর আজ চূড়ার মা বললে—সিধু।

—হাঁ।—ফিরে তাকালে সিধু ; কানু এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। সে বাড়িতে এসে শুনেই বেরিয়ে চলে এসেছে এখানে।

বাড়িতে টুশকি তুফান তুলেছে। ফুল থমথমে মুখে ছেলেদের নিয়ে পাটকামই করে যাচ্ছে। বাবা চুনার চুটি টানছে আর বলছে—কি যে হল ছেলেটো। কি যে মেজাজ। দিনরাত মনে মনে ঘুটছেক, কি ঘুটছেক কে জানে! শুনলম, ঝিকরু বুলছিল বারহেটে গিয়েছিল কাল, সিথানে মহিন্দর ভকতের সাঁতে মিজাজ দেখিয়ে বাত করিছে। ঝিকরুকে এক চড় মেরেছে। আবার গলা টিপে ধরতে গেইছিল। ইরে কি মেজাজ হল রে বাবা! তাথেই উকে বেরাইতে দিই না।

বড় ছেলে চাঁদের বউ বললে—সেই হাতম (পিসী) এমুনি করে দিলেক উদিগে। মানকীকে সিধুকে বিগড়াঁয়ে দিছে সেই। সি মরে গেইছে, ইবার ঠেলা লে তুরা!

চুনার সে কথায় কান না দিয়ে কানুকে হাঁকলে—কানু!

কানুর সঙ্গে টুশকির লেগেছিল। ফুল তার নিজের বোন—সে বোনের জন্য গাল দিচ্ছিল সিধুকে—কানুর তা সহ্য হয় নি—সে প্রতিবাদ করছিল। পুরুষের প্রতিবাদ, ভয় দেখাচ্ছিল

—দিব তুর চুলের মুঠা ধরে কিল ধমাধম্—তখুন হবে। হাঁ—। চুপ কর বুলছি।

—হাঁ দিবি। কেনে দিবি? কেনে কেনে কেনে?

—দিব। এমন বুললে আমি দিব।

—আমি ফুলকে নিয়ে চলে যাব। তুদের ভাত খাব না।

—যাবি! চুলের মুঠা ধরে নিয়া আসব।

—কেনে তা আনবি? যা তুরা সেই খুঁজে আনগা তুদের টুকনী রুকনীকে। তাদের লেগে হেদাইছিস।

হয়তো এরপর মুখের ঝগড়া হাতে নামত। কিন্তু এই সময়েই বাপ চুনার মাঝি ডাকলে—কানু। কানু হো।

—হাঁ।

—শুন্ হে।

কানু এসে দাঁড়াল, চুনার বললে—কুথা গেল সি?

—কুথা যাবেক, সি সেই জোহর সর্দার গেইছে।

—জোহর সর্দার কি আছে এখন? ইয়ার আর সি কি করবেক? তু যা ডেকে নিয়ে আয়।

—সি বুলছে জোহর সর্দাতে মরংবোঙ্গা ইশেরা দিছে।

—ইশেরা দিছে?

—হঁ। তাই বুললে আমাকে সোকালে।

—কি ইশেরা দিছে?

—সি তা জানে না। বুঝতে লাগলেক। তাই গেইছে।

—উঁহু। তু যা! ডেকে আন্ হে। কথা শুন আমার। বুড়া হলম হেঁ। তুদিগে মানুষ করলম। সাদী সাগাই করলাম নাই। তুদের দু ভাইয়ের লেগে আমার দুখ হে। বুলগা তাকে—ডেকে আন্ হে।

তাই কানু এসেছে সিধুকে ডাকতে। সিধু ভাবছিল পুরনো কথা; মনে পড়ছিল টুকনা রুকনীর সেই আসন পেতে দেওয়ার কথা।

কানু ডাকলে—সিধু!

সিধু ঘাড় ফিরিয়ে তাকে বললে—বস্!

—হঁ বসলাম। কি কুরছিস—কেনে ইসব ভাবছিস হে!

সিধু বললে—সেই মানকীর বাড়িতে আসন দিলে টুকনী রুকনী—বুললে যি যাকে ফুল দিলে সি তার পাটিয়া বেছে লে।

—হঁ, তু ঠিক বেছে লিয়েছিলি রুকনীর পাটিয়া।

—কি করে বেছে লিয়েছিলম জানিস?

—হঁ! রুকনীর গালে হাসলে পরে ভারী মজার টোল হত হে!

—সি টুকনীরও পড়ত হে।

—না। রুকনীর মতন লয়। আর তুর নজর খুব কড়া হে।

—উঁ—হুঁ। সেদিন রুকনীর টৌল দেখে চিনছি নাই।

—তবে কি করে চিনলি ?

—রুকনীর পাটিয়ায় একটি লাল টোকা ছিল হে। সি দিয়ে রেখেছিল।

—হুঁ, তু কখুনও বুলিস নাই !

—না। বুলি নাই। রুকনী বারণ করলে।

—তা রুকনীর কথা কেনে হে ? সি তিড়িকটিড়িক মেয়্যা ছুটো পালালছে, ভাল হইছে ! ফুল তার থিকা ভাল বউ বেটে।

—উঁ—হু। ফুল ভাল বেটে কিন্তুক মাত্‌তে লারে হে।

—ই কি বুলছিস ? ফুলের মতুন নাচতে কে পারে বুল ? তু মাদল ধরলে তো আশিনের ধানগাছের মতুন হেলে পড়ে হে। বাওড়ে 'মুনগা' (সজনে গাছ) গাছের মতুন নাচে হে।

—তা বেটে হে। তবে বড়া 'পোচরা' ; সব তাতেই ডর করে। এত ডর কেনে হে ! রুকনীর ডর ছিল নাই। তুর মনে আছে সেই ভালুটোর সঙ্গে যখুন লড়াই করলম তখন রুকনী কেমন চেঁচায়ে চেঁচায়ে বুলছিল—মার হে মার, খুব করে মার। শ্যাষে ভীম মাঝিকে যখুন ভালুকটা ফেলালে মাটিতে তখুন টাঙিটো আগায়ে দিলেক টুকনী।

—হুঁ। বাবা গ—সি কি লাফঝাঁপি হে মেয়েটার ! কিন্তুক—হাসলে কানু, বললে—উরা ভাল লয় হে—পালায়ে গ্যেল বেনাগোরে ; আমাদিগে খোবর দিলে না।

সিধু এবার ঘুরে বসল কানুর দিকে—সি তো মানকীও গ্যেলা হে। তু শুনছিস উদের কি হইছে ?

—কি হইছে ?

—কিরিস্তান হইছে।

—মানকী লাল ?

—উদের নাম বুললে না। টুকনী রুকনীর কথা বুললে। আর ইশেরায় জানান দিলে কি মানকীও হইছে। সাহেবলোকের বাড়িতে কাম করছেক। ম্যামসাহেব সাজছেক—

—কে বুললে ?

সিধু তাকে গতকালের বারহেটে যাওয়ার কথা, নিমু মাঝির কথা, সব বললে। তারপর বললে—তাথেই সোকালে চুড়া মাঝির মা বুড়ী যখন বুললে মানকীর কথা রুকনীর কথা তখুন আমার রাগ হল—বললম্—সারি (সত্য) হলে আমি তাদিগে কাঁড়ারে মারব।

স্তম্ভিত হয়ে গেল কানু—সে ভাবছিল তার বাপের কথা। বুড়া শুনলে বুক চাপড়াবে, মাথা খুঁড়বে।

সিধু বললে—কাল থেক্যা আমি বোঙাবাবাকে ডাকছি। বুলছি, বাবা তু আমাকে দেখা দিয়ে বোল—আমাকে তুর টাঙি দে—আমি এই গুড়খান জেট শালাদিগে কাটি, এই দিকুদিকে কাটি।

বলতে বলতে ভয়ংকর হয়ে উঠল সে।

তারপর বললে—তখুন ইশেরা পেলম।

কানুর দেহে মনেও আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল—সে পট্ করে সিধুর হাত ধরে বললে—কি ইশেরা পেলি ?

—পেলম।

সেই ঝরনার ধারে এক তীরে বুনোবেড়াল আর খরগোশ মারার কথা বললে—তারপর এই অহুর সর্দার ধারে বসে কালকের জল ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের সেই কামনার কথা জানালে। তারপর সেই বাজ পড়ার কথা বললে—বাজটো পড়ল; সাদা ঝকমকে লাল-পানিতে সব আঁধার লাগল। ফুল পড়ে গেল ধপাস করে। আমি বসে রইলম হে যেমন ছিলম। মনে হল বিজলী যেন আমার ভিতর ঢুকে গেল। ই ইশেরা আমি বুঝছি হে। মরংবোঙ্গা গাছ থেকে মাটিতে নামল। আবার শি ইশেরা দিবে। ধর তু আমার হাতটো চেপে ধর। দেখ সেই বিজলীর তাত তুর হাত দিয়ে তুর ভিতরে সিঁধায়ে যাবে। ঠিক যাবে।

কানু বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে পরম ব্যগ্রতাভরে সিধুর হাত চেপে ধরলে। সিধুও তার দিকে তাকিয়ে রইল নিষ্পলক দৃষ্টিতে। ঝকমক করছে সিধুর চোখ, আর কেমন ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা মনে হচ্ছে।

কানু অনুভব করলে—হ্যাঁ, সিধুর হাত আগুনের মত উত্তপ্ত। যেন সে তাপ তার ভিতরে ঢুকছে। তারও চোখ দুটো ঝকমক করতে লাগল।

সিধু হঠাৎ বললে—আরও ইশেরা দিবেক বোঙ্গা।

কানু বললে—হুঁ হুঁ। আমার মনও তাই বুলছেক।

—বুলছেক ?

—হুঁ। এই আমার বুকে হাত দে দেখ। ধপাস্ ধপাস্ করছে—কতো জোর করছেক দেখ

—হুঁ। হুঁ।

দুই ভাই দুজনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। দুজনেই নীরব নিস্তব্ধ

হঠাৎ সিধু বললে—আমি যাব দাদা। তু যাবি ?

—কুথাকে ?

—মানকীর খোঁজকে যাব। রুকনী টুকনীর খোঁজ করব।

—কি করবি করে ? তারা কিরিস্তান হইছে—

—হুঁ। তাদিগে টাঙি দিয়ে কাটব। তারপরে—। স্থির হয়ে চেয়ে রইল সিধু।

কানুও স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—তারপরে ?

—ওই সাহেব—যারা উদের—

—হুঁ।

—তা—দি—গে কা—ট—ব।—একটু পরে বললে—বুকটা জলে যেছে আমার।

নয়ন পাল আমার যেন ধ্যানভঙ্গ করলে। আমি দেখছিলাম সিধু কান্থকে। কিন্তু নয়ন পাল থামালে। তারপর সে যে-পটখানা দেখাচ্ছিল সেখানা রেখে বললে—এই বাবা পেথম পট শেষ।

আর একখানা পট তুলে নিয়ে খুলে প্রথম ছবিটায় তার হাতের পাঁচনবাড়ীর মত ছোট বাখারির টুকরোটা ঠেকিয়ে বললে—

—এই দেখুন বাবু লিটাপাড়ার পোটেণ্ট সাহেব—সাঁওতালেরা বলত পান্টিন সাহেব—সাঁওতালদের নিয়ে দরবার করছে। তখন এই সাহেবই ছিল সাঁওতালদের হাকিম। বোশেখ মাসে তারা আদর করে জাম খেতে দিয়েছে, সাহেব খাচ্ছে।

"এবে শোন কিছু বলি সাঁওতালী ব্যবস্থা বিলি
সরকারী কান্থনগুলি জব্বির মুলকে ছিল চল্।
মেস্তর পাল্টিন নাম লোক ভাল গুণধাম
সাঁওতালের দেওয়া জাম খায় আর বলে—কি নালিশ বল্।
বল্ কি নালিশ আছে—পাঠাব সরকারের কাছে—"

শুনতে শুনতে ইতিহাসের পাতা মনে পড়ে গেল। আমি চোখ বুজলাম। ইতিহাসের সে এক সন্ধিক্ষণ। আমার মনশ্চক্ষের সামনে যেন একটা যবনিকা উঠেছিল। বাগনাডিহির সাঁওতালদের বাড়ির আঙিনা এবং নির্জন জহর সর্ণা থেকে জীবনের নাটক এসে প্রবেশ করছিল ইতিহাসের এলাকায়। ইতিহাসের পাতায় স্থান কিসেরই বা নেই। সবেরই আছে সবারই আছে। কিন্তু এই অরণ্যবাসী মান্থষ যারা এককালের ঝাপসা হয়ে যাওয়া ইতিহাসের পাতার ইতিহাস থেকে মুছে গিয়ে দেশদেশান্তরে জীবনের জন্ম মাটি পাথর অরণ্যকন্দরের নেপথ্য পটভূমির মধ্যে বাঘ ভালুক হাতী নেকড়ে সাপের সঙ্গে পৌঁছুল এই সমতল আর পাহাড়ের সঙ্গম এলাকায়। পাহাড়ের কোলে কোলে বসতি স্থাপন করলে—অসংখ্য গ্রাম গড়ে উঠল। গড়লে তারাই। বন কাটলে, সূর্যের আলোকে করলে অবারিত; উঁচু নীচু মাটি কেটে করলে সমতল। পাহাড়ে ঝরনাকে পাথর দিয়ে বেঁধে করলে জলাধার। চারিপাশ থেকে বাঘ ভালুক তাড়ালে। সরীসৃপ মারলে—তাদের হটালে। পাথর কাঁকর মেশানো জমিকে অস্থরবিক্রমে কর্ষণে কর্ষণে উর্বর করলে। বাঁশীর স্থরে আর মাদলের বাজনায় তুললে দিব্যলোকে মান্থষের সাড়া। তারপর প্রবেশ করছে রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতায়। গৃহের অঙ্গন থেকে জীবনের প্রকাশ্য দরবারে। পুরাণের কর্ণের কথা মনে পড়ল। প্রতিযোগিতার রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করলে। কষ্টিপাথরে খোদাই করা মূর্তির মত স্থন্দর স্থঠাম সবল-পেশী মান্থষের দল এসে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে বিশ্বরঙ্গমঞ্চের এই অংশের দৃশ্যে একটা কিছু ঘটবে। তখন আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন। সত্যই স্বপ্নাচ্ছন্ন।

১৮৫৪।৫৫ সাল। ইংরেজের ভারতবর্ষ জয় একরকম সম্পূর্ণ হয়েছে। লর্ড ডালহৌসী ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে সে কাজ শেষ করে গেছেন। দেশে পুরনো যুগ যাচ্ছে নতুন যুগ আসছে। ওদিকে রেল লাইন বসছে।

তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যা একটি প্রদেশের অন্তর্গত। বাংলার মসনদ মুর্শিদাবাদে অন্ধকার ঘরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। রাজধানী গেছে কলকাতায়।

সে সময় ভাগলপুর একটি ডিভিশন, বীরভূমের উত্তর পর্যন্ত তার সীমানা। এই এলাকায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য সাঁওতালের গ্রাম।

সুদীর্ঘকাল পূর্বে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চের প্রকাশ্য দৃশ্যপট নগর জনপদ থেকে অরণ্য অন্ধকারে নেপথ্যে জীবনকাল শেষ করে নগর জনপদের প্রত্যন্ত এলাকায় এসে বসেছে এই সব সাঁওতালের দল।

"প্রতি দল যেখানে বাস করিল সেইখানেই ছোট বা বড় গ্রাম গড়িল। তাহাদের একজন দলপতি বা মাঝি বলিয়া মনোনীত হইল।…আবার কতকগুলি গ্রামের মাঝি একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মাঝিকে তাহাদের দলপতি বা পরগনাইত বিবেচনা করিল।…সাঁওতালরা দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালত পছন্দ করে না। তাহারা নিজেরাই দলবদ্ধ হইয়া যাহা বিচার করে তাহাই মানিয়া লয়। মুনসেফ সাবরেজেষ্ট্রার নাই। পরগনাইতরাই সকল কার্য করিয়া থাকে।"

বণিক ইংরেজ সরকার অন্ততঃ নিষ্ফলা বনভূমি থেকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য এদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

"সাঁওতালদের বসতি স্থাপনের সুযোগ প্রদানের জন্য মিঃ জেমস পোটেণ্ট নামক প্রবীণ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে পরিদর্শক নিযুক্ত করিলেন।…সাঁওতালেরা এইবার নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসের আশা করিয়াছিল। তাহাদের পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের উপর অন্য কোন সুসভ্য জাতি অত্যাচার করিবে না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল এবং মনপ্রাণ দিয়া কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগের প্রতি কিরূপ অকথ্য অত্যাচারের নির্মম হস্ত তাহাদের উপর প্রচণ্ড আঘাত করিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে।"

এসেছিল এরা লাখদরুণে লোক। অরণ্যভূমি তো কম ছিল না। এরা কারও অন্নে ভাগ বসায় নি। নিজেদের অন্ন নিজেরা উৎপাদন করেও আরও অনেক বেশী উৎপাদন করেছে। দুধ ঘিয়ের ভার নিয়ে এসে সভ্য জাতিদের যুগিয়েছে। আর এনেছিল অদম্য প্রাণশক্তি, শ্রমশক্তি।

আমার মন চলে গেল একশো বছরেরও আগে। বর্গী হাঙ্গামার আমলে।

বর্গীরা পশ্চিম উত্তর বীরভূম ও রাজমহলের পথে এই অঞ্চলটাকে বিপর্যস্ত করেছিল। জীবন অনিশ্চিত। দেশ শস্যশূন্য। গ্রামের পর গ্রাম জ্বলে গেছে। তারপর পলাশীর যুদ্ধ—কোম্পানির দেওয়ানী—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। চারিদিক যেন অন্ধকার, গ্রামের পর গ্রাম উৎসন্ন হয়েছে, অরণ্য এগিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে আরণ্য অন্ধকারের শ্বাপদ ধর্মও এসেছে। তারপর পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময় কোম্পানির সঙ্গে জমিদারের ছোটখাটো সংঘর্ষের মধ্যে মানুষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে। তারপর লেগেছে পাইকদের সঙ্গে। পাইকদের বিদ্রোহের পর দেশে এসেছে একটা শৃঙ্খলা—বানিয়া ইংরাজ শান্তি এনেছিল ব্যবসার জন্যে।

তার ব্যবসা বিচিত্র পথে আসে এদেশের অজানা বাজারে। একদিকে রেল কোম্পানির ব্যবসা অন্যদিকে নীলকুঠি এবং রেশমকুঠির ব্যবসা। নুনের আবগারীর একচেটে ব্যবসা। কাপড়ের তাঁত গেছে। কাপড় আসছে মানচেস্টার হতে। কয়লার খনি খুলেছে। এদেশের লোক ধান চাল তেল মসলাপাতি পাইকারী বিলিতী কাপড়ের আর হাটে তাঁতীর কাছে বোনা গামছা মোটা কাপড়ের দোকান ফেঁদেছে। বড় ধনী যারা তারা নিয়েছে জমিদারী।

এরই মধ্যে রাঁচী হাজারীবাগ থেকে এল এই কৃষ্ণাঙ্গ আদিম অধিবাসীর দল। যারা হাজার হাজার বছরের নির্যাতন ও পরাজয়ের মধ্য দিয়েও দুর্গম অরণ্যের মধ্যে সেখানকার অধিকারী জন্তু-জানোয়ারকে হারিয়ে বেঁচে থেকেছে তারা। আলোর আশায় মানুষের সঙ্গের ভরসায় লাখে লাখে এসে বসত গড়ে বন কেটে বহু কৃষিক্ষেত্র তৈরী করে বসে গেল।

কিন্তু দুটো পুরুষ না যেতে তারা দেখলে, বনের হাতীর পালের আক্রমণ কিংবা নেকড়ের দলের আক্রমণের চেয়েও নিষ্ঠুরতর ভয়ংকরতর আক্রমণে তারা আক্রান্ত হয়েছে।

একদিকে পাদরীরা তাদের জামা কাপড় ও চাকরির জলুসের সঙ্গে তাদের ধর্ম আক্রমণ করেছে। অন্যদিকে দলবদ্ধ নেকড়ের মত এই দিকু অর্থাৎ হিন্দু ব্যবসাদার এবং গৃহস্থদের দ্বারা তাদের সর্বস্ব আক্রান্ত হয়েছে।

প্রথম পুরুষ যে জমি তৈরী করেছিল দ্বিতীয় পুরুষে তার অধিকাংশই কেনারামদের লক্ষ্মীর খাতার হিসেব কুমীর হয়ে গিলেছে; অন্যদিকে তাদের প্রায় অর্ধেক লোক দশ টাকা ধার করে তাদের এক রকম ক্রীতদাস হয়ে গেছে।

নিমু মাঝি লক্ষ্মণ মাঝি হাজারে হাজারে। কতক কতক গ্রামে ভীম মাঝিরা লড়তে গিয়ে মিথ্যা মামলায় বিনা অপরাধে জেলে যাচ্ছে।

বিশু মাঝি লাল মাঝি মানকী টুকনী রুকনীর মত হাজার দরুণে ধর্ম হারিয়ে কাপড় জামা পরে সায়েবদের নোকর হচ্ছে।

মরংবোঙ্গা জহর সর্ণায় কোথাও শালগাছে কোথাও বটগাছের ছায়াতলে বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের উপর বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে।

বাজ পড়ছে বাগনাডিহির বোঙ্গার আশ্রয়স্থল শালগাছের মাথায়।

কচিৎ-দু-চারখানা গ্রামে চুনার মাঝির মত মুর্মু ঠাকুরের চেষ্টায় আজও দিকু নেকড়েরা ঢুকতে পারনি গাঁয়ে। পীপড়া গাঁয়ের হাড়াম মাঝি—পাড়ারকেলে গাঁয়ের শ্যাম পরগনাইত—শিলিংগীর গাঁয়ের মাঝিরা আজও বেঁচে আছে কিন্তু আর বুঝি জীবন থাকে না।

পার্ণ্টন সাহেব ভাল লোক কিন্তু মহেশ দারোগার মত দারোগারা কেনারাম মহিন্দর ভকতের মত দিকুরা তার এক্তিয়ার মানে না। ওদিকে ভাগলপুরের কমিশনার সাদারল্যাণ্ড সাঁওতালদের সত্যকারের প্রজা বানাবার জন্যে তাদের টেনে আনলেন জঙ্গিপুরের মুনসেব কোর্টের আওতায় আর ফৌজদারীতে ফেলে দিলেন ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন।

ভীম মাঝি কেনারাম ভকতের সঙ্গে ঝগড়া করে জঙ্গিপুর মুনসেফের চাপরাসীকে ভাগিয়ে দিয়ে চালান গেল ভাগলপুর জেলে।

পার্ণ্টন সাহেবের কাছে দলে দলে সাঁওতালেরা গিয়ে বললে—সাহেব আমরা কি মরব?

তু বুল?

পোটেণ্ট সাহেব খবরটা জানতেন না তা নয়, জানতেন। তিনি হিন্দুদের অত্যাচারের কথা জানেন, ক্রীশ্চান করায় এদের মনের যে দুঃখ তাও বোঝেন, আবার রেলের রাস্তাবন্দিতে কণ্ট্রাকটরের ইংরেজ এবং ফিরিঙ্গী কর্মচারীদের এদের নারী নিয়ে বিলাসের কথাও জানেন।

কমিশনার মিঃ সাদারল্যাণ্ডকে সে কথা তিনি বলেছিলেন। কিন্তু মিঃ সাদারল্যাণ্ড অন্ত ধরনের মানুষ—লর্ড ডালহৌসি তাঁর আদর্শ। তিনি বলেছিলেন—আমরা এম্পায়ার গড়তে এসেছি মিঃ পোটেণ্ট। ওই সব ব্ল্যাক নিগারদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। ওরা মরবার জন্তেই জন্মেছে এবং অন্তের জন্ত খেটে মরবে। আমি হিন্দুদের অত্যন্ত ঘৃণা করি কিন্তু তবু উই ওয়াণ্ট দেম টু সার্ভ আওয়ার পার্পাস। যদি ইংরেজদের এনে এই দেশটা ভরিয়ে দেওয়া পসিবল্ হত তবে ওদের দাম আমার কাছে থাকত না। ক্রীশ্চান করছে সে তো ভাল করছে। ভবিষ্যৎ কালে ক্রীশ্চান হিসাবে আমাদের অনুগত হলে ওদের দিয়ে হিন্দুদের জব্দ করব। আর ওদের মেয়েদের নিয়ে ব্যাচিলর ইংলিশ অ্যাণ্ড অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা এনজয় করে—করতে দাও। এদেশে তারা সেইণ্টের রোল প্লে করতে আসে নি। জান তুমি লর্ড ক্লাইভ ওয়ারেন হেস্টিংস এদের সময়ে হারেম রাখত তারা। বলে হেসে উঠেছিলেন আবার।

মিঃ পোটেণ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কিন্তু উগ্র এই উপরওয়ালা সিভিল সারভেণ্টটির কথার কোন প্রতিবাদ করতে পারেন নি। দিয়েছিলেন রাজা হিসাবে কর্তব্যের দোহাই। আর বলেছিলেন—আপনি লর্ডের কথা স্মরণ করুন স্যার।

হেসে উঠেছিলেন সাদারল্যাণ্ড।

বলেছিলেন—রাজার ডিউটি সর্বাগ্রে দেশকে শাসন করা, রাজ্য রক্ষা করা। অ্যাণ্ড লর্ডের কথা—সেটা নট ফর দিজ ব্ল্যাক হিদেনস্। সে সবই ফর হোয়াইট পিপলস্।

শেষে পোটেণ্ট বলেছিলেন—মনুষ্যত্বের দাবিও কি করতে পারে না এরা আমাদের কাছে?

হেসে সাদারল্যাণ্ড বলেছিলেন—তুমি বড় দুর্বল-হৃদয় পোটেণ্ট। তোমার চার্চ সার্ভিসে যাওয়া উচিত ছিল। আচ্ছা ভাল, তুমি যখন এত করে বলছ তখন তোমার এলাকায় হোল্ড ওয়ান দরবার। তাদের বল তাদের কি কমপ্লেন্স্ আছে তারা জানাক। আই ওয়াণ্ট রিটিন পিটিশন্স্ অব কেসেস্। তারপর প্লেস বিফোর মি। আমি তোমাকে নিয়ে কনসিডার করব।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

সাদারল্যাণ্ড হাত বাড়িয়ে দিয়ে পোটেণ্টের হাতখানা ধরে বলেছিলেন—লুক টুওয়ার্ডস সাউথ আফ্রিকা, টুওয়ার্ডস আমেরিকা, টুওয়ার্ডস জামিয়েকা। তার কতটুকু এখানে হয়েছে। আমার বিবেচনায় ওদের অসন্তুষ্ট হবার কোন কারণ ঘটে নি। কারণ স্লাটস্ দেয়ার লট। আমরা জেতারি আইনসম্মত করি নাই। তবু তারা যদি হয় তবে লট ছাড়া কি বলব?

সেই দরবার হবে লিটিপাড়ায়।

সাঁওতালদের পরগনাইতদের কাছে খবর গেছে। পরগনাইত গ্রামে গ্রামে মাঝিদের অর্থাৎ সর্দারদের কাছে নাগরা বাজিয়ে বাজিয়ে গিয়েছে।

"পান্টিন সাহেব দোরবার করবেক লিটিপাড়ায়। সর্দার মাঝিরা সোব আসবি। সাহেব সবারি কাছে নালিশ শুনবেক। দরখাস লিবেক। দরখাস লিখাঁয়ে লিবি। দিকুদের কাছে গিঁয়ে লিখাঁয় লিস।"

আমার মনশ্চক্ষের সামনে আমি যেন এই সব ছবিগুলি প্রত্যক্ষ দেখছিলাম। গ্রামে গ্রামে জটলা হচ্ছে। সাঁওতালেরা জহর সর্দার পাশে বসে সমবেত হয়ে সর্দারের সঙ্গে কথা বলছে। মুখে চোখে তাদের বেদনা উত্তেজনা আশা নিরাশা মেঘ ও রৌদ্রের মত একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে।

লিটিপাড়ার ভীম সর্দারের ছেলে বসে আছে গুম হয়ে। মধ্যে মধ্যে তার হাতের পেশী শক্ত হয়ে উঠছে। তার নাম অর্জুন—সে বললে—কি কি হবেক? প্যাটমোটা দারোগা কি বুলবেক? বুললে না দি মানে না পান্টিন না কান্টিন কে? বুললে না? ওই দিকু কেনারামের কাছে টাকা খেলেক, বেঁধে নিয়ে গেল্ বাবাকে। কোর্ট আদালত, বিচার। কেমুন বিচার দেখলি? বাবা ধান লিলে শোধ দিলে তবু কোর্ট বুললে পাবেক। বিচার!

ফাগু হেমব্রম প্রবীণ মাঝি, ভীমের পরেই সে লিটিপাড়ার মাতব্বর। সে বললে—ভেবে করবি কি হে? করতে তো কিছু হবেক?

—হাঁ হবেক।

—সেইটো বুল।

—ঘরে আগুন দিয়া চলে যাব হে।

—যাবি কুথাকে?

হাঁ। যাবে কোথায়? খুঁজে পায় না কোন একটি স্থান যেখানে গিয়ে তারা নির্বিবাদে শান্তিতে থাকতে পারে।

ফাগু বললে—শুন, কথা শুন। দরখাস একটা লিখা। তার পরেতে মুখে বুলব।

—কে লিখবেক? দিকুরা লিখে দিবে? পয়সা লিবে, লিয়ে কিছুই লিখবেক না।

সমস্ত আসরটা নীরব হয়ে গেল। তাই তো।

ফাগু হঠাৎ বললে—আছে হে একজনা। বাবড়ে বোঙা (বামুনঠাকুর) বেটে সে। ভশ্চাজ। বুড়া ভশ্চাজ। রামচন্দ্রপুরে বুড়া ভশ্চাজ আছে।

নয়ন পাল বললে—বাবু মশাশয়, ভশ্চাজ রামচন্দ্রপুরের ত্রিভুবন ভশ্চাজ মশায়। এই দেখুন—

"ভট্টাচার্য ত্রিভুবন তন্ত্রসিদ্ধ মহাজন
ভজন ভুজনে মন দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক রয়—
মা মা বলি গায় গান অশ্রুপূর্ণ দু নয়ান

সরল দয়ালু প্রাণ পাগলা ঠাকুর সবে কয়।
তাঁহারে করিয়া মনে— ফাগুলাল মাঝি ভণে
পাইয়াছি ঠিক জনে—চল সবে তার কাছে যাই।"

বাবু মশাই, এই দেখুন, ভট্টচাজ মশায়ের ছবি। আমার জ্যেঠা তাঁকে দেখেছিলেন—বলতেন ঠিক তেমনিটি হয়েছে।

বড় বড় চুল দাড়ি গোঁফে ঢাকা শ্যামবর্ণ শক্ত কাঠামো এক ব্রাহ্মণ, চোখ দুটো বড় বড়—টিকলো নাক—মোটা ভুরু—কানের পাশে বড় বড় দু গোছা চুল—গলায় রুদ্রাক্ষমালা—কপালে সিঁদুরের টিপ। প্রসন্ন মানুষ। শরীরখানি বিশাল। দশাসই পুরুষ।

তাঁর বিষয়সম্পত্তি বেশী ছিল না বাবু। বিঘে পনের ব্রহ্মোত্তর জমি। তবে সিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন—শ্মশানে কালীপুজো করতেন আর শিষ্যসেবক সেরে ফিরতেন। কতজন আসত—কেউ কবচ কেউ ঝাড়ফুঁক, কেউ কিছু দিয়েও যেত যে যা পারত—তাতেই সংসার পরিপূর্ণ। চ্যালা ছিলেন আমার ঠাকুরবাবা। আমার ঠাকুরবাবা যে প্রতিমা গড়তেন আর সে প্রতিমা যেখানে ত্রিভুবন ভটচাজ পুজো করতেন সেখানে মা নাকি সাক্ষাৎ আসতেন।

ফাগুলালকে একদিন দয়া করেছিলেন। দয়া তাঁর সবাইকে ছিল। ফাগুলাল আর বিশু, লিটিপাড়ার বিশু মাঝি; বৈশাখ মাস—কোথায় কুটুমবাড়ি গিয়েছিল, ফিরছিল বাড়ি লিটিপাড়ায়। হাঁড়িয়াও খেয়েছিল অনেকটা, পথে ফিরতে ফিরতে দুপুরবেলা রোদে বিশু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। জায়গাটা এমন যে সবটাই কাঁকুরে পাথুরে ডাঙা, একটা গাছ নেই শ'খানেক হাতের মধ্যে। ফাগু এমন মাতাল হয়েছে যে তার ক্ষমতা নেই তাকে কোনরকমে তুলে কোন গাছতলায় নিয়ে যায়। সে বিশু মাঝিকে ডাকছে—উঠ্ উঠ্—বিশু উঠ্। বিশু উঠবে কি, মুখ রগড়াচ্ছে কাঁকুরে মাটিতে—মুখ থেকে বেরুনো গাঁজলার সঙ্গে রক্ত বেরুচ্ছে। ভট্চাজ মশায় ফিরছিলেন সেই পথে শ্মশানে তাঁর সাধনপীঠ থেকে তাঁর বাড়ি। ওই শতখানেক হাত দূরেই একটা জোড়ের ধারে শ্মশান। তার পাশে একটা পাথরের ডাঁই চারিপাশে গাছপালা—একটা বৃহৎ বটগাছ—সেই বটগাছতলায় তাঁর আসন, সেখানে এখনও একখানি পাথরে কালীমায়ের পুজো হয় শনি মঙ্গলবারে, অষ্টমী অমাবস্যাতে, তা থেকে আমার গুরুবংশের ভাল আয়টায় হয়।

ভট্চাজ মশায় কারণ করে ফিরছিলেন—হাতে একটা বড় ঘটি, আর তালপত্রের ছাতা মাথায়। গান গাইতে গাইতে ফিরছেন মনের আনন্দে। আসতে আসতে থমকে দাঁড়ালেন ওদের দেখে।

—কি হয়েছে মাঝি?

ফাগু বললে—ধপাস করে পড়ে গেল—আর কি হল। গোঙাইছে। হুইখানে কালী আছে সি বুঝি উকে লিলে। বলে কেঁদে উঠল।

ভট্চাজ মশায় বললেন—হয়েছে। সর—দেখি।

বসে বসে তালপাতার ছাতাটা বিশুর মাথার কাছে রেখে তাকে দেখে বললেন—সরদিগরম হয়েছে মাঝি; একে হাঁড়িয়া খেয়েছিস তার উপর এই বোশেখী রোদ। অদনও হয়েছে

গলায় গলায়। তা এখানে থাকলে তো মরে যাবে রে। ওকে তোল—তুলে ছায়াতে নিয়ে চল। চল, আমার বাড়ি চল।

ফাগু বিশুকে তুলতে গিয়ে নিজেই পড়ে গিয়েছিল। ভট্‌চাজ তখন 'হয়েছে' বলে নিজেই তাকে তুলে সেই এক্‌শো হাত কোনরকমে বয়ে বাড়িতে এনে দাওয়ায় শুইয়ে নিজের কন্যাকে ডেকে বলেছিলেন—একে বাতাস দে মা। একটু ঘাম মরলে জল দে মাথায় মুখে চোখে।

ত্রিভুবন ভট্‌চাজের ওই এক কন্যে ছিল বাবু মশায়—নেহাত বাল্যকালে বিধবা হয়েছিল—লোকে বলত 'কড়ে রাঁড়ী'—বিয়ের তিন মাসের মধ্যে বিধবা হয়েছিল আট বছর বয়সে। এখন তিনি যুবতী—বিশ বাইশ বছর বয়ঃক্রম হবে যখনকার কথা বলছি।

বাপ বেটীতে সাঁওতালদের দুজনকেই পরিচর্যা করে সুস্থ করেছিলেন—সে রাতটাও বাড়িতে স্থান দিয়ে রেখে ভোরবেলা তাদের আঁচলে মুড়ি নাড়ু দিয়ে বিদায় করেছিলেন।

এ ঘটনা, বাবু, লিটিপাড়ায় সাঁওতালদের যে সময়ে মজলিস হচ্ছিল তার দশ বারো বছর আগের কথা। বারশো বাষট্টি সালে সাঁওতাল হাঙ্গামার আরম্ভ—লিটিপাড়ার মজলিস তার মাস দুয়েক আগে বোশেখ মাসে। ওই বজ্রাঘাত আর ঝড়ের কথা বললাম, তার দিন তিনেক পরের কথা।

এই ঝড়ের দিন আর একটি বজ্রাঘাত হয়েছিল বাবু, রামচন্দ্রপুরে ওই কালী থানের পাশে একটি তালবৃক্ষে।

ভট্‌চাজ মশায় তখন আসনে বসে ছিলেন। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। তিনি কারণ করছিলেন আর মাকে ডাকছিলেন।

ভট্‌চাজ মশায় সংসারে তখন নির্বন্ধন ; কন্যেটি ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে কোথায়। নানান জনে নানান রকম বলে। ভট্‌চাজের তাতে গ্রাহ্য নাই।

গ্রামে কন্যেটিকে নিয়ে বড়ই ঝঞ্চাট করেছিল জ্ঞাতি ব্রাহ্মণেরা। নানান অপবাদে নানান টিটকারি রহস্য করত। ভট্‌চাজ গ্রাহ্য করতেন না। বলতেন—বলগে রে শালারা বলগে—চামড়ার মুখ আর মানুষের জিভ। বাঘের জিভ মাংস কুরে খায় আর গর্জায়, মানুষের জিভ নিন্দে করে আর পা চাটে।

মেয়ে কাঁদলে বলতেন—কাঁদিস কেন ক্ষ্যাপা মেয়ে, যে কাদা তোর গায়ে দেয় সেই কাদা কালীর পায়ে দে। চন্দন হয়ে যাবে। ওরে হারামজাদী তোকে আমি মন্ত্র দিয়েছি তবু তোর এই দুখ গেল না। চণ্ডাল রে ওরা চণ্ডাল। বামুন হয়ে সুদ খায়, লোককে ঠকায়—যে জিভ কালী কালী বলবার জন্যে সেই জিভ দিয়ে পরনিন্দে করে। নিন্দে নয় ও হল বিষ্ঠা—মুখ দিয়ে ওদের বিষ্ঠা ওঠে। করবে কি—মুখের বিষ্ঠা থু করে ফেলতেই হবে—গলগল করে বমি করতেই হবে। তাতে সামনে থাকলে গায়ে লাগবেই। মুছে ফেল মা মুছে ফেল। কিন্তু মেয়ের সহ্য হল না—একদিন গেল বক্রেশ্বর—বীরভূমের বক্রেশ্বর মহাপীঠ—সেইখান থেকে হারাল আর ফিরল না। লোকে মন্দ বললে ভট্‌চাজ বলতেন—যে ন্যাংটা মেয়ে ভাতারের বুকে পা দেয় সেই জাতের মেয়ে, আট বছরে বিয়ে দিলাম—তিন মাসের মধ্যে ও তাকে খেয়ে

ফেললে—ও হল ধূমাবতী। তাতারখাগী আপন পথে গিয়েছে। বেশ করেছে। আমাকে পতিত করে কে রে—কোন্ শালা—তার ঘাড়ে ক'টা মাথা। আর করলি করলি—আমার বয়েই গেল।

•

এই হল ত্রিভুবন ভট্চাজ বাবু মহাশয়। এই এঁর কথাই মনে পড়েছিল ফাগুলালের। সে বলেছিল—চল্, ওই ভট্টচাজের কাছে যাই, উকে বুলি, উ লিখে দিবেক।

ভট্টচাজ জানতেন।

বলেছি বাবু, ওই ঝড়ের রাতে কালীর থানের শ্মশানে তালবৃক্ষে বাজ পড়েছিল। ভট্টচাজ কারণ করছিলেন, তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। সর্বাঙ্গে তাপ লেগেছিল।

চেতন হয়েছিল মাঝরাতে।

তিনি মাঝরাতে চিৎকার করতে করতে বাড়ি ফিরেছিলেন—আগুন লাগল রে আগুন লাগল! মায়ের হাসি শুনলাম, লক্লকে জিভ দেখলাম। আগুন বাজ হয়ে পড়ল তালগাছে।

তিন দিন পর তখন ফাগুলাল মাঝিদিগে নিয়ে তাঁর কাছে এল, তখন তিনি উঠেছেন। কেমন পাগল হয়ে বসে আছে।

"সাঁওতালেরা নম করে, অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে!
বলে, আমি এরই তরে বসে আছি—
আয় তোরা আয়।"

ভট্টচাজ নাকি বলেছিলেন তোরা তো সব দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করেছিলি! তা তোদের বিরূপাক্ষ কালকেতু কই রে?

ফাগুলাল হাত জোড় করে বলেছিল, আমরা বাবাঠাকুর সাঁওতালরা গো!

কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ভট্টচাজ বলেছিলেন—হ্যাঁ। তাই তো! তু তো সেই ফাগুলাল।

—হেঁ বাবাঠাকুর, আমি ফাগুলাল।

—ভট্টচাজ স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলেন—বলেছিলেন শান্তকণ্ঠে—আয় আয় আয়। তা কি মনে করে রে? তু তো অনেক দিন আসিস নাই ফাগুলাল।

—হেঁ বাবাঠাকুর, অ্যানেক দিন আসি নাই গ।

—ভাল আছিস? এত দলবল নিয়ে? কি রে? ভূত প্রেত ডান ডাকিন কিছু নাকি?

—না গ তা লয়।

—তবে আমার কাছে? ওই সবের জন্তেই তো লোকে আসে আমার কাছে।

—তার বাড়া গ বাবাঠাকুর। আমাদিগে চুষে খেলেক, পিষে মেলেক—জাত লিলেক, জনম লিলেক; আমরা মরে গেলাম। তু একটো দরখাস লিখে দে।

—দরখাস—দরখাস্ত? কার কাছে রে? বোম্বা বাবার কাছে? না আমার মা কালীর কাছে?

—না বাবাঠাকুর, আমাদের সাহেব পান্টিন সাহেবের কাছে।

হা হা শব্দে আবার ফেটে পড়েছিলেন ভট্‌চাজ।—পার্ণ্টিন সাহেবের কাছে? হা হা হা। আমি লিখব?

—আর কেই দিবে না বাবাঠাকুর। 'কাত'রা (কায়েতরা) টাকা নিয়ে লিখে দিবেক কিন্তু যা বুলব তা লিখবেক নাই।

—হুঁ। আবার স্বাভাবিক হয়ে ভট্‌চাজ ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন—হুঁ। ঠিক কথা।

দরখাস্ত ভট্‌চাজ লিখে দিয়েছিলেন। ওরা যা বলেছিল তা লিখে দিয়েছিলেন।

সাঁওতালী ভাষায় তারা বলেছিল—ভট্‌চাজ বাংলা অক্ষরে তাই লিখে দিয়েছিলেন।

মনশ্চক্ষের সম্মুখে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চের পট অপসারিত হয়ে গেল। এমন মুহূর্ত মানুষের আসে যখন কানে শোনা গল্প মনের মধ্যে স্পষ্ট ছবি হয়ে ফুটে ওঠে।

লিটিপাড়ার ইংরেজ বানিয়া সরকারের প্রতিনিধি মিঃ পোটেণ্টের দরবারের জন্য একখানা ছোট শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। আগ্রা বা দিল্লী অঞ্চলের তৈরী লাল নীল হলদে রঙের ছককাটা শামিয়ানা—চারিপাশে তার ঢেউখেলানো ঝালর। পূর্বদিকের সূর্যের রোদ যাতে এসে রাজপ্রতিনিধির গায়ে না লাগে তার জন্য সেদিককার আধখানা উপর দিক থেকে ঢাকা—নীচের দিকটা খোলা। একটা চৌকো হাত দেড়েক উঁচু মাটির বেদি তৈরী হয়েছে। তার উপর শতরঞ্চি পাতা। তার উপর কুর্সিতে বসে আছে পার্ণ্টিন সাহেব। নতুন জাম পেকেছে, তাই সাঁওতালরা আদর করে এনে দিয়েছে—সাহেব তাই খাচ্ছে।

"পার্ণ্টিন সাহেব নাম লোক ভাল গুণধাম
সাঁওতালের দেওয়া জাম খায় আর বলে কি নালিশ বল্‌।"

সামনে তিনদিকে হাজার হাজার সাঁওতাল বসেছে। তারা সাহেবের সঙ্গে দরবারে দেখা করতে এসেছে—তাদের পোশাকে আজ বাহার দেখা যাচ্ছে। মাথায় বাবরি চুল আঁচড়ানো—তাতে কেউ বেঁধেছে লাল ন্যাকড়ার ফালি, কারও সাদা কাপড়ের ফালি, তার মধ্যে ফুল গোঁজা, পাখীর পালক গোঁজা—ময়ূরের পালক গোঁজা। পরনের কাপড় আজ কৌপিন নয়, খাটো গামছা নয়, ছ-সাত হাতি সাঁওতালী তাঁতে বোনা কাপড়। কোমরে এবং বুকে বেল্ট এবং পৈতের ঢঙে আর একখানা চাদর। অনেকের হাতে বালা। গলায় লাল কাচের বা পুঁতির মালা। হাতে তীর ধনুক। কোমরে গোঁজা বাঁশী। সঙ্গে অনেক মেয়েরা এসেছে। দরবারের শেষে সায়েবকে তারা নাচ গান দেখাবে শোনাবে।

প্রথমেই ভট্‌চাজের লেখা দরখাস্ত নিয়ে কাণ্ডলাল এগিয়ে এল। তার পেছনে ভীমের ছেলে অর্জুন।

কাণ্ডলাল সেলাম করে বললে—এই লে সাহেব দরখাস। তু বিচার কর।

পোটেণ্ট সাহেব সিভিল সার্ভিসের পুরনো লোক—১৮৬৬ সাল থেকে কাজ শুরু করেছেন—এসেছিলেন বিশ বাইশ বছর বয়সে—আজ ১৮৮৫ সাল—কুড়ি বছর হয়ে গিয়েছে। তিনি বাংলা জানেন। হাতে করে নিয়ে চোখ বুলিয়ে হেসে বললেন—ইটো টো টুরা কিছু লিখলি না। কি বুঝবে হামি? "আমরা মরে গেলাম বাবা পল্‌টিন সায়েব—দিকুরা আমাদিগে চুষে

খেলেক, পিয়ে মেলেক, পাদরীরা আমাদের জাত লিলেক, ধরম ইজ্জত লিলেক রাস্তাবন্দির সায়েবরা—।" কুঠা কি হয় বুল। টবটো টুড়ন্ট করেগা।

হঠাৎ একটি তরুণ কণ্ঠে বেজে উঠল—আমার বাবাকে জেহেলে লিয়ে গ্যেল। মিছামিছি জেহেল লিয়ে গ্যেল। ছেড়ে দে। উকে ছেড়ে দে।

—টুমি কে আছ?

—ভীম মাঝির ছেল্যা আমি। তু জানিস ভীমকে।

—হাঁ হাঁ।

—বাবা দিকু কেনারামের কাছে ধান ধার লিলে দশ শলি—সুদ-সমেত দিলেক একশো শলি। দিলে। সব মাঝিদিগে শুধা। কি তুরা বুল।

একসঙ্গে লিটিপাড়ার মাঝিরা বলে উঠল—দিলে দিলে।

—তবু আবার এল—বুললে, আবার দেড়শো শলি দে—

সমবেত কণ্ঠস্বরে বললে—হঁ হঁ। বুললে। বুললে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল আর একজন—গর্ভু মাঝি। তার বাড়ি বারহেটের কাছে। বললে—আমার জমিনগুলান সব লিয়ে লিলে। আমি কিছু ধারি না। তবু লিলে। আমি লিই নাই। তবু জঙ্গিপুরের তুদের মুনসবি প্যায়দা এসে বুললেক—হাঁ তু টাকা লিলি। আদালতের হাকিম বুলেছে তু লিলি। এই লিখে দিছে।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক একজন নয়, দুই তিন চার পাঁচ দশ বিশ পঞ্চাশ একশো পাঁচশো সাঁওতাল উঠে দাঁড়াল। তারা সবাই বলবে। তাদের বুকের তুষানল আজ বাতাসে জ্বলে উঠতে চাচ্ছে। তারা বলবে।

পার্ণ্টন উঠে দাঁড়ালেন।—বাবালোক বৈঠ্ যাও, বৈঠ্ যাও। সব বৈঠ্ যাও। সব লোগের বাত হামি শুনবে। একসাথমে নেহি। বৈঠো।

একপাশে বসেছিল বাগনাডিহির চুনার মাঝি। তাদের গ্রামের তরফ থেকে বলবার বিশেষ কিছু নেই। সে বহুকষ্টে তার গ্রামকে দিকুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কোনমতে কাউকে ধার নিতে দেয় নি দিকুদের কাছে। তবু ডাক শুনে এসেছে। বলতে এসেছে—বড় কষ্ট। তারা ঘি বিক্রি করতে গেলে কখনও এক সেরের বেশী হয় না। ধান বিক্রি করতে গেলে ওজনে একমন ভরে না। তাদের ভাল ভাল কাঁড়ার দাম কখনও দশ-টাকার বেশী পায় না। এক সের ঘি বেচে দু সেরের বেশী নুন মেলে না। কেনে কেনে—কেনে তারা পাবে না?

তার পাশে বসেছিল সিধু আর কানু। সে তাদের সঙ্গে আনে নি। রেখে এসেছিল—বারণ করে এসেছিল তবু তারা চলে এসেছে তার পিছনে পিছনে। ভাগ্যক্রমে দেখতে পেয়ে বুড়ো চুনার মাঝি তাদের দুজনকে দুপাশে বসিয়ে রেখেছে। সিধুর হাতখানা সে জোরে চেপে ধরে রেখেছে। কিন্তু সিধু ক্রমাগত বলছে—ছাড় আপা (বাবা) ছাড়। ছেড়ে দে।

—না। বস। হবে। হবে। কিন্তুক তু উঠ্‌ছিস, সায়েবকে বুলবি কি?

—বোঙা যা বলেছে তাই বলব।

—বোঙা কিছু বলে নাই।

—বুলেছে। মানকীর কথা লালের কথা বুলতে বুলেছে আমাকে।

—কি বুলবি? কিরিস্তান তারা হল কেনে?

—তারা কানছেক। আমি শুনছি। কানছেক। বোঙা ইশেরা দিলে। ছাড় আমাকে।

—না। বস্ কর হে।

ওদিকে তখন কোলাহল ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসছে। সাহেবের সঙ্গের বন্দুকধারী চারজন হিন্দুস্তানী সিপাহী, জনকয়েক তীরধনুকধারী সাঁওতাল বরকন্দাজ, জনচারেক লাঠিধারী হিন্দুস্তানী বরকন্দাজ উঠে দাঁড়িয়ে হাঁকছে—বৈঠ্ যাও। বৈঠ্ যাও। বৈঠ্ যাও।

পার্ন্টিন সাহেব চেয়ারে বসবেন এমন সময় একজন সাঁওতাল - বেশভূষা তার ধূলিধূসর কিন্তু কিছুটা ভাল—সে বুক চাপড়ে ভাঙাগলায় চিৎকার করে উঠল—আমার ধরম ফিরে দে। আমার বিটী ফিরে দে। আমার ধরম আমার বিটী—ছুটো বিটী—টুকনী রুকনী—

বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সে অকস্মাৎ শুরু হল, তারপর ধড়াস করে আছড়ে পড়ে গেল মাটির উপর।

ফাগু চিৎকার করে উঠল—বিশু—

ছুটে এল ফাগু। ঝুঁকে পড়ল বিশুর উপর—বিশু বিশু, কি হলছেক?

সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল প্রবল হয়ে উঠল। সব মাঝি দাঁড়িয়ে উঠেছে। পার্ন্টিন সাহেবকে ছেড়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে বিশুকে। কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না। ফাগু তাকে ডাকছে—বিশু! বিশু!

মিঃ পোটেন্ট হুকুম দিলেন—দরবার উঠাও। বাংলোয় চল। সেখানে আমি রিপোর্ট লিখব বসে।

বন্দুকধারী সিপাহীদের চারপাশে রেখে পোটেন্ট সাহেব চলে গেলেন বাংলোয়।

ফাগু তখনও ডাকছে—বিশু বিশু বিশু! উঠ!

বিশু ক্ষীণকণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে সাড়া দিলে—ফাগু!

—হঁ। কিছুক কি বুলছিস তু? কি বুললি?

এবার আবার প্রাণপণে হা হা করে উঠল বিশু এবং তারই মধ্যে বললে—পাদরী সাহেবরা লিলে ধরম। টাকার লোভ দেখালেক। আর রাস্তাবন্দির সাহেবরা লিলে—

কেঁদে উঠল বিশু।

—বিশু!

বিশু বললে—জোর করে ধরে লিয়ে গেল—বাংলাতে ভরলে—

কণ্ঠস্বর তার আরও উচ্চতর হয়ে উঠল—লিলে টুকনীকে রুকনীকে—লিলে মানকীকে—মানকী বহু তাকেও লিলে—

অকস্মাৎ সমবেত জনতার মধ্য থেকে কে একটা চিৎকার দিয়ে উঠল—একটা জন্তুর মত চিৎকার।

—আ—

নয়ন পাল ছবি দেখিয়ে চলেছিল আর ছড়া বলে চলেছিল।—

"সিধুর গর্জন শুনে চমকিল জনে জনে
হাসিয়া নফর ভনে—স্মর, কালকেতু ব্যাধ
করিল গর্জন।"

পট-আঁকিয়ে নফর পালের বিশ্বাস ছিল সিধু সেই কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু ব্যাধ। এটা বলেছিলেন ত্রিভুবন ভট্টচাজ।

থাক।

পটের মধ্যে ছবিতে দেখলাম এবং ছড়ায় শুনলাম সিধু গর্জন করে উঠেছিল বিশুর মুখের খবর শুনে। তারা জাত হারিয়েছে। সে সপরিবারে টুকনী রুকনীকে নিয়ে ক্রীশ্চান হয়েছিল, লাল মাঝিও মানকীকে নিয়ে ক্রীশ্চান হয়েছিল। তারা রাস্তাবন্দিতে কাজ পেয়েছিল—ভাল কাজ। ক্রীশ্চান বলে তাদের কোম্পানির সায়েব ঠিকাদাররা ভাল কাজ দিয়েছিল। বিশু আর লাল সর্দারি করত। রুকনী টুকনী মানকী এরা তিনজন করত সাহেবদের বাগানে কাজ। তারা ক্রীশ্চান বলে আলাদা থাকত। সাঁওতাল মুনিষ সেখানে হাজারে হাজারে। তারা থাকে পাতার ঝুপড়িতে আর এরা থাকত তেরপলের ছোট তাঁবুতে।

ওই ঝড়ের দিন যেদিন বাজ পড়েছে বাগনাডিহির জহর সর্ণায়, রামচন্দ্রপুরের মা কালীর থানের শ্মশানের তালগাছে এবং আরও কত জায়গায়—সেই দিন রাত্রে সেই জল ঝড়ের মধ্যে রুকনী টুকনী আর মানকী তিনজনকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে রাস্তাবন্দির সাহেবরা।

সেদিন সন্ধ্যের সময় তিনপাহাড়ীর সাহেবদের বাংলোতে এসেছিল আর তিনজন সাহেব। তারা ওই ঝড়ের সময় বেরিয়ে এসে তাদের তাঁবুতে হানা দিয়েছিল। মদ খেয়ে তখন তারা চুর।

লাল এবং বিশু বাধা দিয়েছিল, কিন্তু ওরা দৈত্যের মত আক্রমণ করেছিল তাদের। বিশুকে মেরেছিল বুটসুদ্ধ লাথি, বিশু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। লাল ধনুক হাতে নিয়েছিল—তাকে এক সাহেব বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মেরেছে। তারপর রুকনী টুকনী মানকীর মুখ বেঁধে নিয়ে চলে গেছে।

তারপর পড়ল বাজ।

জ্ঞান হয়ে উঠে বিশু লালকে খুঁজে পায় নি। কেউ খবর বলতে পারে নি। লাল কোথায় কেউ জানে না। হয়তো মরে গিয়েছে।

সেই খবর শুনে আবার চিৎকার করে উঠল সিধু। কানু কাঁদল। আর মুর্মু ঠাকুরের বাড়ির কর্তা চুনার মাঝি মাথা হেঁট করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

সাঁওতালেরা সেদিন জটলা করে বলেছিল—চল আমরা ই জাগা থেকে চলে যাই। থাকব

নাই ই দ্যাশে, খাটব নাই রাস্তাবন্দিতে ; করব নাই দিকুদের গোলামি। পালাই, চ। পালায়ে যাই যি দ্যাশে দিকু নাই, যি দ্যাশে পুড়মান জেট ওই সাহেবরা নাই।

—কুথা সি দ্যাশ কুথা ?

কিন্তু সে দেশের খবর কেউ জানে না। কেউ জানে না।

পাণ্টিন সাহেব বাংলো থেকে বেরিয়ে তাদের বলেছিলেন—বাবালোক, হামি টুমাডের সব কঠা কমিশনরকে লিখছি। সবুর করো বাবালোক, সবুর করো।

কথাটা শুনে সকলেই স্তব্ধ হয়েছিল। কিন্তু সে-স্তব্ধতা আশার প্রসন্ন স্তব্ধতা নয়। সংশয়ে তিক্ত। বহু লোকের মিলিত দীর্ঘশ্বাসের শব্দ একটা অজগরের গর্জনের মত শুনিয়েছিল।

নয়ন পালের ছড়াতেও তাই আছে—

"সাঁওতালেরা ফোঁসে হায় (যেন) অজগর গরজায়
সিধু কান্থ দুই ভাই হুঙ্কার করিয়া কহে বাত।"

সিধু বলে উঠেছিল—কি করবি তু সাবেব ? মহেশ দারোগা কালা আদমী মোটাপেটা দিকু—সি বুলে, তুকে সি মানে না। বুলে—পাণ্টিন কে বটেক ? উকে আমি মানি না। তার তু কি করলি ?

মিঃ পোটেণ্টের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল।

বিশু চিৎকার করে বলে উঠেছিল—তুদের সব ফাঁকি। তুরা দৈত্যি বটিস,—সাদা দৈত্যি। দে আমার দুটো বিটী ফিরায়ে দে, আর এই চুনারের বিটী ফিরায়ে দে। দে রুকনী টুকনী মানকীকে ফিরায়ে দে—এখুনি দে। তু খত লিখবি তারপরে সি কবে তখন জবাব আসবে আমাদের বিটীগুলাকে সাহেব তিনটে—

অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল চুনার।

এর দিন বিশেক পর।

নয়ন পাল ছড়ায় বললে—

"চুনারের মৃত্যু হৈল শ্রাদ্ধ আদি শেষ কৈল
তারপর বার হৈল দুই ভাই বিশ দিন বাদ—"

কুড়ি দিন পর। নয়ন পালের পটে দেখলাম একটা ছবি।

সে ছবি আমার মনশ্চক্ষের সামনে যেন অতীতের যবনিকা তুলে দিল। ১৮৫৪।৫৫ সালের এদেশের জ্যৈষ্ঠ শেষের রোদে পোড়া লাল মাটি ভেসে উঠল। মধ্যে মধ্যে শালগাছের ঝোপ-ভরা খানিকটা জায়গা—তারপর খানিকটা শালবন—তারপর শুধু প্রান্তর—মধ্যে মধ্যে গ্রাম, আবাদী জমি—তার মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে লাল কাঁকুরে মাটির উপর গরুর গাড়ির চাকায় গরু বাছুরের পায়ের ক্ষুরে মানুষের পায়ে পায়ে তৈরি লাল ধুলাচ্ছন্ন পথ। বৈশাখে সেই ভয়ংকর কালবৈশাখীর পর আরও একটা দুটো ঝড় হয়েছিল। তারপর দ্বাদশ সূর্যের উদয়ে পৃথিবী যেন ঝলসে গিয়েছে। লাল ধুলো উড়ছে ঘুর্ণির পাকে পাকে।

ভরা দুপুরে তিনজন সাঁওতাল চলেছে হনহন করে। মাথায় সাদা মোটা কাপড়ের পাগড়ি, পরনে মোটা সাঁওতালী তাঁতের কাপড়, বুকে একখানা চাদর কোমর এবং বুক জড়িয়ে বাঁধা। কাঁধে টাঙি ধনুক এবং শানানো ঝকঝকে তীরের গোছা। এবং কোমরে বাঁধা একটা পুঁটুলি।

চলেছে দীর্ঘ সবল পদক্ষেপে। একটু ঝুঁকে পড়েছে সামনে। যেন মনের গতির সঙ্গে ঠিক চলতে পারছে না। যাবে তারা তিনপাহাড়। সিধু কানু আর বিশু। সিধু কানু প্রতিজ্ঞা করেছে জহর সর্ণায় অর্থাৎ দেবস্থানে ওই তিনটে মেয়েকে তারা ছিনিয়ে আনবেই। আর ওই সাহেবদের উপর শোধ নেবেই। জান কবুল।

চলেছে তারা হিরণপুরের হাট হয়ে পাকুড়ের পথে। সেখান থেকে পীরপৈঁতি হয়ে তিনপাহাড়। এইখানেই রাস্তাবন্দির কাজ চলছে। সাহেবদের একজন থাকে পীরপৈঁতিতে, একজন থাকে পাকুড়ে, একজন থাকে তিনপাহাড়ের কাছে। তিনপাহাড়ে কয়েকজনই সাহেব থাকে। তাদের কাছেই এ সাহেব তিনটে থাকে। তারা খুঁজতে খুঁজতে যাবে।

বিশু বলেছে—হয়তো উরা এক একজনা এক একটাকে লিয়ে আটক করে রাখছেক।

তিনজনেই নির্বাক। বুকে আগুন জলছে।

পথে পড়ে রামচন্দ্রপুর, রাস্তা থেকে একটু দূর। বিশু বললে—আয়, বাবাঠাকুর বলিছে উয়ার সাথে দেখা করতে। উয়ার মতুন বাঁবড়ে ঠাকুর দেখিস নাই। উ আমাকে একবার বাঁচালছিল। উ কালীসিদ্ধ বটে। উয়ার বিটীর যে কি হল? কেউ জানে না। সিও ওই ঝড়ের দিন বেটে। উর বিটী ঘর থেকে চলে গেইছিল সন্ন্যেসী হঁয়ে। তাঁকে চিনতম। রাঁড় বিটী বেটে। ছুটুবেলাতে রাঁড় হইছিল। বজ্জাত দিকুদের খারাব কথাতে ঘর থেকে চলে গেইছিল। হদিস ছিল নাই। আমরা যখন গেলম তিনপাহাড়ে খাটতে, তখন দেখলম বনের ধারে একটো গাঁয়ে কালী ঠাকুরের ঘর গড়ে পুজো করেক। বাবার মতুন হইছে বিটীটো। লোকে বলে মা ভৈরবী। কালী কথা বলে তার সাতে। সেই ঝড়ের রাতে কি হয়েছিল কে জানে, সোকালে লোকে দেখলেক ঠাকুর ভেঙে পড়ে রইছে—মা ভৈরবী হাঁরায়ে গেছে। কুথাও নাই। বাঘে লিলেক কি কি হল খবর হল নাই। কত খুঁজেছে লোকে তা পায় নাই। যখন আমি তিনপাহাড় থেক্যা লিটিপাড়ায় এলম সিদিন বাবাঠাকুরকে হুইখানে হুই যে ঝোঁপটো উইখানে উর দেবতা থান—সেই গেলম উকে বললম। বললম ঠাকুর তুর বিটীকে বাঘে খেলেক—আমার ছুটো বিটীকে সায়েবে লিলে। কি করব ঠাকুর তু বুল, বুলে দে।

ঠাকুর খানিক চুপ হয়ে বসে রইল—তারপরে বললেক—দাঁড়া বিশু, আমি মাকে শুধাই। খড়ি পেতে দেখি। আর কাঁদি রে এখন। আমি এখন কাঁদি। তুঁ আজ যা। আজ যা। ইয়ার পরে আসিস। কিন্তক আসিস। তো চ, বাবাঠাকুরের কাছে হঁয়ে যাই। উয়ার সঙ্গে দেবতার কথা হয়।

কানু বললে—সি সিধুর হলছে।

সিধু বললে—না। হবে। হয় নাই। হবেক—আমি জানি। ইশেরা আমার

মিলছে। আমার মন বলছেক।

—তেবে চল সিধু একবার বাবাঠাকুরের কাছে চল। সি অ্যানেক জানে রে। বুলে দিবেক। ঠিক বুলে দিবেক।

—চল তেবে।

নয়ন পাল গাইলে—

"তন্ত্রসিদ্ধ ত্রিভুবন একদৃষ্টে তাকায়ে রন
সিধু কানু দুইজন ভাইদের পানে।"

সিদ্ধাসনের বেদির উপর বসে দীর্ঘাকৃতি, রোদে পোড়া গায়ের রঙ, বড় বড় রাঙা চোখ, দাড়ি গোঁফ চুলওয়ালা ত্রিভুবন ভট্টচাজের সে দৃষ্টি দেখে বিশু ভয় পেয়েছিল। কিন্তু সিধু কানু ভয় পায় নি।

বলেছিল—এমন করে তাকায়ে রইছিস কেনে ঠাকুর?

বিশু হাত জোড় করে বলেছিল—বাবাঠাকুর, ইয়ারা ভাল লোক গ। বোঙ্গার ইশারা মিলছেক ইয়াদের। বাবাঠাকুর—

নয়ন পাল গাইলে—

"দিব্যদৃষ্টি ত্রিভুবন, উঠিয়া দাঁড়ায়ে কন—
চণ্ডীর স্নেহের ধন আয় তোরা আয় বুকে আয়।"

তিনি নাকি তাদের কালকেতু আর বিরূপাক্ষ বলে চিনেছিলেন। ওই ঝড়ের রাতে তিনি প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন চণ্ডীর কাছে। এবং বলেছিলেন—তুদের লেগে বসে আছি রে আমি। সেই ঝড়ের রাত থেকে। আজ আলি, আয়—আয়। ওরে যে তোদের মরংবোঙ্গা সেই আমার স্থাংটা বেটী! কালী মা! হাঁ রে। তেমনি তোদের চেহারা বটে! বটে! লে—তোদের লেগে আমি কবচ নিয়ে বসে আছি—

গোল তামার কবচ—গাড়ির চাকার মত, মধ্যখানে একটা ছিদ্র—তাতে চণ্ডীর বীজ লেখা—সেই কবচ তাদের হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন।—যা তোরা দিগ্বিজয় করবি। আমি শুনেছি রে লিটিপাড়ায় যা হয়েছে শুনেছি। মা আমাকে স্বপ্ন দিয়েছে। ঝড় উঠেছে বাজ পড়েছে, তোদের নাচবার সময় হয়েছে। নাচ গা তোরা।

'চণ্ডী দেন শক্তিপ্রসাদ নাহি ভেদ বামুন ব্যাধ
দেবাসুর—এ আস্বাদ যার পুণ্য সেই জন পায়।
যে করিবে অত্যাচার পতন হইবে তার
পীড়িত সন্তানে মার করুণা যে বর্ষিছে সদাই।"

সিধু তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল স্থিরদৃষ্টিতে। সে বলেছিল—হাঁ ঠাকুর, আমাদের বোঙ্গাও তাই বুলছে। আমার মন বুলছে। কি দাদা হে, বুলে না?

কানু বলেছিল—হঁ, বুলছেক বুলছেক। যিদিন থেকে শুনছি মানকী টুকনী রুকনীর কথা, সিদিন থেকেই বুলছেক।

শুনতে শুনতে আমার মন চলে গেল ইতিহাসের পাতায়। হাণ্টার সাহেবের বিবরণে আছে—। থাক থাক, ইতিহাস থাক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ—সারা ইউরোপের মানুষ তখন সামান্য অমঙ্গলের চিহ্ন দেখলে গায়ে ক্রশ আঁকে। ক্রায়েস্টের নাম করে। বুকে ক্রশ ঝুলিয়ে রাখে। তাতে বল পায়।

না, সে চিন্তারও অবকাশ নেই। নয়ন পাল ছড়ায় গল্প বলে চলেছে—সেই ছড়ার ছবি পটে ফুটেছে, ছবিতে দেখলাম, বুকের জ্বালায় প্রচণ্ড ক্ষোভে তিনজন তারা চলেছিল পাকুড়ের পথে। ঠাকুর কবচ দিয়েছেন সিধুকে কানুকে—বিশুকে দেন নি। বিশু চাইতে ভরসা পায় নি। সে ক্রীশ্চান হয়ে গেছে। নিজের ধর্মকে ছেড়েছে, নিজের মনেই তার অপরাধের সীমা নেই। কিন্তু বুকের আগুন তার সমান জ্বলছে। অনুশোচনা তাকে নিরন্তর যেন দাউদাউ করে জ্বালাচ্ছে।

গতি তাদের দ্রুত থেকে যেন দ্রুততর হয়ে উঠছে।

হিরণপুরের হাট পর্যন্ত দুধারে সাঁওতাল গ্রামের মানুষেরা বটগাছের তলায় জটলা করছে। শালপাতার সংকেত এসেছে তাদের কাছে।

লিটিপাড়ার মজলিসের পর আরও মজলিস হয়েছে। সে মজলিস থেকে এই শালপাতা পাঠিয়ে গ্রামে গ্রামে জানানো হয়েছে:—

"দিকুদের কাছে কেউ যেন টাকা ধান ধার না নেয়। তারা মানুষ নয়—বাঘ। তারা খেয়ে নেবে।

জমির খাজনা কোন সাঁওতাল যেন মহিষের হালে আট আনা আর গরুর হালে চার আনার বেশী না দেয়।

ক্রীশ্চান পাদরীদের কথায় কেউ যেন ক্রীশ্চান না হয়। সাদা পুড়মান জেটেদের কাছে সাবধান। তারা সাঁওতালদের কুড়িদের কেড়ে নিবে।

সব সাঁওতাল যেন আপন আপন ধনুক শক্ত করে।

কাঁড়গুলি শানিয়ে রাখে। নতুন কাঁড় তৈরী রাখে।

বোঙ্গা কথা বলবেন। শীগগির কথা বলবেন।"

সিধু কানু বিশুকে দেখে তারা ডাকে।—কুথা যাবি তুরা? তুরা কুন গাঁয়ের বেটিস?

সিধু কানু বিশু দাঁড়িয়ে বলে—দাঁড়াবার বেলা নাই হে। অ্যানেক দূর যাব হে।

—কুথা হে?

—অ্যানেক দূর। অ্যানেক দূর। অ্যানেক ঠাঁই।

—সাবধানে যাস গ। দিকুরা সব গরম হইছে। তারা শুনেছেক কি সাঁওতালেরা চুলবুল করছেক। মহেশ দারোগা গাঁভারছে বাঘের মতুন। বুলছে ধরব আর জেহেল দিব।

সিধু শক্ত হয়ে ওঠে। কানু ভাইয়ের দিকে তাকায়। বিশু মৃদুস্বরে বলে—সিধু কানু

চল হে! ইখানে কিছু লয় হে!

আরও কিছুদূর এসে থমকে দাঁড়াল বিশু।

সিধু বললে—দাঁড়ালি কেনে?

—হুই পাকুড়!

—হুই পাকুড়?

—হঁ। পাকুড়ে ঢুকব নাই হে এখুন।

—ঢুকবি না? তবে আলি কেনে?

—চুপ কর হে। কথা শুন আমার। উখানে দিকুরা আছে। রাজারা আছে। সাহেব থাকে। চাপরাসী থাকে। দেখে যদি চিনে ফ্যালে আর তুরা যদি রাগ সামলাতে লারিস তবে সব মাটি হবেক।

—না কিছু করব নাই। চল।

—না সিধু। তুর মুখ দেখে ভয় লাগছেক। চল এখুন ওই বনে ঢুকি। বুঝলি! রাতকে আঁধারে আঁধারে পাকুড় ঢুকব। তারপরেতে খবর লিব। সায়েবের আস্তানা আমি চিনি। ইখানে রাস্তাবন্দির মাঝিদিগে চিনি। রাতে গিয়া শুধাব।

—হঁ। তেবে তাই চ।

তারা বাঁ দিকে উত্তর মুখে পাতলা শালবনটার মধ্যে দিয়ে যে পায়ে চলা পথটা চলে গেছে সেই পথ ধরলে।

গভীর রাত্রি। অন্ধকার পক্ষ। অরণ্যের অন্ধকার গাঢ়তর; যেন চামড়ার মত পুরু। বড় বড় গাছগুলোর উপরের ডালপালা পাতার তলায় ছোট বড় গাছগুলোর গুঁড়িগুলোকে অন্ধকারে গড়া স্তম্ভের মত মনে হচ্ছে। বনটা থমথম করছে। সে এক বিচিত্র থমথমে ভাব। কারণ অজস্র ঝিল্লীর শব্দতরঙ্গ অবিচ্ছিন্ন অবিরাম একটানা বয়ে যাচ্ছে শব্দের ঝরনার মত। তবু মনে হবে—মানুষের মনে হবে কি নিদারুণ স্তব্ধতা।

মধ্যে মধ্যে কচিৎ ডেকে উঠছে কোন জানোয়ার। বাঘ এ অঞ্চলে বড় নেই। আছে চিতাবাঘ ঝিঙেফুলি। চিতার অধিকাংশই গোবাঘা। ঝিঙেফুলিগুলো বড়—তারা মানুষ মারে। বড় বড় মহিষ মারে। তারই একটা আধটা ডেকে উঠছে।

কখনও ডেকে উঠছে হরিণ। কখনও তাদের ছুটে চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর শব্দ উঠছে ঝরনার। পাহাড় থেকে ঝরনা ঝরে পড়ছে কোথাও কোথাও।

নীরন্ধ্র অন্ধকার।

এই নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে বনের গভীরতম অংশে কোথাও একটা আগুন জ্বলছিল।

আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে সেই আলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল—আমি অগ্রসর হয়ে চলেছিলাম। অনেক পিছনে ফেলেছি আমি সিধুকে কানুকে বিশুকে।

তারা আশ্রয় নিয়েছিল বনের প্রান্তে। রাত্রে গিয়ে সন্ধান নিয়ে আসবে। খবর নিয়ে আসবে এখানকার বাংলোয় সাহেব কোন মেয়েকে রেখেছে কি না।

কিন্তু গিয়ে খবর এনেছে—না। এখানে নেই।

সে নিশ্চিত জেনেছে। সায়েব এখানে এনেছিল একটা মেয়েকে কিন্তু সে আর নেই। সায়েব গেছে তিনপাহাড়ী।

আমার মন তাদের পিছনে রেখে অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে এই অগ্নিশিখার আকর্ষণে এগিয়ে চলেছে।

একটি ঝরনার পাশে পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা। সেই গুহার সামনে একখানা অল্প ঢালু প্রশস্ত পাথরের উপর একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে।

সামনে বসে একজন ভৈরবী। আগুনের কুণ্ডের সামনে বসে তিনি আহুতি দিচ্ছেন আর মন্ত্রপাঠ করছেন মনে মনে। ঠোঁট দুটি নড়ছে।

খানিকটা দূরে একটি আশ্চর্য সুষমাময়ী কালো কষ্টিপাথরে গড়া মূর্তির মত একটি মেয়ে। একদৃষ্টে সে দেখছে এই ক্রিয়াকাণ্ড। দীর্ঘাঙ্গী। আয়ত চোখ। চুলগুলি খোলা এবং রুক্ষ। চুল ঘন—কপাল পর্যন্ত ঘিরে তার বিস্তৃতি কিন্তু দৈর্ঘ্যে খাটো, তার জন্যে ঝাঁকড়া হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

ক্রিয়ার ক্রমে আহুতি দেওয়া স্থগিত রেখে ভৈরবী বললেন—রুকনী!

কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটি বিশুর মেয়ে রুকনী। রুকনী চমকে উঠল—তারপর বললে—ই—

ভৈরবী বললেন—ডাক লালকে।

রুকনী অনুচ্চকণ্ঠে ডাকলে—দাদা হে!

গভীর জলে যেন একটা ঢিল পড়ল। অরণ্যের সেই বিচিত্র স্তব্ধতা যেন শব্দটির পরই প্রতিধ্বনির গোলাকার তরঙ্গ তুলে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে, দূর দূরান্তে মিলিয়ে গেল।

নয়ন পালের পটে সেই ঝড়ের রাত্রে তিনপাহাড়ীর ক্রোশ দুয়েক দক্ষিণে গ্রাম প্রান্তের কালীতলায় সেই ডেভিল ডিউইর সঙ্গে দেখেছি এই ভৈরবীকে।

ডেভিল ডিউই সেই দুর্যোগের রাত্রে এই আশ্রয়দাত্রী অসহায়া সন্ন্যাসিনীর উপর, বাঘ যেমন করে হরিণীর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে—তেমনি করেই লাফিয়ে পড়েছিল।

ত্রিভুবন ভট্টচাজের নিরুদ্দিষ্টা বালবিধবা মেয়ে।

নয়ন পাল বলেছিল—মেয়েটির নাম ছিল শ্যামাময়ী। বালবিধবা মেয়েটিকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে ভট্চাজ বলেছিলেন—এই মন্ত্র জপ কর। তুই যে ধূমাবতী হবি আমি জানতাম। তোর রাশিচক্র বিচার করে দেখেছি। তা কি করব! বামুনের মেয়ে। এই তোর ইহকাল—এই তোর পরকাল।

সেই পরকালের পথে সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী হয়েছিল লোকনিন্দার জ্বালায়। ঘুরতে ঘুরতে ওই গ্রামটির প্রান্তে ওদের গ্রামের কালীস্থানে আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রামের লোক ভৈরবীকে পেয়ে খুশী হয়েছিল ভৈরবীর মতিগতি রকমসকম দেখে। কয়েক দিনের মধ্যেই স্থানটিকে ঝাঁটপাট দিয়ে এমন মনোরম ক'রে তুলে তারা বলেছিল—মা, এখানেই তুমি থাক।

তারাই গড়ে দিয়েছিল ঘর, চালা।

যে শিলাখানিকে আগে মা কালী বলে পূজা করা হত ঘরের মধ্যে সেখানিকে রেখে ভৈরবী তার পাশেই মাটির কালীমূর্তি তৈরী করিয়ে রেখে নিত্য পূজা করতেন। প্রথম বৎসরই যে মূর্তি কালীপূজার সময় তৈরী করিয়েছিলেন তাকে আর বিসর্জন দেন নি। বেশ আনন্দেই ছিলেন।

হঠাৎ জীবনে সেদিন সেই প্রাকৃতিক উন্মত্ত তাণ্ডবের মধ্যে তাঁর জীবন যেন ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে গেল।

সেদিন ভৈরবীর চেতনা হয়েছিল রাত্রি দ্বিপ্রহরে শিবারবে। তখন চারিদিক দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। খোলা ঘরটার ভিতরের প্রদীপটা উতলা বাতাসের ঝাপটায় নিভে গেছে। ভৈরবী উঠে বসলেন। বসে রইলেন কিছুক্ষণ। মাথার ভিতর কেমন যেন একটা আচ্ছন্নতা রয়েছে। মনে হল দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বোধগম্য হল যে, না, স্বপ্ন নয়। সব সত্য। নিষ্ঠুর সত্য। তিনি পড়ে আছেন সেই চালাটার মধ্যে। আশে পাশে হাত বুলিয়ে দেখলেন। কিছু পেলেন না। ভিজে সব ভিজে। বৃষ্টির ঝাপটায় সব ভিজে গেছে। তাঁর পরনের কাপড় ভিজে গেছে। সমস্ত দেহে একটা অবসাদ যেন তাকে দুর্বল করে ফেলেছে। পিঠের দিকটায় যন্ত্রণা অনুভব করছেন। মনে পড়ল পশুটা যখন তাঁর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল তখন পাথরের খোঁচায় আঘাত লেগেছিল। মুখে হাত বুলোলেন,—ফুলে উঠেছে কপাল এবং নাকের পাশটা। বর্বর দৈত্যটা তাঁকে ঘুষি মেরেছিল।

অকস্মাৎ তিনি আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলেন। হা হা শব্দের ধ্বনি শিবারবের শেষটুকুর সঙ্গে মিশে মিলিয়ে গেল। মাথার উপরে গাছের শাখাপল্লবের মধ্য থেকে কয়েকটা বাদুড় শব্দ করে পাখা ঝাপটে উড়ে গেল।

তারপর তাঁর কান্নায় ভাষা ফুটল—এ কি করলি মা?

কিছুক্ষণ কেঁদে ক্লান্ত হয়ে স্তব্ধ হলেন। তারপর উঠলেন। অন্ধকারের মধ্যেও তিনি দেখতে পাচ্ছেন। অন্ধকার যত ঘন হোক মানুষ চোখ বন্ধ করে বা হতচেতন হয়ে যখন থাকে তখন সে নিবিড়তম অন্ধকারে দৃষ্টি হারায়, প্রকৃতির অন্ধকার তার থেকে অনেক কম ঘন।

মৃত্যুর অন্ধকার আর সৃষ্টি-জগতের রাত্রির অন্ধকারে অনেক প্রভেদ। রাত্রির অন্ধকার—হোক অমাবস্যা—আকাশে নক্ষত্র থাকে; অন্ধকারের মধ্যে গাছপালা পাথর জমাট অন্ধকারের মত নিজের অস্তিত্বকে দৃষ্টির সম্মুখে জানিয়ে দেয়; আকাশে মেঘ থাকলেও মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আভাস চকিত দীপ্তিতে সব কিছুকে ভাসিয়ে দেয়। মৃত্যু বা হতচেতনার মধ্যে চোখের পাতা নেমে আসে—তার মধ্যে কিছু নেই। ঘুমের মধ্যে থাকে স্বপ্ন—হতচেতনার মধ্যে মৃত্যুর মধ্যে অন্ধকার স্বপ্নহীন—কালো কষ্টিপাথরের দেওয়ালের মত। সেই অন্ধকার থেকে রাত্রির অন্ধকারে চেতনা পেয়ে চোখ মেলে তিনি সব দেখতে পাচ্ছেন। সেই পশুটা নেই সে তিনি প্রথমেই দেখেছেন। তারপর মনে হল সে কি মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে?

উঠলেন তিনি। ধীরে ধীরে তাঁর শোকার্ত হতাশা অসহায় বেদনা কেটে গিয়ে জেগে

উঠতে লাগল একটা ক্রোধ একটা হিংসা। নেমে এলেন তিনি ওই চালাটা থেকে। তারপর সন্তর্পণে গিয়ে কালী ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন দরজাটা খোলা হাঁ-হাঁ করছে। ভিতরটা বাইরের অন্ধকার থেকে গাঢ়তর। ভৈরবী একখানা ভারী ওজনের পাথর তুলে নিয়ে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ঘরের চারিপাশে খুঁজছেন তিনি। ওই কি! ওই সে! দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে—

মুহূর্তে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পাথরটা তুলে মেরেছিলেন—পরক্ষণেই নিজে চিৎকার করে উঠেছিলেন—মা—

খেয়াল হয়েছিল—কালীমূর্তি! কালো নিবিড়তম তমসার পুঞ্জীভূত আত্মাশক্তির মূর্তি যে! কালীমূর্তিটিও সশব্দে ভেঙে পড়েছিল—তিনিও আবার পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন।

আবার চেতনা হয়েছিল শেষরাত্রে। তৃতীয় প্রহরের শিবারব তখন সদ্য শেষ হচ্ছে। এবার অনুভব করেছিলেন মাথায় নিদারুণ যন্ত্রণা। হাত দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন মাথাটা ফেটে গেছে পাথরে লেগে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন—তার মধ্যে আশ্চর্যভাবে জগৎ সংসার অতীত বর্তমান যেন মধ্যে মধ্যে হারিয়ে সব যেন ভুল হয়ে যাচ্ছিল। একটা আশ্চর্য শূন্যতার মধ্যে হতবাক হতচেতন হয়ে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যে একবার চেতনা ফিরে পেয়ে হাতড়ে খুঁজে চকমকি ঠুকে তাতে গন্ধক-লাগানো পাতকাঠি ধরিয়ে প্রদীপ জ্বেলেছিলেন। তারপর ভগ্ন কালীমূর্তির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখে নিজের ত্রিশূল আর ঘটের তলা থেকে তাঁর সাধনার তামার তৈরী চক্রটি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কালীস্থান থেকে। আকাশে তখন মেঘ কেটে গেছে। পশ্চিম দিগন্তের এক প্রান্তে সামান্য দীপ্তির একটি আভাস ফুটে উঠেছে—তিথিতে আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী। এ আভাস কৃষ্ণা চতুর্দশীর চাঁদের। মাত্র দু দণ্ড রাত্রি আছে আর। তিনি পথ ধরেছিলেন সেই বনের দিকে যে বনটায় কাল ডিউই শিকার করতে গিয়েছিল।

ওই বনের মধ্যে দিয়েই পূর্বমুখে পথ ধরবেন; যেতে যেতে নিশ্চয় মিলবে গঙ্গার তীর। পাড়ের উপর থেকে 'নাও মা' বলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

সারা দেহে তাঁর পশুর পাশব অত্যাচারের অবর্ণনীয় জ্বালা! মধ্যে মধ্যে আপনার অজ্ঞাতসারে চিৎকার করে ওঠার মত চিৎকার করে উঠেছেন—আঃ—মাঃ—আঃ! মা মা! আঃ—

গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরা কিন্তু তাঁর হয় নি। যেতে যেতে আবার নিবিড় বনের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। মাথার যন্ত্রণায় মানসিক দাহে অনিয়মে অনাহারে একটা গাছের তলায় শুয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

জ্ঞান যখন হল তখন দেখলেন তাঁর পাশে একটি সাঁওতাল মেয়ে, একটি পুরুষ।

লাল মাঝি আর রুকনী।

লাল মাঝি মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য—বিশু মাঝি তখনও

পড়ে রয়েছে অজ্ঞান হয়ে। লালের মাথা থেকে রক্ত ঝরছিল। কিন্তু তাতে তার গ্রাহ্য ছিল না। মনের মধ্যে ঝড় বইছে—বুকে জলছে আগুন! মানকী রুকনী টুকনী।

ওই পুড়মান জেটেরা জোর করে নিয়ে গেল তাদের। তাদের উপর—। হে মরংবোঙ্গা —হে বাবা ঈশা—হে মা মেরী—তার মানকী রুকনী টুকনীকে ফিরে দে! ফিরে দে! ফিরে দে! ওই দত্যির মতুন সাদা মানুষগুলা তাদের উপর বাঘের মতুন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদিকে খেয়ে ফেলছে। পাহাড়ী চিতির মত দুই হাতে জাপটে ধরে পিষে—; আ হা হা! হে বোঙ্গা!

ভাবতে ভাবতে সে ক্ষেপে উঠেছিল। বাঘের বাঘিনীকে তীর বিঁধে মারলে যেমন বাঘ ক্ষেপে ওঠে তেমনি ক্ষেপে উঠেছিল। বাঘের মতই সন্তর্পণে সে বেরিয়ে পড়ে সাহেবদের বাংলোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। কোথায় কান্নার শব্দ উঠছে! কোথায় আর্ত চিৎকার উঠছে! কোথায়!

অবিরাম অশ্রান্তভাবে সে শুধু বাংলোগুলোর চারিপাশে পাক দিয়ে ফিরছিল।

হঠাৎ একটা বাংলো থেকে, তখন প্রায় শেষ রাত্রি, একটা মূর্তি দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল ঝড়ের মত।

লাল কাঁড় জুড়েছিল ধনুকে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই সে চিনতে পেরেছিল—লম্বা একটি কালো মেয়ে।

কে? কে? লাল মাঝি চাপা গলায় ডেকেছিল—মানকী!

থমকে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা। কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণ ভঙ্গি শুনে সে বুঝতে পেরেছিল, যে ডাকছে সে তার স্বজাত। পরমুহূর্তেই ঠাওর করে নিয়েছিল সে কে। মানকীর নাম ধরে ডাকছে যে, সে নিশ্চয়ই লাল। হাঁ, লাল মাঝি—তার দাদাই বটে।

আবার লাল ডেকেছিল—মানকী!

—আমি রুকনী।

রুকনী তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।—দাদা!

—রুকনী!

—হাঁ। আমি সায়েবটাকে খুন করে পালায়ে এঁইছি। দত্যিটো আমার—। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

—চুপ কর। উরা কুথা?

—মানকী টুকনীকে নিয়ে গেইছে সেই সায়েব দুটো, যারা রাজমহলের কাছ থেকে আইছিল তারা। তু আমার পথ ছাড় দাদা, সায়েবটা মদ খেঁয়ে ঘুমাইছিল—আমি তার কিরিচটো নিয়ে বুকে ভ্যাঁক করে বিন্ধা দিলম—আবার বিন্ধলম—আবার দিলম—এই ত্যাখ লহুতে আমার সব ভিজে গেইছে। এই দেখ কিরিচটো। কেউ জাগবে আর দেখবেক তো—।

বলতে হয় নি, সেই মুহূর্তে উঠেছিল কুকুরের ডাক।

কুকুরটা টের পেয়েছে। ঘেউ ঘেউ শব্দ করছে। বেরিয়ে আসবে এখুনি—ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের উপর।

তারা দুজনে ছুটেছিল। কিন্তু কুকুরের ডাক এগিয়ে আসছে। লাল বলেছিল—বস্ রুকনী, এই গাছটোর আড়ে বস্। আসুক শালা, কাঁড়ে বিঁধব।

লাল বসেছিল ধনুকে কাঁড় জুড়ে, আর রুকনী তার পিছনে কিরিচটা ধরে।

•

প্রতিহিংসায় জর্জর সাঁওতাল জোয়ান—তার হাত কাঁপে নি, বুক কাঁপে নি। কুকুরটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে বিঁধে দিয়েছিল। আর্ত চিৎকার ক'রে কুকুরটা ছটফট করছিল। অত্যাচারিতা সাঁওতাল মেয়ে সদ্য একটা খুন করে এসেছে—তার মাথায় খুন ঘুরছে—বুকে তার আগুন জ্বলছে—সে লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে তার কিরিচ দিয়ে বার বার আঘাত করে বলেছিল—এই লে! এই লে! এই লে। কিন্তু বাংলোটা তখনও নিস্তব্ধ।

আমি মনশ্চক্ষে দেখছিলাম, কলোনীর নেশায় প্রমত্ত দিগ্বিজয়ী ইংরেজটা তখন মরেছে। নারীদেহ উপভোগের আনন্দ সুখস্বপ্নের আচ্ছন্নতার মধ্যেই মরেছে। কোন ক্ষতি নেই, কোন আক্ষেপ হয় নি তার মৃত্যুতে। এরপর ঝড় উঠবে—অন্য ইংরেজরা তুফান তুলবে। গুলির শব্দ, বারুদের ধোঁয়ার গন্ধ। রক্তপাত হবে, মাটি ভিজবে, এম্পায়ারের ভিত শক্ত হবে।

নয়ন পাল বলছিল—

লাল রুকনীকে নিয়ে ছুটেছিল। পালিয়ে চল পালিয়ে চল। কোথায়? সে তাদের মনে হয় নি। ছুটেছিল তারা বন লক্ষ্য করে। নিবিড় বন। বনে বাঘ আছে, ভালুক আছে, সাপ আছে, কিন্তু তাদের তারা ভয় করে না। তারা বাঘকে পারে, তারা ভালুককে পারে, তারা সাপকে পারে। পারে না তারা এই মানুষদের। পুড়মান জেটদের, দিকুদের, তুরুকদের। যারা ভাল পোশাক পরে, যারা ভাল ঘর বানায়, মোকাম বানায়, বড় বড় শহর তৈরী করে, তাদের।

প্রায় ভোর তখন, তখন পেয়েছিল বনের আশ্রয় প্রান্তভাগ। আলো তখন ফুটছে। শিউরে উঠেছিল লাল।

—রুকনী!

—হাঁ—

—তুর কাপড়টো যি লাল হয়ে গৈছে! ই বাবা! তুর মুখে চুলে গায়ে যি সব রক্ত লেগে রইছে! ই বাবা!

—উকে বারে বারে বিঁধলম যি। এই লে! এই লে। এই লে। বিঁধলম আর তুললম—আবার বিঁধলম, আবার তুললম। ভলভলায়ে রক্ত বেরায়লো। ছুটে এসে লাগল।

—তা হলে বাঁয়ে ঢোক। ডাইনে ই পথ ছাড়। কখুন কার সঙ্গে দেখা হবেক। চল বনের ভিতরে! ঝরনাতে সব কেচে ফেলাবি। মাটি মাখায়ে কাচবি কাপড়। তখুন বুঝতে লারবেক। চল।

গভীর থেকে গভীরতর বনের ভিতর তারা চলেছিল সারা সকালটা। কত গভীরে তা

তাদের নিজেদেরও ঠাওর ছিল না। চোখ ছিল তাদের শুধু নিবিড়তর বনসন্নিবেশের দিকে। যেখানে উপর থেকে রোদের ঝলক শুরুবোঙ্গার রূপোর বল্লমের মত এসে বিঁধে মাটিতে গেঁথে দাঁড়িয়ে নেই।

অন্ধকার, যেন কালো মেঘে শুরুযবোঙ্গাকে ঢেকে দিয়েছে এই নিবিড় জঙ্গল। আর চাই ঝরনা। জল খেতে হবে। চান করতে হবে রুকনীকে। কাপড়টা কাচতে হবে, মাটি মাখাতে হবে।

ক্রমশঃ উঁচুতে পাহাড়ের পাথরে পাথরে উঠে নিবিড় অন্ধকার পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল তারা। কান পেতে শুনছিল ঝরনার ঝরঝর বা মৃদু কুলকুল শব্দ। এখন বৈশাখ মাস— ঝরনার বেগ এখন প্রখর নয়, কিন্তু কাল বর্ষা গেছে—আজ জল পড়বে ঝরঝর শব্দে। বর্ষার ঝরনা ঝরার শব্দের মত।

শুনতে পেয়েছিল। ওই দিকে উঠছে। ওই দিকে।

সেই দিকেই চলেছিল দুজনে। কালকের ঝড়ে ছোট বড় ডাল ভেঙে পড়ে আছে কিছু মাটিতে কিছু বনের অন্য গাছের ডালে আটকে ঝুলছে—লেগে আছে।

তাই অতিক্রম করে ঝরনার ধারে এসে তারা পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়েছিল!

ঝরনার ধারে পাথরের উপর অজ্ঞান বা মরা একটি মেয়ে পড়ে আছে। তার পরনে গেরুয়া কাপড়।

—ই মা! রুকনী সভয়ে বলে উঠেছিল। সে চিনতে পেরেছিল তাকে। লালও চিনেছিল। এ যে সেই কালীতলার ভৈরবী মা! এ যে সেই রামচন্দ্রপুরের বাবাঠাকুরের বিটী। তার বাবা বিশুর সঙ্গে তারা দুই বোন কতবার গিয়েছে সেই বাবাঠাকুরের বাড়ি। বিশু বাবাঠাকুরকে বলত, উ বাঁবড়ে বাবাঠাকুর, দিকুদের বোঙ্গা বটেক। উ কালীর সঙ্গে বাত বুলে। সব জানতে পারে। আমার জানটো যেতো সিদিন—তা উ নিজে তুলে নিয়ে এল বাড়িতে—উর বিটীকে বুললে বাওর দিতে। নিজে হাতে জল দিলেক, মাথায় জল ঢাললেক। সেই কৃতজ্ঞতায় কতবার বিশু পাকা পেঁপে ভঁইসা ঘি নিয়ে যেত বাবাঠাকুরকে দিতে। লালও মাঝে মাঝে যেত। কতদিন কিন্তু যেতে পারত না ক্ষেতের কামের জন্য— পাঠিয়ে দিত লাল রুকনী আর টুকনীকে। নইলে পাকা পেঁপে খারাপ হয়ে যাবে। বাবাঠাকুরের বাড়ি গেলে বাবাঠাকুর বলত—খেয়ে যাবি! রাঁধত এই বাবাঠাকুরের বেটী, খেতে দিত সেই। তারা তাকে দিদিঠেকরেন বলত।

তারপর এখানে এসে সেই দিদিঠেকরেনকে কালীমন্দিরে দেখে তারা অবাক হয়েছিল। খুশীও হয়েছিল। আবার ভয়ও পেয়েছিল দিদিঠেকরেনকে কালীবোঙ্গার পুজো করতে দেখে। গেরুয়া কাপড়, রুখু এই একরাশ চুল, কপালে একটা সিঁদুরের টোপা। এখানেও তাদের চিনে আদর করেছে। ক্রীশ্চান হয়েছে শুনে দুখ করত দিদিঠেকরেন। কিন্তু ওরা ঈশাকে মানত, বোঙ্গাকে মানত, কালীঠেকরেনকেও মানত।

সেই ঠেকরেন এখানে এমনিভাবে পড়ে।

শিউরে উঠেছিল রুকনী—ই মা.

লালও শিউরে উঠেছিল—ই বাবা!

—মরে গেইছে?

—না। মরে নাই, নিশেস পড়ছে।

—তবে?

—তু চান কর। আমি মুখে জল দি। দেখি।

সেই অবধি, সে আজ প্রায় এক মাস হতে চলল তারা তিনজনে এইখানেই এই পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় করেছে। গুহাটার ভিতরটায় থাকে। রাস্তাবন্দির লোকজন যাতায়াতের জন্য বন কেটে যে পথ করেছে, খুঁটাবন্দি করেছে, সে দিক থেকে অনেকটা পশ্চিমে, অন্ততঃ ক্রোশ তিনেক পশ্চিমে স্থানটা। পাহাড়ে জায়গা আর নিবিড় বন, দূরে দূরে গ্রাম আছে। কাছে নেই। রুকনী বের হতে দেয় না, লাল বনের ভিতর ঘোরে, ভৈরবী মাকে বনের ধার পর্যন্ত এগিয়ে দেয়—তাও পশ্চিম দিকে; ভৈরবী গ্রামের ভিতর গিয়ে ভিক্ষে মেগে চাল নিয়ে আসেন, পয়সাও মেলে, তা থেকে নুন হলুদ দেশলাই তেল নিয়ে আসেন। লাল প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে বনের মুখে, তাঁকে পেলেই নিয়ে আস্তানায় ফেরে।

পাকুড় পার হয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে কোটালপুকুরে ঠিকাদারদের ছোটখাটো আস্তানা আছে। সেখানে থাকে সাঁওতাল হিন্দুস্থানী ডোম চামার মজুরের দল। পাঠান সর্দার থাকে—শিখ থাকে। ভৈরবী শুনে এসেছেন একটা সাহেব খুন হয়েছে। তা নিয়ে গোলমাল চলছে। তিনটে সাঁওতাল মেয়ে সায়েবরা জবরদস্তি নিয়ে গেছে বলে তিনপাহাড়ীর দিকে সাঁওতালেরা গুজগুজ করছে। তারা মারহাট্টা ভঁয়সার মত রাঙা চোখ করে শিঙ বাঁকিয়ে মধ্যে মধ্যে বলছে—আমাদের বিটীগুলা ফিরে দে। কিছু সাঁওতাল কাজ ছেড়ে চলেও গেছে।

একটা হুকুম এসেছে—সাঁওতালদের ঠাণ্ডা করো। তাদের এখন ভাল কথা বলছে ঠিকাদারেরা, কিন্তু মেয়েগুলির খোঁজ হয় নি।

ভৈরবী মধ্যে মধ্যে কেমন হয়ে যেতেন। সে সময় চুপ করে বসে ভাবতেন। কাঁদতেন আর মা মা বলে ডাকতেন বুক ফাটিয়ে। গুহার মধ্যে সে শব্দ ভয়ংকর হয়ে বেজে উঠত—মা মা মা মা মা! তার যেন শেষ নেই। মনে হত মা ধরিত্রির বুক ফেঁড়ে সে আওয়াজ বের হচ্ছে। কিন্তু বাইরে থেকে শোনা যেত না। তারপর শুরু করেছেন এই নিত্য রাত্রে আগুন জেলে পাতার ঠোঙায় ঘি ঢেলে এই পূজা। বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করেন আর পাতার ঠোঙায় ঘি ঢালেন। আগুনের শিখা লিকলিক করে এঁকে বেঁকে যেন তাঁর হাত ছুঁতে চায়।

রুকনী স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওই আগুনের দিকে।

লাল পাহারা দেয়। পূর্ব দিকে—যে দিকটায় রাস্তাবন্দির জন্যে গাড়ি মানুষ চলবার পথ সেই দিকে দাঁড়িয়ে থাকে—দেখে কোথাও কেউ আসছে কি না।

পূজার শেষে মা ভৈরবী এমনি করে ডাকেন—রুকনী!

রুকনী ডাকে—দাদা হো!

উত্তর আসে—হুঁ।

তারপর লাল আসে। মা ভৈরবী এর পর আগুনের শিখায় ঝকঝক করে সেই ছোরাটা নিয়ে নিজের বুকের কাপড় সরিয়ে খানিকটা চিরে ফেলেন, রক্ত বেরিয়ে আসে, টপটপ করে ঝরে, মা পাতার ঠোঙায় সেই ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ধরে আগুনে ঢেলে দেন। তারপর সেই ছুরি দেন রুকনীকে—রুকনীও তেমনি করে পাতার ছোট ঠোঙায় রক্ত ধরে তারপর সে ছুরিটা দেয় লালকে। লালও তাই করে। মা ভৈরবী খানিকটা রক্ত—হয়তো কয়েক ফোঁটা রক্ত ঢেলে দিয়ে বলেন—যা, দিয়ে আয় ওই গাছের গোড়ায়। তোদের মরংবোঙ্গাকে দে। আর বল—আমার লহু লাও—আমার দুশমনের লহু দাও।

নয়ন পাল ছড়া বলে যাচ্ছিল। আমি মনে মনে আমার তুলিতে কল্পনার ছবি এঁকে যাচ্ছিলাম, যার সঙ্গে নয়ন পালের ছবি ঠিক মেলে না। কিন্তু এইখানে নয়ন পালের ছড়া শুনে আমার তুলি যেন অক্ষম হয়ে গেল। নয়ন পাল বলছিল—

"ব্রাহ্মণের কন্যা সতী হোম জ্বালি যথারীতি
বক্ষ চিরে নিতিনিতি রক্ত দিয়ে পূজেন চণ্ডীরে।
শত্রুপাতে দাও শক্তি শত্রুরক্তে পূর্ণাহুতি
দিয়ে পূজা করি স্বস্তি ঝাঁপ দিব পুণ্য গঙ্গানীরে।
চণ্ডী হাসে স্বর্গধামে অরণ্যে তৃতীয় যামে
শিবা রব হয় বামে—সতী শোনে হবে পূর্ণ হবে।"

ভৈরবী আঙুল বাড়িয়ে বলেন, শুনছিস—

—শিয়াল?

—না। শিবা বলছে—হবে হবে।

আমার কল্পনার তুলিতে এই আশাবাদটুকু ফোটে না। আমার তো সে বিশ্বাস নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ সাল, এক বালবিধবা সন্ন্যাসিনী চরম অত্যাচারে দুর্গতিতে সতীত্ব হারিয়ে বুকের দাহে অন্তরের গভীরতম বিশ্বাসে এ বার্তা শুনেছিলেন। নিশ্চয় শুনেছিলেন।

নিজের চুল কেটে চামর বেঁধে বাতাস দিয়ে, বুক চিরে রক্ত দিয়ে শক্তি আরাধনার কথা আমার শোনা কথা নয়। আমার দেখা জানা কথা। এ দেশের মেয়েদের বুকে বুক চিরে রক্ত দেওয়ার ক্ষতচিহ্ন আমরা বাল্যকালে দেখেছি।

আমি জানি।

আর ওই অরণ্যের সরল, সবল, শান্ত, ভয়হীন মানুষদেরও জানি।

রুকনী লাল এ বিশ্বাস করেছিল। বুক চিরে রক্ত তারা দিয়েছিল ভৈরবীর কালীকে,

তাদের বোঙাকে।

মা যশোরেশ্বরী দেখা দিয়েছিলেন জ্যোতিঃরূপা হয়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে।

ভবানীর বরপুত্র মহারাজ শিবজী দেখেছিলেন তাঁর মা ভবানীকে।

'ময় ভুখা হুঁ।' 'ময় ভুখা হুঁ।' চিতোরেশ্বরী রক্ত চেয়েছিলেন, দ্বাদশ রাজপুত্রের রক্ত, দ্বাদশ রাজপুত্রের বলি।

সেদিন উনবিংশ শতাব্দীতে গভীর অরণ্যে অত্যাচারজর্জরিতা হিন্দু বিধবা শুনেছিলেন, রক্ত দে, বুক চিরে রক্ত দে।

আমি বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে কল্পনার তুলিতে ছবি আঁকতে গিয়ে এ ছবি আঁকতে আমার হাত কাঁপছিল।

নয়ন পাল গেয়েই চলেছিল—

"রাত্রি কৃষ্ণা চতুর্দশী, তিনজনে ভাবে বসি—
হঠাৎ উঠিল ফুঁসি সিধু বীর অজগর যেন গরজায়—
চল্ হে তিনপাহাড়— বসে ফল কিবা আর—
ত্রিভুবন খুঁজে বাহার করিবই সাঁওতাল কন্যায়।
মধ্যযামে ডাকে শিবা ডাকুক তাহাতে কিবা—
কর্ম্মশেষে ঘুম দিবা—তার আগে ঘুমাইতে লাজ!
হঠাৎ অরণ্য মাঝে বজ্রধ্বনি সম বাজে
মা ডাক, তাহার মাঝে হুয়া হুয়া শিবা কলরব!"

সেদিন ভৈরবী আবেগে উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠেছিলেন—মা! সেই ধ্বনি রাত্রির অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল শতগুণ হয়ে। সে শব্দে থমকে দাঁড়িয়েছিল তিনজনে।

মা! মা বলে কে ডাকে! আর আশ্চর্য এ ডাক! আশ্চর্য মোহ এ ডাকের মধ্যে!

সিধু বলেছিল—দাঁড়া হে। বলে সে একটা গাছের উপর চড়ে গিয়েছিল। এবং অনেকটা উঁচুতে উঠে বলেছিল—হুই। আগুন জলছে—তিনটা মানুষের পারা লাগছেক।

নেমে এসে বলেছিল—চল্।

বিশু বলেছিল—যদি বোঙার খেল হয়? কানু—

কানু বলে উঠেছিল—হয় তো হবে। বোঙা তো ডাকছেক আমাদিগে।

সিধু বলেছিল—বোঙা দেখা দিবেক। বোঙাকে বুলব তুর টাঙ্গিটো দে বাবা হে! আমি লিব উটি।

বিশু বলেছিল—দিবে কেনে?

কানু বললে—বুলব কাটব দিকুগুলাকে। পুড়মান জেট আমাদের ধরম লিছে, আমাদের মেয়া লিছে, আমাদের ধান লিছে গরু লিছে কাঁড়া লিছে, জনম লিছে, চাকর করে রাখছে—আমরা কাটব।

সিধু বললে—ই আমাদের দেশ বটে। এ দেশটো আমাদের। ই আমাদের দেশ,

আমরা লিব।

—আমাদের দেশ ইটো।

সিধুর সঙ্গে সঙ্গে কানু একসঙ্গে বলে উঠল—হঁ, ইটো আমাদের দেশ বটে। আমাদের দেশ।

চমকে উঠল বিশু। শুধু বিশু কেন, সিধু কানু—নিজেরা বলেও নিজেরাই এ-কথায় চমকে উঠল—আমাদের দেশ। বুল বাবা বোঙ্গা, বুল!

সেই রাত্রির অন্ধকারে নিজেদেরই এই আশ্চর্য কথা দুটি তাদের সারা অন্তরে চকিত একটি বিদ্যুৎরেখা টেনে দিয়ে মেঘের ডাকের মত বেজে উঠল—ই আমাদের দেশ।

এসে দাঁড়াল তারা অগ্নিকুণ্ডের অদূরে। পূর্ণাহুতির আগুন তখনও জ্বলছে। অবাক হয়ে তারা দাঁড়িয়ে গেল।

তাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আগুনের শিখার ছটায় প্রদীপ্ত এক গৈরিকবসনা আশ্চর্য নারীমূর্তি। আর তাদের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে একজন সাঁওতাল আর একজন সাঁওতাল মেয়ে।

ভৈরবী আবার গভীর স্বরে ডেকে উঠলেন—মা—

অর্থাৎ কাল অমাবস্যা, কাল পূর্ণাহুতি।

মা, আমার আর এই আমার মত হতভাগিনীর ব্রত কি পূর্ণ হবে না? মা—

সঙ্গে সঙ্গে রুকনীও ডেকে উঠেছিল—মা!

সঙ্গে সঙ্গে লাল—মা!

সঙ্গে সঙ্গে সিধু কানু বিশু—মা!

ছয়জনের মিলিত কণ্ঠের সে মা শব্দ যেন অরণ্যলোককে কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে ছড়িয়ে পড়ল দিগ্‌দিগন্তরে। আকাশ স্পর্শ করল। ঝিল্লী-মুখরতার মধ্যেও বিচিত্র আরণ্য স্তব্ধতা যেন মানুষের সেই 'মা' ডাকে বজ্রাহতের মত খানখান হয়ে গেল।

চমকে উঠল তিনজনে। ভৈরবী তাকিয়ে দেখলেন তিনজন সাঁওতাল। দুজন যেন আবিষ্ট—চোখে বিচিত্র দৃষ্টি। অন্যজন বিশু—তাকে চেনেন তিনি।

রুকনী চীৎকার করে উঠল—তুরা! তারপর সে হা হা করে কেঁদে উঠল। বাবাকে দেখে সে কাঁদে নি। কেঁদেছে সে সিধুকে দেখে। তার জীবন যৌবন যাকে দেবার কামনায় এতদিন বাবার হাজার কথাতেও বিয়ে করে নি, সে তার সামনে—সে তাকে কি দেবে?

লাল স্তব্ধ গম্ভীর।

সিধু বললে—মানকী কুথা?

লাল বললে—সায়েব তাকে—

কানু বললে—টুকনী?

—তাকেও পাই নাই। সায়েবরা তাদের দুজনাকে রাজমহলের দিকে নিয়ে গৈছে। রুকনাকে যে সায়েবটা লিয়েছিল রুকনী তাকে খুন করে পালায়ে আইছে।

রুকনী এবার এগিয়ে এসে বললে—সিধু!

সিধু বললে—তু ছুঁস না আমাকে।

হা হা শব্দে হেসে উঠলেন ভৈরবী! সে হাসিতে একটা কিছু ছিল যাতে সিধু এতটুকু হয়ে গেল।

—হাসছিস কেনে ঠেকরেন?

—হাসব না? মাকে ফেলে দিবি বোনকে ফেলে দিবি বউকে ফেলে দিবি? জোর করে পরে তাদের ধরে নিয়ে যাবে—তাদের রুখতে পারবি না—শোধ নিতে পারবি না—ফেলে দিবি?

আবার হেসে উঠলেন তিনি।

সিধু বলে উঠল—লিব—শোধ লিব। তার লেগেই আইছি।

—লিবি শোধ? লিবি? আমি তুদের পথ দেখাবো। আমি যাব।

ভৈরবী এগিয়ে এসে বললেন—তোরা আমার বেটা। তোদের জন্যে আমি আমি বসে আছি। এই যজ্ঞ করছি। পারবি—আমাকে একটা মুণ্ডু এনে দিতে পারবি? একটা সাদা মানুষ জানোয়ার! পারবি না? এই চক্র তোদের দিব আমি। তোদের কেউ রুখতে পারবে না। তোদের দেশ তোদের হবে। তোরা দু ভাই হবি রাজা শুভোবাবু।

লোহার ত্রিশূলটা দিয়ে তিনি আগুন সরিয়ে বের করলেন রক্তরাঙা তন্ত্রচক্র—গোল, গাড়ির চাকার মত। মাঝখানে একটা ছিদ্র।

—এই চক্র দেব। কাল যজ্ঞ শেষ আমার—তার মুণ্ডুটা আমাকে এনে দিবি। সে আমার—

বলতে পারলেন না ভৈরবী—হা হা আর্তনাদ করে পড়ে গেলেন তিনি।

সিধু তবু বললে—দিব। দিব।

কানুও বললে—দিব। দিব। মানকীকে টুকনীকে ছিনায়ে আনব আর সিটোর মুণ্ডুটো আনব।

রুকনী ভৈরবীর মাথাটা তুলে নিয়ে ডাকলে—মা—মাঠে করেন!

ইতিহাস মনে পড়ছে। ৫৩০৮ সংখ্যক 'সংবাদ প্রভাকরে' আছে ক্যাপ্টেন মিডিলটন লিখেছেন—"কানু সিধুর বাড়িতে প্রবেশ করিয়া আমি সাঁওতালদের ঠাকুর পাইয়াছি। ঐ ঠাকুর একখানা মৃত্তিকানির্মিত চাকার মত—তাহার দুই স্থানে ছিদ্র আছে। তাহাতে দুগ্ধ প্রদান করিলে ফুলিয়া উঠে।"

আরও আছে। "সিধু কানুর সম্মুখে দেবতা আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রথমে মেঘরূপে, তাহার পর অগ্নিরূপে, তাহার পর মানুষ-দেবীরূপে তাহাদের দেখা দিয়াছেন।" ওখানকার একজন প্রাচীন ডেপুটি কমিশনার লিখেছেন—"এক অপরূপ সুন্দরী দেবীমূর্তি সিধু কানুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল।"

নয়ন পালের পটে ছড়ায় তার বিবরণ পেলাম। তিনি ত্রিভুবন ভট্চাজের সন্ন্যাসিনী বিধবা কন্যা ভৈরবী মা।

নয়ন পাল তখন দ্বিতীয় পটের শেষ কটা ছবি দেখাচ্ছে।

নিশীথ রাত্রে সাঁওতালেরা পরদিন হাতে মশাল নিয়ে সাহেবদের বাংলো আক্রমণ করেছে। সেই ছবি।

অন্ধকারের মধ্যে আলো হাতে রুকনী সিধু কানু আর লাল।

সংবাদ প্রভাকরের ৫৩০০ সংখ্যার সংবাদ মনে পড়ছে—১২৬২ সাল ১২ই শ্রাবণ: "অতি অল্প দিবস হইল রাস্তাবন্দি সাহেবরা রাজমহলের নিকট ঐ বন্য জাতিদিগের তিনজন স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক অপহরণ করাতে তাহারা কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া উক্ত সাহেব-দিগের প্রতি আক্রমণ করত: তিনজন সাহেবকে হত্যা করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে উদ্ধার করে।"

নয়ন পালের পটে দেখলাম, জ্যৈষ্ঠের শেষ অমাবস্যা তিথিতে অন্ধকার রাত্রি মশালের আলোয় ভয়াল করে তুলে সাঁওতালেরা আক্রমণ করেছে সাহেবদের বাংলো। তাদের সর্বাগ্রে মশালধারিণী রুকনী। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছে তারা।

সিধু কানু লাল তার পাশে। কি ভয়ংকর দেখাচ্ছে সিধু কানুকে। কপালে তাদের সিঁদুরের লেপন, মাথায় পাগড়ি। পুরাণের বীরদের মত ধনুর্বাণ নিয়ে শর নিক্ষেপ করছে।

ওদিকে সাহেবরা তাদের বন্দুক ছুঁড়ছে। কিন্তু তাদের মুখে ভয়ের চিহ্ন। হবেই। মানুষের জগতে একটি আশ্চর্য নিয়ম আছে। অন্যায় বা পাপ যারা করে তারা বিচারের সম্মুখীন হলেই ভীত হয়। দুর্বল হয়।

নয়ন পালও ছড়ায় তাই বললে—

"দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত রাবণ সে বীর মস্ত
থরথর কাঁপে ত্রস্ত—দুই হস্ত
নর বানরের বাহিনী সম্মুখে।
চণ্ডিকার বরাভয় দুর্বলে করিল অজয়
সাঁওতালের তীর জয় করিলেক বারুদ বন্দুকে।"

পাঁচশো সাঁওতাল জমেছিল সে রাত্রে। মা ভৈরবী বেরিয়েছিলেন ত্রিশূল হাতে এবং সঙ্গে গিয়েছিল বিশু আর লাল। তাদের হাতে শালগাছের পাতাসুদ্ধ ডাল। আশপাশের পাহাড়ে পাহাড়িয়া সাঁওতালদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন! আজ সন্ধ্যায় মরংবোঙ্গার আর মা কালীর পূজা! মরংবোঙ্গা সাঁওতালদের দুঃখে দেখা দিয়েছেন সিধু কানুকে। শুভোবাবু করেছেন তাদের। মা কালী আশীর্বাদ দিয়েছেন। তোমরা এস—আজ সন্ধ্যায় কাঁড় ধনুক টাঙি নিয়ে এস।

তারা এসেছিল। এবং সেই রাত্রেই বেরিয়েছিল মানকী এবং টুকনীকে উদ্ধার করতে।

সিধু বলেছিল কটি কথা—আমাদের মেয়্যাগুলা কেড়ে লিবেক?

কাহ্ন বলেছিল—আমাদের বহিন বেটে।

বিশু বলেছিল—আমাদের বিটী বেটে।

রুকনী সামনে এসে বলেছিল—এই আমাকে দেখ্। দেখ্ রে তুরা দেখ্। আমি সি সায়েবটার বুকে কিরিচ বিঁধায়ে মেরে পালায়ে আইছি—দেখ, আমার দশা দেখ্।

ভৈরবী অগ্নিকুণ্ড জেলে সামনে বসেছিলেন—তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—আমি মা! ওরে আমি তোদের মা, আমার ওপর অত্যাচার করেছে, শোধ লিবি না তোরা?

মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছরের প্রখর উত্তপ্ত শোষণে পীড়নে এই সরল মানুষগুলির হৃদয়—যা কাজলকালো জলে ভরা সরোবরের মত—তা নিঃশেষে শুকিয়ে কঠিন শুষ্ক পঙ্কস্তরে পরিণত হয়েছিল—সেই পঙ্কস্তর ফেটে গিয়ে একটা আগ্নেয়গিরির অভ্যুদয় হল।

অগ্ন্যুদ্গার হয়ে গিয়েছিল সেই রাত্রেই।

সংবাদ প্রভাকরের ওই সংখ্যায় ওই পত্রের সঙ্গেই আরও দুটি লাইনের সংবাদ আছে। "অন্য অন্য সাহেবরা ইহাতে ভীত হইয়া স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করেন।"

নয়ন পাল পটখানার শেষ ছবি খুললে।

ভরা গঙ্গার তটভূমির উপর একটা গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে মা ভৈরবী।

তাঁর হাতে একটা মুণ্ড। শ্বেতাঙ্গ ডিউইর মুণ্ড।

গঙ্গার উঁচু পাড়ের উপর তিনি যেন এক ঊর্ধ্বলোকে দাঁড়িয়ে আছেন। গঙ্গার বুকের বাতাসে তাঁর রুখু চুলের রাশ উড়ছে। আকাশের দিকে তাঁর দৃষ্টি। মুখে আশ্চর্য হাসি।

নয়ন পাল বললে—

"অন্তর্হিতা হইল মাতা
হাতে অত্যাচারীর মাথা
গঙ্গাবক্ষে বিসর্জিতা হইলেন
পূজাশেষে প্রতিমা সমান।"

"ভয় নাই ভয় নাই সিধু কাহ্নু দুই ভাই
রাজা হল, তাহারাই করিবেক ত্রাণ।"

মা তাই বলে গিয়েছিলেন বাবু। বলতে বলতে তৃতীয় পট খুললে সে।

"ওদিকেতে অত্যাচার হইল পাহাড় ভার
শৃঙ্গে আর ঠাঁই নাই তিল ধারণের।
তবু নাই কোন গ্রাহ্য হারায়েছে জ্ঞান বাহ্য
পাপ কার্য তাল তাল ইচ্ছা চাপানের।"

এই দেখুন বাবু, গোটা চাকলা জুড়ে গাঁয়ে গাঁয়ে হিঁদু মহাজনেরা বাঁধন শক্তপোক্ত করছে। জব্দ কর বেটাদের। তাড়াতে হয় তাড়াও দেশ থেকে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে

থানা পুলিসের, কোর্ট কাছারীর বাবু, হাকিম দারোগা এমন কি রাজারাজড়া পর্যন্ত। দাও, সময় থাকতে চাপ দাও—পিষে মার। কি বলে বেটারা? কাঁড়ার হালে আট আনা আর দামড়ার হালে চার আনা ছাড়া খাজনা দেবে না? বেটারা আমাদের কাছে ধান খাবে না? আমাদের বশে থাকবে না?

ওদিকে সাহেবরা খেপেছে। এত বড় বড়! তিনটে মেয়ের জন্যে তিনজন সাহেবকে কেটেছে? তিনজন নয় চারজন? এক মাস আগে একজনকে খুন করে কালো একটা মেয়ে পালিয়েছে!

ভাগলপুরের নতুন কমিশনার মিস্টার অলিভার বিলম্ব করেন নি, তিনি ফৌজ আনিয়েছিলেন। গোরা নয়, তারা পাহাড়িয়া সিপাহীর দল—তার মধ্যে সাঁওতালও ছিল। ভাগলপুরের কালেক্টর উইলিয়াম আলেন, পুলিস সাহেব চার্লস ইজারটন, জজ সাহেব জোসেফ বার্টন, কর্নেল জেগস এবং ডাক্তার সাহেব এডমণ্ড রোপার সকলে খানা পার্টিতে মিলে পোটেন্ট সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করতে বসে এই সর্বরিক্ত সরল জাতির জীবনের দুঃখের সকল কিছুকেই অগ্রাহ্য করে নিষ্ঠুর হাতে দমন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।—

Wipe them out if necessary! Wipe them out!

জঙ্গিপুরের এস.ডি.ও. একখানা চিঠি লিখেছিলেন, তাতে লিখেছিলেন, "উপরের কর্মচারীদের অবহেলার জন্য অন্য কর্মচারীরা (নেটিভরা) হাতের বাইরে গিয়েছে। এরা মহাজনদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সাঁওতালদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করছে। রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টারদের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে ওয়াইল্ড নেচারের যারা…"

কমিশনার চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—রাবিশ!

ডিসিসন হল, অঙ্কুরেই এর বিনাশ কর। গিভ এ শো টু দেম। কর্নেল, তোমার পল্টন নিয়ে একবার মার্চ করিয়ে দাও। বলে দাও, এই সব বন্দুক যা কাঁধে রয়েছে সিপাইদের এ সবই তাদের দিকে ঘুরে মৃত্যু বর্ষণ করবে। অ্যাণ্ড ইউ সি, আমরা ওই কালপ্রিটদের চাই, যারা রেলরাস্তায় তিনটি মেয়ের জন্যে চারজন ইংরেজের রক্তে এদেশের মাটি ভিজিয়েছে, উই ওয়াণ্ট দেম। আমি শুনেছি দেয়ার ইজ ওয়ান গার্ল। এ টল গার্ল, দি টর্চ-বেয়ারার। সেই—সেই—শী ইজ দ ফার্স্ট মার্ডারার। টু-মরো গিভ দেম ফার্স্ট শো।

পরের দিন দরবার ছিল। সমস্ত পরগনাইত সর্দার মাঝি এবং ছোট পরগনাইতরা এঁসেছিল, তার সঙ্গে দলে দলে সাঁওতালেরা।

হাজারখানেক সাঁওতাল। সব দাঁড়িয়েছিল। সায়েব তাদের বসতে হুকুম দেন নি। হুকুম খাড়া হয়ে দাঁড়াবার। তারা তাই ছিল। নিজের নিজের লাঠির মাথা দু হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে।

তাদের চারিদিক ঘিরে দাঁড়াল পাহাড়িয়া সিপাহী পল্টন। তাদের লাল কুর্তা লাল প্যাণ্ট পায়ে জুতো মাথায় লাল পাগড়ি কাঁধে বন্দুক। লেফট রাইট লেফট রাইট করে তারা প্যারেড দেখিয়ে চলে গেল।

উপরে সায়েবরা বসেছিলেন চেয়ারের উপর, তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল পুলিস কর্মচারীরা, তাদের মাঝখানে ছিল মহেশ দারোগা।

সাঁওতালেরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সব দেখলে। সে নিঃশব্দতা বিচিত্র। ভীত স্তব্ধতা নয় সে নিঃশব্দতা। দৃষ্টি তাদের নিঃশঙ্ক। তারা স্থির—শুধু ছিল একটা জিজ্ঞাসা! কেন? এসব কেন?

সিপাহীরা প্যারেড করে আবার লাইন করে গিয়ে দাঁড়াল একপাশে। অলিভার সাহেব উঠে বললেন—শুনো সর্দারলোক! হামার বাত ইয়ে হ্যায় কি তুমলোক হুলাউলা মৎ করো। হাম শুনা হ্যায় কি ইসকে শল্লা চলতা হ্যায়। তুমলোক কোর্ট নেহি মাননে চাহাতা, পুলিসকে ভি মাননে নেহি চাহাতা। হাঁ, তুমহারা সাঁওতাললোকসে এক গ্যাং আদমী চার সাহেবলোগোঁকে জান লিয়া। কৌন হ্যায় উ লোগ? বাতাও—নাম বাতাও। এক ছোকরী ভি হ্যায়। কৌন হ্যায় উ? বাতাও।

শুধু নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ পাওয়া গেল না। এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তাদের দৃষ্টিতে পলক পড়ল না। একটা বিপুল শক্তি যেন নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে দেখছে।

—বাতাও! সাহেব বারান্দার মেঝের উপর বুটসুদ্ধ পাখানা ঠুকলেন। তবু সব স্তব্ধ।

—বাতাও!

একটি কণ্ঠ এবার সোচ্চার হল—পীপড়ার হাড়মা মুর্মু। পীপড়ার হাড়মা মুর্মু প্রবীণ মানী লোক। সে ছিল সামনে গ্রাম পরগনাইতের পাশে। তার অনেক অভিযোগ—তার নামে কেনারাম ভকত মিথ্যা নালিশ করেছে—শুনেছে ডিক্রীও করেছে। সে আশা করেছিল প্রতিকার কিন্তু তার বদলে তিরস্কার পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সে বললে,—উ শুনলাম আমরা। কিন্তুক জানি না কে খুন করলেক। সি তো রাস্তাবন্দির ধারে। আমরা জানি না।

—আলবৎ জানতা হ্যায়—

—না সাহেব, জানি না। আমরা ঝুট বুলি না।

—হুল করোগে? রিভোল্ট?

—দিকুরা আমাদের সব লিলে মিছা মিছা নালিশ করে। তুদের কোট মিছা কথা শুনছে। তুদের দারোগা তাদের কথা শুনছে। আমরা কি করব? আমরা মরব?

মহেশ দারোগা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল মনে মনে। সে সাহেবকে সেলাম করে বললে—সবসে বড়া বদমাশ হুজুর। সবসে বড় বদমাশ। এ লায়ার।

—টীচ হিম লেসন্‌স্ দারোগা। বাট নট নাউ।

এরপর কর্নেলকে বললেন—কর্নেল, অ্যানাদার শো প্লিজ।

কর্নেল অর্ডার দিলেন—অ্যাটেন্—শন্! সিপাহীদের বুটে বুটে ঠুকে শব্দ হল—খট্। অনেকগুলি শব্দের একটি সমবেত সুউচ্চ এবং সুকঠিন আদেশদৃপ্ত সাবধানবাণী।

সাঁওতালদের দৃষ্টি বারেকের জন্যও তাদের দিকে ফিরল না। মহিষের মত মাথা একটু

নীচু করে তারা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সাহেবদের দিকে।

বেলা বাড়ছিল, গরমের দিন, আষাঢ় মাস, ঘরের মধ্যে বয় বেয়ারারা সাহেবলোকদের জন্ত জিন আর মিঠাপানি মিশিয়ে ঠাণ্ডাই তৈরী করছিল। অলিভার সাহেব বললেন—যাও, সব ঘর যাও। আপনা আপনা ক্ষেতিকে কাম করো। যো লোগ মহাজনলোগোঁকে জমিনমে কাম করতে কো রুপেয়া লিয়া, কাম বাজাও। যাও।

সাঁওতালরা মৃদুস্বরে বললে—দেলাঃ! চল্ হে! চল্।

অলিভার বললেন—ব্যস ঠিক হো গেয়া। মহেশ দারোগা, বহুৎ কড়া হাঁতমে কাম করো।

কর্নেল শুধু বললেন—স্ট্রেঞ্জ পিউপল্! দে ওয়ের সো সাইলেণ্ট!

অলিভার বললেন—দে আর জঙ্গলীজ। অ্যাফ্রেড। দে হাভ নট সীন এনিথিং লাইক দিস প্যারেড।

কর্নেল বললেন—নো মিস্টার কমিশনর, আই ডোণ্ট থিংক সো। দিস সাইলেন্স ইজ ডেঞ্জারাস।

ভাগলপুর থেকে সাহেবগঞ্জ হয়ে দক্ষিণমুখে বিভিন্ন মাঝির দল বিভিন্ন রাস্তায় ফিরছিল গ্রামের দিকে। নীরবে পথ চলেছে সব। মাঝে মাঝে টুকরা টুকরা কথা —দেখলি হে সব—,

—হঁ দেখলম।

—কি কুরবি?

—কি কুরব?

—বোঙাকে ডাক হে। সি বুলে দিবে কি কুরব।

—বোঙা যদি বুলে ইয়াদের কথা মান্।

—বোঙা তা বুলে না। বোঙা বলবেক—তুর জান আছে তুর মান আছে, তুর মা আছে, বহিন আছে, বিটী আছে, ইজ্জত আছে। তু হড় (মানুষ) বেটিস। তু তা রাখ। না রাখলে তু হড় নোস।

—তা হলে?

—বোঙা কি বুলে দেখ।

—কবে বুলবেক?

—বুলবে। ঠিক বুলবে। জলদি বুলবে। বাগনাডির চুনার মুর্মুর বেটারা বুললে ইশেরা গেছে, তারা কুথা জানিস?

—উঁহু, জেনে না।

একজন বললে, তারা নাকি মানকী রুকনী টুকনীর খোঁজে গেইছে।

—তেবে?

থমকে দাঁড়াল হাড়মা মাঝি—তেবে? চোখ দুটো তার বড় বড় হয়ে উঠল। জাম

পরগনাইত বললে—তেবে কি? কি বুলছিস? হাড়মা বললে—উয়ারাই। ইঁ—উয়ারাই! শ্যাম প্রশ্ন করলে—কি? বুল? হাড়মা বললে—সাহেব বললেক কারা চার সাহেবকে মেরে তিনটা মেয়্যারে কেড়ে নিয়ে গ্যেল! বুলছি না?

—ইঁ। বুললেক।

—উয়ারাই! উয়ারাই। তেবে তারা পেলে।

—কি?

—ইশেরা। ইঁ—না পেলে তো বন্দুকের সাথে লড়ে—ইঁ।

—তু বুলছিস—উয়ারাই?

—ইঁ। চুপ কর্। ইশেরা পেঁয়ে থাকলে হাঁকিড়ে উঠবেক। চুপ।

কিছুদূর এসে একটা সাঁওতাল গ্রামে তারা থমকে দাঁড়াল। রাস্তার মোড়ে একটা ঝাণ্ডা গাড়া রয়েছে। সাদা একটুকরা ন্যাকড়ার একটা গোল সিঁদুরের ছাপ। রাস্তাটা তকতক করছে। ঝাঁট দিয়ে সন্ত পরিষ্কার করে গেছে। খানিকটা দূরে গ্রামের মধ্যে যেন কলকল করছে মেয়েছেলেরা। যেন একটা উৎসব শুরু হয়ে গেছে।

—এ কি! পরগনাইত?

—ভাইথো—এ কি সদ্দার?

—খোঁজ কর্ হে! চল।

গ্রামের ভিতরে গেল দুজনে। অন্য সঙ্গীদের বললে—চল্ তোরা হে। ধীরে কদমে চল্। আমরা এখনি এলম।

বেশীদূর যেতে হল না, দেখা হয়ে গেল কটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে। হাড়মা জিজ্ঞাসা করলে—হাঁ, সাঁওতাল বিটীরা ই কি বেটে? কি পরব আজ?

তরুণী মেয়ে কটি সবিস্ময়ে বললে, ই বাবা! তু জানিস না?

—না। আমরা ভগলপুর গেইছলম।

—মরংবোঙার হুকুম আসছে গ! বোঙা আসছেক!

—বোঙা আসছেক? কে বুললে?

—টাটু ঘোড়ায় চড়্যা একটা ছেল্যা এল। পরনে এই পাগ, এই কুর্তা! এই মালকোচা মারা কাপড়! কি সোন্দর ছেল্যা! সি আনলে শালের ডাল পাতা, পাতাতে সুনুম (তেল), মাখানো। মাঝখানে সিঁদুরের এত বড়ো টোপা।

একটি প্রিয়দর্শন সাঁওতাল কিশোর টাটু ঘোড়ায় চড়ে এই দুপুরে গ্রামে গ্রামে বিলি করে গেছে শালপাতার নিমন্ত্রণ-পত্র। বলে গেছে—"সাঁওতালদের মরংবোঙার ঘুম ভেঙেছে। সাঁওতালদের দুঃখ দেখে বোঙা (রাজা) শুভোবাবু পাঠিয়েছেন—তারা আসছে। তারা আসছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আসছেন বোঙা নিজে। গ্রামে গ্রামে তিনি আসবেন। তার জন্যে তোমরা পথঘাট পরিষ্কার করো। পথের ধারে পুঁতে রাখ এই ঝাণ্ডা। বোঙা শুভো-বাবুদের দেখা দিয়ে বলেছেন "এ দেশ তোদের দেশ।"

শেষ কথা কটি তিনটি তরুণীই একসঙ্গে বলে উঠল—"ই দেশটো আমাদের। আমাদের দেশ।"

—হুকুম আসছেক।

হাড়মা মাঝি শ্যাম পরগনাইতকে বললে—চল হে জলদি চল্। হুকুম আসছেক।

সূর্য তখন অস্তোম্মুখ। রাস্তার দুপাশে শালবনের মাথায় বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধূলিকণায় সে আলো ধরা পড়েছে, তার রাঙা আভা যেন স্থির হয়ে ভেসে রয়েছে পত্রপল্লবের মাথায় মাথায়।

সাঁওতালরা ভাগলপুর থেকে ফিরছে। পথের ধারে ধারে সাঁওতাল পল্লীতে ঢুকবার রাস্তার মুখে পতাকা পোঁতা। ক্লান্ত শ্রান্ত অত্যাচারিত জীবন, যে জীবন একবেলা একমুঠো অন্ন এবং বনজ ফল কন্দ ও শিকার করা পশু পাখির মাংসে বেঁচে, ছিন্ন মলিন বস্ত্রে আর নিজেদের সঞ্চয় করা কাঠকুটো ও আবর্জনার মধ্যে কোনরকমে কাটিয়ে এসেছে, সে জীবন আশ্চর্য পরিচ্ছন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঘুমপাওয়া জীবন একটি আহ্বানে সতেজ জাগরণে জেগে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

বোঙ্গা আসছে! খবর দিয়ে গেছে এক সুন্দর কিশোর সাঁওতাল ছেলে। কুর্তা পরে চাদর বুকে পেঁচিয়ে বেঁধে মাথার পাগড়ি বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল। শালপাতার নিমন্ত্রণ দিয়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

ওই সে ঘোড়া ছুটছে। ছোট টাট্টু ঘোড়া। তার উপরে ছিলছিলে লম্বা সওয়ার ছেলে ঘোড়ার গতির সঙ্গে দুলছে। ওই চলছে। ঘোড়ার ক্ষুরে ওঠা ধুলো তার পিছনটা ঢেকে দিচ্ছে।

১৮৫৫ সালের বৈশাখের সেই দুরন্ত বাজপড়া কালবৈশাখীর দিন ছাড়া আর বৃষ্টি হয় নি। পুড়ে গেল দেশ ঘাট। ঘাস শুকিয়েছে, গরু বাছুর কাঁড়াগুলো খেতে পায় না। মানুষের ঘরে ধান নেই। আকাশে মেঘ নেই। মহাজনের ঘরে ধান। মহাজন বজ্রমুষ্টিতে ধরেছে, জমি লিখে দাও। গরু দাও কাঁড়া দাও। নয়তো ধান নিয়ে তার দামে জীবন লিখে দাও, তাহলে পাবে নইলে পাবে না।

এ অঞ্চলের বজ্রকঠিন লাল মাটি রোদে পুড়ে পুড়ে গুঁড়ো ছাইয়ের মত লাল ধুলো হয়ে সব যেন লালচে করে দিয়েছে। সেই লাল ধুলো উড়িয়ে চলছে ওই আশ্চর্য কিশোর সওয়ার।

গান গাইছে সে ; সে এক নতুন গান, সাঁওতালরা শোনে নি কখনও।—

শুকনা ধুলা উড়ছে, মাটি পুড়ে ধুলা হয়ে গেইছে—
আকাশ ঢেকে গেলো রে।
জল হল নাই! ও জল হল নাই রে,
জৈষ্ঠ আষাঢ় যায় রে—
মাটি ফেটে যায় রে—জল হল না—ই।

দিকুরা সব লুঠলো, সাদা মানুষ জুটলো
কালো মেয়্যা লুটলো—হড়ে ধরম চাড়লো—
মরংবোঙ্গা ক্ষেপলো—
জল হল নাই। তাথেই জল হল না—ই
মরংবোঙ্গা রাগলো—শুভোবাবু জাগলো—
টাঙি নিয়ে ছুটলো—
সায়েবদিগে কাটলো—কালো মেয়্যা কাড়লো;
চোখের পানি মুছলো—
আবার তারা হাসলো—ইবার জল হবে রে—
ওরে ডর না—ই।
শুভোবাবু আসছে—শুভোবাবু আসছে—
শুভোবাবু আসছে—
ঘোড়ায় চড়ি আসছে টগবগিয়ে আসছে,
ওরে ডর নাই রে আর ডর না—ই।
এক হাতে তার টাঙিয়া আর হাতে তার বলুয়া—
পিঠে ধেনুক কাঁড় নিয়া মাথায় পাগ বাঁধিয়া
লাল পাগ বাঁধিয়া চাঁচর চুলে বাঁধিয়া শুভোবাবু আসিছে—
টগবগায়ে আসিছে! আর ডর নাই রে।
আর ডর না—ই।
চোখে আগুন ঝলিছে বোঙ্গার হুকুম বলিছে—
আর ডর না—ই।
আমি তাকে দেখিলাম—তার পরসাদ মাগিলাম—
পাইলাম রে পাইলাম—হুকুম নিয়া ছুটিলাম—
হুকুম হুকুম হুকুম রে—আর ডর নাই রে!
আর ডর না—ই!

সাঁওতাল পল্লীর নরনারীরা স্তব্ধ হয়ে শুনেছে সে গান।

"হুকুম হুকুম হুকুম রে, আর ডর নাই রে
আর ডর না—ই!"

নয়ন পাল বললে—শুনুন বাবু—

"শুন বাবু মহাশয় এ ছেলে তো ছেলে নয়,
আসলে যুবতী হয় পুরুষের বেশে।
কুর্তা পরি তারপরে, চাদরের সাত ফেরে
যৌবন গোপন করে কাটিয়াছে কেশে।
চড়িয়া ঘোড়ার পিঠে, উল্কাসম চলে ছুটে,

হাসিতে খুশি ফাটে—বলে বোল হুকুম হুকুম।
এ মেয়ে রুকনী হয়
এ তো কভু ছেলে নয়।"

এ রুকনী। বাবু মহাশয়, তা হলে কিঞ্চিৎ গোপন বৃত্তান্ত শোনেন। এ জানতেন ত্রিভুবন ভট্চাজ মশায়। তিনি বলেছিলেন আমার ঠাকুরদাদাকে তাঁর শিষ্যকে।

সিধু সব বলেছিল ভট্চাজ মশায়কে দুর্গাপুজার সময়।

সেই রাত্রে মেয়েদের উদ্ধার করে ডিউইর মুণ্ডু নিয়ে তারা ভৈরবী মার কাছে এসেছিল।

মা ভৈরবী যজ্ঞ শেষ করে মুণ্ডুটা নিয়েই গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গঙ্গার ধারে। সিধু কানুকে বলেছিলেন—আমি মরব রে, এবার আমার কাজ শেষ হয়েছে। তোরা ফিরে যা। ওরে, তোদের দুই ভাইয়ের উপর তোদের মরংবোঙ্গা দয়া করেছেন। বুঝতে পারছিস।

—হঁ বুঝছি। বুকে কি ফুঁসাইছে। মাথায় কি শিসাইছে! বলেছিল কানু।

সিধু বলেছিল—হঁ। মন বুলছে তিনটা সাহেব কেট্যা কি হল? তিনটা মেয়্যাকে কেড়ে আনলম—তাথেই বা কি হল? ই দেশটা—আমাদের দেশটো কেড়ে লিতে হবেক। সাঁওতালেরা মরছেক—মরবেক। ধান যেছে পান যেছে জমি লিছে দিকুরা, স—ব লিছে।

—হ্যাঁ রে। সেই জন্যে বোঙ্গা তোদের পাঠিয়েছেন। মা কালী আমাকে বুলেছেন রে। শোন—বোঙ্গাকে ভক্তি করবি। গরীবকে মারবি নে। দুঃখীকে রক্ষা করবি। আর এই নে মা কালীর এই ছুরি। এ ছুরি আমার মা কালীর হাতে ছিল। এ তোদের বোঙ্গার ছুরি। আর কি বলেছিস রুকনীকে? রুকনী!

রুকনী এসে দাঁড়িয়েছিল নতমুখে। চোখ দুটি ফোলা ফোলা—সে কেঁদেছে।

সিধু বলেছিল—উদিগে চলে যেতে বললম। বললম—ইবার বোঙ্গার হুকুম হল—বোঙ্গা দেখা দিলেক। কাল তু যখন তুর কালী মায়ের পুজো করছিস তখুন মহুলাগাছের তলাতে দাদা আর আমি গিয়ে দাঁড়ালাম। ম্যাঘের টোপর পরে তখুন বোঙ্গা দাঁড়ালেক। বুললে—আমি মরংবোঙ্গা! আর চক্ক ওই ভৈরবী দিলে—ইবার ছুরি দিবে। তুরা ইবার যা—মেয়্যাগুলোকে কেড়ে লে। সায়েবগুলার জান লে। তারপরে এই দ্যাশ তুদের দ্যাশ—তুরা কেড়ে লে। তুরা শুভোবাবু হলি। রাজা হলি। তুরা টাঙি ধর কাঁড় লে ধনুক লে বলুয়া লে। দিকুরা পাপী—উরা সাঁওতালদিগে জানে মেলে, মানে মেলে, চাকর করলে। ধান লিলে পান লিলে কাঁড়া লিলে গরু লিলে জমীন লিলে। ই পাপ। সাঁওতালদিগে বাঁচাতে হবেক। বাঁচা—তুরা সাঁওতালদিগে বাঁচা। উরা কাঁদছে—উরা ভুখে মরছে। আমাকে ডাকছে। আমি তুদিগে দুই ভাইকে শুভোবাবু করলম। আমার হুকুম তুরা 'হুল' (বিদ্রোহ) কর। হাঙ্গামা কর। দিকুদিগে পুড়মান জেটদিগে কেটে তাড়ায়ে দে। ই দ্যাশে সাঁওতাল থাকবেক। তুদের দ্যাশ। আমি এলম—গাঁয়ে গাঁয়ে জহর সর্দার আসব পুজা লিব। আমার হুকুম। রাতের আঁধারে বাঘের চোখের মত বোঙ্গার চোখ দুটো জ্বলছিল। আমরা বললম—বন্দুকের সাথে পারব আমরা? বুললে—পারবি পারবি। গুলি

জল হয়ে যাবেক। তাপরেতে বুললেক, না হয় তো আমার হুকুমে মরতে লারবি? বুকটা লাফায়ে উঠল—বুক বুললে—হাঁ পারব। বোঙা হাসল।

থেমেছিল সিধু। কান্থ বলেছিল—আমরা মরদ ভৈরবী মা—আমরা শুভোবাবু হলম। আমাদের সাতে উরা কি করবেক? তা ছাড়া উরা কিরিস্তান; সাঁওতাল লয়। ধরম ছাড়লে। উরা কুথা যাবেক?

ভৈরবী বলেছিলেন—আমি যদি তুদের সঙ্গে থাকি লিবি না?

—হেই বাবা! লিব না? তাই হয়?

—তবে? ওদের কেনে নিবি না?

—উরা কিরিস্তান।

—না! ওরা সাঁওতাল। রুকনী আমার সঙ্গে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো করেছে।

রুকনী এবার এগিয়ে এসে অসংকোচ নিজের বুকের আবরণ সরিয়ে দিয়ে বললে—এই দেখ এই দেখ। ছুরি দিয়ে চিরে মা কালীকে দিলম, বোঙাকে দিলম। দেখ। লালের বুক দেখ। তবু কিরিস্তান বুলবি? দে, মা কি ছুরিটো দিলেক সিটো দে। এখুনি আবার চিরে ফেলায়ে তুরা শুভোবাবু তুদের পায়ে রক্ত দিব আমি। দে।

রুকনীর বুকের সারি সারি ক্ষতচিহ্নের দিকে তারা দুজনে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পর সিধু বললে—ফুল, টুশকি কাঁদবেক। তু ফিরে যা—

কথায় বাধা দিয়ে রুকনী বললে—না, কাঁদবেক না। কাঁদতে দিব না। আমি তুর চাকরানী হব। ফুলকে বুলব তু রাজার রানী, আমি চাকরানী। আমি সেবা করব। তুর হুকুম খাটব। লয়তো তুর সিপাহী হব।

—সিপাহী হবি! হাসলে কান্থ।

—হঁ তো কি! হব। বেটাছেলা সাজব; কাঁড় ধেনুক লিব। তুরা হুকুম করবি, আমি সি হুকুম মানব।

ভৈরবী প্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। তাঁর যাত্রাক্ষণ আসন্ন হয়ে উঠেছে। সূর্যের উদয়লগ্নের প্রতীক্ষা করছেন। তিনি হেসে বলেছিলেন—সিধু কান্থ নে ওদের নে। ওরা তোদের শক্তি। নে—আমি বলছি।

সিধু কান্থ পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে বোধ করি অনুমোদন চেয়েছিল—তারপর একসঙ্গেই বলেছিল—নিলম। মানলম তুর হুকুম।

ভৈরবী আর বিলম্ব করেন নি তাঁর যাত্রাপথে। সূর্য তখন উঠছে। উদয়দিগন্তে রক্তাভ সূর্য দেখা দিয়েছেন স্বর্ণকঙ্কণের একাংশের মত।

এ উপমা আমার নয়, এ উপমা নয়ন পালের। পাল বলেছিল—

"সূর্য মধ্যে মা চণ্ডিকা আপন কঙ্কণ রেখা

দেখাইয়ে সাধিকারে ইশারায় ডাকে।"

সে ইশারার ডাক পেয়েই ভৈরবী 'মা' বলে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল।

আমি চোখ বুজে সেই ছবিটি দেখছিলাম মনের পটে। ব্যাখ্যা খুঁজছিলাম। কিন্তু নয়ন পাল এবার নতুন করে ছন্দে আরম্ভ করলে তার ছড়া। মনের সুর কাটল। নয়ন পাল এবার পয়ারে শুরু করলে—

"আলোর ছটায় ভাঙ্গে মন মধ্যে ঘোর—চল্ চল্, হাঁকে
শুভো হইয়াছে ভোর।
বলে চল, বলে চল, চল রে সাঁওতাল;
দেখিলে দিকুরা হবে বড় গোলমাল।
সাহেবান সিপাহীর বন্দুক তৈয়ার
দেখিলেই দম দম করিবে ফায়ার।
বন মধ্যে হবে চল পরামর্শ শলা
নিযুক্ত করিতে হবে আমলা কয়লা।
সেনা চাই সেনাপতি হুঁশিয়ার দুত
নিয়া যাবে হুকুমনামা করিব প্রস্তুত।
এখন সকলি হবে গোপনে গোপনে
মাদল বাজায়ে পর মাতিব হে রণে।"

গভীর বনের মধ্যে সেদিনের রাত্রের গোটা দলটি গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সে প্রায় দুশো সাঁওতাল। না নিয়ে উপায় ছিল না। সে রাত্রে সায়েব তিনজনের মৃত্যুতে হৈ হৈ হবে। তারা অপরাধীদের খুঁজে বেড়াবে এ আশঙ্কা তাদের স্বাভাবিক। তারা গভীর বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে কয়েক দিন স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করলে। ওদিকে রাস্তাবন্দির সাঁওতালরা—যাদের কোন সম্পর্ক ছিল না এসবের সঙ্গে—তারা বিপদ আশঙ্কা করে পালাতে লাগল। পালানোর পিছনে যেমন ছিল ভয় তেমনি ছিল তাদের রাগ। তিন তিনটে সাঁওতাল মেয়ে জবরদস্তি কেড়ে নেওয়ার জন্যে তাদের বুকে চাপা রাগ আগুনের মত ধোঁয়াচ্ছিল। সে রাত্রের এই ঘটনার পর তাদের বুকের আগুন জ্বলল। তারা পালিয়ে গিয়ে এখানে ওখানে রাজমহল অঞ্চলের সাঁওতাল এলাকায় দল বাঁধতে শুরু করলে। জঙ্গিপুরে সরকারের পাহাড়িয়া ফৌজ তৈরী হল বন্দুক নিয়ে।

কানু সিধু তার লোকজনদের নিয়ে পরামর্শ করে বললে, ইদের কাছে যোজার হুকুম পাঠাতে হবেক। ইরা ইবার হুলের লেগে সাজুক।

কানু তৈরী করলে শালপাতার সিঁদুরের টোপা দিয়ে হুলের হুকুমনামা।

সিধু দেখে খুশী হয়ে বললে—হঁ, ঠিক হইছেক। ঠিক এই চকের মতুন। কিন্তু নিয়ে যাবে কে? কারা?

লাল আর বিশু। হাঁ, তারাই যাবে। রাস্তাবন্দির সাঁওতালেরা চিনবে। ওরা যখন বলবে যে, তারা দেখেছে বোঙার 'চক্ক', বোঙার 'ছুরি'—যখন বলবে বোঙার দেখা দেওয়ার কথা—তখন তারা অবিশ্বাস করতে পারবে না। বলবে, বোঙা কান্থ সিধু দুই ভাইকে শুভোবাবু (রাজাবাবু) করেছে।

—না। রুকনী টুকনী মানকী এবং আরও কিছু মেয়েরা যারা নতুন জমায়েতের সঙ্গে বনে এসেছে তারা সাঁওতালদের জন্যে রান্না করছিল। তাদের মধ্যে থেকে রুকনী এসে বললে—না। তা এখন বুলবি না।

বিরক্ত হয়ে কান্থ বললে—বুলবে না? কেনে? বোঙা আমাদিকে শুভোবাবু করলেক,—বুলবে না?

—তুমি শুভোবাবু—আমি তুমাদের চাকরানী, আমি ই কথা বুলছি কেনে তা শুভোবাবু শুন। ই খবরটো জানাজানি হলে উরা সিপাহী নিয়ে বাগনাডি ছুটবেক। সিখানে জুলুম করবেক।

সাঁওতালেরা সকলেই বলেছিল—হঁ হঁ হঁ। ঠিক বুলেছ। শুভোবাবু এ মেয়্যা ঠিক বুলেছে।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা রুকনী এসে বলেছিল—শুভোবাবু।

—হঁ।

—আমি একটা সিরিং (গান) করলম—তুমাদিগে শুনাব।

—সিরিং!

—হঁ সিরিং। এই হুলার সিরিং।

—হুলার সিরিং।

—হঁ—শুন।

সন্ধ্যায় কাঠের আগুন জেলে রুকনী টুকনী মানকী এবং আরও কটি তরুণী সেই গান গেয়ে নেচেছিল।

"শুকনা ধুল উড়ছে, মাটি পুড়ে গেইছে, ছাইর মতুন উড়ছে—আকাশ ঢেকে গ্যেল রে। জল হল নাই রে—জল হল না—ই!

মরংবোঙা রাগলো, শুভোবাবু জাগলো, টাঙি নিয়ে ছুটলো, সাদা সায়েব কাটলো, কালো মেয়া কাড়লো, চোখের পানি মুছলো—আবার তারা হাসলো, ইবার জল হবে রে—আর ডর না—ই!

শুভোবাবু আসছে, শুভোবাবু আসছে, শুভোবাবু ওই ওই আসুছে, ঘোড়ায় চড়ি আসছে, টগবগিয়ে আসছে—ওরে ডর নাই রে, আর ডর না—ই!"

সিধু উৎসাহভরে বলেছিল—বাঁশী—বাঁশীটো দে।

কান্থ বলেছিল—না। সে সিধুর হাত চেপে ধরেছিল। তু শুভোবাবু উ চাকরানী! না।

গানটা সেই দিন শিখে নিয়েছিল লাল আর বিশু। তাদের সঙ্গে আর কজন। তারা সকলেই ছড়িয়ে পড়বে এই অঞ্চলের সাঁওতালদের মধ্যে।

নয়ন পাল বললে—

"রাজমহল জঙ্গিপুরে উঠে হুলহুলা।
সিধু বলে দাদা কানু—এইবারে দেলা!
দেলায়া বাগনাডিহি হয়েছে লগন—"

রুকনী টুকনী মানকী দাঁড়য়েছিল—তারা পরিচর্য করছিল শুভোবাবুদের। মানকী দুই ভাইয়ের চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল, রুকনী টুকনী দুজনে শুভোবাবুদের কুর্তা চাদর ঠিক করছিল। এর মধ্যেই চারিদিকের বাজার-হাট লুট করে তারা কাপড় কুর্তা ফিতা চাবকী চাল ডাল টাকা পয়সা যোগাড় করেছে। লোক ক্রমে ক্রমে বেড়ে বেড়ে শ চারেক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘোড়াও পেয়েছে তারা গোটা কয়েক। দেশী টাট্টু ঘোড়া।

নয়ন বললে—ও অঞ্চলে আজও ঘোড়ার চলত আছে বাবু। হিরণপুরের হাটে অনেক ঘোড়া আজও বিক্রি হয়। সে সময় ঘোড়ার চলত ছিল আরও অনেক বেশী।

মানকী রুকনী টুকনীও বলে উঠেছিল—হঁ। লগন হইছে শুভোবাবু।

কানু খানিকটা চোখ বুজে ভেবে বলেছিল—হঁ লগন হইছে। ইবার উঠ্।

—তার আগে শুভোবাবু।

—হঁ।

—খত পাঠাও, হুকুম পাঠাও, ইপাশে রাজমহল জঙ্গিপুরে বাবা গেইছে লাল গেইছে যেমুন তেমুনি পচ্ছিম দিকে শালপাতার খত নিয়া হুকুম পাঠাও। তুমরা যাবেক, তুমাদের সাতে মরংবোঙ্গা যাবেক—লোকেরা জানুক, তৈয়ের হোক—

—হঁ। ঠিক কথা বুঝেছে। ঠিক ঠিক।

সাঁওতালরাও বলেছিল—এ কথা ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে শালপাতার খত বোঙ্গার আদেশ শুভোবাবুর হুকুমনামা তৈরী হয়ে গিয়েছিল; হুকুমনামা যাবে আগে তারপর যাবে শুভোবাবুরা। কিন্তু বাগনাডিহি পৌঁছানোর আগে খুব হুলা করা হবে না। এ অঞ্চলে সবাই দিকু। দু চার জন নীলকুঠির সাহেব আছে—রেশমকুঠি আছে। মহেশ দারোগার মত দত্যি আছে। এখন যাবে তারা রাত্রে রাত্রে। এবং ছোট ছোট দলে। তবে তার আগে যাবে হুকুমনামা।

ঝাণ্ডা পোঁতো, রাস্তাঘাট সাফ করো, তীর শানাও। মরংবোঙ্গার হুকুমে আসছে শুভোবাবু।

সেদিন গভীর রাতে সিধু বসে ছিল। একলা বসে ছিল—ভাবছিল সে। তার সামনে গোটা অঞ্চলটার ছবি ভাসছে। তার সঙ্গে তার মন কল্পনা করে চলেছে কয়েক দিনের মধ্যে যা হবে তার ছবি।

মনে জাগছে ভীম মাঝির ছেলের মুখ। ভীম মাঝি, সেই ভীম মাঝি বড় ভাল লোক। সাহসী মানুষ; সত্যিকথার মানুষ। সেই লোককে জেলে পুরেছে। মনে পড়ছে হাড়মা মাঝিকে। হাড়মা মাঝি বলেছিল—আমাদের জান গেল মান গেল ধান গেল জমীন গেল, সায়েব, জীবন

গেল—সাঁওতালেরা জীবনভোরের নফর হয়ে গেল। মনে পড়ছে মহিন্দর ভকতের সেই অপমান। মনে পড়ছে মহিন্দর ভকতের টাকায় বাঁধাপড়া মাঝিদের। মনে পড়ছে বিশু মাঝির বুক চাপড়ানো। মানকী রুকনী টুকনীকে কেড়ে নিয়েছে সাহেবরা। মনে পড়ছে বাপ চুনার মাঝির মৃত্যুর কথা। মানকীর দুঃখ আর বংশের অপমানের দুঃখ তার বুকে ওই মরংবোঙ্গার গাছটার মাথায় বাজ পড়ার মত পড়ে তাকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। সে সইতে পারলে না, মরে গেল। বুকে তাদের দু ভাইয়েরও লেগেছিল তার চেয়েও বেশী। হাঁ, তার চেয়েও বেশী। শুধু মানকী নয়, তাদের মুর্মুবংশের অপমান নয়, সেই আঘাতে বাপের মৃত্যু নয়—আরও ছিল। ওই রুকনীর টুকনীর জন্যে দুঃখ জ্বালা তাদের হয়েছিল। তাদের বাপ যখন তাদের দুই বোনকে নিয়ে পালিয়ে যায় তখন থেকে তারা এই মেয়ে দুটোকে মনে মনে ঘেন্না করত। মধ্যে মধ্যে মনে হত, মরে যাক ওরা মরে যাক। ফুলকে বিয়ে করেছে, ফুল ভাল মেয়ে, বড় ভাল মেয়ে, নরম মেয়ে, মিষ্টি মেয়ে, ভাতের মত মিষ্টি মেয়ে, পেট ভরে, মন জুড়োয়। কিন্তু রুকনী মহুয়ার ফুল, যেমন মিঠা তেমনি মাদকে নেশা ধরায়। সিধুর মাদলে ফুল নাচে—নাচতে নাচতে মেতে ওঠে কিন্তু রুকনী তার মাদলের সঙ্গে নাচত, নিজের নাচের সঙ্গে সিধুকে নাচাতো। সেদিন তাই তার জন্তেও তার বুকে জ্বালা ধরেছিল। কানু দাদার বুকও জ্বলেছিল। টুকনীকেও সে এমনি ভালবাসত। তার শোধ হয়েছে। সাহেবদের মেরে তাদের কেড়ে এনেছে ওরা। তার মন খুঁতখুঁত করে—রুকনীকে উদ্ধার করতে হয় নি। সে নিজে সায়েব মেরে বেরিয়ে এসেছে। ভৈরবী মায়ের দয়া সে-ই আগে পেয়েছে। তবু এখনও বুক জ্বলছে। মা ভৈরবী বলে গেছে মরংবোঙ্গার কথা সে শুনেছে—সাঁওতালদের বড় দুখ। বড় দুখ। বড় দুখে তাদের পরান'গুলি কাঁদছে কাঁদছে কাঁদছে।

সে কান্না থামাতে হবে। মাঝে মাঝে আশ্চর্য লাগে তার—এ কি করে হল? এমন কেন হয়? সঙ্গে সঙ্গেই মন বলে—বোঙ্গা বলেছে সাঁওতালদের দুখ দূর করতে তোকে এমন করলম। ই কাম তোকে করতে হবে। ই তোদের দেশ বটে। তোদের দেশ।

হাঁ, তাদের সে দেশ—পূর্বে এই গঙ্গা নদী—দক্ষিণে হুই বর্ধমানের এলাকায় দিকুদের এলাকা—এর মধ্যে এই পাহাড় জঙ্গল বনবাদাড়, নদীনালা, মাঠঘাট, ক্ষেতখামার, গাছপালা জন্তুজানোয়ার পাখি ফড়িং—সব তাদের। সব তাদের। হাঁ, তাদের।

ই সব কেড়ে নেবার জন্তে শুভোবাবু হল তারা।

মরংবোঙ্গা হুকুম দিলে। মা ভৈরবী 'চক' দিলে, মা কালীর ছুরি দিলে।

সাঁওতালদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তারা ছুটবে। পিছনে পিছনে হাজারে হাজারে সাঁওতাল। টাঙি বলুয়া কাঁড় ধনুক নিয়ে ছুটবে। হাতে মশাল জ্বলবে। মাদল বাজবে—ধিতাং ধিতাং ধিত্যাং তাং। ধিতাং ধিতাং—

শুভোবাবু আসছে—শুভোবাবু আসছে—শুভোবাবু আসছে, ঘোড়ায় চড়ে আসছে, টগবগিয়ে আসছে—আর ভর নাই রে—আর ভর না—ই।

আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল। ইচ্ছে হল বাঁশীটা নিয়ে গানটা বাজায়। বাঁশীটা টেনে নিলে সে। না। রাখলে বাঁশীটা। বাঁশী নয়। কানু দাদা মানা করেছে।

কাল হুকুমনামা নিয়ে লোক ছুটবে। লোক ছুটবে সকালে। তারা রওনা হবে বিকেলে। বাঁশী নয়।

হঠাৎ কে ডাকলে—শুভোবাবু!

সিধু ফিরে দেখলে কিন্তু তাকে চিনতে পারলে না। সে এক পনের ষোল বছরের সাঁওতাল ছেলে কিন্তু সাধারণ সাঁওতাল ছেলের মত নয়; খোলা গা, পরনে খাটো কাপড়—সাঁওতাল ছেলে নয়—এর গায়ে কুর্তা, পরনে মালকোঁচা মেরে পরা কাপড়, গায়ে কুর্তার উপর মোটা চাদর, বামুনের পৈতের মত করে টেনে বাঁধা, মাথায় পাগড়ি—তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—

—কে তু? কে?

—আমি তুর চাকর। হাসলে সে খিলখিল করে।

ভ্রম ভাঙল সিধুর। সে বলল—রুকনী?

—হঁ। ইটো রুকনী! তুমার চাকরানী—চাকর সেজেছে। তুমার কাম করবার লেগে। শুভোবাবু আমি যাব? আমাকে তুমি পাঠাও গ।

—কুথা? কুথা পাঠাব?

—হুকুম নিয়া যাব আমি। পথে পথে গাঁয়ে গাঁয়ে খত দিয়া হুকুম দিয়া চলে যাব বাগনাডিহি। সিখানে রানীকে বলব গা—উঠ রানী উঠ, আমি তুমার চাকরানী। তুমি উঠ। রাজা আসছেক।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সিধু তার মুখের দিকে। রুকনী নাকের গয়না খুলেছে, কানের গয়না খুলেছে, চুলগুলো কেটে খাটো করে ফেলেছে। বেটাছেলের মত চাঁচর চুল করেছে। কিন্তু অপরূপ লাগছে তাকে।

—তু গয়না খুললি, চুল কাটলি?

—তুমার কাম করব বলে শুভোবাবু! তুর খত লিয়ে যাব। আমাকে একটো ঘোড়া দে। আমি চড়তে জানি শুভোবাবু। লাল কাম করবার লেগে একটো ঘোড়া পেয়েছিল। চিঠি নিয়ে যেতো সাহেবদের। আমি চড়তম। আমাকে ঘোড়া দে; আমি বেটাছেলে সাজলম—ইবারে ঘোড়া ছুটায়ে যাব আর বলব—আসছে শুভোবাবু আসছে! আর ডর নাই। ঝাণ্ডা টাঙা তুরা ঝাণ্ডা টাঙা—সব সাফাস্থফা কর। আসছে শুভোবাবু আসছে।

—রুকনী, তুকে আমি সাগাই করব—তু রানী হবি!

—না। ফুল কাঁদবেক। আমি তুমার চাকরানী শুভোবাবু! ফুলের চাকরানী। শুধু আমাকে তুমার চাকর কর শুভোবাবু, সিপাই কর। তুমি লড়াই করবে, আমি তুমার সাতে থাকব। টাঙি লিব, ধেনুক কাঁড় লিব—লড়ব আমি তুমার পাশে দাঁড়ায়ে।

—রুকনী!

"হেনকালে কানু এসে কহিল গম্ভীর—
কয় দিনে কানু যেন হল মহাবীর।

চণ্ডিকার দয়া হৈলে এইরূপ হয় ;
খঞ্জতে পর্বত লজ্ঘে বোবা কথা কয়।
রক্তরাঙা চোখ তার কপালে ভ্রূকুটি ;
হাঁড়ি হাঁড়ি মদ খায় ঘন ঘন চুটি।
টুকনী পাশেতে থাকি সদা করে সেবা ;
টুকনী রুকনী নহে নারী মনলোভা।
আঁচলে বাতাস করে যোগায় হাঁড়িয়া ;
খরগোশ মাংস দেয় বলুং গুঁড়িয়া।
কান্থ এসে ডাকি কয় শুন সিধু ভাই ;
রাজা হয়ে ফাঁকা ঠেকে পাশে রানী নাই!
টুকনীরে করিনু রানী কপালে তাহার
সিঁদুর ঘষিয়া দিনু—মরি কি বাহার!
আমি বলি তুমি কর রুকনীরে বিয়া ;
সমারোহে ফিরিব হে পাশে রানী নিয়া।"

সিধুর আগে রুকনী কথা বলেছিল।

"শুভোবাবু দাদা শুন, কহিল রুকিনী—
আমি রব চাকরানী সঙ্গের সঙ্গিনী।
পুরুষের বেশ ধরি রব সাথে সাথে—
যুদ্ধ শেষে সাদী হবে আনন্দ তাহাতে।
যুদ্ধ শেষে রণক্ষেত্রে পাতিব বাসর—
গড়িব মনের সুখে অতঃপর ঘর।"

সিধু উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল—হাঁ সেই ভাল, সেই ভাল, খুব ভাল।

কান্থ বলেছিল—হাঁ সি খুব ভাল হবে। টুকনী আমার মিঠা মিঠা বহু। উ রাঁধে ভাল, যতন করে ভাল। উ সাতে থাক আমার। তবে তুরা আমোদ কর। আমি চললম।

রুকনী বলেছিল—আমাকে কাল যেতে হুকুম দিছ?

—হাঁ দিলম। সিধুর তাই মন। তু যা বারহেট বাজার হঁয়ে বাগনাডিহি। আর ডোমন যাবেক বেনাগড়ের দিকে। জাম্‌রো গাঁয়ের মণি পরগনায়েত আর বারমাসিয়া গাঁয়ের রাম পরগনায়েতের কাছ হঁয়ে ওই পথে চলে আসবেক বাগনাডিহি। রাম আর মণি পরগনায়েত তেজী লোক। তাদিগে আমরা ফরমন দিব—তারা উদিকে ছুটু শুভোবাবু হবেক। আমরা বড় শুভোবাবু—তারা ছুটু শুভোবাবু। নারাণপুরের সাহেব নীলকুঠি আছে; নারাণপুরের দিকু জমিদার আছে। হুল আরম্ভ হলেই কাটবেক। নারাণপুর লুটবেক। আর ভোলা মাঝি যাবেক মাঝখান দিয়ে হিরণপুরের হাট হয়ে লিটিপাড়ার পথে। "হুকুম হইছে।

শুভোবাবু আইছে। ঝাণ্ডা পোঁতো। সাজা করো সব।" আর একজনা যাবেক পাকুর হঁয়ে।

টুকনী ওদিকে এসে কখন দাঁড়িয়েছিল। সে মনোরমার মত সেজেছে। চুলে ফুল পরেছে, কানে ফুল পরেছে, হাতে ফুল পরেছে, কপালে সিঁদুর ডগডগ করছে। হাঁড়িয়ার নেশায় যেন বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে দুলে নাচছে।

সে বলেছিল—এস আমার শুভোবাবু হে!

কানুর হাত ধরে সে চলে গেল। সিধু বললে—হাঁড়িয়া আন রুকনী। আমার রুকনী হে! রানী হে।

—না। আমি শুভোবাবু সিপাহী হে! বলে সে এনেছিল দেশী মদের বোতল।—এই খাও হে!

সিধু তার কোমর জড়িয়ে ধরে তার মুখপানে তাকিয়ে বলেছিল—বড় সোন্দর সিপাহী হে! সিপাহী তু নাচ জানিস—

—হুঁ।

—নাচ্ হে!

—শুভোবাবু আমার বাঁশী বাজাক হে! ছাড় হে!

—না হে! না হে! একটু পর বলেছিল—তু যাস না সিপাহী।

—না শুভোবাবু আমার বড় সাধ হে! আমি ঘোড়া ছুটায়ে যাব গাঁয়ে গাঁয়ে, হুকুম বুলব, খত্ দিব। আর সিরিং করব—

শুভোবাবু আসছে শুভোবাবু আসছে
ঘোড়ায় চড়ে আসছে
টগবগিয়ে আসছে, আর ডর নাই রে—
আর ডর—না—ই।

১৮৫৫ সালে আষাঢ় মাসে নিদারুণ অনাবৃষ্টিতে সূর্যের প্রখরতম উত্তাপে সাঁওতাল পরগনার ধুলো হয়ে যাওয়া লালমাটি ঘোড়ার ক্ষুরে উড়ছে। আমার মনশ্চক্ষে আমি দেখছিলাম। ঘোড়সওয়ার বাগনাডিহির ধারে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যে গ্রামের পথ সেই পথ ভেঙে ঢুকে গেল।

ওদিকে রামপুরহাট অঞ্চলে নারাণপুর হয়ে ছুটছে ডোমন। সে ঘোড়ায় যায় নি। সে চলেছে কুর্তা পরে, পাগড়ি বেঁধে, টাঙি বলুয়া কাঁড় ধনুক নিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে। মণি পরগনাত হো—রাম পরগনাত হো।

মাঝখানের অঞ্চল দিয়ে চলেছে ভোলা মাঝি। বাঁশলই নদীর কিনারা ধরে পশ্চিমমুখে।

নয়ন পাল বলছিল—

"হুকুম হুকুম রব দেশে ছড়াইল।

গাঁয়ে গাঁয়ে ধ্বজা সব উচ্চে উড়াইল ॥
চুলবুল করে সব যতেক সাঁওতাল।
শুভোবাবু আসিবেক আজ নয় কাল ॥
এদিকে হিন্দুরা সব জমিদার গেরস্ত।
যম সব মহাজন করিল মনস্থ ॥

আর নয় আর নয় বাড়ে বড় বাড়।
সময়ে বর্বর জাতে কর ছারখার ॥
জঙ্গিপুর হতে আসে হাকিমের লোক।
সঙ্গে লয়ে পরওয়ানা—সব করে ক্রোক ॥
বাটি ঘটি কাঁড় গরু গোলা ভেঙে ধান।
সঙ্গেতে দারোগা আছে যমের সমান ॥
কেহ যদি কহে কথা তারে ধরে বাঁধে।
টেনে নিয়ে যায় থানা ঘরগুষ্টি কাঁদে ॥

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় সমান সবাই।
বামুন কায়েত বণ্ডি ভক্ত কসাই ॥
গরীবের ক্রন্দনেতে আকাশ মলিন।
বোঙ্গা বলে ভয় নাই আসিতেছে দিন ॥

পয়ার প্রসঙ্গে কয় বিপ্র ত্রিভুবন।
আকাশে চণ্ডিকা মাতা করয়ে গর্জন ॥
তাঁর কাছে নাই বাপা রাজা প্রজা ভেদ।
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে কভু নাহিক প্রভেদ ॥

যে পাপ করিবে তারে দণ্ড দেন তিনি।
তারই লাগি নিরাকারা সাকারা জননী ॥
মা চণ্ডী তাথৈ নাচে তাথৈ নাচে রে।
ক্ষ্যাপা শিব শিব হয়ে চরণ যাচে রে।
মা চণ্ডী তাথৈ তাথৈ তাথৈ নাচে রে ॥"

ইতিহাস কল্পনা সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ত্রিভুবন ভট্টাচাজের পয়ার প্রবন্ধ যেন ছবি হয়ে ফুটছিল মনের মধ্যে।

"হু হু করে বাড়ে পাপ ঊনত্রিশ দিন।
ত্রিশ দিনে পড়ে মাথে বজ্র সুকঠিন ॥

চণ্ডীর বিচারে পাপ ফলে রে ফলে রে।
বাঁধিয়া সাঁওতাল লয়ে মহেশ চলে রে।"

মহেশ দারোগা। সাঁওতাল অভ্যুদয়ে মা চণ্ডীর কাছে প্রথম বলি। অন্ততঃ ত্রিভুবন ভট্‌চাজ তাই বলে গেছেন তাঁর পয়ারে। তিনি মহেশ দারোগাকে মহিষাসুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। চেহারায় চরিত্রে বেশ একটা মিল তিনি দেখিয়েছেন। ত্রিভুবন ভট্‌চাজের তুলনা বা উপমা তাঁর নিজস্ব। তিনি সিধু কানুকে কালকেতু বিরূপাক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন—বলেছেন জন্মান্তর নিয়ে চণ্ডীর আদেশে মর্তে তারা এসেছিল সাঁওতালদের ত্রাণ করতে। নিজের কন্যাকে বলেছেন—সে ছিল চণ্ডিকার সহচরী বা কিঙ্করী। রুকনী টুকনীকে ইঙ্গিতে বলেছেন সিধু কানুর শক্তি। একজন মনোরঞ্জিনী, একজন উৎসাহদায়িনী। দীর্ঘ পয়ারে বীরভূমের ছোট শুভোবাবু মণি পরগনাত এবং রাম পরগনাত এদেরও এক একটা পূর্বজন্ম আবিষ্কার করেছেন। ১৮৫৫ সালের বৃদ্ধ ত্রিভুবন ভট্‌চাজের বিশ্বাসের ভিত্তিতে তা কল্পনায় সত্য এবং স্বাভাবিক হলেও আমার কাছে তা নয়। আমি ইতিহাসের ধারায় এর মধ্যে দেখছিলাম সেই পুরাতনের পুনরাবর্তন। নিপীড়িত মানুষ বা গোষ্ঠী বা জাতি ক্রমশঃ সর্বরিক্ত হয়ে পেটের জ্বালায় বুকের দহনে একদিন আগ্নেয়গিরির মত ফেটে তার ভিতরের আগুন নিঃশেষিত করে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়। ধর্ম বিশ্বাস ঈশ্বর ইজ্জত—এই কয়েকটার সমষ্টি একটা কিন্তু উদরের জ্বালার সঙ্গে এক হলেই বিস্ফোরণ ঘটে। এটাকে বাদ দিয়ে শুধু একটাতে হয় না। একটা জাত বা একটা দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে প্রচুর আহার্য আর সুখসম্পদের আফিং দিয়েও তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না। আবার শুধু স্বাধীনতা দিয়ে নিরন্তর দুর্ভিক্ষ এবং অনন্ত দুঃখদুর্দশার মধ্যেও স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তাকে শান্ত রাখা যায় না। তারা তাতেও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, চিৎকার করে। দুটোর রিক্ততার সমষ্টি একসঙ্গে হলে তো কথাই নেই।

আমি ভাবছিলাম ওই কটা মানুষের কথা। যারা এগিয়ে এল—বললে—এ আমাদের দেশ। আমরা রাজা। যারা ইংরেজের বন্দুক—ভদ্র হিন্দু জোতদার জমিদার মহাজনদের কুটিল চক্রান্তের উপর খড়্গাঘাত করে আলেকজাণ্ডারের মত গর্ডিয়ান গিঁঠ কাটতে চেয়েছিল। শেকল কাটতে চেয়েছিল। আর তার সঙ্গে ওই কটি বিচিত্র মেয়ে। রুকনী আর টুকনী আর মানকী। মানকী লালের সঙ্গে মেতেছিল মুরশিদাবাদ অঞ্চলে। রুকনী টুকনী সিধু আর কানুর সঙ্গে। তারা কোথায় পেলে এই আশ্চর্য আগ্রহ আর উৎসাহ! নারীর হৃদয় বিচিত্র—তার প্রকাশ বিচিত্র। মহেশ দারোগা—মহেশ্বর লাল—লালা কায়স্থ—মহেশপুর থানার জবরদস্ত দারোগা—তার সাহস তার দুর্দান্তপনা এবং ওই ভকত ও জমিদার জোতদারদের মিলিত শক্তি তখন দেশে আতঙ্ক।

আমড়াপাড়ায় কেনারাম ভকতের বাড়ি। সেখানে সেদিন মহেশ দারোগা এসে গর্ভু সাঁওতালকে বেঁধেছিল পিছমোড়া করে, তার বিরুদ্ধে মিথ্যে একটা খুনের চার্জ। গর্ভু কেনারামের দাসত্ব স্বীকার করতে চায় না। সে বলে—সারা জীবন খেটেছি। তাতেও যদি দশ টাকা দেনা শোধ না হয়ে থাকে তো হল না। ও দেনা নাই। আমি খাটব না।

বার বার বলেছে—না না না।

আর বেঁধেছে পীপড়ার 'কালান হাড়মা' মুর্মুকে। হাড়মা মুর্মু মানী লোক। তার জমি আছে, কাঁড়া গরুর পাল আছে, ঘরে ধান আছে। কেনারামের দাবি তার জমির উপর। সে তা কিছুতেই বেচবে না। ধান সে তার কাছে ধার নেবে না। কিন্তু বিচিত্রভাবে জঙ্গিপুরের কোর্ট থেকে তার সমস্ত কিছুর উপর ক্রোক পরওয়ানা এসেছিল, যেমন এসেছিল লিটিপাড়ার ভীম মাঝির উপর। এবং যেমন ভাবে ভীম মাঝি কিছু ক্রোক করতে দেয় নি সেই ভাবে। সে আদালতের পেয়াদা এবং কেনারামের পালোয়ান চাপরাসীদের ভাগিয়ে দেওয়ার জন্য মহেশ্বর দারোগা থানার সিপাই নিয়ে এসেছে সমস্ত ক্রোক করবার জন্য এবং সরকারী লোককে কাজে বাধা দেওয়ার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। তাকেও পিছমোড়া করে বেঁধে মহেশ দারোগা দুপুরবেলা তার দলবল নিয়ে রওনা হল। সে যাচ্ছে ঘোড়ায়—তার সঙ্গে কেনারামও তার নিজের ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে রওনা হল। সিপাহী এবং কেনারামের পালোয়ানের দল তাদের দড়ি বেঁধে নিয়ে চলল। গর্ভুর ফাঁসি হবে—হাড়মা মাঝির জেল।

রওনা হবার মুখে এসে দাঁড়াল একটা চৌকিদার।

—হুজুর!

মহেশ দারোগা আধখানা পাঁঠা এবং একটা পুরো বোতল মদ খেয়ে—, উপমা খুঁজে পাচ্ছি না বলেই ত্রিভুবন ভট্টচাজের 'মহিষাসুর' উপমা নিচ্ছি, মহিষাসুরের মত সদম্ভে রক্ত-চক্ষু হয়ে ঘোড়ায় চড়েছে। কেনারামের উপমা পাচ্ছি না, কারণ পুরাণে অসুরদের মধ্যে কেউ মহাজন ছিল না।

চৌকিদারটা জোড়হাতে মূর্তিমান পিছন-ডাকার-বাধার মত বললে—হুজুর! তাও পিছন থেকে নয়, সামনে থেকে।

গর্জন করে উঠল মহেশ দারোগা—এ্যাও শালা!

চমকে উঠল চৌকিদারটা। দারোগা বললে—কি? কি? কি?

—হুজুর! সবাই বলছে শুভোবাবু এসেছে!

—'শুভোবাবু?' শুভোবাবুর অর্থ বিপ্লবী নেতা—রাজা; তাই সবিস্ময়ে দারোগা এবং প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই কেনারাম বললে—শুভোবাবু?

—হেঁ হুজুর তাই বলছে লোক। বলছে রাতের আঁধারে মশাল জেলে ঘোড়ায় চড়ে শুভোবাবুরা এসেছে। দুটো শুভোবাবু।

—কোথায়?

—জানি না হুজুর, বলছে রাতে এসে জঙ্গলে ঢুকে গেল। ওই বাগনাডিহির ধারে। আর—। থেমে গেল সে।

—আর কি? জলদি বল শালা! হাতের চাবুকটা দারোগা আস্ফালন করলেন।

—আর সকালবেলাতে যখন কোরক হচ্ছিল তখন একটা সাঁওতাল ছেলে—সি কুর্তা পরা ছেলে—টাটু ঘোড়াতে চড়ে গেল ইদিক থেকে। সি চেঁচাইছিল—হুকুম এল হুল হুল।

দারোগা একমুহূর্তের জন্য ভুরু কুঁচকে ভেবে নিয়ে বললে—চলো! কুছ ডর নেহি। আমি কোম্পানীর থানার দারোগা। শির নিয়ে নেব শালাদের। চলো।

সত্যই আগের দিন রাত্রে মশালের আলো জেলে একদল মানুষ এসে ঢুকেছে বাগনাডিহির উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে। সেই জহর সর্দার থানে। ঘোড়ার উপর ছিল দুজন। শুভোবাবু? সেখানে মশাল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কিশোর সাঁওতাল ছেলের বেশে 'রুকনী'।

সে বাগনাডিহি এসে ফুলের কাছে বলেছে সে সিধু শুভোবাবুর চাকর।

—চাকর! তু—?

হেসে ছেলেটা বলেছে—চাকর সিপাই। তুমারও চাকর, তুমারও সিপাই।

পিছন থেকে টুশকি এসে তাকে ঝাপটে ধরে বলেছিল—তু শালা চাকর? বলে তার মাথার পাগড়িটা টেনে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে ধরতে পারে নি, কারণ চুল রুকনী পুরুষের মতই কেটে ছোট করেছিল, বিশ্বাস করেছিল। টুশকি তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে একটা ঝাঁটা তুলে পিটতে পিটতে বলেছিল—বুল তু কে। রুকনী না টুকনী বুল বুল।

রুকনী কাঁদে নি, খিলখিল করে হাসতে হাসতেই বলেছিল—আমি ফুলরানীর চাকরানী, সিধু শুভোবাবুর চাকর। বাবা রে, বাবা আর কতো মারবি গ?

—ফুল টুশকির হাত ধরে বলেছিল—মারিস না।

—মারব না!

—না।

হেসে ফুল বলেছিল—তার যদি মন হইছে তো তু মেরে কি করবি?

রুকনী বলেছিল—হেই টুশকি রানী তু চলাস না। তা হলে তাদের বিপদ হবেক। থানা আসবেক, সিপাই আসবেক, ধরে নিয়ে যাবেক তাগিদে। চুপচাপ থাক। তারা আসুক আগে।

এবং সারারাত্রি পুরুষের বেশেই বাইরের খাটিয়ায় শুয়ে ছিল। ঘরের মধ্যে শুয়েছিল ছেলেদের নিয়ে ফুল আর টুশকি। রুকনী সারারাত ধরে তিন পাহাড়ীর ঘটনা বর্ণনা করে বলেছিল—উরা দু ভাই, মরংবোঙার দেখা পেলেক, মা ভৈরবী বুললে কালীমায়ের কথা। তারা দু ভাই ই দেশের রাজা হবেক। সায়েবদিগে দিকুদিগে কাটবেক, তাড়ায়ে দিবেক।

অবাক হয়ে গিয়েছিল ফুল আর টুশকি। টুশকি একবার বলেছিল···মিছা কথা।

—ন গ রানী, আমি সিখানে ছিলম। আমি দেখলম সব বসে বসে।

ফুল টুশকি দুজনেই নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ফুল জিজ্ঞাসা করেছিল—তু বুললি তু একটো সায়েবকে কিরিচ বিঁধে বিঁধে মারলি—

—হঁ। সি কিরিচ আমার কাছে রইছে।

—তু বুক চিরে চিরে রক্ত দিলি?

—হঁ। সি দাগ আমার বুকে রইছে। দেখ তুরা হাত বুলায়ে দেখ!

—তু ল কাটলি, বেটাছেলে সাজলি?

—হঁ—সিধুবাবুর সিপাই হলম—তুমার চাকরানী হলম।

—হুঁ। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল ফুল।

—ফুলরানী!

—কি হল গ?

—কিছু না। তু ঘুমো।

কিন্তু রুকনী বুঝতে পেরে বলেছিল—না রানী, আমি চাকরানী থাকব গ, রানী হব না।

উত্তর দেয় নি ফুল। পরের দিন ভোরে আবার বেরিয়ে গিয়েছিল রুকনী। ফিরেছিল সন্ধ্যাবেলা। সেদিন তাকে একলা পেয়ে ফুল জিজ্ঞাসা করেছিল—রুকনী!

—বুল রানী।

—তু চাকর সিপাই হলি ক্যানে? কিসের লেগে?

—হ—ল—ম। একটু চুপ করে থেকে সে বলেছিল—রানী, সি রাজা হল—মরংবোঙা সাঁওতালদের দুখ ঘুচাতে বললেক। দেখলম সিধু সত্যি রাজা হয়ে গেল। বুললে—মরি মরব। দুখ ঘুচাব। শোধ লিব। সায়েবদের সঙ্গে লড়াই করলেক—বন্দুকের সাতে। আমি মশাল ধরে পাশে ছিলম! দেখলম সি তার কি চেহারা গ! তারপরে সি শুভোবাবু হল। আমার সাধ হল শুভোবাবুর আমি সেবা করি, সাতে সাতে থাকি। মেয়া হয়ে কি করে থাকব। তাথেই বেটাছেলে সাজলম। সিপাই হলম্। শুন—শুভোবাবুর গান আমি করলম—শুন।

সে গানটা গেয়ে তাকে শুনিয়েছিল। "শুভোবাবু আসছে, ঘোড়ার চেপে আসছে—টগবগিয়ে ঘোড়ায় চেপে আসছে—আর ডর নাই গ—আর ডর না—ই—"

ফুলের চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়েছিল হঠাৎ। রুকনী বলেছিল—রানী, তুমি কাঁদছ! ফুল বলেছিল—আমি লারব তা রুকনী, আমার গিদরা দুটো নিয়ে—আবার পেটে একটো—সি তো লারব রুকনী, তুর মতুন সাতে সাতে থাকতে। তুকে আমি দিলম। তু থাকিস, সাতে সাতে থাকিস। আমাকে তার ভাল লাগে নাই। ইসব আমি লারি তো। তু পারিস। উকে দিলম তুকে। তু ইয়ার লেগেই বেটাছেলে সেজেছিস, সিপাই হলছিস। আমার কাছ থেকা কেড়ে লিতে! আমি জানি হে। তা আমিই তুকে দিলম।

রুকনী মাথা হেঁট করে চুপ করে বসেছিল। কিছুক্ষণ পর বলেছিল—না রানী, আমি চাকরানী। কাল সি আসবেক, দেখিস আমি তুকে রানী করব।

পরের দিন রাত্রে এল শুভোবাবুরা। সঙ্গে তাদের দুশো সাঁওতাল। তারা সিপাহী। এক হাতে মশাল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল রুকনী। অন্য হাতে সে ধরেছিল ফুলের হাত।

এগিয়ে এসে হেসে বলেছিল—শুভোবাবু এই লাও তুমার রানী।

সকালবেলা সেই জহর সর্ণার ধারে বসেছিল সিধু কান্থর প্রথম কাছারী। ইতিহাসে আছে এবং ত্রিভুবন ভট্‌চাজের পটের পাঁচালীতেও আছে—সিধু কান্থ স্নান করে নতুন কাপড় পরে

মাথায় পাগড়ি বেঁধে তাতে একগোছা ময়ূরের পালক গুঁজে পুঁতির এবং রূপোর (রূপদস্তার) নয়) বালা এবং বুকে মোটা চাদর পৈতের ঢঙে বেড় দিয়ে বেঁধে এসে বসেছিল সেই পাথরের উপর।

ছিল সবাই—ছিল না শুধ্ রুকনী। সিধু জিজ্ঞাসা করেছিল—সি কুথা ?

সকলে চুপ থেকেছিল। টুশকি বলেছিল—সি ফুলকে রানী হয়ে বসতে দেখতে লারবেক না, তাথেই পালালছে।

ফুল বলেছিল—না। তারপর মৃদুস্বরে বলেছিল—সি খুব ভোরবেলাতে সেই ঝুঁপকি থাকতে উঠেছিল। আইছিল ইখানে সব সাফ করবার লেগে। সে দেখেছে কি ওই পেট-মোটা রাক্ষস দারোগা সি তার দলবল নিয়ে কুথাকে গ্যেল। দখিন মুখে গেইছে তারা। রুকনী ছুটে এসে বুললেক—কুথা যেছে উরা আমি খোবর লিয়ে আসি।

কানু বলেছিল—দেরি কর নাই হে! বোঙার পূজা সার হে সব।

সাঁওতালী অনুষ্ঠান বিচিত্র। নাই কি—অর্থাৎ পুরোহিত তাদের নিজের, সে ঘট পেতে পুজো করেছিল। মোরগা এনে বলি দিলে। এবার মেয়েরা গান গাইবে। কিন্তু কোন্ গান গাইবে ? বিভিন্ন পর্বে ওদের বিভিন্ন গান—এমনি সকল সময় গাইবার গান—লাগ্ড়ে সিরিং। বিয়ের গান—বাপ্লা সিরিং। বীজ ছড়াবার বা ধান ভানবার গান—রহয় সিরিং। ঋতুর গানও আছে। আজ কোন্ গান গাইবে ?

সিধু কানু পরস্পরের মুখে তাকিয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করেছিল—তাই তো কোন্ গান ? পুরোহিতও ঠিক করতে পারে নি। ফুল বলেছিল—রুকনী বলে গেইছে সহরায় সিরিং অর্থাৎ কালীপুজোর সময়ের যে গান সেই গান হবেক আজ।

হাঁ হাঁ হাঁ। ঠিক ঠিক। মনে পড়েছিল ভৈরবী মাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল—হাঁ ঠিক। গলায় কাটামুণ্ডু, হাতে কাটামুণ্ডু, ওই রাত্রির মত কালো দেবতা-ঠাকরুনটির মতই তারা এমনি করেই দিকুদের মুণ্ডু কেটে নাচবে।

—হাঁ হাঁ হাঁ। ওই গান। সঙ্গে সঙ্গে মাদল বেজেছিল বাঁশী বেজেছিল—তার সঙ্গে শিঙা বেজে উঠেছিল বিউগ্লের মত।

নয়ন পালের ছড়ায় আছে মা চণ্ডী তা-থৈ-থৈ নেচেছিলেন আর শিব বাজিয়েছিলেন ডম্বরু আর শিঙা।

আমার মন তাকিয়েছিল নিজের ভিতরের দিকে। আমি দেখছিলাম ইতিহাসের পাতা ওলটাচ্ছিল—একখানা সাদা পাতায় একটা হাত যেন লাল কালি দিয়ে লিখে যাচ্ছে। ১২৬২ সাল, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ কানে আসছে।

নয়ন পাল বললে—

"চৈতের বাওড় সম ছুটে টাটু ঘোড়া
বালক সওয়ার তার পিঠে মারে কোঁড়া॥
ছুট ছুট আরও ছুট ছুট আরও জোরে

কাছে এসে খুদে সিপাই লাফ দিয়া পড়ে ॥"

—রুকনী !

—হাঁ। শুভোবাবু খবর আনছি। মহেশ দারোগা কেনারাম লোকজন নিয়ে গর্বুকে বেঁধেছে—মিছা খুনের দায়ে তাকে ফাঁসি দিবেক। আর বুড়া হাড়মা মাঝিকে বেঁধেছে। জমি লিখে দেয় নাই বলে। তারা আসছেক। রাতটো তারা আজ থাকবেক বারহেটে মহিন্দর ভকতের উখানে। কাল সোকালে যাবেক এই পথে ভগলপুর।

—খুন করেছেক গর্বু মাঝি! কাথে ?

—কাথুই না। মিছা কথা! গর্বু কেনা ভকতকে মানছে নাই তাথেই।

—হাড়মা মাঝি—

—সব মিছা কথা। সব মিছা কথা শুভোবাবু। আমি সব জেনে আইছি। সে কাঁদন দেখে আইছি।

স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে।

কানু তাকালে সিধুর দিকে, সিধু তাকালে দাদার দিকে। সমস্ত জনতা চেয়ে রইল তাদের দিকে।

কানু সিধু একসঙ্গে বললে—হুল তবে তো হুল হুল! হুল!

শুধু ফুল কেঁপে উঠল। ক্ষুদে সিপাই গিয়ে তার হাত ধরলে—একটু হাসলে। বললে—তুমি হাসো রানী।

সাঁওতালেরা জমেছিল হাজারখানেকের উপর—তারা চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল—হুল হু—ল হুল। আমরা ক্ষেপলম।

নয়ন পাল বললে—

"হুল হুল তুলক্লাম আমরা সব ক্ষেপিলাম—
ক্ষুদে সিপাহী বলে থাম—আজ নয় হুল হবে কাল।"

—কাল ?

—হুঁ কাল। লগন আসুক।

লগন অর্থাৎ লগ্ন এল পরের দিন সকালে। মা ভৈরবী আর মরংবোঙ্গা নাকি বলেছিলেন নেওতা আসবে। সে নিমন্ত্রণ সাদা খাতার। একখানা সাদা খাতা নিয়ে লোক আসবে।

আমার মন বিমুখ হল। ইতিহাসের কণ্ঠস্বর শুনলাম—হ্যাঁ, তাই হয়েছিল। ইতিহাসে অনেক কিছু ঘটেছে যার অর্থ ইতিহাসে জানে না—তবে ঘটেছে। হাণ্টারের বিবরণে তাই আছে। একখানা সাদা খাতা এসেছিল। এনেছিল চাঁদ রায় বলে এক তরুণ মাঝি। ভোরবেলা স্নান করে সাজছে শুভোবাবুরা। আজ হুল হবে। কাল রাতে বারহেটে মহিন্দর ভকতের বাড়িতে মহেশ দারোগা মদ মাংস খেয়ে আমোদ করেছে। একটা গুদামে গর্বুকে হাতে পায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে রেখেছে। হাড়মাকেও তাই করে ফেলে রেখেছে। আজ সকালে তারা বারহেট থেকে বের হয়ে উত্তরমুখে যাবে—বাগনাডিহি পার হয়ে সোজা উত্তর-

মুখে—ভাগলপুর। সাঁওতালেরা এসে জমেছে। থমথম করছে তাদের মুখ। বুকের ভিতরটা গুরগুর করছে। মহাজন তার পালোয়ান সব—তার সঙ্গে সরকারী সিপাহী—তার উপর মহেশ দারোগা।

ঠিক এই সময় এল এই মাঝি। হাতে তার একখানা সাদা কাগজের গোছার খাতা। চাঁদ রায় (সিধু কানুর দাদা নয়) পাহারা ছিল মহিন্দর ভকতের গুদামঘরে, সিপাহীদের সঙ্গে। সারারাত সে শুনেছে গর্বু মাঝির গর্জন আর হাড়মা মাঝির কান্না। ভোরবেলা সে ছুটি পেয়ে বেরিয়ে আসবার সময় ভকতের গদির বারান্দায় কুড়িয়ে পেয়েছে খাতাটা। সেটা সে হাতে করে তুলে নিয়েই চলে এসেছে। সে শুনেছে সিধু আর কানু মুর্মু শুভোবাবু হয়েছে। বোঙ্গা তাদিগে সাঁওতালদের দুঃখ ঘোচাতে বলেছেন। সারারাত সে গর্বু আর হাড়মা মাঝির দুঃখ দেখে ছুটে এসেছে শুভোবাবুর কাছে।—বাঁচাও শুভোবাবু—বাঁচাও।

সাদা খাতাখানা তার থেকে নিয়ে ক্ষুদে সিপাই বলেছিল—ইটো কি ? পাতাগুলো উলটে দেখে বলেছিল—ই বাবা! সাদা খাতা গ! শুভোবাবু! সাদা খাতা আইছে!

কানু সিধু চিৎকার করে উঠেছিল—হুল! হুল লতান আইছে!

মুহূর্তে আগুন ধরেছিল, বারুদে আগুন ধরে বিস্ফোরণে যেমন বিকট শব্দ হয় তেমনি প্রচণ্ড উচ্চ শব্দ হয়েছিল।—হু—ল! ডঙ্কা দে—

ক্ষুদে সিপাই বলেছিল—না। উয়ারা সত্তর (সতর্ক) হবেক। না।

বাগনাডিহি বারহেটের মাইল তিনেক উত্তরে। তারও খানিকটা উত্তরে দুটো ছোট নদী মিশেছে। ঘোরেল আর গুমানি। সঙ্গমস্থলে রাখশী থান। হিন্দুরা কালীপূজা করে। মা কালী আছে ওখানে। সাঁওতালরা বোঙ্গার পূজা দেয়। একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছতলা। সেই নদীর ঘাটে বাঁশের সাঁকো আটকে হাজার সাঁওতাল ওপারে সামনে এবং এপারে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রইল শ কয়েক। কানু সিধু যেন সত্যই রাজা। তাদের সঙ্গে ঘুরছে ক্ষুদে সিপাই।

সূর্য উঠল। কানু সিধু কজন সাঁওতাল সর্দারকে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল ওই রাখশী-তলায়। ক্ষুদে সিপাই বললে—এই ঠিক ঠাঁই সিধুবাবু। এইখানে দাঁড়াও তোমরা।

ক্ষুদে সিপাই একটু এগিয়ে দাঁড়াল। দক্ষিণ দিকে তার দৃষ্টি। নিস্তব্ধ স্থির হয়ে আছে দেড় হাজার লোক। হঠাৎ কথা ভেসে এল—আসছেক।

মহেশ দারোগা তার পঁচিশ তিরিশ জনের দল নিয়ে এসে দাঁড়াল। পুলের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে উঠল একটা মাদলের ধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে হাজার লোক উঠে দাঁড়াল।

বিবর্ণ হয়ে গেল কেনারাম ভকত। চমকে গেল মহেশ দারোগা! এ যে স্বপ্নেও তারা কল্পনা করতে পারে না। মাটির মত জীবন—লাঙলের ফালের কর্ষণে আর্তনাদ করে না, বোবা মাটির ঢেলা, তারা মাথা ঠেলে উঠে দাঁড়াল। তবু দারোগা মহেশলাল ধমকে উঠল—কারা তোরা, পথ ছাড়।

ক্ষুদে সিপাহী অশথগাছতলা থেকে বলে উঠল—কুত্তা তু। কাকে ভুখাইছিস। সেলাম

দে, ছামুতে তোর শুভোবাবু রাজাবাবু।

—রাজাবাবু? কে? কোথাকার রাজা?

সিধু বলে উঠল—এই স্থানটোর রাজা আমরা। এই স্থানটো আমাদের।

সঙ্গে সঙ্গে কানু, সঙ্গে সঙ্গে হাজার সাঁওতাল কণ্ঠ বলে উঠল—ই স্থান আমাদের।

চমকে উঠল দারোগা। 'দেশ আমাদের'—এ কথা সে কখনও শোনে নি।

নয়ন পাল বলছিল—

"সিধু কানু হুকুম করে খোল বাঁধন খোল—
এই দেশ আমাদের আর বার বোল।"

আমি এসব জানি। ইতিহাসে লেখা আছে। বাঁধন খুলে গর্বু এবং হাড়মাকে মুক্ত করেছিল তারা। বেঁধেছিল কেনারামকে আর দারোগাকে। গর্বুই সর্বাগ্রে একজনের হাত থেকে টাঙি কেড়ে নিয়ে আঘাত করেছিল কেনারামকে। প্রথম আঘাতের পর ছুটে গিয়েছিল সাঁওতালের দল টাঙি নিয়ে। আঘাতের পর আঘাত পড়েছিল। দারোগাকেও আঘাত করেছিল একজনে। কিন্তু কে বলেছিল—না। উকে এমন করে মেরো নাই। উকে রাখশীতলায় বলিদান দাও।

আহত দারোগাকে বেঁধে এনে রাখশীতলায় বলি দিয়েছিল বলির পশুর মত। তারই রক্তের টিকা পরেছিল শুভোবাবুরা।

নয়ন পাল বললে—সে ওই ক্ষুদে সিপাই। ওই রুকনী। সেই বলেছিল বলি দিতে। সেই দিয়েছিল রক্তের তিলক। বলেছিল—এই হল রাজটিকে।

তারপর বলেছিল—ওই রক্ত লাও রাজাবাবু ঠোঙা করে। রানীদিকে টিকা দিবে। তুমরা রাজা হলে তারা রানী হবেক।

সিধু রক্তে একটা আঙুল ডুবিয়ে বলেছিল—তু পর।

—না রাজাবাবু। আমি সিপাহী। তুমার সঙ্গে থাকব।

—রুকনী!

—না রাজাবাবু। লড়াই শেষ হোক। আমি লিব—নিজে চেয়ে লিব গ—বুলব—রাজা, আজ আমাকে রানী কর। তুমি ফুলকে পরাও।

নয়ন পাল বলছিল—

"রুকনী সামান্যা নয় ত্রিভুবন বলে।
সাধকের শক্তি সে যে সঙ্গে সঙ্গে চলে।
কায়া সাথে ছায়া হেন সদাই রঙ্গিনী।
যুদ্ধ করে নৃত্য করে সঙ্গীতে রঙ্গিনী।
হাস্য পরিহাস করে কভু করে রোষ।
তুলে দিয়ে নরনারী বীরে করে তোষ।

ভালবাসে প্রাণসম নাই অভিলাষ।
বীরে জয়ী করিবারে সদাই প্রয়াস।
পাপ নাই পুণ্য নাই করে সর্ব কর্ম।
সাধকের শক্তি যে তার বোঝা শক্ত মর্ম।"

বাবু, সত্যিই আশ্চর্য মেয়ে এই রুকনী। দুই ভাই রাজাবাবু পালকি চেপে চলত গাঁয়ের পর গাঁ লুট করে, জয় করে, কেটে মেরে, সে অত্যোচার বড় অত্যোচার বাবু। ভট্টচাজ ছড়াতে বলেছেন—

"শক্তি যবে উন্মাদিনী উলঙ্গিনী হয়।
কে বা পাপী কে পুণ্যাত্মা সে বিচার নয়।
কি বা কর্ম কি অকর্ম ধর্ম কি অধর্ম।
প্রলয়ে বিচার নাই এই গুহ্য মর্ম।"

সিধু কানু বেপরোয়া হুকুম দিয়ে কেটেছিল। ছেলেও কেটেছে বাবু। তবে মেয়ে কাটা শুনি নাই। তা না কাটুক তবু সে চরম ব্যাপার! এখানকার পট দেখাতে ছড়া বলতে আমারও জিভে আটকায়। শুনেছি পথের দুধারে সাঁওতাল মেয়েরা এসে দাঁড়াত ভিড় করে। যুবতী কালো সুঠাম সাঁওতাল মেয়ে দেখলেই তাকে ডেকে তার কপালে তেল সিঁদুর ঘষে দিয়ে তাকে পালকিতে তুলে নিত। আবার নতুন কাউকে মনে ধরলে পুরনোকে নামিয়ে নতুনকে তুলত। ভট্টচাজ বলেছেন—এ কাজ করত রুকনী। রাজাবাবুদের চোখের চাউনি দেখে ক্ষুদে সিপাই বুঝতে পারত মনের কথা। আবার মেয়েরা যারা রাজাবাবুকে দেখে মনে মনে বরণ করত কামনা করত তাদের মুখ দেখেও বুঝতে পারত। সে তাদের হাতে ধরে বলত—"নাও রাজাবাবু, একে নাও তুমি! দাও কপালে সিঁদুর।"

এ কথা ইতিহাসেও আছে। বেনাগড়ের এক মাঝির স্টেটমেণ্ট আছে—তাতে সে বলেছে—"If they fell in love with any girl at the sight of any girl then they would place their napkins of them (Sidhu and Kanu) on the head of the girl. The girl was then brought to them in the palanquin; if again in the course of the march they fell in love with another girl she was also brought to them." কিন্তু ত্রিভুবন বলেছেন—রুকনী এনে হাত ধরে তুলে দিত তাদের। টুশকি কাঁদত। রুকনী হাসত।

নয়ন পাল বললে—ত্রিভুবন ভট্টচাজকে দুর্গাপুজার সময় রুকনী বলেছিল আশ্চর্য কথা। ভট্টচাজ তাকে বলেছিলেন—ওরে, তুই এবার সিঁদুর পর। সিঁদুর হাতে সে হেসে বলেছিল—।

অর্ধপথে থেমে নয়ন বলেছিল—সে দুর্গাপুজোর কথার সময় বলব বাবু। এখন যেখান থেকে ছেড়েছি সেখান থেকে বলি।

হুল আরম্ভ হয়ে গেল পাঁচকোঠিয়ার অশত্থগাছের তলায় রাখশী মায়ের থানের সামনে। তারপর রব উঠল—হুল হুল হুল।

খিতাং তাং খিতাং খিতাং মাদল বাজিয়ে বারহেটের বাজার লুঠ করতে চলল। ঘোড়ায় চড়ে সিধু আর কানু শুভোবাবু আর টাট্টুতে চড়ে ক্ষুদে সিপাই। সিধুর মনে আগুন জ্বলছে। কাটবে মহেন্দর ভকতকে। লুঠের হুকুম দেবে গোটা বাজারে ; কাটবে মহাজনদের। মুক্ত করে দেবে দশ টাকায় আজীবন কেনা সাঁওতালদের। ডঙ্কা বাজিয়ে ঘোষণা দেবে—রাজা হল শুভোবাবু হল সিধু মুর্মু আর কানু মুর্মু—কোন সাঁওতাল খাজনা দেবে না কোন জমিদারকে। কোন হুকুম মানবে না 'কপ্‌নি'র (কোম্পানির)। লুঠ কর বাজার। কাট দিকুদের। জ্বালিয়ে দাও বাড়িঘর। বরবাদ করে দাও সরকারী থানা—লুঠ কর নীলকুঠি রেশমকুঠি। কিন্তু বারহেটে এসে সিধুবাবুর মন খারাপ হল। মহেন্দর ভকত ঘরে গলায় দড়ি দিয়েছে ভয়ে। আর মহাজনেরা পালিয়েছে। লুঠ হল বাজার। অনেক মহাজন এসে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে বললে—মাফ কর রাজাবাবু—আমরা তোমার প্রজা। যা বলবে তাই মানব। ছেড়ে দিলাম সব সাঁওতালদের। তারা খালাস, তারা খালাস, তারা খালাস। শুধু তাই নয়, তারা এনে সামনে রাখলে টাকার থলি। রাখলে রঙিন কাপড়ের থান। নানান জিনিস। গয়নাগাঁটি। রূপাদস্তার নয় বাবু, সোনা-রুপার।

বাবু, সিধু সোনার হার নিয়ে দিয়েছিল রুকনীর হাতে—পর।

রুকনী নিয়ে চাদরে বেঁধে বলেছিল—আমার ফুলরানীর দাও আগে রাজাবাবু, আমি তাকে দিব! ই হারটোও দিব। সিপাহী কি হার পরে গ। আমি কি মেয়া বটি।

আর বলেছিল—রাজা, তুমরা পোশাক কর। এই কাপড় দিয়া ওইসব দিকুদের যারা কুর্তা করে তাদের দিয়া পোশাক তোয়ের করাও, লইলে মানাবে কেনে গ!

ওস্তাগর ডেকে তখনই লাল গেরুয়ার পোশাক তৈরী করতে দিয়েছিল। পোশাক কেমন হবে তাও সে বলেছিল। বলেছিল পাদরীরা যেমন সাদা পরে, তুমরা তেমনি লা—ল পর। তুমরা রাজা।

তারপর বাবু বারহেট থেকে লীলাতেড়, সেখান থেকে ডাকেতা—তারপর লাহেড়িয়া—হাগামা—

"লীলাতেড়ে ভিলিগণ ধনী মহাজন
সুদের কারবারী করে ধান টাকা দাদন।"

আমি বললাম—পাল মশায়, ওসব কথা আমি পড়েছি। লীলাতেড়ের ভিলি মহাজনকে ধরে নিয়ে এসেছিল শুভোবাবুদের লোক। কিন্তু সে হাত জোড় করে বলেছিল—হুজুর, খাতক যা বুলবে তাই হবে। পুছ করুন আপনি খাতককে। তার মুখ দেখে আর বাড়ির মেয়েছেলেদের কান্না শুনে খাতক সাঁওতালেরা বলেছিল—আমাদের উপর এ মহাজন কিছু করে নাই শুভোবাবু। আমরা যা দিলম তাই নিলে।

তাদের খালাস দিয়েছিল সিধু কানু।

ওসব ইতিহাসে আছে: দেশজোড়া সাঁওতাল অভ্যুদয়। শুধু বিদ্রোহ বিপ্লব নয়। গোড্ডার কাছে পাঁজারারার বাজারে সিপাহীদের সঙ্গে লড়াই করে সিধু কানু বিজয়ী হয়েছিল—রাজা মারা গিয়েছিল।

ইতিহাস মনের মধ্যে বলে যাচ্ছে—এরপর উত্তরে ভাগলপুর রাজমহল থেকে দক্ষিণে বীরভূমে ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত—পূর্বে মুরশিদাবাদ জঙ্গিপুর কাঁদী থেকে রামপুরহাট নারাণপুর হয়ে গনপুর তিলকুড়ি বিষ্ণুপুর আম্বারপুর কাপিষ্ঠা রাজনগর আমজোড়া ঘাট থেকে পশ্চিমে দেওঘরের ধার পর্যন্ত ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার সাঁওতাল সুদীর্ঘ দিনের শোষণের অত্যাচারে ঘৃণার জন্য পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ক্ষোভে ইতিহাসের অমোঘ বিধানে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগারের মত আকাশে উঠে ছড়িয়ে পড়েছিল গলিত লাভার মত।

মানব প্রকৃতির আদিম রুদ্র প্রকাশ। এখানে ন্যায় অন্যায়ের বিচার অচল। সমাজ এখানে শবের মত প্রাণহীন—নিদারুণ আক্রোশে তার বুকের উপর অত্যাচারিতের আশ্চর্য অভ্যুদয় তাণ্ডব নৃত্য করে। না! সমাজ এখানে শব নয়—অত্যাচারিতের অভ্যুদিত শক্তি—সেও লজ্জাহতা কালী কল্যাণী নয়।

আদিম ক্ষুব্ধ প্রকৃতি রুদ্ধ আক্রোশে কোন বিধান মানে না। মহাজনদের তারা কেটেছে। কেনারামের মত খণ্ড খণ্ড করে কেটেছে অনেক মহাজনকে। মহাজনদের একটি একটি করে আঙুল কেটে বলত—এই আঙুলে তোরা টাকা বাজাস। লে—টাকা বাজা। চন্দ্রপুরের রামধন মণ্ডল সদগোপ মহাজন ধানের কারবারী। সাঁওতালরা রামধন মণ্ডল আর তার ছেলেকে ধর্মরাজের হাড়িকাঠে বেঁধে বলি দিয়েছিল। রথের দিন কুমড়াবাদে জোতদারদের মুণ্ডু কেটে রথের চারি ধারে ঝুলিয়ে দিয়েছিল।

কুমড়াবাদের জমিদার প্রাণের ভয়ে জলে নেমে পানা এবং ঘাসের মধ্যে মাথা লুকিয়ে গলা ডুবিয়ে বসেছিল—তাকে চারিদিক থেকে তীর মেরে বিঁধে মেরেছিল তারা। নারাণপুরের জমিদারকে নৃশংস আক্রোশে কেটেছিল! প্রথমে হাঁটু পর্যন্ত পা দুটো কেটে বলেছিল—এ লে, চার আনা। তারপর কোমরে কেটে বলেছিল—লে, এবার আট আনা লে। তারপর হাত দুটো কেটে শোধ করেছিল বারো আনা। সবশেষে মুণ্ডু কেটে চিৎকার করে বলেছিল —ফারখৎ! জামতাড়ার রাজা পালিয়েছিল। পাঁড়বার রাজা লুকিয়েছিল।

স্বার্থপর সুদখোর বামুনদের বলত—গুরুষঠাকুরের বলির পাঁঠা। গুরুঠাকুরকে দেখিয়ে তাদের কেটেছে।

মানুষের মধ্যে প্রকৃতির আদিমতম রূপের রুদ্র প্রকাশ। ইতিহাস সম্ভ্রমে তাকে ধরে রেখেছে। বিচার করে নি। বলেছে—এ একটা বিচারের রায়।

নীলকুঠি লুঠ করেছে প্রতিহিংসায়। লারকিন্স সাহেব ও তার ছেলে মরেছে। মেরেছে তারা। লারকিন্সের স্ত্রী এবং শালিকাকে কেটেছে।

লড়াইও করেছে। শুধু লুঠ শুধু হত্যা করে নি। শুধু হাঙ্গামা করে নি। ইংরেজের সিপাইদের সঙ্গে লড়াইও করেছে। করেছে এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। বন্দুকের সঙ্গে সঙিন তলোয়ারের সঙ্গে তীর আর টাঙির লড়াই। অধিকাংশ জায়গাতেই হেরেছে কিন্তু হার মানে নি সহজে। একজন ইংরেজ আর্মি অফিসার লিখে গেছেন—"It was not war, it was execution. They did not understand yielding. As long as their national drums beat, the whole party allowed themselves to be shot

down. Their arrow often killed our men and so we had to fire on them. When their drums ceased, they would move off for about quarter a mile ; then their drums began again and they calmly stood till we came back and poured a few volleys into them."

এ হিংসা এ বীর্য এ বীরত্ব সবই সেই এক প্রকৃতির চিরন্তন প্রকাশ।

নয়ন পাল আমার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেছিল। সে ডাকছিল আমাকে—বাবু! বাবু! কবার ডেকেছিল তা আমার মনে নেই। শেষ যখন হাঁটুতে হাত দিয়ে ডাকলে তখন আমার সচেতনতা ফিরে এল।

পাল বললে—আর শুনবেন বাবু?

—শুনব। একটু ভাবছিলাম পাল মশায়। কিছু মনে করবেন না। তবে ও সব আর নয়। বেলা গেছে। আমার খাতার পাতা ফুরিয়েছে। একটা জিনিস শুনব।

পাল বললে—দুর্গোৎসবের কথা বলি। ঠাকুর মশায়কে আর আমার পিতামহ ঠাকুর-বাবাকে নিয়ে গিয়েছিল তারা একদিন রাতে এসে পালকি চাপিয়ে। দুর্গোৎসব করতে বলেছিল ওই রুকনী। ঠাকুর মশায়কে জানত। ভৈরবী যার কাছে শুনেছিল। সেই বলেছিল ওই পালকে এনে ঠাকুর গড়িয়ে পুজো করাও রাজাবাবু। পিয়ালপুরের লড়াইয়ে জিতে খুব ধুম করে পুজো করেছিল—বাদ্যভাণ্ড—

বাধা দিয়ে আমি বলেছিলাম—না। থাক পাল মশায়। ও থাক। ও কথাও জানি। মনে মনে গড়েও নিতে পারি। কিন্তু—

—তবে কি বলব বলুন?

—বলুন আমাকে ক্ষুদে সিপাই, ভট্চাজ মশায় যাকে বলেছেন সিধুর শক্তি বা নায়িকা তার কথা, রুকনীর কথা বলুন।

রুকনী—

নয়ন পাল বললে—সে তো মায়ের যোগিনী ছিল বাবা—

শুনে আমি হাসলাম। পাল বললে—হাসছেন বাবা? নিজে ভট্চাজ মশায় বলে গিয়েছেন।

কুণ্ঠিতভাবেই বললাম—পাল মশায়, সেকালে ভট্চাজের কথা সত্যি ছিল। মানে এইসব কথা। একালে আমরা ঠিক মানতে তো পারি নে।

পাল হেসে বললে—তা ঠিক। ই কাল অন্যরকম হয়েছে। তাহলে তাই বলি। তখন যুদ্ধ তো চারিদিকে। সায়েবরা পল্টন নিয়ে যায়—এরা লড়াই দেয়, তারপর মরে যায়। মরে এরাই বেশী—কিন্তু হারে না। তবে জিতও হয়েছে। পিয়ালপুর বলে গেরাম আছে, পাহাড়ে জায়গা সাহেবগঞ্জের উদিকে—সেখানে খুব বড় জিত জিতেছিল সাঁওতালরা।

সেই ঠিক বর্ষা নামব নামব করছে—নামছে—সেই সময় কানু সিধুর দল—সে দল কম নয়—কেউ বলে বিশ হাজার, কেউ বলে ত্রিশ হাজার নিয়ে পিয়ালপুরে পাহাড়ের উপর আড্ডা

গাড়লে। এদিকে তাদের সাহেবগঞ্জ থেকে বীরভূমে ময়ূরাক্ষীর ধার পর্যন্ত একরকম দখল হয়ে গিয়েছে। সাঁওতাল ছাড়া মানুষজন ভদ্রলোক বামুন কায়েত বন্তি সদগোপ এরা দেশছাড়া হয়েছে। ছোট জাত যাদের বলি আমরা—বাউড়ী বাগ্দী ডোম খোপা এদের ওরা কিছু বলে নি। আর বলে নি কামারদের। তাদের তীরের ফলা যোগাতে হত। আষাঢ়ে হাঙ্গামা শুরু—শাওনের শেষ হতে হতে এ মুলুক জয় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক রাজ্যে শৃঙ্খলা হয় নি। এক এক দিকে এক এক জন পরগনাতে শুভোবাবু হয়ে বসল। অবিশ্যি সিধু কানুকে বড় বলে মানত। এই সময়ে পিয়ালপুরে লড়াই হল।

পিয়ালপুরের পাহাড়ে যেখানে লড়াই হল সেখানে পাহাড়টা মজার, গেলে দেখতে পাবেন দুদিকে পাহাড় আর মাঝখানে খাল। বালি আর পাথর। বর্ষার সময় নদী—তাও বর্ষা নামলে—বর্ষা যতক্ষণ বর্ষায় ততক্ষণ। তারপরে এই আধদিন, তাও বড়জোর। আধদিন গেলেই জল নেমে চলে যায়—তখন শুকনো। ঘোর বর্ষার সময় ছিলছিল করে জল বেয়ে চলে—তাতে পায়ের গোড়ালি ডোবে না। দু চারটে জায়গায় পাথরের বাঁধে আটকে এক-হাঁটু এককোমর জল চলে। আবার পাহাড়ে উঠবার ওই পথ।

সাঁওতালরা দুই দিকের পাহাড়ের মাথা আগলে বসে। সাহেবরা সেপাই নিয়ে পাহাড়ের অন্য দিক থেকে উঠতে পারলে না। এই পথের মুখে এসে দাঁড়াল। তখন পশ্চিম আকাশে মেঘ জমেছে—চমকাচ্ছে। আর দূরে ডাক দিচ্ছে।

আমি বললাম—জানি পাল মশায়। ইংরেজরা এদেশের বর্ষার ধরন নদীর ঢল নামা বুঝত না। সাঁওতালরা বুঝতে পেরেছিল পশ্চিমে বনের ওপারে বর্ষা নেমেছে। ঢল নামবে। সে ঢল হাতী ভাসানো ঢল। বুঝতে পেরে ঢুকতে দিয়েছিল। সেই ঢলে ইংরেজ ফৌজ একরকম ভেসে গিয়েছিল। ওদের একজন মেজরও মরেছিল। আপনি রুকনীর কথা বলুন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে ভট্টচাজ মশায় ছড়াতে লিখেছেন রুকনী তখন মধ্যে মধ্যে ক্ষুদে সেপাইদের পোশাক ছেড়ে মেয়ে সেজে নীচে নেমে ঘুরে বেড়াত। বেনাগড়েতে থেকে আর রাস্তাবন্দির সময় সাহেবদের বাংলোতে কাজ করতে করতে ভাল হিন্দী শিখেছিল। বাংলাও শিখেছিল। কালো রংয়ের মোহিনী মেয়ে—ও দেশী কাহার কুর্মীর মেয়ে সেজে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে যেত, খবর নিয়ে আসত। সাজ করত দেয়াশিনীর। একটা কাঠের পিঁড়িতে কাঠি দিয়ে ছত্রি তৈরী করে তার মধ্যে সিঁদুরমাখানো পাথর বসিয়ে ঘুরে বেড়াত গাঁয়ে গাঁয়ে—পূজা দে। পূজা দে। মা আয়িছে। পূজা দে।

লোকে জিজ্ঞাসা করত, কৌন দেবী ছে? রুকনী বলত—কালকা দেবী—কালকা মায়ী ছে। সেই বনের মধ্যে ভৈরবীর কাছে এক মাস ছিল—তার মধ্যে ভৈরবীর কাজকর্ম সে দেখেছিল। অবিকল তাই করত। কপালে সিঁদুরের টিপ পরত, পরনের কাপড় গেরুয়ায় ছুপিয়ে নিয়েছিল। মধ্যে মধ্যে ভর দেখাতো।

পিয়ালপুরের কাছে সংগ্রামপুর। ওখানে ছিল নীলকুঠি, কুঠির সাহেবের ওখানে থাকত ইংরেজ পল্টনের দল। তারা সব দেশী পাহাড়ী সেপাই। আর সাহেবের কুঠিতে থাকত সাহেব কাপ্তেনরা।

পিয়ালপুরের সিপাহীদের কাছ থেকে সেই খবরটা এনেছিল। সঠিক খবর, ওরা সাঁওতালদের আক্রমণ করতে যাবে কাল নয় পরশু। সাহেব তৈরী হতে হুকুম দিয়েছেন। সিপাহীরা কজন এই তরুণী ভৈরবীকে হাত দেখিয়েছিল। বলেছিল, দেখ তো মরেগা কী জীয়েগা?

ভৈরবী খড়ি পেতে ভর করে বলেছিল—হিঁয়া তো মরণ নেহি। কোই জাগা যাবি? যাবি তো তরফ বোল। কৌন তরফ—উত্তর? পচ্ছিম? দখখিন? পুব? কৌন্ তরফ? বোল। নেহি তো ক্যাইসে বলবে?

সিপাহীরা বলেছিল—উত্তর।

—হঁ। পাহাড় পর? উঁচা জাগা?

—হঁ। হঁ।

—তবে তো!—বার কয়েক ঘাড় নেড়ে বলেছিল—তিন আদমী তু লোক। দু আদমীকে মরণ ছে। এক আদমী বাঁচেগা। ওঃ, দমাদম সনাসন আওয়াজ মিলছে হো। কাঁহা যায়েগা রে?

সিপাহীরা সবই প্রায় বলেছিল।

সেই খবর এনেছিল রুকনী। সাঁওতালদের দু পাহাড়ে গাছের আড়ালে আড়ালে সাজিয়েছিল সিধু কানু—আর সেই চাঁদ রায় তার সঙ্গে গর্বু। আর যুদ্ধের দিন সে ভৈরবী মার মত একটা গাছতলায় ঠিক তার মত আগুন জেলে বিনা মন্ত্রে বিনা তন্ত্রে শুধু ঘি পুড়িয়েছিল আর মনে মনে বলেছিল—"জিতায়ে দে মা। জিতায়ে দে!" ওদিকে পুরুত করেছিল বোঙার পুজো, মোরগ বলি দিয়েছিল; বিড়বিড় করে ওদের মন্তর পড়েছিল। তার পুজো শেষ হয়েছিল কিন্তু রুকনীর পুজো শেষ হয় নি। সে কোন ইশারা পায় নি।

হঠাৎ ইশারা মিলল। আকাশে তখন মেঘ বনের মাথায় এগিয়ে এসেছে। একটা বিদ্যুৎ চমকে মেঘ গুরগুর গুরগুর শব্দ করে ডাক দিলে। একটা সনসন শব্দ এল তার কানে। সে বললে—মিলল, ইশেরা মিলল।

বলে সে ছুরি দিয়ে বুক চিরে পাতার দুটো ঠোঙায় রক্ত ধরে ভৈরবী মার মতই একটা হোমের আগুনের সামনে রেখে আর একটা বোঙার স্থানে নামিয়ে দিয়ে বোঙাকে বললে—দোয়া কর। হে বাবা বোঙা!

সঙ্গে আর একটা মেঘের ডাক। সনসন শব্দ বাড়ল। মাথার উপরে বনের মাথায় দোলা লাগল। কানু রুকনীর এসবে খুশী হত না, সে তখন দাঁড়িয়েছে যুদ্ধের সাজ সেজে—তার পাশে চাঁদ রায় গর্বু। মাদলে ঘা দিতে বললে। সিপাইরা ওই নালার মুখে ঢুকেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হোক। সিধু অস্বস্তি বোধ করছিল তার ক্ষুদে সিপাহীর জন্যে—সে পাশে না থাকলে তার নেশা লাগে না লড়াইয়ে। সে ছুটে এল রুকনীর কাছে। হল তুর? আমার ক্ষুদে সিপাহী। উঠ, জলদি।

রুকনী উঠে দাঁড়িয়ে বাকী ঘিটা আগুনে ঢেলে দিলে—আগুনের শিখা হু হু করে জ্বলে উঠল বুকভর উঁচু হয়ে। রুকনী চিৎকার করে উঠল—শুভোবাবুর জিৎ—শুভোবাবুর জিৎ।

লাও শুভোবাবু, আগুনের পরশ লাও।

সিধু তার হাত ধরে বলেছিল—চল চল—লড়াই লাগছে।

রুকনী বলেছিল—হুঁ। আকাশ দেখো। দেখো মেঘ। সনসন শব্দ শুনো। থোড়া সবুর কর শুভোবাবু। উরা জোড়ের ভিতর ভিতর আঁগায়ে আসুক—

তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ আর মেঘগর্জন হচ্ছে পিছনে পাহাড়ের মাথায়। রুকনী বলেছিল—ই মায়ের ইশেরা।

নয়ন পাল ছড়ায় বললে—

"মেঘের ললপে, হলপে হলপে, ছলনায় ডাকে চণ্ডী।
যেন ইশারায়, সাহেবে ভুলায়, আনয়ে বিপদ গণ্ডী।
গুরুগুরু ডাক, হুঁশিয়ার হাঁকে, সাঁওতাল তনয়ে তাঁর।
বুঝিয়া মোহিনী মানবী রুকনী বুঝায়ে অর্থ তার।"

ভট্টচাজ মশায় এখানে ত্রিপদী ছন্দের দ্রুত লয়ে বলেছেন রুকনীর কথাতেই তারা বুঝতে পেরেছিল সবুর করলে ফল হবে। ওদিকে তখন কানুও হুঁশিয়ার হয়েছে। সেও ভাবছে। যুদ্ধে তারা নিরস্ত থেকেছিল তখন। তখন সরকারী ফৌজ অনেকটা ভিতরে ঢুকছে। ঝড় বৃষ্টি এল—ওদিকে ঢল নামল হুড়মুড় করে। তখন তারা শুরু করলে শরবৃষ্টি। কোম্পানির সিপাই অনেক মরেছিল—তার সঙ্গে একজন মেজর।

সেদিন রাত্রে নাচগান হাঁড়িয়া হরিণের মাংসের মহোৎসব হয়েছিল। আর সারা রাত্রি সিধু রুকনীকে বুকে নিয়ে পড়ে ছিল কিন্তু সিঁদুর পরে নি। বলেছিল—সে হবে শুভোবাবু, হবে। এখন আমি তুমার চাকরানী ক্ষুদে সিপাহী থাকব। আমার ভাল লাগছে।

ত্রিভুবন ভট্‌চাজ বলেছেন—

"সাধকের শক্তি যারা তারা নয় বধূ।
তারা হয় জীবনের মনোরমা শুধু।

অন্যায় বলেন নি। এ চরিত্র পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক আছে। তারা সত্যই নায়িকা। এরা যেমন নিন্দিতা তেমনি বন্দিতা।

এই পিয়ালপুরের যুদ্ধের পর বর্ষা নামল ঘনঘটায়। কোম্পানির মিলিটারী সাহেবরা বিপদ বুঝে ভাদ্র আশ্বিন দু মাস যুদ্ধ স্থগিত রাখলে। সাঁওতালদের দেশে সাঁওতাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দু মাসের জন্যে।

রুকনীই বলেছিল—শুভোবাবু হুজুররা একটি কথা বুলক। বুলবি—আমাদের দেশের পরব (বিজয়া দশমী) আছে। দুর্গাপূজা করে দিকুরা। আমাদের উ পূজা নাই। আমি শুনছি—ভৈরবী মা বুলেছিল দুগ্‌গা পূজা করে রামরাজা রাবণকে মেরেছিল। তুমরা উ পূজা কর। চার দিন পূজা হবে পরব হবে। নাম বাড়বেক। আর জিত হবেক। উরা মরবেক। বর্ষা গেলে উরা আবার লড়াই দিবে। পূজা করলে ঠিক জিতবে রাজাবাবুরা।

রাজাবাবুদের খুব মনে লেগেছিল কথাটা। "হাঁ হাঁ কথাটো ঠিক।" সব ছোট

শুভোবাবুকে নিমন্ত্রণ হবে। তারা আসবে। পূজার সময় বড় শুভোবাবুদের ঐশ্বর্য দেখবে। তখন তাদের ঐশ্বর্য অনেক। লুঠ করা ধান প্রচুর—টাকা অনেক, বাজার লুঠ করা কাপড়-চোপড় অনেক। গয়না অনেক। পুঁতির মালা, রূপাদস্তার গহনা, রূপার গহনা। রানী আর রাজাদের সোনার বালা, সোনার মাকড়ি, সোনার মিনি নাকে। রঙচঙে কাপড়। অনেক ধনুক, রাশি রাশি আঁটিবন্দী ঝকঝকে ফলা কাঁড়। বড় বড় টাঙি। তার সঙ্গে তলোয়ার। বাজার থেকে লুঠ করেছে। কোম্পানি সিপাইদের মেরে কেড়ে নিয়েছে। বন্দুক নেয় নি। ওরা তার ব্যবহার জানে না। কার্টিজ বারুদ নেয় নি—নিয়ে কি করবে। অন্ত ছোট শুভোবাবুরা দেখবে এই সব ঐশ্বর্য। দেখবে তাদের সিপাই কত এবং কেমন তাদের বিক্রম। তারা সকলে পরামর্শ করে বলেছিল—হাঁ ঠিক! ঠিক কথা। তাছাড়া ১৮৫৫ সালে দেবতার দয়া প্রসাদ এর প্রতি ছিল গভীর বিশ্বাস। কিন্তু বাঁবড়ে ঠাকুর কোথায় পাবে। বামুনেরা সব ভয়ে দেশ ছেড়েছে। আর বাঙালী বাঁবড়ে ঠাকুর চাই।

সিধু কানুর মনে পড়েছিল ত্রিভুবন ঠাকুরের কথা। হাঁ, ওই বাবাঠাকুরকে আন। বড়া দেবতার মত লোক। উয়াকে আন।

একদিন রাত্রে পালকি করে তাঁকে নিয়ে এসেছিল বাগনাডিহি। তার সঙ্গে নয়ন পালের পিতামহ। সে গড়বে ঠাকুর, ভট্চাজ করবেন পূজা।

নয়ন পাল বললে—

"গুরু শিষ্য দুইজন যেথা যেলে সঙ্গে।
শিষ্য গড়ে দেবীমূর্তি গুরু পূজে রঙ্গে॥
সেথায় সাক্ষাৎ হতে হইবে দেবীকে।
এই বর দিয়াছিলা একদা অম্বিকে॥
ত্রিভুবন ভট্টাচার্য আসি বাগনাডিহি।
বলেছিল—এক কথা তোমাদের কহি॥
দেবীপুজো সুনিশ্চিত হয়ে সুপূজন।
অতঃপর অত্যাচার কর নিবারণ॥
একথা শুনিয়া দুই ভাই করে শলা।
ঠিক ঠিক এইবার স্থাপহ শৃঙ্খলা॥
ঠাকুর বলিল—শুন এই পূজা ফলে।
তোমাদের গত পাপ বিসর্জিব জলে॥
তাহা ছাড়া মন্বন্তরে এইরূপ হয়।
যা হয়েছে তা হয়েছে ধরিবার নয়॥
সে গেল কালীর নৃত্য এইবার মাতা।
দশভুজা হইবেন—শুন তার কথা॥
পুণ্যবানে রক্ষিবেন অত্যাচারী নাশি।
পুণ্যবান হবি তোরা মাতারে প্রকাশি॥"

নয়ন পাল থেমে গেল। একটু ভাবলে, তারপর বললে—পুজো খুব ভাল হয়েছিল বাবু। ভট্টচাজ মশায় মায়ের চোখে পলক পড়তে দেখেছেন, হাসতে দেখেছেন। তার সঙ্গে দেখেছিল রুকনী। সে দেখতে দেখতে চীৎকার করে বলে উঠেছিল—"মা হাসছেক, মা, হাসছে গ। চোখের পাতা পড়ছে গ।" ভট্‌চাজ মশায় সেইদিন তাকে চিনেছিলেন 'নায়িকা' বলে—সাক্ষাৎ নায়িকা। সিধু সেদিন তার কপালে সিঁদুর দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সেদিনও রুকনী বলেছিল—"না। আমার কপালে সিঁদুর দিও না। মা বুলছে দিও না। আমি তো তুমারই রইছি গ। ইয়ার পরে দিবি। লিব লিব—আমি তুমাকে দিতে বুলব।"

প্রশ্ন করলাম—তার পর?

নয়ন পাল বললে—বলছি বাবু মশায়। কিন্তু যা বলছিলাম—বলতে বলতে রুকনীর কথায় চলে এলাম।

অপেক্ষা করে রইলাম—কি বলতে চায় পাল। পাল বললে—বাবু, ভট্‌চাজ মশায় তন্ত্রসিদ্ধ লোক ছিলেন, ওই যে চক্র সিধু কানুকে দিয়েছিলেন ভৈরবী সে চক্র তিনি সাধন করে সিদ্ধ করেছিলেন। ওর ছিদ্রতে দুধ দিলে উথলে উঠত, উছলে উঠত। তাঁর নাকি মায়ের সঙ্গে কথা হত। তিনি নিজে দুর্গাপুজা করলেন। নিজে খুশী হয়ে বলেছিলেন—তোদের জয় অবধারিত রে বাবা। কিন্তু বিজয়া দশমী সেরে ওরা হৈ হৈ করে ফিরে গেল পিয়ালপুরের পাহাড়ে। এর মধ্যে হুকুম দিয়ে গেল—যা করেছ করেছ। অত্যাচার মারকাট যা হয়েছে তা হয়েছে, আর যেন না হয়। খবরদার! কিন্তু বাবু গিয়েই কদিন পর যুদ্ধ হল। সেই যুদ্ধে সব শেষ। শেষ যুদ্ধ! ভট্‌চাজ আপসোস করে লিখেছেন—

"এ কি হইল নাহি জানি—
কি করিল মা জননী দশভুজা
জয়দায়িনী—পূজাফল হইল বিফল॥
ভাবি আমি মনে তাই কালে কালে
মিছা হায় মন্ত্রতন্ত্র কিছু নাই—
দেবতা হতবল॥
মানুষের বুদ্ধি
পাশে যাগযজ্ঞ পুণ্য নাশে
ত্রিভুবন ভট্ট ভাবে কি হবে আমার॥
থাকিতে না চাই ভবে আর না থাকিতে চাই—
পার যা মা কর তাই—
এই ভব ভাবনায় হতে কর পার॥"

চুপ করলে নয়ন পাল। সেও দুশ্চিন্তায় হতাশায় যেন ভেঙে পড়ছিল এই মুহূর্তে।

আমি বললাম—সত্যিই কলিযুগ পাল মশায়। এ যুগে যাগযজ্ঞে কিছু হয় না। আর আগের কালে হয়তো আমরা মনে করতাম সত্য, কিন্তু সত্য ছিল না।

—ছিল না? তাই কি হয় বাবু?

কি করে পালকে আমি বোঝাব। সংগ্রামপুরের যুদ্ধের পরাজয়—ইংরেজ ফৌজের জয় শুধু বুদ্ধির চাতুর্যে আর বন্দুকের শক্তিতে। সাঁওতালরা হারলে অন্ধবিশ্বাসে আর কৌশলের অভাবে। ওদের বিশ্বাস ছিল দেবতার বর ওরা পেয়েছে, ওরা জিতবে। কানু সিধু বিজয়ার দিন বলেছিল—গুলি ইবার আর আমাদের গায়ে বিঁধবে না। দেবতার হুকুমে গুলি জল হয়ে যাবেক।

সেটা বলেছিল ওদের পুরোহিত নাইকে আর সিধু কানু। এবার আর ইংরেজ কর্নেল ভুল করে নি। তারা বুঝেছিল যে, ওই পাহাড়ের উপর বনের মধ্যে এই অরণ্যের অধিবাসীরা সত্যই অপরাজেয়। এবং তারা সেখানে বন্দুক সত্ত্বেও শক্তিহীন।

তাই কৌশল করে ওদের নামিয়ে এনেছিল সমতলে পিয়ালপুরের দক্ষিণে সংগ্রামপুরে। সংগ্রামপুরের মাঠে যুদ্ধ হল। প্রথম কোম্পানীর কিছু সিপাহী গিয়ে বন্দুকের শব্দ করে আক্রমণ করলে। কিন্তু সে শব্দই। ফাঁকা আওয়াজ। তাতে গুলি ছিল না।

কানু সিধু উৎসাহিত হয়ে বললে—গুলি জল হল—গুলি জল হল। ইবার চল—চল ইবার —পাহাড় থেকে নেমে ঝাঁপায়ে পড়ে কেটে ফেল, কেটে ফেল। দুশমনকে কাটলে পাপ নাই। চল চল চল। বাজা মাদল—।

ধিতাং ধিতাং শব্দে মাদল বেজে উঠল। শিঙা বাজল। বিশ হাজার সাঁওতাল পাহাড়ের বন থেকে বেরিয়ে দাঁড়াল—তখন কোম্পানীর সিপাহীরা হটে যেন পালিয়ে যাচ্ছে পিছনে। সমতল মাঠ সেখানে।

চাঁদ রায়কে কানু হুকুম দিলে—চাঁদ, ছুট্ তু তুর দল নিয়ে, ঝাঁপায়ে পড়।

চাঁদ রায় কানু সিধুর সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক সেনাপতি। চাঁদ পাহাড় থেকে নদীর ঢলের মত নেমেছিল। তারপর? তারপর যা হবার তাই হয়েছিল। কোম্পানীর সিপাহীদের কাপ্তেনের হুকুম বেজে উঠেছিল তীব্রকণ্ঠে—হ—ল্ট!

তারপর—রাইট টার্ন!

ঘুরল কোম্পানীর ফৌজ। বন্দুক ধরে অপেক্ষা করে রইল। চাঁদ ছুটছিল দুরন্ত বেগে —কোম্পানীর ওই কটা ফৌজকে গ্রাস করে ফেলবে।

তারপর—ফায়ার!

গর্জন করে উঠেছিল বন্দুকগুলো এক সঙ্গে। হাজার বন্দুক। পড়ল হাজার মানুষ। তবু চাঁদ দমল না। থামল না। কি হল দেখলে না। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়লে। আবার ফায়ার। এবার চাঁদ পড়ল।

উপরে দাঁড়িয়ে কানু দেখছিল। এ কি হল? তাজা রক্তে ভেসে যাচ্ছে সবুজ মাঠ— সাঁওতালেরা পড়ে কাতরাচ্ছে। অনেকে স্থির হয়ে গেছে। মরে গেল? কানু বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল আর ভাবছিল—এ কি হল?

আমার মনে পড়ছে গুলি খেয়ে সাঁওতালদের দলে দলে মরতে দেখে তাদের অপার বিস্ময়ের কথা বলবার সময় কিছুদিন আগে একজন বলেছিলেন—"বোজারা মরছে, গুলি দেখা যাচ্ছে না, পড়ে হাত-পা খিঁচে মরে যাচ্ছে, দেখে হাঁ হয়ে গেল কানু।" কথাটা বলে

হেসেছিলেন। আমার মনে পড়েছিল সঙ্গে সঙ্গে হিরোশিমার কথা। ঠিক সেদিন আধুনিক বিজ্ঞানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অগ্রসর জাপানী জাত এমনি ভাবে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞান। পূজক তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব, পুরোহিত তার কূটবুদ্ধি। সেখানে আজও ন্যায় নেই, পুণ্য নেই, পাপ নেই, অন্যায় নেই।

একটা স্বীকারোক্তি মনে পড়ছে। এই যুদ্ধ সম্পর্কে এক ইংরেজ কর্নেল এই ভাবে তীর-ধনুকধারী সাঁওতালদের প্রতারণা করে সমতলে নামিয়ে বন্দুকের গুলিতে হাজারে হাজারে মারবার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"There was not a single sepoy in the war who did not feel ashamed of himself."

কিন্তু এতেও তারা ফেরে নি।

কানু তলোয়ার বের করে মাথার উপরে ঘুরিয়ে চিৎকার করে ডেকেছিল—ভাই হো! তার পাশে তখন ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে টুশকি—সে হাঁপাচ্ছিল। এদিকের পাহাড়ের মাথায় সিধুও স্থির দৃষ্টিতে সব দেখছিল—সেও নীরব কিন্তু স্থির! তার পাশে তার ক্ষুদে সিপাহী। সিধু চিৎকার করে সাড়া দিয়েছিল—দাদা হো!

—চল হো। মার হো কাট হো।

—হাঁ, চল হো।

মাদল থেমে গিয়েছিল; তাদের বিস্ময়েরও অবধি ছিল না। এমন তারা কখনও দেখে নি। কানু তলোয়ার ঘুরিয়ে হেঁকে বলেছিল—বাজা। মাদল বাজা! হো। বাজা।

বাজল মাদল। কানু ছুটবে এমন সময় তার পিছন থেকে টেনেছিল টুশকি। তার মুখরা স্ত্রী।—যাস না।

—যাব না?

—না। মরবি?

—তা বলে ফিরব? ছাড়।

—না মরবি।

সঙ্গে সঙ্গে কানু তার স্ত্রীকে কেটে বলেছিল—তু তবে আগে মর। বলে ছুটে নেমেছিল এ পাহাড় থেকে। ও পাহাড় থেকে সিধু—তার সঙ্গে ক্ষুদে সিপাহী।

এদিক থেকে আর কয়েকবার গুলির ঝাঁক এসেছিল ছুটে।

এরা পড়ছিল। কানু পড়ল কপালে গুলি বিঁধে। ওদিকে সিধু পড়ল।

কানুর গুলি বিঁধেছিল কপালে। সিধুর গুলি বিঁধেছিল হাতে, কাঁধের নীচে। তখন অন্ধকার নামছে। পিছনে পশ্চিমে বন। বনের ছায়ায় অন্ধকার মুহূর্তে মুহূর্তে গাঢ় হচ্ছিল।

সেই অন্ধকারের মধ্যে সাঁওতালরা ভয়ার্ত হয়ে বনে ঢুকছে। ওদিকে সমতলে বাজছে ইংরেজের মিলিটারী ব্যাণ্ড। তারা ভাবলে ওরা এগিয়ে আসছে। তারা বনে গিয়ে ঢুকল। কানু স্তব্ধ স্থির হয়ে গেছে এপাশে। দৃষ্টি তার নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে বিস্ফারিত। এদিকের পাহাড়ে সিধু কাতরাচ্ছে—অনর্গল রক্ত ক্ষরিত হচ্ছে। তাকে বুক দিয়ে

ঢেকে তার ক্ষুদে সিপাহী।

—শুভোবাবু!

—রুকনী!

—উঠ শুভোবাবু। হাত জখম হইছে। দাওয়াই দিলে সারবে। উঃ। আমার কাঁধে ভর কর। শুভোবাবু!

সে তাকে নিজের কাঁধের উপর অক্ষত হাতটা ধরে তুলে সন্তর্পণে নিয়ে এসেছিল বনের ভিতর। বনের ভিতর ছোট ছোট ঝুপড়ি বেঁধেছিল তারা থাকবার জন্যে। সে একটা ঝুপড়ির ভিতর তাকে শুইয়ে দিয়ে তার মুখে জল দিয়ে একটু হুহু করে বলেছিল—শুয়া থাক শুভোবাবু, আমি বন থেকে লতা ছিঁড়ে আনি। বেঁটে বেঁধে দিব। আঁধার হয়ে গেইছে, উরা এখুন পাহাড়ে বনের ভিতর ঢুকবেক নাই।

—এ কি হল রুকনী!

—কি হল গ?

—এমন করে মেরে ফেলালে!

—ফলাক। আবার জিতব আমরা। শুয়ে থাক তুমি। বলে সে বেরিয়ে গিয়েছিল বনের মধ্যে ওষুধের সন্ধানে। এখানকার সব তার চেনা। সব সে চিনে রেখেছে।

ওদিকে তখন সাঁওতালরা বনের ভিতরে ভিতরে আরও পিছনে হটবার মতলবে ছুটোছুটি করছে। পথে দুজন সর্দার যারা সিধুর অনুগত তাদের সঙ্গে দেখা হতেই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল—সিধু শুভোবাবুর হাতে গুলি লাগল। তাকে দুইদিকের ঝুপড়ির ভিতর শুয়ায়ে দিছি। তুরা দেখ গা। আমি ওষুদ নিয়ে এখুনি এলম। কানু শুভোবাবুর কি হল জানিস?

—তার কপালে গুলি লাগল, মাথার পিছাটা খুলে গেইছে। সি মরল।

—সিধু শুভোবাবু বেঁচে আছে—বাঁচবেক। তুরা বাঁচা। আমি এখনি এলম।

অসম সাহসিনী মেয়েটা চলেছিল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চিতাবাঘিনীর মত। লাফিয়ে লাফিয়ে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিল। এ কি হল? পথ ভুল হল? ঝরনার শব্দ কই? ঝরনার পাশে আছে সেই লতা।

ঘুরল সে। ঘুরেছিল মনের ক্ষোভে একটু বেশী জোরে। পায়ের আঙুলে যেন কেউ ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করলে। হোঁচট খেয়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তারপর সব অন্ধকার।

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে। জ্ঞান যখন হল তখন বন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। সব যেন ঘুমিয়ে এরা। তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের ফালি ফালি আলো গাছের পল্লবের ফাঁক দিয়ে বনের ভিতরে এসে একটু একটু সব দেখা যাচ্ছে। সে তারই মধ্যে আবার খুঁজতে বেরিয়েছিল সেই ঝরনা। ঝরনা সে পেয়েছিল। ওষুধও পেয়েছিল। ওষুধ নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে ফিরেছিল আস্তানায়।

কিন্তু সিধুবাবুকে সে পায় নি। সে ঝুপড়ি শূন্য। আশেপাশের ঝুপড়ি শূন্য। কি হল? কোথা গেল তার শুভোবাবু?

সে চিৎকার করে ডেকেছিল—শুভোবাবু—সিধুবাবু হো!—

বনের মধ্যে প্রতিধ্বনি গমগম করে উঠেছিল। উত্তর মেলে নি।

—সিধুবাবু!

ডাকতে ডাকতে সে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছিল গভীর থেকে গভীরে। কিন্তু হাঁটবার খুব ক্ষমতা তার ছিল না! পায়ের কটা আঙুলের নখ উঠে গিয়েছিল। বসতে হয়েছিল তাকে। তখন ভোর হয়ে আসছে। একটা গাছের শিকড়ে বসে গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসেছিল সে।

নয়ন পাল বললে—ছ মাস পর তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঠাকুরের। ঠাকুরকে সে বলেছিল তখন।

ভোরের সময় সূর্য উঠছে, তখন তার নজরে পড়েছিল তার ঘাড়ে হাতে বুকে রক্তের চিহ্ন! বুঝতে পেরেছিল সে। এ সিধুর রক্তের কুটি।

এতক্ষণে সে কেঁদে উঠেছিল—শুভোবাবু! আমার কপালে সিঁদুর দাও। রক্তের তিলক দাও কপালে। আমাকে রানী কর শুভোবাবু।

—তারপর?

তারপর সব শেষ বাবু। কানু মরেছিল। সিধু মরে নি, সেদিন তার সর্দাররা গাছের ডাল কেটে একটা ডুলি তৈরী করে তাতেই তুলে তাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। সে তখন অজ্ঞান। রক্ত পড়ে পড়ে একেবারে কাটা ডালের পাতার মত আমলে গিয়েছিল। তাকে নিয়ে তারা সোজা চলে এসেছিল বাগনাডিহি পার হয়ে পীপড়াতে। তখন দেশে সাঁওতালদের বুক ভেঙে গিয়েছে। কানুবাবু মরেছে। সিধু নিরুদ্দেশ। ছোট ছোট শুভোবাবুরাও মরেছে। কতক ধরা পড়েছে। সিউড়ি জেল, ভাগলপুর জেল ভরতি হয়ে গিয়েছে সাঁওতাল আসামীতে।

এরই মধ্যে ডুলিতে বয়ে নিয়ে এসেছিল সিধুকে পীপড়ায় হাড়মা মুর্মুর বাড়ি আশ্রয়ের জন্যে। সিধুর তখন হাত ফুলেছে। প্রবল জ্বর। তার মধ্যে চেঁচায়—রুকনী! ক্ষুদে সিপাহী হ!

দিন সাতেক পর জ্ঞান হয়ে একটু বল পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল—কোথা রুকনীকে ফেলে এলি তুরা? কোথা?

সর্দারের তখন ধরা পড়বার ভয়ে মেজাজ খারাপ। তারা বলত—জানি না। সে গ্যেল ওষুদ আনতে, আর এল নাই। সি পালালছে। তুর কাছে ফিরে আসবার লেগে সি যায় নাই, কি করব আমরা। কত বসে থাকব? থাকলে ধরা পড়তাম।

চুপ করত সিধু। কাঁদত আপন মনে।

আরও দিন কয়েক পর সে একদিন রাত্রে উঠে সেই দুর্বল শরীর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল বনের পথ ধরে।—ক্ষুদে সিপাহী! রুকনী!

ওই পথেই সে ধরা পড়ল। ধরিয়ে দিলে একটা মেয়ে। ইংরেজের গোয়েন্দা সাঁওতাল মেয়ে। খবর ওরা পেয়েছিল সিধু এদিকেই বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। সিধু সেদিন হঠাৎ শুনতে পেয়েছিল অবিকল রুকনীর ডাক।

—শুভোবাবু সিধুবাবু! আমার সিধুবা—বু!

—রুকনী! ক্ষুদে সিপাহী!

—শুভোবাবু! শুভোবাবু!

—রুকনী! রুকনী! ইখানে আমি। ইখানে। বলতে বলতেই চারিদিক থেকে কোম্পানীর পুলিশ ফৌজী সিপাহী এসে তাকে ঘিরে ফেলেছিল।• সিধু ধরা দিয়েছিল। শুধু বলেছিল—ই কি করলি? রুকনীর নাম নিয়া ডাকলি কেনে? ই কি করলি?

তারপর ফাঁসী হল সিধুর। সিধুকে ফাঁসি দিলে কোম্পানী বাগনাডিহিতে ওদের গ্রামে সকল লোকের সামনে। তখন সব লোককে মোটামুটি কোম্পানী ক্ষমা করেছে। ফুল তখন গ্রামে ফিরেছে। তাদের সামনেই ফাঁসী হল তার গাছের ডালে ঝুলিয়ে। সিধু এতটুকু ভয় করে নি। বলেছিল—হেরেছি। ফাঁসি দি‌ছিস দে। নিলম ফাঁসি। ফুল, কাঁদিস নাই। রুকনীকে পেলে বুলিস—। না, কিছু না। কিছু বুলতে হবে না। দে ফাঁসি দে।

'জয় বোঙা' বলে সে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছিল।

এরও সাত দিন পরে ফিরেছিল রুকনী! তখন কঙ্কালসার তার চেহারা। একটা পা খোঁড়া হয়ে গেছে। কয়েকটা মাস সে পড়ে ছিল এই পায়ের ক্ষত নিয়ে। পা ফুলেছিল, পেকেছিল। কোনরকমে এরই মধ্যে সে ওষুধ ছিঁড়ে দাঁতে চিবিয়ে ক্ষতে লাগিয়েছে। গাছের পাতা খেয়েছে। ফল খেয়েছে। কদিন অজ্ঞান হয়েও ছিল। একটু সুস্থ হয়ে সে কোনরকমে এসে লোকালয়ে পৌঁছে খবর পেয়েছিল সিধুবাবুর ফাঁসি হবে। সে প্রাণপণে খোঁড়া পায়ে এসে পৌঁছেছিল বাগনাডিহি।

গ্রামের লোকে তাকে দেখে খুশী হয় নি। কিন্তু ফুল হয়েছিল। টুকনীর সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছিল কানু। টুশকি মরেছে। তবু টুকনীকে সহ্য করে নি লোকে। সে চলে গেছে আবার বেনাগড়ে। ক্রীশ্চান হয়েছে আবার।

ফুল আশ্রয় দিয়েছিল রুকনীকে। বলেছিল—তু থাক ইখানে। তু আমার মন্দ করিস নাই। থাক। মরবার সময় সে বুলেছিল—রুকনীকে বলিস—। বুলে আর বুললে না। বুললে না।

রুকনী হতভম্ব হয়ে বসে থাকত ওই মজলিসের পাথরটায়। যেখানে তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল সিধুর, তীর দিয়ে ঘলঘসের ফুল পেড়ে দিয়েছিল; যেখানে সিধুরা রাজা হয়ে প্রথম কাছারী করেছিল; যেখানের বড় মহুলগাছের ডালে সিধুকে ফাঁসি দিয়েছিল—সেইখানে। দিনে আসত গ্রামে, ফুলের কাছে বসে থাকত। দুটো খেত। সন্ধ্যা হলেই চলে যেত ওখানে। সারারাত বসে থাকত। পাগলের মত বকত। বলত—কথা বুল। শুভোবাবু! রাজাবাবু! কথা বুল! আমাকে সিঁদুর দাও। শুভোবাবু!—

কথাটা শুনে বুড়ো ভট্‌চাজ মশায় বলতেন—সিধু তা হলে আসে, দেখা দেয়!

আমি চমকে উঠেছিলাম। সেদিন তাহলে সেখানে দেখেছিলাম কি সিধুকে? সিধু দাঁড়িয়েছিল? কিন্তু রুকনী?

বললাম—রুকনীর কি হল ? কত দিন বেঁচে ছিল ?

পাল বললে—বেশী দিন নয় বাবু। আরও ক'মাস। মাস তিনেক। গরমের সময়, বোশেখ মাস তখন। ফুলের কাছে খেয়ে থেকে একটু সেরেছে—আবার তার চেকনাই ফিরছে। সেই সময় ফুলের কাছে এক সের ঘি চেয়ে নিয়েছিল। রুকনী বলেছিল—ভৈরবী মায়ের মতুন যজ্ঞি করব।

—যজ্ঞি করবি ?

—হুঁ।

—কি হবে তাতে ?

—ভৈরবী মা বুলত—ই যজ্ঞি করলে যা মনে করবি তাই হবে। সেই সায়েবটোর মুণ্ডু সি পেয়েছিল।

—তু কি মনে করবি ?

—মনে ? মনে—। মনে করব—সি আবার বাঁচুক।

—বাঁচবেক ? মরা মানুষ বাঁচবেক !

—হেঁ।

ফুল দিয়েছিল তাকে ঘি। শুধু ঘি নয়, অন্য উপকরণও দিয়েছিল। কিন্তু বাবু, অল্পবুদ্ধি সরল জাতের মেয়ে আর মাথাও ঠিক ভাল ছিল না। যজ্ঞি করতে গিয়ে এমন করে ঘি ঢাললে যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠে লাগল চারি পাশের শুকনো ঘাসে। তার উপর বোশেখ মাস। নিজেও ছিল উপোস করে। দেখতে দেখতে বড় বড় শুকনো ঘাসে আগুন লাগল বেড়া আগুনের মত। মেয়েটা নাচতে লেগেছিল আগুনের এমন শিখা দেখে।

ফুল ছিল সেদিন দূরে বসে। সে দেখতে গিয়েছিল। সে ভয়ে নেমে এসেছিল ছুটে। চিৎকার করে ডেকেছিল—পালায়ে আয় রুকনী, পালায়ে আয়। রুকনী তখন নাচছে। বলছে—শুভোবাবু কথা বুল। কথা বুল। দেখ যজ্ঞি হল। কথা বুল।

ফুল চেঁচাচ্ছিল—রুকনী—রুকনী—

আগুন ঘাসে ঘাসে ছড়িয়ে পড়ছিল হু হু শব্দে। সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছিল বাতাস। সেই আগুন লেগেছিল রুকনীর কাপড়ে। ওদিকে চটপট শব্দে আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল সারা বনে।

তাতেই সে পুড়ে মরেছিল। আর আগুনটা জ্বলেছিল মাসখানেক ধরে। বোশেখ জষ্ঠি মাসে বনে আগুন লাগা দেখেছেন ?

দেখেছি। সেই যজ্ঞের আগুনে রুকনী পুড়ে মরে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু সিধু আজও মুক্তি পায় নি, ইতিহাস ওকে মুক্তি দেয় নি। আজও সে বুকে হাত দিয়ে ছায়ায় মিশে সেই ফাঁসি-যাওয়া গাছের মহুয়াগাছটায় ঠেস দিয়ে ভাবে।